মাসানুক্রমিক সূচী।

বৈশাখ।

জ্যৈষ্ঠ।

...াঢ়।

শ্রাবণ।

ভাদ্র ও আশ্বিন।

কার্ত্তিক।

অগ্রহায়ণ।

পৌষ।

মাঘ ও ফাল্গুন।

চৈত্র।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

চ

ত

দ

ন

প

ফ

স

হ

চিত্রসূচী।

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

মাসানুক্রমিক সূচী।

বৈশাখ।

জ্যৈষ্ঠ।

াঢ়।

শ্রাবণ।

ভাদ্র ও আশ্বিন।

কার্ত্তিক।

অগ্রহায়ণ।

পৌষ।

মাঘ ও ফাল্গুন।

চৈত্র।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ব

ভ

ম

য

র

শ

স

হ

চিত্রসূচী।

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

ইংরাজি-শিক্ষার পরিণাম।

পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, সে কালের তেজীয়ান্ মুনিঋষিগণের সন্তান সন্ততি সকল সময়ে জন্মগ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে দশ মাস কাল গর্ভাবস্থানরূপ যাতনাভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই যত্র তত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষিবংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদশাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।

ষাটি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশ মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন; কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল।

তার পর ষাটি বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের বিশেষ উন্নতির বা অধোগতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আর এক তান উঠিয়াছে, ইংরাজি বিদ্যা এ দেশের ক্ষেত্রে ফলিল না; বাঙ্গালার মাটিতে কি বিলাতি ওক গাছের বৃদ্ধি হয়? এ দেশের মাটিতে বরং দেশী প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যার চাষ আবাদ করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

বিজ্ঞের দল স্মিতমুখে বলিতেছেন, আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, বিলাতি মালমাত্রই ভুয়া; কেবল বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া তোমরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিলে; এখন ঠেকিয়া শেখ ও পথে এসো।

সুতরাং নব্য প্রাচীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্বদেশী বিদেশী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; একটা নূতন পন্থার আবিষ্কার ও অনুসরণ না করিলে ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির আর উপায় নাই; সর্ব্বত্র এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের বেশী হইল, ইংরাজি বিদ্যার বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বড় বড় অধ্যাপক বড় বড় জটিল শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর মরিচাধরা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিতেছেন; তথাপি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না। কি পরিতাপ! ভারতবাসীর মস্তিষ্কটারই বোধ হয় দোষ আছে। ডারউইনের মতানুসারে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ভুক্ত জীবের কিছু দিন হইতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক সেই জীব।

যাহাই হউক, সরস্বতী এ দেশে পদার্পণ করিয়া বন্ধ্যা হইলেন, অথবা কেবল অকালপ্রসূত দুর্ব্বল জীবের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন, এ দেশের পক্ষে এ বড় দুর্নাম ও কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং, এই কলঙ্করটনার ভিত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

ফলে কথাটা কত দূর সত্য, দেখা যাউক। বিলাতের মাটিতে নিউটন ফ্যারাডের মত লোক দুই দশটা করিয়া প্রতি বৎসর জন্মায়, এমন নহে; সুতরাং সে কথা বলিয়া হা-হুতাশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনের পক্ষে ত্রিশ বৎসর কি ষাটি বৎসর এত অধিক সময় নহে যে, তাহার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিতে হইবে।

যাঁহারা এরূপ আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্য নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধি নামক গুণের জন্য তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহারা পঞ্চাশ ষাটি বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি-শিক্ষার প্রথম আমদানির সময়ে একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটাইয়া আঠার দিনের মধ্যে ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আস্ফালনেও কোনরূপ অধীর বা বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। ফলে, ইংরাজি-শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রভূত উন্নতি হয় নাই বলিয়া শোক তাপের কোনও কারণ নাই।

কেহ কেহ হয় ত এই সময়ে চোক রাঙাইয়া বলিবেন, বাতুলের মত এ কি কথা বলিতেছ, ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের কোন্ বিষয়ে প্রচণ্ড উন্নতি হয় নাই? যখন আমরা ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে স্পষ্টতঃ অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়াছি, তখন এখনও আঁধার গেল না বলিয়া চীৎকার করা, এবং কেন আঁধার গেল না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বসা, কেবল অন্ধত্বেরই লক্ষণ। দেখ না, আমরা রেলওয়ে খুলিতেছি, সাহেবে কাণ মলিয়া দিবা মাত্র

বিলাতে টেলিগ্রাফ পাঠাইতেছি, এমন কি, মদ্যপানের বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ অন্যায়, ইহাও বলিতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেছি। পুনশ্চ, দেখ, সেকালের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে; আমরা এখন পৃথিবীর গোলত্বের প্রতিপাদনার্থ জাহাজের মাস্তলঘটিত প্রমাণ এক নিশ্বাসে আওড়াইতে পারি; দধি, ক্ষীর অথবা এলকোহলের সমুদ্রের কথা মানি না; কুশ, শাক, প্লক্ষ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌নামীয় দ্বীপের অস্তিত্ব শুনিলে হাস্য করি; বিকটাকার তেত্রিশ কোটী দেবতার স্থলে এক ঈশ্বরের অনুভব করি; এবং ইংরাজি শিক্ষা সহকারে ইংরাজের রাজনৈতিক ধাত লাভ করিয়া বড় চাকরির সহিত নির্ব্বাচন প্রথাদিও চাহিয়া থাকি।

আমরাও বলি, ঠিক্ কথা। ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা। যে ব্যক্তি ইংরাজি শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি। এবং আশা করি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে এইরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে কখনও পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তথাপি—

অর্থাৎ কি না, আমরা শিখিয়াছি অনেক ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। আমাদের মজ্জা বা শোণিত শোধিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থিচর্ম্মসার চিররোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিতনখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুলা, রঙ ও কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে নামান হইয়াছে। জীর্ণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ রোগীকে ফোঁটা কতক ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া কিয়ৎকাল তাহার শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা তাহার হৃৎস্পন্দন পুনরানয়ন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয় না। আমাদের পক্ষে এ কতকটা সেইরূপ। আজ যদি ইংরাজেরা চলিয়া যায়, আমরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, ছুঁচের অভাবে নরুণ বা কাঁটা ব্যবহার করিব, এবং পুনরায় শাকদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ আওড়াইতে থাকিব। এ সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য কথা; সত্য কথা ও পুরাণ কথা; সবিস্তার উল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে

জাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্ত্তৃক এক কাঠা কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই। রাজ্যবিস্তার দূরের কথা; কিরূপে নিজের পরিচিত সীমানা পার হইয়া পা ফেলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না। রাজ্য-অধিকারার্থ কি কি অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তাহার কতকগুলা নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে; কিন্তু কখন তাহা চক্ষে দেখি নাই। আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না, আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না; আমাদের নিজের হাত পার উপর নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনীশক্তির মাত্রা শূন্য। আমরা সোলার সিপাই; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; আমরা ছেলেদের খেলানার ব্যাঙ্; পেট টিপিলে আমরা কক্ কক্ করি।

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা এক হিসাবে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে সেই বা কতটুকু? কতকটা আমরা একত্ব লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী, মার্হাট্টা ও শিখ, এক কার্য্যের জন্য একাসনে বসিবে, ইহা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এখন সম্ভব হইয়াছে, ইহা কতকটা ইংরাজি শিক্ষার গুণে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকটা আবার ইংরাজী শাসনের গুণে ও অন্য পাঁচটা কারণে। এবং এই একত্ব-সাধনেও আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা, লঘুতা ও তন্তহীনতা অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার গুণে আমরা জাতীয় চরিত্রের এই হীনতাটা দেখিতে শিখিয়াছি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি; কিরূপে হীনতার শোধন করিতে হইবে, তাহা শিখি নাই। তবে ভবিষ্যতে ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজের পায়ের বুট ও আমাদের রুগ্ন প্লীহা, এতদুভয়ের সাহায্য লাভ করিয়া কতকটা চরিত্রশোধনের পথ দেখাইয়া দিতেও পারে।

আর জ্ঞানার্জ্জনের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা শিখিয়াছি অনেক। টিটিকাকা টিম্বক্টুর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত হইতে অক্সিজেন, ক্লোরীন, আর ইলেক্‌ট্রিসিটি ও ঈথর, অনেক কথা শিখিয়াছি, যাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমরা বড় বড় আঁক কষিতে পারি, যাহা ভাস্করচার্য্যের মাথায় কখনও আসে নাই; বায়ুমধ্যে শব্দের বেগ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া নিউটন কিরূপে ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, অক্লেশে বলিয়া দিতে পারি। এমন কি, বোতলের ভিতর হাই-ড্রোজেন পূরিয়া নির্ভয়ে আওয়াজ করিতেও সমর্থ হইয়াছি।

শিখিবার শক্তি কত গভীর, এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ মানরজ্জু ফেলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কি বলিলাম। উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ত কিছুই দেখি না, এবং আরও কিছু দিনের মধ্যে যে পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহারও কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। ইংরাজি-শিক্ষার কি এই পরিণাম?

আমরা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত; সে বিষয়ে আমাদের তুলনীয় কে আছে, জানি না। আমরা বালকের হাতে কর্দ্দম; কাঠিন্যমাত্রবর্জ্জিত। আমাদিগকে লইয়া যাহা গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত হইব। আমরা এক দিনের মধ্যে তেত্রিশ কোটী দেবতা ভাঙ্গিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তি-বাদী হইয়া দাঁড়াই, আবার এক বক্তৃতায় আমাদিগকে থিয়সফিষ্ট করিয়া তুলে। আমরা হাতচালা ও ভূত-নামানো গল্প শুনিয়া উৎকট হাস্যে গৃহপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পর মুহূর্ত্তে টেলিপাথি বা সাইকিক্ ফোর্স শুনিলেই আত্মহারা হইয়া গলিয়া যাই।

আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি, তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মানুষের চুল তাড়িতের পরিচালক নহে শুনিবা মাত্র আমরা লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে আরম্ভ করি; এবং চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিবা মাত্র কোষ্ঠী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়!

বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুলা মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজা-ইয়া গোছাইয়া যথাবিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরী-ক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি, ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনা-গুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয়, ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া,

সাগর পার হইতে চাই, সেতুবন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম্ব হইতে বাহিরিবামাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না। উত্তমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল একবার চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি, আবার রিস্‌লি সাহেব নাক মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন, পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজি-শিক্ষায় আমাদের শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে, স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক, আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিব, তত দিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞান ছাড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যত্রই বা আমরা কি করিয়াছি? কিছু দিন ইংরাজি ভাষায় চটকদার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইবার তৃষ্ণা আমাদিগের শিক্ষিতদিগকে অভিভূত রাখিয়াছিল। সম্প্রতি সে ভ্রান্তি কতকটা গিয়াছে বলিতে হইবে। তবে আজিও অকারণে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি জাহির করিতে গেলে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্য কতকটা আমাদের সমাজ সরগরম করিয়া রাখিতেছে সত্য। সুখের বিষয় ও আশার বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে কি? উপন্যাস ও কাব্য? তাই বা কয় খানা? কাব্যরস-আস্বাদনের শক্তি আমাদের কতকটা আছে, স্বীকার করি। সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি। প্রকৃতিতে ও মানবচরিত্রে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতায় আমরা কোনও কালে বঞ্চিত নহি। পূর্ব্বেও ছিলাম না, এখনও নহি। ইংরাজি-শিক্ষা যে এই অনুভূতির মাত্রা বা সূক্ষ্মতা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ; তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ইংরাজের চরিত্র এবং পাশ্চাত্যগণের জাতীয় জীবনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অদ্ভুত ইতিহাস অনেক অপরিচিতপূর্ব্ব সুন্দর প্রদেশ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে; আমরা এখন সেই নূতন ফুলের মধু আহরণে অধিকারী হইয়া কতকটা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি, এই পর্য্যন্ত।

শক্তি বাড়ে নাই; আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি; কিন্তু স্বয়ং বাক্যরচনা করিতে জানি না। আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন; আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই; আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা জানি না।

চির দিনই কি এমনি ছিল! প্রকৃতই কি আমরা পিতৃপরম্পরাক্রমে পিতৃ-পিতামহ হইতে এই অস্থিহীন মাংসপিণ্ডবৎ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছি? বস্তুতই কি আমাদের হীনতা ধাতুগত ও মস্তিষ্কগত? বস্তুতই কি আমরা মানুষ ও বানরের মধ্যগত পর্য্যায়ভুক্ত জীব?

অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন যাঁহার অভ্যাস আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—না। চিরদিন ত এমন ছিল না। গুরুবাক্যে ভারতবাসীর অমেয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে সত্য; এবং সেই আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা কখন কখন জ্ঞানবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ভারতে জ্ঞানান্বেষণ ছিল না, এমন কথা বলিও না; তাহারা জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত করিতে জানিত না, অথবা পুরাতন পরিচিত পরিধির বাহিরে পদক্ষেপ করিতে সে কালের ভারতবাসী সাহস করিত না, এ কথা বলিও না। কিরূপে প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কিরূপে জীর্ণ কুটীর ভূমিসাৎ করিয়া অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, কিরূপে সাহসের সহিত বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া অজ্ঞানের তিমিররাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, সে কালের লোকে জানিত।—সাক্ষী, উপনিষদ্, সাংখ্য, বেদান্ত, দশমিক লিপি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ; লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়; সাক্ষী, বুদ্ধ ও শঙ্কর, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর, গদাধর ও রঘুনাথ। কত নাম করিব? চক্ষে কি জল আইসে না? লেখনী কি সরে?

দধি সমুদ্র ও ইক্ষু সমুদ্রের কথা তুলিয়া হাসিও না; 'তৈলে পাত্র কি পাত্রে তৈল' বিতর্কের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিও না; ঊনবিংশ শতাব্দীর উপার্জ্জিত-জ্ঞানের সহিত সে কালের জ্ঞানের তুলনা করিয়া তাচ্ছীল্য দেখাইও না। মনে রাখিও, সে কোন্ কালের কথা; মনে রাখিও, তখন পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, তখন এ দেশেরই অবস্থা কিরূপ ছিল। নিউটন যাহা জানিতেন না, এখন তুমি জান; তথাপি তুমি নিউটনের চরণরেণুর যোগ্য নহ, এ কথাও স্মরণ রাখিও। তবে সে কালের মাহাত্ম্য বুঝিবে। অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ

ইংরাজের নিকট শিখিতেছি; সে কালেও তাহারা [illegible]রের কাছে না শিখিত, এমন নহে। গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা [illegible]ণ। তবে বিদেশ হইতে বীজ আমদানি করিয়া তাহার চাষ করিতে জানিত, তাহা ফলাইতে পারিত; আমরা তাহা পারি না।

আর যে জ্ঞান স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ও মাত্রাই কি সামান্য? সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিও না।

পুরাকালের কাহিনী দূরের কথা, সে দিন মুসলমানী আমলে আমাদের যা ছিল, এখনও তাই আছে কি? মুসলমান রাজার সময়ে আমাদের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল, এখন বড় উন্নত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা গম্ভীরভাবে অনেকে যখন তখন বলিয়া থাকেন। ছি ছি! লোকে যখন কুর্নিশ করিয়া সাত পা পিছাইয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে যাইত, যখন ভট্টাচার্য্য লম্বিত শিখা সহ টোলে বসিয়া ন্যায় শাস্ত্রের কচকচি লইয়া কাল কাটাইতেন, ও গৃহস্থ ভদ্র পার্শীর বয়েদ আবৃত্তি করিয়া মুন্সীয়ানা জানাইত, এবং পাঠশালার গুরুমহাশয় পোড়োদের দ্বারা তামাক্ সাজাইয়া লইতেন ও উকুন তোলাইতেন, সে কালে আমাদের অবস্থা মনে করিতেও ঘৃণা আইসে। ছি, ছি, সে কালের প্রসঙ্গ মুখে আনিও না।

আমরা লজ্জার মাথা খাইয়া তখনকার প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিতে চাই, এবং তখনকার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে চোখে হাত দিয়া থাকি। ভট্টাচার্য্যের টোলঘরের পার্শ্বস্থ গোশালা ও ইজার-পরিহিত কাজি সাহেবের মুখে পলাণ্ডুর গন্ধ ভুলিয়া যাই। প্রতাপ ও শিবজী, নানক ও কবির, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। চতুষ্পাঠীমধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও ন্যায়, কাব্য ও অলঙ্কারের স্বাধীন আলোচনা মনে পড়ে। এ সকল সত্য কথা; ইতিহাসের অপলাপ করিও না। সে কালে যত দুর্দ্দশাই থাক, সজীবতার লক্ষণ ছিল; শত্রুতেও আমাদের মর্য্যাদা করিত, ভয় করিত। এখন কি?

সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা ও ক্ষমতা আমাদের কোনও কালে ছিল না, এ কথা বলা সাজিবে না। ইংরাজি বিদ্যার কেহ দোষ দিবে না; সে কথা

জীবিকার্জ্জনের পন্থা শিখিবার জন্য বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহাও একটা লোমহর্ষ সত্য কথা, যে ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির হইয়া অর্থোপার্জনে সমর্থ না হইল, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। সমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে টিট্‌কারী দেয়, সে দুষ্কৃতকারীর মত মুখ ঢাকিয়া লোকসমাজে বেড়ায়; তাহার জীবনে ভার বোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগ্যহীন, সংসারমধ্যে সে দয়ার পাত্র।

বিদ্যার এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিয়া গাত্রে লোমাঞ্চ জন্মে; ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা থাকে না; সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজ অনেক আশায় ভারতবাসীর মূর্খত্ব অপনোদনের জন্য বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অমূল্য রত্নের কি এই মূল্য? বানরের গলায় মুক্তার হার শোভা পায় না; ভারতবর্ষের বিদ্যামন্দিরগুলি ভাঙিয়া ফেল।

ভারতবর্ষের, অর্থাৎ যে দেশের মধ্যে এক সুবৃহৎ মানবসম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হইতে কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ধনলালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্ণকুটীর ও শাকান্ন লইয়া তৃপ্ত থাকিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। তাহার কোষে অর্থ ছিল না, তাহার হস্তে তরবারি ছিল না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপনমাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছিল; এবং এই গরীয়ান্ স্বার্থসংহারের জন্য, এই মহীয়ান্ ব্রতাবলম্বনের জন্য সমাজ তাহাকে শীর্ষস্থানে বসাইয়া পূজা করিত। অদ্যাপি চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান আছেন; কোটীপতির মুকুটমণ্ডিত মস্তক তাহার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়।

এখনও সেই প্রাচীন কালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারা ক্ষীণস্রোতে এ দেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও নাকি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর হইতে শিক্ষার্থী নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া শিক্ষকসমীপে উপস্থিত হয়। তাহারা কি শেখে, কি না শেখে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি তাহাদের উদ্দেশ্য, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, কিসে তাহাদের তৃপ্তি, কেবল তাহাই দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

ভারতবর্ষের অন্য জাতির কথা জানি না; কিন্তু হিন্দুজাতি জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝে না, ইহা তাহাদের জাতীয় অপকর্ষের পরিচয়, এ কথা বলিতে পারি না। তবে কেন এমন হয়?

কুক্ষণে ইংরাজ গবর্মেণ্ট শিক্ষিতগণকে বড় চাকরিতে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; এবং কুক্ষণে অর্থাগমের জন্য ইংরাজি জ্ঞানের দরকার হইয়াছিল। দরিদ্র অন্নার্থী ভারতবাসী অন্নাহরণের এমন সুগম পথ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সেই পথে ছুটিবে, বিচিত্র কি? তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্নচিন্তা মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ; সে জন্য যে দোষ, তাহা দরিদ্র হিন্দুযুবকের নহে ; বিশেষতঃ, মাসী, পিসী ও পিসীত ভগিনীর বিধবা পুত্রবধূর অপোগণ্ড সন্তানগুলির সমবায়ভূত সুবৃহৎ ক্ষুধার্ত হিন্দু পরিবার যখন সতৃষ্ণ ও উৎকণ্ঠভাবে কলেজ-যাতায়াতশীল যুবকের আগামী পরীক্ষায় পাশের জন্য ঊর্দ্ধমুখে তাকাইয়া থাকে। দেশশুদ্ধ সমুদয় লোককে যে অন্নচিন্তা ও বস্ত্রচিন্তা ত্যাগ করিয়া বাগ্দেবীর আরাধনায় নিরত হইতে হইবে, এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করিতে পারি না। [illegible] হইতে বাহির হইবামাত্র [illegible] হিন্দুযুবকের চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার শুষ্ক অক্ষম কঙ্কালাবশেষ শরীর অন্নপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, ও বাল্যেবিবাহিতা পত্নী তিন চারিটি শিশুসন্তান সহ অন্নার্থিনী হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতে থাকে, এই ব্যাপারের জন্য মনুষ্যচরিত্র ও সমাজচরিত্রকে দায়ী করিতে পারি ; হিন্দুযুবককে দায়ী করিতে গেলে বড় নিষ্ঠুরতা হইবে।

বিলাতী শিক্ষার সহকারে বিলাতী সভ্যতার নিয়ম এ দেশে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সংসার খরচের মাত্রাটা অসম্ভাপরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে, সেটাও বিবেচনা করা উচিত। চটিজুতা ও তালপাতের ছাতা মাত্র সম্বল করিয়া এমন কি, সেনেটহাউসে পদার্পণ করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে ; এবং উত্তরীয়মাত্র স্কন্ধে করিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে বেত্রাঘাতের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। [illegible] গেলাস মুখে তুলিবার সময় [illegible] কথা না থাকিলে [illegible] দেহে ব্যাধি ঘটিলে কবিরাজ মহাশয়ের প্রাচীন কফপিত্তঘটিত [illegible] আশ্রয় লইতে সাহস হয় না। সুতরাং জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকিলেও কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় না দেখিলে চলে না ; এবং ভিক্ষা ও চাকরি ভিন্ন অর্থাগমের তৃতীয় পন্থা এ দেশে বর্তমান নাই।

একটা কথা উঠিয়াছে, ভাল ছেলেদের জন্য বড়লোকে যদি বৃত্তিসংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল ভাল মাথা হাইকোর্টের গ্রানিট দেওয়ালের আশ্রয় লইতে না যাইতে পারে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে পর্যন্ত

লাটবাহাদুরগণের শুভবিদায়-উপলক্ষে প্রস্তরমূর্ত্তিস্থাপন দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকিবে, তত দিন এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদনমাত্র।

গবর্মেণ্ট শিক্ষাবিভাগে দেশীয়দিগকে মোটা বেতনের চাকরি দেন না, এই একটা আক্ষেপ আছে। কথাটা ঠিক্ আমাদের মত ভিক্ষোপজীবীর উপযুক্ত, সুতরাং প্রথমে উপস্থিত করিতে লজ্জা হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের উপজীব্য, এবং ইংরাজি বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি, তখন আর লজ্জা করিয়া কোন লাভ নাই। গবর্মেণ্টের উপর কতকটা দাবীও আছে। গবর্মেণ্ট শিক্ষাবিভাগে নিয়োগার্থ বিলাত হইতে যে সকল মূর্ত্তি আমদানি করেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের দ্বিপদত্বে সন্দেহ জন্মে। কৃষিকার্য্যের জন্য এ দেশে গরু ও বিলাতে ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। বিলাত হইতে ঘোড়া আমদানি করিয়া চাষে লাগাইলে হয় ত এখানে লাভ ঘটিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া বিলাতী গাধা কি হিসাবে দেশী গরুকে পদচ্যুত করিবে, বুঝিতে পারি না।

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে দোষ বর্ত্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কারসাধন না হইলে কোনরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ না দেখিয়া প্রাচীনের দল পুনরায় টোলে প্রবেশ করিয়া অমরকোষ মুখস্থ করিতে উপদেশ দিতেছেন; এবং আমাদের ইংরাজ মনিবেরা আমাদের জাতিগত হীনতাকেই কারণ স্থির করিয়া আমাদের মনুষ্যজাতীয়ত্বে কিছু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, আমাদের জাতির মনুষ্যধর্ম্মে সংশয়স্থাপনের সম্যক্ কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই; এবং দেশী পুঁথিগুলির বহুল প্রচারের জন্য ইংরাজি গ্রন্থগুলির উপর আমদানি মাশুল বসাইবার প্রস্তাব না করিলেও ভবিষ্যতের আশা আছে। দোষ ইংরাজি বিদ্যার ত কথনই নহে; এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সম্পূর্ণপরিমাণে নহে। বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেই প্রণালীর সংস্কারের একবার চেষ্টা করা উচিত। কোন্ দিকে সংস্কার চলিতে পারে, এ প্রবন্ধে উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম না। যদি কোন পাঠক নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের এত দূর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের এই স্থলে উপসংহার করিলাম।

অভিভাবক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার পৈতৃক ভদ্রাসন কোথায় ছিল, অথবা আদৌ ছিল কি না, সে বিষয়ে সঠিক কোনও সংবাদ দিতে পারিলাম না। স্মৃতিসুন্দরীকে কতবার সাধিয়াছি; তিনি শৈশবের অতি সুদূর প্রদেশ হইতেও বিষ্ণুবল্লভবাবুর রান্নাঘরের রোয়াক ছাড়া আর কোনও স্থানের খবর এ পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে পারেন নাই। সেই রোয়াকের একাংশে আমার সহায়হীনা জননী, আপনার সহায়হীন শিশুটি লইয়া, দিবসের কঠোর কর্ম্মাবসানের পর, রাত্রি একটার সময় আশ্রয় [illegible] লইতেন।

[illegible] বাৎসরিক ঋতুভেদে রোয়াকটির মূর্ত্তিভেদ ঘটিত। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শীতের শেষ পর্য্যন্ত উহার কিয়দংশ দরমার বেড়ায় বেষ্টিত থাকিত; আবার নবীন বসন্তসমাগমের পূর্ব্বেই বৃক্ষ সকলের শীর্ণ পত্ররাশির ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। গরবিনী-নাম্নী গৃহকর্ত্রীর বিশেষ প্রিয়তমা একজন পরিচারিকা ছিল। স্মরণ হয়, উহার সহিত, সেই আবরণ-বেড়ার সত্বর অন্তর্দ্ধানের বিষয় লইয়া, মাঝে মাঝে স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর কলহ বাধিত। গৃহিণীর নবপ্রসূতা কুমারীর দুধ গরম করিবার নিমিত্ত গরবিনী নিশীথে উহা ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইত। প্রাণাধিক সন্তানের গায় শীত লাগিবে, অথবা হিমে তাহার সর্দ্দি হইবে, স্নেহময়ী জননীর তাহা সহ্য হইত না। কিন্তু গরবিনীর সহিত ঝগড়ায় জিতিয়া উঠাও সহজ নহে। অবশেষে নিরস্ত হইয়া অভাগিনী, এই বিশাল সংসারপ্রান্তরে মাথা গুঁজিবার যে একটু স্থান পাইয়াছেন, তাহাকেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন।

আমার বয়স তখন দশ বৎসরের বেশী হইবে না। বিষ্ণুবল্লভ বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটা ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলেন। খরচপত্র সমুদয় তিনিই যোগাইতেন। স্বর্গীয়া মাতৃদেবী বারোমাস রন্ধনশালার মহাব্রতটি চালাইয়া এই উপকারের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। উপকারকারীর নিন্দা করিতে নাই। আর বিষ্ণুবল্লভ বাবুর নিন্দা অতি বড় শত্রুতেও করিতে পারে না। কিন্তু কর্ত্রীঠাকুরাণীর দুই একটা উদার আচরণের কথা তোমাদিগকে না শুনাইলে, আমার প্রাণের তৃপ্তি হইবে না। গরবিনীর গিন্নী-

মা শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আপনাকে প্রকৃতই রাজরাজেশ্বরী ভাবিতেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মপরায়ণা, সুশীলা, সুগৃহিণী ইতঃপূর্ব্বে ভূভারতে আর কোথাও অবতীর্ণ হন নাই, তিনি চব্বিশ ঘণ্টা কেবল ইহাই মনে করিতেন। শুধু মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেও প্রতিবেশিগণ, বিশেষতঃ দাসদাসীগুলা বাঁচিয়া যাইত। ঠাকুরাণী পদে পদে দৃষ্টান্তসহকারে বিষয়টি লইয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের বিষম কর্ণজ্বর উৎপাদন করিয়া দিতেন।

ঝোঁকটা সেই নিরাশ্রয়া অনাথিনী ও তাহার নিরাশ্রয় শিশুটির উপরেই সর্ব্বদা আসিয়া পড়িত। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী,—তোমরা কেহ কেবল রাজেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া তাঁহার অসম্মান করিও না,—শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আমার স্বর্গীয়া জননীকে বুঝাইতে চাহিতেন যে, তিনি তাহাকে ও তাহার কুপোষ্য সন্তানটিকে প্রতিপালন করিয়া যে অপূর্ব্ব বদান্যতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। দাতাকর্ণের মহিষী পদ্মাবতী ইতিহাসে তাদৃশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। নহিলে ঠাকুরাণীর একটা ব্যাকরণসঙ্গত উপমা মিলিতে পারিত। কিন্তু পোড়া লোকের কেমন স্বভাব, যার যত উপকার কর, তার গুমর ততই বাড়ে। কলিতে কাহারও ভাল করিতে নাই। ঠাকুরাণীর মন বুঝে না, প্রাণ কাঁদে, তাই তিনি সেই সকল লোককে বাটীতে আশ্রয় দেন। বিধাতার কাছে প্রার্থনা এই, পর তাঁহার আপনার না হউক, তিনি যেন চিরকাল পরের উপকার করিয়া মরিতে পান।

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী কুসুমশয্যার উপর কুসুমসুকোমল দেহখানি ঢালিয়া সুষুপ্তিসমাহিত না হইলে, বিষ্ণুবল্লভ বাবুর বাটীতে ঐ সকল বক্তৃতা অবিশ্রাম চলিতে থাকিত। প্রভাতে সাড়ে সাতটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া যখন দেখিতেন, প্রায় সাতটা চল্লিশ মিনিট পার হইয়া গেল, অথচ তাঁহার আলস্যবিজড়িত বাহুখানির সম্মুখে সেই দিব্যবাসসুরভিত, প্রধূমিত-দ্রবময় প্রাতরাশ উপস্থিত হইল না;—বক্তৃতা তখনই চলিত। যখন দেখিতেন, তিনি শয্যাত্যাগ, হস্তমুখপ্রক্ষালন, স্নান, গাত্রমার্জ্জন, শুষ্ক শুভ্র বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি কত কাজ সারিয়া ফেলিলেন, তথাপি রাঁধুনি ঠাকরুণ তাঁহার জন্য একমুষ্টি অন্ন এখনও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলেন না;—বক্তৃতা তখনই

তেন না। স্বামীর পূর্ব্বপুণ্যার্জ্জিত সতীনটি লইয়া তিনি যে কখনও কোনও প্রকার বাদানুবাদ করিতেন, এমন আমার স্মরণ হয় না। তাঁহার সে প্রকৃতিই ছিল না। তিনি আপন সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য [illegible] আপনিই মুগ্ধ থাকিতেন; আত্মেতর জগ[illegible] বড় খবর রাখিতেন না। সুতরাং বর্ত্তমান বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত উদারতার কথা আম[illegible]ও স্বীকার করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমরা বুঝি বা এই গল্পপাঠ এইখানেই বন্ধ করিয়া দাও। একটা শৈশবপ্রণয়ের কথা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। চাপিয়া গেলে স্বয়ং গল্পকারী সম্বন্ধে বিশেষ অবিচার করা হয়। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ, যে সব সুবিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা বাল্য-প্রণয়ের একান্ত বিরোধী, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অরুচিকর অংশটুকু, রোগীর ঔষধসেবনের ন্যায়, কোনও রূপে গলাধঃকরণ করিয়া যান।

প্রেম সম্বন্ধে আমার একটা প্রিয় থিওরী আছে। ফুলটি প্রথম দর্শনেই না ফুটিলে, আর তাহার আশা নাই,—পাশ্চত্য জগতের এই প্রবাদটার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস। শ্রীমতী সন্ধ্যাসুন্দরীকে অতঃপর একদিন যে ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাতে তোমরা কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং স্নেহের আকর্ষণই হউক, আর প্রেমের ফাঁসই হউক, একটা কিছুর উৎপত্তি সেই প্রথমদর্শনমুহূর্ত্ত হইতেই কল্পনা করিতে হইবে। তাই আমার বড় ইচ্ছা যে, বর্ত্তমান বর্ণনাটার উপর একটু কোর্টশিপের রসান দিয়া, এই পুরুষজন্মের সাধ মিটাইয়া লইব। ভরসা করি, ইহাতে তোমরা অস্বাভাবিকতার আরোপ করিবে না।

কথাটা নিতান্ত হাস্যকর, সন্দেহ নাই। দশ বৎসরের নায়ক; আর নায়িকার ত তখন দশ দিবসও পূর্ণ হয় নাই। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নবপ্রসূতা সুকুমারী কন্যার কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। প্রসূতি তখনও সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হন নাই। নায়ক শুনিলেন, এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনও দেখে নাই। রূপের আলোকে গৃহসামগ্রীগুলিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শুনিয়া দেখিবার বড় সাধ হইল। তখন মাকে ধরিয়া, সদ্যোজাত প্রেমিকার গৃহদ্বারে গিয়া, সেই দশমবর্ষীয় প্রেমিকবর দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে

শক্তিশূন্য, সেই অপূর্ব্ব পদার্থে যাহারই অধিকার। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি—সংসারে এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্য পৃথকভাবে একরূপ বুঝিতে পারি। কিন্তু, স্নেহের পরিণামে যে প্রেম, প্রেমের পরিণামে যে ভক্তি, তাহা ত বুঝিলাম না। তিনের সৌরভ সম্মিলিত হইয়া মানুষের হৃদয়ে যে বিচিত্র নন্দনকানন বসাইতে পারে, তাহা ত জানিতাম না। আজ আমি সেই দুর্ল্লভ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছি। তাই আমার এই গল্প শুনাইবার এত আগ্রহ। নহিলে এই অসার জীবনের অসার কাহিনী লইয়া বৃথা তোমাদের কালাতিপাত করিতাম না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শৈশব কাটিয়া গেল। কৈশোর আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কৈশোরেরও কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হইল। সেই দশ দিবসের সুকুমারী এখন ত্রয়োদশবর্ষীয়া দিব্যাঙ্গনা; বিকাশোন্মুখ রক্তোৎপলের ন্যায় বালারুণরশ্মির অপেক্ষা করিতেছে। আমার কাছে সে কখনও সরম বা সঙ্কোচের অভিনয় করে নাই; সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল কথাই খুলিয়া বলিত। কিন্তু আজ কাল তাহার সে ভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই ত্রয়োদশ বৎসরের আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে যে শীঘ্রই পরগৃহে যাইয়া আপনার হইতে হইবে, সেই চিন্তা যেন ইতিমধ্যেই তাহার সকল কার্য্যে কতকটা ছায়া বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। পুস্তকপাঠে তাহার আর তেমন মন নাই। আগে কলেজ হইতে আমি কতক্ষণে প্রত্যাগমন করি, তাহারই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত; এখন অনেক সন্ধানের পর ধরিয়া আনিয়া বসাইতে হয়। মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহে না। কান দিয়া আমার সকল কথা বুঝি শুনেও না। ধমক দিলে বিশাল চক্ষু দুইটি মুখের পানে একবার ফিরাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া, বই ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়। পলাইয়া কোথায় লুকায়, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি পুষ্পোদ্যানের ভিতর বেড়াইতেছিলাম; উদ্যান-পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ কুসুমরাশি সন্ধ্যাসমীরণস্পর্শে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্য দিয়া সেই বিবিধ সৌরভের সম্মিলন উপভোগ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দেখিলাম, অদূরে এক নববিকশিতা মাধবীর মূলে, লৌহময় আসনের উপর সন্ধ্যা অন্যমনে বসিয়া রহিয়াছে। গোধূলির শান্ত সুবর্ণালোক তাহার কেশে, চক্ষে, কপোলে, বাহুতে, সর্ব্বাঙ্গে

আমি বলিলাম, "আমি এই বাড়ীতেই থাকি।"

সুরেন্দ্রকুমারের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাদের বাসায় আমি সর্ব্বদাই যাইতাম। তাঁহাদের ঘরকন্নার খবরও সব জানিত। আমি কি ভাবে কলিকাতায় রহিয়াছি, সুরেন্দ্রকুমারও তাহা জানিতেন। জানিয়াও যে আমার প্রতি তাঁহার প্রণয় ও যত্নের কোনও ত্রুটি করেন নাই, এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তবে, তিনি যে আমার সামান্য আবাসে আসিয়া আমায় দর্শন দিবেন, ইহা আশার অতীত। আমার ন্যায় পরান্নভোজীর বাটীতে আসিয়া বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাকে যে একটু হীনতা স্বীকার করিতে হয়, এ কথা স্বীকার না করিলে চলিবে কেন? সুতরাং বর্ত্তমান বিষয়ে আমার কোনও প্রকার আবদার বা অভিমান আদৌ ছিল না। আমি নিজের টানেই তাঁহার নিকট যাইতাম; তাঁহার অভ্যর্থনার বড় অপেক্ষা করিতাম না।

বন্ধুবর ও তাঁহার সহকারীদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলাম। কিন্তু কন্যার আসিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল,—বর্ত্তমান বিষয়ে সচরাচর যতটা বিলম্ব হয়, তাহারও অতিরিক্ত বিলম্ব হইতে লাগিল। বর-পক্ষীয়েরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন আমি স্বয়ং তাগাদা করিবার নিমিত্ত অন্দরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বিচিত্র-উজ্জ্বল-বস্ত্রপরিহিতা অশেষরত্নালঙ্কার-বিভূষিতা আমার ত্রয়োদশ বর্ষের সঙ্গিনী সেই অপূর্ব্ব বালিকা চারি দিকে পরিজনপরিবেষ্টিতা হইয়া আনতবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুই এক জন তাহাকে ধরিয়া সাধিতেছে। "লক্ষ্মী, মা আমার! কেমন বড়মানুষ রাঙা বর এসেছে; একবার দেখা দিবে চল।" বালিকা সে সব কিছুই শুনিল না। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একটা এইরূপ অভিনয় দেখিয়াছিলাম। সুতরাং তাদৃশ বিস্মিত হইলাম না।

তোমরা কেহ কি বলিতে পার, এই হতভাগিনী কামিনী কুলের গতি কি হইবে? বিধাতা ইহাদের রোদন ভিন্ন আর কি কোনও উপায় করিয়া দেন নাই? ইহারা সুখেও কাঁদে, দুঃখেও কাঁদে;—মানেও কাঁদে, অভিমানেও কাঁদে! আজ যাহাকে দেখা দিতে হইবে বলিয়া কাঁদিতেছে, কালই আবার তাহাকে দেখিবার জন্য কাঁদিবে! এমন অদ্ভুত পদার্থ লইয়াও মানুষে সংসার করে!

আমি অগ্রসর হইয়া ডাকিলাম—"সন্ধ্যা!" সন্ধ্যার মুখে কথা নাই,—

কেবল কাঁদে। তখন কি করি, পূর্ব্বপরিচিতা পরিচারিকা গরবিনীর সাহায্যে নিজেই তাহার হাত ধরিয়া বহির্বাটীতে বন্ধুবর সুরেন্দ্রকুমারের সম্মুখে আনিয়া বসাইলাম। দেখিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে বালিকার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার নয়নে অশ্রুর চিহ্নমাত্র নাই। মুখমণ্ডল স্থির, গম্ভীর; অধরযুগলে যেন অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা পরিব্যক্ত হইতেছে। সেইরূপ স্থির-গম্ভীর ভাবে সে নিজের নামটি হইতে আরম্ভ করিয়া পরীক্ষকদিগের সকল প্রশ্নেরই চমৎকার উত্তর প্রদান করিল। আমার বন্ধুবরের প্রতি দুই একটা বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ করিতেও ভুলিল না! অবশেষে অনুমতি পাইয়া ধীরে ধীরে, শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর উপযুক্ত কন্যার মত, ধীরে অথচ অচলমহিমাভরে, নিজেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করিল না।

বন্ধুবর সদলে বিদায় লইলেন। সকলেই ভাবিলেন, এতদিনে তবে সন্ধ্যার যোগ্য বর মিলিল। কিন্তু আমি ভাবিলাম, একটা শেষ উপায় না দেখিয়া ছাড়িয়া দিলে, আত্মবিজয়টা নিতান্ত মূল্যহীন সহজ হইয়া পড়িবে। যদি মরিতেই হয়, একটা ছোট রকমের কীর্ত্তি না রাখিয়া মরিব না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বড় ঘটা করিয়া বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কর্ত্রীঠাকুরাণীর জীবনের যত সাধ, তাহার সকলগুলি এই একমাত্র সন্তান সন্ধ্যার বিবাহোৎসবে মিটাইয়া লইবেন। সুতরাং আড়ম্বরের আর সীমা রহিল না। বরকন্যা উভয়ের ঠিকুজী মিলাইয়া ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা দিন স্থির হইল। সে দিনেরও বেশী বিলম্ব নাই। সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতেই মাথার উপর মৃত্যুরূপী একখানা মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মেঘের ভিতর যে বিষম বজ্র নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে কি এই জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই দগ্ধ হইয়া যাইবে? চিরদারিদ্র্যপীড়িত হতভাগ্যের অভিনব এই দুঃখের কথা কে বুঝিবে? শুনিবেই বা কে? দুঃখ যে বলিবার নহে। পরান্নভোজীর প্রাণের ভিতর এই দুর্ব্বার প্রেম-পিপাসা যে বলিবার নহে।

একটা আশা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যার হৃদয়ভাব জানিতে পারিলে ইহার কি কোনও প্রতিকার হইবে না? কিন্তু সে বালিকা, তাহার আবার মতামত কি? সে চিরাশ্রুসিক্তা...

সৌরভে তাহারই গৃহভাণ্ডার আমোদিত করিবে। দুঃখের কাহিনী বলিয়া কেবল বালিকা-হৃদয়ের বেদনা বাড়াইয়া কি ফল? ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী স্নেহের যে মধুর স্মৃতি তাহার জীবন হয় ত চিরদিন আলোকিত করিতে থাকিবে, তাহার সহিত এই বিকারজনিত ঘোর তৃষ্ণান্ধকার কোন্ প্রাণে মিশাইয়া দিব? আমার দুঃখ আমারই থাক। কোন্ অধিকারে পরকে তাহার অংশভাগী করিতে চাই?

মন কিছুতেই বুঝিল না। বালিকার নিকট না হউক, স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিকট প্রস্তাবটা একবার করিলে হয় না? দুরাশা অতি দারুণ, তা জানি; তবু একবার চেষ্টা করিতে আপত্তি কি? কিন্তু বলিবে কে? কে সাহস করিয়া শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর মাথার মণিময় মুকুট স্পর্শ করিবে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথাটা মায়ের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম! মা প্রথমতঃ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহাকে বিলক্ষণ আশান্বিত হইতে দেখিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তা কেবল ধনই কি বড়? আমার ছেলের মত ছেলে ত পেলে হয়। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এমন আর কোথায় মিলিবে? কেবল ধনই কি বড়? আমারও এক সময়ে সব ছিল। হায়! কত যুগান্তর হইয়া গেল, জীবনের বাঁধনগুলা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল, এখনও সেই পোড়া স্মৃতি ঘুচে না কেন?"—মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম। আমার কাছে মাকে এই প্রথম কাঁদিতে দেখিলাম। সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না।

তোমাদের যদি দয়া হয়, তবে সেই পূর্ব্বস্মৃতিসন্তপ্তা জননীর দুঃখের সহিত একটু সহানুভূতি দেখাইতে পার; কিন্তু তিনি পুত্রস্নেহের আধিক্য-বশতঃ যে কয়টা কথা বলিয়াছিলেন, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ করিও না।

কি কারণে কি হইল, ঠিক বলা যায় না। ইহার দুই এক দিন পরেই বাড়ীতে একটা বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। সন্ধ্যা স্বয়ং বর্ত্তমান বিবাহে তাহার একান্ত অসম্মতি জানাইয়াছেন। গরবিনী সেই কথা লইয়া পাড়া শুদ্ধ তোলপাড় করিতেছে। বালিকা কারণ কিছুই বলে না; কেবল বলে, বড় মানুষের ঘরে সে বিবাহ করিবে না। গরবিনী অমূল্য অলঙ্কাররাশির উল্লেখ

তাই ত ! বিশৃঙ্খলার আর বাকী কি ? বঙ্কিমের নবেল পড়িয়া মাতৃস্তনরতা কুমারীগুলা পর্য্যন্ত প্রেমের বুলি ধরিল না কি ? ঘরে ঘরে স্বয়ম্বরেরই বা আয়োজন করিতে হয় !

কথাটা লইয়া তোমাদের কাছে এখন রহস্য করিতেছি বটে ;—কিন্তু, তখন ? হৃদয়ের তখনকার সে ভাব আমি কথায় ঠিক ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। আশার অতীত যে আশা, তাহার সাফল্য কল্পনা করিয়া চিরানুগৃহীতের যে সুখ, তাহা ঠিক ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। সেই সম্ভাবিত সুখের মাত্রাটাই ভাল করিয়া হৃদয়ের ভিতর আয়ত্ত করিতে পারি না ;—বর্ণনা ত দূরের কথা।

ইতিমধ্যে কর্ত্রীঠাকুরাণীর সমক্ষে মা'ও বোধ হয় প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিলেন। আমি যদিও প্রকাশ্যে দুই একবার বারণ করিয়াছিলাম, তথাপি অসন্তুষ্ট হইলাম না। কার্য্যটা অসন্তোষের কারণ না হউক, পরিণাম কিন্তু বড় বিষময় হইয়া উঠিল ! শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর রাজহস্ত হইতে মাতৃদেবীকে বেত্রাঘাত কি অন্য কোনও শাস্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল কি না, বলিতে পারিলাম না। কিন্তু, চিত্রব্যাঘ্ররূপিণী তাঁহার সেই প্রিয়তমা চেড়ী, বজ্রনাদে, সম্মার্জনী নামে পরিচিত অপর একটা পদার্থ প্রহারের সম্ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে জানাইয়া দিতে লাগিল। আমরা মাতাপুত্রে মিলিয়াই যে সন্ধ্যার মন বিগড়াইয়া দিতেছি, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ ছিল না। আর গিন্নীমাও কি কিছু দেখিতে পান না, না শুনিতে পান না ? রাঁধুনি-মাগীর আস্পর্দ্ধা কি কম ! গিন্নীমা হুকুম দিলেন,—"মাগীকে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিয়া দে ।"

বিষ্ণুবল্লভ বাবুর বাটী হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের অন্নজল উঠিল। তাহি-ভরসা সব ঘুচিল। বিদায়ের একটা শেষ স্নেহদৃষ্টিও কপালে ঘটিল না। .লাম।

ালতের

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ত অবস্থা-

জননীকে লইয়া বিশাল সংসার-সমুদ্রে ভাসিলাম। ভবিষ্যৎ একবর্ম্মাধিকরণশিত। কাল কি খাইব, এমন সঙ্গতি নাই। বি. এল্. পাশ করিরিয়া, বসিয়া খাতায় নাম লিখিয়াছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ট্রাম ভাড়াটিরও ঘরে আসিয়া য়াছে কি না সন্দেহ। কলেজের গরমটা এখনও কাটে নাই ;—পয়েতার অন্ন

দুই এক দিন এর বাড়ী তার বাড়ী করিয়া কাটাইলাম, ইতিমধ্যে ব্যাপারটা বিষ্ণুবল্লভ বাবুর কর্ণগোচর হইল। গোলাপসুন্দরীর শ্রীমন্দিরে কি একটা উৎসব লইয়া তিনি কয়েক দিবস কিছু ব্যস্ত ছিলেন। বাস্তুভিটায় পদার্পণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং কথাটা তাঁহার কানে পঁহুছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। বিষ্ণুবল্লভ বাবুর অনুগ্রহের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি উপস্থিত এই সংবাদ পাইবামাত্রই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সন্ধ্যাকে এ মুখ আর দেখাইব না। তাই কোনও মতে লোকলজ্জা সম্বরণ করিয়া গোলাপসুন্দরীর গৃহে গিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

বিষ্ণুবল্লভ বাবু আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে ফিরাইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিলেন। সে বাড়ীতে যদি না যাই, তিনি তাঁহার সখের মন্দিরে মাতাপুত্রের নিমিত্ত দুই খানা ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে প্রস্তুত। কথাটা বলিতে কর্ত্তামহাশয়ের লজ্জা বা সঙ্কোচের কোনও চিহ্ন দেখিলাম না। আমি কিন্তু একটু ক্রুদ্ধ হইলাম;—আপনাকে কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ করিলাম। ক্রোধের লক্ষণ কিছু দেখাইলাম না। সযত্নে জিহ্বাকে সংযত করিলাম। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার প্রতি বিষ্ণুবল্লভ বাবুর স্নেহের সহস্র নিদর্শন তাঁহার একমাত্র দোষকে ঢাকিয়া ফেলিত।

আমাকে কোনও বিষয়েই রাজী করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি [illegible]লিলেন,—"তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, লেখা পড়া শিখিয়াছ। তোমার [illegible]তি কোনও বিষয়ে জোর করিবার আমার অধিকার নাই। এ পর্য্যন্ত [illegible]ন পুত্রজ্ঞানে তোমাকে ভালবাসিয়াও বোধ হয়, অনধিকারচর্চ্চা করি- [illegible] ঈশ্বর তাহার প্রতিফল দিলেন। বন্ধনটা মর্ম্মের এত গভীরে গিয়া [illegible]ছে, আগে তাহা জানিতাম না।"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি [illegible]য়া আসিতে লাগিল। আমি তাঁহার দিকে আর চাহিতে পারি- [illegible]খ ফিরাইয়া লইয়া সহসা-উচ্ছ্বসিত নিজ চক্ষেরই দুই এক বিন্দু [illegible]ষ্টে সম্বরণ করিলাম। বিষ্ণুবল্লভ বাবু বলিতে লাগিলেন,—

[illegible]র তোমাকে কোনও অনুরোধ করিব না। তোমার যেখানে [illegible]খানেই থাকিও; তবে ভরসা করি, এতদিন যে সাহায্য লইয়াছ,

কৃপায় আমি এখন মানুষ হইয়াছি। আশা আছে, নিজের উদরান্নের জন্য আর আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না; নিজেই তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিব। আপনি সেই আশীর্ব্বাদই করুন।”

বিষ্ণুবল্লভ বাবু আমার মনোভাব বুঝিলেন। বলিলেন,—“তোমার কালেজের বৃত্তির যে হাজার টাকা জমিয়াছে, তাহা তোমারই নামে জমা আছে। তুমি তাহা জান। এখন আর সে হিসাব আমার নিকট রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর। আমি উহা আনিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমার দুই একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, টাকাটা সমুদয় বিষ্ণুবল্লভ বাবুকে দিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, স্নেহের ঋণ ত টাকায় শুধিবার নহে। যদি বিধাতা কখনও দিন দেন, সে বিষয়ে তখন মনোযোগ দিব। আর সম্প্রতি আমার টাকারও বিলক্ষণ প্রয়োজন। সুতরাং পাঁচ মিনিট পরে যখন বিষ্ণুবল্লভ বাবু নামিয়া আসিয়া সেবিংস্ ব্যাঙ্কের খাতা খানি আমার হাতে দিলেন, আমি তাহাতে আর কোনও আপত্তি করিলাম না।

বিষ্ণুবল্লভ বাবুকে প্রণাম করিয়া শেষ বিদায় লইলাম। প্রণাম করিবার সময় স্কন্ধদেশে এক ফোঁটা উষ্ণ জলের যে স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা এখনও প্রাণের ভিতর জাগিয়া রহিয়াছে। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সকলই যায়; উহাদের স্মৃতি যে যায় না, ইহাই মানুষের চরম সুখ।

অল্পে-স্বল্পে এক খানা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইখানে মাতৃদেবীকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলাম। একজন ঝি নিযুক্ত করিলাম বটে; কিন্তু সংসারের বাহিরের যা-কিছু কাজ, তাহার অধিকাংশ নিজেই সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। কেবল দশটার সময় একবার সাজিয়া গুজিয়া, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া আদালতের হুতা-হাটায় হাজির হইতাম। সেখানে কতকটা সময় আমারই মত অবস্থাপন্ন দুই চারি জন সাম্‌লাধারীর সহিত গল্প করিয়া, কতকটা বা ধর্ম্মাধিকরণমঞ্চে প্রতিষ্ঠাপন্ন বাক্যজীবীর বক্তৃতা শুনিয়া, কতকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া, বসিয়া দাঁড়াইয়া, অপরাহ্ন ঠিক চারিটার সময় ঘরের ছেলে আবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। আমি এখন স্বাধীন। স্বাধীন মাতৃক্রোড়ে স্বাধীনতার অন্ন ভোজন করিতেছি। কিন্তু সেই ত্রয়োদশ বৎসরের

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা করিলাম, এতদিন কেবল কবিত্ব ও বিদ্যার চিন্তা করিয়াছি; এখন কিছুদিন কেবল অর্থ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সংসারে দেখিতেছি, অর্থই সর্ব্ব সুখের আকর। ভবের হাটে যদি অন্ততঃ বন্ধুবর সুরেন্দ্রকুমারের মতনও একখানা দোকান সাজাইয়া রাখিতে পারিতাম, তবে ত আজ জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইত না। আমি যদি কণ্টকময় বাব্‌লা গাছ না হইয়া নবপল্লবিত রসালরাজ হইতাম, তবে কি এ মাধবী আমায় আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিত? কিন্তু যা'হইল না, তা'র জন্য বিলাপে আর কাজ কি? অতীত আমাকে ফাঁকী দিয়া পলাইয়াছে; ভবিষ্যৎ ত এখনও হাতের ভিতর। আমি তাহাকেই মনের মত করিয়া গড়িব!

দেখিতে দেখিতে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ভগবানের কৃপায় আর্থিক অবস্থাটা দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। ভবের হাটে কেবল শূন্যগর্ভ কথা বেচিয়া আমি যেরূপ উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম, অনেক বড় বড় ব্যবসাদার খাঁটি জিনিষের বিনিময়েও তাহা পারিলেন না। তাঁহাদের খাঁটি জিনিষের ধার দিয়াও কেহ পথ চলে না; আর আমি বাজরা নামাইবামাত্র চারিদিক হইতে খরিদদার আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। খাঁটিওয়ালারা গালে হাত দিয়া, অবাক হইয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিতেন; আর আমি প্রতিদিনের পুরা বাজরা প্রতিদিন খালি করিয়া, জুড়ী চড়িয়া, তাঁহাদের গায়ে বলদৃপ্ত আরবী অশ্বের খুরোত্থিত ধূলি উড়াইয়া দিয়া চলিয়া আসিতাম। অনেক খাঁটিওয়ালা আমাকে মাঝে-মাঝে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। আমি ঈষদ্ভিন্ন অধরযুগলে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের হাসি হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিতাম,—"চাই, চাই, ক্ষমতা চাই। কেবল কথায় কাজ হয় না।"

তিন বৎসরের মধ্যেই কলিকাতার অংশবিশেষে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত করিলাম। তাহার সম্মুখে, আমার শৈশবস্বর্গের সেই নন্দনকাননের অনুকরণ করিয়া, সেইরূপ সুন্দর এক পুষ্পোদ্যান বসাইলাম। শৈশবের মত সেইরূপ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ সেই পুষ্পোদ্যানের অপূর্ব্ব লতামণ্ডপ সকল বেড়িয়া বিচরণ করিতাম। সঙ্গে সহচরী কেবল সুখস্বপ্নময়ী এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার স্মৃতি। কতদিন বিচিত্র কুসুমরাশি চয়ন করিয়া, নয়নজলে

পালন করিয়া, নববধূরূপিণী সজীব দেবীপ্রতিমা আনিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারি নাই। বিবাহবিষয়ে আমার ঔদাসীন্য দেখিয়া মা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শয্যা গ্রহণ করিলেন। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। তোমরা আমাকে কপট প্রেমিক, ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী, ভণ্ড প্রভৃতি আর যাহা যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বলিও, কিন্তু মাতৃভক্তিহীন বলিও না। আমি বুক বাঁধিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। মায়ের মুখ আবার প্রফুল্ল দেখিলাম। তিনি পাল্কী করিয়া নিজে গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিলেন। সব স্থির হইয়া গেল। কিন্তু অভাগিনীর কপালে বিধাতা সুখ লিখেন নাই। তাঁহার কত সাধের "দাসী" ঘরে আসিতে না আসিতেই তিনি চলিয়া গেলেন। সুতরাং "দাসী" আর আনা হইল না। আমি একাই রহিলাম।

একা রহিলাম বটে, কিন্তু একা থাকার সেই দুঃখটা আজিও ভুলিতে পারিলাম না। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া দেখিতাম, আমার সাধের শোভনোদ্যানে দলে দলে তরুরাজি মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, দলে দলে কুসুমরাশি ফুটিয়া তাহাদের বুকে সৌন্দর্য্যের বাজার বসাইয়া দিতেছে;—কিন্তু আমি একা! সন্ধ্যাবেলা লতামণ্ডপতলে বসিয়া, আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতাম, দলে দলে, সহস্রে সহস্রে অসংখ্য তারকারাশি মাথার উপর জাগিয়া উঠিতেছে,—দলে-দলে সারি-সারি অসংখ্য শুভ্র মেঘখণ্ড তাহাদের গায়ে গায়ে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে;—কিন্তু আমি একা! ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সংসারে কত লোক দলে দলে প্রমোদের তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—আমি তাহাদের কেহ নহি—আমার কেহ নাই—আমি একা! সকালে বিকালে কত অর্থী প্রত্যর্থী আসিয়া, কত কাজ হাতে করিয়া আমার চারি ধারে ঘেরিয়া বসিত;—কিন্তু আমার কোন কাজ নাই,—আমি নিতান্ত একা!—যাক্! আজ ত আমার আর সে দুঃখ নাই। আজ আমি যে সঙ্গ লাভ করিয়াছি, এই অসংখ্যজীবরাশিপরিমণ্ডিত জগতের অনন্ত ঐশ্বর্য্যও তাহার সহিত তুলনীয় নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তিন বৎসর বিষ্ণুবল্লভ বাবুর বড় কোনও খবর রাখি নাই। দৈবাৎ পথে ঘাটে কোথাও দেখা হইলে একবার হাত তুলিয়া, মাথা নুঁইয়া প্রণাম করিতাম, এই

পাঠ করিলাম। বিষ্ণুবল্লভ বাবু বিষম বিপদগ্রস্ত। তাঁহার বিপদের কথায় আমার মাতৃশোক পর্য্যন্ত চাপা পড়িয়া গেল।

বিষ্ণুবল্লভ বাবু একটা বড় গোছের আফিসে কেশিয়ার ছিলেন। তিনি একবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা তহবিল ভাঙ্গার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদটা পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু বিষ্ণুবল্লভ বাবুর নামের সহিত আফিসের নামটাও ঠিক মিলিতেছে দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই এ বিষয়ের সন্ধান লইতে বাহির হইলাম। জানিলাম, সংবাদ প্রকৃত। আমার ভূতপূর্ব্ব প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা বাস্তবিকই ফৌজদারীতে অভিযুক্ত। সম্প্রতি জামিনে খালাস আছেন।

ভাবিলাম, ঋণ-পরিশোধের এই সময়। কর্ত্তামহাশয়ের উদ্ধারের জন্য প্রাণ-পণ যত্ন করিতে হইবে। বৃত্তান্তটা কি, ঠিক অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাতের প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলেও আমার শৈশবের সেই লীলা-নিকেতনে আর একবার মুখ দেখাইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু তোমাদের কাছে বলিতে লজ্জা হইতেছে, এ বিপদের সময়েও আমি শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীকে বড়মানুষী দেখাইবার একটু প্রলো-ভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। সাজসজ্জার দিকে কিঞ্চিৎ নজর রাখিয়া, নূতন যে ফিটন খানা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তাহাই হাঁকাইয়া বিষ্ণুবল্লভ বাবুর দ্বারদেশে উপনীত হইলাম।

ঘরে প্রবেশ করিতে পা যেন চলে না। প্রাণের ভিতর কি-যেন-কি দুপ্ দুপ্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। আমি যে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল মিষ্টার করুণাপ্রসাদ ঘোষ, তাহা ভুলিয়া গিয়া, আবার যেন সেই শ্রীমতী রাজরাজে-শ্বরী ঠাকুরাণীর অন্নদাস, কালেজের নিতান্ত গোবেচারী নিরীহ ছাত্রে পরিণত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে গরবিনী আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছিল। সে আমাকে দেখিয়াই একটা হাসির বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। গর-বিনী কি আমার পোষাকে ও চেহারায় কোনও অসামঞ্জস্য দেখিল? অথবা, আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমি যে সেখানে মাটী ছাড়াইয়া এক-বারে কাদা হইয়া গিয়াছি, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একটা বিষম গোলমাল পড়িয়া গিয়াছে,—আপনাকে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিনা,—তাহাই বুঝিতে পারিল? তখনকার সেই ঘটনাগুলি আমি আদৌ স্মরণ করিতে

লাম, আমি শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর শয়ন-গৃহে উপনীত হইয়াছি। আমার সম্মুখে শয্যার উপর কর্ত্তা ও গৃহিণী দুইজন বিষণ্ণমনে বসিয়া রহিয়াছেন।

আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বিষ্ণুবল্লভ বাবু যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া শয্যাপার্শ্বস্থিত একখানা চেয়ারে বসাইলেন। নিজেও আর এক খানায় বসিলেন। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন। তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, তিনি আমাকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিলেন।

বিষ্ণুবল্লভ বাবুর সহিত যে সব কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে বুঝিলাম, অভিযোগটা বড় অমূলক নহে। কতক টাকার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। বাকীটা বোধ হয় তাঁহার সহকারী হরসুন্দর সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন। হরসুন্দর এক্ষণে ফেরার। প্রায় দুই মাস তাহার কোনও খবর নাই। গোলাপসুন্দরী তাঁহাকে আপনার কোনও দূরসম্পর্কীয় ভাই বলিয়া পরিচিত করিতেন। পুরা গৃহিণীটির প্রেমানুরোধে বিষ্ণুবল্লভ বাবু তাঁহাকে নিজেরই অধীনে একটা কর্ম্ম দিয়াছিলেন। তাঁহার স্থায়ী আড্ডাটা গোলাপসুন্দরীর বাড়ীতে ছিল বটে; কিন্তু, সকাল বেলা কেবল আহারের সময় ভিন্ন আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না। রাত্রিকালে ত কখনই না। হরসুন্দর সব দিন আফিসেও যাইতেন না। ইচ্ছা হইলে কোনও দিন ১টার সময়, কোনও দিন বা অপরাহ্ণ চারিটার সময়, টলিতে টলিতে একবার গিয়া হাজিরা দিতেন। ক্যাশিয়ার বাবুর নিজের চাকর বলিয়া সাহেবরা তাঁহাকে কিছু বলিতেন না।

বিষ্ণুবল্লভ বাবু তিন শত টাকা মাত্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া, গোলাপসুন্দরীর মন্দিরের সেই নিত্য বসন্তোৎসব কিরূপে চালাইতেন, এরূপ একটা সন্দেহ মাঝে মাঝে আমারও মনে উপস্থিত হইত। আমি তখন কথাটার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করিতাম না। এখন কথাটার গোড়া পাইয়া, মানুষের দুর্ব্বলতা ভাবিয়া,অন্তরে বিলক্ষণ ক্লেশানুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু,যেরূপেই হউক, উপকারীকে বাঁচাইতে হইবে, এই মনে করিয়া আমি আর সেখানে বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না। কর্ত্তা মহাশয়কে দুই চারিটা আশ্বাসের কথা বলিয়া মকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য বিদায় লইলাম।

সে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে গরবিনী পার্শ্বের

আমার প্রাণের ভিতর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল! কি উত্তর করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। সেই সন্ধ্যা! ত্রয়োদশ বৎসরের উদ্বোধনের পর আজ তিন বৎসর ধরিয়া যাহার স্মৃতির পূজা করিয়াছি, অবশেষে যে প্রতিমা বিসর্জ্জনের উপক্রম হইয়া আসিতেছিল, আমার জন্মান্তরের বাসনা-রূপিণী সেই সন্ধ্যা! আমি আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অসম্বদ্ধ কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে স্বয়ং শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আমার সহায় হইলেন। তিনি বলিলেন,—

"পূর্ব্ব অপরাধ কি এখনও ক্ষমা করিবে না? কিছু খাও। ছোট বোন্‌টির মনে অকারণ কষ্ট দিবে কেন?"

তখন আর বাক্যব্যয় না করিয়া যন্ত্রচালিতবৎ সেই গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবামাত্র লজ্জাভয়পরিশূন্যা, হাস্যময়ী, ষোড়শবর্ষীয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী, আমার সম্মুখে পতিত হইয়া, চাবীর গোছা বাঁধা অঞ্চলখানি গলায় বেড়িয়া দিয়া, ঢিপ্‌ করিয়া এক প্রণাম করিল। আমি কথা কহিব কি ছাই!—কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সেই সন্ধ্যা! তিন বৎসরের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! তিন বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে নাম ধরিয়া, নামের কতরূপ বিকৃতি করিয়া ডাকিয়াছি, আজ তাহার সম্বোধনের উপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার অবস্থা দেখিয়া, বোধ হয়, সন্ধ্যার একটু দয়া হইল। সে বলিল,—

"দাদা! দাঁড়াইয়া কেন রহিলেন? বসুন না।" এই বলিয়া বিবিধ ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি-পরিপূরিত একখানা বৃহৎ রেকাবের পশ্চাতে একখান সুবৃহৎ আসন দেখাইয়া দিল। আমি জুতা খুলিয়া বসিলাম। আমাকে তখনও নীরব দেখিয়া বালিকা বলিতে লাগিল,—

"আমি আজ তিন মাস এখানে আসিয়াছি। আপনাকে একবার খবর দিবার জন্য কতলোককে যে সাধিয়াছি। কেউ আমার কথা শুনে নাই। আজ বাবার এ বিপদ না হইলে আপনি বোধ হয়, আর এই সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখ দেখিতেন না!"

আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম,—"ঝাঁটা মারিয়া যাহাদিগকে বিদায় করিয়াছ, তাহাদের প্রতি যে আবার অকস্মাৎ দয়া হইবে, ইহা আমি জানিতাম না।" কথাটা বলিয়াই আমার বড় লজ্জা করিতে

গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে বাষ্পরুদ্ধ, ভাঙা ভাঙা কথায় বলিল,—

"আমরা তোমার কাছে নিতান্ত অপরাধী। সে জন্য আমার মায়ের হইয়া তোমার চরণে সহস্র মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।"—তার পর ঈষৎ রঙ্গচ্ছলে, সেই প্রীতিপরিপূর্ণ অধরে ঈষৎ মধুর হাসি হাসিয়া,—"আর স্ত্রীজাতির অপরাধ পুরুষে যে এত দিন মনে করিয়া রাখে, আমিও তাহা জানিতাম না।"

আমি ভাবিলাম, হায়! এই সেই নিতান্ত সঙ্কুচিতস্বভাবা, আমার আজ্ঞাপালনমাত্র-পরায়ণা, একান্ত পরাবলম্বিনী বালিকা সন্ধ্যা! তাহার ব্যঙ্গের কোনও উত্তর না দিয়া বলিলাম,—"এ বাড়ীর সহিত আর আমার সম্পর্ক কি? তোমার ছেলে মেয়ে হউক, তখন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাহাদের লইয়া আমোদ করিয়া আসিব।"

বালিকা লজ্জাটা চাপা দিয়া বলিল,—"হাতের কাছে ওই জিনিষ গুলা কি তোমাকে দেখিতে দিয়াছি?" আমিও তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের কিছু কিছু সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সে কাজটা শেষ করিয়া, জলের গ্লাসটি রাখিয়া, পকেটের রুমাল খানি লইয়া হাত মুখ মুছিতেছি, এমন সময়ে বালিকা পানের ডিবাটি একটু সরাইয়া দিয়া, মাথাটি একটু নামাইয়া, কতকটা জড়সড় হইয়া বলিতে লাগিল,—

"তা আপনি এখনও বিবাহ করেন নাই কেন? মা ত বৌ বৌ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও কি দেখিতে পাইব না? আমি আপনার এক সম্বন্ধ করিয়াছি। আমার এক ঠাকুরঝী এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছেন। যদি অনুমতি করেন, আপনার নিতান্ত অনুপযোগী হইবে না। এই কথা বলিবার জন্যই আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম।" কথা কয়টা বালিকা, বোধ হয়, মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিয়া, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পাঁচ হাত পিছাইয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম,—

"আমার ঘটকের অভাব নাই। বিবাহের দিনে তোমাদিগকে, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও তাহার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিব না। ভরসা করি, তুমিও আমাকে, সুখের সময় না হউক, অন্ততঃ দুঃখের সময়েও এক এক বার স্মরণ করিবে।" এই বলিয়া আমি আর বিদায়ের অপেক্ষা করিলাম না। আত্মগোপন একবারে সাধ্যাতীত হইয়া পড়িতেছিল। ব্যস্ততার ভাণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া

আমি একটা কাঁদুনীর পালার আশঙ্কা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, আশঙ্কা-টা আমার পক্ষে নিতান্ত অমূলক নহে। কিন্তু সেই বালিকার স্থৈর্য্য, সেই মুখরার গাম্ভীর্য্য, সেই রঙ্গপ্রিয়ার পরসুখানুসন্ধান দেখিয়া মনে করিলাম,—"সংসারের ইহারাই রত্ন। পুরুষ ইহাদিগকে স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাহেবদের সহিত বর্ত্তমান মকদ্দমার একটা মীমাংসা করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম,—"আপনাদের পুরাতন চাকর, আমার এই মক্কেলের প্রতি এক-টুকু অনুগ্রহ করিতে পারেন না কি? আমি এই মকদ্দমার কোনওরূপ Settlement করিতে চাই।"

সাহেব। Settlement,—বাবু? নেটিবের সহিত কোনও Settlement করা আমার অভ্যাস নহে।

আমি। আপনাদের টাকাটার কিনারা হয়, আর আমার মক্কেলও জেল হইতে নিষ্কৃতি পান।

সাহেব। বলিয়া যাও।

আমি। আমার মক্কেল্ সমগ্র টাকাটার দায়ীত্ব স্বীকার করিয়া লইতে-ছেন।

সাহেব। তা'র পর?

আমি। সম্প্রতি ১৫ হাজার টাকা আপনারা পাইবেন। বাকী টাকার লেখা পড়া করিয়া লউন। মাসে মাসে In part আদায় করিয়া উসুল দিবেন। এজন্য আমি জামিন হইতে প্রস্তুত আছি।

সাহেব। সেটা আমার প্রশ্ন নহে।

আমি। তবে কি?

সাহেব। তোমার মক্কেলকে জেলে দিব না। তাহার নিমিত্ত কি দিবে?

আমি। উহা ত আপনাদের অনুগ্রহ! তার জন্য আবার দিব কি?

সাহেব। বাবু! তোমরা আমাদিগকে ব্যবসাদারের জাতি বল। আমরা ব্যবসা করিতেই আসিয়াছি। দান করিবার নিমিত্ত তোমাদের জঙ্গলে

সাহেব। তোমার মক্কেল আমাদের কোম্পানীর অনেক টাকা চুরি করিয়াছে। আমরা এখন টের পাইতেছি। তাহা হইতে আর পঞ্চাশ হাজার দিতে হইবে। ইহাতে লেখাপড়ার কথা নাই। একবারে সব টাকা দিতে হইবে।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। আমি দেখিয়াছিলাম, আবার নিজের স্থাবর অস্থাবর সব জড় করিয়া তার উপর বিষ্ণুবল্লভ বাবুর বাড়ীখানি বন্ধক দিয়াও আরও অতিরিক্ত পনের হাজার টাকার বেশী কিছুতেই সংগৃহীত হইতে পারে না। তাই সাহেবের কাছে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এখন দেখিলাম, তাহার কোনও আশা নাই। সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সাহেবকে একটা লম্বা সেলাম দিয়া বিদায় লইলাম। ভাবিলাম, এত দিন আইন পড়িলাম কি ঘুষ দিবার জন্য? এই সামান্য মকদ্দমাটা ফাঁশ করিয়া বড় সাহেবের মুণ্ডপাত করিতে পারিব না?

বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্নী নিযুক্ত করিলাম। বাছা বাছা চৌকশ সাক্ষীর যোগাড় করিলাম। আর আর কত কাণ্ড করিলাম, তাহা তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই। নিজ মুখে স্বীকার করিয়া অবশেষে নিজেই জেলে যাইব কি? জেলখানাটা আর যাহাই হউক, ব্রহ্মচর্য্যের স্থল নহে। এক কথায়, আত্মরক্ষার্থ আইনের যে ব্যূহটি রচনা করিলাম, তাহা স্বয়ং অভিমন্যুরও অনধিগম্য।

ব্যূহরচনা করিলাম বটে, কিন্তু বিষ্ণুবল্লভ বাবুকে বাঁচাইতে পারিলাম না। আমার আশ্রয়দাতা সেই পরমোপকারীকে, জেলের ওয়ার্ডারগণ গোলাপসুন্দরীর বক্ষ হইতে দুই বৎসরের জন্য কাড়িয়া লইয়া গেল। তার পর সাহেবেরা তাঁহার বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া লইল। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বন্ধুবর সুরেন্দ্রকুমারের আশ্রয় লইলেন। গোলাপসুন্দরীর আর কোনও খবর রাখি নাই। তবে শুনিয়াছি, মকদ্দমা মামলা সব মিটিয়া যাইবার পর, হরসুন্দর কোথা হইতে অকস্মাৎ দেখা দিয়া তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। লোকে বলে, তাহার চরিত্র এখন শুধরাইয়াছে। কারণ, সে গোলাপের গৃহ ছাড়িয়া আর কোথাও যায় না। সেই প্রৌঢ়া সুন্দরীর অদৃষ্টের মত চব্বিশ ঘণ্টা তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে।

ইহার পর আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। আইনের কৌশলে বিষ্ণুবল্লভ বাবুর মকদ্দমার সময় যে বড় ব্যূহটা রচনা করিয়াছিলাম, তাহা বিফল

হইলেও, প্রতিদিবসের ছোট ছোট কাজে ছোট ছোট যে গুলার সৃষ্টি করিতাম, তাহাদের কি আগম কি নির্গমের পথ এ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। অর্থের ভাণ্ডার দিন দিন পূর্ণ হইতে লাগিল। কত বড়মানুষী করিতাম, বন্ধুবান্ধবদের লইয়া কত নূতন নূতন উৎসবের উদ্ভাবন, আয়োজন, সম্পাদন পর্য্যন্ত উপভোগ করিতাম। সে ভাণ্ডার আর কমে না। অবশেষে ধনাগারটা টাকার ফাঁপে ফাটিয়া গিয়া পাছে আমায় শুদ্ধ সহসা উড়াইয়া, গুঁড়াইয়া দেয়, এরূপ আশঙ্কাও হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, অর্থই কি অর্থের উদ্দেশ্য? ইহার দ্বারা জগতের কি কোনও কাজ করা যায় না? ভাবনাটা মনের ভিতর দিন দিন পাকিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনটা নিতান্ত অলস, কর্ম্মহীন, শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল।

হে কর্ম্ম! হে কর্ত্তব্য! হে বাঞ্ছিত! আমি কোথায় তোমার সন্ধান করিব? শৈশবে তোমায় চিনিতাম না, সে সময়টা বৃথায় গিয়াছে, তোমার অন্বেষণ করিতে পারি নাই। তার পর যখন সুখলালসাপরিপূর্ণ যৌবনে আসিয়া উপনীত হইলাম, তখন, তুমি যে আছ, এরূপ দুই একটা চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিল, কিন্তু আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছি। দুই চারি বার লাঞ্ছিত হইয়া তাহারা আর বড় কাছে ঘেঁসিল না। আর আজ এই যৌবনের সীমান্তে, প্রৌঢ়তার প্রাক্কালে, আমি তোমার জন্য আকাশ পাতাল, অন্তর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইতেছি। এখন কি আর তোমার দর্শন পাওয়া যায় না? যে মন্দির নির্ম্মাণকালে তোমার নামে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখন কি তুমি স্বয়ং আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিতে পার না? মন্দির যে জীর্ণ হইয়া আসিতেছে! হায়! আমার কপালে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কি ঘটিয়া উঠিবে না?

শুনিলাম, বন্ধুবর সুরেন্দ্রকুমার বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ সপরিবারে পশ্চিম যাইতেছেন। তাঁহার সহিত একবার দেখা করিবার জন্য মনটা বড় উৎসুক হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিবাহের পর আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের প্রেমটা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। সে জন্য আমিও তাঁহার সহিত সর্ব্বদা আর সাক্ষাৎ করিতাম না। আমি জুড়ী হাঁকাইয়া, নব নব বন্ধুবর্গের সহিত নব নব রসের হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতাম। হয় ত দেখিতে পাইতাম, তিনি ছাতাটি মাথায় দিয়া, সামলাটি হাতে করিয়া, ধীরে ধীরে ফুটপাথের উপর

যেন তাহাতে নিতান্ত অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হইতেন। ক্রমশঃ দেখিতে পাইতাম, দূর হইতে আমার গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ছাতাটি বা সামলাটি আড়াল দিয়া, অথবা অন্য কোনও উপায়ে, যাহাতে আমার চক্ষে না পড়িতে হয়, সেইরূপ করিয়া পলাইতেছেন। কিছু দিন পরে সে রাস্তা দিয়া পথ চলা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাঁহার বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতাম না, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার পূর্ব্বভাব যেন অধিকতর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ইহার কারণ কি না, ঠিক বুঝিতে পারিতাম না। যাহা হউক, তিনি আমার বড়মানুষীতে আপনাকে লজ্জিত মনে করিতেন, দেখিয়া আমি এবার সামান্য বেশে, গাড়ী ছাড়িয়া, পদব্রজে তাঁহার বাটীর দরজায় গিয়া ঘা দিলাম। তিনি নিজেই আসিয়া দরজা খুলিলেন। কতকটা অপ্রসন্ন ভাবে, একটু শুষ্ক হাস্যের সহিত, আমাকে সদরে লইয়া বসাইলেন। সম্ভাষণসূচক দুই একটা কথার পরই আমি বলিলাম,—

"আপনারা সকলে কিছু দিনের জন্য এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন, শুনিলাম। তাই একবার দেখা করিতে আসিয়াছি। অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই।"

সুরেন্দ্রকুমার। শরীরটা কিছু খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারেরা যক্ষ্মার আশঙ্কা করিতেছেন। কিছু দিন ঘুরিয়া দেখি, কি হয়।

আমি। আপনার দাদাকে দেখিতেছি না? তিনি কোথায়?

সুরেন্দ্রকুমার। তিনি এ বাড়ীতে থাকেন না। পটলডাঙ্গায় আলাদা বাটী ভাড়া করিয়াছেন। ক্ষমা করিবেন, বেশী কথা কহিতে আমার কষ্ট হয়।

আমি শুনিয়াছিলাম, ইঁহারা দুই ভাইয়ে পৃথক হইয়াছেন। সে কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রকুমার পাছে বিরক্ত হন, এই ভয়ে সে বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিলাম না। যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, তাহা কোনও মতে ব্যক্ত করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। বলিলাম,—"এরূপ লোকজন লইয়া, সপরিবারে পশ্চিমে গিয়া থাকিতে হইলে বিলক্ষণ অর্থব্যয় আবশ্যক। তাহার বন্দোবস্ত এখান হইতে করিয়া যাওয়াই ভাল। আপনি ওকালতীতে তেমন কিছু বোধ হয় করিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত আপনার তাদৃশ পসার ত দেখি নাই।"

আর বেশী কথা বলিতে হইল না। তাঁহার

"আপনি কি আমার কাছে বদান্যতার পরিচয় দিতে আসিয়াছেন? ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীখানা বিক্রয়ের সময় ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন,—আর কেন? পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া আইনবাজীর পয়সাগুলা যদি একা হজম করিতে না পারেন, রাস্তার দুই পার্শ্বে তাহার যোগ্যপাত্র ঢের দেখিতে পাইবেন। সে জন্য উপযাচক হইয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিতে হইবে না। বড়মানুষী ফলাইবার এ স্থান নহে। এখন অনুগ্রহ করিয়া ঘরে যান। ভরসা করি, আপনার হাত এড়াইবার জন্য বাড়ীর চাকরের সাহায্য লইতে হইবে না।"—

নবম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টে আরও কি হইত, বলিতে পারি না। তাহার পরীক্ষা করিবার সাহস হইল না। একবারে রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ঊর্দ্ধস্থিত বাতায়ন-পথে শৈশবের পরিচিত দুইটি প্রশান্ত চক্ষু, অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া, অতি সকাতরে আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে ঘরে ফিরিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই একটা সুবৃহৎ ভোজের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম।

শৈশবের বন্ধনগুলি একে একে সব ছিন্ন হইয়া গেল। সেই সব পরিচিত মুখ এখন আর একটিও দেখিতে পাই না। দিনের পর দিন আসে, কিন্তু সেই পুরাতনের আর কিছুই আসে না। একটু যে স্মৃতির সম্পর্ক, কেবল তাহা লইয়া এই সুদীর্ঘ জীবন কি কাটান যায়? পুরাতন আমাকে চাহে না। তবে আমিই কেন আর তাহার মুখ চাহিয়া থাকি? তাই নূতনের সহিত সম্পর্ক পাতিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

প্রথমতঃ একটা বিবাহ ত করিতেই হইবে। সংসারের সহিত আমার যে সম্পর্ক, তাহা আমার সঙ্গেই বিলুপ্ত হইতে দিব কেন? আমার এই বিপুল অর্থরাশি দুই হাতে ছড়াইয়া গেলেও, মৃত্যুর পর দিন কতক লোকে বড় জোর বলিবে, "হাঁ লোকটা উদার, হাতদরাজ ছিল বটে।" যাহারা উপকৃত, তাহারা হয় ত তাহাও বলিবে না; অপরে বলিলে বরং চাপা দিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু দুই-চারিটা সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারিলে, নামটা এত শীঘ্র লুপ্ত

মত গজাইয়া উঠিয়াছে, এ কথা ত আর সজ্ঞানে বলিতে পারিবে না। তার পর সমাজেরও একটা উপকারের আশা আছে। দুই এক জনকে যদি তেমন মানুষ করিয়া যাইতে পারি, তাহারা যে পরিণামে দ্বিতীয় রামমোহন, মাইকেল বা বঙ্কিম হইয়া উঠিবে না, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? আর একটা কথা, এই দুর্লভ মানবজন্মের যে সুখ, তাহার ত কিছুই উপভোগ করা হইল না। প্রাণের ভিতর যে স্মৃতি, তাহা ত কেবল অশ্রুময়, দুঃখময়। আমি কেন সাধ করিয়া সে দুঃখ পোষণ করিব? যদি জানিতাম যে, আমার দুঃখে অপরের সুখ;—মনে কর, আমার দুঃখে আমার শৈশবসঙ্গিনী সেই সন্ধ্যার সুখ,—তাহা হইলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু আমি সেরূপ আত্মত্যাগের জন্যও প্রস্তুত নহি। ও সব সৌখীন সেণ্টিমেণ্ট কেবল নভেলেই শোভা পায়। আমার যৌবনের পিপাসা এখনও অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। ফুল শুকাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু দুই চারিটা ভাঙা পাপ্‌ড়ী এখনও ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাই। আমি তাহাদিকেই একরূপ জোড়াতাড়া লাগাইয়া একগাছি মালা গাঁথিয়া গলায় পরিব। সে সৌরভ নাই থাকুক, আকাঙ্ক্ষার অশ্রুজলে ডুবাইয়া লইলেও কি উহার ভিতর একটু রসের সঞ্চার হইবে না?

অতএব আমি বিবাহ করিব। নূতন সংসার পাতিব। স্থির হইল, বিবাহ করিব; কিন্তু বিবাহ করি কাহাকে? একটা পাত্রী ত চাই। ধনৈশ্বর্য্যের অভাব নাই, অথচ বুড়ো বর দেখিয়া মেয়েওয়ালারা সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না,—নানারূপ সন্দেহ করে। জীর্ণ তরুর শীর্ণ শাখায় নবলতিকা বেড়িবে না, জোর করিয়া বেড়িয়া দিলেও তাহাতে ফুল ফুটিবে না, ফুটিলেও সৌরভ ছুটিবে না, এ কথাও কেহ কেহ বলিতে লাগিল। তবে উপায় কি? আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বন্ধুরাও বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ভাবিতে ভাবিতে একটা সুদীর্ঘ বৎসরই কাটিয়া গেল।

তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, এক বৎসরের পর, কন্যা জুটিল। তবে আর দেরী নয়। বন্ধুগণ আনন্দে একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেহ সাজিলেন বরকর্ত্তা, কেহ হইলেন নিৎবর। বরযাত্রীর তালিকা করিতে দুই দিস্তা কাগজ ফুরাইয়া গেল। দ্বাদশ জন জ্যোতিষী ডাকিয়া শুভ অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি লগ্ন পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইল। এত দিনের পর বিয়েপাগলা করুণাশঙ্করের অদৃষ্ট নিতান্তই ফিরিল।

আমার বন্ধুবর্গের কোনও ত্রুটী ছিল না। স্ত্রীলোক নহিলে এ সব শুভ

কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। আমার গৃহে উক্ত পদার্থটির অত্যন্ত অভাব। তাই তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব পরিবার হইতে দুই এক জনকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুন্দরীরা অধীনের কুটীরে পায়ের ধূলা দিয়া আমার নূতন সংসার পাতিবার সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বন্ধুরা নিজে নিজেও সর্ব্বদা আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিবাহের সেই চিরবাঞ্ছিত শুভদিন আসিয়া পড়িল।

বুড়োবর বলিয়া তাঁহার সখের অভাব ছিল না। কন্যার বাড়ী কিঞ্চিৎ দূরে। একটু বেলা থাকিতে থাকিতে বাহির হইতে হইবে। তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। চারি-ঘোড়ার একখানা গাড়ী দিব্য সাজে সজ্জিত হইয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে ঘেরিয়া বাদ্যকরগণ আপনাদের বিবিধ গুণপণার পরিচয় দিতেছে। পশ্চাতে আবার গাড়ীর অনন্ত শ্রেণী। রাশি রাশি লোক, কেহ মশাল, কেহ খাসগ্লাস, কেহ আতসবাজী হাতে লইয়া, সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। এবার বর বাহির হইলেই হয়। অবশেষে বরও বাহির হইলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিলেন না। বলিলেন,—"এখনও একটু বিলম্ব আছে। একজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতে বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। আমি স্বয়ং গিয়া এখন তাঁহাকে না ডাকিলে তিনি হয় ত আসিবেন না; মনে কষ্ট করিবেন। আমি এখনই আসিতেছি। তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাক।" এই বলিয়া, বর মহাশয় পদব্রজে ছুটিলেন। কিন্তু সেই

সেই মুহূর্ত্তে মুঙ্গের হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম। কেবল তাহা কোনওরূপ সম্বোধন বা স্বাক্ষর নাই। কেবল হাতের লেখা দেখিয়া হ না। তবে লাম। চিঠিখানা এই,—"এখন বোধ হয় তুমি আর আমার সহিত সম্পর্ক করিতে সাহস করিবে না। সে বিষয়ে আমিও প্রস্তুত নহি। নারী জন্মের অধম, তাহা তোমাকে না বলিলেও চলে। কিন্তু এই নিরাশ্রয় মার যে পাঁচটি মাসও আজ পূর্ণ হয় নাই,—ইহারই মধ্যে পিতৃহীন। এখন তুমিই ইহার অভিভাবক। নহিলে আর উপায় নাই।" আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না। উদ্বেলিত অশ্রুরাশি বুকের ভিতর চাপিয়া, এটর্ণী-বন্ধু মিষ্টার পি. সি. করের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

মিষ্টার কর ও আর কয়েক জন বন্ধু বিবাহ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য আসি-

হের পূর্ব্বে ভাবী সহধর্ম্মিণীর নামে আমার সমগ্র বিষয়-সম্পত্তির একটা বিনিয়োগ করিব। আজ সে সময় আসিয়াছে। এখন একখানা কাগজ দাও দেখি।"

কাগজ লইয়া একখানা দানপত্র প্রস্তুত করিলাম। তাহাতে উপস্থিত কয়েকজন বন্ধুর সহি করাইলাম। মিষ্টার করের উপর উহার ভারার্পণ করিয়া তাঁহারই নিকট রাখিয়া দিলাম। কি লিখিলাম, কাহাকেও দেখাইলাম না। কিন্তু তোমাদিগকে শুনাইতে বাধা নাই। লিখিলাম,—

"যিনি স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ রূপে আমার উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই প্রীতিকামনায়, আমার এ জন্মের যথাসর্ব্বস্ব, শ্রীমতী সন্ধ্যা ও তাঁহার শিশুটিকে অর্পণ করিলাম।"

গুরুদেবের কৃপায় আজ আমার বিবাহের সাধ মিটিয়াছে। আর আমি মানবী-প্রেমের কাঙাল নহি। সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যে বিশ্বেশ্বরকে বরণ করিয়া এই হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র অধীশ্বর করিয়াছি, অন্তিমে যেন তাঁহাকেই প্রাপ্ত হই।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র।

১৩

মাণিকতলা
২৬ ডিসেম্বর। ১৮৭৯

প্রিয়[illegible]
অভাব ন[illegible]
না,—নান[illegible] [illegible]মি একটি কথা লিখিতে জোর করিছি। আপনি লিখিয়াছেন যে [illegible] বাক্যগুলি বড় কিম্বা ছোট না, এ ক[illegible] হইতে প্রাপ্ত। পরন্তু তৎসকলের দেখি[illegible]বোধ হয় যে তাহা কোন বংশাবলী বৎস[illegible]র পাঁজী হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি-[illegible], মাদলা পাঁজী দিন দিন লেখাইয়া তাহাতে একেবারে সমষ্টি কথা পাওয়া অসম্ভব, এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, কারণ পাঁজীয়ার কথা প্রামাণ্য নহে। সমকালের কথাই প্রামাণ্য। "মাড ফুলি" শব্দের অর্থ "নৈবেদ্য" লিখিয়াছেন আমার বোধ হয় এটি পারশী "মজুফিল" শব্দের অপভ্রংশ। ঐ শব্দে উৎসব, মজলিস্, নৃত্যগীতাদি বোঝায়। নব্য কোন গ্রন্থকার উড়িষ্যায় তাহা [illegible] করিয়াছেন। রঙ্গলাল বাবুর এই [illegible]

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

১৪

মদাত্মীয়েষু—

অদ্যকার ডাকযোগে বীজকের শোধনীয় পত্র পাঠাইলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে গিয়া জগমোহনের দ্বারপার্শ্বে যে আদর্শ আছে তাহার সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। যদ্যপি আমি কোন বীজক বাদ দিয়া থাকি তাহার অবিকল প্রতিলিপি ও অনুবাদ পাইতে ইচ্ছা করি। উৎকল ভাষায় আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই, অতএব মৎকৃত অনুবাদ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না যাহা করিয়াছি তাহা অশুদ্ধ। আপনি তাহার সংশোধন করিবেন। পূর্ব্ব পত্রে অপর সকল কথা লিখিয়াছি। অনঙ্গভীমের বড় দেউল করণ ও নরসিংহের অর্কমন্দির করণ বিষয়ে বড় মাদলা পাঁজীতে যাহা আছে তাহার প্রতিলিপি বিশেষ প্রয়োজনীয় কিমধিকমিতি।

মাণিকতলা
২৯ ডিসেম্বর।
১৮৭৯

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

১৫

মদাত্মীয়েষু—

জানুয়ারীর ৪ঠা দিবসীয় ভবদীয় অনুগ্রহ-পত্র যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। মাদলা পাঁজীর সমস্ত দেখিয়া আমার পুস্তক ছাপাইবার অবকাশ নাই। পরন্তু উপস্থিত বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান করা যাইতে পারে তত দূর কর্ত্তব্য। পরন্তু বীজকগুলির সংশোধন অবশ্য সমাধা করিতে হইবে। এবং তাহা আপনার সাহায্য ভিন্ন নিষ্পন্ন হইবে না। বীজকগুলি দ্বারপার্শ্বে আছে, কিন্তু তাহা পড়িতে দ্বার বন্ধ করিতে হয় না। দ্বার ভিতরে খোলে এবং বীজক বাহিরের অর্থাৎ নাট-মন্দিরের দিকে আছে। দ্বারে দাঁড়াইলেই বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা যায়। পরন্তু রঙ্গলাল বাবু আপনার আদেশ মত বাবু রামপ্রদাস সিংহের নামে পত্র পাঠাইয়াছেন। প্রয়োজন হয় বিদিত করিবেন। ফলে যাহাতে বীজকগুলি শীঘ্র শুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হই তাহার বিহিত চেষ্টা করিবেন পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে। মধ্যে কেবল ৪ পৃষ্ঠা বীজকের নিমিত্ত বাকী আছে।

কোণারকের মন্দিরের পতন বিষয়ে আমি অনেক ধ্যান করিয়াছি, কিন্তু মাটি বসিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন কারণ সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য দ্বারা ভগ্ন হইলে তাহার অবশ্য চিহ্ন থাকিত। কিন্তু আমি কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

১৬

মদাত্মীয়েষু—

আমার পত্র লিখিবার দুই দিবস পরে স্বর্ণাদ্রিমহোদয় হস্তগত হয়, এবং অদ্য আপনার ২১ তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

শুক্রবার আমি দুই প্রহর একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত পুলীসে কর্ম্ম করিব। তৎপূর্ব্ব ও পর সকল সময় বাটীতে থাকিব এবং আপনার সহিত সাক্ষাতে পরম প্রীতি লাভ করিব।

২৩ আগষ্ট। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

১৭

মদাত্মীয়েষু—

১৩ই দিবসের আপনার পত্র যথাকালে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়। আর বিহিত চেষ্টা করিলে যে আপনি কৃতকার্য্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পরন্তু কার্য্যটি অতি দুরূহ, অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। যে পুস্তকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে আরিয়ানা আন্তাইকা বিশেষ উপকারী হইবে না। যেহেতু তাহাতে ভারতবর্ষের ভূগোলের প্রায় কিছুই নাই। তাহার সমস্ত আফগানিস্তান সম্বন্ধে নিয়োজিত। অপরগুলি উত্তম বটে কিন্তু লাসনের পুস্তক জর্ম্মান ভাষায়, তাহার ইংরাজী অনুবাদ নাই। উইলসনের বিষ্ণুপুরাণে অনেক বিষয় আছে, তাহাতে আপনার বিশেষ উপকার হ[illegible]বেন। দেশাবলী গ্রন্থ ৯ খণ্ডে বিভক্ত তাহার[illegible]র ৪ খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত। সংস্কৃত কলে[illegible]গুর ব্যয় আছে—তদ্ভিন্ন আর নাই। তাহা ৩[illegible] সরের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহাতে অনেক বিষয় আছে, তাহার চূর্ণক করিতে পারিলে উপকারী হইতে পারে। আমাদ্বারা এ বিষয়ে যে পর্য্যন্ত সাহায্য হইতে পারে তাহার কোন মতে ত্রুটি হইবে না। আমার প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব আছে। কিন্তু কিছুই লিখিত হয় নাই। লোকের উদ্যমও সকল বিষয়ে উগ্র নহে। আমার উড়িষ্যার বিবরণ বাঙ্গালীদ্বারা ৯ খানি মাত্র গৃহীত হইয়াছিল।

মাণিকতলা
মার্চ্চ ২২—৮০ } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

১৮

মদাত্মীয়েষু—

আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রের অঃ[illegible]ীকার পূর্ব্বেই করিয়াছি। বীজকগুলি প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রিত করিয়াছি। মুদ্রাকার্য্য শেষ[illegible]ইয়াছে। কেবল কয়েক পৃষ্ঠা সূচী অবশিষ্ট [illegible]ছে, দুই এক দিনে শেষ হইবে। এতৎকার্য্যে আপনার সাহায্য আমার বিশেষ উপকারজ[illegible]আরে[illegible] য়াছে।

[illegible] ভিদের

কীকট শব্দই প্রশস্ত, কীটক মুদ্রাকরপ্রমাদ, এবং আমার সংশোধনের ত্রুটির ফল। কীকটের সীমা বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চরণাদ্রি যদ্যপি চরণভৃৎ শব্দের পর্য্যায় হয় তাহা হইলে অস্তাচল বুঝায়, কিন্তু হিমালয়কে কেহ কখনও অস্তাচলের স্থানীভূত বলেন নাই। এবং তাহা হইতেও পারে না। কারণ অস্তাচল পশ্চিমে হইবে। ফলে বিন্ধ্যপর্ব্বত নতশিরা হইয়া চরণাদ্রি হইয়াছে এবং বিন্ধ্য হইতে গৃধ্রকূট মগধের দক্ষিণভাগ এবং তাহাই আমি লিখিয়াছি। কীকটের প্রধান স্থানের একটা নির্দ্দেশ আছে; তাহাতে লেখে কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনঃ। চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যং রাজগৃহং * ?॥ এই শ্লোক অগ্নিপুরাণে আছে; ইহার শেষ শব্দ আমার স্মরণ হইতেছে না; ইহার তিনি[illegible]স্থান সকলই দক্ষিণে পাওয়া যায়; তাঁহার [illegible]র পারে ইহার কোন স্থান নাই। [illegible] প্রকৃত অভিপ্রায় † বৌদ্ধ ধর্ম্ম [illegible] শাক্যের বুদ্ধিত্বপ্রাপ্তি; তাঁহার জন্মস্থানের উদ্দেশ্য নহে। অপর যে সময়ে কীকট প্রসিদ্ধ ছিল সে সময়ে মিথিলা প্রভৃতি স্বতন্ত্র দেশ প্রসিদ্ধ ছিল তৎসমুদায় কীকটের অন্তর্গত নহে। শব্দকল্পদ্রুমে কীকটের পর্য্যায়ে মগধ আছে কিন্তু সে মগধ ত গঙ্গার পরপারে বিস্তৃত ছিল না। দেশাবলীতে যে বিবরণ আছে তাহাতে মগধ গঙ্গার দক্ষিণ পারে স্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাব গুলি সমস্ত ছাপাইলে ২০০০ পৃষ্ঠা হইবে। তাহার মূল্য দিতে কেহই স্বীকৃত হইবে না। দুই খণ্ডে ১০০০ পৃষ্ঠার মূল্য ১৬৲ টাকার কম নহে; তাহা কি কেহ দিবেক? দিলে ছাপাইবার বাধা নাই ইতি।‡

মাণিকতলা
৮ মার্চ্চ ১৮৮০ } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

১৯

মহাশয়েষু—

বিগত প্রাতে আপনাকে একখানি পত্র লিখিবার পর অপরাহ্নে ডাকযোগে আপনার প্রেরিত নীলাদ্রিমহোদয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ নহে। পরন্তু যে পর্য্যন্ত আছে তাহা প্রায় শুদ্ধ। ইহাতে আমার বিশেষ উপকার হইবে; এবং ইহার নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নিকট বিশেষ উপকৃত হইলাম।

মাণিকতলা
২০ জানু, ১৮৮০ } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

২০

মহাশয়েষু—

২২শে দিবসীয় আপনার পত্র গতকল্য অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়াছি। বীজকগুলির পাঠে বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম। আমি উভয় পার্শ্বেরই বীজকের প্রতিলিপি লইয়াছিলাম। কিন্তু দেশীয় কাগজে লওয়ায় তাহা অনেকাংশে কীটদষ্ট হইয়াছে; এবং এক্ষণে তাহা পাঠের যোগ্য নাই। যাহা পাঠ করিয়াছি তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এবং তন্নিমিত্তে এ বিষয়ে আপনাকে ক্লেশ দিতেছি।

আমি উড়িয়া ভাষায় কোন মতে পটু নহি। অতএব আপনি যে অনুবাদ দিবেন তাহাই আপনার নাম দিয়া ছাপাইব এই মনস্থ করিয়াছি। প্রথম বীজকটির আমি ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় উহাতে তেলেগু শব্দ অনেক আছে। জনৈক বিজ্ঞ তেলেঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনি উহার উদ্ধার করিতে পারেন।

মহারাষ্ট্র ভাষায় "চা" শব্দটি সম্বন্ধ প্রত্যয় বটে; পরন্তু "গুণ্ডিচা" শব্দ প্রাচীন; উহা, বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভাষা হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে।

জগন্নাথ দেবের অন্তরে যে একখানি অস্থি স্থাপিত করা হয়, তাহাতে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাহা না দেখিলে কিছুই স্থির হয় না। অনুভবে কাহারও আস্থা হইবার নহে। বৌদ্ধদন্তের উল্লেখ আমি করিয়াছি। কনিংহাম সাহেবের Geography of Ancient India গ্রন্থে উড়িষ্যার বৌদ্ধ-

* শুভং।—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়। † "বুদ্ধনাম্না জীনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

আমি "Indo-Aryans" ছাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম।—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

দিগের উল্লেখ আছে; কিন্তু কি তাহাতে কি অন্যত্র ধারাবাহিক কিছুই লেখা নাই। যে যে স্থানে উল্লেখ আছে, তাহার সারাংশ আমি আমার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছি। আপনার বীজক সম্বন্ধীয় শ্রম শেষ হইলেই আমার পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে সমস্ত তত্ত্ব পাইবেন।

হণ্টারের তালিকা অশুদ্ধ তাহা আমি জ্ঞাত আছি। পরন্তু তদপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য কিছুই আমার নিকট নাই। আপনার তালিকাটি দেখিতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রেরণ করিলে উপকৃত হইব।

"কলেবর" ও "কেশ্বর" * শব্দের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। আমার বর্ত্তমান বোধে "কেশ্বর" পারসী "কৈশর" ও লাতিন Caesar শব্দের অপভ্রংশ অনুভব হইতেছে।

বামদেবসংহিতা হইতে যে শ্লোক গুলি পাঠাইয়াছেন, তাহা অবিকল কপিলসংহিতায় আছে। তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাস্য এই, ঐ উভয় পুস্তক কি একই, কেবল দুই নামে প্রচলিত? এই তর্কটি অনুসন্ধেয়। আমি কপিলসংহিতার শ্লোকগুলি মুদ্রিত করিয়াছি।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

পুঃ নিঃ—

পূর্ব্বপত্রে নীলাদ্রিমহোদয়ের প্রাপ্তিসংবাদ লিখিয়াছি; বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন।

২১

সদাত্মীয়েষু—

বীজকগুলির মূল আপনার দুই পত্রে ছিল তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ পত্রে যে তিনটি বীজক গুলির অনুবাদ ছিল, তাহাও হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বীজকের অনুবাদ পাই নাই। পরন্তু তাহাতে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আপনার টিপ্পনীর সাহায্যে কর্ম্ম সমাধা হইয়াছে। উড়িষ্যার সূচী মুদ্রিত হইতেছে। তাহার প্রকাশের আর বিলম্ব নাই। আপনার শিবসংবাদ সর্ব্বদা প্রার্থনীয়।

মাণিকতলা
২৮—২—৮০ } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

২২

সদাত্মীয়েষু—

কয়েকদিবস পীড়িত থাকা প্রযুক্ত আপনার ৯ই এপ্রেলের পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। "ইণ্ডো-আরিয়ন" পুস্তকের উপদেষ্টা আপনি। অতএব ইহা অবশ্যই সম্ভব যে, আপনি তাহার প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হইবেন। আমার যে সঞ্চয় আছে তাহাতে আর ৪ খণ্ড হইতে পারে। কিন্তু প্রথম দুই খণ্ডের ব্যয় অদ্যাপি আদায় হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বলিলেন যে তিনি হরধামে প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন শিবনিবাসে নহে।

শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চাঁদ দত্ত তিন বৎসর হইল নিদানের বঙ্গানুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করান ও তাঁহার পুস্তক উত্তম হইয়াছে; পুনঃ তাহার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন নাই। পরন্তু ইংরাজদিগের নিমিত্ত একখানি ইংরাজি অনুবাদ করিতে তিনি আসিয়াতিক সোসাইটির আদেশে নিযুক্ত আছেন। মূল অনেকবার ছাপা হইয়াছে আর প্রয়োজনীয় নহে ইতি।

মাণিকতলা
৮ এপ্রেল। ১৭।৮২ } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

* কোলবরকেশ্বর = কোলবর্গীয় ঈশ্বর (রাজা)—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

নারায়ণ রাওএর বখর।

অবতরণিকা।

কঙ্কণ প্রদেশের উত্তরাংশে, সমুদ্রতীরে, সাবিত্রী নদীর মোহানার নিকট, "শ্রীবর্দ্ধন" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রাম বহুদিবসাবধি আবিসিনীয়গণের অধিকারভুক্ত ছিল। আবিসীনীয়গণ মহারাষ্ট্র দেশে "সিদ্দি" নামে পরিচিত।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে (খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) "বালাজী পন্ত" নামক এক জন সদ্বংশজাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ ভট্ট। মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্ব স্ব নামের সহিত পিতার নাম সংযোজিত করিবার প্রথা আছে। তদনুসারে বালাজী পন্ত সাধারণতঃ "বালাজী বিশ্বনাথ" নামে অভিহিত হইতেন। বালাজী পন্ত বা বালাজী বিশ্বনাথ শ্রীবর্দ্ধনের দেশমুখ অর্থাৎ গ্রামাধিকারী (মোস্তাজির) ছিলেন। তদানীন্তন কালের সকল দেশমুখের ন্যায় তিনিও গ্রামের ২৫ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতে পাইতেন। সুতরাং তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

বালাজী বিশ্বনাথ যখন এইরূপে শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনার অধ্যক্ষ কাহ্নোজী আঙ্গ্রের সহিত সিদ্দিগণের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হয়। স্বজাতীয়তানিবন্ধন আঙ্গ্রের সহিত বালাজী পন্তের সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই নিমিত্ত আঙ্গ্রের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইলে, বালাজী পন্তকে আঙ্গ্রের স্বপক্ষীয় জ্ঞানে, সিদ্দিপতি তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বালাজী পন্ত এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ভীতচিত্তে সপরিবারে শ্রীবর্দ্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন রাজধানী সাতারা (সেতারা) অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথ সাতারায় পদার্পণ করেন। এই সময়ে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহু, মহারাষ্ট্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, রাজ্যের জমাবন্দী ও রাজস্ব আদায়ের ভার প্রধান সেনাপতি ধনাজী রাও যাদবের প্রতি সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি এই নূতন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, তৎসম্পাদনার্থ যে সকল কারকুন (কেরাণী) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহাদের অন্যতম। অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে, বালাজী পন্ত স্বীয় কার্য্যে এত দূর দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন যে, সেনাপতি যাদব রাও ও মহারাজ শাহু তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, এবং ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ধনাজী যাদবের মৃত্যু হইলে, মহারাজ শাহু রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার বালাজী বিশ্বনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময় হইতে কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তাগুণে বালাজী বিশ্বনাথ রাজসভার ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নিবারণের ভার বালাজী বিশ্বনাথের প্রতি অর্পিত হয়। বালাজী স্বীয় অদ্ভুত তেজস্বিতা, অদম্য বিক্রম ও অসামান্য বুদ্ধিকৌশলে অল্প কালের মধ্যেই সমস্ত বিদ্রোহের দমন করিয়া, রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করিলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার এই কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁহাকে "পেশওয়ের" অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। (১)

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর সাত মাস পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বাজীরাও অতিশয় পরাক্রমশালী ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। তিনি মুসলমানগণের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, মালব, গুজরাথ (গুজরাট) ও বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি মোগলাধিকৃত প্রদেশসমূহে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, চাম্বেল ও নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মহারাষ্ট্রীয়গণকে প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। বাজীরাওএর প্রবল পরাক্রমে নিজাম উল্‌মুল্ক পুনঃপুনঃ পরাজিত, এবং পোর্টুগীজগণ হতদর্প হইয়া, ভারতে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অজেয় হইয়া উঠে।

বাজীরাও যেমন যুদ্ধনিপুণ, তেমনি রাজকার্য্য-ধুরন্ধরও ছিলেন। তিনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন, শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইলেও, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বাগ্মিতার জন্যও তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। এই সমস্ত গুণসম্পন্নতা হেতু, মহারাজা শাহু, রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত করিয়া, স্বয়ং ভোগবিলাসে কালাতিপাত করিতেন। বাজীরাওএর ভ্রাতা চিমাজী আপ্পাও বীর ও যুদ্ধকুশল ছিলেন। পোর্টুগীজগণের সহিত যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাওএর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বাজীরাও তিনটি পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম, বালাজী বাজীরাও (সচরাচর নানাসাহেব নামে অভিহিত); মধ্যমের নাম রঘুনাথরাও (সাধারণতঃ দাদাসাহেব নামে পরিচিত) এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম, জনার্দ্দন পন্ত। জনার্দ্দন পন্ত অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। চিমাজী আপ্পার একমাত্র পুত্র,—সদাশিব রাও ভাউ, সংক্ষেপে ভাউ সাহেব।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বাজীরাও (বা নানাসাহেব) পেশওয়ের পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই ঘটনার নয় বৎসর পরে, মহারাজ শাহু অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। মৃত্যুকালে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান যে, তাঁহার পিতৃপৌত্র রামরাজাকে তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে দত্তকস্বরূপ প্রদান ও শিবাজীর বংশধরজ্ঞানে সেই দত্তক পুত্রের প্রতি রাজসম্মানমাত্র প্রদর্শন করিয়া, পেশওয়েগণ সমস্ত রাজকার্য্যের নির্ব্বাহ ও যথাসুখে রাজ্য ভোগ করিবেন। শাহুর দত্তকপুত্র রামরাজা অতিশয় অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া, তিনি সাক্ষিগোপালের ন্যায় সাতারার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেশওয়েগণ (১৭৫০ খ্রীঃ) পুণায় রাজধানী স্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্য শাসন ও ভোগ করিতে লাগিলেন।

পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও (বা নানাসাহেব পেশওয়ে) মহারাষ্ট্র রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রাওকে যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান ও পিতৃব্যপুত্র সদাশিব রাও বা ভাউসাহেবের উপর রাজকীয় সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত করিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর হইতে সে সময় পর্য্যন্ত রাজ্যে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ভাউসাহেবের চেষ্টা ও তত্ত্বাবধারণে তৎসমস্ত বিদূরিত হইয়া রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ও প্রজাগণ অশেষ প্রকারে সুখী হইল।

ছয় বৎসর কাল মহারাষ্ট্র রাজ্যের "পেশওয়াই" বা মন্ত্রিত্ব, দিল্লী-বিজয় ও নিজাম উল্‌মুল্‌কের দর্প চূর্ণ করিয়া, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে 'পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ' ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বালাজী বিশ্বনাথের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম বাজীরাও, কনিষ্ঠের নাম "চিমাজী আপ্পা"।

বালাজী বাজীরাওএর রাজত্বকালে, এক দিকে রঘুনাথরাও গুজরাথ (গুজরাট্) আজমীর ও পঞ্জাব জয় এবং অপর দিকে সদাশিবরাও হায়দরাবাদের নবাবকে পরাজিত করিয়া ভারতে মহারাষ্ট্রগৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছিলেন। কিন্তু এমন সময় সহসা অপর দিক হইতে এক বিপদ আসিয়া কিছু দিনের জন্য তাঁহাদিগের উন্নতির গতি রুদ্ধ করিয়া দিল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ আব্দালী ভারত আক্রমণ পূর্ব্বক পঞ্জাব হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য, পুণা হইতে সদাশিব রাও ভাউ (বালাজী বাজীরাওএর জ্যেষ্ঠ পুত্র) ও বিশ্বাস রাও বহু সৈন্য সহ পাণিপতের অভিমুখে প্রেরিত হয়েন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী দিবসে, মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত আব্দালীর যে যুদ্ধ হয়, তাহা ইতিহাসে "পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিণাম ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত ও প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য সমরক্ষেত্রে পতিত হয়। বালাজী বাজীরাও এই সংবাদশ্রবণে একেবারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ভ্রাতা ও পুত্রের শোকে ও পরাজয়জনিত দারুণ মানসিক যন্ত্রণায়, অল্পকালের মধ্যেই তিনি পরলোকে গমন করেন। (২)

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, নানাসাহেব (বালাজী বাজীরাও) পেশওয়ে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে, তাঁহার মধ্যম পুত্র মাধবরাও (সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় গৌরব যে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, মাধবরাওএর চেষ্টায় তাহা পুরুদ্দীপিত হইল। তিনি বহু যুদ্ধে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া ভারতে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মাধবরাও অতিশয় দয়ালু, সত্যপ্রিয়, ধার্ম্মিক ও শৌর্য্যশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক নরপতি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রজাগণকে সুখী করিবার জন্য দিবানিশি প্রাণপণ যত্ন করিয়া, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে অকালে যক্ষ্মাকাশ রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

মাধবরাওএর সন্তানাদি না থাকায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশওয়ের পদ প্রাপ্ত হয়েন। অদ্য আমরা যে মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে নারায়ণরাওএর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম "শ্রীমন্ত নারায়ণরাও পেশওয়ের বখর—রাজকর্ম্মচারিগণের বিবরণ সহ।" ইহা কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহা জানিবার কোনও উপায়ই নাই। এই বখরের প্রারম্ভ ও শেষভাগ অতিসংক্ষিপ্ত। রচনাপ্রণালী নানা ফড়নবীসের আত্মচরিতের রচনা অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে প্রাঞ্জল। অনুবাদে মূলের ভাব যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মূল গ্রন্থের রচনাপ্রণালীর দোষে অনুবাদের ভাষার সমতা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। বখর-বর্ণিত ঘটনাগুলি যথাসাধ্য বিশদ ও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, বহুল পাদটীকা সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে।

(২) এই বখরের অনুবাদ প্রদানের পূর্ব্বে, বখর-বর্ণিত ঘটবলীর সহিত যাঁহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ স্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১ম, রঘুনাথরাও বা দাদাসাহেব।

রঘুনাথরাও বা দাদাসাহেব, পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওএর কনিষ্ঠ সহোদর—মাধবরাও ও

রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দাদাসাহেব সরল-প্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ স্থূলবুদ্ধি হইলেও, অতিশয় সাহসী ও রণপণ্ডিত ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই শৌর্য্যগুণে, সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে, অধিকাংশ স্থলেই জয়শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে, দাদাসাহেব দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই দ্বিতীয়া পত্নীর নাম আনন্দী বাই। আনন্দী বাইর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি, ত্রেতা যুগের মন্থরা অথবা বর্ত্তমান যুগের লেডী ম্যাক্‌বেথ অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না। তিনি নাকি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন; তাই যৌবনে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তিনি দাদাসাহেবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন। এবং এই সময় হইতেই গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পর্য্যন্ত দাদাসাহেবের মনে ও আচরণে কপটতা দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু কিছুদিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও অধিকাংশ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, আনন্দী বাইর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশপ্রাপ্তির ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে উদিত ও ক্রমে বলবতী হইল। এই কারণে মাধবরাওএর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। দাদাসাহেব রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লইবার জন্য মোগলগণকে বার্ষিক ৫১ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহাদের সাহায্যে পুণা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। এই গৃহবিচ্ছেদে রাজ্যনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, দূরদর্শী মাধবরাও দাদাসাহেবের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক, স্বয়ং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া সমস্ত বিবাদের নিবৃত্তি করিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধবরাওএর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, দাদাসাহেব দিগ্বিজয়োদ্দেশে উত্তরভারতে গমন করিলেন। দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তিনি পুনরায় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ চাহিতে লাগিলেন। মাধবরাও তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, দাদাসাহেব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুণা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা, মাধবরাওএর সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুণায় আনীত হইলেন। এই সময় হইতে মাধবরাওএর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, দাদাসাহেব সপরিবারে বন্দীভাবে পুণার রাজপ্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২য়, সখারাম বাপু।

ইনি আফজুল খাঁর দূত বিখ্যাত গোপীনাথ পন্তের বংশধর। "সখারাম বাপু" এক জন প্রসিদ্ধ মন্ত্রণাকুশল রাজনৈতিক ছিলেন। পেশওয়ের দরবারে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইনি দাদা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা ও সচিব ছিলেন। প্রাচীনগণের মুখে শুনা যায়, পেশওয়েগণের আমলে মহারাষ্ট্র দেশে "সাড়ে তিন জন বুদ্ধিমান্" ছিলেন। তাঁহাদের প্রথম সখারাম বাপু; দ্বিতীয়, দেবরাও—ইনি দিল্লীর দরবারের মহারাষ্ট্রীয় দূত; তৃতীয়, নিজাম আলীর মন্ত্রী "বিঠ্ঠলসুন্দর"; এবং "নানাফড়নবীস্" অর্দ্ধ বুদ্ধিমান্। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই মূর্খ! সখারাম বাপুর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে "পেশওয়ের বখরে" বহুবিধ আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ আছে।

এই অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ সখারাম বাপু দাদাসাহেবের সহায় ছিলেন। প্রত্যেক অভিযানে দাদাসাহেবের সঙ্গে থাকিতেন।

৩য়, ত্রিম্বক রাও মামা।

ত্রিম্বক রাও মামা' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইনি এক জন যুদ্ধকুশল সেনানায়ক ও মাধব রাওএর রাজকার্য্যনির্ব্বাহক বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন।

৪র্থ, হরিপন্ত ফড়্কে।

"হরিপন্ত ফড়্কে" একজন অতি বিশ্বস্ত প্রধান সেনানায়ক ও নানাফড়নবীসের বাল্যবন্ধু ছিলেন। ইঁহার পিতা, নানাফড়নবীসের পিতৃব্যের গৃহে "উপাধ্যায়" ছিলেন।

নানাফড়নবীসের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য" পত্রে (৫ম বর্ষ—পৌষ) প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমন্ত নারায়ণ রাওয়ের বখর।

(রাজকর্ম্মচারিগণের বিবরণ সহ)

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীমন্ত কৈলাসবাসী নারায়ণ রাও সাহেবের জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ।

শ্রীমন্ত কৈলাসবাসী জ্যেষ্ঠ (প্রথম) মাধব রাও সাহেবের কিছু দিন রাজ্যশাসনের পর, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায়, তিনি "থেউরে"র গণপতির (১) সমীপে আরোগ্যলাভকামনায় গমন করেন। নারায়ণ রাও সাহেব ও সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য অধিকতর বিকৃত হইল। তখন তিনি রাজশ্রী সখারাম বাপু, ত্রিম্বক (ত্র্যম্বক) রাও মামা ও নানাফড়নবীস প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"এই রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশা আর দেখি না। আমি আজ পর্য্যন্ত শ্রীমন্ত রাজশ্রী দাদাসাহেবকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন আমার পশ্চাতে সেই বন্দোবস্ত আর কিরূপ থাকিবে? বিশেষতঃ চিরঞ্জীব রাজশ্রী বালাসাহেবের কাজকর্ম্মে কিছুমাত্র দক্ষতা ও চাতুর্য্য নাই। এই কারণে, বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে নারায়ণ রাও বলিত (?)।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীমন্তের চক্ষে জল আসিল। তদ্দর্শনে সখারাম বাপু নিবেদন করিলেন,—সে জন্য আপনি তিলমাত্র চিন্তিত হইবেন না। ইহা কর্ম্মট প্রায়শ্চিত্ত (?); এ বিষয়ে কিছু মনে করিবেন না। ঈশ্বর আপনাকে (এই ব্যাধি হইতে)? উত্তীর্ণ করিবেন। কদাচিৎ যদি এমনিই হয়, তাহা হইলে আমরা পাঁচজন মুচ্ছুদ্দী (উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও মন্ত্রণাদাতা সচিব) আছি,—প্রভুর আদেশ মত আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ চালাইব। এবং শ্রীমন্ত নারায়ণ রাও সাহেবের দ্বারা আপনারই ন্যায় রাজ্য শাসন করাইব।" (২)

এই সমস্ত কথাবার্ত্তার দুই চারি দিন পরে, রাও সাহেব (মাধব রাও) কৈলাসবাসী হইলেন। (৩) তার পর ১২ দিন গত হইলে, শ্রীমন্তরাজ শ্রীনারায়ণ রাও সাহেবের জন্য

(১) পুনার অনতিদূরে "থেউর" নামক গ্রামে গণেশের এক সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। থেউরের গণপতি মূর্ত্তি অষ্টসিদ্ধিবিনায়কের অন্যতম।

(২) "পেশওয়েগণের বখর" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে মাধবরাও দাদাসাহেবকে কারামুক্ত করিয়া স্বসমীপে আহ্বানপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, নারায়ণরাওকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। দাদাসাহেবও সরলচিত্তে নারায়ণ রাওকে রাজা করিয়া রাজ্য চালাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

সাতারা হইতে "পেশওয়াঈর পরিচ্ছদ" (অভিষেকবসন) আসিল (১)। তাহা পাইয়া শ্রীমন্ত নারায়ণ রাও সাহেবের মনে "আমিই সকলের প্রভু" এইরূপ অহঙ্কার জন্মিল। পরে সমস্ত সচিবগণ সহ পুণায় আসিলেন, এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

"বাবাজী বরওয়ে" নামক তাঁহার একজন বাল্যসহচর ছিল, তাহাকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে যাহা করিত, তাহাই গ্রাহ্য করিতেন। সচিবগণের কথায় বড় কর্ণপাত করিতেন না। বাবাজীর প্রতি শ্রীমন্তের পূর্ণ অনুগ্রহ ছিল। যাহা হউক, এইরূপে ভালয় মন্দয় এক রকমে চারি মাস রাজত্ব করিলেন।

তৎপরে, সৌভাগ্যবতী (২) আনন্দী বাঈর মনে বৈষম্য জন্মিল। নারায়ণরাও সাহেব রাজ্য করিতেছেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি নারায়ণ রাও সাহেবকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়া, খরগসিং, সুমেরসিং ও তুলাজী পওয়ার (প্রমার) এই তিন জনকে ডাকাইয়া আনিলেন। রাজপ্রসাদরক্ষার জন্য ৫ পাঁচ সহস্র বৈদেশিক গারদী সৈন্য (Regular infantry) শ্রীমন্তের নিকট থাকিত। খরগসিং ও সুমেরসিং তাহাদিগের জমাদার ছিল। দুই শত রাজানুচরবর্গের মধ্যে তুলাজী পওয়ার ও চাপাজী টিলেকর, এই দুই জনই প্রধান ছিল। তন্মধ্যে তুলাজী পওয়ার, সুমেরসিং ও খরগ সিংহকে নিকটে আহ্বান করিয়া আনন্দী বাঈ বলিলেন,—"তোমাদিগকে আমার সংকল্প জানাইতেছি। কিন্তু ইহা যেন কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয়। তোমরা যে পুরস্কার চাহিবে, তাহাই দিব। অগ্রে তোমাদের প্রতিশ্রুতি চাই, পরে সব কথা বলিব।" ইহা শুনিয়া তাহারা নিবেদন করিল,—"আমরা কিছু না জানিয়া শুনিয়া অগ্রে কিরূপে প্রতিশ্রুত হইব? আপনার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে পারিলে, আমরা তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত নিবেদন করিতে পারি।" পরে আনন্দী বাঈ তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও তাহাদিগের নিকট হইতে "বেলভাণ্ডার" (৩) গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, নারায়ণ রাও সাহেবকে হত্যা করাইতে ইচ্ছা করি। এই বলিয়া খরগসিং, সুমেরসিং ও তুলাজী পওয়ার, এই তিন জনের নামে নারায়ণ রাওকে মারিবার আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলেন। তখন তাহারা বলিল যে, যদি দাদা সাহেবের স্বহস্তলিখিত "নারায়ণ রাওকে মারিবে," এইরূপ আদেশপত্র আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারি।"

আনন্দী বাঈ দুই জন জমাদার ও তুলাজী পওয়ার, এই তিন জনের নামে একটি আদেশপত্র লিখিলেন, এবং একদিন উহা লইয়া দাদা সাহেবের নিকট গমন করিলেন। সে সময় দাদা সাহেব দেবার্চ্চনাগৃহে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার স্নান সন্ধ্যা ও তপশ্চর্য্যা

---

(১) ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শাহুর বংশধরগণ অতিশয় অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া, পেশওয়েগণ সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও রাজত্ব ভোগ করিতেন। পেশওয়েগণ অধীনতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের নিকট হইতে "অভিষেকবসন" গ্রহণ করিতেন। মাধবরাওএর মৃত্যুর পর, শাহুর দত্তকপুত্র রামরাজা অগ্রহায়ণ মাসে (১৭৭৩ খৃঃ অঃ) নারায়ণ রাওকে পেশওয়ে-পদে অভিষিক্ত করিয়া, তৎচিহ্নস্বরূপ "পেশওয়াঈর পরিচ্ছদ" প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) মহারাষ্ট্র দেশে সধবা স্ত্রীলোকগণের নামের পূর্ব্বে "সৌভাগ্যবতী" এই বিশেষণটি সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(৩) বেলভাণ্ডার অর্থে বিল্বপত্র ও (দেবীর প্রসাদচিহ্নস্বরূপ) হরিদ্রাচূর্ণ। মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে ইহা অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। কঠিন শপথ করিতে হইলে বেলভাণ্ডার

সমাপ্ত হইবামাত্র (১) আনন্দী বাঈ সেই আদেশপত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তিনি তাহা পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,—তুমি কি বলিতেছ? নারায়ণ রাও আমাদের পর নহে—প্রত্যক্ষ ভ্রাতুষ্পুত্র। সুতরাং তাহাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করা উচিত। যদি সে কোনও অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে, অথবা তাহা দ্বারা যদি রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিতে থাকে, তবে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পার। কিন্তু "তাহাকে মারিবে" এই কয়টি অক্ষর আমি কদাচ লিখিব না। ইহা ছাড়া যদি তোমার অন্য কোনও কথা বা প্রার্থনা থাকে, বল। তোমার যদি স্বয়ং রাজ্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ দিতে পারি।" ইহা শ্রবণে আনন্দী বাঈ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে,"প্রসবকালে ছেলে কাৎ হইয়া পড়িলে, তাহাকে কাটিয়া বাহির করিতে হয়।" পরে আনন্দী বাইর আগ্রহাতিশয্যে দাদাসাহেব "নারায়ণরাওকে ধরিবে" এই কয়টি কথা লিখিয়া দিলেন (২)।

আনন্দী বাই সেই আদেশপত্র লইয়া দেবগৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িয়া দেখিলেন। কলম-দান (লেখনপাত্র) সঙ্গেই ছিল। একটি অক্ষর বদলাইবার ইচ্ছা ছিল বলিয়া "ধ" কে "মা" করিয়া দিলেন; তাহাতে "ধরিবে" স্থলে "মারিবে" এই অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট হইল। পরে সেই আজ্ঞাপত্র জমাদারদ্বয় ও পওয়ারের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—"অক্ষরগুলি খোদ্ সরকারের (দাদাসাহেবের) স্বহস্তলিখিত।" তাহারা এই আদেশপত্র পাইয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

(১) নারায়ণরাওএর অভিষেকবসনপ্রাপ্তির পর কিছু দিন দাদাসাহেব কারামুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে নারায়ণ রাওএর মাতার সহিত আনন্দী বাইর প্রত্যহ অতিশয় কলহ হইতে আরম্ভ হইলে, নারায়ণ রাও জননীর উপদেশক্রমে দাদা সাহেবকে বন্দী করিয়া রাখি-লেন। পেশওয়েগণের বখরে লিখিত আছে যে,—নারায়ণ রাওএর এইরূপ ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নারায়ণ রাওএর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ২।৪ বার দাদা সাহেবের নিকটে গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া মিনতিপূর্ব্বক বলিলেন যে, "আপনি ক্রোধ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন।" দাদা সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন না। "সমস্ত রাজ্য আমি গ্রহণ করিব", ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এই উদ্দেশে তিনি একবার রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার চেষ্টাও করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। তিনি পুনরায় বন্দী হইলেন। এ সময় তিনি দিবসের অধিকাংশ স্নানাহ্নিক, দেবারাধনা, তপশ্চর্য্যা প্রভৃতিতে অতিবাহিত করিতেন; এবং কখনও কখনও উপবাসও করিতেন।

(২) "পেশওয়েগণের বখরে" কথিত হইয়াছে যে, নারায়ণ রাওকে ধৃত করিবার জন্য দাদাসাহেব প্রাসাদরক্ষক গারদী সৈন্যগণকে নয় লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন। সখারাম বাপুও গোপনে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আনন্দীবাই দাদাসাহে-বের লিখিত "ধরিবে" স্থলে যে "মারিবে" করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সখারাম বাপু অবগত ছিলেন না।

কুরুক্ষেত্র।

২। কাব্যাংশ।

অতঃপর কুরুক্ষেত্রের চরিত্রসৃষ্টির কিছু আলোচনা করিব। কাব্য যদি রসের উৎস হয়, তবে কবিসৃষ্ট চরিত্রই সেই রসের আধার। চরিত্রের চিত্রনেই রসের উৎকর্ষ, ভাবের স্ফূর্ত্তি।

কুরুক্ষেত্রের চরিত্রসম্পত্তি অতি মনোহারিণী। কি বৈচিত্র্য, কি বিশেষত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কি সঙ্গতি, কি স্বাভাবিকতা, সকল গুণেই সেই সকল চরিত্র উৎকৃষ্ট। নাটককারের স্পৃহনীয় চরিত্রচিত্রনের ক্ষমতা কবিতে বিশেষ লক্ষ্য হয়।

কুরুক্ষেত্রের শীর্ষ অভিনেতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই কেন্দ্রস্থলে। আর তাঁহার জীবনব্রতের স্বপক্ষ বিপক্ষরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত অন্যান্য চরিত্র। দুর্ব্বাসা, বাসুকি, জরৎকারু এক দিকে, অন্য দিকে ব্যাস, অর্জ্জুন, সুভদ্রা, অভিমন্যু। মরুভূমে ত্রিধারার ন্যায় কবি কুরুক্ষেত্রের শোণিতকর্দ্দমে আর তিনটি স্ত্রীচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—তাহারা সুলোচনা, শৈলজা ও উত্তরা। তাহারা কৃষ্ণের জীবনব্রতের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সহায়িনী নহে, কিন্তু তাহাদের কাব্যের পাত্রপাত্রী-গণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই সকল চরিত্র কুরুক্ষেত্র-চিত্রপটে সন্নিবিষ্ট হইয়া সে পটের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছে। কবি আদর্শপুরুষ নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও সূক্ষ্মতম ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনব্রত—

> সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিব সাধন,
> স্থাপন করিব ধর্ম্ম, এক মহা ধর্ম্মরাজ্য করিয়া সৃজন।

তাঁহার ধর্ম্মমত—

> নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম, যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম্ম
> ধর্ম্ম কৃষ্ণ! সর্ব্বভূতহিত ;
> তাহার সাধন কর্ম্ম নারায়ণে কর্ম্মফল
> ভক্তিভরে করি সমর্পিত।

তাঁহার প্রীতি সর্ব্বভূতময়—

> দেখিলে কণ্টক এক চরণে কাহার
> কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে।

তাঁহার চক্ষে—

কিন্তু যাবৎ না ব্রত শত্রু যুদ্ধকালে

কৌরবেরা; যুদ্ধ-অন্তে ভাই পাণ্ডবের।

কিন্তু অ৳ .ক্ষৌহিণী অনন্ত কোটী মানবের মঙ্গলের পথে অন্তরায় হইয়াছে, সেই জন্য

নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
সাধিছেন স্থিরচিত্তে ক্ষত্রিয়বিনাশ।

কিন্তু

সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ সর্ব্বত্র নিষ্কাম
সর্ব্বত্রই দয়া ধর্ম্ম আদর্শ মহান্।

সেই জন্য—

ক্ষুদ্র কীট ছার
যশোলোভে মত্ত যথা বীর অদ্বিতীয়
ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি
সারথীর ব্রতে ব্রতী।

তিনি যেমন প্রজাপতিরূপে আত্মবলিদান দিয়া এই জগৎসৃষ্টি সম্ভাবিত করিয়াছিলেন, জগৎরক্ষার জন্য আবার সেইরূপ আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত।

একই নির্ঘাতে হায় একই নিমেষে হায়
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়
একই শ্মশান মাত্র করি যেন প্রজ্বলিত
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত।

ধর্ম্মবীর ভীষ্মের কথা বড় যথার্থ—

যাঁর আবির্ভাবে এই জগতের হায়
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত
যাঁর পদতরী ভর করি যুগে যুগে
সংসার-অর্ণব যাত্রী যাবে মোক্ষধাম।

এই আদর্শচরিত্র এত দিন কথায় পর্য্যবসিত ছিল, * কবি অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে তাহার জীবন্ত চিত্র চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত এই [illegible]ছেন। বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্রের জড় কঙ্কালে এত দিনে রক্ত মাংস, অসঙ্গতি[illegible] আর সেই

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণচরিত্র-সমালোচনায় ইংরাজ ঐতিহাসিক ফ্রুডের [illegible] কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক [illegible] বাহিরে; তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী দ্বারাই বর্ণনাসাধ্য। কবি-[illegible] আছে এবং গদ্যের তাহা নাই। বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ও রৈবতক [illegible] আলোচনা করিলে ফ্রুডের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়।

অধিকন্তু জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিলাম, কেন ভারত এক দিন কৃষ্ণরসে মাতিয়াছিল, কেন গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি, কেন মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, কেন আসিন্ধুহিমাচল কৃষ্ণপূজা। কেন ভীষ্মের মত রাজর্ষি, ব্যাসের মত ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াছিলেন। কেন শুকমুখগলিত তাঁহার কথামৃত আস্বাদন করিবার জন্য হিন্দু জনসাধারণ লালায়িত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রে দুর্ব্বাসাচিত্র বেশ ফুটিয়াছে। সেই রৈবতকের দুর্ব্বাসা—

ঋষিকুলধূমকেতু, জীবন্ত নরক
মহাপাপ মূর্ত্তিমন্ত ক্রোধ অবতার।

কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ—কৃষ্ণ বেদদ্বেষী, কাপুরুষ, চক্রী, গোপ, পামর। এই বিদ্বেষের কারণ রৈবতকে বিবৃত আছে। দুর্ব্বাসার দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অঙ্কুরে উন্মূলিত না হইলে,—

ভস্মিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম যেই পাপানল
গ্রাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত

কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন বিফল করিবার জন্য ... র্য্যর নেতা বাসুকির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্য শিলায়
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।

সেই সন্ধিবন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য দুর্ব্বাসা বাসুকি... গী ভগিনী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহের ... ষোল বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু সাধ্বী রমণীর মত দুর্ব্বাসার ... তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও কথায় কথায়

ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ কাঁপে থর থর

তাঁহার মতে

তরুর আবার কেবা পিতা মাতা ভ্রাতা?
হলে বৃক্ষান্তর
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়ে পড়ুক কুঠারে
পূর্ব্ব তরু, আছে তাহে কি দুঃখ লতার?

জরৎকারু তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু সে অনার্য্যা।

অঙ্গ-বাতাসেও তার
হয় দেহ কলুষিত আমি দুর্ব্বাসার,

কিন্তু যাবৎ না ব্রত উদ্যাপন হয়, তাবৎ

হইবে সহিতে
অনার্য্যসংসর্গ পাপ এই বিড়ম্বনা।

আর সেই ব্রত-উদ্যাপনের পথে কোন ধর্ম্মবাধা স্থান পাইতে পারে না। শিশু অভিমন্যু যদি সে পথের কণ্টক হয়, তাহাকে অন্যায়-যুদ্ধে উন্মূলিত করিতে হইবে।

নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি
বধিবে তাহারে রণে।

কবি দশম সর্গে কর্ণ-দুর্ব্বাসা-সংবাদে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক অভিনব ইতিহাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ণ দুর্ব্বাসার করচালিত যন্ত্র; তাহারই উপদেশে কর্ণ কৃষ্ণের পঞ্চগ্রামভিক্ষা নিষ্ফল করিয়া কুরুক্ষেত্র-মহানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। দুর্ব্বাসার উদ্দেশ্য, কৌরব পাণ্ডব ধ্বংস করিয়া কর্ণকে ভারত সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। আর বাসুকির সহিত যে ধর্ম্মসাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা, তাহার ফলে অনার্য্য জাতি অতল জলে ডুবাইয়া দেয়। এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের আমরা যথাস্থানে বিচার করিব। এখানে এই টুকু লক্ষ্য করা উচিত যে, কবি দুর্ব্বাসায় যে সকল ছল কৌশল আরোপিত করিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বাসা-চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কুরুক্ষেত্রের দশম সর্গ অপূর্ব্ব কৌশলে লিখিত—ইহাতে অতি-সংক্ষেপে অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং ক্রূর কুটিল কৌশলী দুর্ব্বাসা-চরিত্রের বিকাশ ও সঙ্গতিরক্ষা দৃষ্ট হয়।

কুরুক্ষেত্রে বাসুকিচরিত্র বড় ফুটে নাই—বোধ হয় কবি ফুটাইবার অবকাশ পান নাই। দীর্ঘকাল কোথা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসংখ্য অনার্য্য জাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াসে ভগ্নমনোরথ হইয়া বাসুকি ভগিনীর কাছে ফিরিয়া আসে। সেই একবারমাত্র তাহার সাক্ষাৎ পাই। তাহার মুখে শুনি,

ছিলাম ব্যাপৃত
কার্য্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া।

কি এই না... কবি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। করিলে

অস... সুযোগে তদানীন্তন অনার্য্যসমাজের অনার্য্য-সম্মিল-

...একটা সজীব চিত্র আঁকিতে পারিতেন। এ চিত্রের

...দিয়াছেন; সেই চিত্র উদ্ভাসিত করিতে পারিতেন।

...ার ফলে রৈবতকের সেই অনার্য্য-ঈশ্বর, অনার্য্য

শক্তির নব অভ্যুত্থানের নায়ক, সেই দৃঢ়তা সাহস শক্তি সর্ব্বত্যাগী পরেত আধার বাসুকির তুলনায়, কুরুক্ষেত্রের বাসুকি যেন নিস্তেজ নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট সর ভ্রম অলীক চিত্র বলিয়া মনে হয়।

জরৎকারুর নিরাশ প্রেমের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মুগ্ধ প্রেমের ইতিহাস রৈবতকপাঠকের অবিদিত নাই। কারুর যখন স্ফুটোন্মুখ যৌবন, হৃদয়ের শত ধারা প্রণয়ের পাত্রে সংক্রামিত হইবার সেই কালে, কৃষ্ণের সহিত নিত্য দেখা হইত।

ক্রমে দেখা ক্রমে কথা, অঙ্কুরিত আশা লতা
ক্রমে ক্রমে হল পল্লবিত
ক্রমে নিত্য দরশন নাহি সহে অদর্শন
ক্রমে ক্রমে পল পরিমিত।

শেষ এক দিন প্রণয়ের বাসন্তী ঊষায় কৃষ্ণ কারুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার?
এস সহোদরা সম হও ব্রতে সহায় আমার।

অভিমানিনী কারু এ প্রত্যাখ্যানে পদস্পৃষ্টা ভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল।

নিব ব্রত? লইলাম, দিব ঘোর প্রতিদান
পাইলাম যেই অপমান
জ্বালাইলে যে শ্মশান করিবে অনার্য্য প্রাণ
তব তপ্ত রক্তে নিরবাণ।

সেই অবধি হৃদয়ের অবরুদ্ধ শত সুখপ্রবাহ—কারুর সকল আশা ভালবাসা—ভ্রাতা বাসুকির প্রতি প্রধাবিত হইল। তাহার অস্ফুট পরিচয় এই কুরুক্ষেত্রে পাই।

এক স্রোতে হায় আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এ জীবন এ হৃদয়; সহোদর স্নেহ
সেই স্রোতঃ সেই স্বর্গ * * * *
প্রভু আমাদের
নাগরাজ পিতা মাতা ভ্রাতা সহোদর
একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
উদাসিনী পত্নী তব। স্নেহপারাবার
ভ্রাতা সে বন্ধন তার।

সেই নিরাশ জীবনের ঘনান্ধকারে একটি ক্ষীণ সাম্রাজ্য-আশা। সেই সঙ্গে আর্য্যের অত্যাচার হই অত্যাচার কারুর মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিতেছিল।

অনার্য্যা আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যের
পশুপক্ষী যেই দয়া পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্য্য নাহি পাই বিন্দু তার।
হায় নাথ, তুমি পিতা নহ কি অনার্য্যদের
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা?

সেই সাম্রাজ্য-আশা চরিতার্থ হইবার আশায়, সেই প্রতিহিংসা-ব্রত সফল করিবার কামনায়, বিলাসিনী কৃষ্ণপ্রেমাধিনী কারু, বিকলাঙ্গ কৃষ্ণশত্রু দুর্ব্বাসার সহিত বিবাহবন্ধন অঙ্গীকার করিল। বিবাহ বলিলে আমরা যে পতিপত্নীসম্বন্ধ বুঝি, এ সে বিবাহ নয়। ইহা পণ-উদ্ধারের চুক্তিমাত্র।

দুর্ব্বাসা আমার নহে পতি
আমি ভার্য্যা নহি দুর্ব্বাসার,
উভয় উভয়ে মাত্র দেখি
উভয়ের সেতু কামনার।

কৃষ্ণই তাঁহার চিরদিন হৃদয়ের স্বামী—জীবনের আরাধ্য ঈশ্বর। কত দিন দেখা নাই, কিন্তু আজিও—

অঙ্গের বাতাস তার অঙ্গের সুবাস
সেই ফুল্ল কম্বুকণ্ঠ বহুদিন শ্রুত

বারেক অনুভব করিবার জন্য কারু বিহ্বলা বিবশা দীনা হইয়া

চেয়ে আছে অভাগিনী, নিদাঘবিদগ্ধ ধরা
কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নব ঘনে।
না না নাথ তুমি মম স্বামী
আমি আমরণ তব দাসী।
আগুন ঋষির মুখে, পতি সম সেই জন
জীবনে মরণে মম জনমে জনমে।

দুর্ব্বাসার কারুর প্রতি ভাব, অনার্য্যসংসর্গরূপ বিড়ম্বনায় বিরাগ ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। অতএব সেই কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতায় যদি না এই দুর্ব্বাসার যুক্তি-পতিত্ব নিমগ্ন হইয়া হারাইয়া যাইত, তবে আমরা কবিকে অসঙ্গতিদোষে অপরাধী বলিতে পারিতাম।

[illegible]ার সেই গভীর প্রেমে নৈরাশ্যের তীব্রতাই বা কত?

আভাষ[illegible]

হয় ত উদয়
অস্ত রবি, অস্ত প্রেম ফিরে না কি আর?

নাহি যদি পাইলাম কেন নাহি মরিলাম
হায় নাথ চরণে তোমার?

জ্বলিয়া জ্বলিয়া অভাগিনীর হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে।

হায় মাতঃ বসুন্ধরে দয়াময়ী তুমি!
বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি।
এ হৃদয় মরুভূমি কর মা গ্রহণ
কারুর হৃদয়ের নিকুঞ্জ বনে
আজি জ্বলিতেছে কিবা দাবাগ্নি ভীষণ!

উন্মাদিনী প্রতিহিংসাব্রত আজিও ভুলে নাই—প্রভাসে উদ্যাপিত করিবে।

আর নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া।

প্রেমনিরাশা,প্রতিহিংসা, রাজ্যলিপ্সা, স্নেহ, কোমলতা, অভিমান, সহিষ্ণুতা, এই সকল বিচিত্র বৃত্তির সামঞ্জস্যে ও সংঘর্ষে কারুচরিত্র। জগতের কাব্যে এরূপ চরিত্রের সংখ্যা অধিক নহে।

ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে কৃষ্ণের প্রধান সহায় ব্যাস অর্জ্জুন, সুভদ্রা অভিমন্যু। ব্যাস ও অর্জ্জুন চরিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কবি রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে ধারণা হয় যে, কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত

নব ধর্ম্মমন্দিরে
ধনঞ্জয় বাহুবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন;
বিশ্বকর্ম্মা দ্বৈপায়ন
করিবেন জ্ঞানবলে
এই পরিখায় নব মন্দির সৃজন
তাঁহার গাণ্ডীব জ্ঞান অস্ত্র তত্ত্বরাশি
তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র গীতা নিত্য অবিনাশী।

সুভদ্রা আদর্শ রমণী—'রমণীর পূর্ণ সৃষ্টি', রৈবতকের সে[illegible] বালিকা এখন যুবতী হইয়াছে। অর্জ্জুনের প্রণয়িণী আজ অভিমন্যুর মাতা। [illegible]রল জল ও ঘন তুষারে যে প্রভেদ, রৈবতকের সুভদ্রা ও কুরুক্ষেত্রের সুভ[illegible] [illegible]ভেদ; যেমন অষ্টমীর চন্দ্র পরিণত হইয়া পূর্ণিমায় ষোলকলায় [illegible]য়, যেমন ক্ষুদ্রা গিরি-নির্ঝরিণী শ্যামল ক্ষেত্রে পূর্ণতোয়া হইয়া জীবনরূ[illegible] বালিকা সুভদ্রা যুবতীতে বিকশিত হইয়া সেইরূপ হইয়াছে।

সুভদ্রা 'ভূতলে রূপের স্বপ্ন', গুণের সমষ্টি। গীতার অপার্থিব ধর্ম্ম তাহাতে মূর্ত্তিমান্। রৈবতকে আমরা শুনিয়াছি

যেইখানে রোগী শোকী ভদ্রা সেইখানে
মূর্ত্তিমতী শান্তিরূপে। অশ্রু যেইখানে
সেখানে ভদ্রার কর।

কুরুক্ষেত্রে দেখি—সুভদ্রার

নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার।
শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার!

রণান্তে প্রতি সন্ধ্যায় সেবক সেবিকা সৈন্য চিকিৎসক সহ রণস্থল বুলিয়া বেড়ায়। তাহার জীবনের ব্রত পরহিত।

তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব বর্ষণ
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পারি যদি মুছাইতে
এক বিন্দু হবে মম সার্থক জীবন।

তাহার রমণীজীবন আদর্শ অতি মহান্।

জগতের পত্নী জগতের মাতা
জগতের দাসী রমণীচয়। (রৈবতক)
রোগে শান্তি দুঃখে দয়া শোকেতে সান্ত্বনা ছায়।
দিদি এই ধরাতলে রমণীর বুক। (কুরুক্ষেত্র)

তাহার কাছে শত্রু মিত্র আর্য্য অনার্য্যে ভেদ নাই।

তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ
এক জল ভিন্ন জলাধার।
শত্রুর এক ভগবান্ সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়।
না বোন, অনার্য্য আর্য্য কহিতে লাগিলা ভদ্রা
একই পিতার পুত্র কন্যা সমুদয়
এক রক্ত এক মাংস এক প্রাণ সকলের
এক আত্মা; এক জল ভিন্ন জলাধার।

তাহার ব[illegible]য়তঃ পুতে হৃদয়ে পাপীর জন্যও স্থানের অসদ্ভাব নাই।

[illegible]ই জন পুণ্যবান্ কে [illegible] তার [illegible] ভাল
তাহাতে মহত্ব [illegible] বা আর

পাপীরে যে ভাল বাসে আমি ভাল বাসি তারে
সেই জন প্রেম-অবতার।

আর জগতের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা, জাগতিক প্রীতির পরিমাণই বা কত!

সুভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ
করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক
মানবের সুখপথ করে উন্মোচন
তবে শৈল ভাগ্যবতী পুণ্যবতী আর
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার?

এই জগতের হিতে আত্মবিসর্জ্জনে আমরা সুভদ্রার কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই। সেই জন্য স্বধর্ম্মপালনে তাঁহার এত অনুরাগ। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন

লও আশীর্ব্বাদ করি স্বধর্ম্মপালন
গীতার সাম্রাজ্য কর জগতে স্থাপন।

কৌরবেরা অন্যায়যুদ্ধে পুত্রের ঘোর অমঙ্গল ঘটাইবে জানিয়াও, সুভদ্রা সেই জন্য পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে মানা করিলেন না।

ধর্ম্ম যুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইব পতিতা।

সেই জন্য পুত্রের বিদায়ের কালে হৃদয়ে অমঙ্গল বিষাদ ছায়া জাগিলেও

তথাপি একটি রেখা মুখে রূপান্তর
হইল না সুভদ্রার।

ভ্রাতার ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনব্রতের উদযাপন জন্য ভগিনীর কতই প্রয়াস, কতই একগ্রতা।

পিতা পুত্র শ্রথ করে করিতেছে রণ
কৃষ্ণ সুভদ্রার বস্ত্র যাইছে ভাসিয়া।

* * *

দয়াময়! নাহি শোক সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার তার শোক নাহি ধরাতলে।
তব পদাশ্রিতা, পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল
সাধিয়াছে যদি দেব মানবমঙ্গল।

* * *

এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিঙ্গনে
বাঁধিব অনার্য্য আর্য্য। গাইবে জগৎ
কৃষ্ণনাম; কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিবে ধরণী।

কবি সুভদ্রাকে পুত্রশোকে পোড়াইয়া তাহার অগ্নিপরীক্ষা দেখাইয়াছেন। সে অগ্নিও সুভদ্রার স্পর্শে চন্দনশীতল হইয়াছে। শোকের সাগর কুরুক্ষেত্রে শবচক্রমহাবেলার মধ্যে, স্তম্ভিত প্রাঙ্গণে যথায় বিরাটপতি মূর্চ্ছিত, 'পাণ্ডব সকল বাঢবিদ্ধ মীন-মত'।

কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়
নিদ্রা যাইতেছে সুখে ; বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিত, মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা

সেই মহা শোকক্ষেত্রে

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক বিস্ফারিত,
কেবল অচল সেথা একটি হৃদয়
সেই নেত্র সেই বুক মাতা সুভদ্রার।

জননী যোগস্থা হইয়া পৃথিবী ভুলিয়া অচেতনা আকাশের পানে চাহিয়া আছেন।

অচেতনা দেবী মাতা বসিয়া শিয়রে

দুঃখময় ধরা হইতে চিত্ত অবসৃত করিয়া নারায়ণে সমাধিস্থা আছেন।

এ ভাব কাহারও কাহারও চক্ষে অস্বভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমতঃ সুভদ্রা সমাধিস্থা ছিলেন, অর্থাৎ শোকের বস্তু হইতে চিত্ত প্রত্যাহার করিয়া ভগবানে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমাধির ফলে প্রহ্লাদ অস্ত্রের ছেদ ও অগ্নির দাহনজ্বালার ক্লেশও অনুভব করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অভিমন্যুর মরণে মানবমঙ্গল সাধিত হইবে।

আমরা সকলে মেলি সাধিতেছি যেইব্রত
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।
সফল জীবন ব্রত অধর্ম্ম হয়েছে হত
সুলোচনা মাতৃপ্রেম অভিমন্যু আত্মদান
নব ধর্ম্ম রাজ্য ভিত্তি চূড়া তার কৃষ্ণনাম।
এই নব ধর্ম্মামৃতে দুঃখ রহিবে না আর
জগতের হবে ধরা সুখ শান্তি পারাবার।

...য়তঃ পুত্রের বীরত্বগৌরবে বীরমাতার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

সম্মিলিত সপ্তরথী বিমুখি ভীষণাহবে।
এই শরশয্যা শেষে হইল যাহার
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর?

শেষ কথা, সুভদ্রার স্নেহ এক পুত্রে সীমাবদ্ধ না করিয়া সমগ্র মানব জাতিতে সংক্রামিত হইয়াছিল।

সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্যু মম
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর
এক মর পুত্র মম হারাইয়া লভিয়াছি
আমি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর।

এরূপ অবস্থায় শোকের উচ্ছ্বাস বা উন্মাদতা সম্ভবে না। যতটুকু শোক স্বাভাবিক, ততটুকুই হইয়াছিল।

একটি লহরী মাত্র তুলিল এক উচ্ছ্বাস
পুত্রের শ্মশান ছায়া বহিল একটি বোন।

এই সুভদ্রাচরিত্র। এরূপ শোভাময় শান্তিময় পবিত্রতাময় মহিমাময় চরিত্র জগতের সাহিত্যে বিরল।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা ও অভিমন্যু সম্বন্ধে কবির এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

জ্ঞান দেব নারায়ণ, বল দেব ধনঞ্জয়,
মধ্যে ভক্তি দেবী ভদ্রা, সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্মবিসর্জ্জন, জ্ঞান বল আত্মদান
ভক্তির নিষ্কামসূত্রে সম্মিলিত মম প্রাণ!

ধর্ম্মরাজ্যব্রতে এই আত্মবিসর্জ্জন বালক অভিমন্যুর। কবির চিরবিশ্বাস

নিষ্পাপ মানব পুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানবের পরিত্রাণ!

মানবউদ্ধারে এই আত্মবলিদান বালক অভিমন্যুর।

পারিল না পিতা পুত্র করিল স্থাপিত
আজি ধর্ম্মরাজ্য দিয়া আত্মবলিদান।
আমরা সকলে মেলি সাধিতেছি সেই ব্রত
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।

কি মহান্ উদ্দেশ্য, কি বিশাল উদ্যম, কি যুগসঞ্চারী ব্রত! এই উদ্দেশ্য ব্রত যে পরিমাণে মহান্ বিশাল যুগসঞ্চারী, তাহার সাধনের জন্য ব[illegible] বস্তুর তেমনি গৌরব মহিমা মহত্ত্ব হওয়া উচিত। এইরূপে সৃষ্টির [illegible] বিধি রক্ষিত হয়। কবি অভিমন্যুচরিত্র যে তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা হয়, যে ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন, এবং মানব-উদ্ধার সাধনার্থে অভিমন্যু যোগ্য বলিদান।

অভিমন্যু 'কৌরবখনির শিশুমণি সর্ব্বোত্তম'। ত্রিদিবপ্রসূত বারিবিন্দু পৃথিবীর শুক্তিতে মুক্তায় ঘনীভূত হইয়াছে।

দেব প্রতিভায়
বিক্রমে মাহাত্ম্যে জ্ঞানে অভিমন্যু মম
আমার (অর্জ্জুন) অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধ গুণে।

অভিমন্যুর কবিতার জ্যোৎস্না সঙ্গীতের বীণা নিরুপমা।

কেন নিজে নারায়ণ প্রশংসা ত সর্ব্বক্ষণ
করেন চিত্রের তব, তব কবিতার।

তাহার প্রীতি সীমাহীন ;

শত্রু মিত্র তার কাছে উভয় সমান,
উভয়ে সমান প্রীতি ভক্তি সমতুল ;
শিশুরা সকলে ভাই, পিতৃব্য আমরা
সকলেই ; পত্নীগণ সকলি জননী,—
সমস্ত জগৎ তার প্রেমের নির্ঝর।

তাহার সকল শৈশবশিক্ষা এইরূপ—

সকল পুরুষ পিতা ; রমণী জননী—
সকলের পুত্র কন্যা ভ্রাতা ও ভগিনী,
দেখিব সকল জীব আপনার মত
পরহিত প্রাণপণে সাধিব সতত।

ইহার ফল আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই,—

যথায় ক্ষত্রিয়গণ হইয়াছে সমবেত
সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত।
কেন সিংহশিশু আমি শুনি বীর সিংহনাদ
না নাচে হৃদয় মম।

আর এই প্রীতির কবি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। একদিন অভিমন্যু তৃষ্ণায় কাতর হইলে

সারথি আনিল বারি, আগ্রহে মা পানপাত্র
লইয়াছি করিবারে পান,
দেখিনু অদূরে মাগো, পড়িয়া সৈনিক এক
অস্ত্রাহত কণ্ঠাগত প্রাণ।
মৃত্যুমুখে পিপাসায় রয়েছে চাহিয়া হায়
মম পানপাত্রে নেত্র স্থির—

ছুটে গিয়া কাছে তার কহিলাম পান কর
আনিয়াছি সুশীতল নীর।

মাতা পিতা মাতুলের প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা অগাধ অপরিমেয়;

মাতা দেবী পিতা দেব মামা নারায়ণ,
আমি তোমাদের মাগো পুত্র নরাধম।

তাহার পত্নী-প্রেম অতলস্পর্শ—

ইচ্ছা থাকি প্রেম অনন্ত স্বপনে
ওই বুকে মরি জাগি না আর।

কুরুক্ষেত্রের মৃত্যুশয্যায়—

কহিল কুমার, 'সুত! ললাটে আমার
লেখ হৃদয়ের রক্তে শরের জিহ্বায়
কৃষ্ণার্জ্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার—
লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।'
* * গাহিতে গাহিতে
পুণ্য নাম চতুষ্টয় মুদিল নয়ন।

অভিমন্যুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বধর্ম্মপালন সুভদ্রাসুতের অনুরূপ।

স্বধর্ম্মপালনে মাগো করি প্রাণদান
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।
* * *
ধর্ম্মযুদ্ধ প্রিয়তমে স্বধর্ম্ম আমার
এই কুরুক্ষেত্র মম ত্রিদিবের দ্বার।
* * *
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত দমন
সাধিব করিব ধর্ম্মসাম্রাজ্য স্থাপন।

তাহার বীর্য্য তরুণ ভাস্করের ন্যায় স্নিগ্ধ প্রখর—

হাসিমুখে নিত্য যায় নিত্য করে রণ
রণক্ষেত্র যেন তার খেলার প্রাঙ্গণ,
* * *
যাদব পাণ্ডব শক্তি যমুনা জাহ্নবী—
বহিতেছে এই ভুমে ধারা সম্মিলিত
* * * এই ভুজে মম
দুর্জ্জয় পার্থের বল, শিক্ষা গোবিন্দের।

সেই বল সেই শিক্ষার পরিচয় পলায়মান সপ্তরথীর পৃষ্ঠদেশে শোণিত অক্ষ

লিখিত হইয়াছিল, কালের প্রস্তরবক্ষে খোদিত হইয়াছিল। আর অভিমন্যুর মরণও আদর্শ-জীবনের উপযোগী—

* * * কহিতে কহিতে
'নারায়ণ ধর্ম্মরাজ্য পতিত-উদ্ধার
শুনিতে শুনিতে জয় অভিমন্যু জয়
অনন্ত কৌরব কণ্ঠে মুদিল নয়ন।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, সেই মহাদিবার, ভারতের জগতের সেই শোকের সেই সুখের দিনের—

অবসান? না না, নাহি এই দিবসের—
অবসান। ব্যাপি চারি যুগ মহাকাল
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন এই দিবালোক
জ্বলিতেছে, জ্বলিবেক।

আর উত্তরা—

ক্ষুদ্র একখণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরা

যাহার

আনন্দনির্ঝর উথলে হৃদয়ে
আনন্দনির্ঝর নয়ন-তারা,
আনন্দনির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর
ঢালে অবিরল আনন্দধারা।
সারাদিন তার পুতুলের বিয়া *
হুলুধ্বনি উচ্চহাসি,

সেই 'পুতুল বিরাটবালা'টির অভিমন্যুর পাশে কেমন শোভা হইয়াছে! যেন মেঘের সঙ্গে তড়িৎ, কবিত্বের সঙ্গে প্রতিভা। পিতার স্নেহে মায়ের আদরে পতির সোহাগে উচ্ছ্বসিতা হইয়া উত্তরা যবে ভাবে 'কে সুখী আমার মত,' তাহার পরদিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অভাগিনী জিজ্ঞাসা করে,—'ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?' ইহাই বিড়ম্বনার নামান্তর জগৎ!

উত্তরার প্রেমের গভীরতার, শোকের পরাকাষ্ঠার ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা

* উত্তরার এই বালিকাসুলভ পুতুলখেলায় কাহারও কাহারও আপত্তি শুনিয়াছি।

করিয়াছি। সে শোকের পরাকাষ্ঠা বুঝিলে, সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যায়। সে শোক কি দারুণ, যাহাতে ছয় দিনে বালিকার কেশভার শুভ্র হইয়া যায়।

করিতে সে শোকচিত্রে রেখাটি গভীরতর
না পারিল পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক চিত্রকর।

উত্তরা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি; এত হাসি ও অশ্রুর সম্মিলন, এত প্রমোদ ও বিষাদের সমাবেশ, এত মেঘ ও রৌদ্রের মিশামিশি, আর কোথায় আছে, মনে পড়ে না।

উত্তরা যে বীরপত্নী, বীরোত্তম অভিমন্যুর অর্দ্ধাঙ্গী, তাহা একটা ঘটনায় বেশ বুঝা যায়।

পতিশোকে বিষাদিনী
উঠি ধীরে ধীরে শেষে কহিল 'মা চল যাই'
কোথায়? মা উত্তরার একভিন্ন গতি নাই
পতির জ্বলন্ত চিতা।

কিন্তু যখন অনাথিনী উত্তরা শুনিল যে,

তুমি কৌরবের লক্ষ্মী আছে মা গর্ভে তোমার
একই অঙ্কুরমাত্র কৌরবের ভরসার,

তখন মৃত্যুর অধিক জীবনব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হয়।

ছয় মাস পরে যেন ছয় যুগ উত্তরার
উত্তরা আসিবে অন্তে স্বর্গে তার তপস্যার।
পতির চিতায় এই মৃত প্রাণ সমর্পণ
নহে মৃত্যু অনাথার দীর্ঘমৃত্যু এ জীবন।

আর সুলোচনা—তাহার হৃদয় গোলক অবিরত অভিমন্যু-সমীরণে প্রপূরিত ছিল।

সুলোচনা দুঃখিনীর কে আছে কি আছে তার
একা তুই সর্ব্বস্ব তাহার
তুই ধর্ম্ম তুই কর্ম্ম তুই প্রাণ তুই মর্ম্ম
তুই অবলম্বন আমার।
তোর মুখচন্দ্র স্বর্গ তোর গৃহ কর্ম্মক্ষেত্র
তুই মম সকল সংসার।
উত্তরা ও অভিমন্যু, দুই পুত্র কন্যা মম
থাকিব লইয়া আমি বুকে
এই মম নারীধর্ম্ম থাকে যদি ধর্ম্ম আর
মারি শত ঝাঁটা * তার মুখে

* সুলোচনার সে কলহপ্রিয়তা, তীব্র জিহ্বার সে অজস্র গালিবর্ষণ (যাহার সহিত

উত্তরার মুখেও শুনি।

> না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া
> না পারে থাকিতে এক তিল না দেখিয়া
> মুহূর্ত্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া
> বৎস-হারা গাভী মত মরে গরজিয়া।

নিদারুণ কাল সে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলে সে অভিমন্যুকে হৃদয়ে লইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

> প্রিয় পুত্রে লয়ে বক্ষে সুলোচনা পুণ্যবতী
> লভিয়াছে নিরবাণ একই চিতায় সতী।

তাহার নিয়তি অভিমন্যুর সহিতই পূর্ণ হইয়াছে। হইবারই কথা;

> হাসে নাই নিজ সুখে কাঁদে নাই নিজ দুখে
> চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত
> আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান
> সুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণ-গত।

তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু কি নিষ্কাম, কি গভীর, কি নির্ম্মল, কি পুণ্যাধার!

কুরুক্ষেত্রের আলোচ্য চরিত্রসৃষ্টির শেষ দৃষ্টান্ত শৈলজা। রৈবতকের পাঠকের কাছে, শৈলজা অপিরিচিতা নহে। রৈবতকের সমালোচনায় দেখিয়াছিলাম যে, 'অতুল রূপ, অমৃতভরা হৃদয়, অদ্ভুত সাহস, অকৃত্রিম প্রেম, অযাচিত আত্মত্যাগ, নিরাশায় অতুল শান্তি, সকল মিলিয়া শৈলজা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে।' দেখিয়াছিলাম, নাগবালা শৈলজা পিতৃহন্তা অর্জ্জুনকে কালভুজঙ্গিনী মত দংশন করিবার জন্য ছদ্মনামে ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের দাসত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রীতিপূর্ণ মুখ, শোকপূর্ণ অনুতাপ দেখিয়া শুনিয়া তাহার হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটে। শেষ অভাগিনী প্রতিহিংসা ভুলিয়া অর্জ্জুনের

> তাই লো বিরলে বসি সত্যভামা উদ্দেশেতে
> ছাড়ি শব্দভেদী শর দল।

কবি একটি ছোট ঘটনায় সুলোচনা চরিত্র বেশ প্রস্ফুট করিয়াছেন। সুভদ্রাও অভিমন্যু মহাগ্রন্থ গীতা পড়িতেছে।

> সুলোচনা কাছে বসি হাই তুলি কিছুক্ষণ
> চলি গেল ব্যাস দেবে করি মিষ্ট সম্ভাষণ,

পায়ে অনাথ জীবন সমর্পণ করে। অবশেষে অর্জ্জুনকে সুভদ্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া নিরাশহৃদয়ে তাঁহার সুখাকাঙ্ক্ষায় আত্ম-সুখ বলিদান দিয়া অর্জ্জুনের সুভদ্রালাভের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেয়। তাহার পর আরক্তবসনধারিণী যোগিনী সাজিয়া বাষ্পোচ্ছ্বাস-অবরুদ্ধ কণ্ঠে অর্জ্জুনের নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া শৈলজা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়। তাহার বিদায়ের কালের কথাগুলি এই,—

বিশ্ব-চরাচর
হবে সব পার্থময়; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি প্রাণেশ্বর
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর।

কুরুক্ষেত্রে যখন তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখন শৈলজা নব-জীবন লাভ করিয়াছে। এই নূতন জীবনলাভের কাহিনী কবি অপূর্ব্ব কৌশলে বিবৃত করিয়াছেন। অর্জ্জুনের কাছে বিদায় হইয়া একাকিনী অনাথিনী শৈলজা নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। পৃথিবীর শত সৌন্দর্য্য তাহার নিরাশ চক্ষে মরুময় বোধ হইতে লাগিল।

আগে মরু পিছে মরু মরু চারি দিকে
হু হু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।

ক্রমে অর্জ্জুনের প্রতি পতিভাব ঘুচিয়া পিতৃভাব ফুটিতে লাগিল। করাল কামনা সুখময়ী কল্পনায় পরিণত হইল। শৈলজা হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিল।

ঈর্ষ্যার নরক নিভিল হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল
মেলিনু নয়ন বেলা অবসান
শান্তি পূর্ণ ধরাতল।

সেই অবধি শৈলজার নব-জীবন আরম্ভ হইল। শৈল বিন্ধ্যাচলে পার্থের মৃণ্ময়মূর্ত্তি গড়িয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা করিতে লাগিল। * চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া পূজিতে পূজিতে

---

* অভিমন্যু এ পার্থপূজা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এইরূপ,—
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত, বেদী-বক্ষে সুস্থাপিত

সেই পতিভাব দেখি হইল বিলীন
সিন্ধুমুখী গঙ্গা মত। এই চরাচর
হইল অর্জ্জুনময়, হইনু তন্ময়।

একদিন ব্যাসদেব শৈলজার কুটীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিলেন,

সিদ্ধ তব পার্থপূজা, পূজ তুমি এবে
পার্থরূপে ভগবান্ অনন্ত সুন্দর।
* * পূজ ভক্তিভরে তবে
আদর্শ মানব কৃষ্ণ যুগ-অবতার
পার্থ কৃষ্ণে কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়।

শৈলজা পিতার মুখে শুনিয়াছিল, ধর্ম্মেই সুখ, 'ধর্ম্ম বিনা আর, হইবে না কোন মতে অনার্য্য-উদ্ধার'। ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিল।

গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
পতিতপাবন নাম, অনার্য্য-উদ্ধার
হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।

তদবধি শৈলজা পরহিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। বনে বনে কৃষ্ণনাম গাহিয়া অনার্য্য * উদ্ধারের, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের সহায়তা করিতে লাগিল।

পুলকে ভরিল বুক গাহিতেছে শারিশুক
জনকের দশ নাম বিহঙ্গ-নিচয়,
স্থানে স্থানে পিঞ্জরায় বনবিহগেরা গায়
বৃক্ষে বৃক্ষে শুনি সেই নাম পুণ্যালয়
নামের সঙ্গীতে বন প্রতিধ্বনিময়।

* শৈলজার স্বজাতিবাৎসল্য বড় মর্ম্মস্পর্শী,—

(সুভদ্রার প্রতি)—এ ভারতভূমি,
যাহাদের পিতৃভূমি সে অনার্য্য জাতি,
আজি কোথা? দেখ আহা কি দশা তাদের
রাজ্যহীন গৃহহীন আহারবিহীন।
* * * * অমাবস্যা ঘোর
অনার্য্যের হায় দিদি রবে কি এমন,
পতিতপাবন হরি, এ পতিত জাতি
পাবে না তাহার দয়া?
(অর্জ্জুনের প্রতি)

পারিব যে দিন মিলি ভগিনী দু'জনে
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত
সেই মহা ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপিত
সে মহা প্রয়াগতীর্থ দেখিব যে দিন
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি সুভদ্রা শৈলজা
বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা।

বিন্ধ্যাচলে শৈলজার পুণ্যাশ্রমে একদিন অভিমন্যু মৃগয়ায় পথ হারাইয়া উপনীত হন। তাঁহাকে দেখিয়া শৈলজার—

কি মধুর স্নেহ-হাসি ফুটিল সে মুখে
কি মধুর স্নেহ-স্রোত উথলিল বুকে।

সেই অবধি একটি নূতন স্নেহনির্ঝর শৈলজার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার হিল্লোলে আকুল হইয়া শৈলজা (অধার্ম্মিক সপ্তরথীর পাপ-মন্ত্রণা নিষ্ফল করিবার আশায়) গভীর নিশাকালে অর্জ্জুনের শিবিরে সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করে। এই সুভদ্রা-শৈলজা-মিলনে কবি উভয় চরিত্রের বৈচিত্র্য বড় সুন্দর ভাবে প্রস্ফুট করিয়াছেন। উভয়ই পার্থানুরাগিণী, উভয়ই অভিমন্যুর প্রতি স্নেহবতী; কিন্তু উভয়ের স্নেহ ও প্রেম কত ভিন্ন প্রকৃতির!

যোগের একটা অবস্থা আছে, তাহাকে কষায় বলে; সে অবস্থায় বৃত্তি থাকে না, কিন্তু বৃত্তির বীজ অতি নিস্তেজভাবে চিত্তের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। বিক্ষেপের প্রবল হেতু উপস্থিত হইলে, সেই বীজ ব্যক্ত হইয়া চিত্ত-বৃত্তিরূপে প্রকটিত হয়। কষায় অবস্থার এই বীজ দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগীর সাধনা সম্পূর্ণ হয়, যোগী সমাধি লাভ করেন।

শৈলজার পার্থপ্রেম অনেক সাধনায় এই কষায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিল না, কিন্তু নিস্তেজ বীজ মর্ম্মের অন্তস্তলে নিহিত ছিল। সেই জন্য অর্জ্জুনের বক্ষে সুভদ্রার সুপ্ত মুখ দেখিয়া (মানস সরসে যেন একটি কমল)

ঈষৎ কাঁপিল চক্ষু সংযত হৃদয়
যোগিনীর অলক্ষিত, কাঁপিল ভূতল
অনন্ত ভূধর ভারে স্থির অবিচল।

সেই বীজ দগ্ধ করিল অভিমন্যুর শোক। যোগিনীর যোগসাধনা সম্পূর্ণ হইল। হৃদয় নির্বাতনিষ্কম্প সাগরের ন্যায় গভীর শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া
পতি পিতা পুত্র তুমি আজি শৈলজার
পুণ্যবতী—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।

অতএব

শান্তির ত্রিদিব বুকে পুত্র সমর্পিয়া সুখে
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ
গাই কৃষ্ণ নাম মা'গো জুড়াই জীবন।
বনবিহঙ্গিনী মত উধাও উড়িয়া
গাব কৃষ্ণনাম মাগো বিশ্ব জুড়াইয়া।

শোকে এই অপূর্ব্ব শান্তি বিধান করিয়া পিতৃস্নেহশৈলে অবরুদ্ধ গৃহমুখী পতিপ্রেমমন্দাকিনীধারা পতিত অনার্য্য জাতি উদ্ধার জন্য বনভূমে বহাইয়া, কবি শৈলজা-চরিত্র সাঙ্গ করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে সুভদ্রা ও শৈলজা কেবল আর্য্য ও অনার্য্য রমণীমাত্র নহে, কিন্তু আর্য্য ও অনার্য্য শক্তির প্রতিরূপ। যমুনা ও জাহ্নবী যেমন প্রয়াগে মিলিত হইয়া পুণ্যতম তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য শক্তি কৃষ্ণের পদতলে সম্মিলিত হইয়া পতিত উদ্ধার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

দাঁড়াইয়া থাক নাথ নিরখি নয়ন ভরি
আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মী থাক মা চরণে পড়ি,

এত দূরে কুরুক্ষেত্রের কাব্যাংশের সমালোচনা শেষ হইল। বারান্তরে দর্শনাংশ আলোচিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রতিশোধ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিছু দিনের ঘনিষ্ঠতায় কৃষ্ণ সর্দ্দার বুঝিতে পারিল, বৈদ্যনাথের বল শক্তি যত, সাহস এবং বুদ্ধি সেই অনুপাতে কম। বুঝিল, এত দিন যে তাহার চলিয়াছিল, সে কেবল বিশ্বনাথ তাহাকে চালাইত বলিয়া। কৃষ্ণ সর্দ্দার নিজের

কাছে কাছে রাখিত। ইহাতেও কিন্তু গোপসন্তান নিঃশঙ্কচিত্ত হইতে পারিত না। বিশ্বনাথের ভয়ে রাত্রে প্রায় তাহার নিদ্রা হইত না।

অতএব বৈদ্যনাথ-দত্ত আশার ভরসায় একান্ত নির্ভর না করিয়া কৃষ্ণ সর্দ্দার নিজের চরদের দ্বারাও খবরাখবর লইতে লাগিল। বিশ্বনাথ বা তাহার দলের কাহারও খোঁজখবর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অন্যান্য বৎসরের চেয়ে এবার স্বরূপগঞ্জের আড্ডায় পূজার ধূম বরঞ্চ বেশী। কৌশলী কৃষ্ণ সর্দ্দার বিশ্বনাথের চতুরতা কতক না বুঝিল, এমন নহে। বৈদ্যনাথ অভয় দিয়াছিল, নবমীপূজার বলির সময় দলপতি অবশ্য ধরা পড়িবে। কৃষ্ণ সর্দ্দার বুদ্ধিখরচ করিয়া স্থির করিল, বাঘ যদিই ফাঁদে পড়ে, মহাষ্টমীর সন্ধিপূজাক্ষণ তাহার উপযুক্ত অবসর।

ষষ্ঠী সপ্তমী একরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। কৃষ্ণ সর্দ্দার সদলে কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে হাজিরী দিতে গিয়াছে, এবং পূজার ছুটীতে তাঁর শীকারখেলায় সহায়তা করিতে যাইবে, ইহাই রাষ্ট্র। বাস্তবিকও অষ্টমীর মধ্যাহ্নে প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট্ শীকারে বাহির হইয়া গেলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরে সন্ধিপূজা। যথাসময়ে ভাগীরথীর অপর তীরে নদীয়ায় বোম এবং বন্দুকের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হইল। তখন স্বরূপগঞ্জ হইতে বোমের উপর বোম ফুটিয়া উঠিয়া জাহ্নবী-খড়িয়ার সঙ্গমস্থল কম্পিত করিয়া তুলিল। বাদ্যভাণ্ডকোলাহলে ভাগীরথীর উত্তর কূল স্পন্দিত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে নদীতীরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথে সহসা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যোদ্ধ্‌বেশী অশ্বারোহী সিপাহী দল সঙ্গে দেখা দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র সেনা বিশ্বনাথের আড্ডার চতুঃসীমা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ সর্দ্দার একটু পশ্চাতে ছিল, তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।

দ্বারে দীর্ঘমূর্ত্তি বলিষ্ঠদেহ বৈষ্ণব এক জন অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষে চন্দনের অক্ষরে হরিনামের ছাপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইলিয়ট সাহেব তাহাকে দেখিয়া অশ্ববেগ সংযত করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ হ্যায় তুম্?—বিশ্বনাথ বাবু?"

বাবাজীটি আর কেহ নহেন,—ভগবান মদক স্বয়ং। সে সাহেবকে সেলাম করিয়া আত্মপরিচয় দিবে, ঠিক এমন সময়ে কৃষ্ণ সর্দ্দার সদলে বিস্তর লাঠি

কৃষ্ণ সর্দ্দার অনেক দিন বিশ্বনাথকে দেখে নাই, ভগবানকেও চিনিত না, সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। বৈদ্যনাথ ঢাল তলওয়ার ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, ইঙ্গিতে সর্দ্দার ভগবানের পরিচয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ইলিয়ট সাহেব বক্রদৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিলেন। বৈদ্যনাথ করযোড়ে বলিল, "খোদাবন্দ, এ ব্যক্তি বিশে ডাকাত নয়, তবে তা'র দলের লোক বটে!"

"কি! আমাকে বলিস্ ডাকাত, ব্যাটা ভেমো গোয়ালা? এক চড়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব জানিস্? মাজিষ্টর সাহেবের সাম্‌নে বলে খাতির করব না।" ভগবান সদর্পে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথ জানিত, ভগবানের পক্ষে ইহা সম্ভব। অতএব সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। থতমত খাইয়া বলিল, "না মোশাই তোমাকে কি আমি ডাকাত বল্‌তে পারি! হুজুর ভগবান ওনার নাম। অনেক কাল ডাকাতের দল ছেড়েছেন, বড় ভাল লোকটি!"

ভগবান হাসিল। "ধর্ম্মাবতার! আপনি হলেন দুনিয়ার মালিক। একমুখে দু কথা শুন্‌লেন! এদের কথায় বিশ্বাস হতে পারে কি না, বিচার করুন।"

সাহেব ভ্রূকুটি করিয়া কৃষ্ণ সর্দ্দারকে শাসাইয়া উঠিলেন, "দেখাও আভি কাঁহা হ্যায় বিশ্বনাথ ডাকাত! নেহি ত আচ্ছা নেহী হোগা।"

কৃষ্ণ সর্দ্দার বৈদ্যনাথকে দেখাইয়া দিল। "জনাব আলী, এই গোয়েন্দার কথায় পিত্তয় করে আমি মারা যেতে বসেছি!"

বৈদ্যনাথ রোদনোন্মুখ হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা—বলে যে, নবমীর দিন আসিতে বলিয়াছিল, আজ নহে; কিন্তু কথা ফুটিল না। ইলিয়ট সাহেব তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বেত কষাইয়া দিলেন। তারপর পূজা-বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

পূজাদর্শকের অধিকাংশ স্ত্রীলোক সেই অবসরে পলাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। সীপাহিরা কাহাকেও যাইতে দিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূজাবাড়ীতে সাহেব যখন প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহিরের গোল ভিতরেও প্রবেশ করিতেছিল—পুরোহিত নূতন লোক, পূজাটা শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচেন, সকলেই চঞ্চল এবং উৎকণ্ঠিত। কেবল বাটীর পরিচারিণী স্ত্রীলোক দুটি স্থিরভাবে প্রতিমার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর বীজন করিতেছিলেন।

পলাইল। অপরা—মীরা—কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, পূর্ব্ববৎ বীজন করিতে লাগিল। একবার মাত্র ধুনাচূর্ণ লইয়া ধূপদানিতে দিল। পট্টবস্ত্র-মণ্ডিতা সে গৌরীমূর্ত্তি, মহিমাময়ী অথচ লজ্জাবিনতা—ইলিয়ট সাহেব প্রশংস-মান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইনি?" স্থির বিদ্যুতের মত কৃশাঙ্গী সরলা যে চকিতে পলাইয়া গেল, তাহাও ইলিয়ট লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুধাইলেন—অন্য স্ত্রীলোকটিই বা কে?

ভগবান বলিল, "ইনি বিক্রমসিংহের কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর গঙ্গাতীরে বাস করচেন। অন্যটি এঁরই বহিন; এঁরাই এ বাটীর মালিক।"

সাহেব চসমার ভিতর হইতে স্থির দৃষ্টির কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তবে কে?"

হাসিয়া ভগবান উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি তাঁদেরই ছেলে, নিজের হরিনাম নিয়ে থাকি।"

ইলিয়ট সাহেবের সন্দেহ হইল। এই বুড়াটা বলে কি না, সে এই যুবতীদের ছেলে; অবশ্য এর ভিতর রহস্য আছে। সাহেবের দোষ ছিল না। তখন ইংরেজ এ দেশে সবে নূতন, এদেশী রীতি নীতি জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না। 'মাতৃবৎ পরদারেষু' যে হিন্দু সভ্যতার অস্থি মজ্জা, তখনকার কথা দূরে থাক, এখনও সাহেব-মহলে সে তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় নাই। তখনকার ইংরেজের চক্ষে নেটীভেরা কমনীয়গুণমাত্রবর্জ্জিত। প্রমাণ, মেকলের কটূক্তি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তীক্ষ্ণ স্বরে কৃষ্ণ সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বোলাও তোমার গোয়েন্দাকো!" বৈদ্যনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল, সাহেব মীরার দিকে বেত্র নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সুধাইলেন যে, সে তাঁকে চেনে কি না?

ডাকাতির রাতের সে দেবীমূর্ত্তি বৈদ্যনাথ ভুলিতে পারে নাই। সরলাকেও তার বেশ মনে ছিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "চিনি, বিক্রমসিংহের বেটী।"

ইলিয়ট ভগবানকে বলিলেন, "দোস্‌রা জেনানাকোভি সনাক্ত করনে হোগা!" ভগবান করযোড়ে প্রার্থনা করিল, পূজা শেষ হইতে দেওয়া হোক্।

আরতিটা দেখিতে সাহেবের মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু ঢাক ঢোলের বাদ্য তাঁর কানে বড় বাজিতেছিল। তিনি বাজনদারদের দিকে বেত উঁচাইয়া হাঁকিলেন, "বস্‌, চুপ রও!" তার পর বিনা বাদ্যে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজাইয়া

আপনার সামনে বাহির হবেন না। মর্জ্জি হয় ত আপনার অসাক্ষাতে বদে তাঁকে সনাক্ত করুক। তা হলে হুজুরকে একটু বাহিরে যেতে হয়!" সাহেব চটিয়া আগুন হইলেন। তাঁর মতে, এ অতি হাস্যকর প্রস্তাব; প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভগবান তবু ছাড়ে না। সে বাহিরের সকল লোককে বাহির করিয়া দিল। সাহেবের সঙ্গে রহিল কেবল কৃষ্ণ সর্দ্দার ও বৈদ্যনাথ। সরলা এর আগে আর কখন সাহেব দেখে নাই, সাম্‌নে আসিতে বড় সঙ্কুচিতা হইল। ইচ্ছা, ঘোমটা বজায় রাখিয়া কোনও মতে এ বিপদ কাটাইয়া তোলে, কিন্তু মীরা বুঝাইয়া দিল যে, তাহা অসম্ভব। সেই মুখ খুলিয়া কথা কহিতেই হইবে, কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তার ঠিকানা কি? মাঝে হইতে অনর্থক কেবল লাঞ্ছনা। কাজেই সরলা মীরার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ বলিল, "এ মা ঠাকুরাণীকেও চিনি হুজুর, ইনি হলেন দেবীপুরের জয়দুর্গা ঠাকুরুণের কন্যে।"

সুযোগ দেখিয়া ভগবান কহিল, "ধর্ম্মাবতার, এ লোকটা কি করে মা-ঠাকুরাণীর পরিচয় জান্‌লে, সেটা ওকে জিজ্ঞাসা করা হোক্!"

ইলিয়ট সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "এ লোকটা তবে কি মিছা বল্‌চে?"

ভগবান বলিল, "তা বল্‌চি নে হুজুর! কিন্তু সে কথাটা সাফ্ হলে ও লোকটার হাট হদ্দ সকলই হুজুরের মালুম হবে।"

তখন ভগবান বৈদ্যনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, "নেমকহারামির যা ফল, তা সে হাতে হাতে পাইয়াছে। এখন মিছা কহিয়া আর যেন পাপের ভার বৃদ্ধি না করে। সম্মুখে ঐ গঙ্গা, মাথার উপরে ঐ মা দুর্গা, কোন কথা লুকাইলে তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

বৈদ্যনাথ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে গল্প করিল। ইলিয়ট সাহেব তাহার ফলে সরলার প্রতি কিছু দয়ার্দ্র হইলেন। শুধাইলেন, বিশ্বনাথ বাবু তাঁর কে হন?

সরলা এ পর্য্যন্ত কোনও কথা কহে নাই, কহিবার প্রয়োজনও হয় নাই। মুখ নত করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "তিনি আমায় মা বলেন! আমার ধর্ম্মছেলে।"

সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, কি আপদ! তোমার মত বালিকা কি করে

সরলা উত্তর দিতে পারিল না। মীরা কহিল, "সাহেব! সোয়ামি ছাড়া সব্বাইকে আমরা সন্তান মনে করি। তার ছেলে বুড়ো নেই।"

কৃষ্ণ সর্দ্দার করযোড়ে প্রার্থনা করিল, ধর্ম্মাবতারের যদি অনুমতি হয়, বিশের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা সে মা ঠাকুরাণীদের শুধাইবে। তার বিশ্বাস, সব কথা তাঁরা জানেন।

ভগবান কৃষ্ণ সর্দ্দারের প্রতি রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে কহিল যে, বৈগুনাথের নিজের কথাতেই প্রমাণ যে, সে ডাকাত। কৃষ্ণ সর্দ্দারকে মাঠাকুরাণীরা কখন চেনেন না; সে কেমন লোক, বলা যায় না। মা ঠাকুরাণীরা বাজে লোকের সঙ্গে কথা কন না, জিজ্ঞাসা যত যা করিতে হয়, হুজুর নিজেই করুন।

ইলিয়ট আর কখন এদেশীয় কুলমহিলাদের সম্মুখীন হন নাই, ভগবানের আপত্তি সঙ্গত মনে করিলেন, এবং একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কতক হিন্দী কতক বাঙ্গালায় উভয়কে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা বিশ্বনাথ বাবুর কোনও খবর বলিতে পারেন?"

মীরা বলিল, "সাহেব, যিনি কখন উপকার করেন, প্রাণ দিয়ে তার প্রত্যুপকার কর্‌তে হয়। এ ক্ষেত্রে জান্‌লেও আমরা এমন কোন কথা বল্‌তে পারতাম না, যাতে বিশ্বনাথের অনিষ্ট হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই আমরা এখন তাঁর কোন খবর জানিনে।"

সরলার আয়ত চক্ষু এই উত্তরে হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার অর্থ, এ কথাটা অমন গুছাইয়া সে সাহেবকে কখনই বলিতে পারিত না। ইলিয়ট সাহেব সে উল্লাসের অর্থ বুঝিলেন। মহিলাদ্বয় যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত, তাহাতে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। তাঁহাদের কোনও কথায় অবিশ্বাসের স্থল ছিল না। সাহেব সসম্ভ্রমে বিদায় লইলেন। উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গেলেন, "যদি কখন বিপদে পড়েন, আমায় স্মরণ করিবেন।"

বাহিরে আসিয়া ভগবান জানাইল যে, মা ঠাকুরাণীরা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতে চাহেন না। সাহেব আপ্যায়িত হইয়া ধন্যবাদ দিলেন, এবং আহ্লাদসহকারে কদলী ও বাতাবি লেবুর উপহার গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার আদেশে বৈদ্যনাথের হাতে তখনই হাতকড়ি পড়িল। কৃষ্ণ সর্দ্দার

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

অধ্যাপক হক্‌সলি।

অধ্যাপক হক্‌সলির মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক জগতে একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপকের বয়স নিতান্ত অল্প হয় নাই—বরং অস্মদ্দেশে যে বয়সে লোকে মৃত্যুতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হয় না, অধ্যাপক সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তবে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই—তাই বৈজ্ঞানিক জগৎ সেই মনীষী মহাপুরুষের মরণে প্রভুত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে অধ্যাপকের জন্ম হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, জননীর সহিত তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য অসাধারণ অধিক। এমন কি, হস্তসঞ্চালনেও

জননীর প্রভাব।

সে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইত। পিতার নিকট হইতে তিনি তিনটি বিশেষত্ব পাইয়াছিলেন—অঙ্কনবিদ্যার প্রতি ঝোঁক, গরম মেজাজ এবং অবলম্বিত কার্য্যে "নাছোড়বান্দা" ভাব, কেহ কেহ সেটাকে একগুঁয়েমি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার পিতা ইলিং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—সেখানেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা অল্প দিনই পাইয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, সেটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ বিদ্যালয়ে তাঁহার ভাগ্যে সৎসংসর্গলাভ ঘটে নাই।

বিদ্যালয়ে পাঠকালে একবার একজন সহপাঠীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। সে তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; শেষে আর সহ্য হইল না। তিনি দুর্ব্বল

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

হইলেও তাঁহার অন্তর্নিহিত উগ্রভাব তাঁহার সহায় ছিল, এবং সহপাঠী প্রচুর প্রহার পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি জয়ী হইলেও চক্ষে আঘাত পাইয়াছিলেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে একদা সিডনি নগরে আস্তাবল হইতে যে তাঁহার অশ্ব লইয়া আসিয়াছিল, সেই তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী, এই পরিচয়ে তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কল কারখানার এন্‌জিনিয়ার হইবার জন্য প্রবল বাসনা সত্ত্বেও, ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নামে এন্‌জিনিয়ার না হইলেও

শিক্ষা।

কার্য্যে তিনি প্রকৃতই এন্‌জিনিয়ার ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষাকালে শরীর-তত্ত্ব বা সজীব কলের ব্যাপার অধ্যয়নেই তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ দৃষ্ট হইত। কিন্তু শরীর-তত্ত্ববিদ্যার জটিল বিষয়ের মোহিনী শক্তি, এই উৎসাহী যুবকের কর্ম্মক্ষেত্রদ্বারেই সাংঘাতিক ফল প্রসব করিয়াছিল।

তের বৎসর বয়সের সময় কতকগুলি ছাত্রবন্ধু তাঁহাকে দেহচ্ছেদ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে বরাবর বিষম বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও এবার তিনি দেহচ্ছেদ দেখিতে গেলেন; কিন্তু দর্শন করিয়া চৈতন্যহীনের মত হইয়া পড়িলেন। শেষ স্বাস্থ্যলাভাশায় তাঁহাকে ওয়ারউইকশায়ারে পিতার বন্ধুর নিকট পাঠান হয়। সেখানে যাইয়া পর দিবস প্রভাতে যখন বিছানা হইতে কোনরূপে উঠিয়া তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন, তখন বাহিরে

লেন ; তবে মধ্যে মধ্যে পাকযন্ত্রে বেদনাবোধ হইত, আর সেই হইতে অবসাদময় অজীর্ণ রোগ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

সিডেনহ্যাম কলেজ ও চেয়ারিংক্রস মেডিকেল স্কুলে পাঠ, তাঁহার জীবনের দুইটি প্রধান ঘটনা। চিকিৎসাবিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি মিষ্টার ওয়ারটন জোন্সের ছাত্র ছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Rattlesnake জাহাজে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। চার বৎসর এই জাহাজে অবস্থানকালে তিনি সামুদ্রিক প্রাণিতত্ত্ব শিক্ষা করেন, এবং বাস্তবিক প্রাণিতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। এই সময় তিনি Liencan Society-তে অনেক বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুই হইল না দেখিয়া, শেষে বিশদভাবে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া Royal Societyতে প্রেরণ করেন। এইবার সুফল ফলিল ; কিন্তু জাহাজে অবস্থান হেতু লেখক তখন কিছু জানিতে পারেন নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিলেন যে, সে প্রবন্ধ ছাপান হইয়া গিয়াছে। Royal Society তাঁহাকে এজন্য মেডেল প্রদান করেন।

ফললাভ।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক টিণ্ডালের সহিত হক্সলির পরিচয় হয়। টিণ্ডালের শোচনীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। উভয়ের প্রথম পরিচয়প্রসঙ্গে টিণ্ডাল বলিয়াছেন যে, তখন তাঁহারা উভয়েই উপযুক্ত কর্ম্মের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, কারণ উপযুক্ত কর্ম্মসম্পাদনের ইচ্ছা উভয়েরই তখন বলবতী। টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃত ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকদ্বয়ের পদ খালি হওয়ায়, তাঁহারা দুই জন, ঐ দুই পদের জন্য আবেদন করেন ; কিন্তু কেহই কর্ম্ম পান নাই। আর এক স্থানেও নাকি এইরূপ ঘটিয়াছিল।

টিণ্ডাল।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হক্সলি রয়াল সোসাইটীর সভ্য হইয়াছিলেন, এবং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা পাঠ করেন। ডারউইনের Origin of Species পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভীষণ তর্কের ঝড় উঠিয়াছিল,—সেই সময় অধ্যাপক ডারউইনের মতের পোষণ করিয়া তাঁহারই মত আক্রমণ সহ্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে তিনি মানব ও লাঙ্গুলহীন বানরের মধ্যে সাদৃশ্যের বিচার করিয়াছিলেন। ডারউইনের পুস্তকের মত এই পুস্তকও তীব্র সমালোচনাবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল। তাহার পর তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Lay Sermons, Addresses, and Reviews' প্রকাশিত হইলেও বড় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল।

কর্ম্মক্ষেত্রে।

লিভারপুল বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিরূপে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বতঃজনন (Spontaneous generation) প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কার্লাইল লর্ড রেক্টর হইলে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্. এল্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ডরেক্টর পদে মনোনীত হয়েন। এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি স্বদেশস্থ এবং বিদেশস্থ নানা বৈজ্ঞানিক সভা কর্ত্তৃক নানা প্রকারে সম্মানিত হয়েন, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত করেন।

সমাজ-নীতি।

ব্রহ্মে রমণী।

এখন ব্রহ্মের বৃটিশ রাজপুরুষগণের উচ্ছৃঙ্খল নীতিহীনতার বিষয়ে যে আন্দোলন উঠিয়াছে,

ব্রহ্মে রমণীদিগের স্বাধীনতা যেরূপ সম্পূর্ণ,জীবন ও সম্পত্তিতে অধিকার যেরূপ অসাধারণ, জগতে বোধ হয় আর কুত্রাপি তেমন দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মের রমণী সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমান।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

আইনে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার হইয়া থাকে। বালিকা বালকের সহিত সমানভাবে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়; বিবাহে সত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এই সম্পত্তিতে তাহার স্বামীর কোন অধিকার নাই, পত্নীর উপরও তাহার আইনতঃ কোন আধিপত্য নাই। শৈশব হইতেই রমণীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। যে নারীপূজা রমণীকে সাধুর মত পূজা ও ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করে, তাহা ব্রহ্মে নাই। তাহাদিগের দেশের ধর্ম্ম কখন তাহাদিগকে সকল পাপের মূল বলিয়া গণ্য করে নাই, এবং তাহাদিগকে নরকগমনের ফাঁদ বলিয়া সন্তর্পণে পরিহার করিতেও বলে নাই। তাহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই বলিয়া গণ্য হয়, এবং জগতে স্বীয় স্থান বাছিয়া লইবার জন্য তাহারা স্বাধীনতাও পাইয়াছে।

ব্রহ্মে যেমন, জগতে আর কোথাও রমণী তেমন ষোল আনা রমণীত্বে পূর্ণ নহে। রমণীর সকল নামহীন সৌন্দর্য্যই তাহার আছে। বর্ম্মায় নব আগন্তুক আশ্চর্য্য হইতে পারেন; কারণ, সেখানে রমণীর কটিদেশ নিতান্ত ক্ষীণ নহে, রমণীর দেহের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সোজাসই তাহাদের পরিধেয়। তাহাদিগকে ভাল করিয়া জানিলেই তাহা বুঝা যায়, কিন্তু তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহাদের প্রত্যেক দৃষ্টিতে এবং দেহকম্পনে সে মাধুরী

রমণীর রমণীত্ব।

প্রকাশিত হয়। পুরুষ অপেক্ষা রমণীর বর্ণ অধিক শুভ্র, তাহাদের নয়ন বিশাল ও মেটে রঙ্গের। তাহাদিগের ব্যবহার স্থির ও সংযত, কণ্ঠস্বর মৃদু ও মধুর। তাহারা পুরুষদিগের মত লেখা পড়া শিখে না, বাদ্যযন্ত্রবাদনে পারগ নহে, গান গাহিতে শিখে না, তবে কেহ কেহ সুন্দর গাহিতে পারে। নৃত্য বা অঙ্কনবিদ্যার তাহারা কিছুই জানে না; কিন্তু তাহারা গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী। ব্রহ্মে বালিকাদিগের সকল বিষয়ে মতামত তাহাদিগের দৃষ্ট ঘটনা হইতে উদ্ভূত; সে সকল অজ্ঞতার অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীর স্বপ্নমাত্র নহে,—সত্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন।

ব্রহ্মে বালিকার আমোদ আহ্লাদের সুবিধা অল্প। প্রত্যেক গৃহে বালিকাকে নিয়মিত কার্য্য করিতে হয়। ধনীর গৃহে দাস দাসী থাকিলেও বালিকারা বস্ত্র বয়ন করে। ব্রহ্মে অল্প বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ হয় না—সাধারণতঃ বিবাহের বয়স ষোল হইতে কুড়ি। বিবাহ বালিকার উপরেই নির্ভর করে। ব্রহ্মে একটা নূতন ব্যাপার আছে, সেটাকে "কোর্টিং" কাল নামে অভিহিত করা যায়। জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল স্তব্ধ রজনীতে নয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত

বিবাহ।

প্রায় ইহার স্থিতি। গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত রজনীতে সমস্ত প্রকৃতি যেন মাধুরীর স্বপ্নে অভিভূত থাকে; সুখস্পর্শ সমীরণ কুসুমসুরভিময় থাকে, আর সেই সৌন্দর্য্যের শান্ত স্নিগ্ধ ছবির মধ্যে হৃদয় সত্যসত্যই আনন্দে কম্পিত হইতে থাকে। গৃহের সম্মুখে বারান্দায় সেই স্বচ্ছান্ধকারময় সন্ধ্যাসময়ে বালিকা উপবিষ্টা; কখন কখন নিকটে একজন বান্ধবী থাকেন, কিন্তু প্রায়ই বালিকা একাকিনী। তাঁহার করপ্রার্থিগণ আসিয়া প্রেমিকদিগের চিরপ্রচলিত প্রথায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পায়। কখন কখন তাহারা অনেকেই আইসে,—যে কাজের কথা জানাইতে আসে, সে প্রায়ই একাকী আসে, আর যে শুধু শুধু আসে, তাহার সঙ্গে একজন বন্ধু থাকাও অসম্ভব নহে। কাহারও উপর বিশেষ অনুগ্রহ হইলে বালিকা তাহার চুরুট ধরাইয়া দেয়—সেই চুরুটই তাহার অধর চুম্বন করে। প্রায়ই কাছাকাছি কোন বাটীর লোক থাকেন;

ম্ভব নহে। কিন্তু প্রেমব্যাপারে কার্য্যবিভাগ নাই, বালিকা একাই তাহা সম্পন্ন করে। সে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কেবল স্বামীর সুনাম থাকা চাই, আর পত্নীর সাহায্য পাইলে সংসার চালাইতে পারে, তাহার এমন সঙ্গতি চাই।

প্রথমেই প্রেমাভিনয়ের প্রধান অঙ্গ পলায়ন ও তাহার পরেই দিন দশ ক্রমাগত কুৎসা-রটনা। সময় সময় বিনা কারণে এই পলায়ন হয়, কেবল উদ্ধত যুবকের প্রবৃত্তির বিলম্বে বিরক্তিই ইহার কারণ; কারণ, জীবন ক্ষণস্থায়ী, এবং আজ আমরা বাঁচিয়া আছি, কিন্তু কাল যে থাকিব, তাহার নিশ্চয়তা কি? পূর্ণিমা রজনীকে রজনীই বলা যায় না—কেবল তপনের তীব্রতাপময় স্বর্ণালোক নিবিয়া গেলেই চন্দ্রের রজত ধবল স্নিগ্ধ আলোক প্রকৃতিকে হাস্যময়ী করিয়া তুলে। বনমধ্যে নির্ঝরকলনাদমুখরিত পর্ব্বতপথে কাঠুরিয়াদের কুটীর আছে—

প্রেমাভিনয়।

ফার্ণ ও সুগন্ধময় তৃণের শয্যা আছে, আর বৃক্ষচ্ছায়ায় সূর্য্যকর দেহকে অবসন্ন করে না। বন আনন্দময়। আহারের জন্য তেমন চিন্তা নাই, একঝুড়ি চাউল, একটু লবণ, আর মৎস্য বা মশ্‌লা, পূর্ব্বে লুকাইয়া রাখা হয়,—তাহার পর একটা হাঁড়ি যোগাড় করিলেই দুই জনের কিছুদিনের আহারের আর ভাবনা থাকে না। অথবা কোনও বিশ্বাসী বন্ধু প্রতিদিন আহার যোগাইয়া যান। রমণীর নিবিড় কুন্তলজালের জন্য কাননকুসুমের অভাব নাই। আর সেই রহস্যময় অজ্ঞেয় স্থানে মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিয়া দুই জনে যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়! তাই যখন কোন আত্মীয়া আসিয়া পবিত্র বৃক্ষতলে প্রেমিকযুগলকে বলেন যে, বিবাহের সকল আয়োজন স্থির হইয়াছে, এবং সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে, তখন তাহারা সেই সুখস্মৃতিসমাকুল কাননভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিতে যে দুঃখিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সর্ব্বত্রই যে পুরুষ প্রেম-পলায়নের প্রস্তাবক, তাহা নহে। নিম্নলিখিত ব্যাপার হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে; লেখকের একটি ব্রহ্মদেশীয় চাকর ছিল, তাহার বয়স বিংশতি বৎসর

চাকরের ব্যবহার।

হইবে; আর সে বড় কাজের লোক ছিল। সে ক্রমে ক্রমে সকল কাজ শিখিয়া লইয়াছিল। যে গ্রামে তাম্বু সংস্থাপন করিয়া লেখক আড্ডা লইয়াছিলেন, সে সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তির (সর্দ্দার) কন্যার প্রেমে পড়িল। তাহার কারণও ছিল; বালিকার কুন্তলজাল দীর্ঘ—তাহার কণ্ঠস্বর মধুর এবং সেও যুবককে ভালবাসিত। একদিন সন্ধ্যাকালে ভৃত্য আসিয়া প্রভুকে জানাইল যে, সে বিবাহ করিবে, কাজেই তাহার কর্ম্মত্যাগ অনিবার্য্য; পরকে উপদেশ দিবার সময় আমরা যেরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে পারি, সেইরূপ বলিয়া লেখক তাহাকে বুঝাইলেন যে, সে এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাহার প্রণয়িণীর বয়সও অষ্টাদশের কম—তাহা ভিন্ন তাহাদের কিছুই সম্বল নাই। আর এক বৎসর নিয়ম মত বেতনপ্রাপ্তির পর একটু কাজের হইয়াই চাকরি-ত্যাগ বড় অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে। ভৃত্য মনোযোগ দিয়া সকল শুনিল ও রাত্রিকালে আহারের পর প্রণয়িণীকে সকল কথা জানাইতে গেল। প্রভাতে অন্য চাকরেরা সংবাদ দিল যে, সে আর ফিরে নাই। অল্পক্ষণ পরেই গ্রামের সর্দ্দার আসিয়া জানাইল যে, তাহার কন্যাও পলাইয়াছে, তাহারা বনমধ্যে গিয়াছে। এক সপ্তাহ তাহাদের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। একদিন সন্ধ্যাকালে লেখক তাম্বুর সম্মুখে ডুম্বুরবৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বালিকার জননী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নিকট লেখক শুনিলেন যে, উভয় পরিবারের মধ্যে সকল বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, বালকের বিবাহ স্থির হইয়াছে, আর যাহাতে বালক

গ্রামে থাকিতে বালক ফিরিবে না, কারণ সে বড়ই লজ্জিত ও ভীত হইয়াছে,—কাজেই তিনি যত সত্বর সম্ভব, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। লেখক বলিলেন যে, তিনি আদৌ ক্রুদ্ধ নহেন, বরং তিনি নবদম্পতিকে দেখিলে আনন্দিত হইবেন। বৃদ্ধার অনুরোধে তিনি সেই মর্ম্মে বার্ম্মিস ভাষায় একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। বোধ হয়, প্রণয়িযুগল অতি নিকটেই লুকাইয়াছিল; কারণ পরদিবস প্রভাতেই বালক একাকী তাম্বুতে উপস্থিত হইল। সে নিতান্ত লজ্জিত এবং প্রথমেই সে পূর্ব্বের মত সহজভাবে কথা কহিতে পরিল না।

ব্রহ্মপত্নী অনুরক্তা, ও তাহাদের যথেষ্ট সাহস আছে। দেশের খুচরা বিক্রয় প্রায়ই রমণীগণ চালায়। তাহারা অপরের দোকানে মাহিয়ানা লইয়া বিক্রয়কার্য্য চালায় না—আপনারাই ব্যবসা চালায়। রেশম ও কাপড় বিক্রয় ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ে গৃহকার্য্যের কোনও ক্ষতি হয় না। তিন ঘণ্টা মাত্র বাজার থাকে, তাহার পরে রমণী গৃহকার্য্যের জন্য যথেষ্ট অবসর অবশ্যই পাইয়া থাকে। সারাদিন রমণীগণ বাজারে বা কারখানায় থাকে না। গার্হস্থ্য-জীবনই ব্রহ্মরমণীর জীবনের কেন্দ্র, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব। এইরূপে প্রত্যেকের ব্যবসা থাকায়, জীবনের উপর আত্মপ্রভাব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে রমণীর মতের উদারতা জন্মে, এবং গৃহকার্য্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে সকল শিক্ষা অসম্ভব, সে সকল শিক্ষাও হয়। ইহা হইতেই ব্রহ্মরমণীর বিশেষত্ব, সহিষ্ণুতা এবং বোধশক্তির উৎপত্তি। ইহাতে আপনার বল এবং দুর্ব্বলতা, উভয়ই জানিতে পারা যায়।

পত্নী।

বিবাহভঙ্গের সম্পূর্ণ সুবিধা সত্ত্বেও, সে ব্যাপারটা বড়ই অল্প ঘটিয়া থাকে। বিবাহিতদিগের মধ্যে বোধ হয় শতকরা একটি বিবাহবিচ্ছেদ হয়, আবার বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে বিবাহ-বন্ধনবিহীন অনেক যুবক যুবতীই পূর্ব্বের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া পুনরায় বিবাহিত হয়েন; কারণ, মিলনে যে প্রেমের মাধুরী কমিয়া যায়, বিচ্ছেদে তাহার আকর্ষণী শক্তি আবার বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, সেখানে বিবাহিত জীবন সুখের। বিবাহভঙ্গের পর পুত্রগণ পিতার ভাগে ও কন্যাগণ মাতার ভাগে পড়ে; তবে লেখক বলেন, সন্তান হইবার পরেও যে বিবাহচ্ছেদ হয়, তাহা তিনি ত দেখেন নাই। ব্রহ্মরমণী যে কেবল স্বদেশীয় পতিকেই সুখী করে, তাহা নহে; ইংরাজ, চীনাম্যান, মুসলমান, হিন্দু, সকলেই তাহাদিগের সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুখী হয়। ভারতবাসীর মত স্বস্থানপ্রিয় আর বোধ হয় কেহই নাই; ফরসীদের নিকট ফ্রান্স যেমন প্রিয়, হিন্দুস্থানীর নিকট হিন্দুস্থান তাহা অপেক্ষাও প্রিয়। তবুও লেখকের একজন সহিস—একজন শিখ—ব্রহ্মে বিবাহ করিয়া সেখানে—স্বস্থান হইতে দূরে,—বাস করিতেছে—সে একজন সৈনিক ছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে।

বিবাহভঙ্গ।

রমণীর আনুরক্তি, সাহস ও দৃঢ়তায় দেশ পরিপূর্ণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। আষাঢ়। "বৈরাগ্য" একটি সুলিখিত দার্শনিক প্রবন্ধ। "ভাষা-তত্ত্ব" প্রবন্ধের লেখক বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার গঠন ও ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে তুলনায় আলোচনা করিয়াছেন; প্রবন্ধটি অনুশীলনের উপযুক্ত। সাহিত্যসেবিগণ এই প্রবন্ধে অবহিত হইলে উপকারের সম্ভাবনা। "বারতলার মেলা" একটি গ্রাম্য চিত্র। পল্লীগ্রামের নানাবিধ ছবি লেখকের

'গঙ্গাযমুনা পূজা' ও 'চন্দ্রসূর্য্য পূজা', এই তিনটি ব্রতের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, এই মেয়েলি ব্রতগুলি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। লেখক যদি এই সকল ব্রতের উৎপত্তি, বিস্তৃতি এবং, কোন্ কোন প্রদেশে ইহাদের স্থিতি, এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল এই সঙ্গে প্রকাশিত করিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত। "প্রতিহিংসা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। এই গল্পের আত্মসম্মানদৃপ্ত অথচ মধুরস্নেহসিক্ত ইন্দ্রাণীর চরিত্রটি একটু নূতন ধরণের, এবং এই ক্ষুদ্র গল্পের ফ্রেমের ভিতরে তাহার বেশ শোভাও হইয়াছে। "দুই বিঘা জমী" একটি নূতন ধরণের সুন্দর কবিতা। "অপূর্ব্ব রামায়ণ" পাঞ্চভৌতিক সভার একটি অংশ। "ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই"—দ্বিতীয় প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "এসেছিল গিয়াছে চলিয়া" লাওয়েলের একটি কবিতার অনুবাদ। "চকোর" শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের একটি কবিতা। এরূপ সংস্কৃতবহুল ভাষা বাঙ্গালা কবিতায় প্রায় দেখা যায় না। "কৃষ্ণবিহারী সেন" স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা। 'শোকাতুর ভক্তবন্ধুদত্ত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে' যাহার কল্পনা, তাহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতী। আষাঢ়। "অদৃশ্য কিরণ" শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এই সকল প্রবন্ধের ভাষা ও রচনাপ্রণালী আরও প্রাঞ্জল ও সরল হওয়া উচিত। "হেসে নে" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি কবিতা। জটিল ভাষায় কবিতাটি অত্যন্ত আচ্ছন্ন, সহজে বোধগম্য হয় না। "ভূত ও জাতীয় চরিত্র" প্রবন্ধে লেখক জাতীয় চরিত্রের সহিত ভূতের ভয়ের সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন। লেখক যে কয়টি ভূতের গল্প করিয়াছেন, সে গুলি হৃষ্টচিত্তে উপভোগ করা যায়, কিন্তু এই গল্পগুলি হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সহিত বোধ হয়, সকলের ঐকমত্য হইবে না। একজন শিখ বা একজন পাহাড়ী ভূতের ভয়ে ভীত নহে দেখিয়া এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে, তাহাদের জাতীয় চরিত্রে আদৌ ভূতের ভয় নাই। "বঙ্গে জ্যোতিষাবিষ্কার" আর্য্যসাহিত্যসমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বরাহমিহির নামক একখানি জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থের প্রমাদ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রগল্ভ ভাষায় রচিত;—বিদ্রূপগুলি যে খুব বহুমূল্য, তাহা নহে। লেখক বিদ্রূপ বাদ দিয়া পুস্তকখানির সমালোচনা করিলে কোন ক্ষতি ছিল না। "জাল-নোট" শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু প্রণীত একটি ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীমতী সরলা দেবীর "নৈনিতালের অপরাধ" একটি সুন্দর সন্দর্ভ। "চিত্র" তিন ভাগে বিভক্ত, একটি নাতিক্ষুদ্র মনোজ্ঞ কবিতা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শকুন্তলা।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থে বালকবালিকাদের জন্য দুষ্মন্তশকুন্তলার উপাখ্যানটি সরল চলিত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এরূপ পুস্তক সম্পূর্ণ নূতন। লেখকের গল্প বলিবার প্রণালী বড় মনোহারিণী, এবং নিশ্চয় বলা যায়, বইখানি শিশুহৃদয়ের সরল প্রীতি নিশ্চিতই আকর্ষণ করিবে। শকুন্তলায় আট খানি লিথো-ছবি আছে। অশ্বারূঢ় বিদূষকের চিত্রখানি বেশ হাস্যোদ্দীপক ও সুন্দর হইয়াছে। চিত্রগুলি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। সমালোচ্য শকুন্তলা "বাল্য গ্রন্থাবলীর" প্রথম গ্রন্থ;—আমরা আশা করি, শকুন্তলার প্রণেতা আমাদের ভবিষ্যতের আশা ক্ষুদ্র শিশুগণের হাতে এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য গ্রন্থ উপহার দিয়া তাহাদের হৃদয় ও কল্পনা সরস ও [illegible]

সারদা।

১।

ফাল্গুন মাসে লূনার কূলে কূলে আর জল নাই। এক ধারে বিস্তৃত বালির চর। শুধু এক পার্শ্বে একগাছি রজতসূত্রের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী লূনা বহিয়া গিয়াছে। অল্পপরিসরা হইলেও চঞ্চলা কিশোরীর ন্যায় লূনা খরস্রোতা।

নদীতীরে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন অঙ্গন বেড়িয়া তিন চারি খানি কুটীর। কুটীরের চারিদিকে কেয়া ও সুপারী গাছের বেড়া। কয়েকটি কেয়া গাছ জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেই মধ্যাহ্নরবিকররোধী কেতকীপত্রের আবরণের ভিতর সন্ধ্যার সময় একজন রমণী লূনার স্ফটিকজলে গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে গাহিল—

"তুম সঙ্গ চলি না পারই হে নাগর,
কুসুমকণ্টা ব্যথাইল চরণ।"

উৎকলরমণীর স্বরে পথশ্রান্তা কুশাঙ্কুরব্যথিতচরণা সুন্দরীর অবসাদ। ঈর্ষ্যাবশতঃ নদীতীরস্থ এক কাঞ্চনবৃক্ষ হইতে কোকিল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

সারদা কৃষ্ণপুরের দধিবামন দেবের মন্দিরের নর্ত্তকী। দশ পনের বিঘা নিষ্কর দেবত্র জমী সে ভোগ করিয়া থাকে। পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাকে দেবতার সম্মুখে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও কেন্দুবিল্ব-কবির কোমলকান্ত পদাবলী গাহিতে হয়। আলোকমালাসমুজ্জ্বল প্রশস্ত নাটমন্দিরে সারদা যখন স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া সংস্কৃত গাথা গাহিত, সকলে মুগ্ধ হইয়া নীরবে শুনিত। তাহার কোমল স্বর যখন সপ্তমে উঠিয়া সমস্ত নাটমন্দির ছাইয়া ফেলিত, তখন বুঝি পাষাণ দেবতারও চমক ভাঙ্গিত।

পিতার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া কুলপ্রথানুসারে সারদা চিরকুমারী। তাহার অন্য দুইটি ভগিনী বিবাহিতা ও স্বামিগৃহে বাস করিয়া থাকে। বাটীতে পরিবারের মধ্যে শুধু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া সুভদ্রা। ভ্রাতার নাম সুবল। সারদার জমীর উপস্বত্ব ভিন্ন সংসার চলিবার আর কোন উপায় নাই। সুবলের কখনও মনে হইত না, সংসারে তাহার কিছু উপার্জ্জনের দরকার। সে নিশ্চিন্তভাবে অহিফেনস্বপ্নে মায়াময় মানবজীবনটা কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতেছিল।

যমুনার তীর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কূলের কাঁটায় না কূলের কাঁটায়!" সে রূপসী সুভদ্রা। "তবে লো সুভি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা, তোকে মজা দেখাচ্ছি" এই বলিয়া সারদা ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতৃজায়ার অঞ্চল ধরিয়া তীর হইতে জলে নামাইল। ফাল্গুন মাসে তখনও বেশ একটু শীত ছিল। সন্ধ্যার সময় জলে নামিয়া গাত্রমার্জ্জন করিতে সুভদ্রা ঠাকুরাণী বিশেষ উৎসুকা ছিলেন না। কিন্তু নাচার। সারদা তন্বী, তিনি স্থূলাঙ্গী; কাজেই অনেক সময় ননদের কাছে সুভদ্রাকে হার মানিতে হইত।

টানাটানিতে অজ্ঞাতসারে সারদার নাসিকা হইতে সোনার 'বেশর'টি স্খলিত হইয়া সুভদ্রার বস্ত্রের উপর পড়িয়াছিল। সুভদ্রা নাসিকাভরণটি করতলমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ভ্রাতৃজায়ার অঙ্গে সজোরে গাত্রমার্জ্জনী প্রয়োগ করিবার সময় সারদার বেশরের খোঁজ পড়িল। ভবিষ্যৎ ক্ষতির আশঙ্কায় তাহার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। সুভদ্রা বলিল, "হারিয়ে যাবে না! সন্ধ্যার সময় আমাকে এত কষ্ট দেওয়া—ধর্ম্ম আছেন!" কিন্তু ঈষৎ স্ফুরিতাধরের মধ্যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না—সুভদ্রা হাসিয়া ফেলিল। গালের মাঝখানে টোল্ খাইয়া তাহার সুগোল সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইল। সারদা সুভদ্রার দুটি গাল অঙ্গুলী দিয়া চাপিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী, আমার বেশর বের কর্"—কিন্তু তাহাকে নাসাভরণের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। সুভদ্রা স্বয়ং তাড়াতাড়ি নাকছাবিটি সারদার হস্তে সমর্পণ করিয়া এক হাত ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল।

সারদা তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন লোক অনিমেষনেত্রে তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। সে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দধিবামন দেবের মন্দির কোন দিকে?" সারদা বলিল, "বরাবর উত্তর দিকে গিয়া দক্ষিণ দিকে ফিরিও। তাহার পর একটা বাগানের পাশ দিয়া পশ্চিমমুখো হইয়া পূর্ব্বদিকে যাইও। কেন, পথ জিজ্ঞাসা করিবার কি আর দেশে লোক ছিল না!" লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। সারদা মনে মনে হাসিল; ভাবিল, লোকটা ভারি বোকা, একটা কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। কিন্তু মানুষটা সুপুরুষ বটে—আলাপ পরিচয়ের নিতান্ত অযোগ্য নহে। বয়স অতি অল্প,—মোটে গোঁফের রেখা দিয়াছে

কাটা। তোমার কথায় লোকটা পালাইবার পথ পায় না!" সারদা একবার ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিল। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে শুধু একটা হুঁ দিয়া দক্ষিণ হস্তে চুল জড়াইতে জড়াইতে ঘাট হইতে উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ভূপৃষ্ঠে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

২।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সন্ধ্যার সময় দধিবামন দেবের মন্দিরে লোকারণ্য। সকলের হস্তেই পুষ্পমাল্য। দূর হইতে দোলমণ্ডপের উপর মালা পড়িতেছিল। কিন্তু অনেক সময় বেদীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মালা হইতে ফুলের পাপড়িগুলি খসিয়া প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দুই তিন জন পুরোহিত ধারা-যন্ত্র দ্বারা লোকারণ্যের মধ্যে সুবাসিত বারি সিঞ্চন করিতেছিল। প্রস্তর-খচিত মন্দিরকুট্টিম প্রমদাদিগের কপোলনিপতিত সিন্দুররাগে ও আবিরে অরুণাভ।

দর্শকদিগের মধ্যে পরিচিতকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ দু'একটা কুঙ্কুম নিক্ষেপ করিতেছিল। ক্বচিৎ কুঙ্কুম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোনও অপরিচিতা রমণীর গায়ে আসিয়া পড়িবামাত্র, চারিদিক হইতে হাসি টিট্‌কারি উঠিতেছিল—তাঁহারাও যে নিতান্ত নীরবে এ ব্যবহার সহ্য করিতেছিলেন, এমন নয়।

দেবতার সম্মুখে স্ফটিকাধারের উপর দুইটি ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণপ্রদীপ। পুষ্পপাত্রে স্তরে স্তরে চন্দনসিক্ত পদ্ম। সেই স্নিগ্ধালোকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি সচন্দন রক্তোৎপল দেবতার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছিলেন।

প্রধান পুরোহিতের ললাটে চন্দনরেখা। সুদীর্ঘ-বপু শুভ্র প্রাবারে আচ্ছাদিত। আনন প্রসন্ন ও প্রতিভাদীপ্ত।

চন্দ্রালোকে লূনার উপর মন্দিরের বৃহৎ ছায়া পড়িয়াছে। যাত্রিপূর্ণ এক এক খানি নৌকা সেই ছায়া ভেদ করিয়া ঘাটে আসিয়া লাগিতেছিল। নৌকায় বিচিত্রবস্ত্রপরিহিতা রমণী ও বালক বালিকার সংখ্যাই অধিক। উৎকলরমণীরা রৌপ্যভূষণের ভারে পুষ্পিতা ব্রততীর ন্যায় অবনতদেহা। চক্ষু প্রায়ই ডাগর ও উজ্জ্বল। বিস্তৃত ভ্রূযুগমধ্যে উল্‌কী,—সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ সর্ব্বত্র।

নিশাগমের সহিত দর্শকসংখ্যার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছিল। নদীকল্লোলমুখরা

সারদা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। নূপুরশিঞ্জনে সকলের চক্ষু সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

সারদার পরিধানে একখানি বারাণসীর স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী। হস্ত-প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়। দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী। কর্ণাভরণ দুখানি পাশা। কেশপাশ মদ্রজাদের মত বাম দিকে ফিরাইয়া বাঁধা। বেণীর উপর কটকী রূপার ফুল। ওষ্ঠদ্বয় তাম্বূলরাগে রঞ্জিত। হস্তে তাম্বূলপূর্ণ একটি সুদৃশ্য তাম্বূলাধার। সমস্ত অঙ্গে ইস্তাম্বুলের সৌরভ। সারদা উৎকলাঙ্গনাদিগের চিরপ্রথা ত্যাগ করিয়া বঙ্গরমণীদের ন্যায় বস্ত্র পরিয়াছিল।

সারদা দেবতাকে প্রণাম করিয়া নাটমন্দিরের মধ্যে বিস্তৃত গালিচায় উপবেশন করিল। সম্মুখের আর একখানি আস্তরণের উপর সেই প্রদেশের তিন চারি জন তালুকদার। সকলেরই মস্তকের সম্মুখভাগ মণ্ডিত। গরদের কাপড়, জরির জুতা, সাটিনের বেনিয়ান ও গাত্রের পলাশপুষ্পাভ প্রাবারে মন্দিরের বর্ণ-বৈচিত্র্য বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তাহাদের পার্শ্বে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক,—পুলিসের নূতন দারোগা। সকলের সম্মুখেই রৌপ্যপাত্রে আবির ও গোলাপজল।

দারোগা বসন্তকুমারের বাটী বরিশালে। কথার এখনও আড় ভাঙ্গে নাই। স্বল্প মূল্যের না হইলেও পরিচ্ছদে পারিপাট্যের সম্পূর্ণ অভাব।

বসন্তকে দেখিয়া সারদা একটু হাসিল। হাসির অর্থ,—তুমি না সে দিন দধিবামন দেবের মন্দিরে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে? তখন বড় পলাইয়াছিলে, কিন্তু আজ আমার জালে আবার তোমায় পড়িতে হইল!

বসন্তকুমার একটু মুখ ফিরাইয়া ভাবিল, "ছি ছি! এত লোকের মধ্যে!"

লূনার ন্যায় সারদারও হৃদয়তট প্রায় শুষ্ক; সুধু একধারে ক্ষুদ্র স্নেহের ধারা ঝির ঝির করিয়া বহিত। কিন্তু অদ্য হঠাৎ প্রবল বন্যার উপক্রম হইল। সুদূরশ্রুত বন্যার বারিকল্লোলের ন্যায় আজি তাহার বেপমান অন্তরের দুরু দুরু স্পন্দন হৃদয়প্লাবী প্রেমের বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছিল।

বীণার মধুর শব্দের সহিত মৈথিল কবির "দছিন পবন বহু ধীরে" মিশিয়া আরও মধুর হইল। সারদার চক্ষু উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়। সমস্ত নরনারীর অস্তিত্ব সে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে জাগিতেছিল, শুধু সেই বিরহবিধুরা রাধিকার কথা।

কারণে গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিল। সন্ধ্যাগমের সহিত পায়ের উপর নূপুর 'কসি' দিয়া বাঁধিতেছিল। পরিধানে "তম-সম চীর।"

তাহার পর গাহিল প্রথম অভিসার। "উজোর" রজনীতে সুন্দরী ঔৎসুক্যের সহিত কুঞ্জভবনে উপস্থিত, কিন্তু হৃদয়েশের কাছে যাইতে পদে পদে লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে সমীরান্দোলিতা লতার ন্যায় থর থর করিয়া সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতেছিল। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরে ত্রাসকম্পিতা হরিণীর ন্যায় রাধা ভীত-চকিতদর্শনা।

লূনার শিশিরশীকরসিক্ত উষানিল অপর পার হইতে আম্রমুকুলের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। নাটমন্দিরের স্ফটিকপাত্রস্থ ক্ষীণপ্রভ বর্ত্তিকালোক ঈষৎ কম্পমান। স্তম্ভসংলগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির কণ্ঠস্থ পুষ্পমাল্য হইতে চম্পকের পাপড়িগুলি খসিয়া পড়িতেছিল।

সারদার প্রস্ফুটিতপদ্মবৎ জাগরণারুণ নয়ন বসন্তকুমারের উপর স্থাপিত। সমীরস্পর্শে অলকগুচ্ছ কপোলের উপর স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। অভিসার গাহিতে গাহিতে তাহার কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পা কাঁপিয়া মধ্যে মধ্যে নৃত্যের তালভঙ্গ হইতেছিল। হৃদয়াবেগসংবরণার্থ কিশলয়-কোমল করতল বক্ষের উপর রক্ষিত।

হঠাৎ নদীকূলে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। সারদা গাহিল,—

"হে হরি শুনিএ শ্রবণ ভরি
  অব ন বিলাসক বেরা;
গগন নকত ছল সেহো অবকত ভেল
  কোকিল করইছি ফেরা।
চকবা মোর সোর কয় চুপ ভেল
  ওঠ মলিন ভেল চন্দা।
নগরক ধেনু ডগরক সঞ্চর
  কুমুদিনী বসু মকরন্দা।

চারিদিক হইতে আবির ও কুঙ্কুম সারদার গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল। বসন্তও একটা কুঙ্কুম ছুড়িয়া মারিল। কুঙ্কুমস্পর্শে সারদা শিহরিয়া উঠিল।

সঙ্গীতান্তে চারিদিক হইতে স্তুতিসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। সারদা একবার অপাঙ্গে আবেশতরলনেত্রে বসন্তকুমারের দিকে চাহিয়া নৌকাভিমুখে চলিল। তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ দর্পিত হৃদয়ের পরিচায়ক। মানবের পূজা অতএব তাহার প্রাপ্য বলিয়া লোকের প্রশংসায় সারদার ভ্রূক্ষেপ নাই।

সারদা জলের উপর পা দুখানি ভাসাইয়া নৌকায় বসিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ-নয়ন মন্দিরপ্রাঙ্গনাভিমুখী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা পদমূল হইতে অলক্তকরাগ ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

ঘাটে আর লোক নাই। সমস্ত লোক প্রাঙ্গনে আগ্রহের সহিত যাত্রা শুনিতেছে। বসন্তকুমার ধীরে ধীরে নৌকার কাছে আসিয়া সারদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমাকে নৌকায় লইবে কি ?"

সারদা একটু মধুর হাসিয়া বলিল, "যদি নৌকা ডুবিয়া যায় ?"

"নৌকার দাম দিব।"

"যদি আমি ডুবিয়া যাই ?"

"সঙ্গে সঙ্গে ডুবিব।"

"এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে !"

"আচ্ছা, না হয় আমার কথা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

"তবে উঠিয়া আইস—কিন্তু দেখিও যেন ভরা-ডুবি না হই।"

ঊষাসমাগমে আপাণ্ডুর মলিন চন্দ্রের ছায়া নদীবক্ষে দুলিতেছিল। দূরে নদীসৈকতে চক্রবাকমিথুনের রব শ্রুত হইতেছিল। এক দল ক্রৌঞ্চ সুদূর জলাশয় উদ্দেশে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র তরণী খানি নদী-তীরজাত শিরীষপুষ্পের পরাগে আবৃত। বসন্তকুমার সারদার চন্দ্রালোকবিভাসিত অধর সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু সেই তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত কোমল রক্তোষ্ঠ স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছিল কি ! সারদা হাসিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল।

৩।

মেঘস্তর ভেদ করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্যকিরণ হঠাৎ মাঠের মধ্যে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িল। ক্রোশের পর ক্রোশ শুধু শুষ্ক ধান্যের মূলে আচ্ছাদিত। দুই মাস পূর্ব্বের সজল মৃত্তিকা প্রখর রৌদ্রতাপে কঠিন-প্রস্তরবৎ হইয়াছে।

কৃষকেরা স্থানে স্থানে অগ্নি দিয়া ধান্যের মূল পোড়াইতেছিল। কৃষকবালকেরা গৃহ হইতে কৃষকদিগের জন্য মধ্যাহ্নভোজন বহন করিয়া আনিয়া আর বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই; ক্ষেত্রমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র পঙ্কিল হ্রদে সন্তরণ দিয়া পদ্মফুল তুলিতেছিল।

সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বালিকাকে দেখিয়া একজন কৃষকবালক বলিল, "রুক্মিণী, আয় না একটু সাঁতার দি। তোকে গোটাকতক পদ্মফুল তুলে দেব।" রুক্মিণী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি পায়রা আন্‌তে যাচ্চি; এখন সাঁতার দিতে পারবো না। আমার জন্যে পদ্মের ফোঁপল রাখিস, আমি ফিরে আস্‌বার সময় নিয়ে যাব।" রুক্মিণীর সহিত একজন নূতন লোক দেখিয়া বালকেরা অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

রুক্মিণী দ্বিপ্রহরে বাটীর পার্শ্বে বাগানে আম্র কুড়াইতেছিল। সুবল গ্রামান্তর হইতে গৃহে ফিরিবার সময় সেই আম্রকাননের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণপুর হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে কোনও ক্ষুদ্র গ্রামে তাহার এক প্রণয়িনীর বাস। সেইদিন প্রাতঃকালে তাহার সহিত সুবলের কলহ হইয়াছিল। কলহের কারণ সুবলের অর্থাভাব। কিছু অর্থ না আনিতে পারিলে সে সুবলকে তাহার অঙ্গনে প্রবেশ করিতে দিবে না। সুবল নিরুপায় হইয়া গ্রামান্তরে এক সুহৃদের কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিমর্ষবদনে গৃহে ফিরিতেছিল। আম্রকাননের ভিতর দিয়া আসিতে পশ্চাৎ হইতে রুক্মিণী বলিল, "ওগো! আমায় একটা পায়রা দেবে না?" এই পথে বহুদিবস হইল সুবলকে এক পারাবত হস্তে গমন করিতে দেখিয়া রুক্মিণী পারাবতটি চাহিয়াছিল। কিন্তু অন্য বারে দিবার অঙ্গীকার করিয়া সুবল চলিয়া গিয়াছিল। সুবলকে দেখিয়া রুক্মিণীর সে কথা মনে পড়িল। রুক্মিণী পিতার একমাত্র কন্যা, বড় আদরের,—তাহার মার্জ্জার পারাবত প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর উপর অসীম স্নেহ।

রুক্মিণীর হাতে দুগাছি মোটা রূপার বালা দেখিয়া সুবলের হঠাৎ লোভ পড়িল। প্রলুব্ধ হৃদয়কে কোন প্রকারে ফিরাইতে পারিল না। সুবল বলিল, "আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় ভাল পায়রা দেব।" রুক্মিণী বস্ত্রাঞ্চলে কোমর বাঁধিয়া সানন্দে দ্রুতপদে সুবলের পশ্চাতে আসিতেছিল।

ক্ষেত্রের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডশৈল। ঝর্ঝরশব্দে শৈল হইতে শৈলান্তরে নামিয়া একটি ক্ষীণ বারিপ্রবাহ গিরিমূল ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই গিরিতটিনীর কাছে আসিয়া রুক্মিণী বলিল, "আমি আর চলিতে পারি না। আমায় বাড়ীতে মার কাছে নিয়ে চল।" রুক্মিণীর চোখে জল আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত তাহার একটু ভয়ও হইতেছিল।

উপর হইতে পায়রা কিনিয়া আনি।” রুক্মিণী কঙ্কণ দুগাছি খুলিয়া সুবলের হস্তে সমর্পণ করিল। সুবল রুক্মিণীকে সেইখানে বসিতে বলিয়া শৈলশিখরে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। রুক্মিণী ছুটিয়া গিয়া তাহার কাপড় ধরিল। সে একলা সুবলের অপেক্ষায় সেখানে বসিয়া থাকিতে কোন প্রকারে সম্মত নয়। পূর্ব্বশ্রুত সমস্ত বাঘের ও ভূতের গল্প তাহার মনে পড়িতেছিল।

সুবল জোর করিয়া রুক্মিণীকে ছিনাইয়া ফেলিল। গণ্ডশৈলের উপর পড়িয়া গিয়া রুক্মিণীর কপাল কাটিয়া গেল। ক্ষত হইতে রক্ত পড়িয়া তাহার অঞ্চল ভিজিয়া যাইতেছিল। সুবলের সে দিকে দৃষ্টিপাত নাই; সে মুহূর্ত্তমধ্যে বালিকার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

চারিদিক হইতে বালিকার আকুল ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি হইতেছিল। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ভূতল হইতে উঠিবার সময় দুর্ব্বলতাবশতঃ রুক্মিণী বসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বালিকার পদনিম্নে নির্ঝরিণীতটে একটি কপোত আসিয়া জলপান করিতেছিল। রুক্মিণী কান্না ভুলিয়া গেল। তাহার একাগ্র দৃষ্টি কপোতের উপর। বালিকা মনে মনে দেবতাকে ডাকিতেছিল, যেন কপোতটি না উড়িয়া যায়। পারাবতটি নদীতটে থাকিলে অন্ততঃ তাহার ভয়ের একটু উপশম হয়। কিন্তু জলপান শেষ করিয়া কপোতটি উড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে রুক্মিণীও ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর লোকজন রুক্মিণীকে অন্বেষণ করিতে আসিয়া দেখিল, বালিকা এক কঠিন উপলখণ্ড শিথান করিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। কঙ্কণহীন শ্লথ ভুজলতা ভূমির উপর নিক্ষিপ্ত।

৪।

সারদার গৃহচত্বরে একটি কপোতপালিকা। অরুণালোকে একদল পারাবত চক্রাকারে নদীর উপর উড়িতেছিল। সারদার আহ্বানে তাহারা অঙ্গনে নামিয়া আসিল। একটি কপোত সারদার স্কন্ধের উপর বসিয়া চঞ্চু দিয়া বারংবার তাহার রক্তোৎপল-ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছিল। সারদা হাসিতে হাসিতে তাহার ঠোঁট সরাইয়া দিতেছিল।

দিন হইতে ইচ্ছা। কিন্তু সুভদ্রাকে দেখিলে কপোতবৃন্দ সুনীল আকাশের দিকে উড়িয়া যায়, ইহাতে সুভদ্রার বিশেষ দুঃখ। অদ্য অনেক কষ্টে দৌড়া-দৌড়ি করিয়া অঞ্চল দিয়া একটি পায়রা ধরিয়াছে। কিন্তু কপোতটি নিতান্ত অরসিক—সুভদ্রার সুন্দর কোমল ওষ্ঠ স্পর্শ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই!

সারদা হাসিয়া বলিল, "জোর করিয়া কি কাহাকেও পোষ মানান যায়?"

সুভদ্রা হাসি কান্না মিশাইয়া উত্তর করিল, "দিদি, তুমি যে ভাল পোষ মানাইতে পার; তাহা বেশ জানি—ঐ দেখ!" এই কথা অভ্যাগত বসন্তকুমারের উদ্দেশে বলিয়া সুভদ্রা দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য, সুভদ্রা ঠাকুরাণীর রাগ ভগিনীর উপর হইতে শেষে ভ্রাতার উপর পড়িল। কিন্তু সুবলের তাহাতে নিদ্রার কিছু ব্যাঘাত হয় নাই।

অসময়ে বসন্তকে অঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সারদা একটু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু আনন্দে তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সস্মিত নেত্রে বসন্তকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আমার যে বড় ভাগ্য!" কিন্তু বসন্তকুমারের মুখ গম্ভীর, হাসির রেখামাত্র নাই। সারদা ধীরে ধীরে বসন্তের হাত ধরিল। কিন্তু সে আদর কোথায়? বসন্তকুমার হাত না সরাইয়া সুধু একটু মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুবল কোথায়?" সারদা একবার অপাঙ্গে বসন্তকুমারের প্রাবৃটের তমসাচ্ছন্ন অম্বরের ন্যায় মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সুবলের স্বভাব চরিত্রের কথা তাহার কিছু অবিদিত ছিল না। সে বুঝিল, ভ্রাতার কোন আসন্ন বিপদ।

উঠানে কথাবার্ত্তা শুনিয়া সুবল চোক মুছিতে মুছিতে শয়নগৃহ হইতে উঠিয়া আসিতেছিল। বসন্তকুমারকে দারোগার পরিচ্ছদে দেখিয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বসন্তকুমার বস্ত্রমধ্য হইতে এক জোড়া রূপার বালা বাহির করিয়া সুবলকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই বালা আর কোন দিন দেখিয়াছ কি?" সুবল বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে অনেক কষ্টে বলিল, "না।"

বসন্তকুমার বলিল, "আমার কাছে গোপন করিয়া আর লাভ কি? আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। প্রায় দুই মাস হইল, তুমি একদিন সন্ধ্যার সময় রত্নগিরির কাছে কৃষ্ণ মহান্তির ছোট মেয়ের হাত হইতে এই বালা কাড়িয়া লইয়াছিলে। আমার সহিত থানায় চল—নতুবা বাজারে জন [illegible]

সুবল করুণনয়নে ভগিনীর দিকে চাহিল। তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত কাতরতা মাতৃক্রোড়স্থ মুমূর্ষু শিশুর দৃষ্টির ন্যায় সারদার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সারদা একবার অভয়প্রদ কটাক্ষে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বসন্তকুমারকে বলিল, "তোমার সহিত নির্জ্জনে একটা কথা আছে; শুনিবে কি?" বসন্তকুমার বলিল, "আপত্তি কি? কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমি কোন অনুরোধ রক্ষা করিব না।"

সারদা বসন্তকুমারের সহিত অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া বরাবর নদীর তীরে আসিল। শ্রাবণ মাসে লুনার উভয় কূল দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীর খরস্রোতে তীরস্থ বেতসলতা অবনমুখী। প্রস্ফুটিত কেতকী-কুসুম বারিপ্রবাহে সাগরাভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। দূরে কোন জলপ্লাবিত তড়াগ হইত উৎপল কুমুদ প্রভৃতি জলজপুষ্প নদীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

সারদা দুই হস্তে বসন্তকুমারের হাত ধরিয়া সকাতরে বলিল, "আমার ভাইকে রক্ষা কর। আমি চার বৎসর বয়স হইতে পিতৃমাতৃহীন। সুবলের বয়স তখন সাত কি আট। সেই দিন হইতে আর আজ পর্য্যন্ত তাহাকে মানুষ করিতেছি। পৃথিবীতে সুবল আমার একমাত্র স্নেহের জিনিষ। তুমি ইচ্ছা করিলে সুবলকে বাঁচাইতে পার, এবং মারিতেও পার।" এই কথা বলিতে বলিতে সারদার চোক ফাটিয়া জল আসিল।

কিন্তু রমণীর মহাস্ত্রও ব্যর্থ হইল। নয়নজলে বসন্তকুমারের মন টলিল না। বসন্ত অতি শুষ্ক ভাবে বলিল, "আমার ইহাতে কোন হাত নাই—উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে।"

"কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মনে করিলে সুবলকে ছাড়িয়া দিতে পার। পাড়াগাঁয়ে দারোগারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে।"

"আমাকে বৃথা অনুরোধ করিতেছ; আমি আসামী চালান দিব।"

সারদা বসন্তকুমারের পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার ভাইকে ছাড়িয়া দাও।"

বসন্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর একটা ঝটিকা বহিয়া যাইতেছিল। সারদার অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ দেখিয়া এক এক বার সুবলকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভবিষ্যৎ পদোন্নতির উজ্জ্বল চিত্রে মন প্রলুব্ধ হইতেছিল।

উচ্চ কর্ম্মচারী হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যদি একটা কলঙ্ক রটিয়া যায়, তাহা হইলে পদোন্নতি হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা। একজন রমণীর সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া এরূপ স্বার্থত্যাগ বসন্তের বিবেচনায় নিতান্ত মূর্খতা। এই সমস্ত ভাবিয়া বসন্ত অতিরূক্ষ স্বরে বলিল, "বৃথা কেন জ্বালাতন করিতেছ, আমি তোমার ভাইকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

সারদা অশ্রুজলপরিপূর্ণ বিস্ফারিত লোচনে বসন্তকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার ভালবাসারও কি কোন শক্তি নাই ?" সারদার সূর্য্যকিরণোজ্জল অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় নদীতটস্থ হরিৎ শষ্পের উপর পড়িতেছিল। বসন্তকুমার হাসিয়া বলিল, "বেশ্যার ভালবাসা !"

পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় সারদা উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে ও রোষে তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। প্রবল অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিতেছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে তাহার মনে হইল, বসন্তকুমার সন্তরণে নিতান্ত অপটু। এইকথা স্মরণ হইবামাত্র,সারদা দু'এক পদ অগ্রসর হইয়া সবলে বসন্তকুমারকে নদীর দিকে ঠেলিয়া দিল। বসন্ত অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একবারে নদীগর্ভে পতিত হইল। সেই সঙ্গে পদস্খলিত হইয়া বা স্বেচ্ছায় সারদাও জলে পড়িল। সেই সূর্য্যালোকপ্রভাসিত বারিপ্রবাহে কেতকী ও পদ্মের সহিত আর একটি ফুল সমুদ্রাভিমুখে ভাসিয়া গেল।

অতি কষ্টে ও দৈবযোগে এক খণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া ও নিকটবর্ত্তী নৌকার সাহায্যে বসন্ত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তীরে উঠিল। কিন্তু সারদাকে আর কেহ উঠিতে দেখিল না।

পর দিন দধিবামন দেবের মন্দির নিম্নে সারদার মৃতদেহ দৃষ্ট হইল। এখনও যেন সে পুষ্পমাল্যশোভিত আলোকাকীর্ণ দেবমন্দিরসংলগ্ন নৃত্যশালার কথা ভুলিতে পারে নাই।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

আকাশের নীলিমা।

আকাশ নীল কেন, এ প্রশ্ন সহজেই মানুষের মনে উদিত হইতে পারে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে পশ্চিমাকাশ সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত হয় কেন? —না, বুড়ী আকাশে সিন্দূর ছড়াইয়া দিয়াছে। এ সমুদায় প্রশ্নের এই একরূপ উত্তর হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান আর একরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত কি, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে। আমরা প্রধানতঃ মহামতি টিণ্ডালের মতের অনুসরণ করিব।

প্রথমতঃ, আকাশের নীল আলোক যে প্রতিফলিত আলোকমাত্র পণ্ডিতগণ তাহার নিশ্চিত প্রমাণ করিয়াছেন। সূর্য্যালোকের গতিপথের পার্শ্বস্থান হইতে এবং সূর্য্যরশ্মির বিপরীত দিক হইতেও এই নীল আলোক আসিতে দেখা যায়। সুতরাং বিপরীত দিক হইতে আগত এবং পার্শ্বাগত এই আলোকতরঙ্গ বায়ুতে অথবা বায়ুস্থ ভাসমান পদার্থকণাসমূহ হইতে প্রতিহত সূর্য্যালোকের তরঙ্গমাত্র, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। কিন্তু প্রতিহত আলোক শ্বেত নহে—নীল, অতএব বুঝিতে হইবে, ইহাতে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গসমূহের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। * কেন এরূপ হয়, তাহার কারণ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

একটা বৃহৎ পর্ব্বতে যেমন সাগরের প্রাচীরবৎ অত্যুন্নত তরঙ্গ এবং ক্ষুদ্র বীচি, উভয়ই সমভাবে প্রতিহত হয়, একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে তাহা হয় না। যদি প্রতিঘাতকারী প্রস্তর তরঙ্গের সহিত তুলনা করিলে অতি ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তরঙ্গের অধিকাংশই প্রতিহত হইতে পারে না, অতি সামান্য অংশই বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসে, অবশিষ্ট অংশ চলিয়া যায়। সেইরূপ মনে কর, বায়ুর সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম কণাসমূহ ভাসমান রহিয়াছে;—বড় ছোট সমুদায় আলোকতরঙ্গই তাহাদের উপর পতিত হয়, এবং প্রত্যেক সংঘর্ষে পতিত তরঙ্গের

---

* সূর্য্যরশ্মির বিশ্লেষণে যে সপ্তবিধ আলোকতরঙ্গ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে লোহিত পীত ইত্যাদি বর্ণের তরঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ভায়লেট্ নীল প্রভৃতির তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র। লোহিতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত ক্ষুদ্র যে, পর পর ৩৯০০০ তরঙ্গ সাজাইয়া গেলে এক ইঞ্চ পরিমিত স্থান অধিকৃত হয়, এবং ভায়লেটের তরঙ্গের ৬৪৬৩১ গুলিতে সেই স্থান অধিকার

অতি ক্ষুদ্র একটু অংশ প্রতিফলিত হয়। লোহিত হইতে ভায়লেট্ পর্য্যন্ত সমুদায় তরঙ্গের সম্বন্ধেই ইহা ঘটে, কিন্তু প্রতিফলিতাংশ সকলের পক্ষে সমান হয় না। বড় ছোট সম্বন্ধসূচক কথা মাত্র; কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট কণা লইলে, তরঙ্গ যতই ক্ষুদ্র হয়, তাহার পক্ষে কণাটি তুলনায় তত বড় হয়, এবং বৃহৎ তরঙ্গের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রতিফলিতাংশও অধিক হয়। পুষ্করিণীর মধ্যে ক্ষুদ্র বীচির গমনপথে একটি ছোট প্রস্তরকণা ধরিলে, সমাগত বীচির যে অংশ (Fraction) প্রতিফলিত হয়, একটা বড় তরঙ্গের প্রতিফলিতাংশ তাহার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এখন সূর্য্যালোক শ্বেত প্রকৃতিস্থ থাকিতে হইলে তাহার অন্তর্গত সপ্তবিধ তরঙ্গের আনুপাতিক পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইলে চলিবে না; প্রত্যুত, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, অতি সূক্ষ্ম পদার্থকণা দ্বারা যদি আলোক বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সপ্তবর্ণের অনুপাত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রতিফলিত আলোকে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গসমূহের আধিক্য হয়, (কারণ তাহারা অধিকপরিমাণে প্রতিহত হয়) অতএব নীলবর্ণই ইহার মধ্যে প্রবলতম বর্ণ হইবে; অবশিষ্ট বর্ণগুলিও নীলের সহিত কিছু-না-কিছু মিশ্রিত থাকিবে, এবং ভায়লেট্ হইতে লোহিত পর্য্যন্ত বর্ণগুলির পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিবে।

যুক্তি দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদি ঈথরতরঙ্গের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র পদার্থকণাসমূহ বায়ুতে ভাসিতে থাকে, তবে তাহাদিগের দ্বারা ক্ষুদ্রতম তরঙ্গগুলির (নীল ইত্যাদির) অপেক্ষাকৃত অধিক অংশই প্রতিহত হইবে, সুতরাং প্রতিফলিত আলোকে নীলতরঙ্গের আধিক্য ঘটিবে। কিন্তু অপরাপর তরঙ্গগুলিও স্বল্পাধিকপরিমাণে মিশ্রিত থাকিবে। বাস্তবিকই যদি আকাশের নীল আলোকের বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ক্রমশঃ-হ্রাসশীল পরিমাণে ভায়লেট্ হইতে লোহিত পর্য্যন্ত সকল রঙ্গেরই অস্তিত্ব অনুভূত করা যায়।

একটির পর একটি করিয়া এই কণাগুলির সহিত সংঘর্ষে শ্বেত আলোকের নীলবর্ণের উপযুক্ত পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। ইহার ফলে এই হয় যে, কিয়দ্দূর হইতে দেখিলে সঞ্চারিত আলোক পীতাভ হইয়া পড়ে; কিন্তু যখন সূর্য্য পশ্চিম গগনের প্রান্তে ডুবিতে থাকে, তখন আলোকরশ্মিকে অনেকটা বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক

ইণ্ডিগো, নীল, সকল গুলিই একে একে কমিয়া যায়, এবং সবুজেরও পরিমাণ কতকটা পরিবর্ত্তিত হয়। এরূপ অবস্থায় সঞ্চারিত আলোক পীত, কমলাবর্ণ এবং রক্তবর্ণও হয়।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, প্রতিফলিত আলোকে দ্বিপ্রহরের গাঢ় নীলিমার উৎপত্তি হয়, এবং সঞ্চারিত আলোকে সূর্য্যাস্তগমনকালের রক্ত পীত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের সমাবেশ সমুদ্ভূত হয়।

কেবল কল্পনা ও যুক্তি নয়—অতি সূক্ষ্ম পদার্থকণাসমূহের এবংবিধ ক্রিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে দৃষ্টিগোচর করা যাইতে পারে। সর্জ্জরস জলে দ্রব হয় না, কিন্তু সুরাসারে দ্রব হয়, এবং সর্জ্জরসমিশ্রিত সুরাসার যখন জলে নিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই দ্রবীভূত সর্জ্জরস তৎক্ষণাৎ অতি সূক্ষ্ম কণাসমূহে বিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতে জল ঘোলা হইয়া যায়। এই সর্জ্জরসের পরিমাণের উপর Precipitateএর সূক্ষ্মতা নির্ভর করে, এবং যদি উপযুক্তপরিমাণে সর্জ্জরস দ্রব করা হয়, এবং পরে জলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে এই সূক্ষ্ম কণাসমূহের দ্বারা অতি সুন্দর নীলবর্ণ সমুৎপন্ন হয়। প্রোফেসর ব্রুকে এই অনুপাত দিয়াছেন ;—এক গ্রাম পরিষ্কৃত সর্জ্জরস ৮৭ গ্রাম সুরাসারে দ্রব করিয়া পরে এই নির্ম্মল দ্রব পরিষ্কারজলপূর্ণ পাত্রে ধীরে ধীরে ঢালিতে হয়, এবং এই সময়ে জল বারংবার আলোড়ন করিতে হয়। এইরূপে অতি সূক্ষ্ম Precipitate উৎপন্ন হয়, এবং ইহার পরে আলোক পাতিত করিয়া একটি কাল জিনিষ ঐ পাত্রের পশ্চাতে ধরিয়া দেখিলে, অতি সুন্দর আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক সময়ে দুগ্ধের নীলবর্ণ এই কারণেই উৎপন্ন হয়। হেল্‌ম্ হোল্‌ট্‌জ্ রমণীকুলের প্রতি ঈষৎ অসম্ভ্রমের সহিতই প্রকাশ করিয়াছেন—নীল চক্ষু আর কিছুই নয়, কেবল একটা ঘোলা Medium মাত্র।

এতদ্ব্যতীত, কৃত্রিম আকাশ প্রস্তুত করিয়াও টিণ্ডাল্ এই বৃত্তান্তের সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী।

আকবর সাহের শিকার।

হরিণশিকার।

শিকারী ফাঁদ পাতিয়া হরিণ ধরে, যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বর্শা, তরবারি বা গুলির আঘাতে হরিণ শিকার করেন, ইহাই চিরপ্রচলিত কথা;—কিন্তু বাদসাহী আমলে হরিণ দ্বারা হরিণ শিকার করান হইত। বনের দুর্ব্বল নিঃসহায় পশুকে সহসা অতর্কিতভাবে অস্ত্রাদির সাহায্যে আক্রমণ করিয়া বধ করা, বীরবর আকবর অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য বোধ করিতেন। বিশেষতঃ, হরিণজাতির উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। * এই জন্য তিনি অস্ত্রাদির সাহায্যে হরিণ নিহত না করিয়া, হরিণের দ্বারাই হরিণ শিকার করাইতেন।

সরকারে অনেকগুলি হরিণ কেবলমাত্র শিকারকার্য্যের জন্যই পালিত ও শিক্ষিত হইত। ইহাদের শিক্ষা ও আহার প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইতেন। শিকারের সময় বাদসাহ অমাত্যবর্গ লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন; সঙ্গে এইরূপ আট দশটি শিক্ষিত হরিণ থাকিত। শিক্ষিত হরিণগুলির শৃঙ্গে ছোট ছোট জাল বাঁধিয়া বনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বন্য মৃগের সাক্ষাৎ পাইলেই শিক্ষাগুণে ইহারা তাহাদের আক্রমণ করিত। ভীষণ যুদ্ধের পর যখন ক্লান্ত ও সমরপরিশ্রান্ত বন্য জীবের শৃঙ্গদ্বয় সেই জালের মধ্যে জড়াইয়া পড়িত, তখন তাহারা সহজেই

---

* আকবর হরিণশিকার ভালবাসিতেন, অথচ হরিণের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল—এ কথাটি সহসা অসমঞ্জস বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আবুল ফাজেল বলেন—"গৌরবান্বিত বাদসাহের পিতা মৃত সম্রাট হুমায়ুন যখন দৈবদুর্ব্বিপাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজপুতানার বালুকাময় মরুমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অন্তর্ব্বত্নী পত্নী হামিদা বেগমের অতিসামান্যতর দোহদসংগ্রহেও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিলেন। একদিন এক হ্রদের তীরে একটি যূথভ্রষ্ট হরিণ শিকার করিয়া, বাদসাহ স্বীয় পত্নীর দোহদ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করেন। সামান্য অর্দ্ধসিদ্ধ হরিণের শল্য মাংসেই হুমায়ুন-পত্নী (আকবরের গর্ভধারিণী) সেই সময়ে যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করেন। আকবর পরে এই ঘটনা অবগত হইয়া হরিণজাতির রক্ষার-জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন।" ইংলণ্ডের Forest Lawর অনুরূপ একটি বিধান প্রচার করিয়া, তিনি সাধারণের হরিণশিকারের বাসনা সম্পূর্ণরূপে সংযত ও নিয়মবদ্ধ করিয়া দেন। ইহাকে প্রবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও,

শিকারীদের দ্বারা ধৃত হইত। এই প্রকারে ধৃত বন্য মৃগ কেবল শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইত।

শিক্ষিত হরিণগুলির শিক্ষানৈপুণ্যের কথা শুনিলে অতিশয় বিস্মিত হইতে হয়। যখন যুদ্ধ করিতে করিতে মাথার জাল ছিঁড়িয়া যাইত, তখন তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রক্ষকদের কাছে ফিরিয়া আসিত। সামান্য বংশীধ্বনি বা সঙ্কেতশব্দ শুনিলেই, শিকারী হরিণ নিজ পালকের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিত। বন্য হরিণের সহিত যুদ্ধকার্য্যে একটি পালিত হরিণ পরাস্ত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে আর একটি প্রেরিত হইত। কখনও বা ৪।৫ দফা এইরূপে হরিণ পাঠাইয়া, অনেক কষ্টে সমস্ত দিনের পর হয় ত একটিমাত্র মৃগ করকবলিত হইত। শিকারীর হরিণগুলি এত দূর পোষ মানিত যে, গভীর রাত্রে শিকার উপলক্ষে তাহাদের সুদূর বনে ছাড়িয়া দিলেও, তাহারা রক্ষকের সঙ্কেত-ধ্বনি শুনিবামাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিত। শিক্ষিত হরিণগুলি পালককে এত চিনিত যে, এক সময়ে একটি হরিণ তাহার পূর্ব্বপালক হইতে বিরহিত হইয়া, কিছুতেই থাকিতে না পারিয়া, এলাহাবাদ হইতে পঞ্জাবে তাহার প্রথম রক্ষকের নিকট পলাইয়া গিয়াছিল।

উল্লিখিত উপায় ব্যতীত আরও চারি প্রকারে হরিণ শিকার হইত। "আকবর-নামা"-কার বলেন, বাদসাহ নিজে ঐ প্রকার প্রথার উপর বড় শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। শিকারের অন্য পন্থা গুলি বড়ই আমোদজনক। আজ চারি শত বৎসর পরে, আমাদের পাঠকবর্গ সেই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া যাহাতে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমরা তাহার মধ্যে বিশেষ কয়টির উল্লেখ করিব।

প্রথম ;—শিকারী ঢাল দিয়া নিজের মুখটি ঢাকিয়া ধীরে ধীরে বনের মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢালের যে দিকটি গভীর, সেই দিকটিই সম্মুখে থাকে। শিকারীর হস্তে বা কটিদেশে কতকগুলি ঘণ্টা বাঁধা থাকে। ঢালের সেই শূন্য-গর্ভ দিকে একটি লাল লণ্ঠন আলোকিত করিয়া আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া মুগ্ধ হরিণ যেমন অগ্রসর হয়, অমনি প্রচ্ছন্ন শিকারী গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহাকে হত্যা করে। এই প্রকার প্রথাকে "ঘণ্টে-হেরা" বলে। কখনও কখনও বা শিকারিরা কেবলমাত্র গান গাহিয়া হরিণ-দিগকে মোহিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া বধ করিত।

ন্যায় হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিত। কৌতূহলী হরিণ ইহাকে কি এক অদ্ভুত নূতনতর জীব ভাবিয়া যেমন নিশ্চিন্তচিত্তে দেখিবার জন্য অগ্রসর হয়, অমনি প্রচ্ছন্ন শিকারীর তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার জীবলীলার শেষ হয়। এই প্রকার শিকারপ্রথাকে "থাঞ্জি" বলিত।

তৃতীয়;—শিকারীরা প্রচ্ছন্নভাবে চারি দিকে সহসা লুকাইয়া পড়ে, এবং দুই জন লোক একখানা সাদা কাপড় মাথায় ঘোরাইতে ঘোরাইতে বনপথ-দৃষ্ট হরিণকে ভয় দেখাইতে থাকে। হরিণ ভয় পাইলে তাহারা তাড়া করিয়া তাহাকে শিকারীদের কাছে লইয়া আসিত; তার পর সকলে মিলিয়া তাহাকে বধ করিত। এই প্রথার নাম "বোকারা।"

চতুর্থ;—দুই জন ভাল তীরন্দাজ,বা বর্ষাবাজ সর্ব্বাঙ্গ সবুজ বর্ণের পোষাকে আচ্ছাদন করিয়া, দুই দিক হইতে বনমধ্যে পথহারা হরিণকে তাড়া দিয়া নিজেদের মধ্যে আনয়ন করিয়া বধ করিত। হরিণ ভয় পাইয়া যখন এদিক ওদিক করিতে থাকে,তখন শিকারীরা তামাসা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইত। এই প্রকার শিকারকে "দদাওয়ান" বলিয়া থাকে।

পঞ্চম;—শিকারীরা তাহাদের আপাদমস্তক বন্য পল্লবে আচ্ছাদন করিত। সেই পল্লবাচ্ছাদনের মধ্যে তাহাদের তীর ধনু লুকায়িত করিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইত। বনমধ্যে হরিণচর্ম্মে নির্ম্মিত নানাবিধ ফাঁস ও ফাঁদ প্রচ্ছন্নভাবে ইতস্ততঃ পাতা থাকে। হরিণ, শিকারী দেখিলেই ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইত, এবং অবশেষে ফাঁদে পতিত হইত। কখন কখন শিকারীরা গাছের আড়ালে থাকিয়া হরিণের স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিতে থাকিত। ডাক শুনিয়া হরিণ অগ্রসর হইবামাত্র শিকারী সহসা তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিত। এইরূপ শিকারের প্রথাকে "আজারা" বলে।

ষষ্ঠ;—শূন্য মস্তকে কখন কখন শিকারী বনের মধ্যে উল্লাসের ভান দেখা-ইয়া ছুটিতে থাকে। তাহার সমস্ত বস্ত্রাদি লোহিত রঙ্গে আগাগোড়া রঞ্জিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বন্য প্রাণিগণ ও সেই সঙ্গে মৃগদলও সেই ব্যক্তিকে আহত মনে করিয়া তাহার পতন ও মৃত্যুদর্শনার্থ চারিদিকে দণ্ডায়মান হয়। এই সময়ে শিকারী তাহাদের আক্রমণ করে। এই প্রথার নাম "তাঁহাজী"।

মহিষশিকার।

এ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শিকারী দুইটি ফাঁদ লইয়া

তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, খুব বলবান এক ব্যক্তি শিকারীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকে। ফাঁসের নিকট একটা পোষা স্ত্রী-মহিষ বাঁধা থাকে। বন্য মহিষ সেই পথে আসিলেই ফাঁদে পা দেয়। শিকারী নিকটে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করে। এই প্রকার মহিষশিকার বড় বিপজ্জনক। কথন কথন ইহাতে শিকারীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়। দ্বিতীয় প্রথানুসারে শিকারী একটি মহিষের উপর চড়িয়া বনমধ্যে কোন জলাশয়ে নামিয়া পড়ে। বন্য মহিষ জল খাইবার জন্য সেখানে আসিলেই, সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বর্শা দ্বারা নিহত করে। এই প্রকার শিকারে শিকারীর বিপৎসম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু, এরূপ শিকার প্রায়ই সফল হয় না। বন্য মহিষেরা এত সতর্ক যে, জলের মধ্যে শিকারী দেখিলেই তাহারা দূরে পলায়ন করে। গৃহপালিত মহিষ অপেক্ষা বন্য মহিষ আরও ভয়ঙ্কর। ইহাদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে কখনও কখনও সিংহ ব্যাঘ্রাদিও মহা ফাঁপরে পড়ে। মহিষশিকারে আকবর সাহ বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না।

বাজ ও শিক্‌রী।

মোগল বাদ্‌সাহদের বাজ ও শিক্‌রী পক্ষীর দ্বারা শিকার একটা প্রধান আমোদের ব্যাপার ছিল। "বাজ্", "সাহিন্", "শক্কর", "বুরকাৎ", "বাসা" প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বাজ পক্ষী বাদসাহ-সরকারে প্রতিপালিত হইত। এই সকল শিকারী পক্ষীদিগকে রীতিমত শিক্ষিত করিয়া শিকারের সময় শূন্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বিমানবিহারী ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় সবল দুর্ব্বল পক্ষীকে লইয়া শূন্য পথে যুদ্ধ দ্বারা পরাস্ত করিয়া, কখনও বা জীয়ন্ত, কখনও বা মৃত অবস্থায়, শিকারীর হাতে আনিয়া দিত। বাজপক্ষীগুলির নামকরণ করা হইত। বাদ্‌সাহ নিজেও কয়েকটি প্রিয় শিক্‌রীপক্ষীর নামকরণ করিয়াছিলেন। শিকারী বাজগুলি পালকের এতদূর অধীন ছিল যে, মহাশূন্যে যখন তাহারা শিকারের চেষ্টায় ফিরিতেছে,—সেই সময়ে নাম ধরিয়া বা শিশ্ দিয়া ডাকিলে, তাহারা পালকের নিকট ফিরিয়া আসিত। পক্ষীর পক্ষ কখন কখন নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহাদের প্রাকৃতিক বর্ণের পরিবর্ত্তন করা হইত। কাহারও বা গলায় ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকিত; কাহারও পায়ে আদরের চিহ্নস্বরূপ ছোট ছোট ঘুঙ্গুর গাঁথিয়া দেওয়া হইত। এগুলি

বাজ পাখী পালন করিবার জন্য অনেক কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট বেতনে প্রতি-পালিত হইত। ভৃত্যদের মধ্যে যাহাদের বেতন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারা মাসিক ৭॥০ হিসাবে পাইত। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বেতনের পরিমাণ তিন মুদ্রা। ইহারা সরকার হইতে বেতন ব্যতীত খোরাকী ও পালিত পক্ষীর শিকার-দক্ষতার জন্য পুরস্কারও পাইত। "মীরশিকার" শিকারের প্রধান কর্ম্মচারী। বাজ পক্ষীরা যদি শিকার করিয়া জীবিত পক্ষী আনিতে পারিত, তবে সেই ধৃত পক্ষীর গুণানুসারে পুরস্কার নির্দ্ধারিত হইত। পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ শিকারীরা পাইত, অপরাংশ "মীরশিকারের" প্রাপ্য ছিল। যে বারে বাদ্সাহের নিজ পালিত বাজপক্ষী শিকার ধরিয়া আনিত, সেবারে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হইত না। মোগলসংসারে প্রায় দুই শতের উপর বাজ পক্ষী প্রতিপালিত হইত; ইহাদের প্রত্যেকটির মূল্য ১৬ মোহর হইতে একটাকা পর্য্যন্ত স্থির হইত

শস্য ব্যতীত এই সমস্ত পক্ষী প্রত্যহ মাংস পাইত। মাংস কুচি কুচি করিয়া ছোট ছোট তাল পাকাইয়া শস্যের সহিত মিশাইয়া খাওয়ান হইত। মাংসভোজী বাজেরা কখনও কখনও নিজের শিকারের মাংস পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিত। আহার ও প্রকৃতিগুণে ইহাদের হিংস্রস্বভাব এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অনেক তীক্ষ্ণচক্ষু পক্ষীও ইহাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত।

জলচর পক্ষী।

জলচর পক্ষী শিকার মোগল বাদসাহদের অন্যতম আমোদ। এ সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকটি সামান্য বিবরণমাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। নদী, হ্রদ ও তড়াগাদিতে হংস, ক্রৌঞ্চ, বক প্রভৃতি নানা-জাতীয় জলচর পক্ষী বিচরণ করে। এই সমস্ত পক্ষী জীবিত ধরিয়া বাদসাহের প্রসাদের মধ্যে কৃত্রিম সরোবরে রক্ষা করা হইত। শিকারীরা একটি কৃত্রিম পক্ষীর খোলস দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিত। ধীরে ধীরে জলচরের নিকটস্থ হইয়া তাহার পা ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিত। কখনও নিজেরা পক্ষীর স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিয়া পাখীকে নিকটে আনিয়া ধৃত করিত। "বদনা", "দৌরাজ", "লাঘাই", "চৌঘাই" প্রভৃতি নানাবিধ শিকার-প্রণালীর দ্বারা এই সমস্ত পক্ষীকে জীবিত অবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইত।

পতঙ্গাদি শিকার করান হইত। শেষোক্ত শিকার সর্ব্বাপেক্ষা আমোদজনক। আকবর সাহ নিজে ইহাতে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। এ সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ রাওয়ের বখর।

২

"নারায়ণরাও রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর ছয় মাস অতিবাহিত হইল। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ নয়মাস রাজত্ব করিলেন। এদিকে জমাদার ও "পঁওয়ার" রাজপ্রাসাদের সমস্ত সৈন্যগণকে ভাঙ্গাইয়া স্বদলভুক্ত করিল। প্রাসাদরক্ষার জন্য পাঁচ সহস্র বৈদেশিক গারদী (regular infantry) (১) সৈন্য ছিল; তাহারা সকলেই এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। এই সংবাদ "চাপাজী টিলেকর" ও অপর কয়েক জন অনুচরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা নারায়ণ রাওকে গিয়া জানাইল যে,—"প্রাসাদে আনন্দী বাইর গুপ্ত বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দুই জন জমাদার ও তুলাজী পওয়ার এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে। অতএব অগ্রে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে আজ্ঞা হউক।" নারায়ণ রাও উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, ইহার বন্দোবস্ত করা যাইবে। তাহাদিগের দ্বারা কি হইতে পারে?" পরে, সখারাম বাপু (২), নানা ফড়নবীস ও হরিপন্ত ফড়্‌কে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া নারায়ণ রাওএর সমীপে গিয়া নিবেদন করিলেন যে,—প্রাসাদমধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণই দেখিতেছি। প্রভু আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না; বাবাজী বরওয়ে যাহা করেন, তাহাই আপনার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অগ্রে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। এইরূপে তাঁহারাও এই বিদ্রোহসংবাদ তাঁহার (শ্রীমন্তের) কর্ণগোচর করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা (নারায়ণ রাও ও বাবাজী বরওয়ে) এ কথাকে মনেও স্থান দিলেন না।

সংকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ৭।৮ দিন পুর্ব্বে সমস্ত গারদীগণ সমবেত হইয়া দরজার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের বাকী হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হউক; আমাদের আর চাকুরী করিবার ইচ্ছা নাই।" তখন চাপাজী টিলেকর শ্রীমন্তের নিকট গিয়া পুনরায় নিবেদন করিলেন যে,—"গারদীগণ যে সকলে সমবেত হইয়াছে, তাহা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে। তাহারা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হইয়াছে। এ বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া শীঘ্র ইহার বন্দোবস্ত করুন্।"

"ইহার পর, যে দিন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে স্থির হইয়াছিল, সেই দিন প্রাতঃকালে নারায়ণ রাও সাহেব "পর্ব্বতী" নামক শৈলে দেবদেবেশ্বরের (৩) দর্শনার্থ গিয়াছিলেন।

(১) বোধ হয়, ইংরাজী Guard (পোর্টুগীজ Guarda) শব্দ হইতে, "গার্‌দী" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) "পেশওয়েগণের বখর" নামক গ্রন্থে সখারাম বাপুর নাম দৃষ্ট হয় না। বরং সখারাম বাপু গোপনে দাদা সাহেবের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন, এরূপ কথা স্পষ্টই লিখিত আছে, এবং তাহাই অধিকতর [illegible]

সেখানে শৈলোপরি স্নানাহ্নিক ও ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া, কুলাবা-পতি রাঘোজী আঙ্গ্রে সর্খেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আঙ্গ্রে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, পেশওয়ে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেন, এইরূপ রীতি পূর্ব্বাপর প্রচলিত ছিল। এই কারণে আঙ্গ্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য "গনেশখিণ্ডি" নামক স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেখানে আঙ্গ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল (১)। অনন্তর শ্রীমন্ত ও আঙ্গ্রে "লকড়ীপুল" পর্য্যন্ত একত্র আসিলেন। চাপাজী টিলেকর সেখানে গিয়া নারায়ণ রাওকে জানাইল যে,—"প্রভু অদ্য প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গমন করিলে পর, গারদীগণ, অদ্যই আপনাকে প্রাসাদমধ্যে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিল। অতএব আপনি পুনরায় পর্ব্বতী শৈলে প্রতিগমন করুন। অগ্রে প্রাসাদরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া পরে প্রাসাদে প্রবেশ করিবেন। আমার বিবেচনায় এক্ষণে ইহাই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।" নারায়ণ রাও এ কথায় তাদৃশ মনোযোগ প্রদান না করিয়া বলিলেন,—"বৈকালে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করা যাইবে।" এই বলিয়া শ্রীমন্ত গৃহে (প্রাসাদে) প্রবেশ করিলেন। আঙ্গ্রে ও স্বগৃহে গমন করিলেন।

"সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীমন্ত "দেওয়ানখানায়" (দালানঘরে) গিয়া দোল্‌নায় বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, এমন সময় জামাদার (সুমের সিং ও খরগ সিং) গারদী সৈন্যগণকে রাজবাটীর মধ্যে আনয়ন করিয়া সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। (অবিলম্বে) চরিদিকে "দীন দীন" শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। নারায়ণ রাও এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া চাপাজী টিলেকর বলিল,—"আজ পর্য্যন্ত আমি মহারাজকে এ বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য মিনতি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রভু কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যাহা হউক, এখনও আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। এই রাজবাটীতে এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। আপনি আমার হস্ত ধারণ করুন; আমি আপনাকে সেই সুড়ঙ্গ-পথে বাটীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারিব।" ইহা শুনিয়া শ্রীমন্ত নারায়ণ রাও সাহেব বলিলেন, "সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে আমার সাহসে কুলাইতেছে না। দাদা সাহেবই এই ষড়যন্ত্র করিয়াছেন; অতএব চল, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা যাউক। তাহা হইলে তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।"

"অনন্তর, নারায়ণ রাও ও চাপাজী টিলেকর উভয়ে "দেওয়ানখানা" হইতে নামিয়া বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিলেন। ইতিমধ্যে অপর দিক হইতে খরগ সিং, সুমের সিংহ ও তুলাজী পওয়ার উলঙ্গ তরবারি হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় সহসা শ্রীমন্তের পূজার গাভীটি তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পাপিষ্ঠ জমাদার ও পওয়ার গাভীকে সম্মুখে দেখিয়া তরবারির আঘাতে হত্যা করিয়া নারায়ণ রাওএর পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অপর দিক হইতে "নারোজ ফাটক" নামক শ্রীমন্তের জনৈক ব্রাহ্মণ অনুচর দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের পথরোধের চেষ্টা করিল। পামর-গণ তাহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে নারায়ণ রাও, যেখানে দাদা সাহেব বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, "এখন আমায় রক্ষা করুন্।" মুহূর্ত্তমধ্যে পওয়ার ও জমাদার (যমদূতের ন্যায়) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাদা সাহেব "থাম, থাম" বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে

সে আমাদের পরিবারবর্গের প্রাণদণ্ডের আদেশ করুক্। 'মারিবে' এই অক্ষরগুলি আপনিই ত স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তবে এখন থামিতে বলিতেছেন কেন ? উহাকে আমাদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিন্; নচেৎ উভয়কেই বিনাশ করিব।" এই বলিয়া তাহারা নারায়ণ রাওকে ধৃত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। তাহাদিগের হস্ত সজোরে দাদা সাহেবের মস্তকে লাগিয়া তাঁহার পাগড়ীটি খুলিয়া গেল। তখন তিনি ভয়ভীত চিত্তে স্বীয় গলদেশ হইতে নারায়ণ রাওএর হস্ত দ্বয় ছাড়াইয়া তাঁহাকে তাহাদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিলেন। এমন সময় (প্রভুভক্ত) চাপাজী টিলেকর নারায়ণ রাওকে রক্ষা করিবার জন্য আঙ্‌রাখা সহ তাঁহার শরীরের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। এবং বলিল, "অগ্রে আমাকে মারিয়া ফেল।" ইহা বলিবামাত্র তুলাজী পওয়ার অস্ত্রাঘাতে উভয়কে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিল। (১) এই সময়ে রাজশ্রী "ইচ্ছারাম পন্ত ঢেরে" নামক জনৈক সরকারী 'পাগেদার' (সাদীনায়ক) তুলাজীকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও তাহার তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী হইলেন। রাজবাটীতে তুমুল বিপ্লব ঘটিল। (২)

(১) চাপাজীর এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাহার বংশধরগণ এখনও ইন্দাপুর তালুকের অন্তর্গত "হয়েখৎপুর" নামক গ্রাম নিষ্কর ভোগ করিতেছে। নারোজী ফাটক ও ইচ্ছারাম পন্ত সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় না।

(২) এ সম্বন্ধে "পেশওয়েগণের বখর" নামক গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"নারায়ণ রাওএর সিংহাসনারোহণের ছয় মাস পরে আনন্দী বাই তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। * * * নারায়ণ রাও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। শ্রাবণ মাসের উৎসব (ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাবিতরণাদি) পরিসমাপ্ত হইয়া গণেশচতুর্থীর উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে কুলাচাপতি রাঘোজী আঙ্গ্রে নিমন্ত্রিত হইয়া পুণায় আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবসমাপনান্তে রাও সাহেব (নারায়ণ রাও) আঙ্গ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন; এবং তাঁহাকে কয়েক দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়া পর্ব্বতী শৈলে গিয়া দেবদর্শন পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে তিনি পথে আনন্দী বাইর ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হয়েন। সঙ্গে হরিপন্ত ফড়কে (সেনাপতি) ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমন্ত বলিলেন,—"এ সব কি শুনিতেছি ? এ বিষয়ে তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে কি না ?" হরিপন্ত উত্তর করিলেন,—"আহারাদিসমাপনান্তে বৈকালে এ বিষয়ের যথাকর্ত্তব্য নিরূপণ করা যাইবে।" এই বলিয়া হরিপন্ত ভোজনার্থ স্বগৃহে গমন করিলেন। শ্রীমন্তও প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীমন্ত গৃহে আসিয়া যখন আহারে উপবেশন করিলেন, তখন ষড়যন্ত্রসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করিতে পারে ? শ্রীমন্ত (এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান না করিয়া) ভোজনান্তে তাম্বূল গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া দাদা সাহেবের অনুচর তুলাজী পওয়ার গারদীগণকে গিয়া জানাইল যে, "তোমাদের কার্য্যসাধনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আমাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রাসাদস্থ প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব উচিত নহে। নতুবা সকলকেই ফাঁদে পড়িতে হইবে।" এই বলিয়া তুলাজী দুই সহস্র গারদী সৈন্যকে সজ্জিত করিয়া সিংহদ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে লাগিল। দ্বাররক্ষক চৌকিদারেরা বাধা দিতে গিয়া গারদীগণের অস্ত্রাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া গারদীগণ প্রাসাদের তটোপরি গমন করিল। এমন সময় শ্রীমন্তের সাদীনায়ক ইচ্ছারামপন্ত ঢেরে ভোজন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি গারদীগণকে এরূপ ভাবে প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া তুলাজী গারদীগণকে বলিল, "দেখিতেছ কি ? ইহাকে মার।"

"নারায়ণ রাও বিপ্লবকারিগণের দ্বারা ধৃত হইয়াছেন, এইরূপ সংবাদ নগরমধ্যে প্রচারিত হইল। তখন সখারাম বাপু, ত্রিম্বকরাও মামা, নানা ফড়ণবীস, হরি পন্ত ফড়্কে, রাঘো সীতকর ও রাঘোজী আঙ্গ্রে প্রভৃতি সকলে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্যও দ্বারের নিকটে আসিয়া একত্র হইল। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ; প্রাসাদে প্রবেশের পথ নাই। তখন আঙ্গ্রে বলিলেন,—"বৃহৎ অধিরোহণীর উপর উঠিয়া কবাট ভাঙ্গিয়া ফেল, এবং নারায়ণ রাও সাহেবকে মুক্ত কর।" এমন সময় দ্বারপাল (ভিতর হইতে) উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "আর কেন কবাট ভাঙ্গিতেছ? নারায়ণ রাও ত নিহত হইয়াছেন!" ইহা শ্রবণ করিয়া আঙ্গ্রে ও অপরাপর সমস্ত কর্ম্মচারিগণ শোকাকুল হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আর প্রাসাদাভ্যন্তরে গিয়া কি হইবে? এখন যে কোনও উপায়ে দাদা সাহেবকে ধৃত করিতে চেষ্টা করা হউক্।" (১)

প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গারদীগণ নিষ্ঠুর—তাহাদের দয়া কোথায়? ইচ্ছারাম পন্তকে গাভীর পশ্চাতে লুক্কায়িত দেখিয়া তাহারা গাভীসহ ইচ্ছারামকে নিহত করিল। এইরূপ মারাকাটী করিয়া তাহারা দেওয়ান্খানায় প্রবেশ করিল। সেখানে আবাজী পন্ত ছিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেখিয়া গারদীগণ বলিল,—"দ্বার রুদ্ধ করিলে কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" আবাজী তথাপি দ্বাররোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন কয়েক জন গারদী দৌড়িয়া তাঁহাকে নিহত করিল ও ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রাসাদমধ্যে এইরূপ তুমুল বিপ্লব কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া ও গারদীগণকে প্রাসাদশিখরোপরি আরূঢ় দেখিয়া নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, দোকানীগণ দোকান পাট বন্ধ করিল।

এদিকে রাও সাহেব শয়নমন্দিরে নিদ্রিত ছিলেন। সহসা এই গোলমাল শ্রবণে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়াই দাদা সাহেবের প্রকোষ্ঠাভিমুখে দ্রুতপদে চলিলেন। সঙ্গে চাপাজী টিলেকর ও নারোজি ফাটক, এই দুই জন ছিল। ইহাদের সহিত তিনি দাদা সাহেবের নিকট গিয়া বলিলেন,—গারদীগণ প্রাসাদমধ্যে বিপ্লব করিয়া মারাকাটি আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এই সকল ষড়যন্ত্র আপনারই কৃত। অতএব এক্ষণে গারদীগণকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করুন্। আপনার যদি রাজত্ব করিবার ইচ্ছা থাকে ত আমায় কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন্।" এই সকল কথা শেষ হইতে না হইতে গারদীগণ মায়ামমতাপরিশূন্য হইয়া সেইখানে আগমন করিল। তদ্দর্শনে নারায়ণ রাও দাদা সাহেবের কোমর জড়াইয়া ধরিলেন। তখন সুমের সিংহ, খরগ সিংহ ও মহম্মদ ইসব তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তুলাজী "আর কেন পলাইতেছিস্" বলিয়া নারায়ণ রাওকে দাদাসাহেবের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে অনয়ন করিল। তখন চাপাজী টিলেকর গারদীগণকে বলিতে লাগিল—"আহাহা! এ ছেলেমানুষ! ইহাকে মারিও না।" এই বলিয়া চাপাজী (তাঁহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে) নারায়ণ রাওয়ের দেহের উপর পতিত হইল। গারদীগণ অগ্রে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া নারোবা ফাটক শ্রীমন্তের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারও দেহ মস্তকশূন্য হইল। তদ্দর্শনে ভয়ে নারায়ণ রাও সাহেবের চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তখন গারদীগণ তাঁহার উপর তরবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। (তরবারির আঘাতে) পেট কাটিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া গেল। * * * ১৬৯৫ শকাব্দ জয়নাম সম্বৎসরে ভাদ্রমাস শুক্ল পক্ষীয় ত্রয়োদশী সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় নারায়ণ রাও নিহত হইলেন।"

(১) এ সম্বন্ধে "পেঁশওয়েগণের বখর" নামক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; যথা,—"এ দিকে সহর মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, সমস্ত সেনানায়কগণ সজ্জিত হইয়া আসিলেন। প্রথমতঃ হরিপন্ত ফড়কে অশ্বারোহণে প্রাসাদের নিকটে আসিলেন। কিন্ত

"পরে সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, "এখন দাদা সাহেবকে রক্তের তিলক পরাইয়া সিংহাসনে বসান হউক্।" এই বলিয়া সকলে দেওয়ানখানায় গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

"এদিকে (রাজবাটীতে আনন্দী বাইর আদেশে) ভেরী প্রভৃতি আনন্দসূচক বাদ্য বাজিতে লাগিল। অনেকেই আনন্দিত হইলেন। সৌভাগ্যবতী আনন্দী বাই প্রাসাদস্থ সকলকে (আনন্দচিহ্নস্বরূপ) "শর্করা বণ্টন" করিলেন। অনন্তর চারি দণ্ড পরে সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেদিন প্রাতঃকালে, কৈলাসবাসী নারায়ণ রাওয়ের স্ত্রী সৌভাগ্যবতী গঙ্গাবাই সাহেব পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র তিনি সত্বরগমনে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। এবং নারায়ণ রাওয়ের মৃতদেহের সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহার স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিবার ইচ্ছা দেখা গেল।

"এমন সময় উলঙ্গঅসিধারী সহস্র সৈন্য সহ ভবান রাও প্রতিনিধি দেওয়ানখানায় গমন করিলেন, এবং দাদা সাহেবকে বলিলেন,—'আপনি পেশওয়েকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া

অপরাপর বড় বড় সর্দ্দারগণও এইরূপে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। আনন্দ রাও রাস্তে, মালোজী ঘোর পড়ে, বজাবা পুরন্দরে, ত্রিম্বক রাও মামা, মালোজী নিম্বালকর, গোবিন্দ রাও গায়কওয়াড়, ভবান রাও প্রতিনিধি, মোরোবা দাদা ফড়্নীস (নানা ফড়নবীসের খুল্লতাতপুত্র), রাঘোজী আঙ্গ্রে, নানা ফড়নবীস, * * * প্রভৃতি কত লোক আসিলেন, তাহা কে গণনা করিতে পারে? ইঁহারা সকলেই "বুধবার পেঠের" (পেঠ = বাজার) থানায় গিয়া একত্র হইলেন এবং পরামর্শ করিতে লাগিলেন—"এক্ষণে কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?" তখন সমস্ত সর্দ্দার ও সাদীনায়কগণ বলিলেন যে, "প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া গারদীগণকে মারিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হউক্। আমাদের সমক্ষে গারদীগণ নগণ্য।" এই পরামর্শ সখারাম বাপুর মনোনীত হইল না। কারণ, তিনি বলিলেন,—"রাও সাহেব (নারায়ণ রাও) প্রাসাদে আবদ্ধ আছেন; এরূপ অবস্থায় আমরা বাহির হইতে হাল্লা (আক্রমণ) করিলে গারদীগণ প্রাসাদমধ্যে অনর্থ ঘটাইবে। এ কারণে, প্রাসাদ-আক্রমণও সুসঙ্গত নহে।

এ দিকে নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া গারদীগণ প্রাসাদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। * * * পরে গারদীগণ দাদা সাহেবকে পরিচ্ছদাদিতে ভূষিত করিয়া সদর দরবারে আনয়ন করিল। দাদা সাহেব তাম্বূল গ্রহণ করিয়া দরবারে বসিলেন। গারদীগণ সেলাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। * * * তার পর দাদা সাহেব, বজাবা পুরন্দরে ও মালোজী ঘোরপড়েকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন চোপদার প্রেরণ করিলেন। * * * দাদা সাহেব দরবার করিয়া বসিয়াছিলেন; এমন সময় মালোজী আসিয়া দাদা সাহেবকে "রাম রাম" ও বজাবা নমস্কার করিলেন। দাদা সাহেব তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, মালোজী বলিলেন,—"বাঃ! আপনি ভাল কীর্ত্তি লাভ করিলেন!" ইহা শুনিয়া দাদা সাহেব বলিলেন, "গত ঘটনার জন্য ভাবিলে আর কি হইবে? এখন সহরে আমার নাম ঘোষণা করিয়া সহরের রক্ষার বন্দোবস্ত করুন্।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। * * * প্রাসাদে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। পার্ব্বতী বাই (ভাউ সাহেবের স্ত্রী), সগুণা বাই (প্রথম বাজীরাওয়ের তৃতীয় পুত্র জনার্দ্দন রাওয়ার স্ত্রী) ও গঙ্গা বাই প্রভৃতির আক্রোশ ও বিলাপ বর্ণনাতীত। পরে গঙ্গাবাই সহগমনের

এইরূপ অবশঙ্কর কার্য্য করিলেন! ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে।' এইরূপে নানাপ্রকারে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পরিশেষে বলিলেন যে,—'আপনার মুখ দেখাও আর আমাদিগের উচিত নহে।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"ইহার পর ত্রিম্বক রাও মামা প্রাসাদে আগমন করিয়া দাদা সাহেবকে বলিলেন,—'আপনি উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন! এখন, নারায়ণ রাওএর মৃতদেহের কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, স্থির করিয়াছেন?' দাদা সাহেব উত্তর করিলেন, 'দাহ করিতে হইবে।' সে সময় শব উত্তোলনের জন্য কোনও ব্রাহ্মণের প্রাসাদে আসিতে সাহস হইল না। সকলেই অতীব ভয়ভীত হইল। তখন দাদা সাহেব বলিলেন, 'যে রূপেই হউক, দহন করিতে হইবে।' পরে, মামা (ত্রিম্বক রাও) বাহিরে আসিয়া ৫ জন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের হস্তে ৫৲ টাকা দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন।

"গঙ্গাবাইয়ের সহগমনের দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া আনন্দী বাই মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গঙ্গাভাগীরথী (১) পার্ব্বতী বাই সাহেব (সদাশিব রাও বা বিখ্যাত ভাউ সাহেবের বিধবা পত্নী) এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র গঙ্গা বাইকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—'তুমি কি পাগল হইয়াছ? এই বিপ্লবে আমাদের এক প্রকার কুলক্ষয়ই (বংশলোপই) হইয়াছে। তোমার গর্ভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর যদি প্রসন্ন হয়েন, চাই কি, সর্ষপ পর্ব্বতে পরিণত হইবে।' এইরূপে অনেক প্রকারে তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না দেখিয়া, পার্ব্বতী বাই তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, এবং বাহির হইতে কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং নারায়ণ্ রাওএর শবের নিকট গিয়া উপবেশন করিলেন। পরে মামাকে বলিলেন,—'শব লইয়া আপনারা গমন করুন্।'

"পার্ব্বতী বাই কাকী বাল্যকাল হইতেই নারায়ণ রাওকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, গিল্‌চীগণের যুদ্ধে (তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে) ভাউ সাহেব নিহত হইলে, তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতী বাই, সন্তান ছিল না বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া নানা সাহেব (বালাজী বাজীরাও) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,—'তুমি দুঃখিত হইও না : নারায়ণ রাওকে তোমারই পুত্র বলিয়া জানিবে। তুমি ইহার লালনপালন কর। এ সমস্ত রাজ্য সম্পদ তোমারই।' পার্ব্বতী বাই কাকী অতিশয় দূরদর্শিনী ছিলেন।

"এ দিকে, ত্রিম্বক রাও মামা (শয্যার পরিবর্ত্তে) ঝুলি প্রস্তুত করিয়া নারায়ণ রাওএর মৃতদেহ তাহাতে স্থাপন পূর্ব্বক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধে দিয়া প্রাসাদের বাহিরে আনয়ন করিলেন। সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ সজ্জিত হইয়া বাহিরে বসিয়াছিলেন, শব বাহিরে আসিলে সকলেই সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত গমন করিলেন। (২) পরে সকলে মিলিয়া শবদাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দাদা সাহেব সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দূরে বসিলেন—তিনি অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন।

---

(১) বিধবাগণের নামের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়গণ "গঙ্গাভাগীরথী" ও সধবাগণের নামের পূর্ব্বে "সৌভাগ্যবতী" এই বিশেষণ প্রযুক্ত করিয়া থাকেন।

(২) "সন্ধ্যাকালে সমস্ত "মুৎসদ্দীগণ" (মন্ত্রী ও অপরাপর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ) শূন্যমস্তকে (শূন্যমস্তকে থাকা শোকের চিহ্ন) প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্তের প্রেত (মৃতদেহ) বাহিরে আনয়ন করিলেন। নারোজী ও ইচ্ছারাম প্রভৃতি আত্মীয়গণ আসিয়া তাহাদিগের মৃতদেহ সংকারার্থ লইয়া গেল। দাদা সাহেব সচিবমণ্ডলীসহ নদীতীরে গিয়া যথাবিধি নারায়ণ রাওয়ের অগ্নিসংস্কার করিলেন। ... দশম দিবসে যথা প্রকারে

"পর দিন সমস্ত কর্ম্মচারিগণ আসিয়া দাদা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দ্বাদশ-দিবসান্তে দাদা সাহেব রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। (১) অনন্তর একদিন তিনি বেদশাস্ত্রসম্পন্ন রাজমান্য রামশাস্ত্রী ন্যায়াধীশকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সঙ্গদোষে আমি অকারণ জনাপবাদ, অপকীর্ত্তি ও অভিশাপের ভাগী হইয়াছি। এজন্য আমার কোন প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত?' ইহা শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে উত্তর করিলেন যে, 'দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এই পাপের আর কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই।' এই বলিয়া তিনি সপরিবারে পুনা পরিত্যাগ করিয়া—ওঁওাঈ নামক তীর্থক্ষেত্রের ৩। ৪ ক্রোশ দূরস্থিত 'ভূর্গাও' নামক গ্রামে কৃষ্ণাতীরে গিয়া বসতি করিয়া, স্নানাহ্নিকাদি ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

গঙ্গোত্রীর পথে।

ক্রমাগত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের ক্লান্তিবৃদ্ধির জন্য আমি আবার আর একটি নূতন পথের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। এবার পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উৎস দর্শন করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। পর্ব্বতপ্রদেশে একটা গন্তব্য স্থান স্থির না করিয়া চলা যায় না; যে দিকে চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিব, এরূপ বন্দোবস্ত হইলে, চাই কি, জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন বৃক্ষতলে ও পর্ব্বতগহ্বরেই কাটিয়া যায়। আর অনাহারে ও পরিশ্রমে সে দিন কয়টিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। আমার যে

ফড়নবীস, সখারাম বাপু ও হরিপন্ত ফড়কে, এই চারি জনে এক পাশে বসিয়া বালুকাময় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া সকলে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—'নানা সাহেবের বংশধরকে রাজা করিতে হইবে। রঘুনাথ রাওয়ের বংশকে কখনও নমস্কার করা হইবে না।' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অপরাপর সকলের সহিত তাঁহারাও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।"—পেশওয়েগণের বখর।

(১) "নারায়ণ রাওয়ের উত্তরকার্য্য সমাধা হইলে দাদা সাহেব পাজরায় পুত্র পতির নিকট স্বীয় কারকুন প্রেরণ করিয়া স্বীয় নামে অভিষেকবসন, রাজমুদ্রা ও কটার (রাজচিহ্নস্বরূপ তরবারি) আনাইয়া লইলেন।"—পেশওয়েগণের বখর।

ভ্রমসংশোধন।—শ্রাবণ মাসের সাহিত্যের ২৭৬ পৃষ্ঠায় ২য় পংক্তির পর, সেই পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষ প্যারাগ্রাফটি বসিবে। ২৭৭ পৃষ্ঠার ৮ম পংক্তির "সদাশিব রাও ভাও (বালাজী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র) ও বিশ্বাস রাও"—স্থলে "সদাশিব রাও ভাউ ও বালাজী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও" হইবে। ২৭৬ পৃষ্ঠায় ২৩শ পংক্তির "পিতৃ পৌত্র" —স্থলে "পিতৃব্য-পৌত্র" হইবে।—লেখক।

তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, এমন নহে। অতৃপ্তি অশান্তি লইয়া আমি হিমালয়ের মহামহিমাময় সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিতে পারিতাম না। স্বর্গের সুন্দর মনোমোহন দৃশ্যপট সকল আমার নয়ন সমক্ষে নূতন শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া আবির্ভূত হইত, আমার অশান্ত প্রেমহীন নীরব দৃষ্টির তাচ্ছীল্য তাহাদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিত; নন্দনকাননের অপূর্ব্ব শোভা আমার তাপিত বক্ষে প্রেমের সঞ্চার করিত না। এত বিড়ম্বনা এত নিরাশাকে সঙ্গী করিয়া পথ চলিবার কষ্ট বুঝাইবার নহে—কাহারও অনুভব করিবারও আবশ্যকতা নাই।

গঙ্গোত্রী যাইবার সর্ব্বজনপরিচিত পথ একটি, তবে পর্ব্বতবাসিগণ হিমালয়ের বক্ষে আজন্মপ্রতিপালিত, তাহারা নিজেদের জন্য সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র পথের বন্দোবস্ত করিয়া লয়। সে পথে আমার ন্যায় অন্নভোজী বাঙ্গালী বীরের কথা দূরে থাকুক, যাহারা প্রতিবেলায় সেরভর আটা ও তদুপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরও চলিবার সাধ্য নাই; সে সকল 'পাকদাণ্ডী' দৃঢ়কায় ক্ষুদ্রদেহ পর্ব্বতবাসিগণেরই যাতায়াতের পথ। গঙ্গোত্রীর যাত্রীদল হরিদ্বার হইতে দেরাদুন আইসে, দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া শ্বেতকায়গণের বিলাস-কুঞ্জ মুসুরী ল্যাণ্ডরের ভিতর দিয়া 'তিহরী' রাজ্যে উপস্থিত হয়; সেখান হইতে গঙ্গোত্রীর একই পথ। আমরা অপর পথে তিহরী গিয়াছিলাম; পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন বাস করায় আমাদের পথ ঘাট অনেকটা পরিচিত হইয়া গিয়াছিল।

আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'তিহরী' হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে। যখন লোটা কম্বল সম্বল করিয়া পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন যদি জানিতাম যে, সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের জবরদস্তিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সেই সুদূর হিমালয়ের কথা লিখিয়া তাঁহার কাগজের কয়েক পৃষ্ঠা অধিকার করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই কম্বলের মধ্যে একখানি ট্রেলের ডাইরি বাঁধিয়া লইতাম। ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাবে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আরম্ভ 'তিহরী' হইতে।

'তিহরী'র ভৌগোলিক অবস্থানের একটা বিবরণ দিতে হইতেছে; সাধারণতঃ আমাদের স্কুলের ছাত্রেরা যে ভূগোল পাঠ করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে 'তিহরী' রাজ্যের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। গড়োয়াল

বিভক্ত; ব্রিটিশ গড়োয়াল ও স্বাধীন গড়োয়াল। স্বাধীন অর্থে নেপাল বা ভূটানের ন্যায় স্বাধীন নহে, ইংরাজের আশ্রয়াধীন রাজ্য—Protected State। পূর্ব্বে এই রাজাদের রাজধানী শ্রীনগরে ছিল, নেপালের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা পলায়ন করিয়া তিহরীতে আগমন করেন; নেপাল যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা গড়োয়ালের এক অংশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন; বর্ত্তমান শ্রীনগর তাহার রাজধানী; ইংরেজের আফিস আদালত সমস্ত সেখানে। গঙ্গানদীর একপারে ইংরেজের সীমানা, অপর পারে তিহরীর রাজার রাজ্য।

তিহরী রাজ্যের সবিশেষ ইতিহাস সংগ্রহ করা আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইলে, আমি তাহার অনুসন্ধান করিতাম। এমন কি, সে সময়ে তিহরীর ইতিহাস জানিবার সামান্য আগ্রহও আমার মনে উদিত হয় নাই, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর রাজা রাজড়ার খবরের আবশ্যক কি, 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর জানিয়া' কোন লাভই নাই। তাই বলিয়া তিহরী রাজ্য সম্বন্ধে আমার যে কোন জ্ঞানই ছিল না, তাহা নহে; কোন বিশেষ কারণে তিহরী রাজ্যের অনেক সংবাদ আমাকে শুনিতে হইয়াছিল।

আমার এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তিহরী রাজ্যের একটি গোলযোগের সময়ে গোলযোগকারিগণের এক পক্ষের মোক্তার ছিলেন; তাঁহার কল্যাণে আমি পূর্ব্বেই অনেক বিষয় জানিতাম। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, বা যাহার সহিত আমার কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, এমন গোলযোগের আমূল অনুসন্ধান করিয়া ব্যক্তি বা পরিবারবিশেষের দোষগুণের সমালোচনার আমি পক্ষপাতী নহি। পরের দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক সেই কথা লইয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করা সময়ের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার বটে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা না করিলে আমাদের অনেকেরই দিনটা বৃথা যায় বলিয়া মনে হয়; পরের ঘরের কথা আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করি, কাহারও কোন গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইলে আমরা সহস্রচক্ষু হই; তিহরী-ব্যাপারে আমারও সেই প্রকার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার সেই সময়ের উদাস দৃষ্টির সমক্ষে কেহই বড় স্থান পাইতেন না; সুতরাং তিহরী রাজ্যের কথা সবিশেষ আমার স্মরণ নাই।

বর্ত্তমান রাজার স্বর্গীয় পিতা শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ সা, ১৯৪৩ সম্বতে পরলোক

ইংরেজ রেসিডেণ্ট প্রভৃতির উৎপাত নাই। রাজা প্রতাপ সা অতিশয় ইংরেজ-প্রিয় ছিলেন, তাহার ফলে তিহরী সহরের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল। তিহরী সহরের অবস্থানভূমি অতি সুন্দর। যিনি প্রথমে এইস্থানে রাজধানীস্থাপনের সঙ্কল্প করেন, তিনি অন্য যাহাই হউন, কবি না হইয়া যান না। পর্ব্বতের মধ্যে এমন মনোরম স্থান আমি আর দেখি নাই, প্রকৃতি-দেবী এই হিমালয়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সহরটিকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গানদী এই সহরের একপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, ভিলং নামে আর একটি নদী আসিয়া তিহরীর নীচেই গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের উপরেই একটি ত্রিভুজের ন্যায় খানিকটা সমতল স্থান ;—ত্রিভুজের দুই বাহু দুইটি তরঙ্গিণী ; ত্রিভুজের ভূমি এক প্রকাণ্ডকায় দুরারোহ পর্ব্বতপ্রকৃতির স্বহস্ত-নির্ম্মিত পাষাণপ্রাচীর। সহর সুরক্ষিত করিবার জন্য কোন আয়োজনেরই আবশ্যকতা নাই ; নদীদ্বয় এমনই খরস্রোত যে, কাহারও সাধ্য নাই, নদী পার হয়। এই স্থানে রাজধানী। মহারাজ প্রতাপ সা গঙ্গানদীর উপরে একটা টানা সাঁকো প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সাঁকো পার হইয়াই মসুরী যাইবার পথ ; তিহরী প্রবেশের এইটিই প্রকাশ্য পথ। আর একটি পথ আছে, তাহা দ্বারা বৎসরের সকল সময়েই তিহরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে। এই পথ শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া তিহরীতে আসিয়াছে, এ পথের মুখও প্রকাণ্ড গেট ও শান্ত্রীপাহারায় সুরক্ষিত। কিন্তু এ পথের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সন্দেহ হয়, এখন সে পথে লোক চলিতেছে কি না। সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার উপরের সাঁকোর অংশবিশেষ টানিয়া তুলিয়া রাস্তাবন্ধ করা হয়, তখন আর কাহারও সহরে প্রবেশের পথ থাকে না।

রাজা প্রতাপ সা ইংরেজের অনুকরণে হাইকোর্ট স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী আইনের সহিত দেশীয় প্রথা পদ্ধতি মিশাইয়া রাজ্যশাসনের সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; ভিলং নদীর অপর পারে একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে 'প্রতাপ নগর' নামে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি পাহাড়ীকে মসুরি প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া ইংরাজী ব্যাণ্ড শিখাইয়া লইয়া যান ; আমি যখন তিহরী গিয়াছিলাম, তখন ইংরাজী ব্যাণ্ড শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম।

এই প্রকারে সুনিয়মে সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন করিয়া মহারাজ প্রতাপ সা

নাবালকের রাজ্যরক্ষার জন্য প্রতিনিধি সভা (Council of Regency) গঠিত করেন, এবং মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (Regent) প্রতিনিধি বা সভার সভাপতি নিযুক্ত হন; তাঁহারই হস্তে ষ্টেটরক্ষার ভার প্রদত্ত হয়। এই রাজ-ভ্রাতার নাম কুমার বিক্রম সা। সচরাচর লোকে কুমার সাহেব বলিয়াই সম্বোধন করে।

সম্পত্তিভোগের কি মোহিনী শক্তি; যেখানে সম্পত্তি, যেখানে ক্ষমতা, সেই-খানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেইখানেই গোলযোগ। সামান্য ভূমিখণ্ডে সহস্র সন্ন্যাসীর স্থান হয়, কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে দুই জন রাজার স্থান কুলায় না। আমরা দরিদ্র,—সম্পত্তি ধনগৌরবের মহিমা জানি না; এই দেখি, যেখানে অর্থ, সে-খানেই অনর্থ; আর দেখি, যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই তাহার অপব্যবহার, সেখানেই প্রতিযোগিতা। বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশ্বরাজ্যে এই গোলযোগ আমরা বাধাইয়া দিতেছি; রাজপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া নিরপেক্ষ বিচারকগণ প্রতিদিন আমাদের এই সমস্ত সম্পত্তি, ক্ষমতা, জোর জবরদস্তির মীমাংসা করিতেছেন; ধনীর বহুসঞ্চিত অর্থ পুলিশ, উকীল আর ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা ভাগ করিয়া লইতেছে; এ দৃশ্যের অভিনয় পুনঃপুনঃ হইতেছে। মামলা মোকদ্দমার দায়ে বিপুল অর্থশালী ব্যক্তি পথের ভিখারী হইতেছে, তবুও কেহ সাবধান হয় না। তবুও যথাসর্ব্বস্ব উদ্ধারের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ, আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই।

কুমার সাহেব অভিভাবক হইয়া সমস্ত রাজ্য স্বহস্তে পাইলেন। তাঁহার পরামর্শদাতা হিতৈষী বন্ধু অনেক জুটিয়া গেল। তাঁহার অন্য অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবিষয়ে তিনি বড় ভাই অপেক্ষা অনেক হীন; পরামর্শদাতাদের হস্তে কলের পুতুলের মত তিনি পরিচালিত হইতে লাগিলেন। তাহার ফল এই হইল, রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিচারবিভ্রাট বা বিচারবিক্রয়। অনেকে অভিভাবকের নাম দিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

এদিকে রাজ-অন্তঃপুরে আর এক পক্ষ ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় করিতে-ছিলেন। মহারাজ প্রতাপ সাহের মৃত্যুর পর বিধবা রাণী সাহেবা অভিভাবক-পদপ্রার্থিনী ছিলেন; কিন্তু ইংরেজ গবর্মেণ্ট মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রম সাকে অভিভাবক করাই কর্ত্তব্য স্থির করায়, বিধবা রাণী নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাঁহার পক্ষেও অনেকে ছিলেন; অভিভাবক

ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। অবশেষে রাণী সাহেবা প্রকাশ্যভাবে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে স্পষ্টভাবে কুমার সাহেবের শাসনের উপরে দোষারোপ করিলেন,—তিনি বিচার বিরুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহার হস্তে রাজ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

নাবালকগণের মাতার এই আবেদনপত্র ছোটলাট উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। ১৯৪৮ সম্বতে কি তাহার কিছু পূর্ব্বে, বিভাগীয় কমিশনর শ্রীযুক্ত মেজর রস সাহেবের উপর অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হইল; সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য রাণীর পক্ষের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রঘুনাথ বাবু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী রঘুনাথ বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় রাণীর পক্ষ জয়লাভ করিল। কুমার সাহেব অভিভাবকের পদ হইতে অপসারিত হইলেন, রাণী সাহেবা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

গৃহ-বিবাদ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; কুমার সাহেবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল; তিহরীরাজ্য হইতে তাঁহার চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। অন্য উপায় না দেখিয়া কুমার সাহেব আর এক জন বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত গড়োয়ালের এক ক্ষুদ্র রাজ্যে দুই পক্ষের উকীল দুই বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে লাগিল; পর্ব্বতবাসী গড়োয়ালীগণ মসী ও বাক্‌যুদ্ধ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। ছোটলাটের আসন টলিল, তিনি সমস্ত অনুসন্ধানের জন্য বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতবেষ্টিত তিহরী রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কূটবুদ্ধিবলে উভয় পক্ষকেই পরাজিত করিলেন; কুমার সাহেব স্বপদে না হউক, সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নাবালক রাজকুমারের গদ্দি-প্রাপ্তির আর অধিক দিন বিলম্ব নাই; এ সময়ে অন্য কোন পরিবর্ত্তন করিয়া লাভ নাই, ইত্যাদি বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া রাণী সাহেবাকেই অল্পদিনের জন্য অভিভাবক স্থির রাখিয়া, ছোটলাট নাইনিতালে প্রস্থান করিলেন। তিহরী রাজ্যের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল; রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি উভয় পক্ষের বিবাদে জলের মত খরচ হইয়া গেল।

এই সমস্ত ব্যাপারের অল্প দিন পরেই আমি তিহরী যাই। কুমার সাহেবের পক্ষীয় বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে।

প্রকার অত্যাচার হইতে পারে; কেহ কেহ বলিলেন, আমি হয় ত সহরেই প্রবেশ করিতে পারিব না। কিন্তু আমার ন্যায় লোটাকম্বলধারী ব্যক্তির মনে সে সব কথা জাগে নাই; আর রামের রাজ্য শ্যামের হস্তেই যাউক, আর হরির হস্তেই যাউক, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; সুতরাং আমার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার হইবে, তাহা আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্লসময়ে আমি ও আমার একজন সন্ন্যাসী বন্ধু তিহরীতে প্রবেশ করি; স্বাধীন রাজ্যে এই আমাদের প্রথম পদার্পণ।

শ্রীজলধর সেন।

প্রতিশোধ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী পূজার পর নৌকারোহণে নবদ্বীপের দিকে চলিয়াছেন। সচরাচর তাঁহার চরণযুগল ছাড়া অন্য যানের তিনি বড় তোয়াক্কা রাখেন না। কিন্তু এবারে একটু কথা ছিল,—দস্যুপতি বিশ্বনাথের হাতে আবার পড়িতে তাঁর বিশেষ আপত্তি। এখন আর ভয় ছিল না—কিন্তু লজ্জা রাখিবার ঠাঁই ছিল না। সরলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার অব্যবহিত পরেই বিশ্বনাথের সেই ব্যঙ্গ-মিশ্রিত তিরস্কার ভগবৎপ্রেরিত দণ্ডতুল্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাড়ে হাড়ে বাজিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জায় পড়িয়া তিনি সরলার আর কোন খোঁজ খবর করিতে পারেন নাই। সে ঘটনার পর আর বাটীর বাহির হন নাই। পাশা-খেলায় বিনোদের বড় আসক্তি—সন্ধ্যার পর বসিয়া দেড় প্রহর না খেলিলে তাঁহার চলিত না। কিন্তু গৃহে বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি সে আমোদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর কোথাও যাইতেন না।

জগদ্ধাত্রীপূজার কিছু দিন আগে বিনোদবিহারী এক লোভে পড়িয়া গৃহ-কোটর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। নিমন্ত্রণ চিঠি পাইয়াছেন, সমুদ্রগড় অঞ্চলে এক ধনশালিনী অনূঢ়া কুলীনকন্যার কুল রক্ষা করিতে হইবে। বাটী হইতে সমুদ্রগড় পদব্রজে দেড় দিনের পথ, কিন্তু পথে প্রায় সর্ব্বত্র বিশ্বনাথের আড্ডা। কাল্‌নার ডাকাতির পর বিশ্বনাথ গা-ঢাকা দিয়াছে, দেশময় সে খবর রাষ্ট্র

সন্ধ্যার একটু আগে নৌকা মৃজাপুরের খালের কাছাকাছি হইল, সমুদ্রগড় অদূরে। এমন সময়ে খালের ভিতর হইতে এক খানা দীর্ঘ পান্সী বেগে আসিয়া গঙ্গাবক্ষে পড়িল। তাহার দাঁড়ি মাঝিদের উল্লাস কোলাহলে, তালে তালে দাঁড়পতনের ধারাবাহিক শব্দে, একটা সুদৃঢ় সংকল্পের ভাব সূচিত হইতেছিল। "গঙ্গা মায়ী কি জয়! কালী মায়ী কি জয়!" শুনিয়া বিনোদ বুঝিলেন, ডাকাতের দল তাঁহার সম্মুখে।

কিন্তু সে পান্সী আপন মনে বাহিয়া চলিল, বিনোদকে কিছু বলিল না। বিনোদের নৌকাও উজানে পাইল বাহিয়া চলিতেছিল। সন্ধ্যাতিমির ঘনাইয়া আসিল। সমুদ্রগড়ের ঘাট দেখা যাইতেছিল। সহসা সেই পান্সীর দাঁড়পতন-শব্দ ঘুরিয়া স্রোতোমুখে ঘনতর হইয়া আসিল। মাঝি উদ্বিগ্ন হইয়া বিনোদকে জানাইল, সমুদ্রগড়ের ঘাটে পৌঁছিবার আগে পান্সী নৌকার উপর আসিয়া পড়িবে।

হইলও তাই। দস্যুহস্তে বন্দী হইয়া বিনোদ পান্সীতে নীত হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি পর্য্যন্ত তাহারা উঠাইয়া লইল, কিন্তু মাঝি মাল্লাদের কিছু বলিল না। অধিকাংশ দস্যু সমুদ্রগড়ের কাছে নামিয়া গেল। অন্ধকারে, তায় রুদ্ধচক্ষে বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কি উদ্দেশে ডাকাতেরা তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া দিল, সকলের উপর তাহাই ভাবিয়া তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইতেছিলেন।

পান্সী যখন তীরলগ্ন হইল, তখন রাত্রি প্রায় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। শৃগালেরা সহসা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র শান্ত নীরবতা, জাহ্নবী-স্রোতের কুলু কুলু রবও সেই শান্তির সঙ্গীতমাত্র। অন্ধকারে, রুদ্ধনয়নে বিনোদ বুঝিলেন, ডাকাতেরা তাঁহাকে পাল্‌কীতে পুরিল। বিনোদ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। প্রাণের ভয় বা ভরসা কিছুই তাঁহার ছিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

লজ্জিত অপমানিত কৃষ্ণ সর্দ্দার মনে মনে শপথ করিল, বিশে ডাকাতের আড্ডা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় না হইয়া সে আর মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মুখ দেখাইবে না। এ দিকে বৈদ্যনাথ বিশেকে ধরাইয়া দিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনিষ্ট যা করিবার, সেই করিয়া গিয়াছিল। তাহার কাছে কৃষ্ণ সর্দ্দার বিশ্বনাথের নাড়ী-

শান্তিপুরের দিকে গেল। ইচ্ছা, সেখানকার বিখ্যাত উপর গস্তিদের দলে মিশিয়া বিশে ডাকাতকে ধরিবে, পারৎপক্ষে আর সাহেবদের শরণাপন্ন হইবে না।

এ দিকে স্বরূপগঞ্জে কৃষ্ণ সর্দ্দার এবং বৈদ্যনাথের নাকালের কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণীতলার শিবিরে মহাষ্টমীনিশায় ভারি উল্লাস পড়িয়া গিয়াছিল। দলের লোকেদের উৎসাহে বিশ্বনাথ সে আমোদে যোগ দিয়াছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে নহে। নেতৃত্বে যতগুলি অসামান্য গুণের দরকার হয়, দূরদর্শন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বিশ্বনাথের তাহা যথেষ্ট ছিল। স্বরূপগঞ্জের ঘটনায় সে বুঝিয়াছিল, কারারুদ্ধ বৈদ্যনাথ অতঃপর তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী দাঁড়াইবে, এবং চিরশত্রু কৃষ্ণ সর্দ্দার "মরিয়া" হইয়া পিছু লাগিয়াই রহিবে। নবমীর নিশীথে সংবাদ আসিল, কৃষ্ণ সর্দ্দার উপর গস্তিদলে মিশিয়া শান্তিপুরে বসিয়া আছে। বিশ্বনাথ বুঝিল, এতদিনে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণীর নিবিড় জঙ্গলে, যেথায় প্রশস্ত পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের উপর বিশ্বনাথ বাবুর দরবার বসিয়াছে, সেথায় এক বার যাই। প্রকাণ্ড পাইকড় গাছের নীচে তৃণমণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপতলে একটিমাত্র মৃণ্ময় দীপ জ্বলিতেছে। তার চেয়ে গাঢ়ান্ধকার ভাল। তাহাতে গত কয় রাত্রির আনন্দোৎসবময় স্মৃতি একটা অনির্ব্বচনীয় কারুণ্যবিজড়িত বিষাদে পরিণত হইতেছে। অদূরে উৎসব উপলক্ষে রচিত তৃণপত্রাবৃত দীর্ঘ গৃহশ্রেণী চন্দ্রালোকে ক্ষুদ্র গিরিপ্রাচীরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। গৃহসংলগ্ন প্রান্তরে প্রায় পাঁচ শত মনুষ্যমূর্ত্তি বিশৃঙ্খল ভাবে বসিয়া গিয়াছে। অনেকেরই হাতে তরবারি, জ্যোৎস্নালোকে তাহার ফলক জ্বলিতেছে।

এই সমবেত ধৃতাস্ত্রমণ্ডলীমধ্যে দুইটি পরিচিত মূর্ত্তি উপস্থিত ছিল না। বিশ্বনাথ এবং মেঘা। প্রতিমাবিসর্জ্জনের পর বিশ্বনাথ মাতাকে প্রণাম করিবার জন্য গৃহে গিয়াছে। মেঘা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। কৃষ্ণ সর্দ্দার শান্তিপুরে গিয়া উপর গস্তিদের দলে মিলিত হওয়ার সংবাদ দলের মধ্যে কেবল মেঘা জানিত। অতএব নবমীর নিশা প্রভাত হইতে না হইতে সে বিশ্বনাথকে অনুরোধ করিল, ডুলি পাঠাইয়া মাতাকে আনাইয়া লওয়া হউক। নহিলে কি জানি শত্রুরা যদি গাড়িয়া ভাতছালায় * সুযোগ বুঝিয়া আজ্ "ওৎ" করিয়া

মানুষ কখন চিন্‌লিনে! শান্তিপুরের যণ্ডারা আজ্ বাইচ্ খেলা ছেড়ে কোথাও নড়্‌বে না, সে ভাবনা করিস্‌নে। তাতে আজ্ ঘাটে ঘাটে ডুরে-পরা যত রঙ্গিণী এসে জুট্‌বে। তুই নিশ্চিন্তি থাক্!"

মেঘা তথাপি সশস্ত্র হইয়া বিশ্বনাথের সঙ্গে গেল। যদিই কোন বিপদ ঘটে। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতসারে সে নিজের দলের বাছা বাছা সড়কীওয়ালাদের পথের স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিল।

সর্দ্দারের ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া, উন্মুখ ডাকাতেরা কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সকলকেই আজ্ বাড়ী ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে হইবে। কিন্তু হুকুম ব্যতীত যাইবার যো নাই। বাত্যান্দোলিত মধু-ক্রমবৎ সেই পাঁচ শত ডাকাতের কথায় ব্রাহ্মণীতলার বন শব্দিত হইতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গাড়য়াভাতছালা গ্রামে এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বাস। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথের অর্থানুকূল্যে দুর্গোৎসব করিতেন। বিশ্বনাথের বৃদ্ধমাতা এই পূজাতেই সন্তুষ্ট ছিল, নিজে কখন "ঠাকুর আনিতে" সাহস করিত না। অনুরুদ্ধ হইলে বলিত, "বাপ্‌রে, ছোট লোক বাগ্দী আমরা,—ও সব কি আমাদের সয়!" এ দিকে যে বিশ্বনাথ স্বরূপগঞ্জে মহা ধুমধামে দুর্গোৎসব করিত, সে কথা কেহ বলিলে বুড়ী বলিত, "সে ত আর বিশ্বর ভিটায় নয়। গঙ্গাতীরে কোন দোষ নেই!" যাহা হউক, মাতৃভক্ত বিশ্বনাথ পূজার সময় প্রায় প্রত্যহ একবার বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মার আর কেহ ছিল না, একটি মেয়ে, আর এই ছেলেটি। এবারে কিন্তু বিশু প্রয়োজন ছলনা করিয়া পূজার ভিতর এক দিনও বাড়ী আসে নাই। কোম্পানি বাহাদুর যে বিশ্বনাথকে ধরিবার জন্য হুলিয়া করিয়াছেন, দেশের সর্ব্বত্র তাহা রাষ্ট্র হইয়াছিল। বুড়ীও তাহা শুনিয়াছিল। বৃদ্ধা জানিত, বিশু যেখানে থাক্, বিজয়ার ভাসানের পর সে তাকে প্রণাম করিতে আসিবেই। এ দিকে মেঘার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া বিশ্বনাথ জন-সমাগমমাত্রশূন্য অপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিলম্ব ঘটিল। আশার পথ চাহিয়া চাহিয়া বুড়ী ক্রমে হতাশ হইল, এবং কোন অজ্ঞাত ঘোর বিপদ নিশ্চয় করিয়া সকন্যা ভাবিতে বসিল। দু জনেরই ভারি কান্না পাইতে-ছিল, কিন্তু বৎসরকার দিন আজ, কাঁদিলে বিশুর অকল্যাণ হবে!

মাতা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর যখন এই অবস্থা, বিশু তখন সহসা আসিয়া

রোধ করিয়াছিল, সাক্ষাতে সে সংযম রক্ষা করিতে পারিল না। বিশ্বনাথ মার পায়ের কাছে বসিয়া পদধূলি লইল, এবং হাসিয়া নিজ উত্তরীয়ে মাতার চোকের জল মুছাইয়া দিল। মা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিল,

"তা হাঁ বাবা, এত লোকের দুক্কু বুঝিস্, মায়ের দুক্কু বুঝিস্‌নে ক্যান বাপ? আমার যে আর কেউ নেই বিশু! এমন পূজো গেল, এক দিন তুই দেখা দিলিনে। এক দিন তোকে হাতে করে মা দুগ্গার পেসাদ খাওয়াতে পারলাম না। লোকে বলে, বিশুকে কোম্পানি ধরে নিয়ে গিয়েছে!"

বিশুকে দেখিয়া দিদি বেশী করিয়া সিদ্ধি বাটিতে গিয়াছিল—মাতার কথা শেষ হইতে না হইতে সে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধির বাটী আনিয়া ভাইয়ের সুমুখে রাখিল। বিশু দিদিকেও প্রণাম করিল, এবং তার পদধূলি মাথায় মাখিয়া বলিল,

"মা না হয় বুড়োমানুষ, একটুতে ভয়ে কেঁদে সারা হয়! তোর মুখটো অমন শুকনো শুকনো কেন দিদি? তুইও কেঁদেছিস্ বুঝি? তোরা ভাবিস্ কি যে বিশে একটা পাখ পাখালি, অমনি ধরলেই হলো!—নয়?"

দিদি বলিল, "বিশু, কেনই বা তুই ও ছাই ব্যবসা করিস্? বাপ পিতেমহ চাষবাস করে যা করেছিল, ডাকাতি করে তার চেয়ে বেশী তুই কি কর্‌লি ভাই! কেবল পরের পেট ভরাচ্চিস্, আর নাম কিন্‌চিস্! নক্ষী ভাই আমার, ও সব ছাড়, মা তোকে আর কোথাও বেরুতে দেবে না।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া দিদিকে কহিল, "তুই বুঝি, মাকে এই সব কু পরামোশ দিয়েছিস্? তাই বলি, মা এমন করে ত কখন কাঁদে না, আজ কেন বছরকার দিনে কাঁদবে! তা আর দেরি করিস্‌নে। এক ঘটী জল আন। খেয়ে পালাই।"

মা বলিল, "হাঁ, যাবি বই কি? আজ রাত্তিরে কোথাও যেতে পাবিনে।"

বিশ্বনাথ কোন কথা শুনিয়াও শুনিল না। কথাটা চাপা দেওয়ার ভরসায় সে বলিল, "মা! কাপড় সব বিলি করে দিইচিস্? ঐ ত্যাখ্‌ আর এক পুঁটুলি এনেচি। যদি কাউকে দেওয়া বাকী থাকে, দিস্!"

বুড়ী হাসিয়া বলিল, "ও সব ভোগা রেখে দে! তুই আমার পেটে হয়েচিস্, কি আমি তোর পেটে হয়েচি! আর তোর কোথাও যাওয়া হবে না। যদি যাস্, আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব,—ঠিক বল্‌চি বিশু!"

বিশু মাতার পৃষ্ঠে আদরের হাত বুলাইয়া ক্ষীণ হাসি হাসিল। "মা, কোম্পানি যে রকম বাদে লেগেচে, তোমার কোলে থাকতেও ভয় হয়।

বুড়ী বিশুর হাত ধরিল। আবার সেই লোল গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারার উপর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। বলিল, "বিশু, ছেলেবেলায় কোম্পানির সিপাইদের নাম শুনে কত ডরাতিস্; যে শোলোক বলে নাচ্‌তিস্, তা কি তোর এখন মনে পড়ে না—

কি হলোরে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মার্‌বে তীর মীরমদনের গায়॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে।
একেলা মীরমদন সাহেব কত নেবে সয়ে॥

মীরমদন পীর ছিল, কোম্পানির সঙ্গে নড়তে গিয়ে সে মরে গেল। অমন নবাব সেরাজউদ্দৌলা, তার রাজ্যি ছারখার গেল। দুঃখিনী বাগ্দীর ছেলে তুই, কি ভরসায় তুই কোম্পানির সঙ্গে যুঝ্‌তে চাস্? দিদি তো ঠিকই বলেচে, এ ছাই ব্যবসা ছাড়!"

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। মা বলিয়া চলিল,

"কতবার বলেচি বাবা, এ ছাই ব্যবসা ছাড়্। এতদিন শুনিস্‌নি, এখন শোন্। এত টাকা যে আন্‌লি, ঘরে কি রাখ্‌তে পেরেছিস্ বাপ্? পাপের টাকা থাকে না। নিজের সুখ বাড়াতে পেরেচিস্? তোর দৌলতে কত পূজো স্বস্তেন্ করলাম, কত বামুনের বিয়ে পৈতা দেলাম, তাতে কি হলো বল্? বউ-মাটি পর্য্যন্ত ছেলে বিয়তে গিয়ে মারা গেল! আহা অমন লক্ষ্মী বউ কি আর হয়! ডাকাতি এমনি পাপ! ও পাপ ছেড়ে বাপ আমার চাষবাস কর্, আবার বিয়ে কর্; ছোট মেয়ে যদি বিয়ে না কর্ত্তে চাস্, ইট্‌লের সেই মেয়েটিকে এনে সাঙ্গা কর। আমাদের তেঁতুলে বাগ্দীর ভেতর ত সে চলন আছে।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "মা তোমার কথা এইবার সত্যি সত্যি শুনব। আর একদিন মাত্তর একটা জায়গায় ডাকাতি করব। অনেক-গুলো টাকা পাব। তার পর সত্যি সত্যি এ ছাই ব্যবসা ছেড়ে দেব। দলের লোকগুলকে আজই বিদায় দেব। কিন্তু মা, মা কালী বুঝি আর তোমার বিশুকে রক্ষে করেন না।"

আমার, অমন কথা মুখে আনিস্‌নে বিশু!" চক্ষু মুছিয়া বুড়ী দাঁড়াইয়া উঠিল।—"মা কালী আমার বাস্তু দেবতা! ভয় কি বাপ? আমি মানত করচি রক্ষাকালীর পুজো দেব!"

তখন মাতার চরণধূলি মাথায় মাখিয়া বেগে বিশ্বনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গ্রামের কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিল না। একেবারে গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইল। সেখানে দীঘির ঘাটের উপর বটগাছের ছায়ায় লুকাইয়া সমস্ত দিন মেঘা সোৎসুকে অপেক্ষা করিতেছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রণ্‌পায় উঠিয়া দুই জনে পাশাপাশি ছুটিয়া চলিল। জনশূন্য, সচরাচর বৃক্ষগুল্মাদিশূন্য, সীমাপরিশূন্য প্রান্তরের পর প্রান্তর উভয়ে দ্রুতগতি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শারদ কৌমুদী সর্ব্বত্রে রজত সুষুপ্তি বিস্তার করিতেছে। মাতা প্রকৃতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বঙ্গের সুখোৎসব-অবসানদিনে স্নিগ্ধবিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। গ্রামসন্নিহিত যে সব শ্যামল প্রান্তর কালিকার নিশীথে উৎসব-বাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, আজ তাহারা নীরবে তারকাসনাথ সুনীল আকাশের বিরাটমূর্ত্তির পানে বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। সকলই শান্ত সমাহিত—কেবল ঝিল্লীরব আপন মনে শব্দিত হইতেছে। ভাব-চক্ষে বিজয়াদশমীর জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী বাস্তবিক বড় অবসাদময়ী। বিসর্জ্জনের যে করুণ ভৈরবী প্রভাতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার পূরবীর বিদায়গানে তাহা অশ্রুনীর সঞ্চিত করিয়াছে। নিশাসমাগমে, বিষণ্ণ প্রকৃতির মুখে তাহাই আবার বেহাগ রাগের উদাস গাম্ভীর্য্য প্রকটিত করিতেছে।

বিশ্বনাথ কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মনটা ভাল ছিল না। বিশু নিজে হইতে কোন কথা বলে না দেখিয়া মেঘা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "বিশু, এমন লুকিয়ে লুকিয়ে আর ক দিন চলবে বল? এত দিন আমি তত ডরাই নেই, কিন্তু এখন আর ভরসা হচ্চে না!"

বিশ্বনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ,—জানিস্ তো?"

মেঘা চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বনাথ বুঝিল, কথাটা মেঘার ভাল লাগে

বড় বড় দল পুষে এখন কেবল বেহাত হওয়া। বেশীর ভাগ লোককে বিদায় দিয়ে কেবল বাছা বাছা কাণীর পাক্ জন কয়েককে সঙ্গে রাখ।

বিশ্বনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "মেঘু, তোর কথাই ঠিক্, কিন্তু আমি বলি কি, একটু আশা ভরসা না থাকলে এই দুর্দ্দিনে দলের লোকগুলো শত্রু হয়ে উঠতে কতক্ষণ ? স্পষ্ট করে সব কথা খুলে বল্‌লে দলের বেশীর ভাগ লোকের চোকে আমার মানসম্ভ্রম কিছুই আর থাকবে না, মেঘু। তা আমি করচিনে। সাহসই লক্ষ্মী। আজ আমি সবাইকে মিষ্টি কথায় বিদায় দেব। ফেডি * সাহেবের কুঠী লুঠ করি আগে। তার পর তোর পরামর্শ মত চলাই ঠিক।"

মেঘা বলিল, "কিন্তু ফেডি সাহেবের কুটী লুঠ করা কি বড় সহজ ভাবচ বিশু ? ম্যাজিষ্টার সাহেবের কুটীর অত কাছে! তা ছাড়া, কথায় বলে গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেল। দাদনের টাকা এখনও এসে পৌছায় নি।"

বিশ্ব। নীট্ খবর না পেয়ে কি কোন কাজে আমি কখন যাই ? টাকার জন্যে জরুরি তাগিদ ক দিন হলো কল্‌কাতায় রওনা হয়ে গেছে। এলো বলে টাকা। অমাবস্থার ভেতর কাজ সাফ করতে হবে।

আর কোন কথা হইল না। রাত্রি পাঁচ দণ্ডের ভিতর উভয়ে ব্রাহ্মণীতলায় ফিরিয়া আসিল।

সেই সমবেত উন্মুখ দস্যুসেনার সঙ্গে সে রাতে দলপতির কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহার সবিশেষ পরিচয়ের স্থল এ নহে। বিশ্বনাথ সকলের সঙ্গেই কোলাকুলি করিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল। প্রত্যেককে অনুরোধ করিল, দেওয়ালীর দিন রাতে যেন কৃষ্ণনগরের নীল বনে লুকাইয়া থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মাঝখানে গোটাকতক কথা ছাড়িয়া গিয়াছি। এইবার সে ত্রুটি সংশোধন করিব।

প্রত্যাখ্যাতা সরলা নৌকায় আসিয়া উঠিলে, একটু পরে বদনও আসিয়া জুটিল। নিজের অপহৃত সেই পেটারিটি তাহার হাতে দেখিয়া সরলা অতিশয় বিস্মিত হইল। বদনের কাছে শুনিল, এইমাত্র স্বয়ং বিশ্বনাথ দিয়া গিয়াছে। মনের তখনকার অবস্থায় সেই উত্তরেই সরলা নীরব হইল—তখন আর কিছু সুধাইল না। বদন দিদির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে আর কেন ? নৌকা বাড়ী ফিরে চলুক!" সরলা বলিল, "না

ভাই, বাড়ীতে আর এ মুখ দেখাব না। তুই আমায় গঙ্গার পথে নবদ্বীপে নিয়ে চল্!"

ও দিকে কাল্নার সেই ব্যাপারের পর ভগবান মেয়েটিকে তাহার মামার বাড়ী রাখিয়া আসিল। বিশ্বনাথ বুঝিয়াছিল, বৈদ্যনাথ যখন গোয়েন্দা দাঁড়াইয়াছে, আড্ডাগুলিতে তাহার নিজের বসবাস আর কর্ত্তব্য নহে। স্বরূপগঞ্জের আড্ডার উপর যে শত্রুদের সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি পড়িবে, তাহাও দলপতি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। বিশ্বনাথ ইংরেজ-চরিত্র কতকটা বুঝিত। জানিত, এই বীরজাতি স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা যেমন বোঝে, আর কেহ তেমন নহে। সরলার নৌকা ঘূর্ণির স্রোতোমুখে গিয়াছে, সে খবর পাইতে তাহার দেরি মাত্র হইল না। ভগবানকে অনুরোধ করিল, মা ঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া যেন স্বরূপগঞ্জের বাটীতে বাস করিতে প্রবৃত্ত করে। ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া নিজে বিশ্বনাথ বিক্রম সিংহের গৃহে গেল। মীরাকে সরলার সকল সংবাদ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি সেই দুঃখের দিনে অনাথা বালিকার কোন উপকার করিতে পারেন কি না। মীরা তখনও নিজে শোকাচ্ছন্ন। চক্ষু মুছিয়া বলিল, "যাঁর বলে উপকার কিছু করলে করতে পারতাম তিনি ত আর নেই! আমি কি করতে পারি?" পীতাম্বর বলিল, "দিদি, বিশ্বনাথ আমাদের বড় ভেয়ের মত। বাবার মৃত্যুকালে তিনি যে উপকার করেচেন, আমাদের বংশে কেউ কখন তা ভুল্বে না। তুমি শোকে অধীর হয়েচ। বাড়ীতে থেকে সাম্লে উঠতে পার বোধ হয় না। তুমি কেন দিন কতক সরলাকে নিয়ে গঙ্গাতীরে বাস কর না!" বিশ্বনাথ ইহাই চায়, বালিকা সরলার কাছে এক জন অভিভাবিকা স্ত্রীলোক থাকার একান্ত প্রয়োজন সে অনুভব করিতেছিল। প্রকাশ্যে পীতাম্বরের কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "এতে দিদিঠাকৃরুণের মনও ভাল হবে, সে অনাথা মেয়েটিরও উপকার হবে!" অতএব কিছু দিনের মধ্যে পীতাম্বর নিজে দিদিকে স্বরূপগঞ্জে রাখিয়া গেল।

সেখানে দুই চারি দিন বাস করিয়া মীরার অভিলাষ হইল, পিতার দাহস্থলে একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া দিবে। পীতাম্বরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিল, একটি শিবমন্দির এবং সচরাচর গঙ্গাবাসের জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। স্বরূপগঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য পীতাম্বরের এরূপ ভাল লাগিয়াছিল যে, অবিলম্বে এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করা

সব তথক্ষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। শিবমন্দিরের মালমসলা সংগৃহীত হইয়াছিল। পূজার পর সুরু হওয়ার কথা।

বিশ্বনাথের কৌশল এবং দূরদৃষ্টি কতটা সফল হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

সাহিত্যে খুন।

সকলেই, বোধ হয়, জানেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। যাহার শ্রবণ এবং অধ্যয়ন পর্য্যন্তই শেষ হয়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে, এবং যাহার সেই পর্য্যন্তই শেষ নহে, যাহাকে অভিনয়ে পরিণত এবং জীবনদান করিয়া কাব্যকল্পনাকে কার্য্যে এবং ব্যবহারে আবার প্রতিফলিত এবং দশজনের চক্ষুর সমক্ষে প্রদর্শিত করা হয়, তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহে। এজন্য দৃশ্য-কাব্যের অন্যতর নাম রূপক—যাহাতে কাব্যে রূপ আরোপিত করে, তাহাই রূপক। বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। যাহা দ্বারা মনের প্রীতি ও আনন্দ না জন্মে, তাহা রসই নহে। সহৃদয় জনগণের চিত্তে করুণাদি স্থায়ী ভাব, বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে, তাহাকেই রস বলে। কাব্য-শরীরকে এরূপে গড়িতে হইবে, যদ্দ্বারা সহৃদয় লোকের চিত্তে আনন্দ জন্মিতে পারে, এবং সেই কাব্য অধীত বা অভিনীত হইলে কোন বিশেষপ্রকার ফলোদয় ঘটে। যদ্দ্বারা কোন বিশেষ প্রকার ফলোদয় না ঘটে, তাহা কাব্যই নহে। দণ্ডী কাব্যশরীরের এইরূপ লক্ষণ দেন :—

"শরীরং তাবদিষ্টার্থ ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"

যে পদাবলীর কোন বিশেষ ইষ্টার্থ আছে, তদ্দ্বারা কাব্যশরীর গঠিত হয়। ইষ্টার্থ কি? না

সহৃদয়বেদ্যোঽর্থঃ।

তবেই দেখা যাইতেছে, কাব্য প্রীতিপ্রদ হওয়া চাই, এবং তদ্দ্বারা কোন ইষ্টার্থসাধন (desired effect) চাই। কাহাদের ইষ্টার্থ?—সহৃদয় জনগণের।

বলা যাইতে পারে। শ্রব্য কাব্যই হউক, বা দৃশ্য কাব্যই হউক, সকল কাব্যই উক্তরূপ রসাত্মক হওয়া চাই। লোকের রুচি নানাবিধ হওয়াতে, শ্রব্য কাব্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রব্য কাব্য কেবল অধ্যয়ন বা শ্রবণ মাত্রেই শেষ হয় বলিয়া, তাহাতে সুরুচিকে বজায় রাখিয়া যত দূর স্বাধীনতা চলে, দৃশ্য কাব্যে তত দূর চলে না ; যেহেতু দৃশ্যকাব্যকে আবার অভিনয়ে জীবিতমূর্ত্তিতে দেখাইতে হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য-বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি প্রভৃতি শ্রব্য কাব্যে চলিতে পারে, কিন্তু দৃশ্য কাব্যে তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া অভিনয়ে দেখাইতে হইলে, তাহা সহৃদয় জনগণের প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। এজন্য দৃশ্য কাব্যের নিয়মাদি অনেকপরিমাণে আরও বিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

কেবলমাত্র পড়িয়া যাহাতে আনন্দলাভ করা যায়, বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে অভিনয় দ্বারা তাহাকে মূর্ত্তিমান করিলে হয় ত তদ্দ্বারা তত দূর আনন্দ না জন্মিতে পারে। যাহাতে সেই আনন্দের ব্যাঘাত হয়, নাটককারগণ তাহা অতি সাবধানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, যাহা সহৃদয় জনগণের রুচির প্রতিবিরোধী হয়, যাহা বাহ্যদৃশ্যে ও ব্যবহারে লজ্জাকর, এমন সকল অনুষ্ঠান কাজেই দৃশ্যকাব্যে সংযোজিত হইতে পারে না। এজন্য সাহিত্য-দর্পণ-কার বলিতেছেন :—

> "দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
> বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গো মৃত্যুরতস্তথা॥
> দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
> শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যুপরোধনম্॥
> স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জ্জিতো নাতিবিস্তরঃ।

নাটকে কি কি পরিবর্জ্জনীয়, আলঙ্কারিক তাহা বলিতেছেন—দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেশাদিবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদ, এবং নখচ্ছেদ প্রভৃতি ব্রীড়াকর ব্যাপার, শয়ন এবং অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ (Blockade) এবং স্নান ও শরীরে অনুলেপন।

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের আলঙ্কারিকেরা নাট্যকে হত্যাব্যাপার নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে হত্যাব্যাপারে লোকের প্রীতি উৎপাদন করা দূরে থাক্, তদ্দ্বারা সহৃদয় জনগণের মনে অত্যন্ত ঘৃণার

সম্ভাবনা। সেরূপ ক্রোধাদ্রেক হইলে লোকে এত দূর উত্তেজিত হইতে পারে যে রঙ্গভূমে হয় ত সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ সেই অভিনীত হত্যাকাণ্ডের উপর আর একটা হত্যাকাণ্ড বাধাইতে পারেন। রক্তমাংসশরীরে এরূপ একটি হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া স্থিরভাবে বসিয়া কে সহ্য করিতে পারে ?—

Desdemona. O. Banish me, my lord, but kill me not.

Othello. Down Strumpet !

Des. Kill me to-morrow, let me live to-night.

Oth. Nay, if you strive,—

Des. But half an hour,

Oth. Being done,

There is no pause,

Des. But while I say one prayer.

Oth. It is too late. (He smothers her.)

এ দৃশ্য কখন ঘটিতেছে, যখন সমস্ত শ্রোতৃবর্গ বিলক্ষণ জানিয়াছেন, ডেস্‌-ডিমোনার কোন দোষ নাই। সেই নিরপরাধা, সরলা, বিশুদ্ধপ্রেমপ্রাণা পতিপরায়ণা কেবল মূর্খ ও নির্ব্বোধ পতির সন্দেহাগ্নিতে পতিতা হইয়াছেন। পতি, সেই সন্দেহাগ্নিতে কোপান্বিত হইয়া অনর্থক সেই সরলাকে হত্যা করিতেছেন। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্বচক্ষে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন ? তাঁহারও কি কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না ? তিনিও কি রঙ্গভূমিতে দৌড়িয়া গিয়া, ওথেলোকে নিরতিশয় প্রহার দিয়া গায়ের রাগ মিটাইতে যাইবেন না ? তাহা হইলেই রঙ্গভূমিতে আর এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়। একজন প্রতারিত বুদ্ধিহীন মুরের মত লোকের প্রতি কিছু এত সহানুভূতি জন্মিতে পারে না যে, নিতান্ত নিরপরাধা স্ত্রীর হত্যা তাহার সহ্য হইবে। কোন ঘোর মহাপাতকীর খুন হইলে তবু লোক বলিতে পারে, কি হইবে ? রাগের মাথায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি স্ত্রীহত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পাপীয়সী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। গোঁয়ার লোকের প্রতি কাহার দয়ার সঞ্চার হইতে পারে ? হিন্দুর চক্ষে যে আদর্শ রহিয়াছে, প্রকৃত সহৃদয় হিন্দুর যাহা রুচি হওয়া উচিত, হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্ম্মের যাহা বিধান, স্ত্রীহত্যা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আবার সেই

কোন্ হিন্দু পড়িতে বা দেখিতে পারেন ? দেখিলে, সহ্য করিতে পারেন ? সে-রূপ স্ত্রীহত্যা দেখাতে কি মনের মলিনতা জন্মে না, অন্তরে পাপস্পর্শ হয় না ? সুতরাং তাহা দেখাতেও পাতক আছে।

প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে এই স্ত্রীহত্যার অভিনয় প্রদর্শন করা হিন্দু ধর্ম্মাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। রঙ্গভূমিতেই তদ্দ্বারা যে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। পাছে রঙ্গভূমিতে এইরূপ অনর্থ ঘটে, পাছে হত্যা-দর্শনের পাপ লোকের কল্পনাকে মলিন করে, তাই আমাদের নাটককারগণ কোনখানে এরূপ হত্যাব্যাপার প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের নব নাটকে এরূপ একটিও দৃশ্য নাই। বাস্তবিক যাহা ইউরোপে Tragedy বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ, তাহা হিন্দু ধর্ম্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত হইয়াছে। সেই ট্র্যাজিডি এ দেশে আসিয়া কি অনর্থই না ঘটিয়াছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে যেরূপ উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। হিন্দুর রুচি এবং হিন্দুর হৃদয়ের সহিত তাহা মেলে। ইউরোপে সে আদর্শ কোথায় পাইবে ? আমরা সাহিত্য-দর্পণ হইতে নাটকের যে নিষেধবিধি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আমাদের নাট-কীয় আদর্শ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইউরোপে নাটকীয় আদর্শ গ্রীস হইতে প্রথমে গৃহীত হয়। তৎপরে তাহার বিবিধ ব্যতিক্রম করা হয়। নানা ইউরোপীয় জাতির রুচি অনুসারে এই সকল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু কি গ্রীক জাতি, কি অপরাপর ইউরোপীয় জাতি, কোন জাতিরই ধর্ম্মাদর্শ হিন্দুর মত নহে, সুতরাং তাহাদের রুচিরও বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল। এ জন্য ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য কোন কালে হিন্দু নাট্যসাহিত্যের আদর্শে উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যেরূপ রুধিরপ্রিয়, যেরূপ কঠিনস্বভাব, তাহাদের নাট-কীয় আদর্শে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। স্পার্টার নিয়মাদি কিরূপ নিষ্ঠুর ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীস ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে। এথিনীয়েরা দেশের অনেক বড় বড় ভদ্র ও দেশহিতৈষী লোককে নির্দ্দয়রূপে নিপীড়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা সক্রেটিসকে তাঁহারা এক রকম বিষপানে বধ করিয়া-ছিলেন। বিষপান করিয়া সক্রেটিস আপনার ধর্ম্মানুরাগ ও তেজ রক্ষা করিয়া-ছিলেন। সেই মহাজনের বিষপান তাহারা স্বচ্ছন্দে দেখিয়াছিল। ক্ষমা বুঝি

সেই নির্ম্মম ও নির্দ্দয় দেশ হইতে ট্র্যাজিডির উদ্ভব। সে ট্র্যাজিডি যে রক্তারক্তি ও নির্দ্দয় ব্যবহারে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

আর যাহারা এই ট্র্যাজিডি গ্রীক সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অপরাপর ইউরোপীয় জাতিগণ কিরূপ ছিলেন ? আমি বার বৎসর পূর্ব্বে "আর্য্য-দর্শনে" যাহা লিখিয়াছিলাম, আজি তাহা আর একবার আবৃত্তি করি :—

"অতি প্রাচীন কালে সেই যে ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ব্বর জাতিসমূহ অত্যন্ত নির্দ্দয়স্বভাব ছিল, আজিও যেন তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত আধুনিক জাতিমধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ নৃশংসাচরণে যেরূপ আমোদ প্রাপ্ত হইত, সে আমোদ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। স্পার্টানগণের নৃশংসাচরণ, রোমানদিগের গ্লাডিয়েটরের ক্রীড়া আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। মধ্যযুগের ইতিহাস নররুধিরে কি ভয়ঙ্কররূপে প্লাবিত রহিয়াছে। ক্রুসেডের রক্তপাত, ইন্‌কুইজিসনের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিবরণ পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আবার দেখ, ইহুদিজাতির প্রতি উৎপীড়ন, উইচক্রাফ্‌টের শাস্তির বিবরণে যে প্রকার নৃশংসাচরণের পরিচয় হয়, কোন্ জাতির ইতিবৃত্তে তত ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত আছে ? আবার ঐ কি ? আয়র্লণ্ডের ঘোর ইতিবৃত্ত—ইংরাজগণ ও স্কটগণের ঘোর হত্যাকাণ্ড, ফ্রান্সের প্রটেস্‌টাণ্ট এবং ক্যাথলিকগণের হত্যাকাণ্ড! এ সমস্ত পড়িলে আর কি ইউরোপীয়গণকে সভ্যজাতি বলা যায় ? স্পেন আমেরিকা জয়ের সঙ্গে কি অধমতম বর্ব্বরতারই পরিচয় না দিয়াছে ? ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র পর্য্যালোচন করিয়া দেখ, তাহাদিগের পূর্ব্বকালের দণ্ডবিধান কেমন রুধিরের লোহিত বর্ণে অঙ্কিত ছিল! এই সমস্ত ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইতে থাকে যেন, ইউরোপীয়গণের প্রকৃতিই কেমন নৃশংস উপকরণে গঠিত। তাহা কিছুতেই নরম করিতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে এত উন্নত বলিয়া গর্ব্ব করা হয়, তাহাও ইউরোপে ব্যর্থ হইয়াছে, ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের নৃশংসতার অপনয়ন করিতে পারে নাই।" কারণ :—What is bred in the bone, can not come out of the flesh.

"ইউরোপীয় জাতির উল্লিখিত প্রকৃতিমূলক দোষ শুদ্ধ যে তাহাদিগের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে এমত নহে, তাহাদিগের সেই বর্ব্বর স্বভাব

রচনায় তাহা ট্র্যাজিডির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ট্র্যাজিডি শুদ্ধ ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্পত্তি। তাহা সেই সাহিত্যের গৌরব কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয়।"

বর্ব্বরস্বভাব এবং রক্তপ্রিয় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণ গ্রীক ট্র্যাজিডিকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও রুচি ট্র্যাজিডির বিষম পরিণামে আনন্দলাভ করিত। তাই ইংরাজী সাহিত্যেও এই ট্র্যাজিডি অনায়াসে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। সেক্সপিয়ারের অতুল্য প্রতিভা ট্র্যাজিডির আনন্দে মাতিয়াছিল। তাঁহার রুচি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যে, সেই ট্র্যাজিডির দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিবর্জ্জন করে। তিনি তাঁহার সমস্ত গুণপনা ও কবিত্বশক্তি সেই ট্র্যাজিডির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমস্ত সুতরাং জগতের এক অতুল্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে সেক্সপিয়ারের প্রতিভাসমুৎপন্ন কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিতেছে। আজি আমরাও সেক্সপিয়ারের পাঠক, পাঠক কি! তাঁহাকে পূজা করিতেছি; তাঁহার কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিতেছি। কালিদাস যে সাহিত্যের সিংহাসনে বসিয়া তাহা শত শোভায় শোভিত করিয়াছেন, এবং শত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সে সাহিত্যে আজি আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ব্যাস, বাল্মীকি অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিতেছেন। ভবভূতির অলোক-সাধারণ "উত্তরচরিত" অবজ্ঞাত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, সুতরাং সেই সঙ্গে সেক্সপিয়ারের সমুদায় ট্র্যাজিডির সম্মান বাড়াইতেও শিখিতেছি। সেক্সপিয়ারের অসংখ্য সুনিপুণ সমালোচকগণ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন; আমাদিগের সুকুমার রুচির বিকার সাধন করিয়া দিতেছেন। পাঁচ জনের সঙ্গে আমারাও বাঁধিবুলি শিখিয়া কেবলই বলিতেছি, সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডিগুলি জগতের অতুল্য সম্পত্তি।

কেবল এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই নাই, আমাদের নূতন রঙ্গভূমে সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। নাটক বলিলেই আমাদের নাটককারগণ অগ্রে ট্র্যাজিডি লিখিয়া বসেন। শুদ্ধ রঙ্গভূমে নহে, শুদ্ধ হাতেকলমে নহে, বাস্তবিকই আমরা এক এক সময়ে নিজে ট্র্যাজিডির অভিনয় করিয়া থাকি। বিলাত হইতে এ দেশে নানাবিধ শাণিত অস্ত্র সুলভ করিয়া

রত্নকে ডেস্‌ডিমোনার মত নৃশংসরূপে হত্যা করিতেছি। আমাদের হত্য ব্যাপারের দৃষ্টান্ত চারিদিক প্রচারিত হইতেছে। শেষে কি ভদ্র কি ইতর, কি ইংরাজীওয়ালা কি নিরক্ষর মূর্খ, সবাই অস্ত্র চালাইতে মজবুত হইয়াছে, এবং ট্র্যাজিডির অভিনয় করিয়া রক্তগঙ্গায় দেশ প্লাবিত করিতেছে।

এরূপ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কারণ, ইংরাজী নাটকে, গল্পে, কাব্যে এবং সাহিত্যে বিশেষ আদর করিয়া আমরা নানাবিধ ট্র্যাজিডি পড়িতেছি। কল্পনায় খুন রাত্রি দিন রহিয়াছে। মনে মনে সর্ব্বদা যে খুন দেখে, খুনে তাহার আর ঘৃণা জন্মে না, পাপের অপবিত্রতা অপনীত হয়। বিশেষতঃ, সাহিত্যে শিখি, যত বীর, যত বড় লোক, যত মান্য গণ্য লোক রক্তারক্তি করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমরাও সেইরূপ বীর হইতে চাই, বড়লোকের সেইরূপ কার্য্যের অনুগামী হইতে শিখি, এবং রক্তারক্তি ও খুন করিয়া পুরুষত্ব দেখাই। খুনে আমাদের নূতন অনুরাগ। ইউরোপীয় সমাজে সে অনুরাগ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

এই ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে আমি বার বৎসর পূর্ব্বে "আর্য্যদর্শনে" যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিয়োগান্ত * রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ, তাহা আর্য্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণ রস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ, তাহা আর্য্য সাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সেক্সপিয়ারের ডেস্‌ডিমোনার জন্য যেরূপ সন্তপ্ত হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, সাগরিকা, মালবিকা, মহাশ্বেতা, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি কবিকল্পিত নায়িকার জন্য কি তদপেক্ষা অনধিকপরিমাণে সন্তপ্ত হইয়া থাকি ? অথচ তাঁহারা কেহই ডেস্‌ডিমোনার ন্যায় নৃশংসরূপে নিহত হয়েন নাই। বাল্মীকি মহাকবির ন্যায় কেমন কাল্পনিক সুন্দর দৃশ্যে সীতাকে আপন কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা, নিষ্পাপিনী ডেস্‌ডিমোনা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইলেন ; সীতা কবি-কল্পিত স্বর্ণরথে দেবতাগণের পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহণ করিলেন। কিন্তু জন্মদুঃখিনী

* ট্র্যাজিডিকে বিয়োগান্ত বলিলে কিছুই বলা হইল না। বিয়োগ অনেক রকমে ঘটিতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজিডির বিয়োগ বিশেষ প্রকার ; তাহাতে রক্তারক্তি, কাটাকাটি চাই। এ জন্য ট্র্যাজিডি বিয়োগান্ত বলিলে ঠিক অনুবাদ হইল না। অথচ সচরাচর লোকে বিয়োগান্ত

সীতার দুঃখ ও ক্লেশ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মানবহৃদয়ের সহানুভূতি-মন্দিরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে।"

"সীতার দুঃখে কাতর হইয়া আমরা বাল্মীকির সহিত প্রতি ঘটনায়, প্রতি পত্রে কাঁদি, কাঁদিয়া হৃদয় কাতরতায় তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞান করি, তাঁহার হৃদয়-মাধুরী শনৈঃ শনৈঃ আমাদের হৃদয়ে জাগিতে থাকে, সীতার সকল গুণে পক্ষ-পাতী হই, সরমার সহিত অশোকবনে তাঁহার জন্য কাঁদিতে থাকি, বনবাসে লক্ষ্মণের সহিত অশ্রুপাতে ভাসাইয়া দিই। সীতা আমাদের মনোমন্দিরে অতি পবিত্র মূর্ত্তিতে চিরদিনের জন্য স্থাপিত হয়েন। সীতা ভারতবাসিগণের হৃদয় বিগলিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসিগণ সীতার জন্য চিরকালই অশ্রুবর্ষণ করিবেন।"

ভবভূতি বা বাল্মীকির সহিত এখানে সেক্সপিয়ারের তুলনা হইতেছে না। আমরা জানি, সেক্সপিয়ারের অনেক গুণ আছে, যে জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হই-বার যোগ্যপাত্র। তিনিও এক জন মহাকবি। কিন্তু এখানে Tragic রসের বিচার হইতেছে; সন্তাপের স্থায়ী ফলের কথা হইতেছে। এ প্রস্তাব কবিত্বের বিচার নহে। তাহা স্বতন্ত্র কথা। সীতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, দময়ন্তী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। চিরদুঃখে তাঁহাদের পতিভক্তি পবিত্র হইয়া গিয়াছে। চিরদুঃখিনী হইয়া তাঁহারা জগজ্জনের হৃদয়মন্দির চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া আছেন। নিহত না হইয়াও তাঁহাদের বিয়োগ জগতের নিকট চির-সন্তাপের কারণ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাদের জন্য কাতর। তবে ত হত্যা ব্যতীতও সন্তাপ সমান স্থায়ী হইতে পারে?

সে যাহা হউক, অনেকে হয় তো বলিবেন, ডেস্‌ডিমোনার জন্য কি আমা-দের হৃদয় কাঁদে না? হৃদয় কাঁদে বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড দ্বারা নিহত হইলে যে অশ্রুপাত হয়, তাহার সহিত সীতার মত বিয়োগ হেতু অশ্রুপাতের একটু স্বতন্ত্রতা আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

সেক্সপিয়ারে আমরা আইমজিন এবং ডেস্‌ডিমোনার মত পতিপরায়ণতা ও প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাই। ডেস্‌ডিমোনার প্রেম জুলিয়েটের মত 'বুক্‌চাপড়ানি' প্রেম নহে। তাহা অতি গভীর, অতি শান্ত ও হৃদয়ব্যাপী, অথচ তেমনই উগ্র, উষ্ণ ও প্রবল। সে প্রেম চক্ষের নেশা নহে। সেই প্রেম-ভূষিতা ডেস্‌ডিমোনা সর্ব্বজনমনোহরা, তাঁহার হৃদয়মাধুরীতে তিনি সকলের

ফুটাইতে ফুটাইতে ডেস্‌ডিমোনার খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তার পর পাঠক ডেস্‌ডিমোনার খুনের নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে ও ঘোর হত্যাব্যাপারে নিমগ্ন হইলেন। ডেস্‌ডিমোনা নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন! কি বীভৎস ব্যাপার! ডেস্‌ডিমোনার সৃষ্টি কি কেবল এইরূপ ঘোর হত্যাব্যাপারের নিমিত্ত? তাহার হত্যাব্যাপার দেখিয়া কি অশ্রুপাত হয়? না, শরীর শিহরিয়া উঠে? ডেস্‌ডি-মোনার পর এমেলিয়া নিহত হইল। মনে হয়, সেই ছুরিকাঘাত যেন নিজ বক্ষে বিঁধিল। কি ভয়ানক!

ম্যাকবেথে আরও ঘৃণিত ব্যাপার। ম্যাকবেথের সর্ব্বত্র হত্যা;—তাহার গোড়ায় হত্যা, তাহার মধ্যে হত্যা তাহার শেষে হত্যা। প্রথমে ডনক্যান, মধ্যে ব্যাঙ্কো, শেষে নিজে ম্যাকবেথের হত্যা,—নাটকের প্রায় সমুদায়ই কসাইখানা। মধ্যে যখন লেডি ম্যাকবেথ উদয় হইয়া বলিতেছেন, আমার রক্তহস্ত যে কিছুতেই ক্ষালিত হইতেছে না; তখন যেন সেই কসাইখানা আরও দেদীপ্য-মান হইতে থাকে। তাহার সামান্য অনুতাপের চিত্র সেই রক্ত-গঙ্গাকে আর ও উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দেয়। প্রকাণ্ড গৃহদাহে দু ফোটা জলের মত সেই অনু-তাপ অগ্নিশিখাকে আরও যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সে অনুতাপ বিষকুম্ভে ক্ষীরমাত্র। সেরূপ সামান্য অনুতাপচিত্রে কি ভয়ানক হত্যা ব্যাপার থাকে? নাটক মধ্যে কোন্ চিত্রের গৌরব অধিক? সমস্ত হত্যাকাণ্ডের না সেই অনুতাপচিত্রের? হত্যা, নাটকের সর্ব্বত্র; অনুতাপ, এক স্থানে মাত্র। সে অনুতাপচিত্র রক্ত-গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ঘোর হত্যাপূর্ণ নাটকের প্রলোভনস্বরূপ।

সেক্সপিয়ারের সমস্ত বড় বড় নাটকে এই বীভৎস ব্যাপার। হ্যামলেটের শেষ অঙ্কও কসাইখানা। রিচার্ড দি সেকেণ্ড, এবং থার্ড, জন, লিয়ার, কোরাও-লেনস প্রভৃতি সকল নাটকই হত্যাকাণ্ডে পরিপূর্ণ। জুলিয়স সিজরে কি ভয়া-নক রবে এই কথাগুলি প্রতিশব্দিত হয়! Beware the Ides of march! সিজরের হত্যার পর এই শব্দগুলি মনে হইলেই হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। কোথায় নাটকীয় করুণ রস! আজিও আমরা ম্যাকবেথের নাম করিলে শিহ-রিয়া উঠি, রিচার্ড দি থার্ডের ঘৃণিত ব্যাপার হইতে শত হস্ত দূরে যাই! নাটক পড়া দূরে থাক, মনে হয় আর Tragedy পড়িব না।

সেক্সপিয়ার কি জন্য তাঁহার ট্রাজিডিকেই শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া

ছেন? লিখিতেছেন Comedy, সেখানেও সেই ছুরিকা। Merchant of Venice পাঠ কর, সেখানেও তোমার চক্ষু সমক্ষে ছুরিকা শাণিত হইতেছে! নাটককে কসাইখানায় পরিণত করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এবং অতি-ঘৃণিত ব্যাপার। এই দেখুন সুরুচিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক Addison কি বলিতেছেন:—

But among all our methods of moving pity or terror, there is none so absurd and barbarous, and which more exposes us to the contempt and ridicule of our neighbours, than that dreadful butchering of one another, which is so very frequent upon the English stage. To delight in seeing men stabbed, poisoned, racked, or impaled, is certainly the sign of a cruel temper; and as this is often practised before the British audience, several French critics, who think these are grateful spectacles to us, take occasion from them to represen us as a people that delight in blood. It is indeed very odd to see our stage strewed with carcases in the last scenes of a tragedy, and to see in the wardrobe of the play-house several daggers, poniards, wheels, bowls for poison and many of the instruments of death."

এডিসন রঙ্গভূমিতে রক্তারক্তি করাকে যেরূপ জঘন্য ও বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হত্যা ও খুন কখন মানুষের আনন্দজনক হয় না। নাটক নবরসের আশ্রয়ভূমি। Tragedy করুণ ও ভয়ানক রসের আশ্রয়। হত্যা বা খুন কখন ভয়ানকের চরমসীমা নহে। রসের পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাকে আনন্দজনক করা চাই। যাহা আনন্দজনক না হয়, তাহা রসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু শাণিত ছুরিকা বসাইয়া হত্যা করাতে কি আনন্দানুভব হয়, না ঘৃণার সঞ্চার হয়? হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমরা ভয়ানকের নিশ্চয় রসভঙ্গ সাধন করি। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করাতে, রসের পরিপাক হয় না; তাহা কবিত্বের হানিজনক এবং রসভঙ্গদোষে দুষ্ট হয়। Butchery is not poetry.

কবিত্ব নাই, এমন কথা বলিতে চাহি না। আমরা সাহিত্যে শুদ্ধ খুনেরই নিন্দা করিতেছি। খুন না করিলে কি করুণ রসের পরিপুষ্টিসাধন করা যায় না? যিনি না করিতে পারেন, তিনি বিভাবাদি দ্বারা রসের পরিপাকসাধনে নিতান্ত অসমর্থ। তাঁহার সে রস গ্রহণ করাই অন্যায়। খুনের প্রতি মানুষের স্বভাবতই ঘৃণা। খুনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য নাট্যসাহিত্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। যে কার্য্য হইতে ভদ্র সমাজ স্বতঃই নিবৃত্ত, সাহিত্যে তাহার উজ্জ্বল চিত্র ধরাতে বরং বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। একটা সমগ্র রাজবংশ মধ্যে কয়টা হত্যাকাণ্ড ঘটে? আমি যুদ্ধের কথা বলিতেছি না। রাজ্যলোভে অরঙ্গজীবের হত্যাকাণ্ডের মত হত্যার কথা বলিতেছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে ওথেলোর ন্যায় কয় জন লোক দেখা যায়? বাস্তবিক, সেক্স-পিয়ার ওথেলোকে যেরূপ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ওথেলোও যেন কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লোক তত দূর নির্ব্বোধ হয় কি না সন্দেহ,—বিশেষতঃ ওথেলোর মত একজন বীর সেনাপতি। সেক্স-পিয়ারের কিংজনে যে স্থলে হিউবার্ট উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা আর্থরের চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে আসিয়াছে এবং সেই কার্য্যের উদ্যোগ হইতেছে, সে স্থলের অভিনয় কতই না ঘৃণার উৎপাদন করে! রক্ষা এই, শেষে সে কার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেখা গেল, নৃশংস (John) জনের পীড়নের জ্বালায় সেই রাজপুত্র কারাবাসের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া মরিল। তাহার আত্মহত্যা কাহার না হৃদয়ে অনর্থক বেদনার উৎপাদন করে? এরূপ বীভৎস চিত্রের ফল কি? রাজ্যলোভের ঘৃণিত পাপচিত্র দেখাইবার জন্য কি এ চিত্রের অবতারণা? কয় জন রাজাই বা সেরূপ ঘৃণিত হইতে পারেন? হইলেই বা কিসে সে লোভ হইতে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে? তবে সে চিত্র সাধারণ লোকের সম্মুখে কেন? নাটক কিছু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের সম্পত্তি ইতিহাসে রাখিয়া দিলেই ভাল ছিল। সেক্সপিয়ার যেখানে Butchery না করিয়া ট্র্যাজিডি রচনা করিয়াছেন, আমরা সে রচনার যারপরনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার অনেক Tragi-Comedy এই ধাতুতে গঠিত। সেরূপ রচনাকে আমি ট্র্যাজিডি শ্রেণীভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত নহি। আইমজিন তত কষ্ট সহ্য করেন নাই যে, তিনি চিরদুঃখিনী দময়ন্তী বা সীতার মত জগতের সন্তাপভাজন হইতে পারেন। সিম্বেলিন বিয়োগান্ত হইলে যদি আইমজিনের সহিত লিয়নিটসের

সীতার সহিত শেষে শ্রীরামের মিলন না হওয়াতে তাঁহার বিয়োগ ব্যাপার এবং বনবাস অধিকতর কাতরতার কারণ হইয়াছে। সীতা জনকালয়ে প্রেরিত হইলে এ কাতরটা ঘটিত না। সীতার বনবাস কাব্যের করুণরসকে চরমসীমায় লইয়া গিয়াছে। বিয়োগান্ত উত্তরচরিতের স্থায়ী ফল এজন্য এত অধিক। ভবভূতির "ছায়াতে" সে ফল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। বিয়োগে কাতরতা উৎপাদন করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডে বীভৎস রসের সঞ্চার হইয়া রসভঙ্গ ঘটে। ডেস্‌ডিমোনাকে মনে হইলেই তাহার খুন মনে হয়, অমনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। সুতরাং রসভঙ্গ ঘটে।

Horace বলেন, রঙ্গভূমে প্রকাশ্যরূপে খুন করাতেই দোষ; খুন যদি প্রকাশ্য রঙ্গভূমে কৃত না হয়, তাহাতে দোষ নাই। এ কথা কোন কাজেরই নহে। খুনের নাম শুনিলেই লোকে শিহরিয়া উঠে। কলিকাতায় যে সকল খুন হয়, লোকে তাহা কি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে? না দেখিলেও হত্যাকাণ্ড শুনিলেই মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত হয়, কল্পনা রক্তারক্তি মনে চিত্রিত করিয়া দেয়! শিশুহত্যা, নারীহত্যা, স্বামিহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার নাম শুনিলেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। লোক স্বচক্ষে যেন সেই হত্যাকাণ্ড জাজ্বল্যমান দেখিতে থাকে। সুতরাং নাটকের মধ্যে হত্যাকাণ্ড আনিলেই, তাহাতে রস-ভঙ্গ ঘটে, এবং প্রকাশ্যরূপে সেই খুন দেখান বা না দেখান, উভয়ই সমান কুফল প্রসব করিয়া থাকে। গ্রীক ট্র্যাজিডি এই ঘোর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত ছিল বলিয়াই যে সে দোষ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইউরোপে নাটককারগণ তাহা গ্রহণ করিয়া কুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন; তাই বলিয়া আমরাও কি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের হিন্দু নামে ও আর্য্যগৌরবে জলাঞ্জলি দিব? ইংরাজীর অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার দোষগ্রহণে আমা-দের সতর্ক হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি চাহিয়া দেখ, সে সাহিত্য সে দোষে কলঙ্কিত নহে। স্বদেশীয় রত্নরাজি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় বর্ব্বরতার একশেষ রক্তারক্তিতে হাত কলুষিত করি কেন?

সেক্সপিয়ার এদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বসাধারণগ্রাহ্য বলিয়া, আমি তাঁহারই দৃষ্টান্ত দিয়া এ প্রস্তাব লিখিয়াছি। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমস্ত যত লোকে পড়িয়াছে, তত অন্যান্য ইংরাজী নাটক নিশ্চয় পড়ে নাই। এমন কি, সেক্সপিয়ার আমাদের কলেজের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন। অতি

নিষ্ফলতা হেতু কখন কখন কোন কোন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রকেও আজিকালি আত্মহত্যা করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মহত্যা পাপে তাহাদের ঘৃণাবোধ হয় নাই। আত্মহত্যার প্রতি তাহাদের ধর্ম্মভীরুতা জন্মে নাই। কারণ, যে সাহিত্যে তাহারা শিক্ষিত, তাহাতে যে আত্মহত্যা করা মহাপাপ, এমন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। সে আদর্শ সংস্কৃত কাব্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির সাহিত্যে আছে কি না, জানি না। ইংরাজেরা যাহাই বলুন, তাঁহাদের রুচি লইয়া আর্য্য রুচিকে দূষিত করা কখনই বিধেয় নহে। এ বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

এই কুরুচিতে আমরা এত দূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি যে, এখন আমরা ইংরাজী সাহিত্যের কোনরূপ নিন্দা সহিতে পারি না। যাহা বাস্তবিক নিন্দার্হ, তাহারও নিন্দা করিলে শরীর জ্বলিয়া উঠে। আমরা সেই সাহিত্যের এত দূর পক্ষপাতী হইয়াছি যে, তাহার নিন্দা শুনিলে দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্যের তদ্রূপ দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে যাই। কিন্তু একজনের দোষ ও পাপ যে অন্যের দোষ ও পাপ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না, তাহা স্মরণ করি না। শ্যাম, রাম ও হলধরের দোষ দেখাইতে পারিলে কি জলধরের দোষ ঢাকে? তথাপি কেমন পক্ষপাত, সংস্কৃত সাহিত্যের দোষ উল্লেখ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের দোষ ঢাকিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমরা বাস্তবিক এ কথার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। Merchant of Venice নামক নাটকে যেরূপ ছুরিকা শাণিত হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করাতে কোন লোক বলিয়া উঠিয়াছিলেন, তোমাদের সীতার অগ্নিপরীক্ষা কি? আমি উত্তর করিয়াছিলাম, তাহা পরীক্ষামাত্র, তাহাতে সীতা পুড়িয়া মরেন নাই; যদি সংস্কৃত কোন কোন কাব্য বা নাটকে অগ্নি দ্বারা নায়কনায়িকার হত্যাব্যাপার সাধিত হইত, তাহা হইলে অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারে ভয় হইবার সম্ভাবনা ঘটিত, এবং সদৃশ কাণ্ড বলিয়া উল্লেখযোগ্য হইতে পারিত। কিন্তু যখন অগ্নিদাহ ব্যাপার সংস্কৃত সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না, তখন অগ্নিপরীক্ষা ও ছুরিকা শাণিত করা, সমান বা সদৃশ ব্যাপার নহে। জতুগৃহদাহ একটি প্রহসন (Farce) মাত্র। রামায়ণে যেমন অনেক অদ্ভুত কাণ্ড আছে, অগ্নিপরীক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম।

ইংরাজী সাহিত্যের খুন সমর্থনার্থ অনেকে বলেন, তাহা স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু সীতার স্বর্গারোহণ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ব্যাপার। ট্র্যাজি-

কিরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার, বলিতে পারি না। পাপমাত্রই মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কাণ্ড যে পাপের চূড়ান্ত। হত্যার মত জঘন্ত ও সর্ব্বজন-ঘৃণিত পাপ কি আর আছে? এই স্বাভাবিক ব্যাপার কবি নাটকমধ্যে আনেন কেন? তাহা নাটকীয় কৌশলমাত্র। যখন সীতা স্বর্গারোহণ করিলেন বা পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন, যখন যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন, রাম সরযূতে মিশাইয়া গেলেন, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি হিমালয়ের মহাপ্রস্থানে অদৃশ্য হইলেন, তখন সকলেই জ্ঞান করিলেন, কবি সেই কৌশলে তাহাদিগকে কাব্য হইতে অপসৃত করিয়া লইলেন। খুন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে অপসারণ করা অপেক্ষা এরূপ অপসারণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। খুন করিয়া অপসারণ করা নাটকীয় কৌশল ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তদ্রূপ পাতালপ্রবেশ ও স্বর্গারোহণাদিও কৌশলবিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সকলেই তাহা সেই অর্থে বুঝিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা গ্রন্থ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হয়। কিন্তু ট্র্যাজিডির হত্যাকাণ্ড দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে, এক বীভৎসকাণ্ডে পর্য্যবসিত হয়। এরূপ পর্য্যবসান নিতান্ত নিন্দনীয়।

কেহ কেহ বলিবেন, হত্যাকাণ্ড যে সকল স্থানেই নাটকীয় কৌশল, এমন নহে; কোন কোন স্থানে তাহা অবশ্যম্ভাবী। ডেস্‌ডিমোনার হত্যা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, তাহা ওথেলোর আখ্যানবীজমধ্যে নিহিত; নহিলে ওথেলো-চরিত্রের পরিপুষ্টি সাধন হয় না। ওথেলোর পরিণাম ঘটনার পর্য্যায়-ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু আমরা বলি, এরূপ স্থলে বিষয়-নির্ব্বাচনের দোষ। যে প্রতিভা ঘটনাচক্রকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে না পারে, সে প্রতিভারও ত্রুটি আছে। সেক্সপিয়ারে প্রতিভার দোষ নহে, সেক্সপিয়ারে রুচির দোষ—সে রুচি এরূপ হত্যাব্যাপারে আনন্দ পাইত, সে রুচি একজন কৃষ্ণকায় মুরকে ঐরূপ নির্দ্দয় পামর রূপে চিত্রিত করিতে বড় আমোদ লাভ করিত। সেক্সপিয়ারের শুদ্ধ নিজের রুচি নহে, তখনকার কালের রুচি ঐরূপ ছিল, ইংরাজ জাতির রুচি ও প্রবণতা একজন মুরকে ঐরূপ চিত্রিত দেখিতে বড়ই আনন্দলাভ করে। আজিও এই রুচির পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি। তবে দুই দশ জন যদি এ রুচির বিরোধী থাকেন, তাঁহা-দের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

আমাদের দেশীসংস্কারের বিষয়নির্ব্বাচনে এইরূপ দোষ দেখা যায়। যে

বন্ধন হইবে, সে বিষয় নির্ব্বাচনের দোষ বলিব না ত কি? ভট্টনারায়ণের অন্তবিধ পর্য্যবসান করিবার সাধ্য ছিল না।

ইংরাজী ট্র্যাজিডির দোষ এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে প্রচুরপরিমাণে গৃহীত হইতেছে। নিজে বঙ্কিমও এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনীর বিষপান এক্ষণে অনেক গৃহস্থসংসারে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। আত্মহত্যায় যে ঘোর পাপ, এখন সে ঘোর পাপের ভয় আমাদের অনেক স্ত্রীলোকের মন ও কল্পনা হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মভীরুতা বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা রঙ্গভূমে ম্যাক্‌বেথ দেখিয়া আসিয়া সাহসিনী হইতেছে। ম্যাক্‌বেথের বিষ ছিল কেবল ইংরাজী ভাষায়, এক্ষণকার কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আনিয়াছেন। পরের পাপ ঘরে আনিয়াছেন।

ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত বলিয়া উঠিবেন, তোমাদের সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে কি খুন নাই? আমরা বলি, যথেষ্ট আছে। মহাভারতে অনেক খুন আছে। পাণ্ডব-শিবিরে পঞ্চশিশু-হত্যা কি? আতিথ্যধর্ম্মরক্ষার্থ কর্ণের পুত্রবলি কি?

এ সমস্ত ব্যাপার আমাদের সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে নাই, তাহা শ্রব্যকাব্যে আছে। শ্রব্যকাব্যের সহিত দৃশ্যকাব্যের যে প্রভেদ, আমরা প্রথমেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার বিচার করিলে শ্রব্যকাব্যের এ দোষ, দোষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য হইবে না।

মহাভারত ও রামায়ণের অধ্যয়নফল বা ইষ্টার্থ অতিশুভজনক। বাস্তবিক, সমুদয় রামায়ণ ও মহাভারতের অধ্যয়নফল হেতু আজিও হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের বল ও প্রভাব এত প্রবল রহিয়াছে। যে ধর্ম্মতেজ ও ধর্ম্মবল সেই দুই মহা-কাব্যের প্রাণ, তাহা সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমরা দানবীরের পুত্রবলি দেখি, তখন আমাদের ধর্ম্মভাব এত উচ্চে উঠে যে, অন্য সকলই নিম্নতলে যায়। আমরা কর্ণের ধর্ম্ম ও দানবীরত্বে মাতিয়া পড়ি। যে দান ধর্ম্মের জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিতেন, তাহার নিকট পুত্রবলি কি? সেই বলিতে ত্যাগের গৌরব এবং দানবীরত্বের ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্ম্মের উচ্চতায় আমরাও ক্ষণিকের জন্য উত্থিত হইয়া কর্ণের ধর্ম্মানন্দে মত্ত হই। পুত্রবলি তখন তুচ্ছ বোধ হয়। আর্য্যধর্ম্মপ্রাণ শুদ্ধ ঋষি-চরিত্রে ছিল না, যথার্থ ক্ষত্রবীরেও তাহা বর্ত্তমান ছিল। ব্যাস পুরাণে তাহা অঙ্কিত

তখনও তিনি দানবীরের ধর্ম্মপালন করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া অকাতরে ইন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া নিজ অমোঘ অস্ত্রদ্বয় দান করিয়াছিলেন। ৫[illegible]শ্যান-পাঠের ফল ধর্ম্মের উত্তেজনা, ধর্ম্মবলে বলীয়ান হওয়া। তদ্দ্বারা প্রকৃতি দূষিত হয় না, কিন্তু আরও উন্নত হইয়া উঠে। ধর্ম্মের জন্য, দানবীরত্বের জন্য হিন্দু সর্ব্বত্যাগী হইতে শিক্ষা করে।

আর, পঞ্চ-শিশুহত্যা কি? তাহা রণব্যাপারের মধ্যে একটি ভ্রান্তি মাত্র। যে ভ্রান্তিতে দুর্য্যোধনেরও হরিষে বিষাদ জন্মিয়াছিল। দুর্য্যোধন এত যে পাণ্ডব-বিদ্বেষী ছিলেন, তিনিও তাহাতে বিষাদিত। রণকাণ্ডের গোলমালে কত ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, ব্যাস সেই যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ভীষণ পরিণাম এবং বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার জন্য ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট এ ঘটনায় কোন দোষ নাই। যাঁহারা কাব্যরূপে মহাভারতকে দেখেন, তাঁহারাও দেখিবেন, যুদ্ধকাণ্ড কি ভয়ানক ব্যাপার! জ্ঞাতিবিরোধের বিষম পরিণাম কি ভয়ানক! যে কাব্যে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পুরাণ। আপামর সামান্য জনগণের ধর্ম্মোন্নতি এবং হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিবার জন্য পুরাণের সৃষ্টি। সুতরাং, পুরাণের মহদুদ্দেশ্যসিদ্ধির অভ্যন্তরে কোথায় এরূপ বধকাণ্ড লুক্কায়িত থাকে, তাহা অনুভূত হয় না। ট্র্যাজেডিতে বধকাণ্ড প্রধান ঘটনা হইয়া পড়ে; পুরাণের প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহা আচ্ছন্ন থাকে। কেবল পুরাণপাঠের ফলমাত্র হৃদয়ে অনুভূত ও অঙ্কিত হইয়া থাকে, এবং সেই ফল চিরদিনের জন্য জীবনকে নিয়মিত ও শাসিত করে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
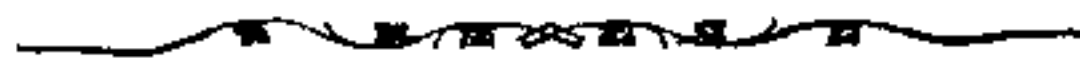
সহযোগী সাহিত্য।

সমাজ-নীতি।

তুর্ক রমণী।

গত জুলাই সংখ্যক ফর্টনাইট্‌লি পত্রে তুরুস্কের মুসলমান রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডেভি সাহেব বলেন যে, স্ত্রীজাতিরউপর মহম্মদ তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। মুসলমানের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণে মানবের অর্দ্ধাংশভাগিনিগণের উপর বড় কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহম্মদ তাঁহার পিতৃব্যের বিধবা দুহিতা ধনশালিনী কাদিজাকে ভাল বাসিতেন, ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পরিণামে কাদিজাকে বিবাহ করিয়া তিনি স্বকীয় বিশাল উদ্দেশ্যের সাধনার্থ তাঁহার ধনসম্পত্তির সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি "Mahomet invariably speaks of women with arrogance and contempt." মানবের গৃহাধিষ্ঠাত্রী কোরাণসরিফে ভূসম্পত্তির সহিত তুলিত।

তুর্ক রমণীর দুরবস্থা।

"স্ত্রীজাতির স্বর্গসুখ তাহাদের স্বামীর পদতলে নিহিত।" আজিও ফুলশয্যার বাসরে নববিবাহিতা বধূকে শয্যার পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। উহা বিবাহসংস্কারের একটা অঙ্গস্বরূপ। কোরাণ বলেন,—"কেবল স্বামীর ইচ্ছানুসারেই সাধ্বী স্ত্রী অনন্ত সুখের অধিকারি হইতে পারেন।" স্বামীর সুনজরে পড়িলে তিনি পরকালে চতুর্থীর চাঁদের মত চিরযৌবন ও চিরসৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইবেন। তাঁহার স্বামীও কদাপি একত্রিংশ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বা অধিকবয়স্ক লক্ষিত হইবেন না।

কোরাণের মন্তব্য।

এইরূপে স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের অসীম প্রাধান্য স্থাপন করিয়া মহম্মদ অতঃপর মহিলা-শাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন। "স্ত্রীগুলা যদি শাসন না মানে, বেত লাগাইও।" ক্রীতদাসীদিগের সম্বন্ধে এই বেত্রাঘাতের সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা যে, পত্নীগণের পক্ষে এরূপ কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে স্বামী মহাশয়ের উপর নিহিত। মহম্মদ সাধারণতঃ বহুবিবাহ অপেক্ষা একপত্নীত্বের অধিক পক্ষপাতী। তবে, "এক পত্নীতে যদি মন না উঠে, উপরি উপরি চারিটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করাও বিধিবিহিত। "কিন্তু যিনি এই পত্নী-চতুষ্টয়ের সুখসম্ভোগ করিতে চান, তাঁহার দরিদ্র হইলে চলিবে না। কারণ, কি গৃহ, কি ভৃত্য, কি অলঙ্কার, যান, বাহন প্রভৃতি সকল বিষয়েই চারিটির পৃথক্ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া চাই। ইহাতে কোনও পক্ষপাত করিলে চলিবে না। এইরূপ চতুরঙ্গ বাহিনীর খোরাক যোগাইতে অনেক তুর্ক পুরুষকে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের অর্থপিপাসাটা একবারে মাত্রা ছড়াইয়া উঠে। এ বিষয়ে মূলপ্রবন্ধ-লেখকের একজন বন্ধু তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন;— "তুর্ক রাজপুরুষেরা যত বড় বেতনভোগীই হউন না কেন, আয় ব্যয়ের তালিকাটা উভয়

মহিলা-শাসন।

বহুবিবাহ।

আস্বাদ পাইয়া নিতান্ত অপব্যয়ী হইয়া উঠেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার হৃদয়ের বিস্তৃতি একটু খাটো; তাহার ভিতর একটি বই দ্বিতীয় স্থান সংকুলন করিতে পারি নাই। তাই কোনও মতে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু, আমার প্রতিবাসী অমুকের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহার চারিটি গৃহিণী। চারিজনের পৃথক্ পৃথক্ চারিটি বাড়ী। প্রত্যেকেরই দশটি হইতে বিশটি পর্য্যন্ত দাসী। অন্দরে জেনানার সংখ্যা মোটের উপর আশিটি। তার উপর আবার কুড়িটি পুরুষ ভৃত্য।" এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চারিটি বিবি অপক্ষপাতে প্রতিপালন করিয়া মহম্মদের নিয়ম রক্ষা করা, বর্ত্তমান সময়ে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং চারিটির প্রলোভন এখন অনেককেই পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। তবে আসল ব্যাপারটা বন্ধ হয় নাই। পত্নীর স্থান ক্রীতদাসীগণ অধিকার করিয়াছে। ইহাদের সন্তানাদি হইলে, তাহারও বিবাহিতার বংশধরগণের তুল্যাসনে উপবেশন করে।

চারিটি অন্দরের চারিপোওয়া ব্যবস্থা!

রিচার্ড ডেভি মহোদয় মহিলাকুল সম্বন্ধে মহম্মদের কঠোর ও লজ্জাকর বিধির উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা বড়ই দুঃখিত যে, সে সকল কথার আদৌ কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কারণ, আমরা কোরাণসরিফে অভিজ্ঞ নহি। ভরসা করি, কোনও মুসলমান ভ্রাতা বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবেন। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাং,"—আর্য্য ঋষির এই মহিমাময়ী উক্তির মত সমগ্র কোরাণে কি কিছুই নাই?

বিদেশীর কথা প্রামাণ্য কি?

খৃষ্টীয় বা য়িহুদী রমণী বিবাহ করিতে তুর্কের কোনও বাধা নাই। এরূপ বিবাহে পত্নী-দিগকে ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিতে হয় না। তবে উহাদের সন্তানগণকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। কিন্তু স্বাধীনতার ক্রোড়ে লালিত য়ুরোপীয় অঙ্গনার পক্ষে মুসলমানের অসূর্য্যম্পশ্য অন্দরের ভিতর বাস করা, এবং উহার অশেষ-বিধ আদব কায়দা রক্ষা করিয়া উঠা, অল্পদিনের মধ্যেই অতি অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং এই সকল আন্তর্জাতিক বিবাহবন্ধন প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বিবাহ।

তুরুস্কে এই বিচ্ছেদের ব্যাপারটা অতি সহজ। উহা আমেরিকাবাসীরও বিস্ময়ের স্থল। তুর্কবাসী যখন দেখিলেন, কোনও বিশেষ রমণীতে আর তাঁহার সুখ নাই, তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীধনগুলি ফিরাইয়া দিয়া অনায়াসে গৃহের বাহির করিয়া দিতে পারেন। তবে উচ্চ-শ্রেণীর ভিতর একটু আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় বটে। তথাপি লেখক বলিতেছেন,—"উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীদিগের পরিবারে এমন কয়েকটি রমণীর কথা আমি বলিতে পারি, যাঁহাদের বয়স তেমন বেশী হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই কেহ দুই বার, কেহ তিন বার, কেহ বা দশ বার পর্য্যন্ত স্বামিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই বিচ্ছেদের কাণ্ডখানাকে একরূপ প্রহসন বলিলেও চলে। এখনও কুড়ী পার হন নাই, এমন অনেক সুন্দরী দ্বাদশবার পুনর্বিবাহিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে তুর্ক পুরুষগণ পত্নীদিগকে থলীর ভিতর পুরিয়া বাসফোরসের জলে বিসর্জ্জন দিতেন—এখন কেবল সম্পর্কের বাঁধনটা বিচ্ছিন্ন করেন। কনস্তানতিনোপলের অধিকাংশ ভিখারিণী এইরূপে পরি-ত্যক্ত পত্নীমাত্র। তাহাদের বয়স গিয়াছে; পথের কোনও ভিখারীর আশ্রয়লাভও আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হতভাগিনিগণ নিতান্ত অসহায় হইয়া, অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগের পর অবশেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয়

বিবাহবিচ্ছেদ।

তুর্করমণীর দুর্দ্দশা।

পুরুষদিগকে তাঁহাদের পরিবারস্থা কোনও মহিলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও বিষম বেয়াদবী বলিয়া পরিগণিত। "তুর্কবাসীকে তাঁহার স্ত্রী, বিশেষতঃ তাহার দুহিতার কথা কখনও জিজ্ঞাসা করিও না।"

অতঃপর মূলপ্রবন্ধের লেখক, ধনশালী সম্ভ্রান্ত তুর্কীগণের জীবন আশৈশব কিরূপে অতিবাহিত হয়, তাহার একটা নমুনা দিয়াছেন। আমরা বাল্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিবাহবয়স হইতে আরম্ভ করিতেছি। "পূর্ব্বকালে বিবাহ ব্যাপারটাও বড় সহজ ছিল। যুবকের মাতা নিজসম্পর্কীয় অথবা পরিচিত কোনও ধনী পরিবারের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতেন। তাহা না হইলে বরের বাপ বাজারে গিয়া, সুন্দরী দেখিয়া, একটা দাসী ক্রয় করিয়া আনিতেন। এ বিষয়ে স্বয়ং বিবাহকর্ত্তার কোনও মতামত গ্রহণ করা হইত না। কিন্তু সে দিন এখন আর নাই। এখনকার বিবাহে কেবল পাড়াপড়শীরা ঘুম বন্ধ করিয়া বেড়াইলে চলে না; যাহার বিবাহ,তাহারও মনের একটু আধটু খবর লইতে হয়। কিন্তু সে খবর অতি সামান্য। বর, কন্যার সহিত স্বয়ং কোনও কথা কহিতে পান না; চরিত্রটা কিরূপ, তাহার কোনও অনুসন্ধান করিতে পান না ; এমন কি, চেহারা খানাও একবার দেখিতে পান না। সকল বিষয়েই তাঁহাকে মায়ের মুখে ঝাল খাইতে হয়। উভয়পক্ষীয় জননীরাই বিবাহকাণ্ডে প্রধান কর্ত্রী ; অবশ্য পিতৃদ্বয়েরও মতটা লইতে হয়।

জীবনপ্রণালী।

বিবাহের 'সম্বন্ধ'।

"তার পর বরের বাপ কন্যার বাটীতে মুদ্রাময় এক উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। লোকের বিশ্বাস, ঐ অর্থরাশি কন্যার দেহভারের সমতুল। অবশেষে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। বিবাহস্থলে যাজক-পুরোহিত না হইলেও চলে। কারণ, কোরাণে পরিণয়ের ব্যাপারটা ধর্ম্মসংস্কারের মধ্যে পরিগণিত নহে। য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে এখন পুরোহিতের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। তুর্কী-বিবাহ বিকালবেলা সম্পন্ন হয়। সদলবলে বর মহাশয় কন্যার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সেখানে রাশি রাশি লোক জমা হইয়াছে। দেশের মেয়ে জড় হইয়া বর-কন্যার সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছে। আশীর্ব্বাদ শুভাকাঙ্ক্ষার ছড়াছড়ি। তখন বরকেও সিকি দুয়ানীর মত ছোট ছোট মুদ্রার কিছু ছড়াছড়ি করিতে হয়। পৈঠার ধারে ভাবী শ্বশুর মহাশয় আসিয়া বরকে আলিঙ্গন করেন। অতঃপর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত বসিয়া কাফি, সরবৎ প্রভৃতি পান করা হয়।

বিবাহ পদ্ধতি।

"ইত্যবসরে অন্দরের ভিতর এক মজার কাণ্ড হইতেছে। কন্যাকে নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত করা হইয়াছে। তাহার মাথার উপর একছড়া নেবুফুলের মালা বিজড়িত ; আর গোলাপী-রঙ্গের একখানা আবরণ ঘোমটার মত মুখ ঢাকিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে। এই অবস্থায় সুন্দরী, গৃহের এক কোণে কৃত্রিম গোলাপকুসুমে রচিত এক বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে একখানা সিংহাসনের উপর গঠিত মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিয়াছেন। ঘরের ভিতর লোক আর ধরে না। চীৎকারে, গোলমালে কান পাতা যায় না। কোথাও ভোজ, কোথাও নাচ, কোথাও গান। চারিধারে পুরনারীবর্গের হাসি তামাসার হুড়াহুড়ি। কন্যা কিন্তু মনসা বুড়ীর মত সেই একভাবে ঠিক বসিয়া রহিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত মহিলাগণ বিদায় লইয়া চলিয়া যান ; কারণ,রমজানের দিন ভিন্ন ঘর ছাড়িয়া রাত্রিবাস করা মুসলমান রমণীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

তুরস্কের 'স্ত্রী-আচার।'

"এ দিকে বরের দুর্গতি দেখ। বেচারী ছেঁড়া জুতার বৃষ্টি সাম্‌লাইতে না পারিয়া প্রাণভয়ে

যে ছেঁড়া চটি নিক্ষেপের প্রথা আছে, তাহা হয় ত এই তুর্ক প্রথারই অনুকরণ। তুর্কী গৃহিণীরা বলেন, এই ছেঁড়া জুতা কুদৃষ্টিনিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। বাসর-গৃহরূপ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইলে, বাড়ীর মধ্যে সকলের বুড়ী যিনি, তিনি বরকে ধরিয়া কন্যার কাছে লইয়া যান। কন্যা ত সেই আপাদমস্তক ঘোম্‌টার মণ্ডিত হইয়া জগদ্দল পাথরের মত বসিয়াই আছেন। তখন বর সেই বস্ত্রমণ্ডিতা সুন্দরীর পদতলে পতিত হইয়া, বিবিধ বাক্যালঙ্কারে, একবার সুন্দর মুখখানি দেখিবার ভিক্ষা করেন। তিনি বলেন,'আমার নয়নের আলোক তুমি! নামটি তোমার বলিবে কি?' কন্যা তিনবার উত্তর করেন,—'গোলাপ, গোলাপ, গোলাপ।' তখন সেই বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার ঘোম্‌টা খুলিয়া দেন। যুবক যুবতী একত্র কিছু আহার করেন। আহারাদি শেষ হইলে, আর তাহাদের নিকটে থাকা কর্ত্তব্য নহে বুঝিয়া, প্রাচীনা সরিয়া পড়েন। এইবার দুই জনের ফুস্‌ফাস্ রসালাপ আরম্ভ হয়। গোলাপটি তেমন চালাক চতুর হইলে সতীনের জ্বালা বড় ভুগিতে হয় না। নহিলে বছর না ফিরিতেই আর একটি, তার পর আর একটি এইরূপে একটি একটি করিয়া প্রায়শঃ চারিটি পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

পাদুকাবৃষ্টি।

তুরুস্কের বাসর।

"অন্দরের আদব-কায়দা বড় বিচিত্র। পূর্ব্বাহ্লে সংবাদ প্রেরণ না করিয়া, অথবা অনুজ্ঞাত না হইয়া, কোনও রমণী তাঁহার স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন না। এই সংবাদ ক্রীতদাসী কিম্বা খোজা চাকরের দ্বারা প্রেরিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রী পালাক্রমে স্বামী মহাশয়ের সেবা করেন। তাঁহার কাপড়চোপড়ের তদ্বির করেন, তাঁহার তামাক বা কাফি যোগাইয়া দেন, এবং অন্যবিধ নানা উপায়ে তাঁহার মন যোগাইতে চেষ্টা করেন। এ সৌভাগ্য বড় বেশী দিন থাকে না; স্বামীর মরজি হইলে বড় জোর বর্ষব্যাপী হইতে দেখা যায়। স্বামীজি ইতিপূর্ব্বেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, সুন্দরীকে দক্ষিণাস্বরূপ কিঞ্চিৎ উপহার দিয়া বিদায় করিয়া দেন। তার পর কতদিনে আবার প্রভুর মনে পড়িবে, এই ভাবিতে ভাবিতে দিন গুণিয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হয়।"

অন্দরের আদবকায়দা।

ডেভী মহোদয়ের এক বান্ধবী শিক্ষয়িত্রীরূপে কয়েক বৎসর তুর্ক রাজপুরুষদিগের পরিবারে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"তুর্করাজ্যে আমি মোটের উপর দশ বৎসর বাস করিয়াছি। অনেক পরিবারের ভিতরকার বৃত্তান্ত জানি। আমি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইংলণ্ডে থাকিয়া দশ বৎসরের মধ্যে দাসীদিগের উপর অত্যাচারের যত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, তুর্ক পরিবারের ভিতর তত দেখি নাই। সাধারণ তুর্ক পরিবারের নৈতিক অবস্থা বিষয়ে আমি যাহা জানি,তাহা প্রকাশ করিতে চাহি না। বহুসংখ্যক কামিনী, এমন কি সুকুমারী বালিকাদিগেরও, গুপ্ত প্রেমের বৃত্তান্ত এবং তদপেক্ষাও দূষণীয় ব্যাপার আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তথাপি, কথাবার্ত্তার অশ্লীলতা ছাড়িয়া দিলে, তুর্করমণীদিগকে, সেক্ষপীয়রের ভাষায়, সাধারণতঃ সাধ্বী (Honest) বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে অশ্লীল কথোপকথনের কথা বলিতেছিলাম, তত্তুল্য কদর্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। তুর্ক-সুন্দরীর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যবশতঃ উহা আরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। তুর্কেরা কুৎসিত রহস্য ও কদর্য্য কামোত্তেজক গল্পের বড়ই বিষম ভক্ত।"

নৈতিক অধোগতি।

তুর্ক রমণীর যথেষ্ট স্বাধীনতাও আছে। স্বামীর অনুমতি না লইয়াও তাঁহারা বাজার হাটের জন্য অথবা বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গৃহের বাহিরে কালাতিপাত করিতে পারেন। গৃহিণীগণ কখনও কখনও বন্ধুর গৃহে গিয়া, দাসদাসী

স্বামী মহাশয় বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গৃহিণী আপন আত্মীয় বান্ধব লইয়া আমোদ করিতেছেন ;—তাঁহার "প্রবেশ নিষেধ।" অপর স্ত্রী বাটীতে থাকিলে পুত্রদিগেরও তন্মধ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। গ্রীষ্মকালে শুক্র ও রবিবার দিন দেখিতে পাইবে, দলে দলে তুর্করমণী কোনও উন্মুক্ত ভূমিতলে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে। সেখানে পুরুষের সমাগম নিষিদ্ধ। রমণীগণ পরস্পরের সহিত কথোপকথনকালেও অতি সূক্ষ্ম স্বর অবলম্বন করেন। বাজার হাটের সময় অথবা বন্ধুসন্দর্শনকালে তুর্ক রমণীর স্বামী পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে পারেন না। তাঁহাকে ২০।২৫ হাত তফাৎ হইয়া থাকিতে হয়।

তুরুষ্ক রমণীর স্বাধীনতা।

ক্রীতদাসীদিগকেও চিরদিন দাসীত্ব করিতে হয় না। ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ বৎসর পার হইবার পূর্ব্বেই তাহারা স্বাধীনতা লাভ করে। গৃহের কর্ত্রী তাহাদের বর জুটাইয়া দিয়া বিবাহ-যৌতুক, বাসগৃহ, এমন কি গৃহসজ্জা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তুর্ক রমণীর ভিতর আজকাল লেখাপড়ারও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। তবে, ইহাদের সম্বন্ধে ফুয়াদ পাশার সুখস্বপ্ন সফল হইতে এখনও বহু বিলম্ব রহিয়াছে।

ক্রীতদাসী।

সাহিত্য।

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাহিত্যব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থায়, সকল সাহিত্যসেবকই সর্ব্বতোভাবে অসন্তুষ্ট। আবার মানব যেখানে বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট, সেখানে সে সহজেই কল্পনাকৌশলে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত রাজ্যে নির্ঝরকলনাদমুখরিত পুষ্পিতদ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিলকুলকূজিত কুঞ্জকাননময় রম্য নন্দনবনের সৃজনে ব্যাপৃত হয়। দূর বলিয়াই সে ভবিষ্যতের চিত্র এত সুন্দর ; কারণ।

"'Tis distance lends enchantment to the view."

সম্প্রতি সার ওয়াল্টার বেসাণ্ট সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ভবিষ্যতের সাহিত্যজীবনের কথার আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে হয় যে, যাঁহারা ভবিষ্যতে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা অতীতকালের সাহিত্যসেবকদিগের ইতিহাসে লিখিত অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহারা এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিবেন যে, ইহা কি সম্ভব যে, একজন লেখক—সকলে যদি শ্রবণ করে—তবে ১২ কোটী শ্রোতা সত্ত্বেও প্রকাশকের অধীন এবং দাস থাকিতে পারেন?—প্রকাশক তাঁহার হইয়া পুস্তক বিক্রয় করিত, আবার অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, তিনি প্রকাশকের হিসাব পরীক্ষা করিতে সাহস করিতেন না, তাহা ঠিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে সাহস করিতেন না, কোন তর্ক না করিয়া যাহা পাইতেন লইতেন, এবং তাঁহার আপনার সম্পত্তি পুস্তক হইতে তাঁহার প্রকাশক কত লইত, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভীত হইতেন? আবার প্রকাশক সেই পুস্তক নিজ সম্পত্তি বলিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিলেও কিছু বলিতেন না। অতীত এবং বর্ত্তমানের সাহিত্য সম্বন্ধীয় এই সকল কঠোর সত্য ভবি-

নূতনে পুরাতনে।

যাঁহারা অতীতের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা বুঝেন, তাঁহারা জানেন, সাহিত্য-ব্যবসায় কেন ঘৃণিত। কারণ সাহিত্য দরিদ্র, অসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী; কাজেই এরূপ ব্যবসায়ের উপর মানবজাতির ঘৃণা স্বভাবতঃই উদিত হইয়া থাকে।

সাহিত্যের এই পরমুখাপেক্ষিতার কারণ কি? প্রকাশকের হস্তে সাহিত্যের সম্পূর্ণ বন্দোবস্তের ভার থাকাতেই ইহার উৎপত্তি। প্রকাশকগণ নিতান্ত গোপনীয় ভাবে সাহিত্য-ব্যবসায় চালাইত; পুস্তকে কত খরচ পড়িয়াছে, গ্রন্থকার কত পাইলেন, বিজ্ঞাপনপ্রচারে কত ব্যয় হইয়াছে, তাহারা পুস্তকবিক্রেতাদিগকে জানিতে দিত না। তাহারা গ্রন্থকারকে অর্থগৃধ্নু জীবরূপে চিত্রিত করিত—তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই দায়, মুদ্রাকর, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, সকলেই অর্থলোলুপ; সকলেরই অর্থের তৃষ্ণা নিবৃত্ত করা অসম্ভব। প্রত্যেক পুস্তকপ্রকাশই ভয়ানক ঝুঁকির কাজ, আর তাহাতে ক্ষতি ত নিশ্চিত। তাহারা গ্রন্থকারকে পুস্তকের ব্যয় এবং দোকানি দর জানিতে দিত না, তাহাদের কথায় পুস্তকবিক্রেতা অসাধারণ লোভী, পুস্তকের ব্যয় অসামান্য, ঝুঁকি ভয়ানক, আর প্রকাশকের ব্যবসায়ে বিপদের ত অন্তই নাই। যাঁহারা জীবিকার জন্য কেবলমাত্র সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতেন, দুই এক জন ঔপন্যাসিক ব্যতীত তাঁহাদের জীবন সাধারণতঃ অর্থাভাবযাতনা নিপীড়িত। এক সময় থ্যাকারেরও কষ্ট ছিল, লে হণ্ট ত চিরদরিদ্র। কে কোন প্রতিভাশালী যুবককে এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দান করিবে? কিন্তু এই অদূরদর্শিতা ও অসততার ফল প্রকাশকদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতিরিক্ত লাভের আশায় তাহারা স্বর্ণডিম্বপ্রসবকারিণী মরালীকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছিল! কিছু দিন বোধ হইল, যেন আর স্বর্ণডিম্ব পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি সাহিত্যের পুনরুত্থানের কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, কতকটা পুস্তকের অধিক আদর হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, নূতন নূতন প্রকাশকের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে; তৃতীয়তঃ, প্রকাশকেরা একটু বুঝিয়াছে যে সর্ব্বগ্রাস চলিবে না; চতুর্থতঃ, লেখকগণ উৎসাহশীল হইয়াছেন; দলবদ্ধ ও অনুসন্ধানপর হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রকাশকের অত্যাচার।

অবস্থা এখনও শোচনীয়, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা ভাল। ভবিষ্যতের সাহিত্যসেবক স্বাধীন। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বেই পুস্তকপ্রস্তুতকরণ নূতন এবং উন্নততর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে। তাহাতে সাধারণের প্রভাব অধিক, ভাল পুস্তক লেখকের লেখকের সম্পত্তি। লেখকের স্বাধীনতার সহিত অন্যান্য পরিবর্ত্তন প্রচলিত হইবে। প্রকাশকের ব্যবসায় দুই বা তিন স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথমতঃ, পাইকারী ব্যবসায়ীর মত বড় প্রকাশক থাকিবেন; তিনি ব্যবসায়ে প্রধান। তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া, অভিধান, মানচিত্র, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মূলধন অগাধ, তিনি অর্থ দিয়া প্রতিভাবান লেখকদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন—তাহাতে তাঁহাদের কোন অপমান থাকিবে না। তাহার পর এখনকার মত সাধারণ প্রকাশকের দল থাকিবেন; তখন তাঁহারা নগণ্য, তাঁহাদের আশা, কোন লেখকের প্রথম ভাল পুস্তকখানি প্রকাশ করা। প্রথম পুস্তক প্রকাশই তাঁহার কেবলমাত্র আশা; কারণ লেখক যশস্বী হইলেই তিনি তৃতীয়শ্রেণীস্থ প্রকাশকের নিকট যাইবেন। এই তৃতীয়শ্রেণীস্থ প্রকাশকগণ গ্রন্থকারের হইয়া গ্রন্থবিক্রয় ও মূল্য আদায় করিবেন, পুস্তকখানি ছাপাইয়া তাহাকে দেওয়া হইবে, তিনি প্রত্যেক বিক্রীত পুস্তকে নির্দ্ধারিত কিছু পাইবেন এবং অন্য কোন প্রকার প্রকাশের

পরিবর্ত্তন।

পুস্তকেরপ্রভেদ।

তবে তাঁহার বেশ চলিয়া যাইবে। ভবিষ্যতে পুস্তক দুই প্রকারের এক প্রকার হইবে; হয় অত্যন্ত মূল্যবান, নয় অত্যন্ত সস্তা। তখন লোকে বুঝিবে যে, যে পুস্তক কিনিবার ও রাখিবার উপযুক্ত, সে পুস্তকের ছাপান বাঁধান প্রভৃতি যতই ভাল হউক না কেন, আরও ভাল আবশ্যক। ভবিষ্যতের পুস্তকে কি সুন্দর শিল্পকার্য্য, কি বিচিত্র বাঁধাই, কি মনোরম মুদ্রাঙ্কণ আবশ্যক হইবে, তাহা আমরা এখনও ভাল বুঝি না। আর প্রত্যেক প্রথিতযশাঃ লেখকের গ্রন্থের একটা সাহিত্যসংস্করণ থাকিবে। সে সংস্করণের কাগজ এবং বাঁধাই ভাল—তখন যে রাশি রাশি পুস্তকালয় হইবে তাহাদের জন্য ঐ সংস্করণ। আবার সর্ব্বসাধারণের জন্য সুলভ সংস্করণ থাকিবে। কিংস্‌লের Westward Ho।র কথাই ধরা যাউক; এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হইলে একটা ভাল সংস্করণ হইবে—মূল্য ৫ শিলিং, তাহা পুস্তকালয়ের জন্য। আবার ভাল ছাপা আবাঁধা ২ বা ১৷৷০ শিলিং দামের আর একটা সংস্করণ থাকিবে—পাঠক ইচ্ছা করিলে বাঁধাইয়া লইবেন। যখন পুস্তকখানা Classic হইবে, তখন উল্লিখিত প্রধান প্রকাশক তৎ-সময়ের প্রধান চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত একটা সচিত্র সংস্করণ বাহির করিবেন—মূল্য ১ গিনি।

এখন সাহিত্যব্যবসায়ের কথা ধরা যাউক। যখন ইহার কল কারখানা সহজীকৃত ও উন্নীত হইবে, যখন এই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তখন ইহা যে কেবল মহৎ এবং সম্মানিত ব্যবসায়ে পরিণত হইবে, তাহা নহে, ইহা মহত্তম্, সম্মানিততম্ ব্যবসায় হইবে। এ ব্যবসায় ঈর্ষ্যার কারণ হইবে, প্রত্যেক পিতাই সন্তানকে এই ব্যবসায়ের জন্য শিক্ষা দিতে চাহিবেন। অন্য সকল ব্যবসায় ম্লান হইয়া পড়িবে, তুলনায় ম্লান নহে, যথার্থই ম্লান হইয়া পড়িবে। কেবল সাহিত্যব্যবসায় দিনে দিনে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

সাহিত্যব্যবসায়।

এ বিষয় ভাল করিয়া বুঝান যাউক। কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। লেখক লণ্ডনে কি ঘটিতেছে, তাহাই বলিবেন এবং সেই সকলের অর্থ বুঝাইবেন। পরিবর্ত্তনের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে,—মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই। তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই জীবনধারণ কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

এই পরিবর্ত্তন তাহাদেরও অজ্ঞাতে উচ্চাশাপ্রণোদিত শ্রমজীবী বালকদিগের দ্বারা সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ। এখন প্রত্যেক বড় সহরে শ্রমজীবী বালকগণ অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজেরই মত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। Polytechnics এ তাহারা গণিত, নূতন ভাষা, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহা ইচ্ছা, শিক্ষা করিতে পারে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষাদান হইয়া থাকে। বালকগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক শিক্ষা করে, তাহাদের শিক্ষায় ইটন বা হ্যারোর শিক্ষার অবসাদ নাই। তাহারা পুস্তক হইতে শিক্ষা বাহির করিয়া লয়। তাহারা এ সকল শিক্ষা করে কেন? শিক্ষার উৎসাহে বা শিক্ষার খাতিরে কি তাহারা রজনীর পর রজনী অধ্যয়নশ্রমে অতিবাহিত করে? তাহা নহে। তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্যই শ্রম করে। হয় ত কর্ম্মে নিরত থাকিবার সময় তাহারা তাহা ভালবাসে, নহিলে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না। কোন বিষয় ভাল না বাসিলে কোন যুবক তাহা আয়ত্ত করিতে পারে না। কিন্তু এই পরিশ্রমের মূল কারণ আপনার উন্নতিসাধনেচ্ছা। Polytechnics হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কি কি পথ উন্মুক্ত থাকে? যাহারা ছাত্র পড়াইতে পারে, তাহাদের জন্য শিক্ষকতাকার্য্য, বিবিধ কেরাণী-গিরী এবং সংবাদপত্রে রচনা, এই তিন ব্যবসায়ই মুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কেরাণীগিরীর

রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, কেমন করিয়া যে তাহাদের দিনাতিপাত হয়, তাহা একটা অজ্ঞাত রহস্য। কিছু দিন পূর্ব্বে কেরাণীগিরীর কার্য্যে বড়ই একটা প্লাবন আসিয়াছিল —এখন স্রোত মন্দ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল সংবাদপত্রসেবা (Journalism) আছে। বর্ত্তমান সময়ে সংবাদপত্র সেবকদলের জনাধিক্য একটা সময়ের বিশেষ ফল বা চিহ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া অনেক চতুর যুবক সংবাদপত্রসেবক হইয়া দাঁড়ায়। কেহ কেহ আদালতে বা পার্লামেণ্টে উন্নতিলাভের চেষ্টা করে ও তৎকালে জীবিকার জন্য সংবাদপত্রসেবায় ব্যাপৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ের কয় জন খ্যাতনামা রাজনৈতিক প্রথমে সংবাদপত্রসেবক ছিলেন। অনেকেই সংবাদপত্রসেবা ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই-করা যুবকগণ সম্পাদকীয় প্রধান প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সেরূপ প্রবন্ধের সংখ্যা অধিক নহে, কাজেই তাঁহাদিগের কতককে তাহা অপেক্ষা নীচ কর্ম্ম করিতে হয়—কেহ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কেহ বা বর্ণনাপ্রধান প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পর এখন সংবাদপত্র-সেবাতেও মহিলাগণ প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া সময় সময় অন্যক্ষেত্রে পায়চারি করিতে আসেন। শুনা যায়, তাঁহারা যে ব্যবসায়ে গমন করেন, সেই ব্যবসায়েই মাহিনা কমাইয়া দিয়া থাকেন*। শেষকালে Polytechnics এর যুবকগণ আছে তাহারা চতুর, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, কিন্তু বিদ্বান নহে। তাহারা রেখাক্ষর লিখিতে পারে, কর্ম্ম করিতে ব্যগ্র ও স্থানে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক, এবং অল্প বেতন গ্রহণ করিতে সম্মত। সংবাদপত্রসেবার ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যাহারা সর্ব্বদাই ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহারা অধিক বেতন পাইবে। তাহার পর ক্রমে কার্য্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে। সংবাদপত্র এখন যেমন আছে, তেমনই রহিবে বা আরও ভাল হইবে। এই কথা বুঝিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ের কথা বিবেচনা কর। সকলেই সংবাদপত্রব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু ইংলণ্ডে এক জন যুবকের পক্ষে ডাক্তার, সলিসিটার বা ধর্ম্মযাজক হইতে হইলে এক শত পাউণ্ডের প্রয়োজন। ব্যারিষ্টার হইতে হইলে দুই শত পাউণ্ডের প্রয়োজন। ব্যবসায়ের দ্বারে দ্বারবান বলিবে, এক শত পাউণ্ড দাও, তবে মধ্যে যাইতে দিব।

সংবাদ পত্র সেবা।

জীবনসংগ্রাম যতই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া দাঁড়াইবে, ততই যুবকগণের নিকট এই দ্বারবানের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। লেখকের বিশ্বাস যে, এক দিন তাহারা তাহাকে দূর করিয়া দিবে। তাহারা এই অর্থের পরিবর্ত্তে পরীক্ষা চাহিবে, এবং প্রাবেশিক অর্থ না দিয়া ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে চাহিবে। তাহার পর অস্মদ্দেশে আইন ব্যবসায়ের মত সকল ব্যবসায়ে ভীষণ ভিড় হইবে; ভিড় অর্থে সকলের আয় কম হইবে, ব্যবসায়ের কায়দা আর থাকিবে না, সলিসিটারগণ ক্রমেই কম অর্থে কাজ করিতে আরম্ভ করিবে, যে সকল ব্যারিষ্টার মোকদ্দমায় পাঁচ গিনি লইত, তাহারাই পাঁচ শিলিংমাত্র লইয়া কার্য্য করিবে; ছয় পেনিতে তখন এক জন ডাক্তার পাওয়া যাইবে, দারিদ্র্য এবং পর মুখাপেক্ষিতার জন্য তখন এই সকল ব্যবসায় ঘৃণিত হইবে। কিন্তু সাহিত্যের এ দুর্গতি হইবে না।

এখন যে সকল পুস্তক পাঁচ শিলিং দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তখন সে সকল এক শিলিং মাত্রে পাওয়া যাইবে, কিন্তু এখন যত লোক পুস্তক ক্রয় করে, তখন তাহার পঞ্চাশ গুণ লোক পুস্তক ক্রয় করিতে শিখিবে। বর্ত্তমান সময়ে এক জন গ্রন্থকার যত পাঠক প্রাপ্ত হয়েন, এক শত বৎসর পরে একজন গ্রন্থকার যে তাহার কত গুণ অধিক পাঠক প্রাপ্ত হইবেন, তাহা

* ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সহযোগী সাহিত্যে শিল্প ও শিক্ষা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নির্ণয় করাই দুরূহ। প্রতিযোগিতায় অন্যান্য ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হইবে, সাহিত্যব্যবসায়ের তাহা হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে শত শত নরনারীর আগমন হইলেও, যাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিবেন, তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, প্রতিভাবান লেখকদিগের স্থানাভাবের সম্ভাবনা নাই। যিনি সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন, তিনিই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন। কাজেই যত লোকেই চেষ্টা করুন না কেন, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। কারণ, সাহস, শিক্ষা বা সংগ্রাম কোন পুরুষ বা মহিলাকে সাধারণের মনোরঞ্জক বা জনপ্রিয় লেখক হইবার উপযুক্ত করে না।

কেবল উপন্যাসে নহে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই দুই দল জনপ্রিয় লেখক দৃষ্ট হইবেন। লেখকদিগের মধ্যে, স্থানীয় এবং সর্ব্বদেশীয়, এই দুই ভাগ থাকিবেই। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার বিশেষ স্থানীয় সাহিত্য থাকিবে। সকল স্থানের জন্য বিশেষ স্থানীয় সাহিত্য আবশ্যক হইবে; স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ইতিহাস, প্রবন্ধ, ধর্ম্মগ্রন্থ, উপন্যাস, সকল স্থানেই, এ সকলের এক পত্তন স্থানীয় সাহিত্য রাখিতে হইবে। তাহা ভিন্ন প্রত্যেক পুরুষে দুই বা তিন জন করিয়া লেখক বা লেখিকা সমগ্র ইংরাজীভাষাজ্ঞ জনগণের জন্য পুস্তক রচনা করিবেন। এই অল্পসংখ্যক লেখকই অত্যন্ত সম্মানিত হইবেন। বর্ত্তমান সময়েই আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সাহিত্যের অধিকাংশ স্থানীয় আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপরপারস্থ মানবগণের মনোরঞ্জক, তাহাতে বড় কিছু নাই; আবার লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমেরিকানগণ ইংলণ্ডে প্রকাশিত পুস্তককে ঐরূপ স্থানীয় ভাব দেখে।

গ্রন্থকারসম্প্রদায়।

ভবিষ্যতে সাহিত্য সম্মানিত হইবে, কারণ, তখন তাহাতে যশ, অপরিমিত প্রশংসা এবং কৃপণেরও স্বপ্নের অগোচর ধনরাশি উপার্জ্জিত হইবে। তখন সাহিত্যে কৃতকার্য্যতা প্রভূত ধনলাভের দ্বার উন্মুক্ত করিবে। তখন সাহিত্যে অপরিমাণ ধনলাভ হইবে, ইংলণ্ডের ন্যায় মদ্যপদিগের দেশে মদের কারখানা বা রৌপ্যের খনিতেও তত ধনলাভ হইবে না। সাহিত্যের পথে এই প্রভূত ধনলাভ ভাল কি মন্দ, লেখক তাহা বলিতে চাহেন না; তিনি কেবল যাহা ঘটিবে, তাহাই বলিতেছেন। সাহিত্যে সাফল্যের জন্য লেখকের স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কত পুস্তক বিক্রয়ে কত লাভের সম্ভাবনা তাহা দেখাইয়া লেখক বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে লোকে যেরূপ আগ্রহের সহিত এক পেনি মূল্যের সংবাদপত্র ক্রয় করে, ভবিষ্যতে লোকে তাহা অপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত খ্যাতনামা লেখকগণের গ্রন্থ ক্রয় করিবে। লোকে সহজেই মনে করিতে পারে যে, অর্থোপার্জ্জনের উপায় এইরূপ সুগম হইলে লেখকগণ তাড়াতাড়ি করিয়া, ভালরূপ চিন্তা না করিয়া; যাহা হয় লিখিতে আরম্ভ করিবেন; আসলে কিন্তু তাহা নহে। কারণ, এইরূপে সফলকাম হইবার জন্য গ্রন্থকারগণ সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তকমাত্র প্রকাশ করিবেন। অধিক প্রশংসার ন্যায় অধিক লাভ ও উচ্চমনোবৃত্তি উত্তেজিত করে। প্রত্যেক পুস্তকের জন্য লেখক অধিক এবং আরও ভালরূপ কার্য্য করিবেন; নায়েগ্রার বিপুল বারিরাশিবৎ যশ যখন লেখকের পদপ্রান্তে পতিত হইবে, প্রত্যেক দেশ এবং সাগরের উপর দিয়া যখন পবনে তাঁহার যশোগীতি বাহিত হইবে, তখন তিনি পুস্তকরচনায় নিশ্চয়ই অধিকতর যত্নশীল হইবেন, সন্দেহ নাই। মিষ্টতম সঙ্গীতের মাধুরী সে যশোগীতির মাধুরীর নিকট কিছুই নহে। তখন লেখক তাঁহার সেই খ্যাতির উপযোগী হইবার জন্য এবং সেই খ্যাতিরক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অধিক চেষ্টিত হইবেন।

এইখানে সার ওয়াল্টারের স্বপ্ন শেষ হইয়াছে। তিনি অতি উজ্জ্বলবর্ণে ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে ভবিষ্যৎ দয়াব্যঞ্জক নেত্রে বর্ত্তমানের দিকে চাহিয়া আছে, আর এই

পদ্মরাগ মণি শোভা পাইতেছে। অলঙ্কার পরিবার জন্য তিনি কর্ণের নানা স্থানে ছিদ্র করিয়াছেন; এবং তাঁহার নাসিকাতেও একখানি হীরক জ্বলিতেছে। এই ক্ষুদ্র হীরকাভরণ-ভূষিতা বেগম ইংরাজী বলিতে পারেন না, কাজেই অতিথিরা তাঁহার অলঙ্কারের প্রশংসা করিবার পরই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল। বেগমের ক্ষুদ্র শিশুকে আনা হইল। তাহার বেশ রঙ্গিন রেশমের; তাহার কেশহীন মস্তকে একটা জরীর কাজ করা টুপি। নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলে, লেখিকার ভ্রমণসম্বন্ধে নানা কথা হইল। এরূপ স্থানে পত্নীগণ অবরোধে থাকিতেই বাধ্য; পত্নীগণ কথাটার একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়—বেগমই নবাবের একমাত্র পত্নী নহেন, প্রথম বেগমের বিবাহের পর দিবস ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। এরূপ অবরোধের নৈতিকতার প্রতি লেখিকা এক বার ঘৃণাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

পর্দ্দার অন্তরালে থাকিলেও, পতি ও পুত্রের উপর হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণের প্রভাব অল্প নহে। বরং স্বাধীনা নানাকার্য্যে ব্যাপৃতা রমণীগণের অপেক্ষা তাঁহাদের প্রভাব অধিক, কারণ তাঁহাদিগের মনোযোগ সেই সকল ভালবাসার পাত্রেই সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত। গৃহের কর্ত্তৃত্বশাসন অবহেলা করিতে প্রায় কেহই সাহস করে না।

প্রভাব।

যে সকল মহিলা অবরোধে থাকিতে বাধ্য নহেন, তাঁহাদিগের প্রসঙ্গে লেখিকা প্রথমে ব্রাহ্ম মহিলাগণের কথা পাড়িয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশে নিতান্ত পরিচিত; লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই সমাজ সংস্থাপিত হয়। রামমোহন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার পিতা বৈষ্ণব ছিলেন। রামমোহন পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। অল্প বয়সে তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, পৌত্তলিকতা বেদের অনুমোদিত নহে। তিনি তাহার পর বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তাঁহার এই বিশ্বাস হয় যে, খৃষ্টের মতই অন্য সকল ধর্ম্মমত অপেক্ষা উত্তম; কিন্তু তিনি ত্রিত্বমত (Trinity) গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একেশ্বরবাদ ভিত্তি করিয়া সমাজ সংস্থাপিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যু হয়; তাহার পরেই সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে সমাজের নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়। সমাজে প্রবেশের সময় সভ্যগণ পৌত্তলিকতা পরিহার করিবার জন্য, প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য, পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য ও পাপ হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। অনুতাপই ক্ষমা ও মুক্তির একমাত্র উপায়; ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে সৎকার্য্য, দান, চিন্তা ও ভক্তি; ত্যাগের মধ্যে স্বার্থত্যাগ; এবং পবিত্র অন্তঃকরণই একমাত্র ধর্ম্মমন্দির। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃরূপে আবির্ভাব। তিনি জাতিভেদপ্রথা রহিত করেন, রমণীদিগকে সমাজভুক্ত করেন, এবং বিবাহের সংস্কার করেন। যখন কেশবচন্দ্র কতকটা হিন্দু মতে স্বীয় অপরিণীতা বয়স্কা কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন সমাজে বড় গণ্ডগোল হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের পাকা সভ্যের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ ও মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা প্রায় ৮০০০। ব্রাহ্ম মহিলাগণ সুশিক্ষিতা; অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কাগণ ইংরাজি জানেন, এবং কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও পাইয়াছেন। গৃহে তাঁহারা ইংরাজ মহিলাদিগের মত বাস করেন। লেখিকা ও তাঁহার স্বামী তাঁহাদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং লেখিকা [illegible] করেন যে, ইহাঁরা ধর্ম্মবিশ্বাস [illegible]তর সভ্যতা অবলম্বন করায়, তাঁহাদিগের হিন্দু ভগিনীগণের সহিত তাঁহাদিগের সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন

ব্রাহ্মসমাজ।

অন্যান্য।

বর্ত্তমান সেই ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ব্যথিত বিষাদার্ত্তের ব্যাকুল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

সাহিত্যসেবকের দারিদ্র্য সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। অস্মদ্দেশেও মধুসূদনের জন্য শোকগীতিতে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন:—

'হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে!'

তবে সার ওয়াল্টার ভবিষ্যতের সাহিত্যসেবকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত হতাশ সাহিত্যসেবককেও আশান্বিত করিবে, সন্দেহ নাই।

তবে এই যে লেখকের স্বপ্ন, ইহা ইংলণ্ডে বলিয়াই সম্ভব। অস্মদ্দেশে সাহিত্যের যে অবস্থা, তাহাতে এরূপ স্বপ্নও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বিবিধ।

ভারতমহিলা।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সাহিত্যে আমরা ভারতমহিলাদিগের সম্বন্ধে একজন বিদেশবাসিনীর মতের সারসংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। এবার তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর একজন বিদেশিনী মতের সারসংগ্রহ প্রদত্ত হইল।

"কুইন" পত্রে শ্রীমতী আর্ণেষ্ট হার্ট যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই এ ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন।

বনবিহারিণী হরিণীর মত অবাধ মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে অবস্থান করিয়া ইংরাজমহিলার দৃষ্টি প্রথমেই এ দেশের মহিলাদিগের অবরোধপ্রথার উপর পতিত হয়। লেখিকা বলেন যে,

অবরোধ।

ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস এই যে, ভারতরমণীদিগের অবরোধপ্রথা বড়ই কঠোর, তথায় মহিলাদিগকে অবগুণ্ঠনমুক্তা এবং আপনার উপযুক্ত কর্ম্মকরণে প্রবৃত্তা দেখিতে পাওয়া কতকটা আশ্চর্য্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতে রমণীদিগের দশ ভাগের নয় ভাগ পুরুষেরই মত স্বাধীন—তাঁহারা মুক্তাবগুণ্ঠনে একাকিনী পথে বাহির হইয়া থাকেন, এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও তাঁহারা শ্রমশীলা। এক জন বক্তার মতে, দশ ভাগের এক ভাগ অবরোধবাসিনী বলাও অত্যুক্তি; তিনি বলেন, ভারতমহিলাদিগের শতকরা চারিজনমাত্র অবরোধবর্ত্তিনী। কেবল তাঁহারাই পর্দ্দার আবরণান্তরালে, পল্লবের স্নিগ্ধচ্ছায়াময় আবরণান্তরালে কুসুমের মত, পতি পুত্র ভিন্ন অন্যের পাপদৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া মাধুরী ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

লেখিকা ইংরাজশাসিত ও দেশীয়শাসিত ভারতবর্ষে মহিলাদিগের সহিত পরিচয় করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, সর্ব্বত্রই মহিলাদিগের অবস্থা স্বামীর মানসিক এবং নৈতিক

অবস্থা।

অবস্থার উপর নির্ভর করে। একটি মুসলমানশাসিত রাজ্যে একজন সুন্দরী, সুকণ্ঠশালিনী রমণীর সহিত সাক্ষাতের কথা তাঁহার বিশেষ মনে আছে। যে কক্ষে লেখিকা ও তাঁহার সঙ্গী বসিয়াছিলেন, সে গৃহ ছবি, ফটোগ্রাফ

হইয়াছিল। গৃহকর্ত্রী প্রাচ্যদেশের বেশে সাড়ী পরিয়াছিলেন এবং বহুমূল্য হীরকাদি পরিবার জন্য তাঁহার কর্ণে ছিদ্র ছিল; কিন্তু তিনি সুন্দর ইংরাজী বলিতে পারেন; তাঁহার উচ্চারণে সামান্যমাত্র টান লক্ষিত হইয়াছিল। লেখিকা তাঁহাকে কতকগুলি ছবি দেখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন—তিনি মনোযোগের সহিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া শেষে বলিলেন, "এ সকল দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।" লেখিকার সঙ্গী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং সেই নিমন্ত্রণসমাগমে পুরুষের সংস্পর্শও থাকিবে না, বলেন; তথাপি সেই পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তাহা তাঁহার শ্বশুরের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার স্বামী শিক্ষিত এবং তিনি ইংরাজসমাজে মিশিয়া থাকেন; পত্নীর এই নিমন্ত্রণগ্রহণে তাঁহার কোনও আপত্তিই ছিল না—কেবল পিতার অমত বলিয়া তিনি কিছু করিতে পারিলেন না। ঐ বাটীর একটি বালিকা একদিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানে খেলা করিতেছিল, রাজ্যের বড় কর্তা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার এই অসাধারণ স্বাধীনতা দেখিয়া ভীত (!) হইয়া পড়েন ও তাহাকে পর্দ্দানশিন করিবার আদেশ প্রদান করেন। অল্প বয়সেই (প্রায় ৭ বৎসর হইতেই) বালিকাদিগকে অবরোধবর্ত্তিনী করা হয়—তাহারা অবরোধে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষে যে বহুবিবাহ বিশেষ প্রচলিত,এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক; হিন্দু বা মুসলমান, কাহারও মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিত নহে। কেবল বড়লোক ও রাজা মহারাজারাই বহুপত্নীত্ব সম্মানবর্দ্ধক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষিত পুরুষগণ এক বিবাহেই সন্তুষ্ট, এবং যদি কেহ স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিবাহ করে, তবে তাহাকে যথেষ্ট উপহাস সহ্য করিতে হয়।

বহুবিবাহ।

লেখিকা কোন মুসলমানরাজ্যে বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নবাবের অবরোধে গমন করিয়াছিলেন—তিনি তাহার বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকালে আটটার সময় তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী ও একদল অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সুবৃহৎ প্রাচীরমধ্যস্থিত একটি দ্বার দিয়া তাঁহারা শ্রীহীন উপবনমধ্যে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে প্রাঙ্গন পার হইয়া কত স্তম্ভশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, কত অপরিষ্কার পথ দিয়া,শেষে তাঁহারা অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। একটা উচ্চ এবং বৃহৎ কক্ষে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন—তাহার তিন দিক প্রাচীরবদ্ধ, কেবল এক দিকে বারান্দার মত খোলা। আগতাদিগের জন্য চেয়ার আনিয়া দেওয়া হইল—সে কক্ষে হর্ম্ম্যতল-আচ্ছাদনকারী ম্যাটিং ভিন্ন অন্য কোন আসবাবই নাই। কত যুবতী, কত বৃদ্ধা যাতায়াত করিতে লাগিল, বেগমের আগমনাপেক্ষায় ইহাঁরা বসিয়া রহিলেন। রমণীগণের সকলেরই বেশ উজ্জ্বলবর্ণ সাটিন বা বুটিদার কাপড়ের প্যাণ্টালুন ও উপরে বক্ষের নিম্ন পর্য্যন্ত খাটো বডিসে ঢাকা। প্যাণ্টালুনগুলা উপরে ঢিলা; কিন্তু জানুর নিম্ন হইতে এতই আঁটো যে, পরিবার পর সেলাই করিতে হয়; স্নানের জন্য সপ্তাহে এক বার করিয়া সেলাই খুলিয়া প্যাণ্টালুন খুলিতে হয় (!!!) তাহার পর দেহ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধ ও মস্তকের উপর দিয়া মস্‌লিন অথবা রেশমের শাটী ঘুরিয়া আসিয়াছে—তাহা সুন্দর ভাঁজে ভাঁজে আসিয়া পড়িয়াছে। বেগমের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল; শুনা গেল, তিনি অতিথিদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য অলঙ্কারমণ্ডিতা হইতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই ক্ষুদ্রকায়া যুবতী বেগম আসিলেন। তাঁহার পরিধানে সবুজ রঙ্গের পাজামা ও জরীর শাটী। তাঁহার অনাবৃত পদে মরকত ও হীরার অলঙ্কার—মূল্য নাকি ৪০,০০০; প্রকোষ্ঠে হীরকখচিত নানা অলঙ্কার—অঙ্গুলিতে হীরক ও চুনি বসান অঙ্গুরী [illegible]

হইবে না। কারণ, তাঁহারাই শেষোক্তদিগের সংস্কারের, শিক্ষার এবং ভারতমহিলাগণের অবস্থা উন্নত করিবার নেত্রী। কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজগৃহে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা আসনের বন্দোবস্ত আছে। যে সকল মহিলা পর্দ্দা পরিহার করেন নাই, তাঁহাদিগের জন্য এই বন্দোবস্ত; বাস্তবিক পিতা ও পতির সম্মতি সত্ত্বেও সহসা পর্দ্দা পরিহার করা তাঁহাদিগের পক্ষে বড় সহজসাধ্য নহে। কিন্তু কেহ কেহ পর্দ্দা পরিহার করেন, অথচ কোন ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করেন না। তাঁহাদের স্বপ্রধান ভাব বড় বিরক্তিজনক। ব্রাহ্মমহিলাদিগের বেশ সুন্দর। আঁটো বডিস ও নিম্নাবরণের উপর কোঁচান রেশম বা মসলিনের শাটী—এক স্কন্ধের উপর তাহা গুটাইয়া আনা হয়। গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে তাঁহারা টুপী ব্যবহার করেন, তাহাতে প্রায়ই জরীর কাজ করা। অনেক মহিলা চিকিৎসাবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা ও শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৩৬ জন দেশীয়া মহিলা পাঠ করিতেছিলেন।

মুসলমানমহিলা।

মুসলমান মহিলারা অবরোধবর্ত্তিনী, কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং পুরুষেরা তাঁহাদিগের জন্য স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন। কোন মুসলমানপ্রধান নগরে একজন শিক্ষিত ক্ষমতাশালী মুসলমান লেখিকাকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীস্বাধীনতা ভিন্ন লোকের উন্নতি হইবে না—স্বাধীনতা প্রদান করিতেই হইবে; অবরোধপ্রথার মূলে পাপ সন্দেহ বর্ত্তমান। ইনি আপনার দুহিতা ও ভগিনীকে ভ্রমণ, অশ্বারোহণ, টেনিস খেলা, অধ্যয়ন ও ইংরাজগৃহে গমন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। ইঁহার পত্নী অবরোধের অপরিষ্কার অংশ অধিকার করেন না, পরন্তু গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষ কয়টিই তাঁহার অধিকারে। বোম্বাইয়ে মুসলমান মহিলারা অবরোধচারিণী হইলেও সুশিক্ষিতা, এবং তাঁহাদিগের কার্য্যের স্বাধীনতাও অনেকটা আছে। শিক্ষাই স্বাধীনতার সোপান। মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে, শিক্ষার আলোকরশ্মি যতই প্রবেশ করিবে, ততই এ দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ধকার দূর হইবে, সন্দেহ নাই।

পার্শি সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষে পার্শিরা সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহাদের প্রভাব অল্প নহে। তাঁহারা ব্যবসায়ে সিদ্ধহস্ত; আবার সাধুতা, সত্যপ্রিয়তা ও দানশীলতার জন্যও পার্শিরা প্রসিদ্ধ। পারসেই তাঁহাদিগের আদিম নিবাস। পবিত্রচিন্তায়, পবিত্র কথায় ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানেই পার্শিদিগের মতে নৈতিক সর্ব্বস্ব। তাঁহাদিগের দানশীলতার প্রভাবে পার্শি ভিক্ষুক দৃষ্ট হয় না। পার্শিদিগের মধ্যে মহিলাগণ সম্মানিত এবং স্বাধীন; তাঁহারা সুশিক্ষিত এবং পার্শিরমণী পতিগৃহের কর্ত্রী। পার্শি রমণীদিগের পোষাক দেখিলেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। সোজা খাটো পোশাকের উপর শাটী ঘুরিয়া মাথার উপর দিয়া আসে। তাঁহারা সাধারণতঃ অনুজ্জ্বলবর্ণের কোমল রেশমের পোষাক পরিধান করেন; শাড়ীর পাড়ে সুন্দর জরীর কাজ করা। সুবেশসজ্জিত একদল পার্শি মহিলা কুসুমসুষমাসম্পন্ন বাসন্ত কুসুমকাননের মত মনোরম।

য়ুরেশিয়ান।

য়ুরেশিয়ানগণ ভারতবর্ষীয় ও য়ুরোপীয়ের মিশ্রণোৎপন্ন বর্ণসঙ্কর। তাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং য়ুরোপীয় বেশধারী উভয় জাতির মধ্যে থাকায় তাহারা কাহারও সহানুভূতি পায় না। দেশীয় ভাষাজ্ঞান যাহাতে আবশ্যক হয়, যেখানেই এমন কোন কার্য্যের প্রয়োজন, সেখানেই য়ুরেশিয়ানগণ আছেন। হাঁসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারীর শুশ্রূষাকারিণীরূপে এবং হাঁসপাতালে চিকিৎসকরূপে তাঁহারা যথেষ্ট কার্য্য করিয়েছেন।

লেখিকা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মরমণী যে কেবল ভারতমহিলাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন, তাহা নহে; জগতে তাঁহার মত স্বাধীন রমণী আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। *

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পক্ষে আর এক শুভদিনের অরুণোদয় সূচিত হইতেছে। ভারতমহিলাগণ বহুশতাব্দী হইতে আত্মত্যাগ, নম্রতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা অন্তরে সাধু ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। যখন তাঁহারা জ্ঞানের দায়িত্ব, একক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা, এবং স্বেচ্ছাপসন্দের স্বাধীনতা পাইবেন, তখন অতীতের কঠোর শিক্ষা বিফল হইবে না। পরন্তু উর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপন করিলে যেমন প্রভূত শস্যের আশা করা যায়, সেইরূপ তাঁহাদিগকে এই সকল প্রদান করিলে প্রভূত সুফলের আশা করা যায়।

উপসংহার।

মেরু প্রদেশে যাত্রা।

কবিগুরু সেক্স্‌পিয়ার বলিয়াছেন যে, উন্মাদ, প্রেমিক ও কবি, ইহারা সকলেই কল্পনাময়। কিন্তু কল্পনা কেবল ইহাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। জড়তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কঠোরতম সত্যের উপাসক বৈজ্ঞানিকও কল্পনার দাস। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাহা কল্পনাজীবীর স্বপ্নমাত্র বলিয়া বোধ হইত, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতেছে; কল্পনার সহায়তা না পাইলে বিজ্ঞান এত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতে পারিত কি?

সে দিন Geographical Congressএর অধিবেশনে, সার অ্যাণ্ড্রি "বেলুনযোগে সুমেরু যাইবার মতলব" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। অ্যাণ্ড্রির মতে তাঁহার প্রস্তাব কেবল বৈজ্ঞানিকের কল্পনামাত্র নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ সম্ভব। প্রথমতঃ, একটা বৃহৎ বেলুন আবশ্যক; সেই বেলুনে যাহাতে তিন জন আরোহী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যন্ত্রাদি, চার মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য এবং শ্লেজ-শকটে পরিণত করিবার মত একখানা নৌকা থাকিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বেলুনটি যাহাতে অন্ততঃ এক মাস কাল বায়ুসাগরে ভাসমান থাকিতে পারে, তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে গ্যাস পুরিতে হইবে —সেই জন্য প্রবল চাপ দিয়া কিছু গ্যাসও সঙ্গে লইতে হইবে। মেরু প্রদেশে বেলুনে গ্যাস পুরিতে হইবে। সমুদ্রে জাহাজের মত অনন্তনভোমণ্ডলব্যাপী বায়ুসমুদ্রে সেই বৃহৎ বেলুন ইচ্ছামত চালাইবার বন্দোবস্তও করা চাই। প্রথম দুইটা বিষয় সহজসাধ্য। মেরুপ্রদেশে বেলুনে গ্যাস পূর্ণ করিবার কথায় লেখক বলেন যে, একটা চলনসই ঘর প্রস্তুত করিয়া তথায় বেলুনে গ্যাস পূর্ণ করিলেই হইবে। বেলুন চালাইবার কথায় লেখক বলেন যে, সে কাজটা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তিনি আপনি এ বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। গত গ্রীষ্ম কালে এই বিষয় পরীক্ষার জন্য যে বেলুনবিহার হইয়াছিল, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ কার্য্য নিতান্ত সহজ—এ উপায়ও লেখক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। বেলুনে পাইল তুলিবার সুবিধা থাকিবে। বায়ুসাগরে, বায়ুতরঙ্গের উপর হেলিয়া দুলিয়া বায়ুতাড়নে বেলুন ভরা-পাইলে বিজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাসিয়া যাইবে। পাইল ও এক বা ততোধিক লম্বিত রজ্জুর সাহায্যে বেলুন চালান যাইবে। কাজেই লেখক দেখাইয়াছেন যে, বন্দোবস্ত সবই ঠিক। লেখক ভরসা করেন যে, বেলুনে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামই পাওয়া যাইবে।

আসবাব।

সুমেরু প্রদেশের বিষয় অবগত হওয়াই এই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই যাত্রিগণ য়ুরোপ হইতে যাত্রা করিবেন। যাত্রিগণ সিপজবারজেনের উত্তর পশ্চিমে

বেলুনে গ্যাস পুরিবার জন্য একটা ঘর প্রস্তুত হইবে। তথায় বেলুনে গ্যাস পুরিয়া সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখা হইবে,—যেন সুবিধা হইলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অজ্ঞাতের উদ্দেশে যাত্রা করা যাইতে পারে। বেলুনে এমন ভাবে ভার চাপান হইবে যে, বেলুন কুজ্ঝটিকা রাশির উপরে ও মেঘমালার নিম্নে ভাসিয়া যাইতে পারে। বেলুন ঘণ্টায় ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিবে। লেখকের বিশ্বাস যে,তিনি ৪০ ঘণ্টার মধ্যে মেরুপ্রদেশে যাইতে পারিবেন ও উত্তর আমেরিকা অথবা সাইবিরিয়ার মানবের অধিবাসপূর্ণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। জুলাই মাসে এক দিন সুবিধা বুঝিয়া যাত্রা করা হইবে—উত্তরে বাতাস বহিতেছে দেখিয়া যাত্রা করিতে হইবে; কারণ, ভাল দ্রুত বাতাস পাইলে বেলুন শীঘ্রই মেরুপ্রদেশে যাইতে পারিবে। সুমেরুর মধ্য প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা অগম্য, সেই প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়াই এই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাত প্রদেশ সকলেরও সীমা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইবে। ভৌগোলিক আবিষ্কার ভিন্ন গ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক আবিষ্কারও হইতে পারে। সঙ্গে স্থান ও সময়ের নির্দ্দেশক যন্ত্রও লইতে হইবে; গতিনির্ণয়ের জন্য যন্ত্র লইতে হইবে; ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্রাদি লইতে হইবে—আরও কত কি লইতে হইবে, তাহার তালিকা দেওয়া চলে না।

যাত্রা।

লেখক বলেন যে, বেলুনযোগে যে কেবল মেরুপ্রদেশে গমনই সম্ভব, এমন নহে; মেরুপ্রদেশ বেলুনে ভ্রমণেরই বিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ, একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, যে সময় ভ্রমণ হইবে, সে সময় সূর্য্য সর্ব্বদা চক্রবালে অবস্থিতি করে। কাজেই অন্ধকারাবরণমুক্ত দৃশ্য দেখিবার সুবিধা যাত্রীদিগের অবশ্যই হইবে; বিচ্ছেদবিহীন সূর্য্যালোকের আর এক সুবিধা এই হইবে যে, বায়ুমণ্ডলের ও বেলুনের উত্তাপের সাম্য রক্ষিত হইবে। বেলুনযোগে মেরুপ্রদেশভ্রমণের আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে,সে প্রদেশ দ্রুমলতাচ্ছাদিত নহে, এবং তাই উজ্জ্বল মেরুপ্রদেশে বিদ্যুৎসঞ্চার সচরাচর হয় না। আবার প্রবলবাত্যার ভয়ও নাই, কারণ জুলাই মাসে বাত্যা বড়ই বিরল। কাজেই এ সকল দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, বহু শতাব্দীর অমনি অনুসন্ধানে যাহা হইবে, একবার মাত্র বেলুনে ভ্রমণে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ হইবার সম্ভাবনা।

সুবিধা।

অ্যাডমিরাল্ মার্কহ্যাম ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলেন যে,কথাটা ভাল, কিন্তু বেলুনবিহারী ভ্রমণকারিগণ নিম্নে কি আছে, তাহা ঠিক বলিতে পারিবেন না; কাজেই যদিও লেখক সুমেরু প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আইসেন,তথাপি তিনি যে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা অসম্ভব হইবে। তাহার পর যদি কোনও দুর্ঘটনাই ঘটে, তখন কি হইবে?

মতামত।

কেহ কেহ বলেন যে, লেখক যদিও মেরুপ্রদেশে যাইতে পারেন, তথাপি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন বড়ই সন্দেহের বিষয় বলিতে হইবে।

মুসো ব্যাবট Revue Scieu tdyigue পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,তাহাতে তিনি সার অ্যাণ্ড্রির মতলবের কতকটা সমর্থনই করিয়াছেন।

লেখক জ্ঞানবিস্তারকল্পে যে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন,—আমরা সর্ব্বতোভাবে কামনা করি, তিনি তাহাতে সফলকাম হউন। আমরা তাঁহার ভ্রমণের ফলাফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

উর্ব্বশীপুত্র 'আয়ু' রাজার অগ্নিপূজা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখকেরা একবারে মনুষ্যসৃষ্টি হইতে ইতিহাস লিখিতে বসিতেন। এই ইতিহাসলেখকেরা 'মানব'-নামক মনুষ্যবংশীয় ছিলেন, এবং পরম্পরাগত কিম্বদন্তী অনুসারে তাঁহারা আপনাদিগকে 'মনু'নামক প্রজাপতির সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু মনুর পূর্ব্বের ঘটনাবিষয়ে কিম্বদন্তীও নীরব ; সুতরাং ইতিহাসলেখকেরা কেবল কল্পনার আশ্রয় লইয়া মনুর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, মনুই আদি মানব। ঈশ্বর মনুষ্যসৃষ্টি করিতে বসিয়া অগ্রে মনুনামক প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন ;—বলা বাহুল্য যে, এই বর্ণনায় আমরা অস্মদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের শেষ সীমায় পৌঁছিলাম, এইরূপ গণ্য করিতে হইবে।

প্রজাপতি মনুর উৎপত্তিবিবরণ কাল্পনিক হইলেও, তিনি নিজে যে এক জন রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে কোনও বাধা দেখা যায় না। বেদে এই প্রজাপতির ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়, এবং প্রাচীন ঋক্-রচনাকারী ঋষিদের চক্ষে তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য। তাঁহা হইতে যখন একটি বিস্তীর্ণ মনুষ্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সার্ব্ব-জনীন বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন তাঁহার এককালীন অস্তিত্বই সমধিক সম্ভবপর। অধিকন্তু তাঁহার এক কীর্ত্তি ঋগ্বেদে অতিশয় প্রসিদ্ধ। তিনি বিচার করিয়া যজ্ঞার্হ দেবতাদের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ বলিয়া অবধারিত করিয়াছিলেন ; এবং এক অগ্নিকেই সেই ত্রয়স্ত্রিংশতের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবসমাজে ইহাই একেশ্বরবাদের প্রথম সূত্রপাত বলিয়া বিবেচনা হয়। অগ্নিতে হোম করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হইল, মনু হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র বেদ এই বিশ্বাসে আপ্লুত। আমার আরও বিবেচনা হয়,—'মনু' ইহা প্রজাপতির প্রকৃত নাম নহে, উপাধিমাত্র। তিনি একজন চিন্তাশীল ধ[illegible] ও সমাজসংস্কারক ছিলেন ;—'মনু' শব্দের অর্থই চিন্তা-শীল। তাঁহার ধীশক্তি [illegible]খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়াই তদীয় সমকালীন লোকে তাঁহাকে 'মনু' এই শ্লাঘ্য [illegible] প্রদান করিয়াছিল। এই নিখিল সংসার যে

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে আর্য্যজাতীয় লোকের মধ্যে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন অর্চ্চনার দেবতা ছিল। মনু তৎকালীন প্রধান প্রধান দেবতাকে ৩৩ সংখ্যা দিয়া, তাঁহারা যে মূলে একমাত্র ঐশী-শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র, ইহা খ্যাপন করেন। এবং অগ্নিকেই তৎসমুদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রচলিত অগ্নিপূজাতে এক নূতন ভাবের আরোপ করেন। এই ভাব হইতেই সমগ্র বেদশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, বলিতে হইবে। আর্য্যসমাজে প্রজাপতি মনু এইরূপে প্রচলিত অগ্নি-পূজার এক নূতন সংস্কার সাধন করেন। প্রাচীন রোমকেরা এবং প্রাচীন পারসীকেরাও অগ্নিপূজা করিতেন বটে, কিন্তু মনুর অগ্নিপূজা পারসীক ও রোমকদের অগ্নিপূজা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার অগ্নিপূজা হইতে বৈদিক উপাসনাপদ্ধতির জন্ম হইয়াছে।

কিন্তু এই মহামনা প্রজাপতি কোন্ দেশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। ইতিহাসের আকাশে তিনি একটি তারার ন্যায়;—আমরা তাঁহার জ্যোতিঃ দেখিতেছি; কিন্তু সে জ্যোতিঃ কত দূর হইতে আসিতেছে, তাহা বলিতে পারি না।

কালক্রমে তাঁহার বংশে 'ইলা' নাম্নী এক অসাধারণ মহিলা জন্মগ্রহণ করেন, এবং কিছুকালের জন্য তিনি মনুবংশের শাসনকর্ত্রীস্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইলার পুত্র পুরুরবা একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। পুরুরবার বিবরণে আমরা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সময়ে উপস্থিত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহার পরে বংশ-পরম্পরায় ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান নগর তদীয় রাজধানী ছিল। আমরা পূর্ব্বপ্রকাশিত পুরুরবার বিবরণে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ত্তমান কাবুল নগরেরই প্রাচীন নাম 'প্রতিষ্ঠান'। এবং শকাব্দের ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পুরুরবা বর্ত্তমান ছিলেন।

গন্ধর্ব্ব বা গান্ধারদেশীয় রীতি অনুসারে, পুরুরবা কিছুকালের জন্য উর্ব্বশী-নাম্নী এক সুন্দরী গান্ধারী রমণীর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। সন্তান উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর পতিপত্নী ভাব থাকিবে, এই নিয়মে তাঁহাদের বিবাহ হয়। উর্ব্বশী গর্ভবতী হইয়াই পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান; এবং সন্তান প্রসব করিয়া, পরে শিশুটিকে তদীয়

উর্ব্বশী ও পুরুরবার সেই পুত্রের নাম আয়ু। পুরুরবার পরলোকান্তে আয়ু মনুবংশের অধিনায়ক হইয়াছিলেন।—আয়ুর পুত্র নহুষ; নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পাঁচ পুত্র;—যদু, তুর্ব্বশ, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু,—প্রত্যেকে এক একটি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের আদিপুরুষ। ইঁহারা সকলেই "মানব ক্ষত্রিয়" ছিলেন।

ঋগ্বেদের ভূরি ভূরি স্থানে আয়ুর উল্লেখ দেখা যায়।—আমরা অদ্য তাহার মধ্যে একটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কুৎস ঋষি বলিতেছেন,—

স পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যতা-যোঃ
ইমাঃ প্রজা অজনয়ন্-মনূনাং।—ঋগ্বেদ; ১।৯৬।২

সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্য এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"স অগ্নিঃ পূর্ব্বয়া প্রথময়া অগ্নির্দেবেদ্ধ ইত্যাদিকয়া নিবিদা কব্যতা গুণিনিষ্ঠগুণাভিধান-লক্ষণাং স্তুতিং কুর্বতা আয়োঃ মনোঃ সম্বন্ধিনা উক্‌থেন চ স্তূয়মানঃ সোঽগ্নির্মনূনাং সংবংধিনীরিমাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ উৎপাদয়ৎ। মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ ইত্যর্থঃ।"

অগাধ-বেদবিদ্যাসম্পন্ন সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য এ দেশে সবিশেষ প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত; এবং তদ্রূপ বিবেচিত হইবার সম্যক কারণও আছে। কিন্তু সায়ণকে অভ্রান্ত বলিয়া ঋগ্বেদপাঠে ব্যাপৃত হইলে অনেক স্থলে ঋগ্বেদের অর্থ অস্ফুট থাকিয়া যায়। সায়ণভাষ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্বেও, প্রস্তাবিত স্থলে তদীয় ভাষ্য আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনোরম বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, তিনি মনু ও আয়ুকে অভিন্ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি 'উক্‌থেন চ' এই অংশ উহ্য করিয়াছেন, তাহাও নিষ্প্রয়োজন ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।—আয়ু এক জন 'মানব' বা মনুবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। যদি ভাষ্যে 'মনু'-শব্দে মনুবংশীয় ধরা যায়, তাহা হইলে গোল নাই;—কিন্তু ভাষ্যের বোধ হয় তদ্রূপ অর্থ নয়।

সায়ণভাষ্য অপেক্ষা এই ঋকের আরও এক অতি প্রাচীন ব্যাখ্যা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পঞ্জিকার ত্রয়স্ত্রিংশৎ কাণ্ডিকায় দৃষ্ট হয়; তাহা এই;—

"প্রজাপতির্বৈ ইদমেক এব অগ্রে আস সোঽকাময়ত প্রজায়েয় ভূয়ান্ স্যাম্ ইতি। স তপোঽতপ্যত। স বাচমযচ্ছৎ। স বৎসরস্য পরস্তাৎ ব্যাহরৎ দ্বাদশকৃত্বঃ। দ্বাদশপদা বৈ এষা নিবিৎ। এতাং বাবতাং নিবিদং ব্যাহরৎ। তাং সর্ব্বানি ভূতানি অনু অসৃজ্যন্ত। তদেতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অভ্যনুবাচঃ—'সপূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্ মনুনাম্' ইতি।"

"আদিতে একমাত্র প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন, আমি জন্মগ্রহণ করি, বহু হই। তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিলেন, মৌনী রহিলেন। সংবৎসরের পর তিনি বাক্য উচ্চারণ করিলেন। দ্বাদশ বার উচ্চারিত সেই শব্দ অর্থাৎ দ্বাদশপদবিশিষ্ট সেই শব্দ নিবিদ্ বলিয়া গণ্য। এই নিবিদ্ উচ্চারিত হইলে সকল ভূত (প্রাণী) দৃষ্ট হইল।"

সায়ণ এই ব্যাখ্যার অনুসরণ করেন নাই। ফলতঃ, এ ব্যাখ্যাও সর্ব্বাংশে মনোরম নয়। ঋকের শব্দমাত্র আলোচনা করিলে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

'কব্যতা' শব্দ লইয়াই যত গোল। 'কু—শব্দে' এই ধাতু হইতে, 'তৎ করোতি' এইরূপ অর্থে, 'কব্যৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কব্যৎ=শব্দ করিতে করিতে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতিরূপী অগ্নিই 'বাক্য উচ্চারণ করিলেন',—বলিয়া 'কব্যতার' মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।—কিন্তু মূলে কব্যতা তৃতীয়ান্ত পদ ও 'স' প্রথমান্ত পদ; ইহাতে ঐ রূপ অর্থ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?— শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবিত ঋকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—

"তিনি আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্‌থে (তুষ্ট হইয়া) মনুদিগের সন্ততি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এই অনুবাদে, সায়ণ 'আয়ুর' যে অর্থ করেন, তাহা গৃহীত হয় নাই।—তাহা ভালই হইয়াছে। তিনি "উক্‌থেন চ" বলিয়া সায়ণ যে অর্থ প্রকাশ করেন, তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাও আমার বিবেচনায় ঠিক।—কিন্তু দত্ত মহাশয়, মূলের যে নিবিদ্ শব্দ, অনুবাদে তাহা এক বারে উঠাইয়া দিয়াছেন। এইটি তাঁহার অনুবাদের দোষ।

মূলের আমি এইরূপ অন্বয় প্রস্তাব করি। যথা:—

"স অগ্নিঃ আয়োঃ কব্যতাপূর্বয়া নিবিদা (স্তূয়মানঃ)—মনুনাং ইমাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ।—"
কব্যতা=স্তুতিং কুর্ব্বতা বাক্যেন। অর্থাৎ তদ্রচিতয়া 'পূর্বয়া নিবিদা'=প্রাচীনয়া নিবিদা ইত্যর্থঃ।

তাহাতে এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে,—

"সেই অগ্নি আয়ুর প্রাচীন নিবিদরূপ বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া মনুদের এই সকল প্রজা উৎপাদন করিয়াছেন।"

এখানে অগ্নির প্রসাদে মনুবংশবিস্তারের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এবং আয়ুর রচিত প্রাচীন নিবিদ্-নামক স্তুতি তাঁহার তুষ্টির কারণ বলিয়া বর্ণিত

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আয়ুর রচিত এই প্রসিদ্ধ নিবিদ্‌টি কি ?— সায়ণাচার্য্য বলেন,—"অগ্নির্দেবেদ্ধ" ইহাই সেই নিবিদের আরম্ভ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই নিবিদের দ্বাদশটি পদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সমুদায় নিবিদ্‌টির অবয়বও প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা এই :—

১। অগ্নির্দেবেদ্ধঃ
২। অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ
৩। অগ্নিঃ সুসমিৎ
৪। হোতা দেববৃতঃ
৫। হোতা মনুবৃতঃ
৬। প্রণীর্যজ্ঞানাম্
৭। রথীরধ্বরাণাম্
৮। অতূর্তো হোতা
৯। তূর্ণির্হব্যবাট্
১০। আদেবো দেবান্ রক্ষৎ
১১। যক্ষদগ্নির্দেবো দেবান্
১২। সো অধ্বরা করতি জাতবেদঃ ॥

ঋগ্বেদ অপেক্ষা এই নিবিদ্‌মন্ত্র যে অতি পুরাতন, তাহা বলা বাহুল্য। কেন না, কুৎস একজন অতি প্রাচীন ঋগ্বেদী ঋষি; তাঁহার মুখে এই নিবিদ্ প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, দেখা যায়। অধিকন্তু, এই নিবিদ্‌টিকে স্থানে স্থানে 'পুরোরুক্' মন্ত্র বলা হইয়াছে।—বিশ্বদেব নিবিদ্ প্রভৃতি অন্যান্য যে কয়েকটি 'নিবিদ্' মন্ত্র সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের শেষে

"প্রেমাং দেবো দেবহূতিং অবতু দেব্যা ধিয়া"

ইত্যাদি বাক্য দেখা যায়; কিন্তু এই নিবিদের শেষভাগ তাদৃশ নহে।—বোধ হয়, তজ্জন্যই এই নিবিদের 'পুরোরুক্' এই পৃথক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।—পুরঃ অগ্রে রোচতে ইতি পুরোরুক্। যাহা সম্মুখে ঝলমল্ করিতেছে, তাহার নাম 'পুরোরুক' —ঋগ্বেদী ঋষিদের চক্ষুর অগ্রে এই মন্ত্র সর্ব্বদা দেদীপ্যমান ছিল, তাই ইহার নাম 'পুরোরুক্'।

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এইরূপ হয়,—

১। দেবতারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন;
২। মনুবংশীয়েরাও অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন;
৩। অগ্নি অতি সুন্দররূপে দীপ্তি পাইতেছেন।
৪। দেবতারা অগ্নিকে হোতা বরণ করিয়াছেন;
৫। মনুবংশীয়েরাও অগ্নিকে হোতা বরণ করিয়াছেন;
৬। তিনি প্রকৃষ্ট রূপে যজ্ঞ সকলের নেতা;
৭। অধ্বর সকলের রক্ষক;
৮। তিনি অজেয় হোতা;
৯। শীঘ্রগামী হব্যবহনকর্ত্তা।
১০। দেব অগ্নিদেবতাদিগকে আনয়ন করুন;

১১। দেব অগ্নিদেবতাদিগকে যজন করুন ;

১২। সেই জাতবেদা অগ্নি আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

ঋগ্বেদী ঋষিদের বিবেচনায়, আয়ু রাজার রচিত এই মন্ত্র অপেক্ষা অগ্নির প্রীতিকর বেদবাক্য দ্বিতীয় নাই। অগ্নি নামক অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে দেবতারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত করিয়াছেন ; অসীম আকাশের প্রান্তভাগে তারকাপুঞ্জেও অগ্নি দেদীপ্যমান, অপেক্ষাকৃত সন্নিকটে আকাশে সূর্য্যমণ্ডলেও অগ্নি দেদীপ্যমান, তাহার অধোদেশে মেঘমালায় বিদ্যুৎ আকারে অগ্নি দেদীপ্যমান ; পৃথিবীতেও গৃহে গৃহে অগ্নি দেদীপ্যমান। এই সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তি অন্নের মূলাধার,—প্রাণের মূলাধার,—সৃষ্টিরই মূলাধার। মনুবংশীয়েরা এই অচিন্ত্যশক্তির মহিমা চিন্তা করিয়া, উপাসনার জন্য তাঁহাকে আপনাদের যজ্ঞে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ; মহারাজ আয়ু তদ্দর্শনে বলিতেছেন,—"অগ্নি অতি সুন্দররূপে দীপ্তি পাইতেছেন!"—অগ্নি যেমন সকল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তা, তেমনি নিজেও অদ্ভুত লাবণ্যময়, সন্দেহ নাই। তদীয় মহিমা ও রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজা বলিতেছেন ;—"দেবতারা সকলে অদৃশ্য থাকিয়া এই মহাশক্তিকে মনুষ্যের চক্ষে প্রকাশিত করিয়া নরলোকে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিয়াছেন ;—দেবলোক ও নরলোকের মধ্যে অগ্নি দূতস্বরূপ। তিনি দেবতাদের সকাশ হইতে অন্ন লইয়া মনুষ্যের নিকট আসিতেছেন—এবং মনুষ্যদের উপহার লইয়া দেবতাদের নিকট যাইতেছেন। হে অগ্নি! আমাদের কি সাধ্য দেবতাদের পূজা করিব? যাঁহাদিগকে দেখি নাই, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া পূজা করিব?—আমরা তোমাকেই হোতার পদে বরণ করিলাম। তুমি সর্ব্বব্যাপী ; নরলোকেও আছ, দেবলোকেও আছ। তুমিই আমাদের হইয়া দেবতাদের পূজা সম্পাদন কর। দেবতারা আমাদের জন্য যে অন্ন পানের সৃষ্টি করিয়াছেন, দরিদ্রগণকে বিতরণের জন্য তাহা যজ্ঞস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে,—তুমি দেবতাদিগকে এখানে আনয়ন কর ;—তুমি জাতবেদা, সকলের মনোভাব বুঝিতে পার,—আমাদের মনোভাব তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন কর। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে দৃষ্টিপাত করুন ; আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।"

ইহাই উর্ব্বশীপুত্র আয়ু রাজার অগ্নিপূজা।

মার্কিণে ইন্দ্রজাল।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে ইন্দ্রজালের প্রভাব বিলুপ্ত হইতেছে, এবং বিজ্ঞানই ধীরে ধীরে ইন্দ্রজালের স্থান অধিকার করিতেছে। বিজ্ঞানবলে আজ সৌদামিনী সংবাদবাহিকা, সূর্য্য চিত্রকর, অগ্নি কল-পরিচালক; সমস্ত জড় জগৎ বিজ্ঞানের পদানত। বিজ্ঞানের এই রাজত্বকালে যদি ইন্দ্রজালের মহিমার কোনও কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা অবিশ্বাস্ত এবং হাস্যাস্পদ বিষয় বলিয়াই মনে হয়। ঠাকুরমার উপকথার ঝুলি হইতে অনেক ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর আমদানী করা যাইতে পারে। বালকগণের নিকট তাহা বিলক্ষণ প্রীতিকর হইলেও চিন্তাশীল পাঠকগণের তদ্বিষয়ে মনোযোগ-প্রদানের সময় নিতান্ত অল্প; কিন্তু আজ আমরা যে ঐন্দ্রজালিক ঘটনার কথা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাহা 'ইলষ্ট্রেটেড্ আমেরিকান্' নামক একখানি মার্কিণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল আমেরিকার একখানি প্রধান পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, অবিশ্বাস্ত এবং বিস্ময়কর হইলেও, তাহা শ্রবণযোগ্য, এই বিবেচনায় আমরা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কিণ লেখকের পত্রখানির অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে আমি মিচিগান উপদ্বীপের উত্তরাংশে পর্য্যটন উপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এই প্রদেশের বায়ুর উপকারিতা এবং ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার আবিষ্কারের যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা শুনিয়াই আমি এই অঞ্চলে আসিবার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। ভূতত্ত্ব আমার বিশেষ প্রীতিকর বিষয়। এই প্রদেশের গিরিব্রজ এবং অরণ্যানী অনির্ব্বচনীয় সুন্দর, এখানকার নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ যেন আমাকে নবজীবন দান করিল।

"হ্যান্কক নগরের উপকণ্ঠে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল বাস করিয়াছিলাম। মধ্যে একদিন পর্ব্বতারোহণে গমন হইয়াছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া আমার ভূপরীক্ষাদণ্ড (Geological hammer) হস্তে লইয়া সন্ধ্যাকালে নগরে ফিরিতেছি, এমন সময়ে পথে একটি সুইস যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পরি-

পদব্রজে একত্র আসিলাম, তাহারই মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান অনেক ঘটনার কথা বলিয়া ফেলিলেন।

"এই যুবকের নাম অলিভারসন। ইনি একজন চিত্রকর। এই সময়ে তিনি কোন চিত্রশালায় Retoucherএর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তে Nitrate of silverএর কাল দাগ তাঁহার ব্যবসায়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট শুনিতে পাইলাম, স্থানকক হইতে সত্তর মাইল দূরে একটা কারখানায় তিনি একটি সুবিধাজনক কাজ হাতে পাইয়াছেন,কাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে তিনি কয়েক দিনের জন্য সেখানে একবার বেড়াইয়া আসিবেন। আমার ডাক্তার আমাকে দেশভ্রমণের অবাধ ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুতরাং আমি আমার এই নবপরিচিত সঙ্গীর সঙ্গে পর্য্যটনে বাহির হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল, আমরা ঠিক তিন দিনে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারি; স্থির হইল, প্রথম দিন রাত্রে ওল্‌ব্রাইট্‌ নামক একজন লোকের বাসায়, এবং দ্বিতীয় দিন রাত্রে Anderson's place নামক একটা চৌরাস্তার উপর আড্ডা লওয়া যাইবে।

"অক্টোবরের অতি সুন্দর প্রভাতে যাত্রা আরম্ভ করা গেল। চতুর্দ্দিকে স্বর্ণময় বৃক্ষপত্রবিন্যস্ত স্ফটিকস্বচ্ছ নীহারবিন্দুতে তরুণ সূর্য্যের অনুজ্জ্বল আভা বিভাসিত হইতেছিল। সেই নির্ম্মল বায়ুহিল্লোল কি স্ফূর্ত্তিকর! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা ভ্রমণ করিলাম; সন্ধ্যাকালে অলিভারসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ওল্‌-ব্রাইটের গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী দীপের ম্লান আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইলেন। এক-দল কুক্কুর চীৎকার করিয়া আমাদের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। ওল্‌ব্রাইটের গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলে একজন লোক ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, 'ভিতরে আসুন'—আমরা একটি ছোট কুঠুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, দীপালোকে অপরিচিত গৃহস্বামীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম।

"গৃহস্বামী একজন ফরাসী, স্থূলকায়, খর্ব্বদেহ, সবলবাহু এবং দৃঢ়স্কন্ধ। তাহার তীব্র জ্যোতিঃপূর্ণ চক্ষু এবং উন্নত নাসিকায় তাহার ধূর্ত্ততা এবং কৌতুক-স্পৃহা সুস্পষ্ট। স্থূল ওষ্ঠ ও ক্রমনিম্নগামী ললাট বুদ্ধি এবং তেজস্বিতার ব্যঞ্জক। ক্ষুদ্র গৃহে দুইটি কক্ষ, ছাদের উপর একটি কুঠুরী। গৃহস্বামীর নিকট আমাদের

এবং তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একটি বালিকাকে আহ্বান করিয়া লইল। আমি ইতিপূর্ব্বে এই বালিকাকে দেখি নাই, আমাদের আসিতে দেখিয়াই সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

"আহারাদির পর উননের প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে বসিয়া গৃহস্বামীর গল্প শুনিতে লাগিলাম। তাহার নাম বর্জ্জি ; সে তাহার স্বদেশীয়গণের ন্যায় সদালাপী এবং বাক্যকুশল। তাহার স্বদেশীগণ পিকার্ডি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে বটে, কিন্তু বর্জ্জির জন্মস্থান নিউ-ব্রন্সউইকে, কানাডা হইতে সে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে উঠিয়া আসিয়াছে। কথাবার্ত্তায় মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। একটি গার্হস্থ্য চিত্র আমার নয়ন-সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছিল—গৃহস্বামী গল্প করিতেছেন, তাহার ক্রোড়ে বালিকা নিদ্রিতা, তাহার সুবর্ণকান্তি কেশগুচ্ছ ললাটে ও স্কন্ধদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। অলিভারসন সমস্ত দিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কেদারার উপর বসিয়া ঢুলিতে-ছিলেন দেখিয়া, বর্জ্জির নিকট শয়নের প্রস্তাব করিলাম।

"বর্জ্জি বলিল, 'আচ্ছা, উপরের কুঠুরীতে আপনারা শয়ন করিতে যান, এই বাতিটা হাতে করিয়া যান, আমি আর একটা জ্বালাইয়া লইতেছি।'

"আমি বাতিটি হাতে লইলাম,অলিভারসন্ আগে আগে চলিলেন ; উভয়ে জীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়া উঠিতে লাগিলাম।

"অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছি, হঠাৎ নীচে গোলমাল শুনিয়া উভয়েই স্থিরভাবে দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত বালিকাটি জাগিয়া উঠিয়া বড় কাঁদিতেছে, তাই বর্জ্জি তাহাকে গালাগালি করিতেছে ; সে কিছুতেই থামে না দেখিয়া, বর্জ্জি ভয়ানক রাগিয়া উঠিল, আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, 'দেখে-ছেন মশায়, মেয়েটা কি পাজী!' তাহার পর বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'থাম্ বল্‌ছি, ফের যদি কাঁদবি তো এখনি নাক টিপে মেরে ফেলবো।'

"বালিকা তথাপি শান্ত হইল না, আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্ষিপ্তপ্রায় বর্জ্জি ক্ষণমাত্রও বিবেচনা না করিয়া কোমরবন্দ হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়া ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর ন্যায় বালিকার দিকে ছুটিয়া গেল, এবং তাহার কেশরাশি চাপিয়া ধরিয়া সেই ছুরি সবলে তাহার গলদেশে বসাইয়া দিল। ছিন্নশিরা হইতে রক্তস্রোত সবেগে উৎসারিত হইতে লাগিল, বালিকার

"আমি অলিভারসনের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠদেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, মুখ মার্ব্বেলের ন্যায় শ্বেত! আমিও নিরুপায়, আমার নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল; নীহারকণার ন্যায় শীতল ঘর্ম্মজাল মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল; হাত তুলিয়া যে সেই ঘর্ম্ম অপসারিত করি, এমন ক্ষমতা ছিল না।

"কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই ভাবে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতাম, বলা যায় না; কিন্তু বর্জ্জি যখন আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'যান, শয়ন করুন গে'—তখন আমাদের চমক ভাঙ্গিল। আমাদের হাতে অস্ত্র থাকিলে আমরা নীচে পলায়নের চেষ্টা করিতাম, এবং প্রতিবেশী ও পুলিশের লোকজনকে ডাকিয়া সেখানে জড় করিতাম। কিন্তু একখানি ছোট ছুরি ভিন্ন আমার কাছে তখন অন্য কোনও অস্ত্র ছিল না, আমার ব্যাগের মধ্যে একটা রিভলভার ছিল, কিন্তু তাহা নীচে; তখন হাতে পাওয়া শক্ত। আমাদের দুই জনেরই মনে হইল, গৃহস্বামী ক্ষিপ্ত হইয়াছে; যে কোন মুহূর্ত্তে সে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। এমন একটি গবাক্ষদ্বারও দেখিলাম না, যে পথে আমরা পলায়ন করিতে পারি। প্রভাতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এবং তাহার পর নীচে নামিয়া প্রয়োজন হইলে একটা হাঙ্গামা করিয়া বাহিরে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

"রাত্রে আমাদের উভয়ের কাহারও নিদ্রা হইল না। বোধ হইল, বুঝি ইহজন্মে আর রাত্রি প্রভাত হইবে না, কিন্তু অবশেষে বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, বর্জ্জি নীচের ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ব্রেকফাষ্টের জন্য কেটলেতে জলগরম হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারা গেল। অবশেষে বর্জ্জি সিঁড়ির উপর উঠিয়া আসিল, আমাদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনারা নীচে আসুন! সমস্তদিনই কি ঘুমাইবেন?'

"আমরা অতি সাবধানে, কতক ভয়ে ভয়ে নীচের দিকে চাহিলাম; শ্মশ্রু-বিরল মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া বর্জ্জি দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার সম্মুখে—আশ্চর্য্য! কেহ বিশ্বাস করিবেন না—সেই বালিকা সজীব এবং সুস্থ দেহে

চারিদিকে চাহিলেন, তাহার পর উন্মুক্ত দ্বারপথে দ্রুত প্রস্থান করিলে। তাঁহার সঙ্গে আমার আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

"বর্জ্জি প্রফুল্লচিত্তে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার মুখ হাস্যোৎফুল্ল; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমেশ্বরের দিব্য, আপনি সত্য বলুন, ইহার অর্থ কি? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আপনি গতরাত্রে এই বালিকাকে হত্যা করিয়াছিলেন।'

বর্জ্জি সহাস্যে উত্তর করিল, 'না, না, সে আপনার ভ্রমমাত্র; আপনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, অথবা আপনার চিন্তা আপনাকে ছলনা করিয়াছে।'

"এই কয়েকটি কথা ভিন্ন বর্জ্জির মুখে আর কোনও উত্তর পাই নাই। আমি বালিকাকে সস্নেহে ডাকিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এ যে সেই বালিকা, তাহাতে আমার আর কোনও সন্দেহই রহিল না। কারণ পূর্ব্ব-রাত্রে বালিকার ওষ্ঠের উপর একটি দাগ দেখিয়াছিলাম, এখন সেই দাগটি তেমনি দেখিতে পাইলাম।

"ব্রেকফাষ্ট শেষ হইলে গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া হ্যানককে ফিরিয়া আসিলাম। এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর যাবৎ এই রহস্যের কারণাবিষ্কারের জন্য অনেক মাথা ঘামাইয়াছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। তখন ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান ছিল না, কাগজপত্রেও এ কথা লইয়া কোনও আন্দোলন চলিত না। অনেক চিন্তার পর এখন বুঝিতে পারিতেছি, বর্জ্জি একজন পাকা যাদুকর, তাহার ইন্দ্রজালপ্রভাবে আমরা উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি ইহা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে কি?"

আমরাও জিজ্ঞাসা করি, এটি গল্প, না সত্য?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রাদেশিক অবস্থা ও মেটেরিওলজি।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, আজ কাল নানা জটিল প্রাকৃতিক ব্যাপারেরও সমাধান হইতেছে সত্য,—কিন্তু প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা-টির রহস্যোদ্ভেদ করা, সসীম মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্ত বহির্ভূত। অপর ঘটনা

বিষ্কৃত রহিয়াছে, এবং যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত মানবের সুখ-সচ্ছন্দতা চিরসম্বদ্ধ, নানাদেশীয় বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমবেত চেষ্টাতেও, তাহাদের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে না। প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্য এই অজ্ঞাতকারণ নানা ঘটনার মধ্যে অন্যতম,—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রবলবায়ু ও দুর্ভিক্ষাদি আপদ্, কি মূল কারণে মধ্যে মধ্যে নানা দেশে উপস্থিত হইয়া লোক-পীড়ন উপস্থিত করে, এবং কি নিয়মেই বা এই সকল উৎপাত আবির্ভূত হয়, এ পর্য্যন্ত তাহা ঠিক জানা যায় নাই। গ্রহ নক্ষত্রের উদয়াস্ত ও গ্রহণাদির সংঘটন-কাল, আমরা যে কোন সময়ে গণনা করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু প্রাদেশিক অবস্থাগণনার কোনও প্রকৃষ্ট নিয়ম নাই।

প্রাদেশিক অবস্থার গণনা সম্ভবপর হইলে, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের কার্য্যের মধ্যে ইহা যে অশেষ মঙ্গলজনক হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রতিবৎসর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবে যে সকল প্রাণী নষ্ট হইতেছে, এবং আকস্মিক ঝটিকাবর্ত্তে ধনজনপূর্ণ যে সকল অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষে বিনষ্ট হইতেছে,তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর অপরাংশের কথা ছাড়িয়া,—বৃষ্টিবাত্যাদির অনিশ্চয়তা হেতু কেবল ভারতবর্ষে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা শুনিলেও চমকিত হইতে হয়। গত ১৮৭৬ অব্দ হইতে ভারতবর্ষে যে বৎসরদ্বয় ব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রায় সত্তর লক্ষ ভারতবাসী বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং গবর্মেণ্টের প্রায় নয় কোটী ষাটি লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয় নাই,—এতদ্ব্যতীত ভারতজাত শস্তের অল্পতা হেতু, বিদেশীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের যে কত ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই,—কেবল ইংরাজ বণিক্‌দিগেরই এই হেতু প্রায় সাত কোটী পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন ১৮৭৬ সালের পূর্ব্ব বাঙ্গালার বিখ্যাত জলপ্লাবন ও ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষে যে কত প্রাণিনাশ হইয়াছে, তাহা গণনা দ্বারাও এ পর্য্যন্ত স্থির হইল না। গত ১৮৬৪ সালের বিখ্যাত শারদীয়া ঝটিকার সর্ব্বগ্রাসিনী ভীষণ-মূর্ত্তি বোধ হয় আজও অনেকের হৃদয়ে জাগরূক আছে,—এই ভয়ঙ্কর ঝটিকায় ষাট হাজার লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। দেশের এই সকল আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাষ পাইলে, ইহাদের অনিষ্টকারিতা যে অনেকাংশে নিবারিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৃষ্টিবাত্যাদির অনিশ্চয়তার জন্য জগতের অনেক ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া

বৈজ্ঞানিকসমাজে বহুকাল হইতে অনেক অনুসন্ধানাদি চলিতেছে। প্রজা-ভাগ্যের সহিত রাজকোষের অবস্থাও অল্পাধিক পরিমাণে সম্বদ্ধ জানিয়া, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ঋতুবহুল ভারতবর্ষেও, ইংরাজরাজ এ বিষয়ের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—এবং কয়েকটি সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় উন্নত জাতিগণের এই ঐকান্তিক চেষ্টায় যে এ পর্য্যন্ত কোনও ফললাভ হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইতিমধ্যে এ বিষয়ের অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে, এবং যে প্রকার উৎসাহসহকারে ইহার আলোচনা ও পরীক্ষাদি চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, শীঘ্রই প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্য ব্যাপারের একটি সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসা হইয়া যাইবে।

দেশের আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের কারণানুসন্ধানের জন্য, প্রাদেশিক নানা অবস্থার প্রতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়,—তন্মধ্যে অবস্থাবৈচিত্র্যের বিজ্ঞানসঙ্গত মূল কারণের অনুসন্ধান, এবং পৃথিবীর বিভিন্নাং-শের নানা ঘটনার সংঘটনকাল ও তাহাদের প্রকৃতিবিষয়ক ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহা হইতে উপদ্রবসংঘটনের কালসম্বন্ধে একটা নিয়মাবিষ্কারের চেষ্টা—এই দুইটিই আজ কাল বিজ্ঞানবিদ্‌গণের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে, এবং এই উভয়ের সাহায্যেই তাঁহারা এখন মেটেরিওলজি বা বায়ুনভঃশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের নানা গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে, এ পর্য্যন্ত বায়ুনভস্তত্ত্বের যে সকল বিষয় জানা গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই অনিশ্চিত ও আনুমানিক,—কাজেই বিজ্ঞানের অপরাপর উন্নত শাখার তুলনায়, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যে বায়ুনভোবিদ্যা ইহার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। বায়ুর চাপের পরিবর্ত্তনের সহিত বৃষ্টিবাত্যাদির বিশেষ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ায়, চাপমান যন্ত্র (Barometer) সাহায্যে, এখন আমরা আসন্ন বৃষ্টিপাত ও ঝটিকাগমের কথা জানিতে পারি, এবং উপস্থিত বিপদ নিবারণার্থে যথাসাধ্য সাবধান হই-বারও কিঞ্চিৎ অবসর পাই,—কিন্তু আগামী বৎসরের প্রাদেশিক অবস্থার বিবরণ, বর্ত্তমান বৎসরে জানিবার, বা বায়ুর গতি ইত্যাদির কথা ঘটনাকালের এক মাস পূর্ব্বেও প্রচারিত হইবার কোনও উপায় আজও আবিষ্কৃত না হওয়ায়, আমরা দৈব উপদ্রবের অনিষ্টকারিতা সম্যক নিবারণের কোন উপায়ই

গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক যে প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে, সাধারণের কৌতূহলনিবৃত্তি ব্যতীত ইহার আরও অনেক ব্যবহার আছে,—বহুকালের বিবরণ পর্য্যালোচনা করিয়া, প্রাদেশিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের একটি নিয়মাবিষ্কার করা, এই বিবরণসংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে ঘন ঘন অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায়, রাজস্বসংগ্রহের নানা অসুবিধা হয় দেখিয়া, এই সকল দৈববিঘ্নের প্রকৃত কারণ অবধারণের জন্য, ১৮৭৮ অব্দে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক একটি অনুসন্ধানসমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সমিতিতে তাৎকালিক অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ্ যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুকালের প্রাদেশিক অবস্থার তালিকা পরিদর্শন করিয়া, সৌর উৎপাতের (Solar activity) সহিত ভারতবর্ষের প্রাদেশিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্থির করেন, এবং এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের অবস্থাভেদে যে বৃষ্টিপতনাদির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এ কথাও প্রচার করেন। সামান্য দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অনেক সময় ইহাতে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এই চিহ্নগুলির সংখ্যা ও স্থান সূর্য্যমণ্ডলে নির্দ্দিষ্ট নাই, কোন সময়ে ইহা আমরা সমগ্র সূর্য্যাবয়বে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাই, আবার কখনও বা ইহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না ; পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রায় প্রতি একাদশ বর্ষে (১১০৪) সূর্য্যমণ্ডলে কৃষ্ণ রেখার আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই সময়ের মধ্যকালে, ইহাতে কৃষ্ণ রেখার লেশমাত্র দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি স্থানে, ঠিক প্রতি একাদশ বর্ষে, সূর্য্যমণ্ডলের চিহ্নহীন অবস্থায়, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাত হইতে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, * ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত সৌর-চিহ্নের স্বল্পতা প্রযুক্ত হইতেছে।

পণ্ডিতগণের পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য হইলে, ইহা যে বর্ত্তমান যুগের একটি মহান্ আবিষ্কার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তি আলোচনা করিলে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরোধী সম্প্রদায়ের অগ্রণী অধ্যাপক ব্ল্যাণ্ডফোর্ড বলেন, সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক অবস্থার তালিকা পর্য্যালোচনা করিলে,

* অনুসন্ধান-সমিতির অনুমানের মূল তত্ত্বটি, সভ্যগণের স্বাধীন অনুসন্ধানলব্ধ আবিষ্কার নহে। ভারতবর্ষে অনুসন্ধান আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বে সুবিখ্যাত মার্কিন জ্যোতি-

বৃষ্টিপাতাদির সহিত সৌর চিহ্নের অল্পাধিক্যের যে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না। দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশের অবস্থা সৌর উৎপাতের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উত্তর ভারতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়। গত ১৮৩৬ ও ১৮৬০ অব্দ সৌরচিহ্নাধিক্যের কাল ছিল, সুতরাং অনুসন্ধান-সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে, সমগ্র-ভারতে উক্ত দুই বৎসর সুবৃষ্টি ও প্রচুর শস্য হইবার কথা,—কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রাদেশিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, উক্ত দুই বর্ষে উত্তরভারতে বৃষ্টির লেশমাত্র ছিল না, এবং তজ্জন্য মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রকার নানা যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত জ্যোতির্ব্বেত্তা পগ্‌সন্ সাহেব, কৃষ্ণচিহ্নের বিষয় কোন আলোচনা না করিয়া, আকস্মিক বৃষ্টিবাত্যাদির উৎপত্তির অপর একটি কারণাবিষ্কারের জন্য কিছু কাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, অপরাপর পরিবর্ত্তনশীল তারকার (Variable stars) ন্যায় আমাদের সূর্য্যও ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এজন্য সেই পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ পৃথিবীতেও নানা বিসদৃশ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, সৌরপরিবারস্থ শুক্র, বৃহস্পতি ও পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ ব্যতীত আর কিছুই নহে,—শুক্র ও পৃথিবীর কক্ষপরিভ্রমণকালে, প্রতি সাত মাসে সূর্য্যমণ্ডলের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়,এবং প্রতি ৫৬ বৎসরে গ্রহরাজ বৃহস্পতি দ্বারাও সূর্য্যমণ্ডলের বিশেষ অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটে। পগ্‌সন্ সাহেব বলেন, এই দুই কারণে, সর্ব্বশক্তির আধার সূর্য্যমণ্ডলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলেও, সৌরশক্তির বিকাশস্থল পৃথিবীতে যে সেই পরিবর্ত্তন অনুভূত হইবে না, তাহা কিছুতেই সাহস করিয়া বলা যায় না। পগ্‌সন্ সাহেব, প্রাদেশিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের এই মূল কারণ অবলম্বন করিয়া, সংঘটনকাল সম্বন্ধে একটি নিয়মের আবিষ্কারের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু এই আবিষ্কার-কার্য্যে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের অবস্থার তালিকা আবশ্যক হওয়ায়, এবং বহু অনুসন্ধানেও তাহা সংগ্রহ করিতে না পারায়, তিনি অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বিষয়টির পুনরালোচনায় বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধানসমিতির কার্য্য শেষ হইলে, লিওটার্ড (L. Liotard) নামক জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ বায়ুনভোবিদ্যার উন্নতিকল্পে কিছু দিন চেষ্টা করিয়াছিলেন;

সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়াছেন। লিওটার্ড বলেন,—কোন বিশেষ জ্যোতিষিক ব্যাপার যে এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; পৃথিবীর কক্ষের বক্রতা, বা কক্ষসমতলে পৃথিবীর অক্ষরেথার অবনতি প্রভৃতি চিরনির্দ্দিষ্ট ব্যাপার দ্বারা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা চিরনির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত, তাহা হইতে তদনুরূপ নিয়মিত কার্য্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—কাযেই কক্ষের বক্রতাদি দ্বারা নিয়মিত ঋতুপরিবর্ত্তন ভিন্ন অপর কোনও অনিয়মিত ঘটনার উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে একই ঋতুতে বৎসরভেদে প্রবল ঝটিকা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিসদৃশ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় কেন ? তদুত্তরে লিওটার্ড বলেন,—গ্রহ উপগ্রহাগত প্রতিফলিত আলোকের বিশেষ কোনও ধর্ম্ম দ্বারা, এই সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সাধারণ শুভ্র সূর্য্যালোক গ্রহ উপগ্রহাদিতে পতিত হইলে, ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এবং এই বিশ্লিষ্ট আলোকের কিয়দংশ উক্ত জ্যোতিষ্ক হরণ করিয়া অবশিষ্টাংশ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে ; অপর গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কোনও প্রকারে উক্ত প্রতিফলিত আলোকপথে উপস্থিত হইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ উক্ত কিরণে আলোকিত হইয়া উঠে। লিওটার্ড বলেন, এই প্রতিফলিত আলোকের প্রভাবেই, দেশের অনিয়মিত অবস্থাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্বীয় মতের সমর্থনকালে লিওটার্ড বলিয়াছেন, সৌরপরিবারস্থ প্রত্যেক গ্রহের পরস্পর এক একটি সম্বন্ধ আছে ;—এই সম্বন্ধফলেই শনৈশ্চর ও বৃহস্পতি, ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কক্ষভ্রষ্ট করিয়া বহু যোজন দূরে টানিয়া লইয়া যায়। ইন্দ্র, বরুণ, বুধ ও মঙ্গল, সকল গ্রহই পরস্পর এই প্রকার এক একটি সম্বন্ধ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ,—সুতরাং সূর্য্যপ্রদক্ষিণকালে কোনও এক সময়ে, উক্ত সম্বদ্ধ গ্রহগুলির মধ্যে পরস্পর রশ্মির আদান প্রদান হইতে পারে না, এ কল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত গ্রহাগত উক্ত প্রতিফলিত আলোক, দেশের অবস্থাবৈচিত্র্যসাধন করিতে পারে না, এ প্রকার বিশ্বাসেরও কোনও কারণ নাই। আলোকের বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও চৌম্বক শক্তির কথা বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং এই সকল মহতী শক্তির প্রভাবে প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে না, এ কথা কে বলিতে পারেন ?

কেবল প্রতিফলিত আলোক দ্বারা কি প্রকারে পার্থিব পরিবর্ত্তন সকল

করিয়াছেন। ইনি বলেন, যখন প্রতিফলিত আলোক পার্থিব আকাশে প্রবেশ করে, তখন ইহাতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়; সূর্য্যালোকের যে সকল সাধারণ গুণ থাকে, প্রতিফলিত আলোকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না,—সাধারণ সূর্য্যরশ্মির কিয়দংশ গ্রহগণ কর্ত্তৃক হৃত হওয়ায়, প্রতিফলিত আলোক যেন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আলোকরূপে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর আকাশে, সর্ব্বদাই সূর্য্যালোকের ন্যায় এক চিরনির্দ্দিষ্ট আলোক প্রবেশ করায়, ইহা সর্ব্বদাই এক নির্দ্দিষ্ট আলোকহিল্লোলে তরঙ্গিত থাকে; পূর্ব্বোক্ত প্রতিফলিত আলোকের ন্যায় এক ভিন্ন প্রকৃতির আলোক আকাশে হঠাৎ প্রবেশ করিলে, ইহার পূর্ব্বের নিয়মিত অবস্থা লুপ্ত হইবার উপক্রম ঘটে, এবং তজ্জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। লিওটার্ড বলেন,—এই আন্দোলনের ফলে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশের পূর্ব্বনিয়মিত প্রাকৃতিক অবস্থাপ্রাপ্তির চেষ্টাতেই, অনিয়মিত বৃষ্টিবাত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশের এই অনিয়মিত অবস্থার স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সাহেব বলেন,—গ্রহদের গতির পরিমাণ দ্বারা, উপদ্রব সকলের স্থায়িত্বকাল নিরূপিত হইয়া থাকে;—যে গ্রহ অতি বেগবান, তাহার প্রতিফলিত আলোক শীঘ্রই পৃথিবীর ক্ষুদ্র সীমার বহির্ভূত হইয়া যায়। কাযেই তজ্জনিত উপদ্রবও অত্যল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয়।

লিওটার্ড সাহেবেরকৃত, প্রাদেশিক অবস্থাবৈচিত্র্যের এই নূতন সিদ্ধান্ত, অতি অল্প দিন হইল,প্রচারিত হইয়াছে; বোধ হয়, আজও বিদেশীয়বিজ্ঞানবিদ্‌গণের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এই মহান্ আবিষ্কারের দ্বারা লিওটার্ডের নাম যে চিরস্মরণীয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ভূকৈলাসের রাজকবি।

৺ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ভূকৈলাসের রাজবংশের খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষ; তিনি লর্ড কর্ণোয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের সময় বর্ত্তমান ছিলেন; সেই সময় তাঁহার নামানুসারে জয়নগর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়; * কাশীর সুপ্রসিদ্ধ 'জয়-নারায়ণ কলেজ' তাঁহার স্মৃতিজ্ঞাপক কীর্ত্তি। কিন্তু ইষ্টক ও প্রস্তরে অঙ্কিত নাম কালে লুপ্ত হইয়া যায়; যাঁহারা উচ্চ দেউল দ্বারা আকাশ চুম্বিত করিয়া স্থায়ী যশের দাবী করিয়াছিলেন, এরূপ কত বিক্রান্ত পুরুষের নাম অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; বড় বড় জঙ্গলে বেষ্টিত ইষ্টকাবলী 'জরাসন্ধ', 'ত্রিপুরাসুর' প্রভৃতি পৌরাণিক নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া অকৃতজ্ঞ-ভাবে স্বীয় নির্ম্মাতার নাম গোপন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা ৺ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অন্য একরূপ কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিব। ইহা বোধ হয় কালে তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে। কাশীবাস করিবার সময় রাজা 'কাশীখণ্ডের' একখানি অনুবাদ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন; ইহা প্রাচীন অন্যান্য অনুবাদগ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহা ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী অনুবাদ। প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক অনুবাদিত হইল, অধ্যায়ান্তে তাহা উল্লিখিত আছে। যথাঃ—

ব্যাস বিরচিত স্কন্দপুরাণ অন্তরে।
কাশীখণ্ড খণ্ডরস পানে পাপ হরে॥
রসবসু শ্লোক ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়।
ভাষাছন্দে দ্বিজ জয়নারায়ণ গায়॥

বেদরুদ্র শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অধ্যায়।
ভাষাছন্দে দ্বিজ জয়নারায়ণ গায়॥
তুরঙ্গখচন্দ্র শ্লোক তৃতীয় অধ্যায়।
ভাষাছন্দে দ্বিজ জয়নারায়ণ গায়॥ ইত্যাদি।

এই পুস্তকে অনুবাদকারকের কল্পনার দৌরাত্ম্য নাই,—আজকাল যেরূপ অনুবাদ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি ও অভিপ্রায় সঙ্গত, ইহা ঠিক সেইরূপ।

অনুবাদখানি বড় সহজে রচিত হয় নাই; যে কার্য্যই সুচারুরূপে করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতেই ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও হৃদয়ের একাগ্রতা চাই। রাজা বাহাদুরের এই সমস্ত গুণ সম্পূর্ণপরিমাণে ছিল। তিনি কতগুলি পণ্ডিতের সাহায্যে, কি ভাবে অনুবাদ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় নিজেই

দিয়াছেন। আমাদের সে সম্বন্ধে কোনও বক্তব্য নাই। তারিখের অংশটিতে লিপিকরের একটু প্রমাদ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া বিবরণটি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর।
কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর॥
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
সতরশ চৌদ্দ শাক পৌষ মাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে॥
সুব্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
পরন্ত বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়।
বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥
পচত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা।
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা॥
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ।
এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥
পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত রহিলা।
শ্রী উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥
যদ্যপি নয়ন দুটি দৈবযোগে অন্ধ।
তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥
ইষ্টনিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম।
পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী-মর্ম্ম॥
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর।
গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর॥
শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান।
শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ।
ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহারে করেন রায় তর্জ্জামা খসড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
এইমতে চল্লিশ লাচাড়ী হৈল যবে।
বিদ্যাবাগীশের কাশীপ্রাপ্তি হৈল তবে॥
ভাদ্রমাসে মুখুর্য্যা গেলেন নিজ বাটী।
বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী॥
তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥
নিজে তাঁর সহিত করিয়া পর্য্যটন।
ছয় মাসে বহু গ্রন্থ করি সংকলন॥
ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত।
পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥
তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম।
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতিধীর গুণবান॥
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার॥
ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ।
এইখানে সমাপ্ত করিলা বিরচন॥
তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া।
রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া॥
সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিশী।
কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী॥"

প্রায় এক শত বৎসর হইল, এই অনুবাদ পুস্তক বিচক্ষণ পণ্ডিতমণ্ডলীর বহু বর্ষের চেষ্টায় সংকলিত হইয়াছিল; সুতরাং সাহিত্য-জগতে ইহার জন্য একটা স্থায়ী রকমের স্থান প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

কিন্তু পুস্তকখানি শুধু অনুবাদ নহে। অনুবাদের শেষে একটি মৌলিক

চিত্রপট। এই চিত্রপট স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর তুলিতে অঙ্কিত, সুতরাং আমাদের বড় আদরণীয়। এখনও এই চিত্রপটের সঙ্গে বর্ত্তমান কাশীর কতকটা সাদৃশ্য অবশ্যই আছে ; কিন্তু আমরা যেরূপ দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে উন্নতির সোপানাবলী অধিরোহণ করিয়া প্রাচীন দৃশ্যাবলী যবনিকার পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি, আর এক শত বর্ষ পরে ৺রাজা জয়নারায়ণের অঙ্কিত এ চিত্রখানির মূল্য আশাতীত রূপে বাড়িয়া যাইবে। এখনও এই আলেখ্যখানি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একখানি অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক, অতিশয় মনোহর দৃশ্য।

পুস্তকবিশেষে পৃথিবীর বড় বড় তীর্থ গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; ম্যাণ্ডিভিলি যেরুজেলামের একখানি আলেখ্য আঁকিয়াছিলেন ; ব্যাসদেব ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে প্রাচীন কাশীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন ; নরহরি ভক্তিরত্নাকরে নবদ্বীপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন ; ইহাদের সঙ্গে ১০০ বৎসরের প্রাচীন কাশীর এই চিত্রখানি এক স্থানে রক্ষা করিবার যোগ্য।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে অংশে কাশীর তাৎকালিক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অনুবাদ গ্রন্থের পরিশিষ্টমাত্র ; এই পরিশিষ্টের প্রারম্ভ এইরূপ,—

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা শোভে কাশীতলে। যেন অর্দ্ধ শশী শোভে শশিমৌলীভালে॥

একটি কবিতার উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট মানচিত্রের পরে প্রয়োজনীয় বিবরণ গুলি প্রদত্ত হইয়াছে ; কাশীর আয়তন ;—

গঙ্গাতীরে বারাণসী দুই ক্রোশ পথ। তার মধ্যে দেড় ক্রোশ লোকের বসত॥

আমরা অতি সংক্ষেপে এই বিবরণ গুলি হইতে নোট সংগ্রহ করিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ ঘাট গুলির বর্ণনা ; ইহাদের কোন কোনটির সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ আছে ; নারদ পাঁড়ের ঘাট, প্রয়াগের শ্রীমান সিংহের ঘাট প্রভৃতি অসংখ্য ঘাটের স্থিতি ও দিক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘাটের পর পোস্তাগুলির আকৃতি, গঠন ও নির্ম্মাণকারীদিগের বিবরণ ; মিরের পোস্তা, সাজাদার পোস্তা, ব্রহ্মার পোস্তা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে ; ইহাদের সন্নিকটবর্ত্তী দালান গুলি সম্বন্ধে ইতস্ততঃ মতামত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যথা,—

তার মধ্যে পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর।
শ্রীমাধব রায়ের ধারারা নামধর॥
সুমেরুর দুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ।

একশত পনর হস্তের পরিমাণ।
নবতি হস্তের পর বসিবার স্থান॥
তাহার উপর যদি কোন জন যায়।

ছিল; যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি রাজাবাহাদুরের অবস্থিতিকালে ঐ 'ধারারা' হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিম্বা তাহার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তাহাদের এক জন রমণী-প্রেমে বঞ্চিত, অপর একজন সংসারক্লিষ্ট; কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই মরা যায় না,

অন্য একজন সেই ধারারাতে চড়ি।
দৈবক্রমে তথা হৈতে তরু পরে পড়ি॥
তরু ডাল সহ পুন হইয়া ভূমিষ্ঠ।
অনায়াসে নিজ ঘরে হইল প্রবিষ্ট॥

তার পর রাজপথ; সংক্ষেপে অনেক কথাই আছে। "শরীরের যত নাড়ী নির্ণয় হইবে। কাশীকার কুচা পথ প্রমিত নহিবে॥" এই এখন যে কার্য্য মিউনিসিপালিটি করেন, পূর্ব্বে তাহা ধর্ম্মভীরু গৃহস্থ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত;—

মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা।
দিনকর হিমকর করহীন তথা॥
একারণ নিশিযোগে পথিকের প্রীতে।
দীপশিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে॥

তৎপরে অধিবাসিগণের বৃত্তান্ত; গুজরাটী, মৈথিল, বাঙ্গালী, পঞ্চদ্রাবিড়ী প্রভৃতি নানাবিধ লোকের পরিচ্ছদ ও ব্যবসায় বর্ণিত আছে। অসংশ্লিষ্ট দর্শকের ন্যায় সরলভাবে ভাল মন্দ কথা বলিয়া যাওয়াতে, সমস্ত চিত্রপটের মধ্যে একটি হাস্যরসের উৎস সঞ্চারিত হইয়াছে; লামাগণের বৃত্তান্ত এইরূপ,—

—লামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ।
বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট॥
সদাগরী মহাজনী ব্যবসা সবার।
এক এক জনার বাটী পর্ব্বত আকার॥
সোনার কদম্ব ফুল সহিত জিঞ্জির।
কার কর্ণে শোভা করে যেমত মিহির॥
মণি সহ স্বর্ণ গুল্‌ফ কার কার গলে।
প্রবাল কনক মালা কার গলে দোলে॥

বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণগণের ছবি অতি সুন্দর; একজন শ্রদ্ধাশীল হিন্দুর তুলির আলেখ্য; "চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ পুষ্পমালা গলে"—ব্রাহ্মণগণ কি কি রাগ রাগিণীতে বেদপাঠ করিতেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীতে সে সময় প্রায়ই হত্যাকাণ্ড হইত; "এই মত প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্দ। ক্ষণে মাত্র গড়াগাড় যায় কত স্কন্ধ॥"

কাশীনিবাসী শিল্পকরগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; জোলাদের বিবরণ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

কাশীমধ্যে বহুতর জোলার বসতি।
তাহারা যে কর্ম্ম করে কহিব সম্প্রতি॥
কিম্‌খাপ জামদানী শাড়ী এক পাটা।
শাল্‌লা, গুদড় তাস পরে ধনুকপাটা॥
কাবচোরি এ সকল জরীবাব হয়।
দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মুল্যের নির্ণয়॥
সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে।
শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে॥

স্পষ্টরূপ জাগিয়া উঠিয়াছে ; তখন অহল্যা বাইর দেবমন্দির নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইদানী অহল্যাবাই হইল প্রচার। বিশ্বেশ্বর বাটী কৈল অপূর্ব্ব ব্যাপার॥
আপাদমস্তক সর্ব্ব পাষাণে নির্ম্মিত। দুই মঠ মধ্যে নাটমন্দির শোভিত।
পাষাণের খোদগারী অতি পরিপাটী। ফুল লতা পাতা তাহে কত কোটী কোটী॥
মর্ম্মরে বিশাল বৃষ বিরাজে দক্ষিণে।
* * * *
কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই নহিল কাতর॥

ইহার পরে বিষ্ণু মহাদেব নামীয় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের মন্দিরের বর্ণনা। এই বিবরণে অবগত হওয়া যায়, নবদ্বীপের কারিগরগণ কাশীতে বিশেষ আদর পাইতেন।

মধ্যে মধ্যে শিবলিঙ্গ অপূর্ব্ব পাষাণে। নদীয়ার কারিগর করিল নির্ম্মাণে॥

তার পর কাশীবাসিনী স্ত্রীলোকগণের কথা; শুদ্ধচারিণী রমণীগণের ব্রতাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার অতি বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে ; এই স্থলে সরল কথায় ও কবিতায় দীপ্তি আসিয়া পড়ে ;—

কারো উরঃ-দেশে মুক্তামালার দোলনী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥
বারাণসী জরির ওড়ণী তার পর। কালবর্ণ বাদলা নির্ম্মিত মনোহর॥

নানাদেশবাসিনী রমণীগণের ভিন্ন ভিন্নরূপ ছবি ; যেন ফটোগ্রাফের ন্যায় প্রকৃত চিত্রন ; কিন্তু কবি এ বিষয়ে বড় সতর্ক,—

এ সব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত মনোমধ্যে বৈগুণ্য নহিবে॥

কাশীবাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাজন লেখনীর মুখের চাঞ্চল্যও সংযত করিতে পারিতেন।

সর্ব্বশেষে একটি বারমাস্যা ; অর্থাৎ কাশীতে কোন মাসে কি কি উৎসব হয়, তাহার বর্ণনা। এটি বড়ই সুন্দর, নানা দেশের সমাগত লোকের নানারূপ উৎসব, বড়ই রহস্যজনকভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; কোথাও দেশোয়ালীগণের গুড়ি খেলা, কোথাও বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব, মহারাষ্ট্রবাসিগণের পূজা-পদ্ধতি। এ সমস্ত নিপুণ কারিগরের ন্যায় রাজ-কবি স্বীয় চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছেন ; অথচ তাঁহার কারিগরীর গুপ্ত তত্ত্ব আর কিছুই নহে,—সরল সত্য কথা ; যাহা হইতে উজ্জ্বল, হৃদয়স্পর্শী ও সুন্দর আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, তথাপি উপসংহারে আর দুএকটি কথা নিবেদন করিব। আমার নিকট যে পুঁথিখানি আছে, তাহার লেখক প্রেমানন্দ দাস। ইনি বোধ হয়, প্রকৃতির ফুল পল্লবের ছবি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার

তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে ফুল পল্লবের ঘ্রাণ নিঃসৃত হইয়াছে। লেখাগুলি বড় পরিপাটী, বড় সুন্দর। সে কালে সুন্দর লেখা দেখাইয়া বিবাহ করিতে হইত; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, প্রেমদাসের ভাগ্যে সুপাত্রী ঘটিয়াছিল! পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পাইয়াছি। ইহার হস্তলিপি ১৭৩১ শকের (১৮০৯ খৃঃ) প্রেমদাস লেখক আবার নিজেও এক জন সুকবি; পুস্তকের শেষে তাঁহার দুইটি সুন্দর গান আছে; গান দুইটি বৈষ্ণবী-মাধুর্য্য-মাখা দুর্গাবন্দনা। একটি এইরূপ;

রাগিণী ভৈরবী।

জয় জয় শঙ্কর মোহিনী গৌরী।
কাঞ্চন গলিত ললিত তনু জোড়ি॥
বাঁকা রজনীপতি বদন সুচারু।
বেণী রচিত কচ কুঞ্চিত হেরু॥
ভালে কিরীট মণি বিধু আধখণ্ড।
হাটক দরপণ ঝলমল গণ্ড॥
ভুরু ভঙ্গিম জিনি মনমথ-চাপ।
নয়নযুগল মৃগী খঞ্জন দাপ॥
নাসা তিল ফুল গজমতি দোল।
শ্রুতিযুগ কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
বাঁধুলী বিম্ব অধর চারু কাঁতি।
দশন করক বীজ মোতিম পাঁতি॥
কুচযুগে মণিময় হার বিরাজ।
চিত্র পটাম্বর পরিহিত মাঝ॥
সব তনু ঝলমল আভরণ সাজ।
বাহন যুগল বিরাজে মৃগরাজ॥
দশ করে অসি ইষু চর্ম্ম কোদণ্ড।
ত্রিশূল ভুজঙ্গ অসুরকুলখণ্ড॥
জয় জয় অম্বরে অমরসমাজ।
বরিষে কুসুম ঘন দুন্দুভি বাজ॥
প্রেমানন্দে করু করুণ প্রসাদ।
অন্তিমে গতি তব যুগল পাদ॥

ভূকৈলাসের রাজবংশ বঙ্গদেশে বহুমান্য; এই বংশে এককালে মহাজনের উদয় হইয়াছিল। সেই বংশের একজন রাজকবির এই কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া দীন লেখক কৃতার্থ হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

আর্য্যসমাজে বহুপত্যাত্মক বিবাহ।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশের কয়েক জন কৃতবিদ্য মহোদয়ের চেষ্টায়, মারাঠী ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অনুবাদ গ্রন্থ "বেদার্থযত্ন" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে মূল ঋক্, পদবিচ্ছেদ, অন্বয়, মারাঠী ও ইংরাজী ভাষান্তর এবং সর্ব্বশেষে বিবিধ ঐতিহাসিক টীকাটিপ্পনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা যেরূপ ভাবে সংকলিত হইতে-

বেদার্থযত্নের পর এ পর্য্যন্ত আর কেহ মারাঠী ভাষায় বেদ সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করেন নাই। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সেণ্টজেভিয়ার কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক, পণ্ডিতপ্রবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয়, বিগত জ্যেষ্ঠ মাস হইতে "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" নামক মাসিক পত্রে, "বেদার্থযত্নকারগণের স্মারক" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে, বৈদিক কালের ইতিহাস ও সমাজস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধসমূহে গবেষণা ও মৌলিকতারও সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন যে, ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১৬৬ সূক্তের মর্ম্মানুধাবন করিলে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন আর্য্যসমাজে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত ছিল। লেখক মহাশয়ের মত বিশদ করিবার জন্য, প্রথমতঃ এই সূক্তের তৎকৃত অনুবাদ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

অনুবাদ—(১) আমি গোপাল সমূহের অধিপতি 'বিরাজ্'। (হে ইন্দ্র) আমাকে শত্রুগণের হন্তা, সপত্নগণের মস্তকে পদস্থাপনকারী ও আমার সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাকে ("ঋষভ") শ্রেষ্ঠ কর। (২) আমি ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, অক্ষত ও সপত্নদিগের অবমর্দ্দকারী। এই সপত্নগণ আমার চরণতলে অবস্থিতি করিতেছে। (৩) গুণের দ্বারা ধনুকের উভয় প্রান্ত যেরূপে বন্ধন করে, আমি সেই রূপে এই স্থানেই তোমাদিগকে বন্ধন করিতেছি। হে বাচস্পতে! ইহাদিগের মন ইহাদিগকে এরূপ দংশন করুক, যেন ইহারা আমা অপেক্ষা আপনাদিগকে হীন বলিয়া মনে করে। (৪) সর্ব্বকর্ম্ম-সম্পাদনসমর্থ তেজের দ্বারা আমি তোমাদিগের পরিভবের জন্য আসিয়াছি। তোমাদিগের চিত্ত, তোমাদিগের যুদ্ধসামর্থ্য ও তোমাদিগের পরাক্রম আমি হরণ করিয়া লইতেছি। (৫) তোমাদিগের 'যোগ' (উপার্জ্জন-শক্তি) ও ক্ষেমের (রক্ষণশক্তি) দ্বারা আমি যেন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হই। আমার পদ যেন তোমাদিগের মস্তকের উপর পতিত হয়। যেমন জল মধ্য হইতে ভেকগণ শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ তোমরা আমার পদতলে থাকিয়া চীৎকার করিতে থাক।"

অধ্যাপক ভাগবত অনুমান করেন, এই সূক্তে উল্লিখিত "সপত্ন" শব্দ, "সপত্নী" শব্দের পুংলিঙ্গ। সমানপতিকা রমণীগণ যদি "সপত্নী" নামে অভিহিত হন, তাহা হইলে রমণীর সহপতিগণকে সপত্ন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ, ইহাই সপত্ন শব্দের আদিম অর্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এতদনুসারে সুভদ্রা যেমন দ্রৌপদীর সপত্নী, ভীম সেইরূপ অর্জ্জুনের সপত্ন। সপত্নীগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ থাকে, সপত্নগণের মধ্যেও সেইরূপ শত্রুতা থাকা স্বাভাবিক। লেখক আরও বলিতে পারিতেন যে, সপত্নদিগের এইরূপ বিদ্বেষপরায়ণতা হইতেই পরবর্ত্তিকালে শত্রুমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া সপত্ন শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল; এবং কালক্রমে বহুপত্যাত্মক বিবাহ আর্য্যসমাজ হইতে দূরীভূত হইলে, সপত্ন শব্দের প্রাচীন অর্থ বিলুপ্ত হইয়া, উহা "শত্রু" শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত হইল।

সর্ব্বানুক্রমপ্রণেতা কাত্যায়ন বিরাজের পুত্র ঋষভকে (ঋষভো বৈরাজঃ) এই সূক্তের ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায়, ইহা কাত্যায়নের ভ্রম বা পৌরাণিকগণের কল্পনামাত্র। তিনি বলেন, বস্তুতঃ বিরাজই এই সূক্তের ঋষি। কারণ, মূলে প্রথম ঋকেই আছে, "ঋষভং মা সমানানাং...হন্তারং শত্রূনাং কৃধি বিরাজং।" অর্থাৎ, "আমাকে সমকক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে ঋষভ বা শ্রেষ্ঠ কর; * * * বিরাজকে শত্রুগণের হন্তা কর।" এখানে "মা" এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত বিরাজং পদের অন্বয় করিলে, অর্থের সুসঙ্গতিও রক্ষিত হয়, এবং বিরাজই যে এই সূক্তের ঋষি, তাহা বুঝিতে আর কোনও কষ্টই হয় না। সুতরাং "ঋষভো বৈরাজঃ" এই কল্পনা শিথিলমূল হইয়া পড়িতেছে।

গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য (ইন্দ্রের নিকট) প্রার্থনা করিতেছেন। সমস্ত সপত্নগণকে পরাজিত করিয়া বিরাজ প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়াছিলেন, ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্য। তৃতীয় মন্ত্র পাঠে অনুমিত হয় যে, বিরাজের সপত্নগণ যতদিন না ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল বা স্বীয় সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগকে বন্দী বা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। চতুর্থ ঋকে বিরাজ তাঁহার সপত্নগণের সমক্ষে আত্ম-প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছেন। পঞ্চম ঋকে, সপত্নগণকে শেষ পর্য্যন্ত বন্দী ভাবে রাখাই বিরাজের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে। লেখক এই সূক্তকে "সপত্নসূক্ত" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অধ্যাপক ভাগবত মহোদয়ের অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অতি প্রাচীন কালে যখন আর্য্য রমণীগণের মধ্যে সহবাস সম্বন্ধে, মালাবারের নায়র জাতির ন্যায় স্বৈরাচার ও নিয়োগ প্রভৃতির বিধি প্রচলিত ছিল, তখন যে কোনও সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে বহুপত্যাত্মক বিবাহের প্রথা ছিল না, এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ, যখন মহাভারতে গোতমবংশীয়া জটিলার সপ্ত স্বামী, বার্ক্ষীনাম্নী মুনিকন্যার দশ স্বামী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী গ্রহণের বিবরণ কথনপ্রসঙ্গে এই প্রথাকে "সনাতন ধর্ম্ম" বলা হইয়াছে, তখন অধ্যাপক ভাগবতের অনুমানকে অমূলক মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগের ভূমিকার এক স্থলে অথর্ব্ব বেদসংহিতা হইতে বহুপত্যাত্মক বিবাহের অনুকূলে যে বিধিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমানের পরিপোষক। পরবর্ত্তী কালে, "নৈকস্যাঃ বহবঃ সহপতয়ঃ" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা সেই প্রথা নিবারিত হইয়াছিল।

জাপানী পুরাণ।

গত বর্ষের ভয়ঙ্কর সংগ্রামের পর হইতে চীন ও জাপানের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। চীন ও জাপানের বিবরণ শুনিতে এখনও অনেকে সমুৎসুক। বিগত আগষ্ট মাসের "কেরলকোকিল" পত্রে "জাপানী পুরাণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জাপান-প্রত্যাগত কোনও লেখক সেখানকার পুরাণপাঠপ্রথা ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে এই প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

জাপান-প্রত্যাগত লেখক বলিতেছেন, "আমার জাপানে অবস্থানকালে, 'চোওয়াজীর মন্দিরে 'প্রতি মাসের ৮ই ১৮ই ও ২৮ শে তারিখে পুরাণ পাঠ হইয়া থাকে', এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রত্যহ আমার নিকট আসিত। প্রত্যহ সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, একদিন আমার মনে জাপানের পুরাণপাঠশ্রবণের জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল। চোওয়াজীর মন্দিরে, আমার ন্যায় বিদেশীয়ের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ নহে শুনিয়া, একদিন আমার দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, পুরাণশ্রবণের জন্য মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ সাদরে এই বৈদেশিক-গণের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমরা যে মন্দিরে পুরাণ শ্রবণের জন্য গমন করিয়াছিলাম, তাহার পুরোভাগে এক বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপ; সভামণ্ডপের সম্মুখে একটি বিবিধপুষ্পতরুপূর্ণ উদ্যান, স্থানে স্থানে স্থাপিত স্বচ্ছপ্রস্তরনির্ম্মিত কারুকার্য্যময় নানাবিধ কৃত্রিম বৃক্ষ ও লণ্ঠন সমূহ মন্দিরের শোভা

সুন্দর বস্ত্রে মণ্ডিত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। পাশের দিকে ঠেসান দিয়া বসিবার উপযুক্ত একটি কেদারা ও তাহার নিকট একটি ক্ষুদ্র ভেরী (ছোট ঢোল)। এক কোণে একটি ছোট চৌকির উপর এক জন কেরাণী বিরাজমান। মন্দিরের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা তাঁহার কার্য্য। কেরাণী বাবু তাঁহার বৃহৎ চশমাটি নাকে দিয়া জানু পাতিয়া বসিলে, তাঁহাকে ভূতযোনিবিশেষ বলিয়া বোধ হইত।

চোওয়াজীর মন্দিরে পুরাণশ্রোতার সংখ্যা তেমন বেশী দেখা গেল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে পক্ককেশী প্রাচীনা, মস্তকে টাকযুক্ত বৃদ্ধ উগ্রমূর্ত্তি ভণ্ড সন্ন্যাসী, দরিদ্র বণিক্, ও কৌতুকদর্শী অল্পবয়স্ক বালকের সংখ্যাই অধিক। আমরা মন্দিরে প্রবেশের অল্পক্ষণ পরে বহুসংখ্যক দাসদাসীপরিবৃতা ও বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিতা একটি মহিলা বিশিষ্ট আড়ম্বর সহকারে মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাবভাব ও বেশবিন্যাসের মধ্যেও একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক, স্বীয় পাইপ বাহির করিয়া বিশেষ ভঙ্গী সহকারে ধূমপানে প্রবৃত্তা হইলেন। অপর শ্রোতৃগণও তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দেশলাই ও চুরুট সমূহ যন্ত্রচালিতবৎ ঘন ঘন এক হস্ত হইতে হস্তান্তরে নীত হইতে লাগিল। পুরাণপাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এই প্রকার আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সভামণ্ডপ হইতে সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কেরাণী বাবু চৌকী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত কেদারায় উপবেশন পূর্ব্বক তালে তালে ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গও সেই সঙ্গীতে যোগদান করিলেন। গীয়মান সঙ্গীতের ধ্রুবা এইরূপ,—'নামুমিয়ো ওরেন্‌গোকিয়া।' ইহা বোধ হয়, সংস্কৃত" নমামাহং ওরঙ্গাখ্যং" বাক্যের অপভ্রংশ হইতে জাত। জাপানী ভাষায় এই মন্ত্রের কোনও অর্থ হয় না। সেখানকার মন্দিরের পুজক বা পুরোহিতগণও এই মন্ত্রের অর্থ জানিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। ইহা "নিচিরন" নামক বৌদ্ধপন্থাবলম্বিগণের প্রধান মন্ত্র। শ্রোতৃবৃন্দ পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্রের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ রেশমী চোগা পরিয়া কথকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে একজন শিষ্য; তাহার হস্তে সোনালী জরীর কাপড়ে বাঁধা "হোক্কী" নামক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ। ধর্ম্মগ্রন্থখানি টেবিলের উপর একটি রেকাবীর মধ্যে রক্ষিত হইল। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি বেদী (জাপানী ভাষায় টোকোনোমা) বেদীর উপর একখানি দেবমূর্ত্তি-অঙ্কিত চিত্রপট। কথকঠাকুর সেই চিত্রপটের বন্দনা পূর্ব্বক ব্যাসপীঠে উপবিষ্ট হইয়া, শ্রোতৃগণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিন বার ঘণ্টা নিনাদ করিলেন। তার পর, ধূপ জ্বালাইয়া, ধর্ম্মপুস্তক হইতে কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন। সকলেই তাঁহার সঙ্গে সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই সকল মন্ত্র প্রাচীন চীনীয় ভাষায় রচিত ছিল বলিয়া তাহার অর্থ তদ্দেশবাসিগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়।

মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া কথকঠাকুর গ্রন্থবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলে, শ্রোতৃবৃন্দ পয়সার পুরিয়া বাঁধিয়া টেবিলের অভিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কথকঠাকুর সে দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া গম্ভীর ভাবে সেই ধর্ম্মপুস্তক হইতে আরও কতকগুলি কবিতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে, বোধ হয় কোনও দুর্ভাগ্য শ্রোতা পয়সার একটি পুরিয়াতে হাত দিয়াছিল, আর অমনি কেরাণী বাবুটি তাহার উপর চটিয়া আকাশপাতাল এক করিয়া ফেলি-

সমীপে উপস্থিত হইল। কথকঠাকুর তাহার হস্ত হইতে পানপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এক নিশ্বাসে উহা শূন্য করিয়া ফেলিলেন। বালক পুনর্ব্বার একপাত্র ও তার পর আর একপাত্র চা আনয়ন করিল; কথক মহাশয় পূর্ব্ববৎ সেগুলিও নিঃশেষ করিলেন। পানান্তর তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেদিনকার বক্তব্য বিষয় অতিশয় সরল ও সর্ব্বজনপরিচিত ছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত হোক্কী নামক গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষ অবলম্বনে সেদিন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে,তাঁহার এক একটি উপদেশ শেষ হইলে, শ্রোতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে "নমাম্মিয়ো" এই বাক্য উচ্চারণ দ্বারা তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কথক মহাশয় সহাস্য-বদনে বলিলেন,

"কিশিমোজিনের উৎসব উপলক্ষে আপনারা সকলে পবিত্র হৃদয়ে এ স্থলে সমবেত হইয়াছেন, দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। (শ্রোতৃগণ একবাক্যে-'নমাম্মিয়ো' 'নমাম্মিয়ো!') আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনারা কিশিমোজিনের কৃপালাভের জন্য চেষ্টা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না। মানবগণ সংসারাগ্নিতে পতিত হইয়া, মুক্তিলাভের নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে; এই কারণে ভগবান কিশিমোজিন সর্ব্বদা তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। (সকলে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ স্বরে-'নমাম্মিয়ো'! 'নমাম্মিয়ো!') কিন্তু সত্যের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে, কিশিমোজিনের পূজা বা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন নিরর্থক। কারণ যাহাদের হৃদয়ে সত্য-প্রীতি নাই, দেবী তাহাদের প্রতি কিছুতেই সদয় হন না। মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ স্বার্থপর ও লোভী, তাহাদের কামনার কিছুতেই শেষ হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ সত্যপ্রিয় না হইলে, সহস্র প্রার্থনাতেও তাহাদিগের কামনা পূর্ণ হইবার নহে। আপনাদের হৃদয় যদি সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বাসপূর্ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে দেবী আপনাদিগের সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিবেন। ইহাই মানবের প্রতি আমাদিগের ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক মহাত্মা নিচিরনের উপদেশ ও পরমাত্মা বুদ্ধের পবিত্র আদেশ। (সকলে ভক্তিভরে, 'নমাম্মিয়ো!' 'নমাম্মিয়ো'!,)।

"অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সরল ও পবিত্র হইলেও, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য, দুঃখ, ভয় ও সন্তোষ, এই সপ্ত বিকার তাহাকে বিকৃত করে। সুরূপ, সুস্বর, সুগন্ধ, সুগ্রাস ও সুবেশ, এই পঞ্চ বাসনা রূপ অনলের দ্বারা মানবগণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। মনুষ্য জন্মগ্রহণ মাত্র পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ বাসনার বশীভূত হইয়া অন্তঃকরণকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই কারণ, পরমাত্মা বুদ্ধ এই দুঃখময় সংসারের প্রতি ধিক্কার প্রদর্শন করিয়াছেন। (সকল সহানুভূতি ও সম্মতিপূর্ণ স্বরে,—'নমাম্মিয়ো!' 'নমাম্মিয়ো!')। মানব দেহের ন্যায় অমঙ্গল ও ঘৃণিত বস্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। বুদ্ধদেবের আদেশপালন ব্যতীত এই মলমূত্রাদিপূর্ণ অপবিত্র শরীর, বিমল ও ধুতপাপ হইবে কিরূপে?

"কবিবর 'সায়জীও'র কবিতায় ও 'রঞ্জীবোসৎসু' নামক গ্রন্থে মানবজীবনকে পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুষ্পের সৌন্দর্য্যের ন্যায় মানবজীবনের সৌন্দর্য্য ও ক্ষণভঙ্গুর। মনুষ্যগণের মধ্যে অনেকেই সংশয়িতচিত্ত ও গতানুগতিকের অনুগামী হইয়া বাসনানলে দগ্ধ হইতেছে। বুদ্ধদেবের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন এই অনল হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। বাসনানলের জ্বালাময়ী শিখার হস্ত হইতে বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার উপদেশ মনুষ্যজাতিকে ত্রাণ করিতে সমর্থ। (সকলে 'নমাম্মিয়ো!' 'নমাম্মিয়ো'!)।

"এ বিষয়ে তোমাদিগকে একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা 'রোকুসুসুপুঞ্জী' নামক কোনও সুপণ্ডিত দৈবজ্ঞ বুদ্ধদেবের সহিত এক অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। বনমধ্যে নানাজাতীয় মনুষ্যের অস্থিরাশি নিপতিত ছিল। তন্মধ্য হইতে একটি

করোটী উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধদেব সেই দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই করোটী যাহার, সে কোন্ দেশীয় ও কিরূপ চরিত্রের লোক ছিল? এবং এখন বা সে কোথায় গিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে?' দৈবজ্ঞ করোটী পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধদেবের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। বুদ্ধদেব আর একটি করোটী উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু দৈবজ্ঞ এবার বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না। তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, 'এই করোটী যাহার, সে ব্যক্তি আমার জনৈক শিষ্য ছিল; সে বাসনার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহার সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতে পারিলে না।' ইহা শুনিয়া দৈবজ্ঞ অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং সেই দিবস হইতে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সেই দৈবজ্ঞের ন্যায় সকলেরই পরমাত্মা বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (সকলে 'নমাম্মিয়ো!' 'নমাম্মিয়ো!')।

ধর্ম্মপুস্তকে আমরা যে মুক্তির বিষয় পাঠ করি, তাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে, এবং উহা প্রাপ্তির জন্য এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমনেরও কোনও আবশ্যক নাই। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের স্বরূপত্বপ্রাপ্তি ঘটে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মুক্তিলাভের জন্য বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইলে, আমাদিগকে মহাত্মা নিচিরেনের উপদেশ মত প্রথমে হৃদয়কে সত্যানুরাগের দ্বারা পূর্ণ করিয়া, পরে "নামুম্মিয়ো ওরেন্‌গোকিয়ো" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।"

এইরূপে ব্যাখ্যান শেষ করিয়া কথকঠাকুর হাস্যমুখে যেরূপভাবে শ্রোতৃগণের দিকে চাহিলেন, তাহাতে বোধ হইল, এতক্ষণ যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল, তাহা সবই যেন (তাঁহার মতে) একটা তামাসা মাত্র! এবং শ্রোতৃবৃন্দ ও সকলেই "নমাম্মিয়ো" শব্দের দ্বারা তাহার অনুমোদন করিলেন। অনন্তর কেরাণী মহাশয় পুনর্ব্বার গীতবাদ্য আরম্ভ করিলে শ্রোতৃগণ তাহাতে যোগ দিলেন। এই প্রার্থনাসঙ্গীত শেষ হইবার পূর্ব্বেই, কথকঠাকুর ব্যাসপীঠ হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তাঁহার শিষ্য টেবিলের উপরিস্থিত ধর্ম্মপুস্তকটি লইয়া গুরুদেবের অনুগমন করিল। এইরূপে সে দিনকার পুরাণপাঠের ব্যাপার সমাপ্ত হইল।"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা।

সময় আর যায় না।

একদিন বেলা দুটায়, রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়,
হ'য়ে অতি ক্রুদ্ধ দিনের দারুণ দীর্ঘতায়;
সে সুরু প্রদোষে, শুয়ে, উঠে, বোসে,
"দিন আর যায় না" বল্লেন শেষে রোষে।
বাহিরেতে এসে, এদিক ওদিক দেখে,
বাড়ির সব ভৃত্যগণকে পাঠালেন ডেকে;—
বল্লেন"বেটা রামা,তোর গায়ে নেই যে জামা'?—
তোর গোঁফ যে বড় সাদা?
দফাদার তোম্ ত শ্রেফ্,
বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে খাতা হয়;
যাও লে আও চাবুক—এই চন্দু কাঁহা
যাতা হ্যায়?
—এই সর্দ্দারকা নাম ক্যা?"
"হুজুর দুলারাম"—"কেয়া

এই প্রকারেতে রাজা কাউকে দিলেন ছাড়িয়ে,
রোষভরে সম্মুখ থেকে কাউকে দিলেন
তাড়িয়ে ;
কাউকে দিলেন নানা গালি মিষ্ট সুশ্রাব্যাতি ;
কাউকে দিলেন চাবুক, কাউকে দিলেন লাথি।

২

তবু সময় যায় না ; পরে 'ড্রয়িং রুমে' পৌঁছে,
নিশ্বাস ফেলি বসিলেন গিয়ে এক কৌচে ;
দেখলেন একটি সাদা বিড়াল শুয়ে আছে নীচে,
অমনি লাঠি নিয়ে রাজা ছুটলেন তার পিছে।
বিড়ালটি লাঠি খেয়ে, ঘুম থেকে উঠে,—
চারিদিক দেখে, উঠল সেখান থেকে,
সে প্রহার সম্বন্ধে, ভাল কি মন্দ এ,
বেশী আন্দোলন না ক'রে পালিয়ে গেল ছুটে ;
শুধু একবার মাথা নেড়ে, হেঁচে, কল্লে 'মেউ',
অর্থ—'ভদ্রলোকে এমন করে নাক কেউ'।

৩

রাজা ফের বসিলেন 'কৌচে' ক্লিষ্ট প্রাণে ;
দেখিলেন দীনভাবে চেয়ে ঘড়িপানে ;
পড়িলেন সুয়ে, কৌচের উপর শু'য়ে,
নিলেন একখানি ছবিওয়ালা উপন্যাস হাতে ;
এমন কি ওল্টালেনও দুই চারি পাতে ;
কিন্তু তাতেও দেখিলেন পরে অসমর্থ ;
বোধ হল বইখানার ভারি শক্ত অর্থ ;—
অসম্ভব বোঝা ;—লাইনগুলো সোজা,
কিন্তু তার ভাবগুলো এত এঁকা বেঁকা,
যে যেন সে উর্দ্দু কিম্বা পারসী-ভাষায় লেখা।
ডা'নদিক থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডা'নে,
পড়ে দেখলেন যে তার একই রকম মানে।
বই দিলেন ছুড়ে, দশ হাত দূরে ;
উঠিলেন দাঁড়াইয়া—দু তিন ঘর ঘুরে ;
তাকিয়ে নিজের চেহারায় ঘরের বড় আয়নায়
বলিলেন পুনরায়, "সময় আর যায় না এ।"

৪

শেষে ঘড়ি দেখে, পাঠালেন ডেকে,
মন্ত্রীবর্গে, পারিষদে তাহাদের বাড়ি থেকে ;
দিলেন এই আজ্ঞা যে 'শীঘ্র ও দ্রুত,
হবেন তাঁরা হাজির, নইলে নানা রকম জুতো
বন্ধ হবে ডান হাতের ব্যাপার, ঘুঘু চরবে
ভিটে।'
এই কথা শুনি, মানী ও গুণী,
পণ্ডিত ও পারিষদ ও সভ্য সমস্ত,
এসে হইলেন হাজির হ'য়ে মহা ব্যস্ত।

৫

সবাই এলে বল্লেন রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়—
"ডেকে আস্‌ছি তোমাদের করিতে উপায়,
যা'তে বিপদ সময়টা শীঘ্র কেটে যায় ;
তোমরা অতি বজ্ঞ, ঘোর অকর্ম্মণ্য,
পাল্লে না ত কোন উপায় কর্ত্তে এর জন্য,
আজ এটা নির্দ্ধারণ কর অবিলম্বে,
এখনই সকলে ভেবে ;—নহিলে নিতম্বে,
পৃষ্ঠে ও শিরে, পড়িবে অচিরে,
নবতম সভ্য প্রথায়, অতি মনঃপূত—
শপাশপ চাবুক ও দমাদম জুতো।"

৬

গতিকখানা দেখি, সবাই ভাবল "এ কি,
প্রস্তাব অসুবিধার ; নিশ্চয় নিঃসন্দ,
'বেহ্মদত্তি' চপিয়াছে মহারাজার স্কন্ধ।"
সবাই ভেবে সারা, ভেবে দিশেহারা,
কিসে প্রশমিবে রাজার নিদারুণ কোপে ;
সভায় নাহি শব্দ, সকলে নিস্তব্ধ,
কেউ টিকী নাড়ে, কেউ চুলকোয় ঘাড়ে,
কারো হাত গণ্ডস্থলে, কারো হাত গোঁফে ;
কারো পেল কাশি, কেউ বা নিশ্বাসি—
তাকায় আগে, পিছু পানে,
উপরে ও নীচু পানে,
দেওয়ালে, কড়িতে, পাখায় ;-অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে,
কেবল কেউ তাকায় না ক রাজার মুখ পানে।

৮

কহিলেন রাজা পুনঃ "জীবনটা ঘোর ফাঁকা ;
সুবিধা হোল না কিছু থেকে এত টাকা ;
সময়ই জীবনের প্রধান বিপদ ;
জীবনের প্রধান কার্য্য করা সময়-বধ।
শুনি কারুর কারুর সময় হাওয়ার মত ছোটে ;
আমার সময়টা ত দেখি এগোয় না ক
মোটে—

এত নাচ এত গান সেই রাজবাড়ি ;
রাখি এত পারিষদ মাইনে দিয়ে ধরে' ;
রাগীতে রাগীতে গেল অন্দরমহল ভরে,
তবু সময় যায় না ক ;—মুসলমানদের কালও
এ বিষয়ে ইংরেজদের চেয়ে ছিল ভাল ;
তখন নবাব, রাজারা ত, পেত বার মাসই—
সময় কাটার জন্য দিতে প্রজাদের ফাঁসি ;
এখন সময় ঠিক যেন কাছিমের মত হাঁটে।
—বল দেখি কার সময় কি রকমে কাটে ?

৯

তখন উঠিলেন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়,
নিবেদিতে কি রকমে তাঁর সময় যায়।
—"মহারাজ—কবিতা ও নভেল ও নাটক
লিখনে ও পাঠে বেশ সময় কাটে ;
আমার লেখার হোক্ বা নাই হোক্ পাঠক ;
কেউ তাতে দেয় নাক গালি, কিম্বা আটক।
গুরু বিষয়ের কাছে যাই না কভু ভ্রমে ;
নাটক, নভেল, লিখি বিনা পরিশ্রমে—
দুচারখান বই খুঁজে, সহজে চোখ বুঁজে,
বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক কিছু নাহি বুঝে,
সময় বেশ কাটে রাজন্—কিছুই না শিখে,
নাটক, নভেল, পড়ে' ;
আর নাটক নভেল লিখে।"

বলিলেন রাজা তবে, মাথায় হাত রাখি,
হাঁ যারা বয়াটে, তাদের সময় কাটে
এরূপে অনেক ; কিন্তু তবু থাকে বাঁকি।
—সে যা হক্, পূর্ণচন্দ্র তুমি অতি ছাগল,
নির্ব্বোধ ও গণ্ডমূর্খ, নিষ্কর্ম্মা ও পাগল।
আর অতি 'পাকা', রোজগারে ফাঁকা,
খাও দাও, বসে থাক, উড়োও বাপের টাকা।
—সর্দ্দার! পূর্ণচন্দ্রে না করে' কিছু বেশী,
বিদায় করে' দাও দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেশী।
করিল পাহারা শীঘ্র হুকুম তামিল রাজার ;
করিলেন পূর্ণচন্দ্র এবম্বিধ সাজার
সদাপত্তি নানা ; বলিলেন "না না—
দোহাই হুজুর"—সর্দ্দারকে করিলেন মানা,

১০

কহিলেন উঠে তবে নন্দলাল দত্ত।
"মহারাজ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সত্ব—
অধিকারী আমি ; লিখে উদার প্রবন্ধ,
ইংরাজ ও বড়লোককে দিয়ে গাল মন্দ,
চলে যায় পেটে ; দিন যায় কেটে
সুখে ; ধর্ম্মের এবং দেশ হিতৈষিতার ভাণে,
করি মেলা গোল, কাযেই অনেকেই জানে।
মহারাজ সংবাদপত্র লেখা অতি সোজা ;
দরকার শুধু ইংরাজি পত্র গুলো খোঁজা ;
আর খ্যাত লোকদের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটা ;
কদাচ 'লাইবেল' করে চাই জেল খাটা।"
রাজা বল্লেন "বটে, বুদ্ধি নাইক ঘটে
যাঁদের, তাঁদের ই'তে অনেক সময়
কাটে জানি।
কিন্তু তবু বাঁকি থাকে সময় অনেক খানি।
নন্দ তুমি ভ্যাড়া—বুদ্ধি অতি ত্যাড়া ;
—সর্দ্দার! এঁর দশবার নাক ধরে নেড়ে
১৭ কানমুটি দিয়ে এঁরে দেও ছেড়ে।
ক্রমে কার্য্যে পরিণত রাজার আদেশ ;
সে রকমে খানিক সময় কেটে গেল বেশ।
দত্ত অতি ক্লিষ্ট, আর অবশিষ্ট
সবাই বরং সে সাজায় হইলেন হৃষ্ট।

১১

কহিলেন জীবন সরকার উঠে "মহারাজ!
হিন্দু ধর্ম্ম সংরক্ষণ করা আমার কাজ ;
করি ব্যাখ্যা ধর্ম্ম, ভাগবতের মর্ম্ম,
বেদ, দর্শন, মনু, স্মৃতি,—সংস্কৃত না শিখিই,
প্রচারি যোগ ব্রহ্মচর্য্য—চালাই একখান
মাসিকী,
ইতে" বল্লেন সরকার "বিদ্যে নেইক
দরকার ;
বলা দরকার "ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব ;
তাতে আমার মাসিকপত্র কাটে 'অসম্ভব।"
রাজা বল্লেন "কর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্ম
নিয়ে নাড়াচাড়া আর মাসিকী নয় মন্দ ;
কিন্তু তা করেও সময় থাকেই [illegible]

সর্দ্দার, এ গরুর মাথা কামিয়ে গোবর
জল খাঁটি—
ঢেলে, দেওয়াও নাকে খত ৩০ গজ মাটি।
শুনে এই বাণী জীবন গেলেন বড় দমে,
উক্তরূপ স্নাত হয়ে, নাক দ্বারা ক্রমে,
৩০ গজ খাঁটি, মাপিলেন মাটি,
নাসিকার হস্তপদে ততদূর হাঁটি।

১২

কহিলেন উঠে তবে শ্রীরাম গোস্বামী।
"রাজন্, হিন্দু সমাজের সংরক্ষক আমি—
আমার কাজ অতি সোজা—দিন যায় চলি,
হিন্দুসমাজের মধ্যে করে' দলাদলি।
যদি কোন প্রভু, প্রকাশ্যে খান কভু—
কুক্কুট ইত্যাদি, ভাগ আমারে না দিয়ে,
হুলস্থূল বাধিয়ে দেই সে ব্যাপার নিয়ে।
যদি কেউ নিয়ে, বিধবার দেয় বিয়ে;
কিম্বা কেউ ফিরে আসে বিলেত
ফিলেত গিয়ে;
তখন বলি 'লাগে'; আধ্যাত্মিক রাগে,
যাই তার মস্তকটা চিবিয়ে খেতে আগে;
পেলে মেলা লোকের এরূপ বুদ্ধির বিভ্রাটে
এই রকম গোলেমালে অনেক সময় কাটে।"
বলিলেন গোপীকৃষ্ণ বিরক্ত ও ক্লিষ্ট,
"দলাদলি করেও সময় থাকে অবশিষ্ট।
যাহোক তুমি ঘোর, বিড়াল ও চোর;
সর্দ্দার বেড়াও ১৯ বার টিকী ধরে ওর;
আর মারো ২৫ চড় গালেতে সজোর।"
খেয়ে ২৫ চড় এবং ১৯ টিকীপাক,
বাহিরিলেন গোস্বামীজি চুলকাইয়া নাক।

১৩

কহিলেন শ্যামভট্ট "খেয়ে পুঁথি ঘেঁটে,
উড়ো তর্ক করে' আমার সময় যায় কেটে;
যা কিছু বাকি থাকে, দেই ফাঁকি
টিকি নেড়ে, টিকি ঝেড়ে, নস্য নিয়ে নাকে;
রাজা নেড়ে ঘাড়, বল্লেন "তুমি ষাঁড়,
নস্য নিয়েও সময়ের অনেক বাকি থাকে।
সর্দ্দার এঁর পীঠের উপর আমার ঘোড়ার
চাবুক খেয়ে ভট্ট চীৎকারিলেন অট্ট;
এবং তিনি যে এক মহাষণ্ড অতি বস্ত,
রাজার সে খেতাব করিলেন প্রতিপন্ন।

১৪

বল্লেন শ্রীতিনকড়ি ঘোষ তখন উঠে—
"মহারাজ, আমার সময় যায় ঠিক ছুটে,
অতি তাড়াতাড়ি, যেন রেলগাড়ি,
খেয়ে দেয়ে, আর খেলে তাস, পাশা,
দাবা;
তা'তে শুধু সময় ?—যায় সময়ের বাবা!
করি মিলে কয় এয়ার ফরাসেতে বসে,
'পঞ্জা' 'কচেবার' আর 'কিস্তি' দেই কসে';
মাঝে মাঝে টানি হুঁকো তাকিয়ায়
দিয়া ঠেস;
তাতে আমাদের সময়টা কেটে যায় বেশ।"
রাজা বল্লেন না, না, আমার আছে জানা,
খেলে সময় অনেক যায়, তবু সব যায় না,
তিনকড়ি ঘোষ, তুমি একটি মোষ'—
সর্দ্দার দেও ঝাঁটাইয়া অকর্ম্মণ্যটাকে,
অন্তঃপুর হ'তে এল মনোহর ঝাঁটা,
চীৎকারিলেন তিনকড়ি—নবমীর পাঁটা;—
সম্মার্জ্জনী আহার, নিকটেও তাঁহার,
এমন কিছু নুতন নয় ত—দাগই আছে
পীঠে।
তবে কিনা মিঠে হাতের হোলে হ'ত মিঠে।

১৫

কহিলেন উঠে' তখন কৃষ্ণকমল মুখো'।
"মহারাজ আমি খেলিনে তাস,
টানিনে হুঁকো;
আমি কাটাই কোনরূপে সকাল
থেকে সন্ধ্যে,
আফিং খেয়ে, ঢুলে, শুয়ে হাঁই তুলে,
বসে ফরাসে, আর মিলে কয় এয়ার,
তাকিয়ায় ঠেসে, রাজা বাদশাহ সম্বন্ধে,
সবাই করি উড়ো গল্প; আর তিন তুড়িয়ে,
সময়ের চৌদ্দ পুরুষকে দেই উড়িয়ে।
রাজা বল্লেন "কৃষ্ণকমল তুমি অতি হাতি;

সর্দ্দার ছেড়ে দেও এঁরে দিয়ে দশ লাথি।
৮২ র ওজন ১০ লাথি ভোজন,
করি মুখার্জি পো চম্পট দশ দীর্ঘ যোজন।

১৬

রাধানথ চট্ট উঠে বলিলেন ;—"রাজা—
আমার সময় কাটে খেয়ে গুলি
এবং গাঁজা——
আর অতি সরস, ভাঙ্গ ও চরস—
স্রোতের মত চলে যায় মাস ও বরষ ;
কতিপয় নব্য, বর্ব্বর অসভ্য,
এগুলির গৌরব চান করিবারে খর্ব্ব ;
খেতেন স্বয়ং শিব—জানেন পুরাণজ্ঞ সর্ব্ব।
রাজা বল্লেন "রাধা, তুমি অতি গাধা,
গাঁজা গুলিতে যায় না সমস্ত বর্ষটি ;
—সর্দ্দার ছেড়ে দেও এঁরে মেরে বিশ চটি।"
চটি খেয়ে চট্টজি ত দিয়ে তিন লাফ,
সভাগৃহ হ'তে চোঁচা ছুটিলেন সাফ।

১৭

উঠে বলিলেন শেষে রামকান্ত বন্দ্যো' ;
—ফোলা তাঁর গাল, চোখ তাঁর লাল,
চলি আগে পাশে, এড়ো এড়ো ভাবে ;
"কাজ কর্ম্মের সঙ্গে আমার নাই 'নামগন্ধ'।
আমার সময় বেশ্ যায়, ব্রাণ্ডি ও
বেশ্যায় ;
করিনেক আমি কোন ছোট লোকের
নেশায় ;
মহারাজ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও সভ্য,
সদুপায় সময়কে করিবারে বধ,
এই দুই যুগ্ম দ্রব্য—বেশ্যা ও মদ ;
বেশ্যাসক্তি সত্য এ ছিল পূর্ব্বেও মর্ত্তে এ,
আর সোমরস নামে, ঋষিরা লেখেনও,
সেকালেও এক প্রকার ছিল মদ খেনো।
কিন্তু কভু, কোথায় সুরা সভ্য প্রথার
পান ছিল না—স্বীকার সবাই কর্বেন
এই কথায়।
ইংরাজি প্রথায় ব্রাণ্ডি কিম্বা হুইস্কি পান,
সময় বধের অতি অব্যর্থ সন্ধান।
বেশ্যা ও মদ, উৎকৃষ্ট ঔষধ,
যাদের সময় ভারি হয়ে' মাথার উপর ঝোলে,

তারা খাটো করে দেয়—এমন কি—'প্রময়'।
রাজা বল্লেন ইতে সময় যায় বটে দ্রুত—
কিন্তু তবু খানিক বাঁকি থাকেই,—বস্তুতঃ
তুমি অতি শুয়োর, স্বভাব অতি কু ; ওর
ধরে মুখে মারো সর্দ্দার ৭ বুট জুতো,
খেয়ে ৭ ডসনের অত্যুত্তম বুট,
রামকান্তের অবিলম্বে নেশ্যা গেল ছুট।

১৮

সবারে তাড়িয়ে দিয়ে—বেলা তখন ৬টা—
রাজার মেজাজ হ'ল আরো খারাপ ও চটা ;
বস্‌লেন গিয়ে বেগে, বাড়ির মধ্যে রেগে ;
বলিলেন শেষে—"হায় এখনও দুঘণ্টা ;
—গ্রীষ্মের বেলা—কিই বা করি এতক্ষণটা ?
করেছেন অতি মূর্খ অপদার্থ ব্রহ্মা,
জীবনটা ঘোর ছোট ও সময়টা ঘোর লম্বা।
লিখ্‌লে পড়্‌লে চোটে মাথা ধরে' ওঠে ;
সে জন্যে সে কাজ কর্ত্তে পারিনাক মোটে।
জমীদারী কাযে মন বসে না ;—তা যে
নীরস ; আর কায কর্ম্ম রাজাদের কি সাজে ?
দেখিয়াছি বহু উপায় কাটাইতে বেলা ;
অনেক রকম নেশা, অনেক রকম খেলা,
"অনেক রকম রঙ্গ," অনেক রকম সঙ্গ,
অনেক রকম অত্যাচার স্বাস্থ্য করি ভঙ্গ—
বিলাস, সম্ভোগ ভড়ং—টাকার বা সাধ্য,
করেছি ত সর্ব্ববিধ আমোদের শ্রাদ্ধ।
তবু সময় যায় না ক ; দেখ্‌ছি ভেবে সব
রাজা রাজাদের সময় যাওয়াই অসম্ভব।

১৯

"এখন কি যায় করা ?—
কোথায় বা যায় যাওয়া ?"
রাজা উপায় না পেয়ে, উঠ্‌লেন যেন
হাঁপিয়ে,
যেন বন্ধ হল সেই ঘরের মধ্যের হাওয়া,—
চাকর গিয়েছে ছাড়ান ; বিড়াল গিয়াছে
তাড়ান ;
মন্ত্রী পারিষদদের ধরে' দেওয়া গিয়েছে জুতো ;
পুনরভিনয় তার ত হয় না ; বস্তুতঃ
পুনশ্চ সে সব, করা অসম্ভব ;

তাই গেলেন রাজা—বেধা অতি
সোজা—ভেবে
চীনে নয়, ব্রহ্মে নয়, মাদ্রাজ নয়, বম্বে নয়,
নয় আমেরিকা আফ্রিকা ইউরোপে—
আকাশে নয় পাতালে নয়,—
রাজা গেলেন ক্ষেতে।

কুরুক্ষেত্র।

(৩)

(দর্শনাংশ)

ইরাজ সমালোচক ম্যাথু আরনল্ডের মতে কাব্য জীবনসমালোচনার নামান্তর। পরন্তু ঐ সমালোচনার ভাষায় সৌন্দর্য্য ও ভাবে সত্য সন্নিবিষ্ট থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সুন্দর ভাষা ও সত্যভাব সংযুক্ত জীবন সমালোচনাই কাব্য। কাব্যের এই লক্ষণে কিছু অব্যাপ্তি দোষ আছে। প্রকৃতি বা বর্ণনা কি কাব্যের অন্তর্গত নহে? অথচ সে বর্ণনায় জীবন সমালোচনার গন্ধমাত্র নাই। কিন্তু একবার অবশ্য স্বীকার্য্য যে যাহাকে কাব্যে দার্শনিকতা বলে অর্থাৎ জীবতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক প্রসঙ্গের কবিতাময়ী আলোচনা—সেই 'কাব্যে দার্শনিকতা'র আরনল্ড কৃত কাব্যলক্ষণ অতি উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশনা। এই সুন্দর ভাষা ও সত্য ভাব সংযুক্ত জীবন সমালোচনা, এই কাব্যে দার্শনিকতা কুরুক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। ম্যাথু আরনল্ড নির্দ্দিষ্ট কাব্য এ কাব্যের পত্রে পত্রে বিরাজমান। কুরুক্ষেত্রের এই দর্শনাংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে। 'কাব্যে দার্শনিকতার কাব্যে স্থান হইতে পারে কিনা একবার আমি অন্যত্র অলোচনা করিয়াছি।* তাহার এস্থলে পুণরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথাটার সারমর্ম্ম এই যে যাহা সুন্দর তাহাই কার্য্যের বিষয় হইতে পারে। দার্শনিকতার একটা গভীর সৌন্দর্য্য অন্তর্নিহিত আছে, কাব্যে তাহার কবিতাময় সন্নিবেশ না হইবে কেন? আর শ্রেষ্ঠ কবির দৃষ্টান্তের যদি কোন প্রামাণ্য থাকে তবে দার্শনিকতার কাব্যে প্রবেশলাভ অবশ্যম্ভাবী; কারণ, কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয় সকল কবিই নিজ নিজ কাব্যে দার্শনিকতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ব্যাস কলিদাস ভবভূতি মাঘ ভারবি সেক্ষপীয়র মিল্‌টন দান্তে গেটে সেলি ওয়াড্‌স্ ওয়ার্থ, টেনিসন ব্রাউনিং সকলেই দার্শনিক কবি।

নিদান দেখিতে পান; বিশ্বের নিষ্কামতা সাম্যনীতির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষে জগৎ সুখময় নিত্য সুখময় বোধ হইয়াছে।

দুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম
জগৎ আনন্দ রাজ্য সুখ প্রস্রবণ।
অনন্ত চাহিয়া দেখ গ্রহ উপগ্রহ
অসংখ্য বিরার্থ মূর্ত্তি ভ্রমে অহরহ
কি অচিন্ত্য প্রেমে, কিবা চিন্তাতীত ব্রতে
কি সুখে অচিন্তনীয় নিয়তির পথে
কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের উঠিছে উচ্ছ্বাস
কি সুখ সঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ।
* * * * *
এ জগৎ সুখ ময়, নিত্য সুখ ময়
নিজ বিধাতার মত। অজস্র ধারায়
ঝরে সুখ জ্যোৎসনায়, বহে ঝটিকায়
গায় কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
মলয়ের সমীরণে, ফলে তরু দলে
ফুটে ফুলে ভাসে জলে হাসে দিবালোকে।

এইরূপে কবি জগৎ তত্ত্বের নানা গভীর প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন! সে আলোচনায় সত্য জ্ঞানও সৌন্দর্য্যের সুসঙ্গত মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিলে মনে যুগপৎ আশা উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কবি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিক কথা বলেন নাই। পরোক্ষে অনেক কথাই বলিয়াছেন; তাহার পাঠক বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে আভাস পাইয়াছেন।

ঈশ্বর বিশ্বরূপ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, গুণাতীত, সর্ব্বগুণাধার. চিন্ময়, প্রেম পারাবার। তিনি নিরঞ্জন কিন্তু তাঁহার কামনা অজস্র জগৎ সুখ।

স্রষ্টা কি কামনা হীন? চেয়ে দেখ মহাসৃষ্টি
অনন্ত জগৎ সুখ কামনা তাঁহার
ঘোষিতেছে মহাবিশ্ব অনন্ত প্লাবিয়া কণ্ঠে
এ কামনা অশ্রান্ত অপার।

অনন্ত মঙ্গলময় অনন্ত করুণাময়
অনন্ত জ্ঞানের পারাবার,
বৎস! যেই নারায়ণ তাঁহার সৃষ্টিতে নিত্য
কত হত্যা কত হাহাকার।
তথাপি তাঁহার মুখ, কি প্রসন্ন প্রীতিময়
কি অনন্ত প্রেমের দর্পন।

তিনি বিধাতা, সুকৃত দুষ্কৃতের ফলদাতা; সেই জন্য জগতে

মানবের উষ্ণরক্ত বিনা মানবের পাপ
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ
না হয় মোচন যদি, মানবের মুক্তিপথ
রক্তসিন্ধু গর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ।

ভগবান্ বিশ্বরূপ—অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপের সমষ্টি। বেদান্তের ভাষায় তিনি স্থূলরূপে বিরাট, সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ আর কারণরূপে ঈশ্বর। গীতার একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা প্রশংসার সীমা-তীত। কবি চতুর্থ সর্গে স্থূল বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন।

সংখ্যাতীত সৌররাজ্য চন্দ্র তারা প্রভাকর
ঝলসিয়া মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর
*   *   *   *   *
গ্রহে গ্রহে বিধুনিত সংখ্যাতীত পারাবার
বহিতেছে সংখ্যাতীত নদনদী অনিবার
*   *   *   *   *
স্থাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত
সৃষ্টস্থিত লীনদেহে জলে জলবিম্ব মত

এ বিরাটের বর্ণনা; অবশ্য মনোজ্ঞ বলিতে হয়। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর রূপের সন্নিবেশের অভাবে এবং গীতার তুলনায় অবশ্যভাবে এ বর্ণনা অনুজ্জ্বল হইয়াছে।

জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কবি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের তীব্র কামনা প্রবাহ কেবল এক ঈশ্বরেই লীন হইয়া আত্মস্বরূপ হারাইতে পারে। সেই আধ্যাত্মিক জগতে গঙ্গা সাগর সঙ্গম।

এ তীব্র কামনা হায় কেন মানবের তরে
চাহ রূপ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর
এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা যাহার অনন্তরূপ

চাহ গুণ? এই বিশ্ব যার গুণ লীলাভূমি
সেই গুণাতীত হতে গুণীকে আবার?
চাহ প্রেম? এই বিশ্ব যার প্রেম পারাবার
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার।

এই প্রেমময় হরির নাম লইয়া প্রবন্ধ শেষ করি। বারান্তরে কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক অংশের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আফ্‌জল খাঁর অভিযান।

(উদ্দেশ্য)

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানগণের শাসনাধীন ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে মহামতি আকবরের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা ও আহম্মদ নগর, এই প্রদেশত্রয়ের সুলতান-গণের আধিপত্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের মধ্যভাগে আহম্মদ নগর রাজ্য বিধ্বস্ত ও দিল্লীশ্বরের করতলগত হয়। কেবল বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের যে সকল অংশ বিজয়পুরের সুলতানগণের শাসনাধীন ছিল, মহারাষ্ট্র দেশ তাহাদিগের অন্যতম। খৃঃ ১৪৮৭ অব্দ হইতে ১৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় শত বৎসর কাল, তাহারা নিষ্কণ্টকে মহারাষ্ট্ররাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খৃঃ মহাত্মা শিবাজী স্বদেশের উদ্ধার কামনায় বিজয়-পুর পতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদিগের অধীনস্থিত "তোরণা দুর্গ" অধিকার করেন। তোরণা দুর্গের জীর্ণ সংস্কার কালে, উহার এক অংশ খনন করিতে করিতে, শিবাজী সুবর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ কলস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানী-ভক্ত শিবাজীর নিকট এই আকস্মিক ধন লাভ দেবীর কৃপার নিদর্শন স্বরূপ বিবেচিত হইল। তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহুসংখ্যক গিরিদুর্গ ও মুসলমান শাসিত প্রদেশ সমূহের কোন কোন অংশ

তাঁহার হস্তগত হইল। শিবাজীর এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, বিজয়পুরের স্থলতান তাঁহার পিতা শাহাজীকে (১৬৪৯ খৃঃ) কৌশলে বন্দী করত কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনায় শিবাজী বিচলিত বা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট না হইয়া পিতার মুক্তি সাধনের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সম্রাট সাহজাহান্‌কে এক বিনয়গর্ভ পত্র প্রেরণ করেন। শিবাজীকে অনুগত ও আশ্রয়প্রার্থী জানিয়া শাহজাহান্ শাহাজীর মুক্তির জন্য বিজয়পুরের স্থলতানকে আদেশ প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ সাহজানের আদেশে ও অন্যান্য কতিপয় কারণে বিজয়পুরপতি শাহাজীকে কারামুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে শাহাজী মুক্তিলাভ করিলে, শিবাজী পুনরায় স্বীয় অধিকার বিস্তারে যত্নবান্ হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে "কল্যাণ" ও কঙ্কণ প্রদেশ এবং সমস্ত "ঘাটমাথা" (সহ্যাদ্রির মালভূমি) অধিকার করিলেন। শিবাজীর ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের স্থলতান তাঁহার দমনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপগড় নামক গিরিদুর্গের সন্নিকটে শিবাজীর সৈন্যদলের সহিত ইহাদিগের যুদ্ধ হয়। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে এই ঘটনা "প্রতাপগড়ের যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংরাজগণের রচিত ইতিহাসে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা :—

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের স্থলতান ১২ সহস্র সৈন্য সহ আফ্‌জল খাঁ নামক জনৈক স্থপ্রসিদ্ধ সেনানায়কে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আফ্‌জুল খাঁকে সসৈন্যে আগমন করিতে দেখিয়া স্থচতুর শিবাজী অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার পূর্ব্বক স্বীয় ব্যবহারের জন্য অতিশয় দুঃখ ও আফ্‌জলের শরণাগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সরল হৃদয় আফ্‌জল তাঁহার কপটতা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। সাক্ষাৎ কালে শিবাজী আলিঙ্গনচ্ছলে আফ্‌জলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, হস্তস্থিত গুপ্ত অস্ত্রের (বাঘনখ ও বৃশ্চিকাস্ত্রের) আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। এইরূপ ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আফ্‌জল খাঁ নিহত হইলে, শিবাজীর সৈন্যগণ সহসা শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের পরাজয় সাধন করে।"

ইংরাজ লেখকগণের ইতিহাসে আফ্‌জল খাঁর অভিযানের এইরূপ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত ও সেই সঙ্গে শিবাজীকে "ঘোর বিশ্বাসঘাতক" ও "অতিশয় পাষণ্ড" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণ (ইতিহাস লেখকগণ) আফ্‌জল খাঁকেই অতিশয় ক্রুর ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে আফ্‌জল খাঁ কনকগিরির যুদ্ধে শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাম্ভাজীকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। এবারেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শিবাজীকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। শিবাজী তাহা অবগত হইয়া আত্মরক্ষা ও তাহার অসদভিপ্রায়ের যথোচিত দণ্ড বিধানের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদুভয় বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি কি পরিমাণে সত্য ও সুসঙ্গত তাহার নির্ণয় করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ইংরাজ রচিত যে সকল ইতিহাস গ্রন্থে শিবাজীর বিবরণ সংকলিত হই-য়াছে, তন্মধ্যে ক্যাপ্‌টেন জেম্‌স্‌ গ্রাণ্ট ডফ্‌ প্রণীত History of the Marthas নামক গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ও সর্ব্বজনপরিচিত। এই গ্রন্থে শিবাজীর বিবরণ যত্ন সহকারে ও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। হণ্টার ও এল্‌ফিনষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর জীবনী সংক্রান্ত আলো-চনায় এই গ্রন্থকেই অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে ডফ্‌ সাহেবের মতই আমাদিগগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভারতের অপরাপর প্রদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশে ইতিহাস গ্রন্থের নিতান্ত অভাব নাই। প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশের ইতিহাস রচনা করিয়া রাখি-য়াছেন। তাঁহাদিগের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি "বখর" নামে অভিহিত (১)। খ্যাতনামা মিশনারী ডাক্তার মিচেল বলেন,—The Maratha Country abounds with Bakhars, or narrativesof particular hlstorical events written in prose".—J. R. A. S. (Bom) Jan. 1849. মহারাষ্ট্র দেশের কৃতবিদ্যগণের চেষ্টায় এপর্য্যন্ত প্রায় ৪০ খানি বখর মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কত মহামূল্য বখর যে একবার বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে; তাহার ইয়ত্তা নাই।

গ্রাণ্টডফ্‌ সাহেব তাঁহার ইতিহাস রচনার জন্য যে সকল উপকরণ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বভাষায় রচিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তিনি স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদটীকায় বলিয়াছেন,—"শিবাজীর জীবন সংক্রান্ত ইতিহাস সংকলন বিষয়ে আমি মহারাষ্ট্রীয় বখর হইতে অধিক পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছি।" যে সকল বখরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শিবাজীর বিবরণ সংকলন করিয়াছেন, তন্মধ্যে (১) কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্কৃত "শিবাজীর বৃত্তান্ত" * (২) মহ্লার রামরাও চিটনীসপ্রণীত শিবাজীর বখর (খ), এই দুইটি গ্রন্থই প্রধান। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেই দুইখানি গ্রন্থই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তদ্ভিন্ন আরও ৩।৪ খানি প্রাচীন বখর সংগ্রহ করিয়াছি। সুতরাং গ্রাণ্টডফ্ সাহেব যেখানে Maratha M.S.S. এর উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে আমরা এই সকল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা পাইব।

শিবাজীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান ঘটনার বর্ণনা স্থলে গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব পাদটীকায় Maratha M.S.S. বা Persian M.S.S. ইত্যাকার উল্লেখ করিয়া, বর্ণিত বিষয় কোন মূল হইতে সংগৃহীত তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, শিবাজীর জীবনের দুইটি অতি প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার গ্রন্থের আধার নির্দ্দেশ বিষয়ে বড়ই মনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম চন্দ্ররাওয়ের হত্যা; ২য় আফ্জল খাঁর হত্যা। চন্দ্র রাওয়ের হত্যার দোষ ডক্ সাহেব শিবাজীর স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা স্থলে, কোনও স্থানে পাদটীকায় Persian M.S.S. অথবা Maratha M.S.S. এর কোনও উল্লেখ করেন নাই! আফ্জল খাঁর অভিযানের বর্ণনায় তিনি একবারে মৌনাবলম্বন

(ক) কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্—শিবাজীর জনৈক কর্ম্মচারী। শিবাজীর মৃত্যুর ১০।১২ বৎসর পরে ইনি "শিবাজীর বৃত্তান্ত" নামক বখর রচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই বখর অতিশয় প্রামাণিক।

(খ) এই বখর সম্বন্ধে গ্রাণ্টডফ্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—(It is) Compiled by Mulhor Rao Chitnees, from Original Memorada, and originals or copies of many original outhentic papers, written or transcribed by his ancestors, who were all persons highly distinguished at the Courts of Raigurh, Jinji and Satara. Mulhor Ram Rao's Life of Shivajee is very voluminous, but I do not think he has made a good use of the valuable etters and records in his possession. Shivajee's instructions to officers

করেন নাই সত্য ; কিন্তু উক্ত সপ্ত পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনার শেষ পংক্তির পাদটীকায় সংক্ষেপে "Maratha and Persian M.S.S. and English Records." কেবল এইটুকু উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণের কোন্ অংশ কোন্ মূল হইতে সংকলিত তিনি স্পষ্টতঃ কোথাও তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। এই-রূপ দুইটি গুরুতর বিসম্বাদিত বিষয়ের আধার নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সাহেব মহোদয় কেন এরূপ অবহেলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। ফল কথা, ডফ্ সাহেবের লেখার সহিত কাফি খাঁ ও অপরাপর মুসলমান ইতিহাস লেখকগণের উক্তি মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আফ্‌জল খাঁর অভিযানের বিবরণ তিনি প্রধানতঃ মুসলমান লেখকগণের গ্রন্থ হইতেই সংকলন করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমতঃ ডফ্ সাহেবের উক্তি, তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণের অভিপ্রায় আমাদের মন্তব্যসহ নিম্নেপ্রদান করিতেছি।

গ্রাণ্ট ডফ্ বলেন,—শিবাজীর দৌরাত্ম্য অতি ক্লেশকর ও অসহনীয় হইলে, বিজয় পুরের অধিপতি তাঁহার দমনার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া পঞ্চ সহস্র সাদী, সপ্তসহস্র সুশিক্ষিত পদাতি ও নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ সহ এক বৃহৎ সৈন্য দল সংগঠন করিলেন। আফ্‌জল খাঁ নামক একজন উচ্চ পদস্থ প্রসিদ্ধ সেনানী "স্বেচ্ছা পূর্ব্বক" এই সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে বিদায় কালে, আফ্‌জল খাঁ মুসলমান-স্বভাব-সিদ্ধদাম্ভিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক সভা মধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তুচ্ছ বিদ্রোহী শিবাজীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বিজয়পুরের সিংহাসন তলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আফ্‌জল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি বিজয়পুর হইতে প্রথমে পণ্ডর-পুর * ও পরে তথা হইতে "ওয়াঈ" (Waeen) প্রদেশে উপনীত হইলেন।" —Grant Duff.

এই বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণ বলেন, "বিজয়পুরের সুলতান শিবাজী সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য, আদিল সাহীরাজ্যের সমস্ত উজীরও

* পণ্ডরপুর—মহারাষ্ট্র দেশের এক অতি প্রধান তীর্থক্ষেত্র।

(১) ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ আদিলশাহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার অপ্রাপ্ত

আমির উমারাহগণকে রাজ সভায় আহ্বান পূর্ব্বক, শিবাজীকে ধৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎকাল প্রচলিত রীতিঅনুসারে সুলতানা একটি পাত্রে কয়েকটি তাম্বুল রাখিয়া, সমবেত আমীর উমরাহ গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনাদিগের মধ্যে যিনি শিবাজীকে ধৃত করিয়া আনিতে সমর্থ, তিনি এই তাম্বুল গ্রহণ করুন্।" সুলতানার এইরূপ আহ্বানে উপস্থিত উমরাহ-গণের মধ্যে আফ্‌জল খাঁ ব্যতীত কেহই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। কেবল আফ্‌জল খাঁ সুলতানার সম্মুখীন হইয়া, তাম্বুল গ্রহণ পূর্ব্বক "কুর্ণীশ" করত নিবেদন করিলেন,—"শিবাজী অতি তুচ্ছ পদার্থ! অধীনের প্রতি আদেশ হইলে সে "এক অশ্বে" শিবাজীকে ধৃত করিয়া আনয়ন অথবা তাহার শিরচ্ছেদ করিতেও পারে। "মেরে ডর্‌সে শিব্বা বিল্লী হোতা হ্যায়।" আফ্‌জল খাঁ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিলে, সুলতানা অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকারে সম্মানিত করিয়া বলিলেন,—"শিবাজীকে ধৃত করিয়া আনিতে পারিলে, তাহার অধিকৃত প্রদেশের শাসনভার (সুভেদারী) আপনার প্রতি অর্পিত হইবে।" এইরূপে আফ্‌জল খাঁকে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করিয়া সুলতানা তাঁহাকে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী আয়োজন সহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গর্ব্বস্ফীত আফ্‌জল খাঁ কচ করিয়া প্রথমতঃ তুলজাপুরে আগমন করিলেন। এবং হিন্দুগণের প্রতি বিদ্বেষ বশত, মহারাজ শিবাজীরও অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয় পরিবারের কুল দেবতা "ভবানীর" গণ্ডকী * মূর্ত্তি ভগ্ন ও চূর্ণ করিলেন (১), পরে তথা হইতে পণ্ঢরপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও হিন্দুদেব দেবীগণের অপমান ও দুর্দ্দশা করিয়া "ওয়াঈ" প্রদেশে আগমন করিলেন।" (ক)

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে গ্রাণ্ট্ ডফ্ সাহেব বলেন ;—আফ্‌জল খাঁকে ওয়াঈ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দেখিয়া শিবাজী প্রতাপগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (২)। এবং আফ্‌জল খাঁকে অতি বিনয়গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ করিতে

---

* গণ্ডকী নদী হইতে আনীত প্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি।

(১) (আফ্‌জল খাঁ) "পথিমধ্যে তুলজাপুর আক্রমণ করিয়া হিন্দুগণের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন।" বোম্বাই চিত্র ৩৪৭ পৃঃ।

(ক) কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ প্রভৃতি বিরচিত শিবাজী চরিত।

(২) শ্রীযুক্তবাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার বোম্বাই চিত্রে বলিয়াছেন, (শিবাজী

লাগিলেন। তিনি আফ্‌জল খাঁকে জানাইলেন যে, খাঁ সাহেবের ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী বীরপুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। খাঁ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি মধ্যস্থতা করিয়া বিজয়পুর-পতির সহিত তাঁহার সন্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি নিজের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ, তাঁহাকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অপিচ, তিনি স্বীয় ব্যবহারের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ও খাঁ সাহেবের দয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিবাজীর পুনঃ পুনঃ ঐরূপ সন্ধিসূচক প্রস্তাবে আফ্‌জল প্রীত হইলেন। তাঁহার মুসলমান-স্বভাব-সুলভ দাম্ভিকতা ও শত্রুর প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তথাপি তিনি যে শিবাজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তাহার কারণ এই যে, "ওয়াঙ্গি" হইতে সুদূরব্যাপী অরণ্যময় দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া সৈন্যসামন্ত সহ প্রতাপগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল গিরিপ্রদেশে বর্ষার প্রকোপ এরূপ প্রবল থাকে যে, সে সময় সৈন্য লইয়া ঐ সকল প্রদেশ অতিক্রমের চেষ্ট করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও দোষ হয় না। ঐ সকল কারণে, আফ্‌জল খাঁ শিবাজীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি শিবাজীর আবেদনের উত্তর প্রদানার্থ, গোপীনাথ পন্ত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে দূতরূপে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন।"—Grant duff.

এইস্থানে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের সহিত ডফ্‌সাহেবের মতের গুরুতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ বলেন, "এই সময়ে শিবাজী রাজগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রায় বিংশতি সহস্র—সপ্ত সহস্র সাদী, তিন সহস্র শিলেদার (১) ও প্রায় দশ সহস্র মাওলী পদাতি ছিল। আফ্‌জল খাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শিবাজী তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মন্ত্রদাতা কর্ম্মচারিগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া, সুলতানার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শিবাজী সন্ধিস্থাপনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—শত্রুর প্রতি তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে। গুপ্তচর-মুখে অবগত হইয়াছি যে, আফ্‌জল খাঁ বিজয়পুরের সুলতানার নিকট সর্ব্ব-সমক্ষে দাম্ভিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে যে, সে আমাকে

বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। অতএব তাহার সহিত সন্ধি-স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। এই দুরাত্মা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাম্ভাজীকে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করিয়াছে, ইহার সহিত সন্ধি করিলে, আমাকেও বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া সেইরূপে বিনাশ করিবে। ইহার "হিতশত্রুত্ব"পরিণামে আমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক হইবে। এই কারণে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। মারিতে মারিতে মরি, অথবা যাহা হইবার হয়, হইবে। কিন্তু সন্ধি করা কিছুতেই উচিত নহে। কারণ সন্ধি করিলে নিশ্চয়ই প্রাণনাশ হইবে। যুদ্ধ করিয়া যদি জয়লাভ হয়, ভালই; আর যদি সমরে প্রাণ যায় ত কীর্ত্তি থাকিবে। এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

জিতেন (জয়েন ?) লভতে লক্ষ্মীঃ মৃত্যুনাঽপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিনী কায়া কা চিন্তা মরণে রণে॥

অতএব যুদ্ধ করাই আমার স্থির সংকল্প। দুর্গম জাওলী প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিব (১)। আমার পুত্র সাম্ভাজী ও জননী জীজীবাইকে তোমাদের রক্ষণাধীনে এই রাজগড়ে রাখিয়া যাইতেছি। আফ্‌জল খাঁকে বিনাশ করিয়া যদি জয় লাভ করিতে পারি, তবে ত কোনও কথাই নাই, কিন্তু যদি যুদ্ধে আমার প্রাণ যায়, তবে তোমরা সাম্ভাজীকে রাজা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবে।" সকলকে এই কথা বলিয়া জননীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক শিবাজী বিদায় গ্রহণ করিলেন। "বৎস! বিজয়ী হও, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাম্ভাজীর ঋণ পরিশোধ করিতে বিস্মৃত হইও না!" বলিয়া জননী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও উত্তেজিত করিলেন। মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিবাজী প্রতাপগড়ে গমন করিলেন।

এদিকে আফ্‌জল খাঁ পণ্ঢরপুর হইতে প্রথমতঃ রাজগড় অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু পণ্ঢরপুর পরিত্যাগের অল্পদিন পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, শিবাজী প্রতাপগড়ে গমন করিয়াছেন। এই কারণে তিনি রাজগড়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়াঈঁ প্রদেশ পণ্ঢরপুর হইতে প্রতাপগড় যাইবার পথে অবস্থিত। আফ্‌জল খাঁ পূর্ব্বে

(১) শিবাজীর অধীনস্থিত প্রদেশ সমূহের মধ্যে "জাওলী" সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। এই প্রদেশ সহ্যাদ্রির সানুদেশে অবস্থিত, অতীব বন্ধুর, পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত ও অরণ্যসমাকীর্ণ। এই প্রদেশে শিবাজী "প্রতাপগড়" নামক এক অতি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়া আফ্‌জল খাঁর সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প, এই কারণে

ওয়াঈ প্রদেশের সুভাদার ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রথমতঃ ওয়াঈঁতে আসিয়া কয়েক দিবস অবস্থিতি করিলেন। ওয়াঈঁতে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রতাপগড়ের দুর্গমতা, অজেয়তা ও পথকষ্টের বিষয় চিন্তা পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিলেন, "শিবাজী বড়া হরাম্‌খোর হ্যায়। উস্‌কি করামত্‌ ঔর্‌ হিক্‌মত্‌ ইন্‌শা আল্লাহুৎ আল্লা জান্তা হ্যায়্‌। জাওলী অতিশয় দুর্গম স্থান; সেখানকার ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যে অবস্থিতি করিয়া সে যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছে। সেখান হইতে কোনও প্রকার কৌশলে তাহাকে বাহিরে আনিতে এবং বিশ্বস্ততা ও মায়া মমতা প্রদর্শন করিয়া কোনও রূপে তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিলে, যেরূপেই হউক, সুলতানের কার্য্য সাধন করিব।" এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি গোপীনাথ পন্ত নামক দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ জনৈক কর্ম্মচারীকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। বিদায়কালে তিনি গোপীনাথ পন্তকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন যে, "শিবাজীকে নানা প্রকারে মায়া মমতা লোভ ও বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জাওলীর বাহিরে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে; এবং তাহাকে বলিবে যে, 'আপনার পিতা শাহাজী ও আমি (খাঁ) এক পাদসাহের অধীনে চাকরি করি, বলিয়া, তাঁহার সহিত আমার (আফ্‌জল খাঁর) বহুদিন হইতে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাব আছে। সুতরাং আপনি (শিবাজী) আমার পর নহেন। আপনার পিতা স্বীয় অসাধারণ বীরত্ব, প্রভুভক্তি ও দেশ-বিজয় দ্বারা পাতসাহকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছেন। আপনিও আপনার পিতার ন্যায় সাহসী ও সমরকুশল। আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, ইহা ভাল নহে। সুলতান আপনার নিকট অনেক প্রত্যাশা করেন। সুলতান আপনার পিতাকে এতদিন পালন করিয়াছেন। আপনি তাঁহার পুত্র; এখন আপনাকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার ন্যায় সাহসী বীরপুরুষের দ্বারা মহৎ কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া লয়েন, পাদসাহের ইহাই ইচ্ছা। আপনি পাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পিতার ন্যায় তাঁহার অধীনে থাকিয়া, তাঁহার রাজ্যের উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা করুন; সুলতান আপনাকে স্বীয় সচিবের পদে নিযুক্ত করিয়া আপনার সম্মান বর্দ্ধন করিবেন। আপনার পিতা এক জন উচ্চপদস্থ মনসবদার। আপনি বিদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিলে সুলতান

তানের প্রিয়কর্ম্মচারী শাহাজীর পুত্রকে সদুপদেশ প্রদান দ্বারা সুপথে আনয়ন করিবার জন্য সুলতান আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি বিদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন, আমি বাদসাহের নিকট আপনার বীরত্বের প্রশংসা করিয়া আপনার অধিকৃত গড়, কোট, কিল্লা প্রভৃতি সমস্তই যাহাতে আপনার অধীনে থাকে, তাহা করিয়া দিব। সাহাজীর পুত্রকে আমি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া মনে করি। যাহাতে সুলতানের সহিত তাঁহার বিরোধ নিবৃত্ত হয়, তাহা করাই আমার অভিপ্রেত (১)। সুলতানের সহিত যদি আপনার সাক্ষাৎ করিতে সাহস না হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিলেও চলিতে পারে। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আপনারই ইচ্ছামত সন্ধি যাহাতে স্থাপিত হয়, আমি তাহা করিব। যেরূপ আপনার বিশ্বাস জন্মে, সেরূপ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।' এইরূপ নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া শিবাজীকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রণোদিত করিবে। তিনি যদি আমার শিবিরে আগমন করিতে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইবে যে, আমি তাঁহার শিবিরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছি। (২) যদি তুমি কোনও রূপে বাক্য কৌশলে প্রলুব্ধ করিয়া শিবাজীকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত করিতে পার, তাহা হইলে, সুলতানের নিকট তোমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া, তোমার পদোন্নতি করিয়া দিব।"(৩) এইরূপ উপদেশ প্রদান, পুরস্কার ও পদোন্নতির প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক আফ্‌জল্‌খাঁ গোপীনাথ পন্তকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। শিবাজী সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় বখর সমূহ।

গ্রাণ্ট ডফ্‌ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর শত্রুপক্ষীয় ইতিহাসলেখকগণের কথার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, (সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া) শিবাজী কৌশলে আফ্‌জল খাঁকে দমন করিবার জন্য

(১)—গ্রাণ্ট ডফ্‌ সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, আফ্‌জুল খাঁর দূত শিবাজীকে গিয়া বলিল—"That the Khan (his master) and Shahjee were intimate friends, that the Khan bore no enmity towards his son, but on the contrary would move his desire to assist him by interceding for pardon, and even endeavouring to get him cofirmed as jahagirdar in part of the territory he had usurped"—pp. 14

(২) সভাসদ বখর দ্বিতীয়, কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ, চিত্রগুপ্ত, শিবদিগ্বিজয় ও মারাঠী

অবনতি-সূচক বিনয়গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১) কিন্তু শত্রুপক্ষীয় ইতিহাসলেখকগণের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিবার উপযুক্ত কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। পক্ষান্তরে, মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণ যে বলিয়াছেন যে, শিবাজী আফ্‌জল খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং আফ্‌জল খাঁই প্রথমতঃ কপটতা পূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহা আমাদের নিকট সমধিক সুসঙ্গত বোধ হইতেছে। কারণ, শিবাজীর কর্ম্মচারী কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে,—

১ম।—এ সময় শিবাজীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২০ সহস্র ছিল। আফ্‌জল, দ্বাদশ সহস্র মাত্র সৈন্য সহ তাঁহার বিরুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন।

২য়।—শিবাজী জাওলীর ন্যায় দুর্গম প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রতাপগড়ের ন্যায় অজেয় গিরিদুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, গ্রাণ্ট ডফ্‌ও এ কথা স্বীকার করেন। সুতরাং যুদ্ধে বিজয় লাভ করিবার তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এরূপ অবস্থায় তিনি যে সহসা ভীত হইয়া সম্মুখ-যুদ্ধের পরিবর্ত্তে আফ্‌জল খাঁকে দমন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হইবেন, ইহা আমাদের সম্ভব বলিয়া বোধহয় না।

৩য়।—শিবাজীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। কারণ, আফ্‌জল খাঁ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিল, প্রথমতঃ বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া পরে তাঁহাকেও সেইরূপে হত্যা করিতে পারে, এই আশঙ্কা শিবাজীর মনে স্বভাবতঃ উদিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া সগর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতা যাহার চির অভ্যস্ত, তাহাকে কৌশলে প্রলুব্ধ করিয়া হস্তগত করিতে যাইলে কৃতকার্য্য কত দূর হইবার সম্ভাবনা, তাহা শিবাজীর ন্যায় সুচতুর ব্যক্তির অগোচর ছিল না। যে দংশনোদ্যত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গকে বধ করাই অভিপ্রেত ও যাহাকে সহজেই যষ্টি প্রহারে নিহত করা যাইতে পারে, তাহাকে প্রথমে কৌশলে ধৃত করিয়া পরে বিনাশ করিব, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন? সুতরাং তিনি আফ্‌জল খাঁকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে আফ্‌জল খাঁর নিকট অবনতি স্বীকারের ভাণ করিয়া সেই ভ্রাতৃহন্তা বিশ্বাসঘাতকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব ক[illegible] ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না।

এই সকল কারণে, কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ ও অপরাপর [illegible] যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শনের কোন কারণ দে[illegible]

(১) এই বিবরণ যে মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের গ্রন্থ হইতে স[illegible] সমসাময়িক ও ঔরঙ্গজীবের অধীনস্থিত ইতিহাসলেখক কাফি খাঁর র[illegible] আছে।

পক্ষান্তরে আফ্জল খাঁর পক্ষে সন্ধির প্রস্তাবসহ প্রথমতঃ শিবাজীর নিকট দূত প্রেরণ খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ,—

১ম।—আফ্জল খাঁ একজন অতিউচ্চপদস্থ অহঙ্কারী সেনানায়ক ছিলেন। বিজয়পুরের একটি অট্টালিকার গাত্রে একটি প্রস্তরলিপি সংযোজিত আছে। উহাতে লিখিত আছে যে,—"অত্যন্ত ভাগ্যশালী, দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ও মিথ্যা ধর্ম্মের উচ্ছেদকারী বর্ত্তমান সেনাধিপতি আফ্জল খাঁ মহম্মদসাহী কর্তৃক ইহা (১৬৫২ খৃঃ) নির্ম্মিত।" এতাবতা আফ্জল খাঁ কিরূপ বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি কিরূপ অহঙ্কারী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ একজন উচ্চপদস্থ অতি বিখ্যাত সেনাপতি "স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া" সর্ব্বসমক্ষে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই শিবাজীকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া সিংহাসনতলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। সুতরাং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। তদ্ব্যতীত রাজবিদ্রোহী শিবাজীকে ধৃত করিয়া দিতে বা বিনাশ করিতে পারিলে, তিনি তদধিকৃত প্রদেশের সুভেদারী প্রাপ্ত হইবেন, এই দুরাশাও তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাপালনে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিল।

২য়।—যুদ্ধের দ্বারা আফ্জল খাঁর প্রতিজ্ঞা সহসা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ জাওলীর ন্যায় দুর্গম প্রদেশে সৈন্য সামন্ত লইয়া যাওয়াইত দুষ্কর। যদি বা কোনওরূপে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তথাপি প্রতাপগড়ের ন্যায় সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়ে অবস্থিত শিবাজীর ২০ সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা তাঁহার অতি অল্প ছিল। আফ্জল খাঁর জয় হইলেও হইতে পারিত, স্বীকার করিয়া লইলেও, শিবাজীর ন্যায় অশ্বারোহণপটু তেজস্বী ব্যক্তিকে ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, তাহা আফ্জল খাঁ জানিতেন। কিন্তু শিবাজীকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে না পারিলে, আফ্জল খাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় কিরূপে? কাজেই কৌশল অবলম্বন ভিন্ন আফ্জল খাঁর স্বীয় প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিবার অন্য উপায় ছিল না।

৩য়।—২০ সহস্র সৈন্যসহ শিবাজী প্রতাপগড়ের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। ১২ সহস্র সৈন্যসহ সেই দুর্গ আক্রমণ করিয়া শিবাজীকে পরাজিত করা কিছুতেই সম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থায় প্রলোভনের দ্বারা শিবাজীকে প্রতাপ ...র বাহিরে আনয়ন করিবার দুরভিসন্ধি আফ্জল খাঁর মনে উদিত হওয়া, ...ভাবিক। কিন্তু সুদৃঢ় দুর্গে বহু সৈন্যসহ অবস্থিতি করিয়াও শিবাজী ...জল খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন, তাহার কারণ ... যায় না। অতএব মহারাষ্ট্র বখরকারগণ যে বলিয়াছেন যে, ...মনে কপটতা ছিল ও তিনি কৌশল পূর্ব্বক শিবাজীকে প্রতাপ- ...নয়নের জন্য তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার অভিলাষ প্রকাশ ...শিবাজীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা অসঙ্গত ...

৪র্থ :—আফ্জল খাঁ অতিশয় প্রকাণ্ডকায় মহাবলসম্পন্ন ছিলেন। পক্ষান্তরে, শিবাজীর আকৃতি খর্ব্ব ছিল এবং অসুরাকৃতি আফ্জল খাঁর ন্যায় বীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপযুক্ত শারীরিক বলও তাঁহার ছিল না। (এ কথা গ্রাণ্ট ডফ্ও স্বীকার করেন।) এ কথা আফ্জল খাঁর অবিদিত ছিল না। সুতরাং আফ্জল খাঁর মনে এইরূপ একটা দুরভিসন্ধি উদিত হওয়া অসম্ভব নহে, যে কোন প্রকারে একবার শিবাজীর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে পারিলে তিনি তাহাকে সহজেই কুক্ষিতলগত করিতে পারিবেন।

এই সকল কারণে, আফ্জল খাঁর মনেই কপটতা ছিল, ইহাই অধিকতর সম্ভব মনে হয়। এইরূপ কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে সময়কার বিজাপুর দরবারের অনেক উমরাহ স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করিয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং আফ্জল খাঁও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুজীকে নিহত করিয়াছিলেন। অতএব, শিবাজীর ও আফ্জল খাঁর সৈন্যসংখ্যার তারতম্য, শিবাজীর জাওলীর ন্যায় দুর্গম প্রদেশে অবস্থিতি ও আফ্জুল খাঁর সৈন্য সহ তথায় গমনের অসুবিধা, উভয়ের শারীরিক গঠন ও বলাবল, আফ্জল খাঁর অহঙ্কৃত স্বভাব, তৎকৃত ঘোর প্রতিজ্ঞা এবং তাহা পূর্ণ হইবার অন্তরায়, সুলতানের প্রদত্ত প্রলোভন, আফ্জলের পূর্ব্বচরিত্র এবং সে কালের উমরাহগণের বিশ্বাসঘাতকতা (১) প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিলে, আফ্জল খাঁর চিত্তে যে কপটতা ছিল না, তিনি যে নিতান্ত সরলভাবে ন্যায় যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই সকল কথার সম্পূর্ণ বিচার না করিয়াই গ্রাণ্টডফ্ সাহেব আফ্জল খাঁকে নির্দ্দোষী ও শিবাজীকে কপটাচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অপর একজন সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তলেখকগণের উক্তির ধীরভাবে আলোচনা করিয়া লিখি[illegible]

খাঁই প্রথমতঃ Sent his secretery w[illegible]

mises of promotion[illegible]

interv[illegible]

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। শ্রাবণ। প্রথমেই পাঞ্চভৌতিক সভায় "ভদ্রতার আদর্শ" প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা আছে। পরিচ্ছদের প্রকারভেদের সঙ্গে ভদ্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ব্যোম বলিতেছেন যে, 'ইংরাজ মালী যখন গায়ের কোর্ত্তা খুলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া বাগানের কাজ করে, তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া প্রভুমহিলার লজ্জা পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা যখন কোন কাজ নাই কর্ম্ম নাই, দীর্ঘ দিন রাজপথপার্শ্বে নিজের গৃহদ্বার-প্রান্তে স্থূল বর্ত্তুল উদর উদ্ঘাটিত করিয়া হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নির্ব্বোধের মত তামাক টানি, তখন্ বিশ্বজগতের সম্মুখে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুশ্রী বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকি।' হয় ত অনেকের মতে"ভদ্রতার"অন্য আদর্শও আছে—ফ্যাশনের বাহিরে তাহার রাজত্ব;—কেবল দেশবিশেষের পরিচ্ছদবিশেষেই সে ভদ্রতার বসতি নহে,—আবৃত বা নগ্ন, সর্ব্ববিধ হৃদয়েই তাহা থাকিতে পারে। শোভনতার অভাবকে 'অভদ্রতা' বলিতে সকল সামাজিক সম্মত হইবেন কি না, বলা যায় না। যে 'ইংরেজ মালী গায়ের কোর্ত্তা খুলিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া কাজ করে, তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া প্রভুমহিলার লজ্জা হয় না',—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে,অসভ্য আফগানস্থানের মুসলমান রাজকুমার, সেই মালীর দেশে, তাহার প্রভুমহিলা বা তদপেক্ষা অভিজাতবংশীয়াদের অনাবৃত বক্ষ দেখিয়া বল্‌রুমের এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয় পক্ষের কাহাকেও অভদ্র বলিতে গেলে, দু দলের প্রতিই অন্যায় করিতে হয়। পরিচ্ছদ ভিন্নও ভদ্রতার অন্য চিহ্ন ও অন্য আদর্শ আছে, তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া শ্রেণীভেদ না করিলেও দুনিয়া নিতান্ত অভদ্র হইয়া পড়িবে না—পাঞ্চভৌতিক সভার কোনও সভ্য ব্যোমকে এই বলিয়া অনায়াসে আশ্বস্ত করিতে পারিতেন! "মেয়েলী ব্রত" প্রবন্ধে এবার 'মঙ্গলবার বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের' বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "ক্ষুধিত পাষাণ" একটি অতি চমৎকার সুরচিত গল্প—একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এই গল্পের রচনাপ্রণালী যেমন সুন্দর,—ইহার কল্পনাকৌশলও তেমনই মনোহর। বর্ণনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কবিত্বপূর্ণ। গল্পটিতে পাঠকের আগ্রহ আদ্যন্ত জাগরিত থাকে,—এবং নিঃশেষে পাঠ করিয়াও কৌতুহলপিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এই গল্পের সেই মায়ামন্দির, সেই তরুণী ইরাণী, সেই অরালী পর্ব্বতের শিখরে ঘনসন্ধ্যা প্রভৃতি কবির অতি সুন্দর সৃষ্টি—সত্য সত্যই যেন আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন। "শীতে ও বসন্তে"কবিতাটির আমরা রসগ্রহ করিতে পারি নাই। "ব্যাকরণ তুলনা" একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ—অনুশীলনের যোগ্য। "লক্ষ্মীবাই"

পল্লীগ্রামের রথযাত্রা" বেশ হইয়াছে। এবারকার "আলোচনার"

পাঠযোগ্য,—'সভ্যতার আদর্শ' প্রসঙ্গে আমরা যাহা

"বঙ্গদেশে কান্যকুব্জীয়

কালিদাসের জয়।

"কালিদাসের চরিত্র ভাল ছিল না", এই কিম্বদন্তী কেবল বাঙ্‌লা মুলুকেই প্রচলিত দেখিতে পাই। কবির জন্মভূমি উজ্জয়িনী ও তৎসমীপবর্ত্তী অঞ্চলে ইহার বিপরীত জনশ্রুতি বিদ্যমান কালেও প্রবল। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য কবির চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য এক বিদুষী বারবনিতাকে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, কালিদাস জয়লাভ করিয়াছিলেন। রাক্ষসীর হাবভাবময় আহ্বানবাক্য ও তদুত্তরে কবির সুপরামর্শ নিম্নে বিবৃত হইল।

আহ্বান।

(তোরা) আয়, আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
উড়ে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
গ্রীবা বাঁকাইয়া, পক্ষ ঝাপটিয়া,
স্বর্ণ-পিঞ্জরে তোরা আয়;
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
(মোর) রঙ্গিণ নয়নে বিলোল চাহনি,
সীমন্তে সুবিন্দু, অধরে নাচনি,
অশান্ত লালসাময়,
(মোর) উরস-কদম্বে কাঞ্চন-কাঁচলি,
কটিতে চরণে রজত কাকলি,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ পড়িছে উছলি,
(হের) কপোল-গোলাপে কত বুল্‌বুলি
নাচিয়া বেড়ায় তায়!
(তোরা) আয়, আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!

(আমি) যৌবন-সাগরে মাণিক্য-তরণী
সাজায়ে রেখেছি, মদন আপনি
নাবিকের বেশে, মৃদু হেসে হেসে,
ক্ষেপণি ধরেছে তায়!
(হের) ওই সুখ-দ্বীপ! বাজিছে বাঁশরি—
তরণীতে আয়, কি হবে সাঁতারি?
পড়ে থাকা মিছে, দুঃখ পাওয়া মিছে;
বহে অনুকূল বায়;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী পুরুষেরা আয়;

জনমে জনমে, জীবনে, মরণে,
এত তীব্র সুখ পাবিনে পাবিনে,
বিমোহিত চিত্ত—মিলনের গীত
শুক সারী ওই গায়;
জীবনের জরা, অলীক ভাবনা,
দুঃস্বপন সম, অলীক কল্পনা,
অলীক জল্পনা, অপূর্ণ বাসনা,
সুখ-দ্বীপে নাহি হায়;
(ওই) বাজিছে বাঁশরি, মধুর, মধুর—
তালে তালে তার কনক কেয়ূর
বাজিছে এ ভুজে; মেখলা কিঙ্কিণী
আনন্দে শিহরি, বাজে ঝিনি ঝিনি;
(আমি) আনন্দে বিহ্বলা, আনন্দে বিবশা;
সুখের তিয়াষা, রূপের পিপাসা,
তোদেরো ঘুচিবে; তোদেরো ধমনী
বিদ্যুৎ প্রবাহে নাচিবে এমনি,
সূর্য্যোকান্ত মণি প্রায়।
(হবে) নয়নেতে নেশা, প্রাণে ঘুম ঘোর;
সারা নিশি জাগি হইবি অঘোর;
পড়িবি ঘুমায়ে; এ উরস মোর
ভূপতি শিথান প্রায়;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী পুরুষেরা আয়!

(তোরা) সুখ-দ্বীপ পানে মেলিয়া নয়ান
দেখ দেখ্ চাহি—বিজয়-নিশান
লাল নীল পীত বাসন্তী রঙের
উড়িছে বাতাসে; বীর অনঙ্গের

সুন্দর পতাকা তার ;
মানিয়াছে হায় দুঃখ ভয় ক্লেশ ;
প্রাণান্তক যত অশিব অশেষ ;
নিরাশার ওই শূর্পণখা-বেশ,
লেহ্ন বহে নাসিকায় !
(এবে) বসন্ত বাহার বেহাগ রাগিণী ;
(সুধু) পূর্ণিমা চাঁদনি, মাধবী যামিনী ;
(সুধু) কুসুমের মালা, সঙ্গীতের রেশ্‌ ;
(সুধু) মখ্‌মল-শয্যা, কিংখাপের বেশ ;
(সুধু) গোলাপি আতর, সুবাসিত জল ;
রজতের থালে কনকের ফল ;
তাম্বুলের রাগ, আবীর কুঙ্কুম,
ফানুশে, ঝাড়রে, আলোকের ধুম,
হাসি, করতালি, রাগিণী ঝঙ্কার,
রঙ্গের আলাপ, রসের বিহার,
ছন্দোময় নৃত্য, শোভার ফোয়ারা,
আহা মরি কিবা আনন্দের কারা,
নিজে প্রাণ ধরা দেয় ;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী পুরুষেরা আয় !

কালিদাসের উত্তর।

চিনেছি, চিনেছি তোরে !
হায় রে নাগিনি, মানবীর বেশে,
দেবভাষা মুখে, এলি হেসে হেসে,
জড়ান' রয়েছে কুন্তলের কেশে
সর্পশিশু বিষময় !
আমি কবি ; মোর উজ্জ্বল নয়ান
অন্তর্ভেদী সদা ; ছলনা ও ভাণ
বুঝেছি বুঝেছি, সকলি জেনেছি ;
রাখ্‌ রাখ্‌ নারি অমিয়ার ভাণ—
(তোর) কণ্ঠেতে গরল বয়।
(ছি ছি) এ কি তোর সজ্জা ? নারী-চক্ষু-শয্যা,
চিরতরে ছাড়ি, লজ্জা পেয়ে লজ্জা,
ধূলায় লুটায় কায় !
(একি) আবরণহারা অঙ্গ-যষ্টি তোর !
ওই দেখা যায়, পড়ে আছে ঘোর
কুণ্ডলী পাকায়ে, বিষম সাপিনী
কালকূট-ভরা, প্রাণসংহারিণী,
হৃদি-পিণ্ডলেহ চুষিছে নাগিনী,—
থেকে থেকে ওই ফণা আস্ফালিয়া,
(তোর) কণ্ঠনলী মাঝে দিতেছে ঢালিয়া
হলাহল সুচিজ্বালা ;
(ছি ছি) ঢেকেছিস্‌ তনু ঢাকাই বসনে,
কত হাব ভাব প্রকাশি বদনে,
চাহিস্‌ লুকাতে, হাসি-পারা মুখ,
অন্তরের জ্বালা, বুকের অসুখ,
(তোর) প্রাণ যাহে ঝালা পালা।
(তোর) ওই সর্প-চক্ষু করে মিটি মিটি,
রাখ্‌ রাখ্‌ তুলে ঢাকাই শাড়িটি,
সাপের খোলোস্‌ তোর।
কবি-নেত্রে আমি বুঝেছি, বুঝেছি,
ছদ্মবেশী নারী, জানিতে পেরেছি,
(তোর) নাগিনী-ব্যভার ঘোর।
(ছি ছি) সাপের খোলোস্‌
ঢাকাই শাড়িটি তোর।
গিয়াছে সঙ্কোচ, লজ্জা ঘৃণা শঙ্কা,
উলঙ্গ রসনা, বাজাইয়া ডঙ্কা,
মোহপূর্ণ গীতি গাস্‌।
নগন নয়ন, নগন বদন,
নগন নিতম্ব, নগন জঘন,
দোকানীর সম খুলিয়া দোকান,
ছি ছি মরি লাজে, নগন পরাণ,
পুরুষে দেখাতে চাস্‌।
'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি,'
গলায় পরিতে ফাঁশ।
(তোর) নেত্রনীলিমায় চপলা হানিছে ;
চিকুরকলাপে তরঙ্গ নাচিছে ;
স্ফীত পয়োধরে উথলি পড়িছে
নাগিনীর অহঙ্কার।
বৃথা ও গরব, বৃথা ও বিলাস,
যৌবন-মালঞ্চে কান্তির বিকাশ,
বৃথায় রমণি ও তোর প্রয়াস
এ হৃদয় ধরিবার।
(তোর) নাগিনী-ব্যভার ঘোর—
দীন চক্ষে আহা উঁকি মারে ওই
অতি দুঃখী প্রাণ তোর।

হায় অভাগিনী, সে সৌভাগ্য কোথা—
পারিবি জুড়াতে হৃদয়ের ব্যথা,
হয়ে কবি-প্রণয়িনী?
এ তোর জনমে, এ তোর জীবনে,
এ মহান্ সুখ পাবিনে পাবিনে,
কোন কূপে হায়, এ মর্ত্ত্য-ভবনে,
শোভা পায় মন্দাকিনী?

* * *

ছাড় ছার বৃত্তি, হও তপস্বিনী,
ধর কমণ্ডলু, কলুষনাশিনী
গঙ্গাতটে গিয়া, থাক বার মাস—
উদার প্রবাহ, প্রশান্ত আকাশ,
কুসুমিত তরু, লতিকার হাসি,
বনরাজি গায়ে জ্যোৎস্নার রাশি,
সৌরভ-প্রবাহ প্রথম ফাল্গুনে,
আম্র মুকুলের, সেবি কায়মনে
জুড়াও জীবন, তিল তিল করি
কুলটা-কলঙ্ক যাওরে পাশরি।
মধুর সঙ্কোচ, দয়াময়ী-বেশ,
অবরোধ-বধূ-দেহের অশেষ
সৌন্দর্য্য ফিরে গো আসুক আবার—
বসন্তলক্ষ্মীর লাবণ্য-সম্ভার
যেন মধুমাসে; মুগ্ধা মোহিনী
শারদ নিশীথে যেন বনরাণী;
শেফালি-সৌরভে মদিরা-বিঘোর,
বনস্থলী যবে আনন্দে বিভোর।

* * *

বৃথায় বৃথায়, এ জনমে আর
দক্ষিণা বাতাসে, স্বর পাপিয়ার
পশিবে না তোর মরুভূ-হিয়ায়।
এ কলুষ ঘোর ধোয়া কভু যায়
মানব-জীবন-কর্ম্মনাশা-জলে?
লো কুলটা, তুই ঝাঁপিয়া অঞ্চলে
ম্লান মুখ তোর, আকুল আহ্বানে,
ছাড়ি ছলা কলা, ডাক্‌রে মরণে।
চির দয়াবান, চির প্রেমবান,
বিশ্বে নাহি বঁধু মরণ সমান;—
পরশে তাহার নিবিড় আনন্দ;
অধরে তাহার সুধা মকরন্দ;

ত্বকে নাহি তার শুষ্ক অসাড়তা;
কণ্ঠে নাই তার ব্যাকুল জড়তা;
অপূর্ণ বিশ্বের অপূর্ণ সংস্কার,
পাপ পুণ্য ভেদ, নাহিরে তাহার;
মন্দাকিনীজল তাহারো সুকেশে,
(হর-শিরে যথা) উছলে হরষে।
কলঙ্কিনী, তোর দেহের কলঙ্ক
হইবে বিধৌত; মরণের অঙ্ক
কি সুন্দর!—তুই পড়িস্ ঢুলিয়া
ক্লান্ত দুটি আঁখি সুধীরে মুদিয়া;—
সুখক্লান্ত কোন সুন্দরীর প্রায়,
ছাদে পড়ি বালা যবে সে ঘুমায়;
(আর) কুহরে কোকিলা; দক্ষিণা বাতাসে
বিকম্পিত তনু, জ্যোৎস্নারাশি হাসে।

* * *

যুগ কল্প যুগ এইরূপে যাবে—
(তোর) অশান্ত হৃদয় মহাশান্তি পাবে
মৃত্যুর আলয়ে; পাষাণ হইয়া,
(অহল্যার মত) রহিবি পড়িয়া।
এমনি যুগান্ত [illegible]ত হইবে
মহার্ষি-আশ্রমে; ঝরিয়া পড়িবে
পাষাণের রেণু;—পুষ্পের মঞ্জরী
হবি শেষে তুই মালঞ্চ-সুন্দরী
ঋষি-তপোবনে। শকুন্তলা আসি,
(তোরে) পরিবে কুন্তলে, গালভরা হাসি!
হবি শেষে তুই চারু প্রজাপতি—
পুষ্প হ'তে পুষ্পে, মহাহর্ষে মাতি,
ছুটিয়া বেড়াবি কবি-কুঞ্জবনে!
তার পর তুই, বিচিত্র বরণে,
বিহগের সাজে, কল্পতরু পরে,
অলকার কোন নন্দন ভিতরে,
কুহু কুহু স্বরে, নব-উষা-মুখে,
যক্ষ-দম্পতিরে জাগাবি কৌতুকে!
পক্ষীজনমান্তে, সাজিয়া হরিণী,
নৃপতিকন্যার মহা সোহাগিনী
থাকিবি হইয়া; কিছু দিন পরে,
[illegible] ইন্দ্রধনু অদৃষ্ট-অম্বরে
দেখা দিবে তোর; মহাবহ্নি-দীপ্ত
(পৃথিবী-কন্যার পরীক্ষার মত)
(তোর) আত্মার কলঙ্ক সব নিবে হরি,
করিয়া তুহারে ত্রিলোকসুন্দরী!

পুণ্য পুঞ্জফলে, মানবের ঘরে,
আবার আসিবি নারীজন্ম ধরে।

*   *   *

ধর্ম্মের সহায়, সিদ্ধির সাধনা,
জয় জয় নারী, অপূর্ব্ব ললনা।
সন্ধ্যা সম তার চাঁচর চিকুর;
সন্ধ্যা সম তার লোচন মধুর;
অধরে তাহার শেফালির বাস;
কপোলে তাহার গোলাপী আভাস;
ভ্রুভঙ্গে তাহার সারল্য সাজান';
ব্রীড়াময় হাস্যে মাধুরী মাখান';
প্রেমাশ্রুচুম্বনে অমিয়া ছানিয়া,
নয়নে অধরে রেখেছে মাখিয়া;
নখদর্পণেতে জ্যোৎস্না বিভব;
ললাটে মহিমা, চরণে গৌরব;
সতত সরস আশা পুষ্প ঢালা,
শ্রীকরে তাহার কনকের থালা;
দুই কর্ণে দুটি কদমের ফুল;
নাহি সাজসজ্জা, তবুও অতুল!
নাহি পক্ষপাত, নাহিক বিভ্রাট,
গৃহ-রাজত্বের অপূর্ব্ব সম্রাট!
পতি-মুখ তার সুধাংশু জিনি;
তার পানে চাহি কি দিবা রজনী
আছে গো রোহিণী; সুখরাজ্যে তার
অনন্ত বসন্ত করে গো বিহার;
বিপন্ন জনেরে হেরিলে পরে
মুক্তারাশি তার নয়নে ঝরে;
(তার) মুখ পানে চাহি বুঝিতে নারি
মানবী কি দেবী, অপূর্ব্ব নারী!
হেন বেশে নারি! আসিবি যখন
কবি-প্রণয়িণী হইবি তখন!
তখন হানিস্ কটাক্ষে তোর
যত আছে বাণ; বিষদিগ্ধ ঘোর
নাগপাশে তোর, বাঁধিয়ে নাগিনি,
রাখিস্ আমারে দিবসযামিনী! *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।

সহর অঞ্চলে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার আয়োজন কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা সহরের লোকের অজ্ঞাত নহে, কিন্তু পল্লীগ্রামের এই উৎসবের মধ্যে যে আনন্দ, যে নিষ্ঠা, যে প্রীতিপূর্ণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শুধু অনুভবনীয়, বর্ণনা দ্বারা ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তবে রসজ্ঞ পাঠকগণ যদি তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ রস উপভোগ করিতে পারেন, এই ভরসায় তাহার একটা বর্ণনা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিজয়ার আলিঙ্গন এবং আনন্দোচ্ছ্বাস থামিতে না থামিতেই, লক্ষ্মীপূজা আসিয়া উপস্থিত হয়। পল্লীগ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই লক্ষ্মীপূজা একটি অতি সাধারণ কিন্তু প্রয়োজনীয় উৎসব। দুই প্রকার পদ্ধতিতে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে; এক—যাঁহারা ধনবান, তাঁহারা কেহ কেহ প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করেন, প্রতিমার পদতলে ধানের আড়ি, কড়ি ইত্যাদি ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধানের আড়িতে পরিপূর্ণরূপে ধান ঢালিয়া লক্ষ্মীরূপে তাহারই পূজা

* এই কবিতার দুই এক স্থলে plagiarism ও anachronism আছে। আশা করি পাঠক মহাশয়েরা মাফ্ করিবেন।—লেখক।

হয়; অল্পব্যয়সাধ্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই দ্বিতীয় প্রকারের পূজাই প্রচলিত আছে।

শনিধান ও খয়েনধান এই পূজার একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। দ্বাদশীর দিন হইতেই বাড়ীর মেয়েরা ধানগুলি ঝাড়িয়া বাছিতে আরম্ভ করে; তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে, যাহাতে ইহার মধ্যে একটিও কাল ধান না থাকে।

তাহার পর লক্ষ্মীপূজার দিন সকাল বেলা পূজার সরঞ্জাম বাহির হয়। লক্ষ্মীর আড়ি, কড়ি, শঙ্খ প্রভৃতি আসবাব ঘরের সরদাল, কলুঙ্গা কি এই রকম কোন উঁচু যায়গায় তোলা থাকে; যাহাতে বাড়ীর দুষ্ট ছেলেরা হাত বাড়াইয়া সেগুলি গোপনে হস্তগত করিতে না পারে। লক্ষ্মীপূজার দিন সকালে গৃহকর্ত্রী স্নান করিয়া আসিয়া সেগুলি সেখান হইতে নামাইয়া জলে ভাল করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেন। আহারাদি শেষ হইলে মেয়েরা কাপড় ছাড়িয়া লক্ষ্মীদেবীর পরম-আদরনীয় বেতেছাওয়া সেই আড়িটি আলিপনায় রঞ্জিত করে। কেহ জলচৌকী, কেহ বা পিঁড়ির উপর লক্ষ্মী স্থাপিত করে। লক্ষ্মীপাতার পিঁড়ি বা জলচৌকী সাধারণ গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তাহা সাবধানে পৃথক্ করিয়া রাখে। পূজার দিন সেখানি ধুইয়া আলিপনা দিয়া তাহা চিত্রিত করে; এবং ঘরের যে দেওয়ালের কাছে লক্ষ্মীস্থাপন করা হইবে, সেই দেওয়ালের অনেক দূর পর্য্যন্ত দুর্গাঠাকুরাণীর চাল-চিত্রের মত আলিপনায় চিত্রিত করে। গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের চিত্রনৈপুণ্য অধিক নহে, কিন্তু যেটুকু নিপুণতা তাহাদিগের অভ্যস্ত, তাহা তাহারা সেই মাটীর দেওয়ালে প্রয়োগ করিতে ছাড়ে না। সেই চিত্রের উপর পতাকা উড়িতে থাকে, মধ্যে নানা রকম লতাপাতা কাটে, এবং সর্ব্বোচ্চ থাকে সিংহাসন-সমেত লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি আঁকে, ঠাকুর ঠাকুরাণীর চারি দিকে বালিশ আঁকাইয়া দেয়, এমন কি, চিত্রের দুই পাশে লক্ষ্মীর বাহন প্রকাণ্ড দুটি পেচকের চিত্র অঙ্কিত করিতেও ছাড়ে না; এই পেচকের চেহারা সর্ব্বত্র ঠিক পেচকের মত হয় না; কারণ, একে চিত্রকারিণীর এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাহার উপর যে উপকরণ দিয়া যাহার উপর চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা চিত্রাঙ্কনের কিছুমাত্র অনুকূল নহে; তাই অসম্ভবপুচ্ছবিশিষ্ট লম্বা শরীরের নীচে এক জোড়া বাঁকান পা, এবং চক্রাকার মুণ্ডুর মধ্যে গোল গোল দুটো চোখ, মাথার উপর সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত দুটি বৃহৎ কান। কিন্তু পেচকের

এই চিত্র যতই বিকৃত হউক না কেন, আশা করা যায়, তাহা বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মী-দিগের অপ্রীতিকর হয় না, এবং দেওয়ালে আলিপনার এই চিত্র কিছু বেশী দিন না মুছিয়া পল্লীগৃহিণীদিগের নিকট হইতে প্রশংসাকর্ষণের জন্য অবিকৃত রাখা হয়।

যাহা হউক, সমস্ত চিত্রটি শেষ হইলে, ঝাঁপি টেপারীর ফল আলিপনার বাটিতে ডুবাইয়া তদ্দ্বারা চিত্রের চতুর্দ্দিকে ছাপ দিয়া তাহাকে ভারি জাঁকাল করিয়া তোলে। যাহাদের গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত এবং দেওয়াল চুনকাম করা, তাহারা দেওয়ালের আলিপনার পরিবর্ত্তে বাটিতে খয়ের গুলিয়া ছোট একটি তুলি দ্বারা দেওয়াল চিত্রিত করে;—কিন্তু পল্লীগ্রামে অট্টালিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

দেওয়ালে ও মেঝেতে আলিপনা দেওয়া হইলে লক্ষ্মীপাতা হয়। 'এলনি'-অঙ্কিত জলচৌকী বা পিঁড়িখানা দেওয়াল ঘেঁসিয়া বসাইয়া তাহার উপর 'আড়ি' রাখে, এবং তাহাতে সেই বাছা ধানগুলি চুড়া করিয়া ঢালিয়া তাহার উপর লক্ষ্মীর মুখস বসাইয়া দেয়। লক্ষ্মীর মুখস সোলার পাতে প্রস্তুত, মুখসের উপর লাল রঙ্গ দিয়া চোক মুখ আঁকা, ধানের মধ্যে বসাইয়া দিবার জন্য তাহাতে একটা দাণ্ডী লাগান থাকে। লক্ষ্মীপূজার দিন সকাল বেলা মালী বৌ বা মালীদের মেয়ে এক একটা মুখোস ও কলাপাতে জড়ান শিউলী ও করবীর গোটাকত ফুল প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে দিয়া যায়; ইহার পরিবর্ত্তে কিছু পয়সা পায় না; চাউল, মুড়ি, জলপান, লাড়ু প্রভৃতির বরাদ্দ আছে, লক্ষ্মীপূজার পরদিন সকালে তাহাই তাহারা আদায় করিয়া বেড়ায়।

মুখোস বসাইয়া সমস্ত আড়িটি লাল কাপড়ে ঢাকিয়া তাহার চারি দিকে নানা রকম আকারের লাল কৌটা, ছোট বড় মাঝারি রকমের সামুদ্রিক কড়ি, ছোট ছোট সাদা কাঁকুই, এবং আধ পয়সা দামের টিনমোড়া ক্ষুদ্র আরসি—সমস্ত সাজাইয়া দেয়। তাহার পর লক্ষ্মীর সম্মুখে একটি পিতলের জলপূর্ণ সিন্দূররেখাঙ্কিত ঘট সংস্থাপিত করিয়া, তাহার মুখে আম্রশাখা ন্যস্ত করে।

লক্ষ্মী পাতা হইলে, গৃহিণী সেখানে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া নৈবেদ্য সাজাইতে ব্যস্ত হন। এ দিকে বাড়ীর মেয়েরা সকল ঘরে আলিপনা দিয়া বারান্দা, চৌকাট, গৃহপ্রাঙ্গণ, সমস্ত বাড়ী,—কমল-বন, পদ্মফুল, পাখী, লতা

সূর্য্য অস্ত গেল। ধূসর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ায় গ্রামখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মেঠো পথ দিয়া রাখালবালকেরা গরু চরাইয়া আজ সকালে সকালেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পক্ষিকুল হর্ষধ্বনি করিতে করিতে কুলায় অভিমুখে ফিরিতেছে; সান্ধ্য অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে, এবং গৃহে গৃহে, বাজারের দোকানে, নদীতীরসংলগ্ন নৌকায়, আম্রকাননবেষ্টিত, বাঁশ বনের প্রান্তবর্ত্তী কৃষককুটীরে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে শরতের পূর্ণ শশধর রজতচক্রের ন্যায় পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল, ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সহসা যেন সমস্ত প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল। মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ, শুধু দুই একটি নক্ষত্রবধূর লজ্জাকাতর দৃষ্টি চন্দ্রের শুভ্র কিরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল; বালক বালিকাগণ উঠানে, বারান্দায়, ছাদের উপরে চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া শ্বেতবর্ণের বৃহৎ শঙ্খ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সজোরে ফুঁ দিতে লাগিল; শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন কোন বাড়ী হইতে কাঁশর ঘণ্টার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; সন্ধ্যার পর প্রত্যেক গৃহ উৎসবময়, সমস্ত গ্রাম হাস্যকলরবমুখর।

লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পাশে দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ধূপের সুগন্ধে গৃহ ভরিয়া গিয়াছে; পিতলের রেকাবিতে আতপ চাউলের চূড়াকার নৈবেদ্য, তাহার উপর সন্দেশ, মোণ্ডা, বাতাসা। পূজার জন্য সাজিতে স্থলপদ্ম, রজনী-গন্ধা, বক, শেফালিকা প্রভৃতি ফুল। কাঠের বারকসে মুগের ডাল, ছোলা, পাটনাই মটর, বরবটীভিজে, হাঁড়িতে দই, কড়ায় দুধ, বাটিতে ক্ষীর, ধামা-বোঝাই খই, মুড়ি, মুড়কি। লক্ষ্মীপূজা হইয়া গেলেই, গরীব দুঃখী, রাখাল কৃষাণ, নৌকার মাঝি, মালাকর, বারুই, নাপিত প্রভৃতিরা লক্ষ্মীপূজার 'ভুজো' ও 'নাড়ু' লইতে আসিবে,—তাহাদের বিতরণের জন্যই মুড়ি, মুড়কি, খৈ, বেশী পরিমাণে যোগাড় করা হইয়াছে।

পূজার সকল যোগাড় হইয়াছে, কেবল এখনও নাড়ু তৈয়ারী হয় নাই; নারিকেলের ছাঁই লক্ষ্মীপূজার একটা প্রধান উপকরণ। নারিকেল ভাঙ্গা হইলে, তাহার জল একটা পাথরের বাটিতে লইয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কাছে রাখিয়া আসিয়া বড় বৌ, মেজ বৌ, দুই যা, দুই খানা কুরণী লইয়া, নারিকেল কুরিতে লাগিল। গিন্নির কাছে ছাঁই তৈয়ারীটা আসে ভাল; তিনি, উনানে কড়া চাপাইয়া ছাঁই করিতে লাগিলেন। ছাঁই তৈয়ারী হইলে, গিন্নি মেয়েদের

তাঁহার আদেশে মনঃসংযোগ করিল। হঠাৎ গিন্নির মনে পড়িল, আসনাঙ্গুরী ও মধুপর্কের বাটি আনান হয় নাই, পুরুতঠাকুর আসিয়া সে গুলি না পাইলে, এখনি হাঙ্গামা বাধাইবে; হয় ত রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং পরে হয় ত সকল বাড়ী পূজা সারিয়া অসময়ে পূজা করিতে আসিবে! লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পূজা অসময়ে—বাস্‌রে! গৃহস্থ না ছারেখারে যাইবে; গিন্নি ব্যতিব্যস্ত হইয়া, তখনি পুরুতবাড়ী লোক পাঠাইলেন। একটি পয়সা পাইয়া পুরুতঠাকুরাণী হৃষ্টচিত্তে জিনিষ গুলি ছাড়িয়া দিলেন; তিনি জানেন, সে গুলি তাঁহার ঘরেই আসিবে, পয়সাটি উপরি-লাভ মাত্র।

এ দিকে পুরুত ঠাকুর নামাবলী গায়ে টিকিতে ফুল গুঁজিয়া যজমানবাড়ী আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁহার কিছুমাত্র অবসর নাই; তিনি ধূলি-ধূসরিত পা দুখানি চটি হইতে বাহির করিয়া এক ঘটী জলে তাড়াতাড়ি তাহা ধুইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পূজায় বসিলেন। ছেলেরা জোরে জোরে শঙ্খ বাজাইতে লাগিল, মেয়েরা পুরুতঠাকুরের একটু তফাতে চৌকাট ঘেঁসিয়া বসিয়া ঔৎসুক্যের সহিত পূজা দেখিতেছে, কেহ বা পুরোহিতের অত্যন্ত সন্নিকটবর্ত্তী ধুনুচির আগুনে ধুনো নিক্ষেপের অধিকার পাইয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্‌ মনে করিতেছে।

পূজা শেষ হইলে পুরোহিত অন্য বাড়ীতে চলিলেন। গিন্নিরা সকলকে ঘরের বাহির করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই সময় লক্ষ্মীঠাকুরাণী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া ভোগ গ্রহণ করেন।

দণ্ড খানেক পরে গিন্নি ছেলেদের মধ্যে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলেন। কলাপাতে একটু সন্দেশ, চাট্টি ভিজে, দুখানি শশা, খানদুই নারিকেল, একটু ছানা, ক্ষীর পাইবামাত্র ছেলে মেয়েরা জ্যোৎস্নালোকিত রোয়াকে বসিয়া পরম পুলকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। সেই ফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে আলিপনাঙ্কিত রোয়াকের উপর বসিয়া প্রসাদ খাইতে খাইতে বালক বালিকা-গণ হাস্য কলরব ও উল্লাসে নিমগ্ন হইল।

ছেলেদের জলখাবার দিয়া গৃহিনীগণ পুরোহিত-বাড়ীতে সিধা ও জল খাবার পাঠাইতে লাগিলেন। আত্মীয় কুটুম্বদের বাড়ীতেও জলপান প্রেরিত হইতে লাগিল। কোন কোন ভদ্রলোকের ছেলে মুখোস পরিয়া কৃত্রিম দাড়ী,

কোথাও তাহারা ধরা পড়িতেছে, আর গৃহিণী কর্ত্তৃক পরম সমাদরে আহূত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে,—গৃহিণী কাছে বসিয়া, 'এটা খাও, ওটা খাও,' বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত ভিখারিণী সাজিয়া নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, "মা চাট্টি ভিক্ষে পাই, লক্ষ্মীপূজোর দিন চাট্টি ভুজো না দিয়ে অমনি ফিরিও না।" কেহ বলিতেছে, "কেরে মাগি রাত্রে ভিক্ষে নিতে এসেছিস্, কাল সকালে আসিস্।" কিন্তু গৃহিণীর কন্যা বা পুত্রবধূ সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া দুই কোমল বাহু দিয়া সেই ছদ্মবেশিনী ভিখারিণীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিতেছে,—"মাগী কত ছলই জানে, ও গলার আওয়াজ কি আমরা চিন্‌তে পারিনে ?" অমনি চারি দিক হইতে মধুর হাস্য-কলরব উত্থিত হইতেছে। এই শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত আনন্দহিল্লোলিত রাত্রে যুবতীগণের সেই সরল স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্য চারি দিকের মাধুর্য্যকে আরো ফুটাইয়া তুলিতেছে; আকাশের কোন দূর দূরান্তর হইতে পূর্ণচন্দ্র সেই কোমল হাসি দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছে, এবং তাহা গোপন করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে না। যেন আজি প্রকৃতি-দেবীর কল-হাস্যোচ্ছ্বাসপূর্ণ বিমল বাসররাত্রি! আকাশে চন্দ্রের হাসি, উপবনে প্রত্যেক পল্লবের অন্তরালে সুবাসপূর্ণ কুসুমের হাসি, গৃহ-প্রাঙ্গণে যুবক-যুবতীগণের প্রসন্ন হাসি, নিখিলের সমস্ত হাস্য মিলিয়া এক কোমল হাস্যতরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী আলিপনায় অঙ্কিত শুভ্র পুষ্প, লতা, পক্ষী এবং লক্ষ্মীর চরণযুগল পর্য্যন্ত যেন সজীব হইয়া সেই হাস্যে যোগদান করিতেছে।

আজ রাত্রে লক্ষ্মী, অর্থাৎ ভাত খাইতে নাই, সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীতে কেহ লুচি, কেহ রুটি খাইতেছে, কেহ বা সমারোহ পূর্ব্বক চিঁড়াদইয়ের ফলার করিতেছে, তাহার পর ছেলে পিলে হইতে যুবক বৃদ্ধ অনেকেই বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইবার জন্য তাস, পাশা, দাবা লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে। এই হাস্যময়ী, শান্তিপূর্ণ রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইতে কাহার ইচ্ছা হয় ? আজ ঘুমাইতে নাই।

রাত্রি দশটার পর বাজারের বারোয়ারী তলায় পাঁচালীর গান আরম্ভ হইল। অনেকেই পাঁচালী শুনিতে বারোয়ারী তলার সামিয়ানার নীচে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু এবার পাড়ায় পাড়ায় [illegible]

হইতে চাষাদের মধ্য হইতে এই গান একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল; এমন কি, চাষার ছেলেরা চাঁদ সদাগর, পদ্মাবতী, বেহুলার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু অল্প দিন হইতে রাখাল কৃষাণরা আবার বেহুলার পালা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে; আজ রাত্রে প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে তাঁহাদের অনুগত রাখাল কৃষাণ এবং মজুরেরা এক এক নীলের চাদর অথবা পাল টাঙ্গাইয়া দুই তিনটা কম্বলের উপর বসিয়া বেহুলার পালা গাহিতে সুরু করিয়াছে। দুই তিনটি কেরোসিনের টিমি অথবা ল্যাম্প মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, চাষারা সেই ম্লান দীপালোকে দাঁড়াইয়া কেহ পদ্মাবতী, কেহ মনসা, কেহ নখিন্দরের বক্তৃতা করিতেছে; যাহারা মেয়ে সাজিয়াছে, তাহাদের পায়ে নূপুর, মাথায় কতকগুলা রূক্ষ পরচুলা, পরনে ময়লা শাড়ী ফের দিয়া পরা, প্রকোষ্ঠে পিতলের বিবর্ণ বলয়, কঙ্কণ, উপর হাতে তাবিজ, অনন্ত। বৃদ্ধ চাঁদ সদাগর মাথায় এক জীর্ণ কালো টুপী পরিয়া এক গাছি স্থূল লাঠি হস্তে আসিয়া দাঁড়াইলে, চিকের অন্তরাল হইতে মেয়েরা একবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সদাগরের মুখশ্রী, এবং পরিচ্ছদপারিপাট্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাহার পর চাঁদ সদাগর যখন বৈবাহিকের দর্শনকামনায় অশ্বারোহণে দ্বিতীয়বার আসরে প্রবেশ করিল, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। এক জন লোক উবু হইয়া বসিয়া সদাগরের দুই পা চাপিয়া ধরিয়া চলিয়াছে, এবং সদাগর একটা ঘোটকমুণ্ড সম্মুখে প্রায় বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া অগ্রগামী হইয়াছে, ঢোলক বাজিতেছে, খঞ্জনীতে ঘা পড়িতেছে, আর অশ্বরূপী মনুষ্য তালে তালে পা ফেলিতেছে, ঝন্‌ঝন্ করিয়া পায়ের নূপুর বাজিতেছে। অশ্বারোহণেই চাঁদসদাগর তাঁহার বৈবাহিক সবিহান সদাগরের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল; আলাপ শেষ হইলে গায়কেরা অতি তীব্র চীৎকারে গান ধরিল; একঘেয়ে সুর, মিষ্টত্বের নামগন্ধ নাই, কিন্তু ঢোলক ও খঞ্জনীর শব্দ এই অমিশ্রিত সুরের প্রত্যেক কম্পনের সহিত মিলিয়া বহুদূরে এমন একটি প্লুতরাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে, যাহা এই কোজাগরপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাতরঙ্গিত রাত্রে মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত শ্রোতার শ্রবণপথে মোহময় স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসে, অস্তাচলবর্ত্তী চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হইয়া পড়ে, শীতল বাতাস বহিতে থাকে, এবং পূর্ব্বগগন লোহিতাভ হইয়া উঠে।

ঢোলক বাজিতেছে, খঞ্জনীর ঝঙ্কার উঠিতেছে, কেরোসিনের টিমি লণ্ঠনের মধ্যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া সমস্ত লণ্ঠনটা কালীতে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, এবং চিম্নি-গুলির পাদদেশে সবুজপক্ষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র পতঙ্গের মৃত দেহ পড়িয়া আছে; ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত চিকের আড়ালে বসিয়া মায়ের কোলের কাছে ঢুলিতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে সং আসিয়া গানের একঘেয়েত্ব ভাঙ্গিয়া চারি দিকে একটা সজীবতা ফুটাইয়া তুলিতেছে, এবং মেয়েদের মধ্যে ভারি হাস্যকল্লোল উঠিতেছে, তখনই হঠাৎ তাহাদের নিদ্রা ছুটিয়া যাইতেছে।

রাত্রি প্রভাত হইল, তথাপি গান ভাঙ্গিল না। নখিন্দর সর্পাঘাতে পড়িয়া আছে, তখন কি গান ভাঙ্গা যায়? তাহা হইলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে? সুতরাং বেলা দশটা পর্য্যন্ত গান চলিল, মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাজারে যাইতে যাইতে একবার দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া লইতেছে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর স্নান করিবার জন্য ঘাটে যাইতে যাইতে বকুলতলায় দাঁড়াইয়া একটু গান শুনিলেন, তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বেহুলার গান হইলে বৃষ্টি হয় না—একেবারে বৃষ্টি নাই, বেটারা দেশে আগুণ লাগাইবে দেখিতেছি।" আজ সকালে ছেলেপিলের খাওয়া বন্ধ, গোয়ালে গরু বাঁধা আছে, রাখালেরা পাঁচনের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া গান গিলি-তেছে। অবশেষে অনেক গান এবং বক্তৃতা বাদ দিয়া নখিন্দরকে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল, রমণীরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গান ভাঙ্গিয়া গেল।

গান শেষ হইলে গৃহিণী স্নান করিয়া আসিয়া লক্ষ্মী তুলিলেন। ফকির, বৈষ্ণব, রাখাল, কৃষাণ, পারঘাটের মাঝি, ধোপা, নাপিত, বারুই, মালী সকলে আসিয়া লক্ষ্মীপূজার ভুজো ও নারিকেলের নাড়ুর জন্য তাঁহাকে ধরিতে লাগিল; তিনি অক্লান্তভাবে অন্নপূর্ণার ন্যায় দুই হস্তে তাহাদের মধ্যে জল-পান বিলাইতে লাগিলেন। যাঁহার আয়োজন নিতান্ত অল্প, তিনিও আজ কাহাকেও নিরাশ করিলেন না। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও বৌ ঝিদের আজ আর চোক মেলিবার যো নাই; কেহ রান্নাঘরের বারান্দায় আঁচল মেলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কেহ যেখানে সুবিধা পাইয়াছে, সেখানেই শুইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুধায় ছেলে কাঁদিতেছে, বাটিতে দুধ পড়িয়া আছে, উঠিয়া জ্বাল দিবার শক্তি নাই; কাহারো ছেলে মায়ের ভিজে

গৃহিণী ক্রমাগত মুখনাড়া দিয়া বলিতেছেন,—"এমন ক'রে,—রাত জেগে গান না শুন্‌লেই কি নয়?—এমন ঘুম ত কখন দেখিনি।"—কিন্তু তাঁহার সেই স্নেহের ভর্ৎসনায় কাহারো সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। কাজেই গৃহিণী নিজেই দুধ জ্বাল দিয়া ছেলেগুলিকে খাওয়াইতেছেন, ভাত রাঁধিয়া পাথরে ঢালিয়া বৌ ঝিদের ডাকাডাকি করিতেছেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা পবিত্রহৃদয়া পল্লীবিধবাদিগের সংযত, নির্লিপ্ত হৃদয়ের স্নেহ, মমতা এবং পরোপকারবৃত্তির সম্যক্‌স্ফূর্ত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে, জননী লক্ষ্মীর পূজাচ্ছলে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর কার্য্য সম্পাদন করেন।

নারায়ণ রাওয়ের বখর।

৩

নারায়ণ রাওয়ের বখরের উত্তরার্দ্ধের অনুবাদ প্রদান করিবার পূর্ব্বে, নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে বখরের বর্ণনার সহিত মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসলেখক গ্রাণ্ট ডফ্‌ সাহেব মহোদয়ের প্রদত্ত বিবরণের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক।

গ্রাণ্ট ডফ্‌ সাহেব বলেন,—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অগষ্ট দিবসে, বেলা ২টার সময় নারায়ণ রাও নিহত ও গারদীগণ কর্ত্তৃক রাজপ্রাসাদ বেষ্টিত হইলে, নগরমধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সাখারাম বাপু কোতওয়াল কাছারীতে (office of police magistrate) গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এমন সময় প্রাসাদ হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—"দাদাসাহেব নিরাপদে আছেন; প্রাসাদে কোনও গোলমাল নাই। তিনি আপনাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে প্রাসাদমধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, এবং নাগরিকগণকে অভয় প্রদান করিতে আপনাকে বলিয়াছেন।" এই সংবাদ পাইয়া সখারাম বাপু হরিপন্তকে বলিলেন যে, "আপনি স্বীয় নামে দাদাসাহেবকে পত্র লিখিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করুন।" এই পত্র লিখিত হইলে, রঘুনাথ রাও উত্তরে জানাইলেন যে,—"গারদীগণ বিদ্রোহী হইয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়াছে।"

হরিপন্ত ফড়্‌কের মনে পূর্ব্ব হইতেই রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি সন্দেহ ছিল। রঘুনাথ রাওয়ের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র তিনি সহসা প্রকাশ্য ভাবে সকলের সমক্ষে স্বীয় সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই স্পষ্টবাদিতার পরিণাম চিন্তা করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পুণা পরিত্যাগপূর্ব্বক "বারামতী" নামক নগরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। সখারাম বাপু নগরবাসিগণকে অভয় প্রদান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। তার পর ত্রিম্বক রাও মামা হতভাগ্য পেশওয়ের উত্তরক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ইংরাজ দূত মষ্টীন ও অন্যান্য রাজদূতগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাঘোবাকে অভিনন্দন

ইঙ্গিতক্রমে কপটবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই রঘুনাথ রাও গারদীগণের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্তিলাভ ও সাতারা হইতে স্বীয় নামে "অভিষেক-বসন" আনয়ন করিলেন।

রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি সকলের সন্দেহ থাকিলেও, বর্ত্তমান হত্যাকাণ্ডে তিনি স্বয়ং কত দূর লিপ্ত ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় নাই বলিয়া কেহই তাঁহার সিংহাসনারোহণে বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই। ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রীও তাঁহার রাজ্যপদপ্রাপ্তিবিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত না করিয়া, গোপনে এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফলে, প্রায় দেড় মাস পরে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইল। রাম শাস্ত্রী নির্ভীকহৃদয়ে প্রকাশ্যভাবে দাদাসাহেবকে দোষী প্রমাণিত করিয়া বলিলেন, "দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আপনার এই পাপের আর কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনি ভবিষ্যতে কখনই কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। আপনার রাজ্যের উন্নতি হইবারও আর কোনও আশা নাই। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি এই পাপ-রাজ্যে পদার্পণ করিব না।" এই বলিয়া তিনি ওয়াঈ'র নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন।—Grant Duff's History. Vol. I. 700—702,)

বখরের উত্তরার্দ্ধ।

„ইহার পর দাদাসাহেব দুই মাস রাজকার্য্য করিলেন। গঙ্গাবাঈ সাহেব অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই কারণে, আনন্দীবাঈ সাহেব তাঁহাকে ও পার্ব্বতীবাঈকে একটি প্রকোষ্ঠে বন্দোবস্ত (বন্দীপ্রায়) করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন নানা ফড়ণবীস সেই প্রকোষ্ঠের নিকট দিয়া গণেশদরজার (প্রাসাদের পূর্ব্ব দ্বারের) দিকে যাইতেছিলেন। সে সময়ে গঙ্গাবাঈ ও পার্ব্বতীবাঈ স্বীয় প্রকোষ্ঠের বাতায়নসমীপে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা ফড়ণবীসকে (নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া) সঙ্কেতপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। ফড়ণবীস নিকটে আসিলে পার্ব্বতী বাঈ তাঁহাকে বলিলেন যে,—"গঙ্গাবাঈ অন্তঃসত্ত্বা আছেন, দুই মাস শেষ হইয়া তৃতীয় মাস আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার গর্ভে অবতার হইবে। আপনারা পাঁচ জন সচিব আছেন, এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।" তখন নানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিব? বলুন্।" পার্ব্বতী বাঈ বলিলেন, "দাদাসাহেবকে ধৃত করিবার পরামর্শ কর।" ইহা শুনিয়া নানা বলিলেন, "আমরা সেই চেষ্টাতেই আছি। আপনাদেরও যখন সেইরূপই আদেশ হইতেছে, তখন এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য অবশ্যই করা যাইবে।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন। সে সময়ে রক্ষিগণ কেহই নিকটে ছিল না।

সেই দিবসই রাত্রে ১১ জন মুৎসুদ্দী বা রাজকর্ম্মচারী 'নানা'র গৃহে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের নামের তালিকা এই,—

১। নানা ফড়ণবীস।	৫। ত্রিম্বক রাও মামা।	৯। হরিপন্ত তাত্যা ফড়্কে।
২। নারো আপাজী।	৬। আপাজী বলবন্ত।	১০। আনন্দ রাও পান্সে।
৩। বাবু রাও কেশব।	৭। কৃষ্ণাজী বহিরব মণ্ডে।	১১। খাসগীওয়ালে। †
৪। বিসাজীকৃষ্ণ বিনীওয়ালে *	৮। আপাজী পুরন্দরে।	

* বিসাজীকৃষ্ণ বা বিশ্বনাথজীকৃষ্ণ বিনীওয়ালে পেশওয়েগণের "অগ্রগামী সৈন্যের অধিনায়ক" ছিলেন। বিনীওয়ালে শব্দের অর্থ—quartermaster general.

এইরূপ ১১ জন কর্ম্মচারী (১) একত্র হইয়া দাদাসাহেবকে ধৃত করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। তার পর এ বিষয়ে একটি লেখ্য প্রস্তুত করিয়া সকলের তাহাতে স্বাক্ষর করিবার প্রস্তাব হইল। (২) তখন ত্রিম্বক রাও মামা বলিলেন, "এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম সখারাম বাপুর সম্মতি চাই। তাঁহার সম্মতি ভিন্ন এ বিষয়ে কাহারও সম্মতি প্রদান করা উচিত নহে।" সে দিন ইহার বেশী আর কিছু হইল না। মামা ও অন্যান্য সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতি-গমন করিলেন।

পরদিন আবার সকলে নানা ফড়ণবীসের গৃহে একত্র হইলেন। তখন নানা সাহেব ফড়ণবীস সকলকে বলিলেন যে, "আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ এ সব কথা কোনওরূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দাদাসাহেব সকলের সর্ব্বনাশ করিবেন। এ কারণে, গীতা, গঙ্গাজল ও পুষ্প তুলসী স্পর্শ করিয়া সকলে পরস্পরের নিকট শপথ করুন। এ বিষয়ে যদি কোট্যা-বধি (অর্থাৎ বহুকোটী) টাকা ব্যয় হয়, তথাপি সকলে মিলিয়া তাহা করিতে হইবে, এ বিষয়েও প্রতিজ্ঞা করুন।" সকলেই এ কথায় সম্মত হইলেন। সে দিন ইহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, "আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইবে।" তার পর নানা বলিলেন, "এই কার্য্যে যদি সখারাম বাপুর সাহায্য থাকে, তবেই ইহা সিদ্ধ হইবে।" কিন্তু তিনি দাদাসাহেবের পক্ষপাতী, ইহা শুনিয়া মামা উত্তর করিলেন,—"আপনারা ১১ জন যখন এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তখন বাপুর ভার আমি লইতেছি।" নানা বলিলেন, "তিনি (সখারাম বাপু) একজন বুদ্ধিমান্; এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তালাভবিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইলে, আমার সম্বন্ধে তাঁহাকে নিঃসংশয় হইতে বলিবেন।" পুনরায় সকল কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন সখারাম বাপু রাজপ্রাসাদে কাজ করিতে আসিলেন। কাজকর্ম্ম সমস্ত শেষ হইল। বাপুর সহিত মামার মনান্তর ছিল। কেবল সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহারা পর-স্পরের সহিত কথা কহিতেন;—কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে। উভয়ের মধ্যে অতিশয় শত্রুতা ছিল। (৩) কাছারী বরখাস্ত হইলে, রাত্রে ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া, মামা সখা-রাম বাপুর গৃহে গমন করিলেন। বাপু স্বীয় বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। দ্বারপাল সেখানে গিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, "মামা আসিয়া নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।" শুনিয়া বাপু বলি-লেন,—"ইহা কিরূপে হইতে পারে? পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিম দিকে কিরূপে উদিত হইবে? মামা আমাদের গৃহে কখনই আসিবেন না।" দ্বারপাল কহিল,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু মামা নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।" ইহা শুনিয়া বাপু বৈঠকখানা

(১) গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব কেবল সাত জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত তালি-কায় ধৃত হয় নাই, এরূপ দুইটি নাম (প্রথম—বজা বা পুরন্দরে ও দ্বিতীয় মোরোবাদাদ ফড়ণবীস) দৃষ্ট হয়।

(২) এই সকল কার্য্যে নানা ফড়ণবীস সকলের নেতা ছিলেন। তাঁহারই আহ্বানে ও চেষ্টায়, এই ১১ জন মুৎসুদ্দী একত্র হইয়া দাদাসাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(৩) পূর্ব্বে মাধাব রাও পেশওয়ে সখারাম বাপুকে পদচ্যুত করিয়া, ত্রিম্বক রাওকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই, বোধ হয়, মামার সহিত বাপুর মনান্তর হয়।

হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে নীচে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মামা নমস্কার করিলেন। বাপু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিম দিকে কিরূপে উদিত হইলেন!" মামা উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরকৃপার খেলা কেহ বুঝিতে পারে না। কালক্রমে পশ্চিম দিকেও সূর্য্যোদয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই ঈশ্বরী মায়া কাহারও বোধগম্য নহে। আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি। আপনার সহিত কতক কথা আছে। যেখানে মক্ষিকারও প্রবেশ নাই, এরূপ নিভৃত স্থানে চলুন।"

বাপু তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তখন মামা বলিলেন,—"আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছি। যাহা চাহিব, তাহা বক্সীস্ দিতে হইবে।"

বাপু। বক্সীস্ যদি দিবার যোগ্য হয়, ত দিতে প্রস্তুত আছি।

মামা। তাহা হইলে সত্য করুন। বড়লোকেরা কথা দিয়া কখন অন্যমত করেন না।

বাপু সত্যে বদ্ধ হইলেন।

মামা। আমি অপর এক বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছি। গ্রহণ করিতে হয়, করিবেন; না হয়, আমি কিছুই বলি নাই, এবং আপনিও কিছু শুনেন নাই। এ বিষয়ে আপনার প্রতিশ্রুতি চাই।

বাপু। উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, গ্রহণ করিব। নচেৎ আমি কিছুই শুনি নাই। (এরূপ ভাবে থাকিব)।

সখারাম বাপুর নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া মামা বলিলেন;—"এই লেখ্য আনিয়াছি, পাঠ করিয়া দেখুন।" বাপু কাগজটি লইয়া পড়িয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

মামা। আপনি ইহাতে সম্মতিদান ও স্বাক্ষর করুন।

বাপু। আমি এ বিষয়ে কিরূপে সম্মতি প্রদান করিব? আমি দাদাসাহেবের পক্ষের লোক। আপনি আমাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিলেন। এ সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই বলিয়া বাপু কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া মামা বলিলেন, "ইচ্ছা হয় সম্মতি প্রদান করুন। আমি এ বিষয়ে আপনাকে বেশী অনুরোধ করিতে চাহি না। (যদি বলেন) এখনি এই লেখ্য ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি। আমাদেরই বা এত কি গরজ পড়িয়াছে! আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, এবং আপনিও কিছু শুনেন নাই। কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ব্যবহারের দ্বারা বাপুর সত্য লঙ্ঘন করা হইল। বড়লোকের কথাই প্রমাণ। আপনি কথা দিলেন যে, 'যাহা চাহিবেন, তাহা দিব'; অতএব এখন এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন।"

বাপু। আমি দাদাসাহেবের পক্ষের লোক; আমি কিরূপে ইহাতে স্বাক্ষর করিব?

মামা। আপনি দাদাসাহেবের পক্ষের লোক বলিয়াই ত আপনার স্বাক্ষর ও সম্মতি চাহিতেছি। নহিলে আমরা ১১ জন কি চক্রান্ত করিতে জানি না?

বাপু। 'বাপু সত্যভঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার কথার ঠিক নাই', এই কথা আপনি রাষ্ট্র করিবেন বলিয়া আমি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিতেছি। কিন্তু দাদাসাহেবকে আপনারা কিরূপে ধৃত করিবেন?

মামা। আগে স্বাক্ষর করুন, পরে বলিতেছি।

আনাইয়া বাপুর হস্তে প্রদান করিলেন। বাপু তাহা লইয়া শপথ করিলেন। পরে বলিলেন, "গঙ্গাজল পর্য্যন্ত হস্তে লইয়া শপথ হইল, এখন বলুন, দাদাসাহেবকে কিরূপে ধরিবেন ?"

মামা। সে কথা আজই জিজ্ঞাসা করিবেন না। যেখানে গোপনে আমাদের এই সকল বিষয়ের পরামর্শ হইবে, কল্য সেখানে আপনাকে লইয়া যাইতে আমাদের একজন লোক আসিবে। আপনি সেখানে গেলে এ কথার উত্তর পাইবেন। এই বলিয়া মামা বাপুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। দাদাসাহেব এ সব বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

পরদিন রাত্রে নানার গৃহে ১১ জন মুৎসুদ্দী সমবেত হইলেন, এবং বাপুকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। বাপু আসিলে, সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, "দাদাসাহেবকে কিরূপে ধৃত করা যাইবে? তিনি প্রাসাদে থাকিতে তাঁহাকে হস্তগত করা সহজসাধ্য নহে।" বাপু বলিলেন,"দাদাসাহেবকে কোনও উপায়ে পুণার বাহির করিতে হইবে। হায়দরাবাদের নিজাম আলীর সহিত পেশওয়েগণের বন্ধুত্ব আছে। তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিত হউক যে, 'দাদাসাহেব নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি নানাসাহেবের (বালাজী বাজী রাওয়ের) পুত্রকে হত্যা করেন নাই, পরন্ত আপনার পুত্রকেই হত্যা করিয়াছেন বলিয়া আপনি মনে করিবেন; এবং ইহার প্রতিবিধানার্থ আপনি লক্ষ সৈন্য লইয়া পুণা আক্রমণের চেষ্টা করিবেন।' এই পরামর্শ সকলের সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। পরে গঙ্গাভাগীরথী পার্ব্বতী বাঈ সাহেবের নামে একখানি পত্র হায়দরাবাদের মোগলকে (নিজাম আলীকে) ও একখানি পত্র পেশওয়ের তত্রস্থ উকিল (দূত) রাজশ্রী"কৃষ্ণরাও কালে"কে লিখিত হইল। কৃষ্ণ রাওয়ের পত্রে লিখিত ছিল যে, "নবাবকে প্রত্যেক কুচের জন্য লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া লক্ষ সৈন্য সহ তাঁহাকে বালেঘাটের নিকট লইয়া আসিবে।" এইরূপ দুইটি পত্র লিখিত হইল। সেই রাত্রেই দূতহস্তে পত্র প্রেরিত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রত্যহ প্রাসাদে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। (১)

মাস খানেকের মধ্যে দূত পত্র লইয়া (হায়দরাবাদে) পঁহুছিল। উকিল (কৃষ্ণরাও) নিজাম আলীর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পড়িয়া নবাব বলিলেন,—"নানা সাহেব পেশওয়ের পুত্র নিহত হন নাই, আমার পুত্রই নিহত হইয়াছে। এ কারণে আমার পুণা আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া নবাব লক্ষ সৈন্য লইয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। (২) এ দিকে কৃষ্ণরাও দাদাসাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, "নিজাম আলী পুনা আক্রমণের উদ্দেশে রণসজ্জা করিতেছেন।" তদ্ভিন্ন নানা ও বাপু প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণকেও গোপনে এক পত্র লিখিত হইল।

---

(১) দ্বাদশ রাজকর্ম্মচারিকৃত এই চক্রান্ত, মহারাষ্ট্র ইতিহাসে "বার্‌ভাইর্চে কারস্থান" বা বার ভাইয়ের চক্রান্ত নামে প্রসিদ্ধ।

(২) পেশওয়েগণের বখরেও লিখিত আছে যে, সখারাম বাপু নিজামকে দাদাসাহেবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য গুপ্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ট ডফ্ বলেন,— নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুতে পুণা দরবারে গোলমাল বাধিয়াছে, দেখিয়া, মারাঠাগণের চিরশত্রু হাইদার আলী ও নিজাম আলী মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের দমনের জন্য দাদাসাহেব রণসজ্জা করিয়া বহির্গত হইলেন। নিজাম আলীর সহিত

এক মাস পরে উকিলের পত্র লইয়া দূত পুণায় আসিল, ও দাদাসাহেবকে পত্র প্রদান করিল। তিনি পত্র পাঠ করিয়া সখারাম বাপু, ত্রিম্বক রাও মামা, নানা ফড়ণবীস ও হরিপন্ত ফড়কেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উকিল লিখিয়াছেন যে, নিজাম পুনঃ আক্রমণের উদ্দেশ্যে সসৈন্য বাহির হইয়াছেন। এ সংবাদ কি সত্য?" বাপু বলিলেন, "উকিল মিথ্যা কথা লিখিবেন না। নিজামের এ দিকে আসিবার সংবাদ নিশ্চয়ই রটিয়াছে। তিনি বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছেন, তাই লিখিয়াছেন। আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। (মাধব রাও) পেশওয়ের সময় মোগলেরা আসিয়াছিল, কিন্তু কি করিতে পারিয়াছিল? আপনি স্বয়ং সসৈন্য সজ্জিত হইয়া সম্মুখীন হউন। বিপর্য্যাস (অর্থাৎ নিজামের অসদভিপ্রায়) দেখিলে, দণ্ড দেওয়া যাইবে। সে জন্য চিন্তা কি?" বাপু এই কথা বলিলেন।

পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহ দাদাসাহেব সমস্ত মুৎসুদ্দীগণ (১) এবং আনন্দীবাঈ ও দত্তক পুত্র চিরঞ্জীব অমৃত্য রাওকে সঙ্গে লইয়া গারপীরে (২) গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিন্দে হোলকর ও অন্যান্য সর্দ্দারগণকে পত্র লেখা হইল যে, "নিজাম আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে, আপনারা সকলে সৈন্যসামন্ত সহ আসিবেন।"

এ দিকে নবাব কুচের পর কুচ করিয়া বালেঘাটের নিকট আসিলেন। দাদাসাহেব কুচ করিয়া "কোরেগাঁও" মোকামে উপনীত হইয়া বলিলেন, "পুণায় পার্ব্বতীবাঈ ও গঙ্গাবাঈ দুই জন মাত্র আছেন। তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাহাকেও সেখানে রাখা উচিত। কারণ, গঙ্গাবাঈ তিন মাসের গর্ভবতী।" এই বলিয়া খোণ্ডো (খুণ্ডিরাজ) থওাজী নামক তাঁহার জনৈক পটশিষ্যকে (৩) মুতালিকের পরিচ্ছদ, মুদ্রা (মোহর) ও তরবারি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—"তুমি পুণায় গিয়া প্রাসাদের ও সহরের বন্দোবস্ত রাখিবে (৪)।

ইতিমধ্যে নাগপুরের সাবাজী ভোঁসলে বিদ্রোহী হইয়া ঔরঙ্গাবাদ অভিমুখে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া দাদাসাহেব ত্রিম্বক রাও মামাকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং কর্ণাটকে গমন করিলেন। নানা ফড়ণবীস প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণ দাদাসাহেবকে বন্দী করিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু দাদাসাহেব যত দিন পুণায় ছিলেন ও সৈন্যসামন্ত তাঁহার হস্তে ছিল, ততদিন তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। রঘুনাথ রাও পুণা পরিত্যাগ করিয়া নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবামাত্র বারভাইগণ তাঁহাদিগের ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা পাইলেন। রাঘোবা কর্ণাটকের অভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র, নানা ও বাপু প্রভৃতি সকলে একে একে পীড়ার ভাণ করিয়া পুণায় প্রত্যাগমন করিলেন। দাদাসাহেব ইহার প্রকৃত কারণ তখন বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দূরবর্ত্তী দেখিয়া, মুৎসুদ্দীগণ গঙ্গাবাঈকে মুক্ত করিয়া পুরন্দর দুর্গে প্রেরণ করিলেন; এবং সাবাজী ভোঁসলের ও নিজাম আলীর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন।

(১) পেশওয়ের বখরের বর্ণনামতে, খাসগীওয়ালে প্রভৃতি কয়েক জন প্রাচীন কর্ম্মচারীকে পুণায় রাখিয়া দাদাসাহেব যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

(২) "গারপীর" পুণার অনতিদূরে। এখানে পেশওয়েগণের সেনানিবাস ছিল।

(৩) পটশিষ্য—প্রিয়তম ও বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ভৃত্য। পেশওয়েগণের সেবার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ ভৃত্য নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে "ভৃত্য" না বলিয়া শিষ্য নামে অভিহিত করা হইত।

(৪) পেশওয়েগণের বখরে লিখিত আছে, রাঘোবা পুণা পরিত্যাগের পূর্ব্বে নারো আপাজীকে প্রাসাদ ও নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন।

(তাঁহার আদেশক্রমে?) ধোণ্ডো খণ্ডাজী পুণায় প্রতিগমন করিয়া প্রাসাদের ও সহরের বন্দোবস্ত করিলেন।

এদিকে মুৎসুদ্দীগণ দাদা সাহেবকে নিজামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া রাখিলেন, এবং নিজামকে গোপনে পত্র লিখিলেন, "আপনি বালেঘাটে আসিবেন ; তার পর আমরা যেরূপ লিখিব, সেইরূপ করিবেন।" অনন্তর একদিন রাত্রে সমস্ত মুৎসুদ্দীগণ একত্র হইলেন। বাপু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এখন পার্ব্বতী বাঈ ও গঙ্গা বাঈয়ের মুক্তির জন্য কোন্ উপায় অবলম্বনীয় ?" (তখন সকলের বিবেচনায় স্থির হইল যে,) পুরন্দর দুর্গ নারো আপাজীর (ইনি চক্রান্তকারিগণের অন্যতম) তত্ত্বাবধানে আছে। অতএব তাঁহাদিগকে সেই দুর্গে লইয়া গিয়া রাখা হউক।" সখারাম বাপু নারো আপাজীকে বলিলেন, "আমি দাদাসাহেবের নিকট হইতে আপনার পুরন্দরে প্রতিগমনের আদেশ আনিয়া দিতেছি। বাঈগণ (পার্ব্বতী বাঈ ও গঙ্গা বাঈ) যাহাতে পলায়নপূর্ব্বক পুরন্দরে গমন করিতে পারেন, আপনি তাহা করিবেন।" এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া মুৎসুদ্দীগণ দাদা সাহেবকে বলিলেন যে, "পুরন্দরের নিকট রামোশী নামক পার্ব্বত্য জাতি বিদ্রোহী হইয়া অতিশয় দাঙ্গা করিতেছে। এ কারণে নারো আপাজীকে পুরন্দরে ফিরিয়া যাইবার আদেশ প্রদত্ত হউক্ ; তাহা হইলে তিনি গিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করিবেন।" তাঁহাদের সকলের অনুরোধে দাদা সাহেব নারো আপাজীকে বিদায় দিলে, তিনি পুরন্দরে আসিলেন।

পরদিন ১১ জন মুৎসুদ্দী এক স্থানে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আমাদের মধ্যে দশ জনের পুণায় প্রতিগমন করা আবশ্যক। এক জনকে এখানে থাকিতে হইবে, তিনি এদিকের উপায় করিবেন। অতএব কে এখানে থাকিতে প্রস্তুত আছেন, বলুন। যিনি এখানে থাকিবেন, তাঁহাকে 'আজই মরিয়াছি' মনে করিতে হইবে।" তখন বাপু বলিলেন, "আমি এখানে থাকিতেছি। এদিকের সমস্ত বন্দোবস্ত আমি করিব।" ইহা শুনিয়া মামা বলিলেন, "আপনারা যাহাতে পুণায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইতে পারেন, আমি তাহা করিতেছি। এবং আমি এখানে থাকিতেছি। (১) 'আমি আজই মরিয়াছি' বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ভার আপনাদের উপর রহিল।"

পরদিন বাপু কপালে কাপড় বাঁধিলেন, এবং দাদা সাহেবকে বলিলেন, "আমার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। শরীর ভাল নাই। আমাকে পুণা যাইবার অনুমতি দিন। আরোগ্য হইলে পুনরায় আসিব। মামাও দাদা সাহেবকে বলিলেন, "বাপুর শরীর ভাল নাই ; তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হউক। আরোগ্য হইলেই তিনি আসিবেন।" কাজেই দাদা সাহেব তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বাপু পুণায় আসিলেন।

ইহার পর নানা ফর্ণবীসের স্বাস্থ্য বিকৃত হইল, এবং হরিপন্ত তাতা ফড়কে শূল রোগে খুব কষ্ট পাইতে লাগিলেন (২)। (তাঁহারা পুণায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, দাদা বলিলেন, "সকলেই পীড়ার ভান করিয়া বিদায় চাহিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন রকম জুয়াচুরি আছে বলিয়া আমার বোধ হয়।" তখন মামা বলিলেন,—যুদ্ধে অনিচ্ছু সৈনিক-কে বলপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করাইলে সে আর কত তলওয়ার চালাইবে ? অতএব ইহাদিগকে বিদায় দেওয়া হউক্। পুণায় গিয়া, ৮।১০ দিনে আরোগ্য হইলে, ইহাঁরা পুনরায়

(১) দাদা সাহেবের পক্ষপাতী বলিয়া বাপুর প্রতি মামার সন্দেহ ছিল ; এই কারণে তিনি বাপুকে একাকী দাদা সাহেবের কাছে রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ মনে করিলেন না।

(২) পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ সমস্তই ভানমাত্র।

আসিবেন। আমি আপনার সঙ্গেই রহিলাম। আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।" এই রূপে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া মামা মুৎসুদ্দীগণকে পুণায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়াইলেন (১)। তাঁহারা পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। দাদাসাহেব সেখান হইতে কুচ করিয়া এক মঞ্জিল অগ্রসর হইলেন। সেখানে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখা হইল।

পুণায় আসিয়া মুৎসুদ্দীগণ গঙ্গাবাঈয়ের জননী "তাঈবাঈ" সাঠী"কে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"আপনি গঙ্গাবাঈকে ছুখোটা (২) করিবার জন্য বলিয়া (একবার) স্বগৃহে আনয়ন করুন।" তাঁহাদিগের উপদেশক্রমে তাঈবাঈ প্রাসাদে গিয়া রাজ-শ্রীধোণ্ডো খণ্ডাজীর নিকট, গঙ্গাবাঈকে ছুখোটার জন্য গৃহে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধোণ্ডো খণ্ডাজী গঙ্গাবাঈকে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পার্ব্বতীবাঈ ও গঙ্গাবাঈকে ঘোমটা দিয়া তাঈবাঈ সাঠীর গৃহে আনা হইল। দু জনেই গেলেন, এ কথা ধণ্ডো খণ্ডাজী জানিতে পারিলেন না।

নারো আপাজী পাঁচ শত সাদী সহ পর্ব্বতীশৈলে (লুকাইয়া) বসিয়াছিলেন। রাত্রি প্রহরেক কালে তিনি (গোপনে তাঈবাঈর গৃহে আসিয়া পুরন্দর পর্য্যন্ত পাল্কীর ডাক বসাইয়া, গঙ্গাবাঈ ও পার্ব্বতীবাঈকে পাল্কীতে করিয়া দুই প্রহর রাত্রে পুরন্দরে লইয়া গেলেন। (৩) পরদিন প্রাতে সখারাম বাপু, হরিপন্ত ফড়্‌কে' নানা ফড়ণবীস প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণ (পুণা হইতে পুরন্দরে) পলায়ন করিলেন। এই সংবাদ ধোণ্ডো খণ্ডাজীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি রাঘোবাকে জানাইলেন, যে, "বাঈদ্বয়কে (গঙ্গাবাঈ ও পার্ব্বতীবাঈ) লইয়া মুৎসুদ্দীগণ পুরন্দরে পলায়ন করিয়াছেন।" (৪) ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

(১) পেশওয়ে বখরের উল্লেখ অনুসারে, দাদাসাহেব পেশওয়ে হইয়া "চিন্তো বিঠ্‌ল" নামক তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সখারাম বাপু চিন্তো বিঠ্‌লকে বলিলেন,—আপনার মন্ত্রিত্বপ্রাপ্তিতে নানা ও হরিপন্ত প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট ও আপনার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছেন। ইঁহারা সঙ্গে থাকিলে, আপনার কখন কি বিপদ্ ঘটাইবেন, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এ কারণে ইঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য দাদাসাহেবকে আপনিও অনুরোধ করুন্। আমার সঙ্গে ১০।১২ শত সওয়ার আছে; সরকার হইতে আরও কতক সৈন্য আমার সাহায্যের জন্য দেওয়া হউক; আমি ইঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইব, এবং পুণায় ইঁহাদিগের গৃহে চৌকী পাহারা রাখিব, যেন ইঁহারা কোনওরূপে বিদ্রোহাচরণ করিতে না পারেন।" বাপুর এই উপদেশ চিন্তো বিঠ্‌লের নিকট সুসঙ্গত বোধ হওয়ায়, তিনি রাঘোবাকে বলিয়া বাপুর সঙ্গে ১ হাজার সওয়ার ও ১ হাজার গারদী সৈন্য প্রদানপূর্ব্বক, নানা ও হরিপন্ত প্রভৃতির সহিত তাঁহাকে পুণায় পাঠাইলেন।

(২) ছুখোটা—মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার বিশেষ প্রথাকে "ছুখোটা" বলে। এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণ ক্রিয়াকর্ত্তাকে বা মৃত ব্যক্তির অতিনিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তিকে, অন্ত্যেষ্টি শেষ হইলে, ভোজনের জন্য একদিন স্বগৃহে আহ্বান করিয়া বস্ত্রাদি প্রদান করেন।

(৩) খৃষ্টীয় ১৭৭৪ অব্দের ৩০শে জানুয়ারী এই ঘটনা ঘটে Grant Duff;—পুরন্দর দুর্গ পুণার প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

(৪) পেশওয়ের বখরে লিখিত আছে, নারো আপোজীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বাপু, নানা ও হরিপন্ত সহসা একদিন বিদ্রোহিতার ভান করিয়া প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক, গঙ্গাবাঈ, পার্ব্বতীবাঈ, সাগুনাবাঈ (জনার্দ্দন বাবার স্ত্রী) ও দুর্গাবাঈ (রাঘোবার [illegible]) প্রভৃতিকে লইয়া পুরন্দরে পলায়ন করেন, এবং দাদাসাহেবের পক্ষীয় বক্সী ও কর্মচারিগণ এই কার্য্যে

ঐতিহাসিক কথা।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, বিধাতা আপন মস্তক হইতে ব্রাহ্মণের, বক্ষোদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে এই চারি ভিন্ন আর জাতি নাই;—এবং এই পুরাতন চারি জাতি মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান সহস্র-জাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক কথা, এই চারি মনুষ্যের মধ্যে, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ ও মাথার বলে শ্রেষ্ঠ; ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ ও বাহুবলে শ্রেষ্ঠ; বৈশ্য পীতবর্ণ ও কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের দাসত্বই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জাতিভেদের মূল কথা এই বর্ণভেদ; এবং ভারতবর্ষে অদ্যাপি জাতিশব্দের অপর পর্য্যায় বর্ণ।

কৌতুক এই যে, প্রকৃত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলে এই পৌরাণিক আখ্যানের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়। সমগ্র মনুষ্য জাতিকে মোটামুটি চারি জাতিতে বিভাগ করিবার প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ককেশীয় জাতি, আর্য্যজাতি যাহার প্রধান শাখা, সেই জাতি আপনার শ্বেতচর্ম্ম ও প্রকাণ্ড মাথা লইয়া অদ্যাপি সমগ্র পৃথিবী আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। আদিম আমেরিক তাম্র বা রক্তবর্ণের জন্য ভূগোলবিবরণে বিখ্যাত, এবং তাহাদের বাহুবলের জন্য সম্যক্ খ্যাতি আছে কি না, জানি না; তবে মহাভাগ খ্রীষ্টান দিগের শুভ পদার্পণের পূর্ব্বে, আমেরিকার লোকে মিশর, কাল্দিয়া ও গ্রীস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াও বড় বড় সাম্রাজ্যস্থাপনে ও উন্নত সভ্যতাসৃজনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই দেখিতে পাই। মোগলজাতীয় চীনাম্যানের প্রধান পরিচয় পীতবর্ণ, এবং শুনা যায়—এই চীনাম্যানই প্রথমে দিগ্দর্শন শলাকার তথ্য অবগত হইয়া সমুদ্রযাত্রা সুগম করে। আর মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি নিগ্রহের ও উৎপীড়নের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যতই ব্যথিত হউক না, কৃষ্ণকায় কাফ্রি শ্বেতাঙ্গের দাস্যে জীবন অতিবাহিত কেন না করিবে, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পরিগণিত হইত ও হইয়া থাকে।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকার যে এইরূপে একটা সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ের কারণ

দেখি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, চারিবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতবর্ণ মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা কত দূরে আসিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

বাল্যকাল হইতে আমরা মুখস্থ করিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ, গ্রীক ও জর্ম্মান, পার্শী ও হিন্দু, একই মানববংশে উৎপন্ন ও পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্বদ্ধবান্। এই প্রাচীন মানববংশ একটি বিশেষ সুগঠিত সুন্দর ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, একই দেবতার আরাধনা করিত, এবং কাস্পীয় সাগরের ধারে অথবা পামির অধিত্যকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অধিবাস করিত। কালক্রমে বংশবিস্তারসহকারে বা খাদ্যাভাবে বা পার্শ্বস্থ জাতির আক্রমণে আদিম বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কেহ পশ্চিমে কেহ বা পূর্ব্বে যাত্রা করে, এবং কালক্রমে পশ্চিমে আৎলান্তিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলে। সেই সেই প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এই বৈদেশিক অতিথির পদার্পণানুগ্রহে সর্ব্বত্র সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আপনাদের গরু ভেড়া ও বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত অতিথিসৎকারে নিয়োজিত করিয়াও নিস্কৃতি পায় নাই। এমন কি, অধিকাংশ স্থলে আপনাদের অস্তিত্ববার্ত্তা পর্য্যন্ত এত দূর নিষ্কামভাবে লুপ্ত করিয়াছে যে, বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিস্তর আক্ষেপ ও গবেষণাতেও তাহার উদ্ধার হইতেছে না। যাহাই হউক, শ্বেতকায়গণের এই আতিথ্যগ্রহণস্পৃহাটা অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী রহিয়াছে; এবং এই ক্ষুদ্র ধরাখানার মধ্যেও অত বড় সাহারা দেশটাকে মরুভূমি ও মেরু প্রদেশটাকে বরফভূমি করিয়া বিধাতা তাঁহাদের বাসস্থানকে যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বিধাতার এই নিষ্করুণ কার্পণ্যের সুচারু কৈফিয়ৎও পাওয়া যাইতেছে না।

আমাদের পঞ্চনদবাসী পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন, এবং সার উইলিয়ম্ জোন্সের পর হইতে ইউরোপীয়েরাও আপনাদিগকে আমাদের জ্ঞাতি সাব্যস্ত করিয়া সেই নামে পরিচিত করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদের জ্ঞাতিত্বস্বীকারে কুণ্ঠিত, এবং অপরের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরাজেরা যে নিশ্চয়ই বানরের বংশধর, ডারুইনের মতের এইটুকু গ্রহণ করিতে আনন্দসহকারে প্রস্তুত। তথাপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইংরাজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের আর্য্যত্ব স্বীকৃত ও আর্য্যশব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

এই স্থলে ইউরোপীয়দের আর্য্যত্বে অধিকার-বিষয়ক যুক্তির একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রধানতম ও প্রবলতম যুক্তি ভাষাগত ঐক্য। ফলে ইংরাজ ও জর্ম্মন্ ও পঞ্জাবী ও মারাঠী একই ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ভাষাগত ঐক্যের মূলে শোণিতগত বা জাতিগত ঐক্য না থাকিলে, এত বড় হেঁয়ালিটারও কোন অর্থ হয় না। অপিচ, ইংরাজের ভাষার ও বাঙ্গালীর ভাষার সাদৃশ্য ও বিভেদ পর্য্যালোচনা করিয়া, যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একত্র পাশাপাশি অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়েও কতকটা স্থূলসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। এমন কি, তাঁহাদের আদিম বাসস্থান পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে। তবে যেমন সিদ্ধান্ত-মাত্রেই সকল পণ্ডিতকে কখন এক মত গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই,—এখানেও সেইরূপ দুই মত রহিয়াছে। আর্য্যভাষাসমুদয়ের ব্যবচ্ছেদ ও তুলনায় আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, আর্য্যজাতির প্রধান বাসস্থল ছিল, কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে; আর কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, সুইডেনের উত্তরে। পুরাতত্ত্বে এইরূপ ঈষৎ মতদ্বৈধ দেখিয়া বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কাজ।

এই ভাষাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান আর্য্যজাতীয় মনুষ্যগণকে ছয় প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ছয়ের মধ্যে চারি শাখা ইউরোপে, ও দুই শাখা এশিয়া মহাদেশে বসতি করিতেছে। ইউরোপে কেল্ট, টিউটন্, গ্রীক্-রোমান, ও স্লাব্; এবং এশিয়া মহাদেশে পারসী ও হিন্দু। এই ছয় শাখা লইয়া আর্য্যজাতিরূপ মহাবৃক্ষ। ইহার মূল কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে বা সুইডেনের উত্তরে কোন স্থানে সংস্থিত ছিল। ইহার শাখা প্রশাখা সমগ্র ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমগ্র ধরা-ভাগ ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। সমগ্র ধরাভাগ ইহার ছায়ার আশ্রয়ে "সুশীতল" হইতেছে; ইহার শোভা, ইহার ঐশ্বর্য্য, ইহার সমৃদ্ধি পৃথিবীতে তুলনা-বিরহিত; তবে ইহার আওতা ক্ষুদ্র আগাছার পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর।

এই সিদ্ধান্তটা স্থূলতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত; ইহার যাথার্থ্যে সন্দিহান হইবার সম্যক্ কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীনকালে কোন দেশবিশেষে একটা বিশেষলক্ষণাক্রান্ত মানব-বংশ বসতি করিত; সেই বংশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে শোণিতগত ও জন্মগত সম্বন্ধ ছিল; অর্থাৎ তাহারা পীতবর্ণ মোগল, ও কৃষ্ণকায় কাফ্রি, ও তাম্রবর্ণ আমেরিক হইতে স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত জীব ছিল;—সেই জাতির নাম হউক "আর্য্যজাতি"। তাহারা একটা বিশেষ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত; সেই ভাষা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের জাতীয় সম্পত্তি, তাহাদের নিজস্ব ছিল;—তাহার নাম হউক "আর্য্য ভাষা"। তদ্ভিন্ন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের একটা স্থূল ঐক্য ছিল; অতএব সেই প্রাচীন ধর্ম্মের নাম দাও "আর্য্যধর্ম্ম"। সেই আর্য্য-ভাষা-ভাষী আর্য্যধর্ম্মাশ্রয়ী আর্য্যজাতি কালে সমগ্র পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং অধুনাতন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মনুষ্য-গণের অনেকে অদ্যাপি সেই প্রাচীন আর্য্যগণেরই বংশে জন্মিয়াছে; কাল-সংকৃত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই প্রাচীন আর্য্যভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং হয় ত সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মকেই রূপান্তরিত করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এ পর্য্যন্ত স্থূলতঃ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচারে এইরূপ কয়েকটা প্রশ্ন আসিয়া পড়ে ও তাহাদের উত্তরের দরকার হয়। সম্প্রতি যাহারা আর্য্যভাষায় কথা কহে, ও আপনাদিগকে আর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, সকলেই প্রকৃতপক্ষে আর্য্য নামের অধিকারী বটে কি না? প্রাচীন আর্য্যজাতি পৃথিবী ছাইবার পূর্ব্বে কোন-না-কোন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত;—সে কোন্ স্থান? প্রাচীন আর্য্যজাতি কোন-না-কোন সময়ে প্রাচীন বাস-ভূমি ত্যাগ করিয়া দিগন্তে বাহির হয়;—সে কোন্ সময়?

এ কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু সন্দেহের কারণ জন্মে।

ভাষাগত ঐক্য ধরিয়া জাতিগত ঐক্য স্থাপন করিতে গেলে, অনেক সময়ে ভুল হয়। ভাষাপরিবর্ত্তন পৃথিবীর ইতিহাসে নিত্য ঘটনা। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে পুনঃপুনঃ দেখা যায়, সময়ে সময়ে এক একটা সমগ্র সম্প্রদায় অথবা সমগ্র জাতি আপন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পরের ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিল। বিজিত জাতি বিজেতৃ জাতির ভাষা গ্রহণ করিয়া অনেক সময়ে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করে। আধুনিক ফরাসী

সাম্রাজ্যের অধীনতার সময়ে রোমকদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে খাঁটি জর্ম্মাণ নর্ম্মাণেরা ফরাসী দেশে বাস করিয়া ফরাসী ভাষা গ্রহণ করে। ওয়েলশ্ ও আইরিস্‌গণ ক্রমে আপন ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ভাষা গ্রহণ করিতেছে।

কাফ্রিদাসেরা অনেক স্থলে শাদা প্রভুদের নিকট হইতে খৃষ্টানির সহিত ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকা দেশে লাল, শাদা ও কালো, এই ত্রিবিধ বর্ণসমন্বয়ে যে সকল অপূর্ব্ব সুচারু সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা ইউরোপীয় ভাষায় কথা কহে। অথবা অধিক দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি,—যখন আমাদের মধ্যেই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে লজ্জা অনুভব করেন!

বস্তুতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষে চাহিলেই এই বর্ণরহস্যের সহিত ভাষা-রহস্যের সম্বন্ধ অনেকটা বুঝা যায়। মহারাষ্ট্রভূমি বাদ দিলে প্রায় সমুদয় দাক্ষিণাত্যেরা আপন আদিম ভাষা ছাড়িয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ কর্ত্তব্য বোধ করে নাই, অথচ তাহারা ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে আর্য্যপন্থার অনুগামী হইয়াছে। তামিলভাষী ও তেলুগুভাষী লোকে সর্ব্বতোভাবে হিন্দু; কিন্তু তাহারা আর্য্যজাতীয় বা আর্য্যভাষাবলম্বী নহে। আবার মহারাষ্ট্র দেশে ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যভাষা প্রচলিত। অবশ্য গারো ভীল সাঁওতালের কথা বলিতেছি না, আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুসমাজভুক্ত লোকের কথা বলিতেছি। ইহারা সকলেই আর্য্যভাষায় কথা কহে। কিন্তু শোণিতসম্বন্ধ ধরিতে গেলে বিশুদ্ধ আর্য্যত্বের জন্য কয় জন স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? এই বাঙ্গালা দেশেই বাগ্‌দি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি জাতির পূর্ণ অনার্য্যত্বে কেহ সন্দেহ করেন না। যাহারা সচরাচর শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে গণিত হয়, তাহাদের শোণিতেও অনার্য্য মাত্রা অধিক, কি আর্য্য মাত্রা অধিক, তাহা বলা দুষ্কর। *

* এইখানে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা নিগূঢ় কথা আসিয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শক ও হুন নামে প্রসিদ্ধ লোক দলে দলে ভারত-বর্ষে আসিয়া বাস করে। তাহারা সকলেই বৌদ্ধ অথবা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, ও হিন্দুগণের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়। শক অথবা হুন নামে পরিচিত সকলেই যে অনার্য্য ছিল, তাহা বলা যায় না; তথাপি তাহাদের সহিত মিশ্রণে আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যদের বিশুদ্ধির যথেষ্ট হানি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অনেকের বিবেচনায়, পৌরাণিক অর্থাৎ আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের অনেকটা এই সকল বর্ব্বর জাতির নিকট গৃহীত। কাহারও মতে রাজপুতেরা শকদিগেরই বংশধর। শক ও হুন জাতীয়ের মধ্যে অনেকেই এ দেশে বাস করিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। যাহাই

এই সকল দেখিয়া কেবল ভাষার সাহায্যে জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ঠকিতে হয়। অমুক ব্যক্তি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে, অতএব সে আর্য্যসন্তান; অমুক ব্যক্তি ইংরাজি কহে, অতএব সে আর্য্য টিউটন, এরূপ বিচার অন্যায় ও অসঙ্গত।

সুতরাং জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অন্য পন্থার অবলম্বন আবশ্যক। মানুষে কিংভাষায় কথা কহে, কেবল ইহা দেখিলে চলে না। গায়ের রঙ্‌টা কেমন, মুখ খানা গোল না দীঘল, চুলগুলা কোমল না কর্কশ, চোখ কালো না কটা, নাক উচু না বসা, এই সকল দেখা দরকার হইয়া পড়ে। এবং এই সকল দেখিয়া মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমগ্র মানবজাতিকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইউরোপের সকল লোকেই আর্য্যভাষায় কথা কহে। কেবল পিরিনীস পর্ব্বতের নিকট বাস্ক নামে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, ও উত্তর রুশিয়ার ল্যাপ জাতির ও ফিন্ জাতির কেহ কেহ যে ভাষায় কথা কহে, তাহা আর্য্যভাষা নহে। স্থূলতঃ ইউরোপের সকলেই আর্য্যভাষা-ভাষী, ও এই কারণে সকলেই

হউক, আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসমাজের উচ্চতম স্তরেও যে বিশুদ্ধ আর্য্যত্ব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান নাই, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

আর একটা কথা, এখানে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও, উল্লেখ করা যাইতে পারে। সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য ছিল। বহু আর্য্য ও বহুতর অনার্য্য কোন-না-কোন আকারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল ভারতবর্ষবাসী বৌদ্ধের বংশধরেরা গেল কোথায়? ইতিহাসে লেখে, স্পেনের খ্রীষ্টানেরা এক সময়ে তদ্দেশবাসী ইহুদীদিগকে কঠোরভাবে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। হিন্দুরা যে কখন বৌদ্ধগণকে হিমালয় পার করিয়া বা সিন্ধুনদ পার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। আর সমগ্র জাতির একটা প্রধান ভাগকে একেবারে দেশান্তরিত করিয়া দেওয়াও সম্ভাবিত নহে। কালক্রমে সেই সকল বৌদ্ধগণ হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী আচার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। অথবা আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, যাহা দ্বিজেতর শ্রেণী সকলের নিকট সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মেরই বিকার ও রূপান্তরিত অবস্থামাত্র। বোধ হয়, সেই সকল বৌদ্ধেরাই হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ও নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধহিন্দু, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী জাতি সকলের সৃষ্টি করিয়াছে। সচরাচর যাহাদিগকে সঙ্করবর্ণমধ্যে ধরা যায়, তাহাদের উৎপত্তি কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। ব্যবসায়ভেদে জাতিভেদ, এবং ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্তি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই দুই ঘটনাও কতক এই হিসাবে বুঝা যায়।

আর্য্যজাতীয় বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু আকার অবয়বের তুলনা করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন গঠনের লোক দেখা যায় যে, সকলকেই এক বংশে উৎপন্ন বলিতে জীববিদ্যা রাজী নহেন। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ভূমধ্য-সাগরের তটবর্ত্তী দেশের লোকের আকৃতি কিছু খর্ব্ব; চুল কালো, চোখ কালো, বর্ণ অপেক্ষাকৃত ময়লা, মুখের অবয়ব কাহারও গোলাকার, কাহারও বা ঈষৎ দীর্ঘ। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের গঠন অনেকাংশে পৃথক্; তাহাদের আকৃতিতে শালপ্রাংশুত্ব ও মহাভুজত্ব বর্ত্তমান; বর্ণ ধপধপে শাদা; বদনকে মণ্ডল বলিলে ভুল হয়; চুল রক্তবর্ণ অথবা ইংরাজি কাব্যের অনুরোধে সুবর্ণ বর্ণ, আমাদের বিচারে কটা; চক্ষু নীল। আবার অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের গঠনে উভয় জাতির লক্ষণই কিছু-না-কিছু বিদ্যমান; ইহারা উভয় বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই। এবং ইহাদের সংখ্যা ইউরোপের মধ্যভাগেই অধিক।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয়, ইউরোপের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ তিনটা অথবা অন্ততঃ দুইটা বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপন্ন। অনুমান হয়, উত্তর অঞ্চলের লোকেই স্থূলতঃ আর্য্য, এবং দক্ষিণ অঞ্চলের লোক স্থূলতঃ অনার্য্য। তবে সর্ব্বত্রই আর্য্যে অনার্য্যে অল্পবিস্তর মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। খাঁটি অবিমিশ্র আর্য্যের বা খাঁটি অবিমিশ্র অনার্য্যের সংখ্যা অধিক মিলে কি না, সন্দেহের স্থল।

ইংরাজেরা আপনাদিগকে আর্য্য টিউটন বলিয়া পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক সময়ে ডেন্ ও নরমান্ আসিয়া ইংলণ্ডে বাস করে;—তাহারাও আর্য্য টিউটন ছিল। সুতরাং তাহাতে ইংরাজ জাতির বিশুদ্ধির হানি হয় নাই। ওয়েল্‌শ্, কর্ণবাল, স্কটলণ্ডের উত্তরভাগ ও আয়লণ্ডের পশ্চিমভাগের লোকে কেল্টিক ভাষায় কথা কয়, ও আপনাদিগকে কেল্টিক্ আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

কেল্টিক্ ও টিউটনিক, উভয়ই আর্য্যভাষা; তবে উভয় ভাষায় কালক্রমে যতটা তফাৎ দাঁড়াইয়াছিল, কেল্টিক ও টিউটনের শারীরিক গঠনে অবশ্যই ততখানি পার্থক্য জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ভাষা যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, জীবশরীরের গঠন তত শীঘ্র বদলায় না। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড, তিন প্রদেশের অধিবাসীদের একই রকম গঠন হওয়া উচিত; নতুবা উঁহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ জন্মে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, তিন প্রদেশেরই অধি-

কোথাও বেশী। অনেক খাঁটি ইংরাজ,—যাঁহারা বিশুদ্ধ ইংরাজিতে কথা কহেন, তাঁহাদের শরীর খাটো, মুখ গোল, চুল ও চোখ কালো,—দেখিলেই তাঁহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ইংলণ্ডের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই কয়টা কথা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে,—কত পূর্ব্বে তাহা সম্প্রতি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা চলে না—ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের যোগ ছিল; মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান ছিল না। তখন ইউরোপে সুতরাং ইংলণ্ডে, খর্ব্বাকৃতি জাতিবিশেষ বাস করিত। ইহারা পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিত, লড়াই করিত। কালে সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল বিস্তৃত হিমানীস্তরে আবৃত হয়। এই আকস্মিক শীতোৎপত্তির কারণ কি, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইউরোপের তদানীন্তন মনুষ্য এই হিমের দৌরাত্ম্যে অনেকাংশে লুপ্ত বা স্থানত্যাগী হইয়া দক্ষিণ মুখে তাড়িত হয়। কালে হিমের আচ্ছাদন গলিতে থাকে; কালে সেই মহাদেশব্যাপী বরফের আস্তরণের পরিধি সংকীর্ণ হইতে থাকে। এখনও সেই হিমরাশি সর্ব্বত্র গলে নাই। এখনও আল্‌প্স পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে সেই হিমরাশি পূর্ব্বের মত বর্ত্তমান। এখনও ইউরোপের উত্তরে মেরুপ্রদেশ সারা বৎসর সেই হিমস্তরে আবৃত থাকে। এখনও সমগ্র গ্রীনলণ্ড দেশ হিমে আচ্ছাদিত। ক্রমশঃ শীতের অপগমে ইউরোপ সেই হিমাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করে; আবার জীবজন্তুর অধিবাসের উপযোগী হয়। প্রাচীন খর্ব্বকায় মনুষ্য হিমস্তরের পরাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উত্তর মুখে অগ্রসর হয়। ম্যামথের অস্থির সহিত তাহাদের অস্থিপঞ্জর ভূস্তর মধ্যে নিহিত রাখিয়া যায়। এই সময়ে আর একটি জাতি আসিয়া দক্ষিণ ইউরোপ ছাইয়া ফেলে, এবং পূর্ব্বতন খর্ব্বাকৃতি অধিবাসিগণকে আরও উত্তরে দূরীভূত করে। সেই অবধি ইউরোপে ইহাদের আর বড় চিহ্ন রহিল না। হয় ত বর্ত্তমান হ্রস্বকায় এস্কিমো জাতি অদ্যাপি তাহাদের বংশ রক্ষা করিতেছে। নবাগত মনুষ্যেরা কালো চোখ কালো চুল ও লম্বা মুখ লইয়া দক্ষিণ ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহারাও ধাতুর ব্যবহার প্রথমতঃ জানিত না, পাথর কাটিয়া বিবিধ সুন্দর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। আর্য্য গ্রীক অথবা হেলীনেরা বোধ হয়, ইহাদিগকেই জয় করিয়া ও দাসত্বে আনয়ন করিয়া গ্রীসের ইতিহাস আরম্ভ করেন।

ইহাদের পর আর একটি অনার্য্য জাতি ইউরোপে অধিকার স্থাপন

কালো চুল ও কালো চোখ; অধিকন্তু ইহাদের বদনমণ্ডল প্রকৃতই মণ্ডলাকৃতি। ক্রমশঃ অধিকার প্রসারিত করিয়া ইহারা সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয়, এবং দক্ষিণাঞ্চলের পূর্ব্বতন দীর্ঘানন অধিবাসীদিগকে আপনাদের সহিত মিশাইয়া ফেলে।

ইহাদের পর আর্য্য জাতি আইসে। আর্য্য জাতির দৈহিক লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জাতির অপেক্ষা উন্নত ছিল। ইহারা যেথনে উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে পূর্ব্বতন অধিকারীকে পরাজিত করিয়া আপন ধর্ম্ম, আপন ভাষা, আপন আচার অবলম্বন করাইয়াছে। আর্য্যেতর ভাষা, আর্য্যেতর ধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বত্র মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, তবে অনার্য্যের দৈহিক গঠন লুকাইবার নহে। এই আর্য্য জাতিরাই হয় ত বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই আর্য্য। পূর্ব্ব হইতে ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিমগামী, উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণগামী হইয়াছে। উহাদের ধর্ম্ম ও ভাষা বিজিত ভূখণ্ডে প্রবল হয়। প্রাচীন মানবগণের ভাষা ও ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায়। সম্প্রতি সেই অনার্য্য ভাষা হয় ত দুই এক জায়গায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। পিরিনীস-পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ বাস্ক ভাষা সেই প্রচীন কালের অনার্য্য জাতির ভাষা। বাস্ক-ভাষী অনার্য্যগণ, যাহারা আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তৃত ছিল, তাহাদিগকে আইবিরীয় নাম দেওয়া হয়। ভাষা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু শারীরিক গঠন ধরিয়া বিচার করিলে দক্ষিণ ইউরোপের লোক আর্য্যধর্ম্মী হইলেও স্থূলতঃ অনার্য্য-বংশজ। মধ্য ইউরোপের লোকে বংশে সঙ্কর। উত্তরাঞ্চলের লোকে স্থূলতঃ খাঁটি আর্য্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ধরিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। ব্রিটিশ দ্বীপে পূর্ব্বে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। আর্য্য কেল্টেরা আসিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যায়। অনার্য্য আর্য্যের সহিত মিশে নাই। আর্য্যই অনার্য্যের সহিত মিশিয়াছিল। ভাষা ছিল পূর্ব্বে অনার্য্য বাস্ক-জাতীয়,—ভাষা হইল আর্য্য কেল্টিক্। পরে রোমানেরা এই আর্য্য-ভাষা-ভাষী অনার্য্য জাতিকে পরাস্ত করিয়া খৃষ্টীয় ও রোমান সভ্যতা প্রদান করে। তবে ভাষার বা শোণিতের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সময় পায় নাই। পরে জর্ম্মনী হইতে প্রায় খাঁটী আর্য্য জর্ম্মাণ আসিয়া ব্রিটীশ দ্বীপ ক্রমে অধিকার করে ও পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সহিত মিশে। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কেল্টিক ভাষা

সম্পূর্ণ লোপ পায়। পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে অদ্যাপি লোপ পায় নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীতে আর্য্যত্বের মাত্রা অধিক, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীতে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। স্পেন দেশে ও ফরাসী দেশে বাস্ক-ভাষী অনার্য্য আইবিরীয়গণ বাস করিত। ফরাসী দেশের কতক অংশে আর্য্য অধিকার বিস্তারের সহিত কেল্টিক ভাষা ও রীতি নীতি চলিত হয়। রোমানেরা উত্তর দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া আর্য্য রোমক ভাষা প্রচলিত করে। শোণিত মূলতঃ অনার্য্যই রহিয়া যায়। পরে রোম সাম্রাজ্যের পতন ও জর্ম্মণ বিপ্লবের সময়, ফরাসীর পূর্ব্বোত্তরভাগে আর্য্যগণের প্রবল মাত্রায় আমদানি হয়। এক্ষণে স্পেনবাসী স্থূলতঃ অনার্য্যবংশীয় আর্য্যভাষী। দক্ষিণ ফরাসীর পক্ষেও তাহাই বক্তব্য। উত্তরপূর্ব্ব ফরাসীতে স্থূলতঃ আর্য্য কেল্ট ও আর্য্য টিউটনের অধিবাস, ভাষা আর্য্য রোমক।

প্রাচীন রোমানদের জাতিনির্ণয় দুরূহ। প্রাচীন রোমকেরা উত্তর হইতে আগত গল জাতি দ্বারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইত। তাৎকালিক গলদিগের যেরূপ বিবরণ আছে, ও পরবর্ত্তী ইতিহাসে জর্ম্মনদিগের যে বিবরণ আছে, তাহাতে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, বোধ হয় না। উভয়েরই প্রকাণ্ড কলেবর ও সুনীল চক্ষু রোমক ঐতিহাসিকের নিকট প্রশংসা অধিকার করিয়াছিল। এই গলেরা আবার পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গল ও জর্ম্মন উভয়েই প্রায় খাঁটি আর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। রোমকেরা স্বয়ং বোধ করি সঙ্করজাতিভুক্ত ছিল। তাহারা আর্য্য ভাষায় কথা কহিত ও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রাচীন অনার্য্য আইবিরীয় জাতি, বোধ হয়, আর্য্যগণের সহিত কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন ইটালীয় সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

গ্রীস দেশে আইবিরীয় জাতির বোধ করি বিস্তার হয় নাই। সেখানে দীর্ঘাননশালী অনার্য্যেরই বসতি ছিল। আর্য্য হেলীনেরা আসিয়া ইহাদিগকেই জয় করে ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রীসে সমাজের উচ্চতর স্তরে আর্য্যত্ব ও নিম্নতর স্তরে অনার্য্যত্ব প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টানির বিস্তারে উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে।

জর্ম্মনির দক্ষিণভাগে সঙ্কর জাতিরই অধিক প্রাদুর্ভাব। উত্তর জর্ম্মনিতে

রুশিয়ার ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকে শ্লাবনিক ভাষায় কথা কহে। শ্লাবনিক ভাষা আর্য্য ভাষার শাখামাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া যে কেহ শ্লাবনিক ভাষা কহে, সেই আর্য্যবংশীয়, এমন নহে। এমন কি, রুশিয়াতে যতটা বর্ণসাঙ্কর্য্য ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে, ততটা অন্যত্র হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও ঠিক্ এই ইতিহাস। দক্ষিণাপথে অধিকাংশ লোকই আর্য্য-ধর্ম্মী, কিন্তু অনার্য্যভাষী ও অনার্য্যবংশী। আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুসমাজে উচ্চস্তরে আর্য্যত্বের ও নিম্নস্তরে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। ভারতবিজেতা আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। শূদ্রের সহিত তাঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সহজে মিশিতে চাহিতেন না। তথাপি মিশ্রণ-নিবারণও অসাধ্য ছিল। দ্বিজাতিরসংখ্যা পূর্ব্বেও অল্প ছিল, এখনও অল্প আছে। সেকালে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রকন্যা বিবাহ বৈধ বিবাহের অন্তর্গত ছিল। ফলে আমরা যতই আর্য্যত্বের স্পর্দ্ধা করি না, কটা চামড়া, কটা চুল ও নীলচক্ষুর বড় প্রাদুর্ভাব ব্রাহ্মণের মধ্যেও দেখা যায় না। প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ আয়তন ও উন্নত নাসা দেখিয়াই আজকাল আমাদের মধ্যে আর্য্যত্বের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর সূর্য্যাতপ বর্ণবিকারের জন্য কতকটা দায়ী হইতে পারে; কিন্তু কতকটা মাত্র। বেদধর্ম্মানুযায়ী হিন্দুশাস্ত্র কঠিন নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা বর্ণবিশুদ্ধিরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লব ও তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকের সমবেত প্রয়াসে সেই বিশুদ্ধির যথেষ্ট অপচয় হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নীচকে উচ্চে তুলিয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চকেও নীচে নামাইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুরাতন প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম নিবাস কোথায় ছিল, নিরূপণ দুষ্কর। অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম ভাগ বিশাল গভীর মহাসাগর-তলে নিমগ্ন ছিল। ভূ-বিদ্যায় এই কথা প্রমাণ করে। পশ্চিমে ইউরোপ-খণ্ড ও পূর্ব্বে এশিয়াখণ্ড, এই মহাসাগর কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন ছিল। মধ্য ইউ-রোপ ধৌত করিয়া সমুদয় জলরাশি বিশাল নদ নদীর আকারে এই মহা-সাগরে পতিত হইত; ইরাণ ও হিন্দুকুশের অধিত্যকা ধৌত করিয়া বড় বড় নদী উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া এই মহাসাগরে পড়িত। এই মহা-সাগর প্রকৃতই তাৎকালিক ভূমধ্যসাগর ছিল। বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও উত্তর-

সাগরের সহিত হয় ত সেই পুরাকালীন ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ছিল। বোধ হয়, এই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে প্রাচীন পীতকায় তাতার বা তুরাণ জাতি বসতি করিয়া পূর্ব্ব আশিয়াখণ্ডে আধিপত্য করিত। সেই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে শ্বেতকায় আর্য্যগণ ধীরে ধীরে আপন গার্হস্থ্যসমাজ স্থাপন করিতেছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা পশ্চিমগামী হইয়া ইউরোপের পুরাতন অধিবাসীদিগকে দূরীকৃত করিতেছিলেন, বা স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মিশ্র সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন।

কালক্রমে সেই ভূমধ্যসাগরের তলদেশ ভূগর্ভাগত শক্তির বলে উত্তোলিত হইতে থাকে। মহাসাগরের পরিধিসীমা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। উহার জলরাশি উত্তরমুখে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইয়া উত্তরমহাসাগরে মিশিতে থাকে। অদ্যাপি ওবি নদী সেই পথে সাইবিরিয়ার সাগরগর্ভোত্থ প্রান্তর ভেদ করিয়া উত্তর মুখে বহিতেছে। সাগরগর্ভ ক্রমশঃ উত্তোলিত হইয়া মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। মহাসাগর ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জল এখনও শুকায় নাই। বৈকাল ও বালকাশ, বিস্তীর্ণ আরাল, কাস্পীয় ও কৃষ্ণসাগর অদ্যাপি স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন বিশাল মহাসাগরের পুরাতন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বল্‌গা ও দানিউব, আমুদরিয়া ও শির-দরিয়া, অদ্যাপি পূর্ব্বের মত পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়া ধুইয়া লইয়া সেই মহাসাগরের গর্ভদেশ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই মহাসাগরের গর্ভ উত্তোলিত হইয়া স্থলে পরিণত হইলে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ সাধিত হয়। তখন বোধ করি, পশ্চিমবাসী আর্য্যগণের কেহ কেহ সেই স্থলপথে আসিয়া ইরাণের উত্তরে পামিরের নিম্নে, আরাল ও কাস্পীয় সাগরের তটবর্ত্তী ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই স্থানে ইহাদের প্রাচ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সেই সময়ে বা কিছু কাল পরে এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রাচীন জাতির সহিত তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে মানবজাতির ইতিহাসের আরম্ভ। এশিয়া দেশে তখন পুরাতন মানব সম্প্রদায় উন্নতিপন্থায় আরোহণের চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে তাতারজাতি চীন সাম্রাজ্য ও চীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমে তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেতিসের তটবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশে কাল্‌দীয় জাতি আপন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। দূরে নীলতটে সূর্য্যোপাসনায়

মধ্য এশিয়ার জল যত শুকাইতে লাগিল, সমুদ্রগর্ভ উত্তোলিত হইয়া কোথাও অনুর্ব্বর প্রান্তর কোথাও বা মালভূমি বা মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, অনার্য্য উগ্রস্বভাব পীতকায় মোগলজাতি ততই স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সরিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহাদের পীড়নে আর্য্যগণ দক্ষিণবর্ত্তী হইয়া হিন্দুকুশের ও ইরাণের অধিত্যকা আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়েন। প্রতাপান্বিত ব্যাবিলন ও নিনেবের রাজগণ বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিম-মুখে চলিতে দেয় নাই। পূর্ব্ব মুখে যাইবার ও বোলানের গিরিসঙ্কট পার হইয়া কেহ কেহ সপ্তসিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারত-ভূমে তখন ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতি বাস করিত। ইহারা ক্রমশঃ আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়া আর্য্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড হিন্দুজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে আর্য্য মিদীক ও পারসীক কিছু দিন পরে ব্যাবিলনের ধ্বংসসাধন করিয়া বিক্রান্ত পারসীক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই ঘটনার পর হইতে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আর কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় না। সুতরাং তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

ইতিহাসে লেখে, পারসীকদিগের সহিত উত্তরাঞ্চলবাসী সীদিয় বা শক জাতির সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হইত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সীদিয় জাতির যেরূপ বিবরণ দেন, তাহাতে অন্ততঃ আকার অবয়বে তাহারা আর্য্যজাতিরই অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হইতে পারে—তাহারা আর্য্য ও মোগল, উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন, অথবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মোগল বা তাতার জাতি। সম্প্রতি এই প্রশ্নের মীমাংসার উপায় নাই। আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের পর শকজাতি পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রাচীন অযোধ্যাবাসী শাক্যজাতি ও শাক্যজাতির কুলপ্রদীপ কুমার সিদ্ধার্থের সহিত এই শক-জাতির কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, বলা যায় না। উত্তরকালে শকজাতি বাহ্লীকের গ্রীকগণের স্থাপিত যবনরাজ্যের ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আপতিত হয়। মহারাজ কনিষ্কের সময় শকজাতির আধিপত্য মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুর্জ্জরে শকবংশ কিছু দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শকজাতি আর্য্যবংশীয় ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে

মধ্য এসিয়া এখনও শুকাইতেছে। এখনও সময়ে সময়ে মধ্য এসিয়া হইতে উগ্রস্বভাব পীত অনার্য্য দলে দলে বাহির হইয়া মানবের সভ্যতা ধ্বংস করিবার জন্য বাহির হয়। পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত সমগ্র মহাদেশ তাহাদের ভয়ে চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হূনজাতি পশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া ইউরোপবাসী আর্য্যগণের মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে; ও রোম সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইউরোপের ইতিহাস নূতন করিয়া আরব্ধ করে। দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া পারস্য হইতে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ কাঁপাইয়া তোলে। পরাক্রান্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য তাহাদের কর্তৃক ধ্বস্ত হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদের গতি রোধ করিয়া ভারতবর্ষে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান।

আরও সাত শত বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসে অতীত হইল। পুনশ্চ মধ্য-এসিয়া পৃথিবীর উপপ্লবের জন্য বর্ব্বরপাল প্রেরণ করিল। রুম সম্রাট ও দিল্লীর সম্রাট ও চীন সম্রাট একই সময়ে যুগপৎ জঙ্গিস্ ও তৈমুরের নামে কাঁপিতে লাগিলেন। আরও পাঁচ শত বৎসর পরে দেখিতে পাই, রুমের সিংহাসনে তুর্কি বসিয়া রোমসাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে, ও পৃথ্বীরায়ের সিংহাসনে মোগল বসিয়া হিন্দুর নিকট জিজিয়া আদায় করিতেছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ইন্দু।

১

চারু ছেলেমানুষ। তাকে 'ধরে বেঁধে' তার স্বামীর ঘরে দিয়া আসিতে হয়। চারুর স্বামী মন্মথ, চারুকে কথা কহাইবার জন্য কত চেষ্টা করে, চারু কিন্তু কলাবৌটির মত এক হাত ঘোম্‌টা টেনে, 'গুটিসুটি' হ'য়ে, বিছানার এক পাশে জড়ের মত পড়ে থাকে! মন্মথ কত ডাকে, কত সাধে, কত অভিমান করে, কখনও রাগও করে, কিন্তু চারু ফিরে চায় না! কত হা'হুতাশ, কত দীর্ঘ শ্বাস, নিষ্ঠুর চারু তবু কথা কয় না! চারুর মা ও খুড়ি, দুই এক দিন 'আড়ি' পাতিয়া, জামাই বেচারার এই দুর্দ্দশা দেখিলেন। চারুর এই ব্যবহারে জামাই পাছে সত্যই বিরক্ত হন, মা ও খুড়ির এই এক আশঙ্কা জন্মিল; তাই চারুকে

কোনরূপে 'জাগান' দিয়া, 'রাতারাতি' যুবতীভাবাপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা পড়িয়া গেল! চারুকে তাঁরা কখনও বকিতেন, কখনও ভয়, কখনও বা লোভ দেখাইতেন, কিন্তু কেমন 'একগুয়ে' মেয়ে চারু, সে সব কথা সে কানেই তুলিত না! এজন্য চারুকে এক আধ দিন মার কাছে একটু বেশী রকম লাঞ্ছিতও হইতে হয়; কিন্তু তবু চারু বাগ মানিল না! কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, মা ও খুড়ি, হারি মানিলেন! ইতিমধ্যে চারুর দিদি ইন্দু, শ্বশুরবাটী হইতে আসিল! ইন্দু আসিলে তার মা ও খুড়ি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; ইন্দুকে বলিলেন, "আমরা ত চারুকে 'এঁটে' উঠতে পাল্লেম না, এখন, বাছা, তুই যা পারিস কর্! চারু ত তোর কথা শোনে, তুই কেন রাত্রে তাকে সঙ্গে করে মন্মথর ঘরে নিয়ে যাস্‌নে?" ইত্যাদি।

পিতা মানসিংহ কর্ত্তৃক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত জগৎসিংহ যেমন, উল্লাসে গর্ব্বে, স্বীয় রণপাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইন্দুও তেমনই এই ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখাইতে, আপনার সমস্ত কৌশল, সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করিল।

ইন্দু এখন প্রতিরাত্রে চারুকে মন্মথের ঘরে দিয়া আসে, নানারূপ কথাবার্ত্তায় চারুর মুখ ফুটাইতে ও লজ্জা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। মন্মথ এক দিন তাস খেলিবার কথা তুলিল; ইন্দু দেখিল, পরামর্শটা মন্দ নয়, এই উপায়ে, মন্মথর সহিত চারুর ভাবটা সহজে হইতে পারিবে; কেন না, সে জানিত, চারু খেলা তেমন জানুক না জানুক, খেলিতে কিন্তু তার ভারি উৎসাহ! তা হলে কি হয়, চারু ত সহজে মন্মথের সঙ্গে খেলিতে 'রাজি' হয় না। "বরের সঙ্গে আবার খেলা, ছি! দিদির যেমন কাচ!" কিন্তু দিদি যে কিছুতেই ছাড়ে না, একে দিদির বকুনি, তাতে মায়ের অপমানের ভয়, চারু কি মুস্কিলেই পড়েছে গা! চারু মনে মনে মা দুর্গা, কালী, কত দেবতাকেই মানে, "কবে ও তাদের বাড়ী থেকে যাবে", কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর দেবতা, তার মিনতি কেহ শুনে না। শেষ আর কি করে, দুই এক দিন দেখিয়া, চারু অগত্যা খেলিতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু ঘোমটা কিছুতেই কমাইল না। দিদি চলিয়া গেলে, চারুর আর খেলা হইত না, কাজেই ইন্দুকে বসিয়া থাকিতে হইত। বাজী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সব দিন চারুর ধৈর্য্য থাকিত না। সে খেলিতে খেলিতে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। মন্মথের অনুরোধে, ইন্দু সে বাজীটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিত

না। দিদি চলিয়া গেলেই আবার যে চারু সেই চারু। বিশেষতঃ চারু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কাজেই দিনমানেও চারুকে মন্মথের ঘরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। চারু অনেক কান্নাকাটি, আপত্তি করিল, কিন্তু কে তার কথা শুনে বল! শেষ 'দুপুর বেলাতেও' চারুকে দিদির সঙ্গে ঘরে আসিতে হইত! কিন্তু সে দিদির আঁচল ছাড়িত না! দিদিকে মাঝে রাখিয়াই কোন কোন দিন 'দেখা বিন্তি', কোন দিন বা 'গোলাম-চোর' খেলা হইত! বিন্তিখেলায়, মন্মথ ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে খেলার নিয়ম ভাঙ্গিত; চারুর সেটা অসহ্য হইত, সে নিজে মুখ ফুটিয়া মন্মথকে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু দিদিকে তখনই কানে কানে বলিত, "ও কি? অমন কেন?" আবার, গোলাম-চোরে, মন্মথ প্রায়ই সাধ করিয়া "গোলাম-চোর" হইত! চারুর তাতে ভারি আনন্দ, ভারি উৎসাহ! সে সময়, চারুর অজ্ঞাতে, তার ঘোমটা একটু সরিয়া যাইত, কোন দিন হয় ত সেই মুহূর্ত্তে, মন্মথর সহিত, তার "চোকোচোকী" হইয়া যাইত, মন্মথের চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিত! সে হাসি যেন "হেরে গিয়ে হেসে চাওয়া।" চারু কিন্তু তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইত। লজ্জায় মুখ নামাইত! অঙ্গুলিস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন "গুটিসুটি" হইয়া যায়, চারু তেমনই জড়সড় হইয়া পড়িত, কোন দিন বা পলাইয়া যাইত। বেশী পীড়াপীড়ি ভাল নয় বলিয়া, ইন্দুও তাহাতে আর আপত্তি করিত না! চারু চলিয়া আসিলেও, ইন্দু, মন্মথের সহিত গল্প করিত। তবে প্রায়ই ইন্দুর দুই একজন "সমবয়সী" বা দুই একজন ঠাকরুণ দিদি, সে সময়ে আসিয়া জুটিতেন; নানা রকমের কথাবার্ত্তা, হাসি তামাসা চলিত। মন্মথ বেশ মিষ্টি মিষ্টি মজার মজার গল্প করিতে পারিত; সে গল্প শুনিতে ইন্দুর বড় ভাল লাগিত! ক্রমে মন্মথের সহিত তাসখেলা ও গল্প করা, ইন্দুর একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইল! মন্মথ যদি আহারান্তে দৈবাৎ বাহিরে যাইত, ইন্দু অমনি মন্মথকে ডাকাইতে পাঠাইত! আসিতে বিলম্ব হইলে, অভিমান করিত। মন্মথ শীঘ্রই ইহা বুঝিল; বুঝিয়া কি জানি কেন, ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে আসিতে বিলম্ব করিত। শেষ আবার সাধিয়া ঠাকুরঝির অভিমান ভাঙ্গাইত! কে জানে এ খেলা খেলিয়া কি লাভ! সরলা ইন্দু অত শত বুঝিত না, সে অকপটে মন্মথকে বিশ্বাস করিত; মন্মথ যেন তার "সমবয়সী"! এইরূপে, আমোদে আহ্লাদে, হাসি গল্পে দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপে মন্মথের প্রতি ইন্দুর স্নেহ

বিস্তার করিয়াছিল, এখন উর্ণনাভের মত, সে জালে আপনিই জড়িত হইতে লাগিল।

২

"কলিকাতা"; * * নং বেচু চাটুর্য্যের লেন।
"২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

"ইন্দু!—

"কয় দিন তোমার চিঠিপত্র পাইতেছি না কেন? ভাল আছ ত? বাড়ী হইতে প্রতাপপুর যাইবার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলে, 'সেখানে গিয়া খুব ঘন ঘন পত্র দিব।' কিন্তু এ দুই সপ্তাহ মধ্যে, কেবলমাত্র একখানি চিঠি দিয়াছ, এরই নাম, 'যেবা রোগী ছিল বসে, বৈদ্যে শোয়ালে এসে!'

"তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে যে কত অধীর হই, তা ত তুমি জান! জানিয়াও যে ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিবে, এ বিশ্বাস ত হয় না! তাই এত ভাবনা!

"শুনিলাম, জামাইষষ্ঠীতে মন্মথ ভায়া তোমাদের ওখানে আসিয়াছেন। চারুকে ত কত দিন দেখি নাই! সে এখন কত বড়টি হয়েছে? মন্মথের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কয় ত?

"ইন্দু, চার বছর আগে, তুমিও যখন তোমার বোন্‌টির মত ছিলে, সে দিন মনে পড়ে কি? সে সব কথা মনে হ'লে বোধ হয় এখন তুমি খুব লজ্জিত হও, কিন্তু আমার পক্ষে এখন সে স্মৃতি বড় মধুর! তাই বলে আবার তোমাকে পাকাগুটি কাঁচিয়ে বস্‌তে বলিনে, কেন না, সে দিন আর ফির্‌বে না বলেই সে সব স্মৃতি এত মধুর মনে হয়। আবার তেমনি করে, তোমায় ভালবাসার পাঠশালে হাতে খড়ি দিয়ে, অক্ষরপরিচয় করাতে হবে, সে আশঙ্কাটা যদি থাক্‌ত, তবে হয় ত, তার নামেও চম্‌কে উঠতাম! কিন্তু সে ভয় আর নেই, এখন ত তোমার 'গুরুমারা বিদ্যা!'

"তা সে কথা থাক্! আজকাল বোধ হয় তোমরা খুব আমোদে আছ! তা বেশ! কিন্তু দেখো, যেন নূতন আমোদ পেয়ে, পুরানোদের একেবারে ভুলো না। শাস্ত্রের বিধিটা যেন মনে থাকে,—'সেবকান্ন পুরাতনঃ!'

"এখন, তামাসা থাক্! সত্যই তোমার পত্রের জন্য পথ চেয়ে আছি কেমন আছ? আমি অমনই বেঁচে আছি! এখন বিদায়। ইতি—

চিঠিখানি যে ইন্দুর স্বামীর, তা আর আমাদের পাঠক পাঠিকাদের বলিতে হইবে না।

ইন্দু পত্রখানি পড়িয়া কি ভাবিতে ভাবিতে উপরের ঘরে যাইতেছিল। চিঠিখানি তখনও হাতে। সেই সময় মন্মথও নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির ঘরে উভয়ের দেখা হইল। মন্মথ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার চিঠি ঠাকুরঝি?" "কই কারু নয়" বলিয়া, একটু হাসিয়া, ইন্দু চিঠিখানি হাতের মুঠায় লুকাইল। মন্মথের প্রথমে যে সন্দেহটুকু ছিল, এখন তাহা দূর হইল। সে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "চিঠি দেখাবে বলেছিলে যে, দেখাও।" ইন্দু, "না না সে চিঠি নয়," বলিয়া পাশ কাটাইতেছিল, মন্মথ পথ আটকাইল, বলিল, "চিঠি দেখাও, নইলে কিন্তু ছাড়ব না।" ইন্দু চিঠির খানিকটা বাহির করিয়া হাত দূরে রাখিয়া বলিল, "এই দেখ!" মন্মথ ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিখানি লইতে গেল, ইন্দু সেই অবকাশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, মন্মথ তার হাত ধরিল। সহসা ইন্দুর হাসি তামাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, খুব বিরক্তি ও দৃঢ়তার সহিত ইন্দু বলিয়া ফেলিল, "ও কি মন্মথ, হাত ছাড়!" মন্মথ অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মন্মথ ইন্দুকে হাস্যময়ী চপলপ্রকৃতিই জানিত, বুঝি তাই এতটা সাহস করিয়াছিল; আজ, সেই চপলার ক্ষণিক প্রভাবে, সে একেবারে স্তম্ভিত হইল!

৩

মন্মথ যখন বাহিরের ঘরে একাকী থাকিত, তখন ছোট ছোট বালক বালিকার দল বড় মজা পাইয়া যাইত। কেহ একটা বটের পাতায় কতকগুলি ধুলা, দুখানা খোলাম্ কুঁচি, হলো বা গোটাকত তেলাকুচা আনিয়া বলিত, "মন্মথ বাবু খাও।" কেহ বলিত, "টুমি নাকি চারু ডিডির নাম করেছ! ওহো! বৌএর নাম করেছে, সব্বাইকে বলে ডেব।" কেহ বা মন্মথর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিত, "টোমায় চারু ডিডি ডাক্‌চে।" মন্মথ ইহাদিগকে এক আধবার যে তাড়া তুড়ি না দিত, তা নয়; কিন্তু আসলে সে বিরক্ত হইত না। বরং মাঝে মাঝে সেই ছেলেখেলায় যোগ দিত। মধুর রসের সম্বন্ধ না হইলে বুঝি এতটা মধুর ভাবের প্রবাহ বয় না।

তাহারা বাহিরে আসিবার পথে, সদর দরজা ভেজাইয়া, তাহার ফাঁকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উকি দিয়া সব দেখিত। আর মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়া, সেই ছোট দলকে ডাকিয়া, নূতন নূতন তামাসা শিখাইয়া দিত। মন্মথের সহিত চোখোচোখি হইলেই "ওলো দেখেছে লো" বলিয়া ঝম্ ঝম্ রবে সেই বালিকার দল অন্দরের দিকে ছুটয়া যাইত। আবার টিপি টিপি আসিত, হাসিত, পলাইত। ইহারা চারুর অনেকটা সমবয়সী। মন্মথ অন্য দিন এ সব বেশ উপভোগ করিত। আজ ইহারা অনেকক্ষণ ছুটাছুটি, লাফালাফি করিল, কিন্তু মন্মথ সে দিকে বড় মনোযোগ দিল না। তখন সেই "গৃহ-হারা আনন্দের দল" যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল। মন্মথ অন্যমনস্কভাবে একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। মনটা বড় চঞ্চল। মুদ্রিতচক্ষু মন্মথ, কি একটা ভাবিতেছিল, এমন সময় শুনিল,—

"ঘুমুলে ঘুমুলে পান খেলে না,
পান সেজেছি এলাচ দানা;"

* * *

মন্মথ হাসিয়া চক্ষু মেলিল। দেখিল, সম্মুখে একটি কৃত্রিম পান হাতে দাঁড়াইয়া তাহার এক অষ্টমবর্ষীয়া শ্যালিকা। মন্মথ তাহাকে যেই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অমনি পানটি মন্মথের গায়ে ছুড়িয়া হাসিতে হাসিতে একদৌড়ে পলাইয়া গেল। এমন সময় কে ডাকিল, "জামাই বাবু! 'দিদিমণি' আপনাকে ডাক্‌চে।" সে ডাক মধুর বীণাধ্বনির মত মন্মথের কানে বাজিল। মন্মথ তখন কাঁচপোকায় আকৃষ্ট আরসুলার মত ঝির অনুসরণ করিল।

৪

মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্মথ বাহিরে চলিয়া গেলে, ইন্দুও মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার এতটা দৃঢ়তা আসিল? সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, কাজটা ভাল হয় নাই। ভগ্নীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন দোষের কি হয়েছে। তখন আর কোন কথা ইন্দুর হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্মথ কত কষ্টই পেয়েছে! ছি! ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া আপন মনে জিভ কাটিল।

সে দিন বৈকালে অন্যদিনের চেয়ে 'সকাল্ল সকাল' মন্মথের জলখাবারের

জলখাবার দিতেছে। ইন্দু জলখাবার দিল বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্মথের দিকে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বলিল, "মন্মথ জল খাও।" মন্মথ প্রথম ভাবিয়াছিল, বুঝি আজ জলখাবারে কিছু ভেল আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ তার মনে স্থান পাইল না। সে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তখনও ইন্দু অবনতমুখী। মন্মথ মুগ্ধনেত্রে দেখিল, সেই অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্মথ ব্যাপার বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" ইন্দু মুখ তুলিল, চারি চক্ষে মিলিবামাত্র উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, মন্মথ সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "কই—চিঠি!" চিঠি ইন্দুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠিখানি খুলিয়া ইন্দু মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ পত্রখানা আগা গোড়া পড়িল, পড়িয়া ফিরাইয়া দিল। কিন্তু একটা তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না,—তামাসার মাত্রাটা কিছু বেশী চড়িল—"যাও ছি! অমন কল্লে কিন্তু আর আসব না", বলিয়া গমনোদ্যতা ইন্দু যেন ঈষৎ কোপ-কুটিল-কটাক্ষে মন্মথের দিকে চাহিল। সে অপাঙ্গে বুঝি একটু হাসিও খেলিয়াছিল।"—তখন "যাই" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মন্মথও বাহিরে গেল।

৫

মন্মথ কাল বাড়ী যাইবে, আজ রাত্রে তাই খেলার ধুমটা একটু বেশী। "অনেক রাত হয়েছে এখন যাই" বলিয়া ইন্দু একবার উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু মন্মথ বাধা দিল; বলিল, "রাত আর কই হয়েছে, আর আজকের রাত বই ত নয়।" ইন্দু ভাবিল, তা বটে। সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চারুর তখন অর্দ্ধেক রাত্রি।

ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গুরু গুরু দুরু দুরু গভীর গর্জ্জনে মেঘ গর্জ্জিতেছে। সেই "ঘোনা ঘোরা বাদল" নিশীথে, ইন্দু আর মন্মথ খেলিতেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর ইন্দু মনে মনে মন্মথের রসিকতার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সংসার সুষুপ্ত, কেবল মন্মথ আর ইন্দু খেলায়, গল্পে, হাসিতে বিভোর। সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি, কাড়াকাড়ি, হাসাহাসি আরম্ভ হইল। সহসা

ধীরে, অতি ধীরে, ইন্দু, সে গৃহ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" ইন্দু ফিরিল না। বুঝি সে কথা তার কানে গেল না।

৬

মন্মথ পরদিন অতি প্রত্যূষে বাড়ী চলিয়া গেল। চারু আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েদী যেমন জেলখানা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্ত বাতাসে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে, সে তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইন্দু কিন্তু বড় বিমর্ষ। এই বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া লেখাপড়া-জানা এক নবীনা ঠাক্‌রুণ্‌ দিদি, ইন্দুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিলেন,—

"সোনার নাতিনী, এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা,
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা।"

ইন্দুর সমবয়স্কারাও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিত, "নে ভাই ইন্দু, তোর আর বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচিনে। ভগ্নীপতি তো সবারই আছে লো!" কেহ বা সুর আর একটু চড়াইল, "কি লো; মন্মথ গিয়ে তুই যে একেবারে ব'য়ে গেলি। লোকের বর বিদেশে গেলেও ত এমন হয় না।"

ইন্দুর মাও ক্রমে ইন্দুর এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, "ইন্দু, তোর হলো কি? দিন রাত অমন করে কি ভাবিস বলতো, দিনকের দিন যে শুকিয়ে উঠ্‌লি।"

ইন্দু কোন উত্তর দিত না। শুধু নতমুখে, কাঁদ কাঁদ হইয়া থাকিত। কোন দিন বা অন্যের অলক্ষ্যে কাঁদিয়া ফেলিত।

আজ অনেক দিনের পর ভূপেন্দ্র ইন্দুর হস্তাক্ষর পাইলেন, সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন—

"প্রিয়তম!

"সত্যই এ পোড়ারমুখী তোমায় ভুলিয়াছিল, নহিলে এমন গুরুতর পাপ করিবে কেন! আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! তোমাকে অনেক কথা লিখিব বলিয়া এ পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম কিন্তু তা আর পারিলাম না। আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে, সকল কথা পরে লিখিব। কেমন আছ? ইতি

"পাপিষ্ঠা

"একি এ? একি আমার ইন্দুর পত্র? হাঁ, ইন্দুর হস্তাক্ষরই ত বটে।" ভূপেন্দ্র এক বার দুই বার তিন বার কতবার পত্র পড়িলেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ভূপেন্দ্রের মনে কত রকমের অনুমান উঠিতে লাগিল, শেষ পত্র বন্ধ করিয়া ভূপেন্দ্র ভাবিলেন, ছি আমি কি পাগল! কিন্তু—কিন্তু ইন্দু এমন করিয়া পত্র লিখিল কেন? আবার ঐ কথা? শেষ ভূপেন্দ্র সিদ্ধান্ত করিলেন, আমোদে মত্ত হইয়া আমায় পত্র দিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া ইন্দু নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়াছে। তাই অনুতাপ করিয়া এমনতর লিখিয়াছে। এ সামান্য কথাটাও এত ক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমি কি নির্ব্বোধ! ভূপেন্দ্র ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন—

"আমার ইন্দু!

"পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তা এত লজ্জা কি? আর এই সামান্য কারণে এমন অপরাধীর মত পত্র দিয়াছ কেন? এ ত অতি তুচ্ছ কথা, যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝিয়া কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া, এমনই করিয়া অনুতপ্ত হইয়া, আমায় জানাও, আমি তোমার সে প্রথম অপরাধও মার্জ্জনা করিতে প্রস্তত। যা হোক, এর জন্য এত অপ্রতিভ হবার কারণ নাই। তুমি যে আমায় ভুলিতে পার না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এমন করে পত্র দিতে আর দেরী করো না, লক্ষ্মী আমার।

"অন্য অন্য কথার উত্তর দাও নাই কেন?

"চারুদের কেমন ভাব হলো জানিতে উৎসুক আছি। মন্মথ এখন কোথায়?

"কেমন আছ। আমি ছুটীর চেষ্টায় আছি। ছুটী পেলেই তোমায় আনিতে যাব। আর যদি এর মধ্যে অন্য সুযোগ পাই, তবে ততদিনও অপেক্ষা করিতে হবে না। এ সুখবরের জন্য কি খেতে দেবে, দাও। ইতি।"

ইন্দু যথাসময়ে এ পত্রের উত্তর দিল—

"তুমি আমার অপরাধ যত সামান্য মনে করিতেছ, আসলে তা নয়। পাপিষ্ঠা আমি, তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি, আমায় লইয়া তুমি কি আর সুখী হইতে পারিবে। একদিন বিস্তারিত জানাইব। আজ থাক।"

পত্র পড়িয়া ভূপেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। মিছে কথা এ, ইন্দু পাপিষ্ঠা, ইন্দু অবিশ্বাসিনী, অসম্ভব এ।—ঘন ঘন পত্র দিব বলিয়া এত বিলম্ব করিয়াছে, ইন্দুর কি ছেলেমানুষি। কিন্তু তবু ভূপেন্দ্রের মনের মেঘ কাটিল না। কি এক

ভূপেন্দ্র ছুটী লইয়া ইন্দুর কাছে যাওয়াই স্থির করিতেছিলেন, কিন্তু পর দিন তাঁর শ্বশুরের পত্রে জানিলেন, মন্মথ শ্বশুরবাটী হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিতেছে। এই সুযোগে ইন্দুকে আনা সহজ হইবে মনে করিয়া, ভূপেন্দ্র তখনই শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন; উত্তরে শ্বশুরও দিন স্থির করিয়া জানাইলেন। স্থিরীকৃত দিনে যথাসময়ে ভূপেন্দ্র ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মন্মথও গাড়ী হইতে নামিল। ইন্দু কই? ভূপেন্দ্র অতিমাত্র আগ্রহে, মন্মথকে শুধাইলেন, "তোমার ঠাকুরঝি?" মন্মথ সংক্ষেপে বলিল, "তাঁর আসা হইল না।" "কেন?"—"ঠিক বলিতে পারি না,।" "সব ভাল ত।"—"হাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে ভূপেন্দ্রের উদ্বেগ বাড়িল মাত্র। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, ইন্দুর একখানি চিঠি। ইন্দু শুধু লিখিয়াছে, "প্রিয়তম! একবার এস।" ভূপেন্দ্রের আসন টলিল, সাহেবকে বলিয়া কহিয়া কোন রূপে পাঁচ দিনের ছুটী লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে, "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে", ভূপেন্দ্র ইন্দুর উদ্দেশে ছুটিলেন। পরদিন বেলা দশটার পর ভূপেন্দ্র প্রতাপপুরে পৌছিলেন। যাহাকে দেখিবার জন্য ভূপেন্দ্র এত ব্যাকুল, সম্মুখে ওই যে সৌধ, ওই সৌধে ভূপেন্দ্রের সেই প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। তবে আজ সেই সুখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভূপেন্দ্রের মন সহসা এত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? দূর হইতে চারু কিরূপে ভূপেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে অমনি "ভূপেন বাবু এসেছে গো!" বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। ইন্দুর সহিত চোখাচোখি হইয়া চারু এক মুখ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শাসাইল "দিদি আজ!" বোধ হয় চারুর তখন মনে হইতেছিল, "দিদি আমায় এবার বড় জালানই জ্বালিয়েছে, এখন আমিও তেমনি দাদ তুলবো," তাই সংক্ষেপে এই শাসনবাক্য প্রয়োগ করিল। চারুর এই বালিকা-সুলভ কল্পনা বুঝিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, ভূপেন্দ্রের আগমন-সংবাদে ইন্দুর মুখও প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু "দিদি আজ!" এই কথায় কি জানি সহসা কেন সে প্রফুল্ল মুখকমল নিমেষে শুকাইয়া উঠিল।

আজ বহু দিনের বিচ্ছেদের পর দম্পতির মিলন হইল। ইন্দুর সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপেন্দ্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দু, এমন দেখচি কেন?" ইন্দু কিছু বলিল না, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিষাদের

গম্ভীর হইয়া উঠিল। ভূপেন্দ্র আগ্রহভরে ইন্দুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতে-ছিলেন, ইন্দু সরিয়া গেল; বলিল, "আমায় ছুঁও না," ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া, ইন্দুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তখন ইন্দুর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। ভূপেন্দ্র আবার স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ইন্দু এমন দেখ্‌চি কেন? অমন করে, অপরাধীর মত চিঠি পত্রই বা লিখ্‌তে কেন? আর মন্মথের সঙ্গে যেতেই বা আপত্তি কল্লে কেন?" ভূপেন্দ্র দারুণ আগ্রহে,একবারেই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ইন্দু আত্মহারা হইয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিল। পদস্খলিত ভক্ত যেমন ইষ্টদেবের সম্মুখে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদে, পথ-হারা শিশু যেমন জননীর কোল পাইয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদে, ইন্দু তেমনি করিয়া কাঁদিল।

তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ইন্দু সরিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"তবে শোন।"

ইন্দুর সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপেন্দ্র মহাভীত হইয়াছিলেন, সমস্ত আলোচনা করিয়া, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কি এক অঘটন ঘটিয়াছে। "আর বল্‌তে হবে না—ইন্দু আমি বুঝেছি," বলিয়া, ভূপেন্দ্র তাড়াতাড়ি আবার ইন্দুকে বুকে ধরিলেন।

"না বুঝ নাই। বুঝিলে এ কালসাপিনীকে এমন আদর করিয়া বুকে লইতে না," বলিয়া ইন্দু আবার কাঁদিয়া ফেলিল;—"যা বুঝি নাই, তা আর বুঝে কাজ নাই ইন্দু! তুমি যে অপরাধই করে থাক, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" ইন্দু ভূপেন্দ্রের নিষেধ শুনিল না। তবু বলিল,—"না; শোন!" "না, ইন্দু না, শুনে আর কাজ নাই! এস, অন্য কথা কই," বলিয়া ভূপেন্দ্র, ইন্দুর সেই রোদন-লোহিত, অশ্রুসিক্ত, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ধরিয়া বার বার চুম্বন করি-লেন; তার পর,অতি যত্নে চোখের জল মুছাইয়া,ইন্দুকে আপনার পাশে বসাই-লেন। অতি সাবধানে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, ক্রমে ইন্দুও সে সকল প্রসঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই মলিন মুখ আবার যেন প্রফুল্ল হইল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল। ভূপেন্দ্র বুঝিলেন, তবে বুঝি বা এখনকার মেঘ কাটিয়া গেল। এমন সময় কে ডাকিল—"ইন্দু চুল বাঁধবে এস!" "তবে যাই" বলিয়া ইন্দু উঠিল,ভূপেন্দ্রও উঠিয়া বিদায়-চুম্বন দিলেন; এবং ইন্দুও প্রতিচুম্বন করিল—সে চুম্বন বড় তপ্ত, বড় গাঢ়! কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া

ভূপেন্দ্র বাহিরে যাইতেছিলেন, সিঁড়ির ঘরে একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন, পাশের ঘরে চেনা গলায় কে বলিতেছে, "ইন্দু, আয় লো, তোর মাথা বেঁধে দি ;" ইহার পরের চরণ ভূপেন্দ্রের জানা ছিল, ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া, বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথে, তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল—এই যে হীরক, ইহা খাঁটি না নকল ? ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয় না ? নকল হয় হোক, ভাঙ্গিয়া কি লাভ ? আমি ত জানি ইহা খাঁটি। তবে সে ভুল ভাঙ্গিয়া কাজ কি ? ভূপেন্দ্র এই ভাবিয়া আবার আপনার মন দৃঢ় করিলেন।

আর, ইন্দু ? ইন্দু চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বড় অন্যমনস্ক হইতেছে। সেই নবীনা ঠাক্‌রুণদিদি, চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন—কিন্তু ইন্দু আজ সে হাসি তামাসায় যোগ দিতে পারিতেছে না! ইন্দু যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন! চুল বাঁধা শেষ হইলে, ঠাক্‌রুণদিদি,—

"সাদা মনে কালো ফিতেয় বেঁধে দিলাম চুল,
স্বামীর পায়ে মনটি রেখো, হয় না যেন ভুল!"

বলিয়া বেশ করিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, একটি "টিপ" পরাইয়া, ইন্দুর মুখে চুমো খাইলেন! ইন্দু বিষাদের হাসি হাসিল। ঠাক্‌রুণ দিদি বুঝিয়া গেলেন,—

"মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে!"

সেই দিন সন্ধ্যার পর চারু তার ঘরে গিয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! তোমরা শীগ্‌গির এসো গো, দিদি কেমন কচ্চে!" চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন, ছিন্নকণ্ঠ পক্ষিণীর মত ইন্দু ভূমিশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। ইন্দু কখন যে তার ঠাকুরমার কৌটা হইতে আফিং চুরি করিয়া খাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। "ওমা আমার কি হলো গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা ইন্দুর মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। ইন্দু একবার কাতর দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিল। তার পর চারুকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একবার ডাক চারু, একবার ডাক!"

* * * * *

ধীরে ধীরে ভূপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত

চিঠি ভূপেন্দ্রের হাতে দিল, তার পর ভূপেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া, কাতর-কণ্ঠে বলিল, "আমার বুকে দিন রাত নরকের আগুন জ্বল্‌ছে, এ পাপের বোঝা আমি আর বহিতে পারি নে,—তুমি আমায় ক্ষমা করে চরণে ঠাঁই দিলে, কিন্তু আমার জ্বালা নিভিল কই? আর বলিতে পারি না, চিঠিতে সব রইলো, আমার দশা যেন সবাই শোনে।"

মনের আবেগে, বহু কষ্টে, ইন্দু এই কয়টি কথা বলিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, বলি বলি করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না। ইন্দু তখন নির্ব্বাক হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৃন্তভ্রষ্ট ফুল্ল কুসুম যেমন কর্দ্দমস্পৃষ্ট হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া শুকাইয়া যায়, ধরণীলুণ্ঠিতা ইন্দুও তেমনই কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে মৃত্যুযন্ত্রণায় ইন্দুর চক্ষু মুদিয়া আসিল। উদ্দামহৃদয়ে আকুলকণ্ঠে, ভূপেন্দ্র ডাকিল, "ইন্দু!" বাণবিদ্ধ হরিণী যেমন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও বংশী-রবে শিহরিয়া উঠে, স্বামীর কণ্ঠস্বরে ইন্দু তেমনই শিহরিল! তার পর ধীরে ধীরে সেই বিবেকবিক্ষত, অনুতপ্ত প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল!

সীতারাম।

প্রথম অধ্যায়।

আমরা বড়ই উপন্যাসপ্রিয়। আমাদের রুচি বুঝিয়া, বঙ্কিমবাবু সীতারামকে লইয়া একখানি বিচিত্র উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। সে উপন্যাসে বঙ্কিম-বাবুর সরল সুন্দর তুলিকার বিন্যাসে সীতারামের চিত্র যেরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠি-য়াছে, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের অধিকারী মহাশয় বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাইয়াছেন। একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ সন্ধান; সুতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তথাপি উপন্যাসের সীতা-রামে ইতিহাসের সীতারাম পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার অবসর পায় নাই।

কৃত্রিম ফুল বড়ই সুন্দর;—বর্ণসামঞ্জস্যে, গঠনগৌরবে আসল বলিয়া অনেকেরই ভুল হইয়া থাকে! কিন্তু তথাপি তাহা কৃত্রিম; ঘ্রাণে মধুগন্ধ নাই, স্পর্শে সেরূপ দুর্লভ কোমলতার অভাব। উপন্যাসের নায়ক হইয়া সীতা-

এবং বেকসুর খালাস হইবার ভরসায় কবুল জবাব দিয়া গ্রন্থারম্ভেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।"

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। উদ্দেশ্য, বোধ হয়, আমাদের উপন্যাস-স্পৃহার সাময়িক পরিতৃপ্তি, এবং লেখকের অর্থাগমের সোপাননির্ম্মাণ; (১) আরও একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। উপন্যাসের নায়ক সাজাইয়া বঙ্কিমবাবু সীতারামকে যেমন নাস্তানাবুদ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যদি কখনও কেহ সীতারামের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য একেবারেই সিদ্ধ হয় নাই। আদর্শ উপন্যাসলেখক গ্রন্থ শেষে দুই জন নাগরিকের মুখ দিয়া আমাদিগকে যাহা শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহা এই :—

"রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সে ত জানাই ছিল। গড় টড় সব মুসলমানে দখল করে লুটপাট করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হলো কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদে চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া দু'টো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকে কত রকমই বলে! আবার কেউ কেউ বলে রাজা রাণী নাকি ধরা পড়েন নাই,—সেই দেবতা এসে তাঁদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

---

(১) 'সীতারামের' উদ্দেশ্য আর যাহাই হউক, 'অর্থাগমের সোপান নির্ম্মাণ' যে বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য ছিল, ইহা বোধ হয় না। নিঃস্বার্থ সাহিত্য-বীর বঙ্কিম বঙ্গের এই সামান্য সাহিত্য-মন্দিরের কেবল 'সোপান' নহে, চূড়াও নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসের অনুরোধে ঐতিহাসিক সীতারামের ঐতিহাসিকতার ব্যতিক্রম করিয়া তিনি ইতি-

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস না ওটা উপন্যাস তার ঠিক কি? এটা না হয় মুসলমানের রচা। তা থাক্ গিয়ে,—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।"

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ একবার তামাক সাজিয়া খাইতে খাইতে আমরা দশ জনে মিলিয়া এতদিন ধরিয়া বহুবার তামাক সাজিলাম, খাইলাম,—ঢালিয়া সাজিলাম, তাহাও খাইলাম, এবং এখনও ঢালিতেছি, সাজিতেছি, খাইতেছি, এবং নিঃশেষপীতধূমপটলে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছি,—কিন্তু কোন্‌টা কাহার রচা কথা, আর কোন্‌টাই বা সীতারামের আসল ইতিহাস, তাহার আর কোন অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছি না!

সীতারাম বাঙ্গালী,—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সন্তান। আমরাও বাঙ্গালী। সীতারামের ইতিহাস যে আমাদেরই গৌরবের ইতিহাস, সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; বাঙ্গালী বলিয়াই সীতারামের ইতিহাসের সমাদর হয় নাই। বিদেশের ইতিহাসলেখকেরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া আমাদের ললাটে এক দুরপনেয় কলঙ্করেখা টানিয়া দিয়াছেন; আমাদের জীবন, আমাদের দৃষ্টান্ত, আমাদের ইতিহাস, সে কলঙ্করেখা অপসারিত করিতে পারিতেছে না। যে দুই এক জন বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি তাহা কথঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারিত, সীতারাম তাঁহাদের মধ্যে একজন; কিন্তু সীতারামের উপন্যাস আছে, সীতারামের ইতিহাস কৈ?

বহুদিনের পরপীড়নযাতনায় আমাদের অস্থিমজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! জীবন আছে, কিন্তু সকলেই জীবন্মৃত; তাহার উপর আবার সকলেরই মেরুদণ্ড পুত্রকলত্রভারে অল্লাধিক অবনত হইয়া পড়িয়াছে! সুতরাং যাহা কিছু অবসর, তাহা অর্থচিন্তাতেই সঁপিয়া দিয়াছি। কে কোথায় কি বলিল, কে কোথায় কি লিখিল,—কে তাহার সন্ধান লয়, কেই বা তাহার প্রতিবাদ করে?

আলোচনার অভাবে অনেক "ঐতিহাসিক ব্যক্তিই" বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া পড়িয়াছেন, সীতারামও যে সেই পথে গমন করিবেন, তাহাতে আর দুঃখ কি? এখনও দুই শত বৎসর যায় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই সীতারামের

কেবল উপন্যাস, জনশ্রুতি, অথবা পিতামহীর উপকথা ; তাহার কতক হিন্দুর রচা কথা, কতক মুসলমানের রচা কথা, এবং পাছে রচা কথার অভাব থাকিয়া যায়, সে খেদটুকু পূরণ করিয়া যাহা বাকী ছিল, তাহাও বঙ্কিমবাবুর রচা কথায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল যেন একটু একটু করিয়া বাতাস ফিরিতেছে ;—বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করিবার জন্য কিছু কিছু আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। এই শুভ দিনে কেহ কি সীতারামের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন না ? উপন্যাস লেখা সহজ কথা,—একটু ভিত্তি পাইলেই হইল, তার পর ঘরে বসিয়া তামাকের ধূমরেখা অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট অংশ গড়িয়া তুলিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ইতিহাস লেখা সেরূপ সহজসাধ্য নহে। সময়, অর্থ, শ্রম,—উৎসাহ, অনুরাগ, অধ্যবসায়, সকলগুলিই হয় ত নষ্ট হইতে পারে ! নষ্ট হয় হউক, কিন্তু তথাপি স্বদেশের সাহিত্যসেবকদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করি, তোমরা কেহ স্বদেশের বিলুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখ। ইহাতে অর্থাগম হইবে না, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকাবৃদ্ধি হইবে না ; কিন্তু কেহ যদি যত্ন চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর ললাটকলঙ্ক দূর করিতে পার, আমরা দশ জনে মিলিয়া তাহার ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিব !

সীতারামের ইতিহাস আমাদিগের গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু তাহা সংকলন করিবার উপাদানের বড়ই অভাব ; হিন্দু সে ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন দিনই চেষ্টা করেন নাই ; মুসলমান তাহা লিখিয়াছেন, কিন্তু সত্যোদ্ঘাটনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই ; ইংরাজ কেবল সীতারামকে একজন "দস্যুদলপতি বিদ্রোহী" বলিয়াই গ্রন্থ-সমাপন করিয়াছেন। সুতরাং সে-কালের লেখকদিগের হাতে পড়িয়া সীতারামের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে।

সীতারামের বীরত্বকাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বীরকীর্ত্তির শেষচিহ্ন এখনও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। মহম্মদপুরের দুর্গপরিখা প্রায়ই জলশূন্য শুষ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে তাহার সীমাচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সীতারাম নাই, কিন্তু তাঁহার রামসাগরের স্বচ্ছ সলিলে এখনও গৌরবদ্বীপ প্রতিফলিত হইতেছে। সিংহদ্বার জরাজীর্ণ হইয়াছে, রাজপুরী বন্য শ্বাপদের লীলাভূমি হইয়াছে, দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া স্থানে স্থানে

নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর সারি সারি তোপ সাজাইয়া বীরবিক্রমে বাদশাহের বলদর্পিত ফৌজদিগকে পদদলিত করিয়া মোগল-সেনাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহার শেষনিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই! তাহা দেখিবার জন্য আমাদের বাঙ্গালীহৃদয়ে তত দূর কৌতূহল হয় না, আমরা অবসর পাইলে ইংরাজ নবাবদিগের পদানুসরণ করিয়া, কত লাথি গুঁতা খাইয়া, রেল, ষ্টীমারে হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া, দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা পাহাড়ে ইংরাজকীর্ত্তি দেখিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হই। কিন্তু দেশের কোন্ নিভৃত কোণে বাঙ্গালীর স্বহস্তরচিত কোন্ পুণ্যকীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান লই না। বাঙ্গালী মহম্মদপুরের সীতারামের দুর্গপ্রাচীরে পদচালন করিবার অবসর পায় নাই, কিন্তু অনুসন্ধাননিপুণ ইংরাজ পরিব্রাজকেরা তাহার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে অনেকবার সীতারামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের কৌতূহলনিবারণের জন্য এক জন সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ * সীতারা[illegible]কীর্ত্তিকলাপের যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহাই সীতারামের একমাত্র লিখিত ইতিহাস;—কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহারও অধিকাংশই উপন্যাস!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সীতারাম ঐতিহাসিক চরিত্র; সে চরিত্র লইয়া উপন্যাস লিখিতে গিয়া তাহার ঐতিহাসিকতা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সীতারামের কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে আবার নূতন করিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে, মুসলমানেরা ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলা দেশ বাহুবলে পদানত করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিতেন;—কালক্রমে জন কতক ইংরাজ বণিক বাণিজ্য করিতে আসিয়া রোরুদ্যমান বালকবালি[illegible]র গ্রাসবিগলিত মিষ্টলড্ডুকের ন্যায় মোগলের হস্তচ্যুত সোনার রাজ্য কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এই বর্ণনা ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে।

মুসলমানেরা যে অনেকবার বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা। কিন্তু কোনদিনই মুসলমান বাঙ্গালা দেশে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শাসন করা দূরে থাকুক, সকল স্থানে রীতিমত দীর্ঘ

কাল রাজস্ব সংগ্রহ করিবারও সুবিধা হয় নাই। কখন কোন অংশ পদানত হইত, কখন আবার কোন অংশ স্বাধীন হইয়া উঠিত। সুতরাং মুসলমান শাসনসময়ে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করা, বাহুবলে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবার কল্পনা করা, সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া, কেহই অন্যায়, অবৈধ কার্য্য বা বাতুলতা বলিয়া মনে করিতেন না।

পাঠান-সেনা বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার জন্য অসিহস্তে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিল। কিন্তু সেকালের বাঙ্গালীও দুর্ব্বলহস্তে অসি চালনা করিত না। স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্বদেশরক্ষার জন্য, স্বাধীনতারক্ষার জন্য বাঙ্গালী অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছিল;—শেষে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ পদানত করিতে না পারিয়া, যাহা পদানত হইল, তাহা লইয়াই পাঠান ভূপতিগণ মুসলমান রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন।

কালক্রমে হিন্দু মুসলমানের বৈরিভাব চলিয়া গিয়াছিল; মুসলমানের অধীনে হিন্দু, এবং হিন্দুর অধীনে মুসলমান, এক গ্রামে এক দেশে শান্তি ও প্রীতিতে বসতি করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটেরা যখন বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার জন্য বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন বাঙ্গলা দেশে তিন শ্রেণীর তিনটি প্রবল শক্তি বর্ত্তমান। এক দল হিন্দু ছিলেন,—তাঁহারা কোন দিনই মুসলমানকে করপ্রদান করেন নাই। এক দল মুসলমান ছিলেন,—তাঁহারা মোগলকে প্রভুপদে বরণ করিতে অসম্মত। আর এক দল হিন্দু ছিলেন,—তাঁহারা কখন কখন মুসলমানকে করপ্রদান করিলেও, সুযোগ পাইবামাত্র স্বাধীন হইয়া উঠিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। মোগলের সঙ্গে এই তিন দলেরই শক্রতা বাধিয়াছিল, সে যুদ্ধে বাঙ্গলা দেশ কতবার হারিল, জিতিল,—কখন মোগলকে সম্রাট বলিয়া সেলাম করিল, কখন আবার সময় পাইয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করিল না। পাঠান ভূপতিগণ অনেকবার সুবর্ণরেখাপারে তাড়িত হইলেন, বাঙ্গলা দেশে মোগলের একাধিপত্য বিস্তৃত হইল; কিন্তু তবুও বাঙ্গলা দেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলের শাসনাধীন হইল না;—ইহাই সেকালের ইতিহাস। *

---

* "The province of Bengal paid a nominal Submission to the throne Delhi, but during several reigns had been virtually independent."—Mill's

তোড়নাভয়ে "শতহস্তেন বাজিনঃ" বলিয়া সসম্ভ্রমে সেকালে তাহারা অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটুতা লাভ যাহারা বালকদিগকে একখানি ছুরি হাতে করিতে দেখিলে তাড়াতাড়ি আঙ্গুল কাটিবার ভয়ে ছুরিখানি কাড়িয়া লইয়া বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় হাতে তুলিয়া দেয়, সেকালে তাহাদেরই বালকবৃন্দ লাঠি তরবারি লইয়া খেলা করিত,—আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণও কোষাকুষি ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

সম্রাট আকবর, এই সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বাঙ্গলা দেশে মোগলের একাধিপত্য স্থাপন করিবার আশায়, যথাক্রমে টোডরমল্ল এবং মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আকবরের বাহুবলে ভারতবর্ষে মোগলের প্রবল প্রতাপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল;—এলাহাবাদ, আগরা, অযোধ্যা, আজমীর, গুজরাট, বিহার, বাঙ্গালা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান, মাহী, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগরে সুবা সংস্থাপিত হইয়াছিল। * রাজা টোডরমল্ল সুবে বাঙ্গলার সমুদায় সকর ভূমি ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভাগ করিয়া দিয়া, বার্ষিক ১০৬৯৩১৫২ টাকা রাজকর নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন;—কিন্তু এই রাজকর কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারেন নাই। †

মহারাজা মানসিংহ আসিয়া বাহুবলে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিয়া নিরূপিত রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। পাঠান সুবর্ণরেখাপারে তাড়িত হইল, প্রতাপাদিত্যের "যশোর নগরধাম" ধূলিপরিণত হইল, অনেকেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজকর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন;—কিন্তু তথাপি আশানুরূপ রাজকর সংগৃহীত হইল না।

মানসিংহের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর মানসম্ভ্রম চলিয়া গেল; বাঙ্গালী আবার স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। সম্রাট আরঙ্গজীব আসিয়া যখন বাহুবলে পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, বাঙ্গলা দেশ তখন একপ্রকার স্বাধীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরঙ্গজীব সেই দেশ করায়ত্ত করিবার আশায়, আপন পৌত্র আজিমশ্বান্ এবং আপন অনুচর মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

---

* আইন আকবরি।

† Grant's Analysis of Fi[illegible]

ইঁহারা উভয়েই ঢাকার রাজধানীতে থাকিয়া রাজ্যশা

লাগিলেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন দৃঢ়মুষ্টিতে রাজকরসংগ্রহে ব্যস্ত, ...

তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। আরঙ্গজীবের নাম আজিও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সে সময়ের লোক তাঁহার নামে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, মুসলমান মস্‌জিদে হিন্দুস্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তীর্থদর্শনেও হিন্দুদিগের বিড়ম্বনার একশেষ হইতেছিল;—সুতরাং হিন্দুমাত্রেই মুসলমান শাসনের উপর বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিলেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ যদি কঠোরহস্তে রাজকর সংগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী হয় ত আরঙ্গজীবের অত্যাচার একেবারেই অনুভব করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইল না;—মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্গলা দেশে ১৩ চাক্‌লা এবং ১৬৬০ পরগণা সংস্থাপন করিয়া বার্ষিক ১৪ ২৮ ৮১ ৮৬ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিলেন। * এই রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য চাক্‌লায় চাক্‌ এক এক জন "ফৌজদার" নিযুক্ত হইলেন, এবং কেহ সহজে রাজ দিলে, একের জমিদারী অন্যের হাতে সমর্পণ করিবার নিয়ম হই দিনের পর হিন্দুর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। যে জমিদার অধীনত করিতে বা রাজকর প্রদান করিতে অসম্মত, নবাব সরকারে তাহা দারী অন্য লোকের নামে লিখিত হইতে লাগিল, এবং সেই অন্য লো লস্কর যোটাইয়া, সুবাদারী ফৌজ এবং জমিদারী লাঠিয়াল লই দিগের জমিদারী কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। এতদিনের পর ব যায়-যায় হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর এই সংকট সময়ে সীতারামের সুতরাং সীতারামের ইতিহাস বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়া সীতারাম কে? কেমন করিয়া তিনি ইতিহাসে পরিচিত হইলেন, কেমন তাঁহার পদোন্নতি হইল—তাহা বুঝিতে হইলে মুর্শিদ কুলী খাঁর নবাবী আমলের আমূল বিবরণ পাঠ করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

* Grat's Analysis of Finances of Bagal.

এই পত্রের ৭. এ সম্বন্ধে কোন কথা আমি সুরেশ বাবুকে লিখি নাই। আমার মনে ছিল যে চৈত্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের মহা গুরু নিপাতের বৎসর।

১৩০১ সালের প্রায় মাঝামাঝি আমি প্রবাসে যাই। প্রায় বৎসরেক আমি প্রবাসে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে (ঠিক কোন সময়ে আমার স্মরণ হইতেছে না)। কাশীধামে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্রের কথা উত্থাপিত হয়, আমি সেখানে নিজের মতামত ও এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব আলোচনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে অর্থাৎ গত ভাদ্রে আমি দেশে ফিরিয়া আসি। তাহার পর ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুরেশ বাবুর একখানি পত্র পাই,—পত্রখানি এই :—

"ভাদ্র ও আশ্বিনের 'নব্য-ভারতে' 'প্রতিবাদ'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি আপনি দেখিয়াছেন।

"উক্ত প্রবন্ধের এক স্থলে লেখক শ্রীবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, 'চতুর্থ বৎসরের 'সাহিত্যে' কামাখ্যা বাবুর এই প্রবন্ধ বাড়িয়া হীরেন্দ্র বাবু একটু ভাসা রকম জবাব দেন; শুনিয়াছি কামাখ্যা বাবু তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; (২) কিন্তু সেই সময়ে সাহিত্য-পতি বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু হওয়াতে, কামাখ্যা বাবুর প্রস্তাবানুসারে 'সাহিত্য-সম্পাদক' মহাশয় ও কামাখ্যা বাবু একমত হইয়া সে প্রতিবাদ পত্রস্থ করেন নাই।'

"উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, তাহা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। বোধানন্দ সরস্বতী কি আপনার কাছে এ কথা শুনিয়াছেন? এরূপ জনরবের মূল কি? আপনি যাহা জানেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় জানাইবেন। ইতি ২১শে ভাদ্র ১৩০২।

"বিনয়াবনত

"শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

"পুনশ্চ। এই পত্রের উত্তর একটু শীঘ্র লিখিলে বাধিত হইব।

"শ্রীসুরেশ শর্ম্মা।"

পত্রখানি সময়ে আমি পাই নাই,—পাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

সুরেশ বাবু যাহা বোধ করিয়াছিলেন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই,—"নব্য-ভারতের" প্রবন্ধ আমি তখনও দেখি নাই। এবং সুরেশবাবু যাহাকে [illegible] ...বর্ণ,তাহা জনরব নহে,—(৩) প্রকৃত ঘটনা বটে; পূর্ব্বকার উদ্ধৃত তিনখানি পত্র তাহার সাক্ষ্য।

যদি সে সময়ে বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু না হইত, এবং আমি ও সুরেশ বাবু একমত না হইতাম, তাহা হইলে এ বিষয় লইয়া নিশ্চয়ই আলোচনা হইত। (৪) আমার এই বৈশাখের

---

(২) কামাখ্যা বাবু কোনও প্রতিবাদ করেন নাই।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৩) যাহার মূলে সত্য নাই, তাহা জনরব ভিন্ন আর কি বলিব?—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৪) দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে 'একমত' হইয়াই আমি অপরাধী হইয়াছি, দেখিতেছি! বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর অনেক মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাঁহার সপিণ্ডীকরণও শেষ হইয়াছে বহুদিন! লেখক এতদিনে এ বিষয়ে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। তিনি নিজে যদি 'আলোচনা' না করেন, এবং প্রবাসে থাকেন, সে অপরাধ কাহার?—সাহিত্য-সম্পাদক।

পত্রখানিকে আমি প্রতিবাদ বলিতেছি। (৫) এখন সুরেশ বাবু আমার ..কচ যাহা জানি.. চাহিয়াছেন তাহা আমি তাঁহাকে ও পাঠকগণকে জানাইলাম।

সুরেশ বাবুর শেষপত্র পাইয়া আমি ২৩শে সেপ্টেম্বরই তাঁহার সহিত দেখা করি, এবং সেইখানে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যতীশ বাবু আমাকে ভাদ্র ও আশ্বিনের "নব্য-ভারত" দেখান। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পূর্ব্ব চিঠি লেখালিখি সম্বন্ধে সুরেশ বাবু কিছু প্রতিলিপি রাখেন নাই, এমন কি তাঁহার নিজের ১৩ই বৈশাখ ১৩০১ সালের পত্রখানির বিষয়ও তাঁহার স্মরণ ছিল না।

অতঃপর "নব্য-ভারতের" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আর কিছুই নাই। (৬)

শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৫) কামাখ্যা বাবু তাঁহার ১৩০১ সালের ৫ই বৈশাখের পত্রখানিকেই 'প্রতিবাদ' বলিতেছেন। আমি এ বিষয়ে আপত্তি করিতেছি। সেখানি আমাকে লিখিত পত্রমাত্র,—তাহা প্রতিবাদ নহে। আমি তাহা পত্র বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম; কেন না, তাহা প্রতিবাদরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে,—সে পত্রে এমন কোনও লক্ষণই ছিল না। কামাখ্যা বাবুর সেই পত্রে আছে,—"ফল কথা বিষয়টির আলোচনা এখন প্রীতিপ্রদ হইবে না, নচেৎ দেখাইতে পারা যাইত, যে হীরেন্দ্র বাবুর পত্র দ্বারা আলোচিত বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় নাই।" এই অংশ পড়িয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ের আলোচনা প্রীতিপ্রদ হইবে না বলিয়াই কামাখ্যা বাবু আপাততঃ নিরস্ত হইলেন, এ ঘটনা না ঘটিলে তিনি নিজ মতের যাথার্থ্য ..খাইতেন। ইহা-ভিন্ন তাঁহার পত্রের আর কি অর্থ হইতে পারে? যে পত্রে তিনি "দেখাইতে পারা যাইত [illegible] এবং বস্তুতঃ কিছুই দেখান নাই, সে পত্রকে প্রতিবাদ মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই।

২ ও ৩ নোটে আমি যাহা লিখিয়াছি, উপরি-লিখিত পত্রাংশের আলোচনাই তাহার প্রমাণ। কামাখ্যা বাবু যখন আদৌ 'প্রতিবাদ' করেন নাই,—তখন কেহ যদি বলেন, কামাখ্যা বাবু 'প্রতিবাদ করিয়াছিলেন',—তাহা হইলে এরূপ নির্দ্দেশকে অনায়াসে বাস্তবের অপলাপ বা অযথার্থ বলা যায়। কামাখ্যা বাবু দ্বিতীয় বার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—এ কথা কেবল জনরব নহে,—মূলহীন অলীক জনরবও বটে।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৬) যদি কামাখ্যা বাবুর মূল আলোচ্য সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি এক্ষণেও তাহা লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

সমাজতত্ত্বে হারবার্ট স্পেন্‌সর।

অগষ্ট সংখ্যা কোণ্টেম্পোরারি পত্রে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসর সমাজতত্ত্বের অংশবিশেষের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় সমাজের ব্যবসায়িক প্রণালী—(Professional Institutions)। সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, মনস্বী স্পেনসর সাহেব বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক। বিবর্ত্তনবাদের মূলতত্ত্ব (অবিশেষ অব্যাকৃত হইতে বিশেষ ব্যাকৃতের আরম্ভ) অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ও গ্রীস প্রদেশে প্রচলিত থাকিলেও, ঐ তত্ত্বের সম্যক্ সর্ব্বাঙ্গীন স্বতন্ত্র আলোচনা অধুনাতন বৈজ্ঞানিক যুগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ডারবিন কি স্পেনসর ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। যদি ডারবিনই প্রথম প্রবর্ত্তক হয়েন, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ডারবিন প্রচারিত বিবর্ত্তনবাদ সাকার স্থূল জগতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্পেনসরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিবর্ত্তনের বিশ্বব্যাপী প্রসার—স্থূল সূক্ষ্ম, সাকার নিরাকার, সাঙ্গ নিরঙ্গ, বিশ্বের সর্ব্বত্র আবিষ্কার করিল। তিনি প্রচার করিলেন যে, বিবর্ত্তনের ক্রীড়া শুধুই যে জড় জগতে আর চেতন জগতের স্থূল দেহাংশে সীমান্বিত, তাহা নহে। জীববিজ্ঞানে (Biology) মনোবিজ্ঞানে (Prychology) ও সমাজবিজ্ঞানেও (Sociology) বিবর্ত্তনের লীলা প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই লীলার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিবর্ত্তনের মুখ্য নিয়মের আবিষ্কারে স্পেনসার অনেক গ্রন্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্পেনসর ধারাবাহিকক্রমে বিবর্ত্তন গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিবার সংকল্প করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত করেন। তদনুসারে প্রথম ভাগ মূল তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয় (First Principles)। দ্বিতীয় ভাগ (১ম ও ২য় খণ্ড) জীবনতত্ত্বের বিশ্লেষণে, তৃতীয় ভাগ (১ম ও ২য় খণ্ড) মনস্তত্ত্বের আবিষ্করণে, তৃতীয় ভাগ সমাজতত্ত্বের সমালোচনে, এবং চতুর্থ ভাগ ধর্ম্মতত্ত্বের নিরাকরণে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। গত ৩০ বৎসর অমিত অধ্যবসায় ও অপরিমেয় যত্নে স্পেনসর সেই গ্রন্থাবলীর রচনায় প্রবৃত্ত আছেন। মনোবিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমাজবিজ্ঞান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—(মূল কথা, রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, ও যাজনিক প্রণালীবিষয়ক ৪ খণ্ডে সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।) ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে (Data of Ethics)। সম্প্রতি স্পেনসর সমাজবিজ্ঞানের ব্যবসায়িক অংশের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমানে আলোচ্য প্রবন্ধ সেই আলোচনার একাংশ। ইহাতে বক্তা, কবি, নট ও নাট্যকারের উদ্ভব, বিবর্ত্তনের

সমাজতত্ত্ব।

বিবর্ত্তনবাদ।

স্পেনসরের বিশেষত্ব।

জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান।

বিবর্ত্তন গ্রন্থাবলী।

Sociology Ethics.

দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। বিবর্ত্তনের মূল সূত্রে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের বিকাশ। যাহা কারণে বীজভাবে লুকায়িত ছিল, তাহাই বিবর্ত্তনের বিধিবশে কার্য্যে ব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতএব এই নিয়মেই অসভ্য আদিম অবস্থা হইতে মানবের সকল প্রথা প্রণালী সভ্য আধুনিক অবস্থায় ব্যাকৃত হইয়াছে।

অব্যক্ত ও ব্যক্ত।

অসভ্য অবস্থায় জাতির সহিত জাতির বা সমাজের সহিত সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য ঘটনার মধ্যে ছিল। নেতা বা দলপতি দলবল লইয়া ভিন্ন সমাজের নেতা বা দলপতির সহিত বিরোধ উপলক্ষে প্রায়ই সম্মুখসমরে অগ্রসর হইতেন, এবং বিপক্ষ দলন করিয়া জয়োল্লাসে সানুচর সসজ্জ হইয়া বিজয়ী বীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহাকে সমাদরে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্ম তাঁহার স্বজাতি বা স্বসমাজ মহোৎসব করিত। এই মহোৎসবের বীজ হইতেই বক্তা, কবি, নট ও নাট্যকারের উৎপত্তি।

বক্তা প্রভৃতির আদি কি?

আদিতে প্রত্যাগত বিজয়ী বীরের জয়ঘোষণা করিয়া কোন বচনবাগীশ তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া তাঁহার অবদানপরম্পরার বর্ণনা করিত। ইহা হইতে ক্রমবিকাশে বক্তৃতার উদ্ভব হইয়াছে। এই মন্তব্যের প্রমাণার্থ স্পেনসর আপন প্রথামত দৃষ্টান্ত পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। অধুনা ধরাতলে যে সকল বিদ্যমান অসভ্য জাতি দৃষ্ট হয়, তাহাদের সামাজিক প্রণালী পদ্ধতিই দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। সে দৃষ্টান্ত কি? ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে প্রতি শাখা জাতির সামাজিক উৎসবে বক্তার বক্তৃতা শ্রুত হইয়া থাকে। দেহোমা, কালিডোনিয়া, তিহিতি প্রভৃতি অসভ্য দেশেও উক্ত প্রথা লক্ষিত হয়।

বক্তা।

ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতাই কবিতা; সঙ্গীতরসিক অসভ্য জাতিরা, তাললয়সংযুক্ত করিয়া বিজয়ী দলপতির জয় ঘোষণা করে। (নিগ্রো শাখাজাতিরা ইহার প্রমাণস্থল)। কোথাও বা এই জয়ঘোষণা সঙ্গীতযন্ত্রের সহকারে উচ্চারিত হয়। (মরুভব জাতি ইহার দৃষ্টান্তস্থান)। এইরূপে ক্রমশঃ বক্তার বচনস্রোত তালের মানদণ্ডে নিয়মিত হয়। তাহা হইতেই ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা কবিতার উৎপত্তি।

কবি।

অনেক স্থলেই জীবিত বিজেতার সহিত তাহার পূর্ব্বপুরুষের অবদান কীর্ত্তিত হয়। কারণ অসভ্যের বুদ্ধিতে ইহলোক ও পরলোকে কোন অনতিক্রম্য ব্যবধান নাই। সে ভাবে, মৃত ব্যক্তি (যাহাকে সে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করে) আত্মগোপন করিয়া ইহলোকেই বিদ্যমান আছে। মৃতের সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস হইতেই (স্পেনসরের মতে) ভূত দেবতা শেষ ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নীত হয়। অথবা ভূতাদি ঐ বিশ্বাসেরই সৃষ্টি। এ মত কত দূর প্রমাণসঙ্গত বা সমীচীন তাহার বিচার এ স্থলে নিষ্প্রোয়জন। জড়বাদী স্পেনসরের এই অবধি ঈশ্বরতত্ত্ব-দর্শন। বর্ত্তমানে বক্তব্য এই যে, আদিম কালের কবিতা যে ধর্ম্মপ্রধান বা ধর্ম্মময়, তাহার কারণ স্পেনসর এই প্রণালীতে মীমাংসা করিয়াছেন।

বিজয়ী বীরের অবদানবর্ণন হইতে অবদান-অনুকরণ বড় অধিক দূর নহে। কথা বলা অপেক্ষা কার্য্যে দেখান অধিকতর হৃদ্য হয়। বক্তৃতা বা গীতি অপেক্ষা অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী। এইরূপে নটের উৎপত্তি হয়। অসভ্য জাতির সমাজ প্রণালীর অনুশীলন করিলে এই কথাই সপ্রমাণ হয়। এসকিমো, নেজোজি প্রভৃতি জাতি ইহার দৃষ্টান্ত। সংস্কৃতে নট হইতে নাটকের উৎপত্তি। অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য (হাবভাবের পরিচায়ক ভঙ্গি বর্জ্জিত হইয়া) অভিনয়ে পরিণত হয়; এক চরিত্রের অভিনয়ে ক্রমশঃ তাহার সহকারী ও অরিপক্ষের কার্য্যাবলীর অভিনয় মিশ্রিত হয়। তখন

নট।

নট অন্যান্য পাত্র পাত্রীর সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। এইরূপ নট সূত্রধরে (Stage manager)

নাট্যকার।

উন্নীত হয়। সূত্রধর সহযোগী নট নটীর হাবভাব ভাষা ভঙ্গির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইহাই ত নাট্যকারের কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ অভিনেতা ও নাট্যকার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সেক্ষপীয়র ও মলেয়ার অভিনেতা ও নাট্যকার উভয়েরই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু ইদানীং কয় জন নাট্যকার অভিনয়কার্য্যে ব্রতী হয়? এইরূপে অব্যক্ত অব্যাকৃত অবিশেষ হইতে ব্যক্ত ব্যাকৃত বিশেষের বিকাশ হয়। ইহাই বিবর্ত্তনবিধি।

সাহিত্য।

বিলাতে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস।

ইংরাজ এদেশবাসিগণকে চিরদিন কতকটা ঘৃণা আর কতকটা কৃপার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। 'নেটিবের' ভিতর যে কোনও প্রকার মহত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যজ্ঞান থাকিতে পারে, এরূপ

সাহিত্য-জগতের সাধারণ সম্পত্তি।

চিন্তা কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট নিতান্ত উপহাসের বিষয় ছিল। ভারতবাসীকে আমরা বাহুবলে পরাজিত করিয়াছি:—পরাজিতের আবার মহত্ত্ব কি? বিজিতের কাছে জেতার আবার শিক্ষণীয় কি? বহুকাল ব্যাপিয়া ইংরাজের মনোভাব সাধারতঃ এইরূপই ছিল। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। রোমরাজ্য-বিধ্বংসী, পাশব বলের অবতার, প্রাচীন গথ ও ভান্দাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর বিজেতৃগণ এ পর্য্যন্ত ঐরূপই ভাবিয়া আসিতেছেন। তবে গথ ও ভাণ্ডালের সহিত তুলনায় ইংরাজকে অবশ্য অনেকটা উচ্চ স্থান দিতে হইবে। সাহিত্য, জগতের সাধারণ সামগ্রী। বিশ্বজনীন সহানুভূতিই উহার প্রাণ। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের মত উহা আপন প্রভাব আপনার সঙ্কীর্ণ পরিধিমধ্যেই সংযত করিয়া রাখিতে চাহে না। সাহিত্য স্বভাবতঃ এই সসাগরা বসুধাকে বেষ্টন করিয়া প্রেম ও প্রীতির মেখলা পরাইয়া দিতে চাহে। সার উইলিয়ম জোন্স হইতে আমাদের আজিকার আলোচ্য শ্রীমতী মেরিয়ম নাইট পর্য্যন্ত ইহার সাক্ষী।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এত দিন কেবল ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের উপরই নিবদ্ধ ছিল। সেই সংস্কৃতের ছায়ায়, আধুনিক সভ্যতার সলিলসেকে, এই পরাজিত অধম

ইংরাজের চক্ষে বঙ্গ-সাহিত্য।

বঙ্গদেশে যে এক অতুল মহিমাময় অভিনব সাহিত্যের ভিত্তি, অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইংরাজ এতদিন তাহার বড় একটা খবর রাখিতেন না। তিনি আপনার মিল্টন, কিটস শেলি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, মাইকেল, হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার প্রবৃত্তি কখনও দেখান নাই। ওয়াল্টার স্কট, ডিকেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট প্রভৃতি তাঁহাকে এত দূর পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সুদূর ভারতবর্ষের এক কোণে কোথায় কোন্ বঙ্গরাজ্যে শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইবার আদৌ তাঁহার অবসর ছিল না।

এখন সে দিন গিয়াছে। ইংরাজের নিত্য নূতন বুভুক্ষা নিবারণের জন্য আর সে স্কট নাই, থ্যাকারে নাই, জর্জ্জ ইলিয়ট নাই। সকলেই আপনাপন জীবনগত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর সেই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন যাঁহারা সেই মহাত্মাদিগের পদাঙ্ক

শ্রীমতী মেরিয়ম নাইট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "বিষবৃক্ষের" ইংরাজী অনুবাদের কথা "সাহিত্যের" পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন। সম্প্রতি ইনি আবার বঙ্কিম-কৃত "কৃষ্ণকান্তের উইলের" এক অনুবাদ প্রচারিত করিয়াছেন। অনুবাদ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমতী মেরিয়ম্ স্বয়ং যে কথা লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগাজিন" হইতে আমরা তাহার আদ্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

বিলাতে বঙ্কিম বাবু।

"কৃষ্ণকান্তের উইল এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস বিষবৃক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানের শ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ। ইহাদের প্রণেতা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহারই স্বদেশীয় কোন লেখক 'বঙ্গের ওয়াল্টার স্কট্' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কারণ বোধ হয় এই যে, বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস ঐতিহাসিক শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের অপেক্ষাও উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাস আধুনিক প্রণালীর অধিকতর অনুগত; শুধু তাই বলিয়া নহে, উদ্ভাবন ও বর্ণনশক্তির হিসাবেও তিনি বড়। যে সকল গভীরতম প্রদেশে স্কট্ কখনও প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, বঙ্কিমের সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সেখানেও বিচরণ করিত। পরিহাসরসিকতায় হয় ত উভয়েই সমান। কিন্তু স্ত্রীচরিত্রের অঙ্কনে বঙ্কিম নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ।

বঙ্গের স্কট্।

"১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ইহা বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরাজী সংস্করণের নিমিত্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মের জে. এফ. ব্লুম্হার্ট এম্. এ. মহোদয় একটি ভূমিকা, নির্ঘণ্টপত্র ও টীকাগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

"ইংরাজ পাঠক যদি বঙ্গীয় নারী-চরিত্রের উচ্চতা ও গভীরতা অনুভব করিতে চান, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহায় আর কোথাও পাইবেন না।

"আমরা যাহাকে উপন্যাস বলি, তাহা বাঙ্গালার অথবা সাধারণতঃ প্রাচ্য প্রদেশসমূহের, নিজস্ব নহে। নাটক বা দৃশ্যকাব্যই প্রাচ্য লেখকদিগের প্রধান অবলম্বন। গত পঞ্চাশৎমাত্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য আদর্শে উপন্যাসরচনার সূত্রপাত হইয়াছে। আরও কয়েক জন ভাল ঔপন্যাসিক আছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই বঙ্কিমের সমকক্ষ নহেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আসন গ্রহণ করিতে পারেন, এমন কোন লেখকের কথাও শুনিতে পাই না। কিন্তু আমরা আশাহীন নহি। ভারতবাসীর হৃদয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও পরিহাসরসিকতা হিন্দুজাতির বিশেষত্ব। সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, সর্ব্ববিধ মনুষ্যত্বের চিত্রণে কথাগ্রন্থ কত দূর উপযোগী, সুকুমার শিল্পের হিসাবে ইহার প্রসার কত বিস্তৃত, এ সকল কথা লেখকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইলে, এ বিষয়ে শিল্পীর অভাব হইবে না। পুরুষ লেখকদিগের ন্যায় তখন লেখিকারও আবির্ভাব হইবে। উপস্থানক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বেই অনেকগুলি স্ত্রী-কবির অভ্যুদয় হইয়াছে।

বঙ্গের উপন্যাস।

"অনুবাদে ভাষার অন্তরায় সহজে যাইবার নহে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অযোগ্য অনুবাদকের হস্তে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল অনুবাদ দেখিয়াছি, তাহারা হয় অসম্পূর্ণ, নয় ত একেবারেই হাস্যাস্পদ। কতকটা অসম্পূর্ণতা অনিবার্য্য বটে। একে ত ভাষান্তরের কার্য্যটাই স্বভাবত সুকঠিন, তা'র উপর যে জীবনের আদর্শ এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভের কোনও উপায় নাই। হিন্দুর পারিবারিক জীবন

অনুবাদে অন্তরায়।

হিন্দুজীবনের কয়েকটি চিত্র ইংরাজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজী পাঠক-সম্প্রদায় উহাদের সৌন্দর্য্য মূলগ্রন্থ হইতে উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। ভবিষ্যতের কবিসমাজ হয় ত আপন গ্রন্থনিচয়ের দেশীয় ও ইংরাজী সংস্করণ যুগপৎ প্রকাশিত করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা করিতে পারিতেন,—ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁহার যে আবার বিদেশী পাঠক জুটিবে, সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমের এরূপ আশাও ছিল না; তিনি উহার কামনাও করিতেন না। হয় ত তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহা অনাকাঙ্ক্ষিতই ছিল। কেবল অযোগ্য অনুবাদকের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার মানসেই তিনি যোগ্যতর হস্তে উহার ভারার্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১)

উপন্যাসে উপকার।

"এমন দিন আসিবে, যখন বঙ্গীয় লেখকদিগের পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণতা আর থাকিবে না;—উহা এখনই কমিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতের সেই ঔপন্যাসিকগণ সভ্য জগতের সর্ব্বত্র আপনাদের প্রতিভার পুরস্কার খুঁজিয়া বেড়াইবেন; এবং সাহিত্যের সার্ব্বভৌমিক চিত্রশালায় স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর চরিত্র-চিত্র যোগাইবার জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবেন।

ভবিষ্যৎ।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন লইয়া অনেক আন্দোলন ও আলোচনা চলিয়াছে। প্রাচ্য-দেশবাসী মনে করেন, এ বিষয়ে প্রতীচ্যেরই অগ্রণী হওয়া উচিত। কেবল অগ্রণী হইলে চলিবে না; কার্য্যক্ষেত্রে যাহা কিছু করিবার, তাঁহাকেই করিতে হইবে। প্রাচ্যেরা কেবল প্রতীচ্যের প্রত্যুদ্গমন করিবেন; অথবা উত্তরসাধক হইয়া থাকিবেন। প্রাচ্যের এই ভাব অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে। কিন্তু উপন্যাসে তাঁহার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। পাশ্চাত্য কথাগ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য নরনারীর পরিচয় পাইতেছেন। তিনি স্বদেশীয় নরনারীর যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাশ্চাত্যের সমক্ষে উপস্থাপিত করুন। তাহা হইলে জাতিবিদ্বেষ ঘুচাইয়া পরস্পরের প্রীতিসংস্থাপনে অনেকাংশে সফল হইবেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন।

"বঙ্কিমচন্দ্র বহুবর্ষব্যাপী রাজসেবা ও অসাধারণ প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সুতরাং শাখা প্রশাখাসমেত তাঁহার পূর্ণ নাম,—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। কিন্তু ইংলণ্ডে এই সব শাখা প্রশাখায় পরিচয়ের বড় ব্যাঘাত ঘটে। এখানে তিনি, বিষবৃক্ষের গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামেই খ্যাত। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ কিন্তু তাঁহাকে স্নেহবশতঃ বরাবর বঙ্কিম বাবু বলিয়াই ডাকিয়া আসিতেছেন; এবং চিরদিন ঐ বলিয়াই ডাকিবেন। বঙ্কিম বাবু অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রস্তাবে উল্লিখিত দুইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুইখানিই জীবনের প্রকৃত নিখুঁত চিত্র; পাশ্চাত্য পাঠকের পক্ষে যেমন মনোরম, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। বঙ্কিমের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সানুভূতির জন্য স্ত্রীজাতি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রহিবে।"

বঙ্কিমের কথা।

---

(১) স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু শেষে এ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন,—এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক "দেবীচৌধুরাণীর" নিজ-কৃত ইংরাজী অনুবাদের খাতা-খানি বাহির করিয়া আমায় দেখাইয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অনুবাদ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, 'ফেয়ার' করিয়া রাখিয়াছি;—নিজের সব বই নিজেই অনুবাদ করিব মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু তারপর আর ইচ্ছা হইল না।"

আমাদের বিবেচনায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বিষয় ও উদ্দেশ্যনির্ব্বিশেষে একই নিকষে পরীক্ষিত করা সুসমালোচনার কার্য্য নহে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান গার্হস্থ্য জীবনের অঙ্কনে "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল গার্হস্থ্য জীবনই উপন্যাসের বিষয়ীভূত নহে। উদার, মহান্, ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির হিসাবে উচ্চতর স্থান "চন্দ্রশেখরের" প্রাপ্য। আবার ঐতিহাসিক হিসাবে "রাজসিংহ" ইহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। শ্রীমতী মেরিয়মের মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের আর একটুকু বক্তব্য আছে। বঙ্কিমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তিনি স্কটের মহত্ত্বের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। যে উদার, সর্ব্বতোমুখ সানুভূতির পরিচয় পাইয়া সমালোচকগণ স্বয়ং সেক্সপিয়রের নিম্নেই স্কটের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রে তাহা ত দেখিতে পাই না। স্কটের সেই বিশাল বৈচিত্র্য বঙ্কিমে কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র যত্ননির্ব্বাচিত চিত্রগুলি সাজাইয়া কেবল এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালা সংগঠিত করিয়াছেন। কিন্তু, স্কটের কাব্যোদ্যান মাতা বসুমতীর বক্ষের ন্যায় বিশাল; উহাতে স্থান পায় নাই, জগতের অরণ্যে এমন কুসুম অতি অল্পই আছে।

আমাদের কথা।

আমরা শ্রীমতী নাইট্‌কে অনুরোধ করি, তিনি "বিষবৃক্ষ" "কৃষ্ণকান্তের" ন্যায় "চন্দ্রশেখর" "রাজসিংহ" প্রভৃতিরও অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য পাঠকসমাজে প্রচারিত করুন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিমকে সম্পূর্ণরূপে পাইলে ইংরাজ পাঠক আনন্দিত হইবেন। গদ্য-কাব্যের ন্যায় বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পদ্যগ্রন্থগুলিরও অনুবাদ হওয়া উচিত। মাইকেলের "মেঘনাদবধ", হেমচন্দ্রের "দশমহাবিদ্যা", বা রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" ইংরাজীতে অনুবাদিত হইলে, ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অনুরোধ।

সমালোচনা।

কিংস্‌লি।

ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখক মিষ্টার ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসন "ফোরাম্" পত্রে, ইংরাজ লেখকদিগের সমালোচনা করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দুইটি সমালোচনার সার সংগ্রহ করিয়াছি।* তিনি চার্লস্ কিংস্‌লির যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, এবার তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন যে, কিংস্‌লি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক না হইলেও, তাঁহার সময়ের লোকের উপর তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রভাব তাঁহার কোন বিশেষ গুণ হইতে উদ্ভূত নহে; পরন্তু তাহা তাঁহার পরিবর্ত্তনক্ষমতা, সাহিত্যে উৎসাহ, ক্ষমতার প্রচুরতা, নবপথাবলম্বনক্ষমতা, সহানুভূতিবাহুল্য ও সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে তিনি পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে নানা চিন্তা ও নানা সমস্যার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া অনেকে চিন্তাও করিয়াছে, অনেকে আনন্দিত হইয়াছে। তিনি নানা উপায়ে নানা বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি গীতিকবিতা, গীত, নাটক, রোমান্স, উপদেশ, প্লেটোনিক-কথোপকথন, সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ, শিশুদিগের জন্য আষাঢ়ে-গল্প, বৈজ্ঞানিক পুস্তক, দার্শনিক প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক, সকলই রচনা করিয়াছেন। ... সকলের প্রতি

প্রভাব।

কোনটাই প্রথম শ্রেণীর রচনা নহে; এবং কতকগুলিকে 'ভাল নয়'ও বলা যাইতে পারে। তবে তাঁহার রচনা সাধারণের রুচি ও ধারণার মর্ম্মস্থলস্পর্শী; কাজেই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া পাঠককে চিন্তা করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রচুর ক্ষমতা, তীক্ষ্ণতা এবং সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। কাজেই, তিনি ভবিষ্যৎবক্তা বা সাহিত্যগুরুদিগের দলস্থ না হইলেও, তাঁহার সময়ের পাঠকদিগের উপর তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভাবিত নহে।

কিংস্‌লির প্রায় সকল কল্পনাসঞ্জাত পুস্তকই তর্কবহুল; সে সকলে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং জাতি সম্বন্ধে তর্ক দেদীপ্যমান; সেই জন্যই সে সকল পুস্তক তত ভাল হয় নাই। সে সকল গ্রন্থ কৌতূহলোদ্দীপক, সে সকলে তেজ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অভাব নাই। তবে ইহাই আশ্চর্য্য যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা কেবল তর্কবহুল পুস্তিকামাত্র, তাহারই মধ্যে তিনি এত সৌন্দর্য্য, এত কল্পনা সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে "Hypatia"ই বিশেষ প্রশংসিত। "Westward Ho!"ও সুন্দর ঐতিহাসিক রোমান্স। প্রথমোক্ত গ্রন্থের অনেক ভ্রম ইহাতে নাই; ইহাতে পরিপক্কতা পরিস্ফুট, এবং ইহা অধিকতর যত্নের সহিত লিখিত। কিংস্‌লি যে খুব উচ্চ দরের ঔপন্যাসিক, এ কথা না বলিলেও ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে এমন অনেক দৃশ্য—বিশেষতঃ বর্ণনাপ্রধান দৃশ্য আছে, যে সকলে সাহিত্যাঙ্কনক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ের কোন রোমান্সেই সে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণনা সন্নিবেশিত হয় নাই। "Two Years Ago"তেও কয়টি সুন্দর দৃশ্য আছে; তবে এই গ্রন্থে, যে সকল গুণ বা দোষ কিংস্‌লির বিশেষত্ব, সে সকলের কিছুই নাই। কিংস্‌লির অন্যান্য কল্পনাসঞ্জাত গ্রন্থের মধ্যে, প্রকাশের চল্লিশ বৎসর পরে, এখনও "The Heroes" শিশুদিগের গ্রীকপুরাণের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়, এবং গ্রন্থখানি ঐ শ্রেণীস্থ গ্রন্থ সকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কিংস্‌লির সকল উপন্যাসই অল্পাধিকপরিমাণে রাজনীতিজড়িত। লেখক তন্মধ্যে "Yeast"এরই অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকারের কতকগুলি সুন্দর কবিতা, কতকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যচিত্র, প্রভূত উজ্জ্বল চিন্তা, স্থিরীকৃত ধারণা, যৌবনাবেগ ও উৎসাহের প্রথম অরুণরাগ সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বলিয়াই ইহা সাহিত্য-শিল্পের হিসাবে "Alton Locke" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে সংবাদপত্র বা প্রবন্ধের গন্ধ নাই, ইহাতে তেমন আকস্মিক তাড়না নাই, ইহা কবিতাপূর্ণ। গ্রন্থকার নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের বিষয় ভাল জানিতেন। "Yeast" পল্লীগ্রামের কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে যে সকল সামাজিক দোষ সত্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী সেই সকলই আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে কোন কল্পনাসৃষ্ট শ্রমজীবী বা ধনিসন্তান, ধর্ম্মযাজক বা শিকার-চোরের চিত্র চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থকার যাহা জানেন, তাহাই লিখিয়াছেন, আর যাহা অনুভূত হইয়াছে, তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি চিত্রই অত্যন্ত সুন্দর। পুস্তকের রচনাপ্রণালী চমৎকার নূতন; প্লেটোনিক কথোপকথন ও কার্লাইলের ধরণের পুস্তিকা একত্র মিশাইয়া, সেই মিশ্রণোৎপন্ন জিনিসটা আবার জর্জ্জ ইলিয়টের সাইলাস্ মার্ণারের মত গ্রাম্য রোমান্সের ছাঁচে ঢালিয়া ইহা রচিত; মধ্যে মধ্যে আবার উপদেশ, সুন্দর গাথা ও রাজনৈতিক আলোচনারও অভাব নাই। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে এখনও পুস্তকখানি বারবার পাঠ করিলেও বিরক্তি জন্মে না। "Alton Locke" অবশ্যই জনসাধারণের অধিক প্রিয়। কিন্তু লেখক সাহিত্যশিল্পহিসাবে

রাজনৈতিক উপন্যাস।

লেখক বলেন যে, কবি হিসাবে কিংসলির স্থান অনেকটা উচ্চে। তাঁহার কবিতাগুলি মধুর ও প্রাঞ্জল। তিনি যে সকল গীত রচনা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে দুই চারিটি এতই

কবিতা।

চমৎকার যে, টেনিসনের গীতগুলিও সে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয়। "The Sounds of Dee" ও "The Three Fishers"এর কথাই ধরা যাউক। যদি এই দুইটি গীত কবিতাহিসাবে অত্যুৎকৃষ্টও না হয়, তবুও যখন এই দুইটি গীত মধুর কণ্ঠে করুণ মধুর স্বরে গীত হয়,তখন তাহার তুলনা কোথায়? শেষোক্ত গীতটি কি সুন্দর! সমুদ্রের জলে তরী ভাসাইয়া সেই ত তিন জন ধীবর চলিয়া গেল, তিন জনেই পত্নীর কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। ব্যয় অল্প নহে, উপার্জ্জন অধিক নহে,— তাহারা চলিয়া গেল; শিশুরা দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহারা চলিয়া গেল। তিন জনের পত্নী ব্যাকুলহৃদয়ে বসিয়া রহিল। সাগরের উন্মত্ত বারিরাশির গর্জ্জন আর বৃষ্টিপাত শব্দ তাহাদের শ্রবণে আসিতে লাগিল। হায়! "মানব করিবে কর্ম্ম, রমণী কাঁদিবে শুধু।" তাহার পর যখন স্রোত সরিয়া গেল, তখন সেই রজতধবল সৈকতশয়নে শয়ান তিনটি মৃতদেহের উপর অরুণাভা নিপতিত হইল। আর যাহারা আর নগরে ফিরিবে না, তাহাদের জন্য মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহাদের পত্নীরা কাঁদিতে লাগিল।

জীবনের শেষ পনের বৎসরে তিনি রাশি রাশি বক্তৃতা,উপদেশ,গল্প,ভ্রমণবৃত্তান্ত, কবিতা, কথোপকথন, শিশুদিগের জন্য কল্পিত গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, স্বাস্থ্যোন্নতিসম্বন্ধীয়, সমাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রাশীকৃত রচনায় সেই পূর্ব্বরচিত উপন্যাস গাথা ও কবিতার অপূর্ব্ব প্রতিভাচ্ছটা নাই। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে সেই প্রতিভার দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইল।

দুটি সনেট।

নারী।

শুভ্র দুই চক্ষু মুদি' কোন্ প্রাতে উঠি'
হরিরে স্মরণে ল'য়ে পুণ্যময়ী সতী
গৃহকর্ম্মপানে ধাও,—স্নেহ-আঁখি দুটি
করুণা-কাতর ফিরে সবাকার প্রতি!—
স্নেহধন ধেয়ে আসে, দাও মুঠি মুঠি
স্নেহভক্ষ্য,—বক্ষাঞ্চল ভূমে পড়ে লুটি',
স্নেহ যেন ঝরে' পড়ে বসন-আধারে!—
বেলা বেড়ে যায়, তুমি মাথা রাখি বুকে
অতিথির তরে বসে', অন্ন নাহি মুখে!—
স্নেহ কর, সেবা কর, সরস শ্যামল
কর সংসার-অন্তর,—সুন্দর সফল
সতী জীবন তোমার; মরণ তোমারে
ব্যথা নাহি দেয়, সে ত শয়ন-সুন্দর
নিরলস জীবনের ক্ষণ অবসর!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিশু।

অশরীরী আনন্দের ক্ষুদ্র এক কণা,
তৃপ্তির অধরচ্যুত এক বিন্দু হাসি,
আপনে আপনি মগ্ন এত আনমনা
ভুলে কি ধরার গেহে ফুটিয়াছ আসি?
বিহগের নভঃপ্লাবী স্বর মধুময়,
বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে জোছনা অঞ্চল,
আকুল সৌরভ-ভরা কুসুম-হৃদয়,
প্রেমের আলোকে দীপ্ত নয়ন চঞ্চল,
শোকমুক্ত হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
স্তব্ধ রাতে দূরাগত বাঁশরীর গান,
সন্ধ্যার ললাটে স্নিগ্ধ তারকাপ্রকাশ,
কি আছে জগতে বল তোমার সমান?
ব্যথিত কাতর হৃদি জুড়াবার তরে
ভুলে কি ফুটেছ আসি এ আঁধার ঘরে?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক,—একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, "সাধনা" অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্যসংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া "সাধনাকে" সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাহার পর "সাধনা" ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা "সাধনার" বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধনা" বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয়, বাঙ্গালীপাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে "সাধনা" বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে "সাধনার" মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায়, সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য!

এবারকার "সাধনার" প্রথমেই সম্পাদকের রচিত "বিদ্যাসাগর-চরিত",—এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যপ্রকাশ সম্ভাবিত নহে। আমরা কেবল এ জন্য লেখকের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যে দিন এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর-স্মরণার্থ-সভায় প্রথম পঠিত হয়, সেই দিন সভাপতি শ্রীযুত জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য রবীন্দ্র বাবুকে সভাস্থলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জীবনচরিতের আলোচনায় যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, উদার সহানুভূতি, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, উন্নত বর্ণনাকৌশল ও পরিণত লিপিকুশলতার আবশ্যক,—রবীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে। তিনি বিস্তৃত জীবনচরিতের রচনায় হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা লাভ করিবেন, মনে করি। "তুকারামের অভঙ্গ" একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। ইহাতে তুকারামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহার কতিপয় 'অভঙ্গের' অনুবাদ আছে। অনুবাদে একটু নূতনত্ব এই যে, তুকারামের মূল অভঙ্গগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বলিয়া অনুবাদও অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, অমিত্রাক্ষরের স্রোত ক্ষুদ্র কবিতার শেষে আসিয়া সহসা বিরত হয়,—তখন আর তাহার মাধুর্য্য পাওয়া যায় না;—যাহা হউক, ইহা এখনও পরীক্ষাধীন। "বৈদিক উপাখ্যান" একটি সংগৃহীত প্রবন্ধ। "অ্যাংলোবাৎসল্য" নামক প্রবন্ধটি বিলক্ষণ সময়োপযোগী, এবং যাঁহাদের জন্য কল্পিত, তাঁহাদের অত্যন্ত উপকারী হইবে। বর্ত্তমান লেখক যাঁহাদের 'অ্যাংলোবৎসল' সংজ্ঞা দিতেছেন, কিছু কাল পূর্ব্বে এক জন লেখক তাঁহাদিগকেই 'ইঙ্গ-বঙ্গ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। "সম্পদব্রত" চলিত কথায় রচিত একটি ব্রতের ইতিহাস বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ব্যাপারটি কি, আমরা ভাল বুঝিতে পারি নাই। এই সংখ্যায় "লক্ষ্মীবাই" সমাপ্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। "সিরাজদ্দৌলা" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে; লেখক পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে জানেন, এবং তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, মনোরম ও বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সিরাজের বাল্যজীবন বিবৃত হইয়াছে। "নিবেদন" একটি মিষ্ট কবিতা। "অতিথি" একটি গল্প। লেখক ইহাতে একটি ধারাবাহিক পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্রশালার মধ্যে একটি সকলবন্ধনহীন সংসার-

সন্নিবেশে যেমন শ্রব্য গানের সৃষ্টি হয়, তেমনই বিবিধ বর্ণবিন্যাসে 'দৃশ্য-সঙ্গীত' উৎপন্ন হইতে পারে, ইয়ুরোপে সম্প্রতি এই এক নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইতেছে। "পাঞ্চভৌতিক সভায়" বৈজ্ঞানিক কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে। "নন্দোৎসব" একটি সুন্দর স্বভাবানুগত চিত্র।—লেখক পর্ব্ব ও উৎসবগুলির এইরূপ ছবি আঁকিয়া ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমান বাঙ্গালীর উৎসবানন্দের একটা স্থায়ী ইতিহাস রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কালস্রোতে সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—ভবিষ্যতের জন্য অতীতের চিত্র সর্ব্বত্রই আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। "উপাসনার প্রকারভেদ" প্রবন্ধের নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। "ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক" প্রবন্ধে লেখক উক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। "আমরা ও তোমরা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার 'প্যারডি';—হাস্যজনক বটে। "ধারাস্নান" একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনী; মন্দ হয় নাই। "বহুপত্যাত্মক বিবাহ" প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট। সচরাচর এরূপ সুলিখিত ও সুসজ্জিত প্রবন্ধ দেখা যায় না। 'বহুপত্যাত্মক বিবাহ' সম্বন্ধে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল এই প্রবন্ধে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। "নগর-সংগীত" একটি কবিতা। এই কবিতাটি 'মিলের' জন্য প্রসিদ্ধ হইবে,—কবিতার প্রতি 'ভাগের' তিনটি চরণের শেষ অক্ষর যুক্তবর্ণ, এবং যুক্তবর্ণ দিয়াই তাহা মেলান হইয়াছে;—যেন যুক্ত-বর্ণ পালোয়ানেরা 'মিলের' জন্য 'কুস্তি' করিতেছে।—এরূপ স্থলে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে;—শব্দের লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত কোমল ভাব-শিশু এমনই বন্দী হইয়া আছে যে, ইহজীবনে আর তাহার স্ফূর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, উভয়ে প্রফেসর হক্সলির বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দুইটিই পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "গীতার প্রামাণ্য"—তৃতীয় প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ গুপ্তের "ঋগ্বেদের দার্শনিক তত্ত্ব"—দ্বিতীয় প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি"—চতুর্দ্দশ প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বোধানন্দ স্বামী সরস্বতী "প্রতিবাদ" নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"চতুর্থ বৎসরের 'সাহিত্যে' কামাখ্যা বাবুর এই প্রতিবাদ পড়িয়া হীরেন্দ্র বাবু একটু ভাসা রকম জবাব দেন; শুনিয়াছি, কামাখ্যা বাবু তাহারও প্রতিবাদ করেন; কিন্তু সেই সময়ে সাহিত্যপতি বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু হওয়াতে, কামাখ্যা বাবুর প্রস্তাবানুসারে, 'সাহিত্য-সম্পাদক' মহাশয় ও কামাখ্যা বাবু একমত হইয়া, সে প্রতিবাদ পত্রস্থ করেন নাই। এখন এত দিন পরে, হীরেন্দ্র বাবু সেই কথা পুনরুত্থাপন করিয়া, একেবারে 'মোসাহেবি' ধরণের মীমাংসা সমেত পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন, অথচ 'সাহিত্য-সম্পাদক' মহাশয় জানিয়া শুনিয়া কামাখ্যা বাবুর প্রতিবাদের নামটি পর্য্যন্ত লন নাই;" যিনি অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার কথার উত্তর লিখিলে, অভদ্রতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে কামাখ্যা বাবু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার উ[illegible] দিয়াছি। এই মাসের "সাহিত্যের" স্থানান্তরে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র-রহস্য" নামক প্রস্তা[illegible] পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সরস্বতীর কৃত অভিযোগের কোনও মূল না[illegible] স্বামী সরস্বতী তাঁহার প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কোনও ভদ্র লেখকে[illegible] উপযুক্ত নহে।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

নবদ্বীপ নগরে জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন দরিদ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। জগন্নাথের ঔরসে শচীর গর্ভে বিশ্বম্ভর মিশ্রের জন্ম হয়। ইনি চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত হয়েন। বাল্যকালে তাঁহাকে সকলে নিমাই বলিয়া ডাকিত। তিনি অধ্যাপকের বৃত্তি অবলম্বন করিলে নবদ্বীপে 'নিমাই পণ্ডিত' নামেই সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর মিশ্র, অন্যথা নিমাই পণ্ডিত, অন্যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, তৎকালীন কতক লোকে একজন ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তিনি দেখিতে গৌরবর্ণ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কখনও কখনও তদীয় অনুচরেরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াও উল্লেখ করেন।

অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া এক্ষণকার কালেও যে একবারে অসম্ভব, তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলে এক্ষণেও যে দুই এক জন অবতার না পাওয়া যায়, তাহা নহে। প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, তমলুক মহকুমায় আমি এক কল্কি-অবতার দেখিয়া আসিয়াছি। মাণিককালী নামে একজন অতি-কদাকার কৃষ্ণত্বক্ গোদা কুম্ভকার জলামুঠা পরগণায় আপনাকে কল্কির অবতার বলিয়া খ্যাপন করিলে, তাহার দুই তিন সহস্র শিষ্য তাহাকে তদ্রূপ বলিয়া পূজা করিয়াছিল। বিশ্বম্ভর মিশ্রের অন্ততঃ গৌর বর্ণ ছিল, জলামুঠার কল্কিমহাশয়ের তাহাও নাই। আবার সে দিন দেখিতে দেখিতে ঈশ্বর না কি পরমহংস সাজিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, শুনিতে পাই!

ফলতঃ একবারে অসম্ভব না হইলেও, এক্ষণে ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষিত সমাজে ঈশ্বরের কাচ কাচা কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশ যখন মুসলমান রাজত্ব বা অরাজকের অধীন ছিল, যখন প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যার জ্যোতিঃ দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছিল, যখন ব্যাকরণ পড়িয়া লোকে পণ্ডিত হইত, এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন

অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে মনুষ্যকেও ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি হওয়া ততদূর অসম্ভব ছিল না। বিশ্বম্ভর মিশ্রের জীবনবৃত্তান্তে আমরা সেই অতীতের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। অদ্য আমরা সেই চিত্র কীদৃশ, তাহারই কিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বাঙ্গলা দেশে ইংরেজাধিকার অদ্য দেড় শত বৎসরেরও অধিক হয় নাই। এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে নূতন রাজার প্রতাপে নূতন সভ্যতার সংঘর্ষে এদেশে কিরূপ সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই রামমোহন আবির্ভূত হইয়া গৌরাঙ্গকে একবারে না হউক, অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। যে সমাজবিদ্রোহীর দল বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গপদবীর অনুসরণ করিয়াছিল,—তাহারা আর

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অদ্য এ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত নহে। কেবল 'নাম ভজ, নাম জপ' এ বিশ্বাস উড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা জাতিভেদকে দোষ বলিয়া মনে করেন, ভক্ষ্য দ্রব্যকে আত্মরুচির শেষ সীমা অবধি টানিয়া লইয়া যাইতে চান, এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মকে ভ্রান্ত ও ব্রাহ্মণপন্থাকে অসৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, রাধাকৃষ্ণের নামেও তাঁহাদের হুঙ্কার উপস্থিত হয়। মহরমের দেখাদেখি যে সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি, সে সঙ্কীর্ত্তনের যুগ বোধ করি চলিয়া গেল। এখন গির্জ্জায় খ্রীষ্টভজনার অনুকরণে নূতন ব্রাহ্ম উপাসনার যুগ উপস্থিত। দেড় শত বৎসরের মধ্যেই এই ব্যাপার। প্রায় ত্রিশতবর্ষব্যাপী মুসলমান অধিকারের ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা পাঠককে অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখ্তিয়র খিলজীর পাঠানেরা নবদ্বীপ ও গৌড়রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া এ দেশের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। তাহারা আর এ দেশ হইতে চলিয়া গেল না। তাহাদের ঔরসে এদেশীয় স্ত্রীলোকের গর্ভে মুসলমান প্রজার উৎপত্তি আরম্ভ হইল। অনেক লোক তাহাদের বলপ্রয়োগে জাতি হারাইয়া মুসলমান হইল; অনেকে বা মুসলমান হইলে লাভ আছে দেখিয়া মুসলমান হইল; দুই এক জন বা প্রতিমা ও নানা দেবদেবীর পূজা বাস্তবিকই পাপ মনে করিয়া আল্লা ও তাঁহার নবির শরণাপন্ন হইল।

অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক হইয়া দাঁড়াইল। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যেরাও অনেকে ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতে লাগিল। উত্তর বঙ্গেই এই ঘটনা সমধিক ঘটিয়াছিল। বৈদ্যজাতীয় রাজা গণেশের পুত্র মহারাজ যদুসেন, মুসলমানদের রাজা হইয়া মুসলমান হওয়াই শ্রেয় বিবেচনায়, সুলতান জেলালুদ্দীন নাম ধারণ করিলেন, এবং তিনি এক জন গোঁড়া মুসলমান হইয়া হিন্দুদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন।—বিবেচক ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রশান্ত সাত্ত্বিকধর্ম্মের সহিত বিজেতা দস্যুদলের প্রচণ্ড রাজসিক ধর্ম্মের তুলনা করিয়া তাহাতে বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাইলেন না। মুসলমানদের দাম্পত্যধর্ম্মের যথেচ্ছাচার এবং জীবহিংসা, বিশেষ গোহত্যা, তাঁহাদের চক্ষে অতীব হেয় বিবেচিত হইত। মুসলমানদিগকে বাহুবলে বলীয়ান্ দেখিয়াও ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-অনুচরেরা তাহাদের আচার ব্যবহার জঘন্য বলিয়া তৎপ্রতি পরাঙ্মুখ থাকিলেন। এইরূপে ব্রহ্ম-পন্থী ও মহম্মদ-পন্থী-দের মধ্যে বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। মুসলমানেরা ব্রাহ্মণদিগকে হিন্দু ও 'কাফের' বলিয়া অবজ্ঞা করিত; ব্রাহ্মণেরাও তেমনি তাহাদিগকে 'ম্লেচ্ছ' ও 'নীচ' বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু ম্লেচ্ছ' ও 'নীচ' দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তাহারা মনে করিলেই ব্রাহ্মণের মন্দির ভাঙ্গে, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করে ও জাতি লয়। ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রতিশোধ দিতে বা প্রতীকার করিতে অক্ষম। অনেক শ্রেষ্ঠ কুলীন পরিবারেও যবনসংস্পর্শদোষ পঁহুছিতে লাগিল। দেশে এক প্রকার হাহাকার পড়িয়া গেল; ব্রাহ্মণদের চক্ষে কলি-যুগ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল; অমানিশার অন্ধকারের ন্যায় দেশব্যাপী বিষাদের ছায়া চারি দিক ছাইয়া ফেলিল; সুখ দুঃখের সংসার ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে যেন বিমিশ্র ক্লেশের আগারে পরিণত হইল; লোকের মন উদাসীন ও বৈরাগ্য প্রবণ হইল। এইরূপ বিশ্বাসের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-সমাজ কি প্রকারে রক্ষা পাইল, ইহাই বিচিত্র।—ফলতঃ রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু যে প্রজ্ঞা ও পৌরুষ মানবের অভ্যুদয়ের মূল কারণ, তাহার প্রভাব দিন দিন উপক্ষীণ হইতে লাগিল। বখ্‌তিয়রের আগমনের তিন শত বৎসর পরে ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত বাঙ্গালী সমাজ, মৃত না হইলেও, মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল।

১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াসসাহী বংশের শেষ রাজা

শকাব্দে) নিমাই পণ্ডিতের জন্ম হয় বলিয়া কথিত আছে। এই রাজা স্বীয় হাব্‌শী সৈন্যগণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার রাজপুরীর প্রধান খোজা বারিক সুলতান সাহজাদা উপাধি ধারণ ও তদীয় সিংহাসন অধিকার করিল। রাজ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পর মুক্ক-আণ্ডীন নামে হাব্‌শী সেনাপতি বারিকের প্রাণ সংহার করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি সুলতান ফিরোজশা হাব্‌শী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। তৎপুত্র মামুদশাও বিদ্রোহী ভৃত্যের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। এই ভৃত্যের নাম সিদ্দী বদরদিওআনা। তাহার প্রকৃতি রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ ছিল, এবং তদীয় অত্যাচারে দেশশুদ্ধ লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে,—যখন নিমাই পণ্ডিতের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর,—তখন সৈয়দ হুসেন নামক বদরদিওআনার প্রধান অমাত্য বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচারী প্রভুর প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বয়ং তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং কিছু-কালের জন্য বাঙ্গলা দেশে শান্তি পুনঃসংস্থাপিত করেন।

চৈতন্যের বাল্যে এই সকল লোমহর্ষণ যুদ্ধবিপ্লব সংঘটিত হয়। কিন্তু তদীয় ভক্ত জীবনচরিত-লেখকেরা তাহার কোনও উল্লেখ করেন না। ফলতঃ, চৈতন্যের জীবনের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই সকল ঘটনার কোনও বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়াও বোধ হয় না। তবে দেশে এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ অরাজক অত্যাচার ও দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ জন্মিয়াছিল, জানা যায়। চৈতন্যের ভক্ত জীবনচরিত-লেখকেরা তাঁহার জন্মকালে যে সকল সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা। তিনি হরিনাম সঙ্গে লইয়া ভূমিষ্ঠ হউন বা না হউন,—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব ও জনপদপীড়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সৈয়দ হুসেন রাজা হইয়া সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহা নামে বিখ্যাত হয়েন। ইনি এক জন অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইহার জীবনবৃত্তান্ত তাদৃশ পরিস্ফুটরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি সৈয়দ-বংশোদ্ভব হইয়াও বাল্যে একজন ব্রাহ্মণের গরুর রাখালমাত্র ছিলেন।—তজ্জন্য উত্তরকালে তিনি রাখাল বাদসা নামে পরিচিত হয়েন। আজিও মালদহ জেলায়—যথায় তাঁহার রাজধানী ছিল,—তাঁহাকে এই নামে উল্লিখিত হইতে শুনিয়াছি। তৎপ্রদেশে তাঁহার নাম আজিও সমধিক বিখ্যাত।

মুসলমান ছিলেন; এবং কোনও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় জাতিভ্রষ্ট গর্ভধারিণী সহায়হীনা হইয়া পড়িলে, হুসেন স্বগ্রামের কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে গরুর রাখালিতে নিযুক্ত হয়েন। নতুবা সে সময়ে খাঁটি সেখ বা সৈয়দের বেটা যে ব্রাহ্মণের গরুর রাখালি করিবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। মুসলমান-সংসর্গে তৎকালে অনেক স্ত্রীলোকের জাতি যাইত। এবং ঈদৃশ অবস্থায় হীনজাতীয় দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা উভয় সমাজেরই এক প্রকার বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইত। ফলতঃ ত্রিশতবর্ষব্যাপী মুসলমান রাজত্বের ফলে এ দেশে এক জাতীয় নীচ মুসলমানের উৎপত্তি হয়। রাখাল হুসেন প্রথমে এইরূপ এক জন নীচ মুসলমান ছিলেন। এই শিশুর ললাটে বিধাতা কিরূপ সমৃদ্ধি লিখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বয়োবৃদ্ধি হইলে রাখালি তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আপনাকে এক জন সৈয়দের বেটা বলিয়া চিনিতে পারিলেন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে নানা উচ্চ আশার প্রভাব বিস্তৃত হইল। তিনি গ্রাম ছাড়িয়া তৎকালীন রাজধানী গৌড়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ বা সুবুদ্ধি রায় নামে জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজসরকারে রাজস্ববিভাগে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, হুসেন রাজধানীতে আসিয়া এই সুবুদ্ধি খাঁয়ের অধীনে কোনও এক সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েন। সুবুদ্ধি খাঁ একটি জলাশয় খনন করাইতেছিলেন, হুসেন তাহারই তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার কোনও দোষদর্শনে রুষ্ট হইয়া, তদীয় প্রভু তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে কঠিন বেত্রাঘাত করেন; হুসেন যখন রাজা হয়েন, তখনও তাঁহার শরীরে এই বেত্রাঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এইরূপ দুরবস্থা হইতে তিনি ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকেন। চাঁদপুরের এক কাজী সাহেব তাঁহার পরিচয় পাইয়া, অর্থাৎ তাঁহাকে সৈয়দের পুত্র জানিয়া, আপন কন্যা দান করেন;—এবং ইহার পরই তাঁহার উন্নতির দ্বার অপাবৃত হয়। হিন্দুর পক্ষে জাতি ও কুল যেরূপ উন্নতির বাধাদায়ক হয়—মুসলমানের পক্ষে তদ্রূপ হয় না। মুসলমান মাত্রেই সমান। দাসত্ব হইতে সিংহাসনে হাত বাড়াইলেই মুসলমানে অনেক সময়ে পায়। তিনি ভদ্রসমাজে স্থান পাইয়া ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন, এবং স্বীয় বুদ্ধি ও শৌর্য্য বলে গৌরবান্বিত হইয়া অবশেষে রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হয়েন। ইহাতে তাঁহার ঈদৃশ

কোন রাজার আমলে তিনি প্রথমে প্রধান অমাত্যের পদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঠিক জানা যায় না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ে রাজধানীতে ঘোরতর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপ সময়ে প্রতিভাশালী দক্ষ লোকের উন্নতির বড় সুবিধা। বাপের বেটা হইয়া কেহ এমন সময়ে বড় কল্কে পায় না। জমীদারের ছেলে দেখিতে দেখিতে লুটপাটে এক দিনে দরিদ্র হইয়া যায়; দরিদ্রের পুত্র শৌর্য্যবীর্য্যশালী হইলে দশের নেতা হইয়া এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইয়া উঠে। হুসেনের ভাগ্যেও তাহা ফলিয়াছিল। তখন কে কবে রাজা হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা এক জনকে বা সিংহাসন দিতেছিল, এক জনকে বা সিংহাসন হইতে টানিয়া ফেলিতেছিল। হুসেন সম্ভবতঃ সৈনিকবেশে রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়া আপন পৌরুষ দেখাইয়া নায়কের পদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং নায়ক হইতে অমাত্যের পদ লাভ করেন। যাহা হউক, সিদ্দী বদরদিওআনা যে সময়ে রাজা ও সৈয়দ হুসেন তাঁহার প্রধান অমাত্য, তখন রাজার নৃশংস অত্যাচারে উদ্বেজিত হইয়া রাজ্যের অনেক প্রধান প্রধান লোকে প্রধান অমাত্য হুসেনের শরণাপন্ন হয়। হুসেন নিজে উৎপীড়ক বা অন্যায়কারী ছিলেন না;—প্রভুর উৎপীড়ন ও অন্যায় কার্য্য দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকিবে।—অবশেষে ঈদৃশ প্রভুকে বিনাশ করিয়া তাঁহার স্থান অধিকার পূর্ব্বক অত্যাচারের স্রোত নিবারণ করা হুসেনের চক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং দেশের অনেক লোকে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল।—হুসেনের সেনা গৌড় নগর অবরোধ করিল।—সিদ্দি বদর দিওআনাও সৈন্য সামন্ত লইয়া সম্মুখসংগ্রামে অগ্রসর হইল, এবং এক ভীষণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র লোকের সহিত ধরাশায়ী হইয়া নিজ প্রাণবায়ু আকাশে উড়াইয়া দিল।

ইহার পর, যে সকল সৈনিকের সাহায্যে হুসেন সিদ্দি বদরদিওআনাকে পরাস্ত করিলেন—তাহারা উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে, হুসেন তাহাদের অনেকের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনার প্রভুশক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন। লোকে দেখিল, তিনি রাজার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন। তাঁহার ক্রোধ যেমন ভয়ঙ্কর, তাঁহার প্রসাদ তেমনি শুভঙ্কর। তিনি যথাস্থানে দণ্ড ও দান মান বিস্তার করিয়া আপন সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিলেন। তিনি

তাঁহার সুশাসনে হিন্দু মুসলমান শান্তি সুখ ভোগ করিতে লাগিল। হুসেন সাধু মুসলমানের ন্যায় হিন্দুর মন্দির ভগ্ন ও দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিতে বিরত ছিলেন না। প্রত্যুত, তাহা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। সে সময়ে তাহা অত্যাচার বলিয়াই গণনীয় ছিল না।—হিন্দুদের বহুকাল 'গা সওয়া' হইয়া গিয়াছিল।—কিন্তু তিনি হিন্দুদের উপর হিন্দু বলিয়া বিশেষ বিদ্বেষবান্ ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি আপন বাল্য-প্রভু ব্রাহ্মণকে এক জমীদারী প্রদান করেন, এবং তিনি অনেক হিন্দুকে ভাল ভাল চাকুরিও দিয়াছিলেন। ফলতঃ, রাজস্ববিভাগের কার্য্য হিন্দুরা যেমন বুঝিত—মুসলমানেরা তেমন বুঝিত না। তাহাতে হুসেনের পূর্ব্ব হইতেই রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কার্য্যে হিন্দুরা নিযুক্ত হইত।—কিন্তু পূর্ব্বের বিদ্রোহবার্ত্তা স্মরণ করিয়া হুসেন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। রাজবাটীতে তাঁহার এক দল শরীররক্ষক রাজপুত বা মেশোআলী সৈন্য ছিল, এবং কেশব ছত্রি নামে এক জন ক্ষত্রিয় তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। মাধাইপুরের এক জন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি আপন "দবিরখানা" বা Private Secretaryর পদে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহারই ভ্রাতা আর এক জন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে সাকর মল্লিক উপাধি দিয়া আপন সভাসদ্ করেন। এই দুই ভ্রাতা হুসেন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ্য ত্যাগ করিয়া যবন হয়েন, এবং প্রজার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন; হুসেন তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দবিরখানাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সাকর মল্লিক পলাইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। এই দুই ব্যক্তি রাজসম্মান রাজপ্রসাদ হারাইয়া,—এক্ষণে জাতিচ্যুত হইলে লোকে যেমন ব্রাহ্ম হয়,—তদ্রূপ বৈষ্ণব হইয়া, গৌরাঙ্গের দলে প্রবিষ্ট হয়েন; এবং এক জন সনাতন গোস্বামী ও অপর জন রূপ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। "জাত হারালেই বৈষ্ণব" এই যে একটা কথা অস্মদ্দেশে জন্মিয়াছে, ঈদৃশ ঘটনাবলীই তাহার মূল।

হুসেনের এক সময়ের মনিব সুবুদ্ধি খাঁর কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই; যথা :—

পাছে যবে হুসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহ বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারনের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মরিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানী তাঁর মুখে দেয়াইলা॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণের চরণ পাইবে॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥
কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইলা।
প্রভুর লাগে না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল॥
রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচো পয়সা হয় একেক বোঝাতে॥
আপনা রহে এক পয়সায় চাবনা খাইয়া।
আর পয়সা বেনিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন॥
রূপ গোঁসাঞি আসি তাঁরে বহু প্রীত কৈল।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইল॥"

বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী যাহা শুনিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিতেন, বিশেষতঃ, বৈষ্ণবনিন্দা যমদণ্ডের হেতু বিবেচনা করিতেন। সুতরাং তদীয় বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা করা যায় না। হুসেন সাহার ন্যায় রাজা স্ত্রীর কথায় যে ঈদৃশ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। সুবুদ্ধি খাঁ বা সুবুদ্ধিরায়ের প্রকৃত নাম সুবুদ্ধি ভাদুড়ী। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। ইনি তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর দুই পুত্রের নাম জগদানন্দ ও কেশব। ইঁহারা যথাক্রমে জগদানন্দ রায় ও কেশব খাঁ নামে বিখ্যাত। (১) সুবুদ্ধি রায়ের পরিবারে আলিয়ারখানী নামে যবনদোষ ঘটে। (২) কি কারণে এই দোষের উৎপত্তি হয়, তাহা জানা যায় না। কুলজ্ঞেরা লিখিয়া গিয়াছেনঃ—"আলিয়ার খান যবন সুবুদ্ধি রায়কে দস্তবান করিয়াছিল।" ইহার অর্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। আলিয়ার খাঁ কে, তাহাও জানা যায় না। হুসেন সাহার সহিত এই বিবরণের কি সম্পর্ক, তাহাও জানা যায় না। তবে কৃষ্ণদাসের বিবরণের সহিত উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে এইরূপ বিবেচনা হয় যে, হুসেন সাহা রাজা হইয়া প্রথমতঃ সুবুদ্ধি রায়কে খুব বাড়াইয়াছিলেন,

কিন্তু তাঁহার কোন দোষ দেখিয়া অবশেষে হুসেনের আজ্ঞায়, আলিয়ার খাঁ নামক হুসেন সাহার কোন মুসলমান কর্ম্মচারী সুবুদ্ধি রায়ের অপমান করে, এবং তাহাতে তাঁহার জাতি যায়, এবং নিগৃহীত হইয়া তিনিও গৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হয়েন। বোধ হয়, সাকর মল্লিক, ওরফে রূপগোস্বামীর পলায়নের পর সুবুদ্ধি রায়ের লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। কেন না, রূপের দ্বাদশ বন চিনিবার পর সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, প্রকাশ পায়।

ফলতঃ, গৌরাঙ্গ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন লোকের ধনমান বড়ই অস্থির ছিল। অবস্থাচক্র সে সময়ে বড়ই প্রবল বেগে ঘূর্ণ্যমান ছিল। আজ যে ব্যক্তি রাজা, কাল সে ব্যক্তি পথের ভিখারী; আজ যে ব্যক্তি সম্মানিত, কাল সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হইত। সাংসারিক সমৃদ্ধির ঈদৃশ অস্থিরতা দেখিয়া বৈরাগ্যমার্গই অনেকের চক্ষে সমীচীন বোধ হইত। মুসলমান রাজত্বে আইন কানুনের বড় একখানা চলন ছিল না। যেখানে যে বলসঞ্চয় করিতে পারে, সেখানে সেই রাজা। দেশাধিপতিরা মনে করিলেই লোকের সর্ব্বস্ব লুট করিতে পারিত। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া চিরকালই তাঁহার অপবাদ আছে।—রাজ্যে কখন বা অরাজক, কখন বা যথেচ্ছাচারবশতঃ সে সময়ে তিনি কিছু অধিক চঞ্চলা হইয়াছিলেন। উচ্চপদ লাভ করিতে পারিলে, অধিকারী যে তাহা নিরাপদে দীর্ঘকাল ভোগ করিবেন, তাহার আশা কিছু কম ছিল।—To make hay while the sun shines,—ইহাই কর্ম্মচারীদের হৃদয়ের গুপ্ত বাসনা ছিল। এইরূপ অবস্থায় পদস্থ ব্যক্তিরা যত শীঘ্র সম্ভব অর্থসঞ্চয় করিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেন, এবং অনেকে দবিরখানা ও সাকর মল্লিকের ন্যায় ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইতেন।

রাজ্যের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের দশা কিরূপ ছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এখন আর হিন্দু রাজা নাই যে, ব্রহ্মত্র দিয়া ব্রাহ্মণের বিদ্যার সম্মান করিবে। হিন্দু রাজত্বের সামন্ত রাজারা এই সময়ে জমিদারে পরিণত হয়েন। এই জমিদারীও বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারেরা প্রায়ই লুণ্ঠিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন। ইঁহারাই ব্রাহ্মণদের উপজীব্য হইয়া ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করা ইঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।—স্মৃতিশাস্ত্র পড়িলে অগ্রে রাজার সভা-পণ্ডিত ও ধর্ম্মাধিকরণিক

এখনঃএকবারেই রুদ্ধ। এখন যদি কাহারও গরু গলায় দড়ি দিয়া মরে, তবেই স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের কিঞ্চিৎ তৈল‍বট লাভ হয়, এবং বিবাহে বা শ্রাদ্ধে পুরোহিতের যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্য। এখন মনু যাজ্ঞবল্ক্য পড়িবার লোকাভাব। এখন রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সঙ্কলনের আবশ্যকতা হইয়াছে। সুতরাং কেবল বামনাই যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের দশা উত্তরোত্তর হীন হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যার পুরস্কার ও গৌরব কম, সুতরাং অনুশীলনও কম।

ফলতঃ, এই সময়ে বিদ্যা বংশ ও ব্রহ্মচর্য্যের কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অস্মদ্দেশে কিঞ্চিৎবিদ্রূপসংযুক্ত একটি কবিতা প্রচলিত আছে; তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কবি যে একজন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবিতাটি এইঃ—

"চেয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর যারে করে সাথ॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী-ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী ছুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধুম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় সার॥"

গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ অতীব দরিদ্র ছিলেন, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে এই কথাই লেখা আছে; কিন্তু কিরূপে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত, তাহা লিখিত হয় নাই। জানা যায়, জগন্নাথের নিজের টোল ছিল না; কেন না, অন্যের টোলে গৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে, জগন্নাথ একজন ব্যবসায়ী অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন না। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট, এবং তাঁহার পিতার নাম কুবের মিশ্র। কুবের মিশ্রের সাত পুত্র; জগন্নাথ তাঁহাদের অন্যতম। সম্ভবতঃ। বিদ্যা-ভ্যাসের জন্য তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন,—এবং পিতার তাদৃশ বিষয় বৈভব না থাকায়, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই বসবাস করেন।

দরিদ্রের অনেক সন্তান কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। অন্নবস্ত্রের কষ্টের

গিয়াছিল। কেবল দুইটি সন্তান রক্ষা পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বড়টির নাম বিশ্বরূপ ও ছোটটির নাম বিশ্বম্ভর। অনেকগুলি সন্তান লইয়াছে বলিয়া, যমের মুখে তিক্ত বোধ হইবে বিবেচনায়, প্রতিবেশিনীরা শেষ পুত্রটির নাম রক্ষা করিলেন,—"নিমাই।" এই সরল বিশ্বাস আজিও আমাদের পুরবাসিনী-দের কোমল হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই।

বিশ্বম্ভর অপেক্ষা বিশ্বরূপ বয়সে অনেক বড় ছিলেন। পিতা মাতার সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই দেখিয়া, নিমাইএর শৈশবেই বিশ্বরূপ বিবেকী হইয়া বাহির হইয়া যান। পুত্রকে এইরূপে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাদের ক্রন্দনে শিশু নিমাইএর হৃদয়ও যে ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইরূপ আচরণ অবশেষে তাঁহারও আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, এবং তিনিও অব-শেষে মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যান। তদ্বিবরণ পরে সবিস্তার আলোচিত হইবে।

সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বিবেচনা হয় যে, উপভোগের জন্যই ঈশ্বর আমাদের জীবনের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবন অতি উৎকৃষ্ট আনন্দময় পদার্থ; তবে ইহা মধ্যে মধ্যে ক্লেশেও দগ্ধ হইয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, জীবনের আনন্দ আমাদের প্রযত্নে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং ক্লেশ আমাদের প্রযত্নে হ্রাস হইতে পারে। অতএব সমীচীন পদ্ধতি অনুসারে, কিসে আমাদের জীবন অপেক্ষাকৃত মধুময় ও ক্লেশবিহীন হইবে, ইহার উপায়-উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হওয়াই আমাদের পৌরুষ এবং মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, ইহাও স্বীকার্য্য যে, যাহাকে আমরা জীবন বলি, তাহা অনন্তকালস্থায়ী নহে। ইহার পূর্ব্বেও একটা জীবন ছিল, পরেও একটা আছে। পূর্ব্বে কি ছিল ও পরে কিরূপ হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই।—তবে পরজীবন যে এই জীবনেরই অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থা, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং এ জীবনে যাহা বিশুদ্ধ ও পবিত্র বলিয়া গণ্য, পরজীবনে তাহারই উপায়সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

তদনুসারে আমাদের দীর্ঘদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টি শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, জীবনের এই চতুর্ব্বিধ লক্ষ্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই জীবনে যদি অকর্ত্তব্যের পরিহার ও কর্ত্তব্যের আচরণরূপ ধর্ম্মসঞ্চয়, অর্থলাভ, এবং অভি-লাষের তৃপ্তির সহিত মোক্ষের অনুশীলন না করা হইল, তাহা হইলে বেদপন্থী-দের সমীচীন বিবেচনায় জীবন ব্যর্থ।

গৃহস্থাশ্রম ব্যতিরেকে সর্ব্বসামঞ্জস্যে এই চতুর্বর্গসাধনের উপায়ান্তর নাই। অতএব সন্ন্যাসীদের জীবন ব্যর্থ। পিতামাতার শুশ্রূষা, পুত্রকন্যার লালন-পালন, উপযুক্তরূপ শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠন, জীবনের পরম ধর্ম্ম। দাম্পত্য-প্রীতি জীবনের উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু। সন্ন্যাসী এ সকলেই বঞ্চিত। বৈধ-ভাবে অর্থ কাম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে অবৈধভাবে অনেক সময়ে তাহার সেবা করিতেও দেখা যায়।

সন্ন্যাসী যদি গাছের পাতা খাইয়া বন্য পশুর ন্যায় থাকিতে পারে, তবে সমাজের গলগ্রহ বলিয়া নিন্দনীয় হয় না, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে তাদৃশ নিন্দার ভাজন হয়। সে কাহার জন্য জীবনের ভার বহন করে, তাহা স্পষ্ট নয়। অন্য লোকে কেন যে তাহার উদরান্ন অর্জ্জন করিয়া দিবে, তাহাও সুব্যক্ত নয়। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই সন্ন্যাসের দোষ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের সমাজে, অন্ততঃ আধুনিক সমাজে, সন্ন্যাসী পূজ্য। ফলতঃ, শাস্ত্রে, মনুষ্য যখন অকর্ম্মণ্য হয়, তখন সন্ন্যাসের বিধান আছে, কিন্তু তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া শাস্ত্রে চিরকালই নিন্দনীয়,—অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রে।—বৌদ্ধেরা এই শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া তরুণ ভিক্ষু ভিক্ষুনীর দল বাড়াইয়া গিয়াছে।—তদবধি এ দেশে আর্য্যবিগর্হিত সন্ন্যাসের বাড়াবাড়ি।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবন নিষ্ফল হইল, শুকাইয়া গেল। তিনি জীবন্মৃত হইলেন। তাঁহার জীবনের যবনিকা এইখানেই নিপতিত। শিক্ষার দোষে, সময়ের দোষে, যেমন একটি ফুল প্রস্ফুটিত না হইয়া বৃন্তে শুষ্ক হইয়া যায়, এইরূপে তাঁহার জীবন বিকশিত হইতে না পারিয়া তেমনি শুকাইয়া গেল।

কেন বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইলেন?—তিনি দেখিলেন, সংসারে সুখ নাই। জনক জননী অন্নকষ্টে প্রপীড়িত, ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি অকালে মরিয়া গেল। নিজে ভাল খাইতে পান না, ভাল পরিতে পান না,—মান নাই, সম্ভ্রম নাই; দরিদ্র বলিয়া লোকে অবহেলা করে। এমন জীবনে সুখ কি? বিবাহ করিলে পিতা মাতার ন্যায় তাঁহারও একটি কষ্টের সংসার উৎপন্ন হইবে। তাহা অপেক্ষা তিনি ভাবিলেন যে, সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল—তাহাতে গৃহীর দ্বারে গেলেই উদরান্নের উপযুক্ত ভিক্ষা মিলে, লোকে ভক্তিও করে।

যে বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জনপূর্ব্বক যৌবনে গৃহী না হইয়া সন্ন্যাসী হইলে তাহাতে দোষ আছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে যদি তাঁহার উদরান্ন না জুটিত, তবে তাঁহার পক্ষে প্রথমে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, পরে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনীয় ছিল। তিনি সন্ন্যাসী না হইয়া যদি সৈনিক হইতেন, তবে আমরা প্রীত হইতাম, এবং তাঁহার জীবনকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিতাম। তাহাও অসম্ভব হইলে, যদি কৃষি বা বাণিজ্য অবলম্বন করিতেন, অথবা শিল্পের অনুশীলনে নিযুক্ত হইতেন, যে কোন রূপে—সমাজের প্রয়োজনীয় কোনও একটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতা মাতার শুশ্রূষা করিতেন, এবং তাহাদের অন্নকষ্টমোচনের উপায় করিতেন, তাহা হইলে প্রীত হইতাম।

বিশ্বরূপের জননী বৃথাই তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। সন্তান পিতা মাতার যত্নে, বিশেষ দরিদ্র পিতামাতার কষ্টের অন্নে লালিত হইয়া এই করিল যে, বাপমাকে কাঁদাইয়া এ অসময়ে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভক্ত বৈষ্ণবেরা যাহাই বলুন, ঈদৃশ ব্যবহার নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। ভাগবত পড়িলে যদি এমন ফল ফলে, তবে তাহা সমুদ্রে ফেলিয়া দাও!

পরান্নপুষ্ট অনাতুর সন্ন্যাসীরা স্বাবলম্বনে পরাঙ্মুখ বলিয়া ভদ্র ও শিষ্ট সমাজে কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবারই পাত্র। যখন ইহাদিগকে ভিক্ষার জন্য কপটতার ভেক ধারণ করিতে দেখা যায়, যখন ইহারা অজ্ঞলোকদিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া উদর পোষণ করিতেছে দেখা যায়, তখন ইহাদের উপর ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া থাকা যায় না।

গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনের বিবরণ শেষ হইল। এক্ষণে আমরা গৌরাঙ্গের জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করিব।—বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত আমাদের প্রধান অবলম্বন হইবে।

পাঠককে বলা বাহুল্য যে, আমরা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করি না। গৌরাঙ্গকে কেন, কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বর বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।—যাঁহারা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, যেন তাঁহারা এই প্রবন্ধ না পড়েন। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা রক্তমাংসে গড়া মনুষ্যের প্রকৃত জীবনকাহিনী অবগত হইয়া নীতিসংগ্রহের বাসনা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি জন্য এই প্রবন্ধ রচিত, এবং তাঁহারা যদি এই

গৌরাঙ্গ আপনার সময়ের এক জন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই ; অন্যথা তিনি এত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন কেন ? কিন্তু সকল বিষয়েরই দেশ কাল পাত্র আছে। যে যেমন ভক্ত, তাহার দেবতাও তাদৃশ। চৈতন্য অদ্য জীবিত থাকিলে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেন কি না, জানি না।—চৈতন্য কেমন লোক ছিলেন, ইহা দেখা যেমন আবশ্যক, তেমনি শ্রীবাসভবনে যাঁহারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেমন লোক, তাহাও যথাসম্ভব দেখা আবশ্যক হইবে।

চৈতন্যে আমরা ঈশ্বরত্বের কোনও চিহ্নই দেখিবার আশা রাখি না। যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্ধ বিবেক-শূন্য বিশ্বাসের সহিত অণুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য। তবে তাঁহার মনুষ্য-চরিত্রে প্রশংসা বা সহানুভূতির যোগ্য কিছু আছে কি না, আমরা বিশেষরূপে তাহারই অনুসন্ধান করিব। আর তিনি নিজে সজ্ঞানে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া খ্যাপন করিয়াছিলেন কি না—ইহারও আমরা অনুসন্ধান করিব। মনুষ্য দেখিয়া লোকের কিরূপেই বা ঈশ্বরভ্রম জন্মে, তাহাও আমাদের আলোচ্য হইবে। তিনি জগতে নূতন কোনও সত্যের প্রচার করিয়াছেন কি না, ইহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এবং মোটের উপর তাঁহার কার্য্যে, উপদেশে ও দৃষ্টান্তে আমাদের কোনও হিত বা অহিত সাধিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহাও বিবেচিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

ভাইফোঁটা।

চাঁদপুরের বাগ্‌চীদের মেয়ে চারুশীলা এবার অনেকদিন পরে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষেই তাহার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে আজ দুই বৎসর ভাইফোঁটা দেয় নাই, তাই শাশুড়ীকে লিখিয়া পাঠাইল, এবার ভাইফোঁটার আগে আর সে শ্বশুরবাড়ী যাইবে না ; শাশুড়ী

চারুশীলার বয়স এই সবে তের বৎসর। দেখিতে যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি মিষ্ট, মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে, এমন কোন কাজই নাই, যাহা সে পারে না; যদিও বাপের বাড়ী আসিয়া তাহার তিন বৎসরের ছোট ভাইটিকে কোলে পিঠে করিয়া, তাহার মুখে পুনঃপুনঃ চুম খাইয়া, একশত বার করিয়া তাহাকে বিভিন্ন রকমে সাজাইয়া তাহার দিন কাটিয়া যাইত, এবং দুই এক দিন অন্তরই তাহার ছোট বোন লক্ষ্মীর ঝাঁকড়া চুলের গোছা ও কতকগুলা গুছি লইয়া চুল বাঁধিতে বসিয়া বেলা দুইটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিজের পছন্দমত করিয়া চুল বাঁধিতে পারিত না, তথাপি রান্না হইতে সংসারের সকল রকম কাজেই তাহার দক্ষতা ছিল। তাহা ভিন্ন শান্তিপুরে তাহার শ্বশুরবাড়ী; সে তাহার ননদের কাছে একটু একটু গান গাহিতে শিখিয়াছিল, এবং কখন কখন তাহার বালিশের নীচে বিষবৃক্ষ বা বৌঠাকুরাণীর হাট দেখা যাইত।

চাঁদপুর গ্রামখানি বড় সুন্দর। বাগচীদের বাড়ী একেবারে গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত; বাড়ীর কাছে একটা প্রকাণ্ড দিঘি, এই কার্ত্তিক মাসেও দিঘিতে জল থৈ থৈ করিতেছে; সমস্ত গ্রামের মেয়ে পুরুষে এই দিঘিতে স্নান করে। দিঘির পর পারে গোচারণের মাঠ। রাখালেরা সেখানে গরু চরায়, গান করে, অদূরবর্ত্তী ছোলার জমীতে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছতলায় কপাটী খেলে, এবং কখন বা যে সকল খেজুর গাছে গাছিরা রসসঞ্চয়ের জন্য 'ঠিলি' বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ঝিল্লীরব-মুখরিত সন্ধ্যাকালে মাঠ হইতে ফিরিবার সময় সেই সকল ঠিলি খুলিয়া রস খায়, আর অন্ধকারে দৈবাৎ কলসীর মধ্যে নিহিত মানকচুর টুকরার সন্ধান না পাইয়া নিঃসন্দেহচিত্তে সেই কটু রস পান করিয়া সমস্ত রাত্রি মুখ চুলকাইয়া মরে!

দিঘির একপাশে একটা পোড়ো মাঠের উপর কতকগুলি বুনো আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। এই নূতন পল্লীখানির নাম 'বুনোপাড়া।' বুনোরা চাসবাস করে, গৃহস্থের বাড়ী কৃষাণ খাটে, বাড়ীতে শাক সব্জী লাগাইয়া তাহাও বিক্রয় করে। বুনোদের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী, অনেক সময় রেজাগিরি করিয়া ইহারা দু পয়সা উপার্জ্জন করে; কাহারও পাকা ইমারত প্রস্তুতের জন্য ঢেঁকিতে সুরকী কোটার নাম রেজাগিরি, এই কার্য্য বুনোদেরই একরকম একচেটিয়া। অনেক বুনো শুধু ঘরে বসিয়া [illegible]

পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বুনোদের বিবাহের সময় একটা চমৎকার আচার প্রচলিত আছে; বিবাহ শেষ হইলে বরটি ধীরে ধীরে একটা কুঁড়ের চালে চড়িয়া বসে, আর তাহার বিবাহিতা স্ত্রী সেই স্বামিরত্নকে আহ্বান করিয়া বলে :—

"চালে হ'তে নামো তুমি,
ঘুঁটে কুড়িয়ে পুষবো আমি।"

কোন কোন বুনো স্বামী স্ত্রীর এই অভয়বাণীকেই চিরজীবনের সম্বল মনে করিয়া এক পয়সাও উপায় করে না; শুধু কোন একটা উৎসব উপলক্ষে ধেনোমদ খায়, মাদল বাজায়, আর অন্যের দুর্ব্বোধ্য বিচিত্র সুরে গান গাহিয়া স্তব্ধ শান্তিপূর্ণ গ্রামে বর্গীর হাঙ্গামার মত একটা বিকট কলরবের স্রোত প্রবাহিত করে।

কালীপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বুনোদের মধ্যে এখনো মাদলধ্বনির বিরাম নাই।

চাঁদপুরের বাজার বেশী বড় নহে। সাহেবদের নীলকুঠি হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা গিয়াছে; এই রাস্তার ধারে খান কয়েক দোকান। কোন দোকানে কাপড় বিক্রয় হয়, ময়রার দোকানে মুড়ী, মুড়কী, সাধারণ রকমের সন্দেশ পাওয়া যায়, এবং একটা মুদীর দোকানে তেল, লবণ, লাল, নীল, সাদা, নানা রঙ্গের ফেটির সূতা, তামাক, সুপারী মসলাও বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে চারুর ঘুম নাই। কখন রাত্রি পোহাইবে, কতক্ষণে সে ভাইফোঁটার আয়োজন করিবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। অনেক রাত্রে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিক ফরসা হইবামাত্র চারুর ছোট বোন লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাজী হাতে লইয়া ফুলবাগানে ফুল কুড়াইতে গেল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতেই যমপুকুর পূজা করিবার নিয়ম—সে এবার পুকুর পূজা করিতেছে; তুলসীতলায় একটা ছোট পুকুর কাটিয়াছে, পুকুরের মধ্যে জল ঢালিয়া তাহাতে হেলেঞ্চা কল্‌মীর লতা পুতিয়াছে, পুকুরের পাড়ে হলুদগাছের চারা লাগাইয়াছে, এবং মুগকলাই ছিটাইয়া দিয়াছে; মুগকলাইয়ের নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, এখনো পাতা গজায় নাই; পাছে ছাগল কি গরুতে তাহার সাধের পুকুরের লতা পাতাগুলি খাইয়া যায়, কি কোন ছেলেপিলে আসিয়া

ঠাকুরদাদা মহাশয়কে অনুনয় বিনয় করিয়া বেড়া দিয়া পুকুরটি ঘিরিয়া লইয়াছে।

লক্ষ্মী শিউলীতলায় আসিয়া সাজী ভরিয়া শিউলী ফুল কুড়াইল। প্রস্ফুটিত, সুন্দর, শিশিরশিক্ত ফুলগুলি লোহিত বৃন্তে শুভ্র কোমল সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বৃক্ষমূলে পড়িয়া আছে, আর বালিকা রক্তিম উষায়—জীবজগৎ জাগ্রত না হইতেই, ফিংয়ে তাহার তরুকোটর হইতে বাহির হইবার আগেই, দহিয়াল তাহার পুচ্ছ খুলিয়া মুক্ত আকাশে একবার খানিকটা উড়িয়া আসিয়া উচ্চ তরুশাখায় বসিয়া উষার আগমনী গান ধরিবার পূর্ব্বেই, বনদেবীর মত নিবিষ্ট চিত্তে ফুল কুড়াইয়া সাজী ভরিয়া ফেলিল; তাহার পর গোটাকতক জবা, করবী, স্থলপদ্ম উঁচু উঁচু ডাল নোয়াইয়া পাড়িয়া, ফুলগুলি পুকুরের ধারে লইয়া আসিল। পুকুরটি সযত্নে নিকানো হইলে তাহার চারিদিকে ফুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে, কাল রাত্রে শুইবার সময় তাহার দিদি খুব ভোরে তাহাকে জাগাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিল।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি গিয়া দিদিকে ডাকিল। চারু উঠিয়া দেখিল, সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে, চারি দিক পরিষ্কার, উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে; লক্ষ্মীর উপর রাগ করিয়া বলিল, "এতখানি বেলা হয়েছে, এতক্ষণ আমাকে জাগিয়ে দিস্‌নি কেন লো রাক্ষসী?"—লক্ষ্মী বলিল, "সত্যি দিদি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, পুকুর সাজাতে সাজাতে মনে পড়লো, তা, এখনো ত বেশী বেলা হয় নি।"

চারু কাপড় চোপড় ছাড়িয়া দূর্ব্বা তুলিতে গেল। ফুলবাগানে—চামেলী ফুলের জাফ্‌রীর কাছে বেশ বড় বড় সুন্দর দূর্ব্বা জন্মিয়াছিল; চারু কতকগুলি দূর্ব্বা তুলিয়া সেগুলি ধুইয়া একখানি রেকাবীতে রাখিল, তাহার পর চন্দন পাটা পাড়িয়া চন্দন ঘষিতে লাগিল। ধান, দূর্ব্বা ও চন্দনে রেকাবখানি সাজান হইলে, চারু বামা পিসিকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিল।

চারুশীলাদের বাড়ীর কাছেই বামার ঘর। বামা জাতিতে কৈবর্ত্ত, শুদ্ধ, শান্ত অতি পবিত্রচরিত্রা বিধবা। সংসারে সে নিতান্ত একাকিনী, কিন্তু ক্ষুদ্র চাঁদপুর গ্রামের সকলেই তাহার আপনার। গ্রামের পুরুষবর্গের সকলের সঙ্গেই তাহার এক একটা সম্বন্ধ আছে,—দাদা, খুড়ো, জেঠা ইত্যাদি।

বালক বাল্যকালে বামাকে পিসি বলিয়া ডাকিয়াছে, এখন তাহার শিশুপুত্র তাহাকে দেখিলে ছুই হাত তুলিয়া আদর করিয়া বলে,—"পিতি তোলে কল না।"—কেহ যদি বলে, "বামা তোমার দিন চলে কেমন করে?"—তাহা হইলে সে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উত্তর দেয়, "কেন, আমার এত সব সোনারচাঁদ ভাইপো ভাইঝি থাকৃতে আমার অভাব কি?"

সত্যই সংসারে বামার কোন অভাব নাই। সকলেই তাহাকে ভালবাসে; সে যে গরীব, সংসারে সে যে দুঃখিনী বিধবামাত্র, তাহাকে দেখিলে এ কথা কাহারও মনে উদয় হয় না। পাড়ার বৌ ঝিরা তাহাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে, গিন্নিরা তাহাকে সৎপরামর্শদাত্রী বলিয়া মনে করেন। কোন যুবতী শ্বাশুড়ীর নিকট গালাগালি খাইয়াছেন, তিনি বামার নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিয়া দুঃখভার লাঘব করিলেন; বামা হাসিতে হাসিতে সেই রূঢ়-ভাষিণী শ্বাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিল, এবং এ কথা সে কথার পর বলিল "হাঁ দেখ মাসীমা, তুমি তোমার বৌ'মার মনে ও রকম করে কষ্ট দিয়ো না, তোমার ত ঐ একটি বৈ বৌ নয়, মুখভার ক'রে থাকে, সে কি দেখ্‌তে ভাল হয়? কোন দোষ করে ত দু কথা বুঝিয়ে বো'ল, ছেলেমানুষ বৈ ত নয়। মনে ব্যথা দিয়ে কথা বল্লে কখন কাউকে আপন করা যায় না।"—বামা এমনি ভাবে কথা পাড়ে, এবং তাহার মন্তব্য প্রকাশ করে যে, গৃহিণী তাঁহার বধূর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পান না; শেষে বামা বধূকে ডাকিয়া শ্বাশুড়ীবধূর মনোমালিন্য দুর করিয়া দেয়।

ছোট ছেলে পিলে ভুলাইতে, তাহাদের ঘুম পাড়াইতে বামা বড় ওস্তাদ। ছেলেরা তাহার অত্যন্ত বাধ্য। দশবৎসর বয়সে চারুশীলার বিবাহ হইয়াছে; বিবাহের পরদিন সকাল বেলা চারু কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছিল, সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে না। প্রিয়তমা কন্যাকে বিদেশে পরের বাড়ী নিতান্ত অপরিচিত লোকের মধ্যে পাঠাইতে মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বিদায় না দিয়া উপায় নাই। কাহাকে তাহার সঙ্গে পাঠান যায়, এই কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু চারু কাহারও সঙ্গে যাইতে রাজি হইতেছে না, অবশেষে মা যখন চারুকে বলিলেন, "তোমার বামাপিসি, তোমার সঙ্গে যাবে, কেঁদ না লক্ষ্মী মা আমার!"—তখন চারু অনেকটা স্থির হইয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল, বামাপিসি সঙ্গে থাকিলে আর তাহার ভয় নাই,

শ্রান্ত, শিশুহৃদয়খানিকে বিদেশিনীবর্গের হাস্যকৌতুকময় সোৎসুকদৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হইতে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়া আবার মায়ের ধন মায়ের কাছে ফিরাইয়া আনিয়া দিবে। গৃহিণীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বামা চারুর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল, এবং ছাদ্‌না-তলায় দাঁড়াইয়া চারুর চোখ মুছাইয়া যখন বলিল ঃ—

> "চারু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে?
> বাড়ীতে আছে বামাপিসি সঙ্গে সেজেছে।"

কুনোবিড়ালের বদলে বামাপিসি সঙ্গে গেলে কেমন হয়, চারু?" তখন এই বিষাদময় বিদায়দৃশ্যের মধ্যে, অশ্রুতে তাহার চোখের পাতা ভিজে থাকিলেও, মেঘের অন্তরালপথে প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণের ন্যায় মৃদুহাস্য তাহার ওষ্ঠ-প্রান্ত রঞ্জিত করিয়াছিল।

সেই সময় হইতে চারুর সঙ্গে বামার বেশী আত্মীয়তা হইয়াছিল। নিজের কিছু কাজ পড়িলেই সে বামাকে ডাকিত। আজ সকালে লক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া আনিলে বামা স্মিতমুখে বলিল, "কি মা চারু, আজ আবার সকাল বেলা পিসিকে কি দরকার, শ্বশুরবাড়ী কিছু খবর টবর নিয়ে যেতে হবে না কি?"—বিবাহের সময় ছাদ্‌না-তলার কথা গুলি চারু আজও ভোলে নাই, তাই বলিল, "না পিসি, তুমি একবার কুনোবিড়ালের কাজ করেছ, আর তোমাকে কুকুর বিড়ালের কাজ কর্‌তে হবে না! তুমি এই টাকাটা নিয়ে হাটে যাও, ভাল ঝাড়াপান, আর ভাল সন্দেশ টন্দেশ যা পাও, নিয়ে এসগে, আমি আজ ভাইফোঁটা দেব।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ক্রয়বিক্রয়ের কিছু ধুমধাম আছে বলিয়া, আজ খুব সকালেই হাট বসিয়াছে। বামা পানের দোকানে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া একপণ ঝাড়া পান কিনিল, কিন্তু সেই একপণ পান কিনিতে তাহাকে দেড়পণ কথা খরচ করিতে হইল; বারুইমাগী ভারি বাচাল, পানের গোছার উপরে ও নীচে দুই দশটা ভাল পান দিয়া ভিতরে 'কুলের পাতার মত' ছোট ছোট পান গুঁজিয়া দিয়াছে; বামাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা!—বামা পানের গোছা খুলিয়া সমস্ত ছোট পান ফেরত দিল, এবং নিজের হাতে ভালপান গোছাইয়া লইয়া গোছা বাঁধিল। বারুই বলিল, "এমন বাছাবাছা পান আমি কাউকে দিইনে"—বামা তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিল, "একপণ পান কিনে [illegible]

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে পল্লীগ্রামের ময়রারা ছাবার সন্দেশ তৈয়ারী করে, বামা এই ছাবা এবং গোল্লা রসগোল্লা প্রভৃতি কয়েক রকম মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। এতক্ষণ চারু বসিয়া বসিয়া সুপারি কাটিতেছিল। সুপারি কাটা হইলে, সে সুপারি, ধ'নের চাল, লবঙ্গ, এলাচ, প্রভৃতি মসলা দিয়া রেকাবী সাজাইল; এবং ভাইফোঁটা দিবার জন্য মাঝের ঘরে তিনখানা আসন পাতিল; পরিষ্কার গেলাসে তিন গেলাস জল রাখিল, রেকাব ভরিয়া সন্দেশ আনিল। তাহার পর লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী! তুই দাদাকে আর যোগীনকে ডেকে আন, আর তুইও কাপড় ছেড়ে আয়; কিছু খাস্‌টাস্‌নিতো? তুইও ফোঁটা দিস্‌।"

লক্ষ্মী তাহার আঁচল লুটাইতে লুটাইতে ঝাঁকড়া কালো কুঞ্চিত কেশের স্তবক দুলাইতে দুলাইতে উপেন ও যোগীনকে ডাকিতে গেল। সুরেন সকলের ছোট, তাহার বয়স তিন বৎসর মাত্র, চারু তাহাকে একখান নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া গায়ে জামা, পায়ে মোজা দিয়া দিল, এবং কেরেপের চাদর খানিতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, মাথার নরম পাতলা চুলগুলির মধ্যে একটি সিঁতি কাটিয়া, তাহাকে একখানি আসনের উপর বসাইয়া দিল।

উপেন ও যোগীন কাপড়চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত হইয়া আসনের উপর বসিল। তাহাদের দেখাদেখি সুরেনও কোন রকম অস্থিরতা প্রকাশ করিল না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া রেকাবীর উপর সজ্জিত স্তূপাকার সন্দেশের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; বুঝিল, আজিকার আয়োজন কিছু গুরুতর।

চারু প্রথমে বামহস্তে রেকাব হইতে ধান ও দূর্ব্বা তুলিয়া লইয়া তিনবার তাহার দাদার মাথার উপর দিল, এবং বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়া চন্দন তুলিয়া দাদার কপালে তিনটি ছোট ফোঁটা দিল, তাহার পর মসলা পান ও সন্দেশপূর্ণ দুখানি রেকাবী দাদার উভয় হস্তে স্থাপন করিয়া তাহাকে নতমস্তকে প্রণাম করিল। অনন্তর চারু ছোট ভাই দুইটির কপালেও পূর্ব্বোক্তরূপে ফোঁটা দিল। যোগীন চারুকে প্রণাম করিল দেখিয়া সুরেনও দিদির পায়ের কাছে মাথা লুটাইল। এইবার লক্ষ্মীর ফোঁটা দিবার পালা। দিদির দেখাদেখি লক্ষ্মীও ভাইফোঁটা দিল। চারু বলিল, "লক্ষ্মী, তুই দাদাকে ফোঁটা দিলি, ভাইফোঁটার মন্তর বলেছিস?" লক্ষ্মী দিদির দিকে মুখ তুলিয়া, তাহার চক্ষের উপর কৌতূহলদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল "কোন্ মন্তর দিদি, তুই ত মন্তর বলিসনি।"

হয়, সেই যে তোকে বলেছিলাম, ভায়ের কপালে—" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "মনে হয়েছে :—

"ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়োরে পড়লো কাঁটা।"

এমন সময় ঠাকুরদাদা মহাশয়,—গৌর বর্ণ, উন্নত দেহ, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুলগুলির অধিকাংশই শুভ্র, মুখে শিশুর ন্যায় সরল প্রসন্ন হাসি,—সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীগণ তাহাদের উৎসব লইয়া ব্যস্ত। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রীতিভরে তাঁহার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং বাল্যকালের এমনি একটি মধুর উৎসব-হিল্লোলিত হৈমন্তিক প্রভাত, শৈশবের নিত্যসহচর ভাইভগিনীগণের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখ, কথায় কথায় তাহাদের সঙ্গে আড়ি ও ভাব, পিতা মাতার শান্ত, সুন্দর মুখচ্ছবি—একে একে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; আজি জীবনের এই প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়াও তাঁহার মনে হইল, সে যেন সে দিনের কথা; কিন্তু শৈশবের সেই আনন্দময় খেলাঘর এখন ভগ্ন, বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে আর কেহ নাই, সেই সকল চিরপরিচিত মুখ একে একে পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়াছে; সে কালে যাহারা নিতান্ত আপনার ছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, কেবল তিনিই একা সকলের স্মৃতি বুকে ধরিয়া সকলের চিন্তাভার মাথায় লইয়া অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন, এবং এক অভিনব জগতে বাল্যের সেই খেলার পুনরভিনয় দেখিতেছেন। এক সময়ে যাহাদের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল, তাহারা ত বাঁধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন যাহাদের নূতন করিয়া পাইয়াছেন, তাহাদের লইয়া নূতন অভিনয়েই তাঁহার আনন্দ, তাই তিনি চারু ও লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ তোরা দুই বোনে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইফোঁটা দিচ্ছিস, আমি বুড়োটা কি একেবারেই বাদ পড়িলাম? হায়, হায়, বুড়ো বলে একবার কি জিজ্ঞাসাও কর্ত্তে নেই? আমি আজ তোদের কি করে বোঝাব যে, আমিও একদিন উপেন যোগীনের মত ছেলেমানুষ ছিলাম, আমারও কপালে ফোঁটা দিবার লোক ছিল।"

চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদামহাশয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, তুমি যে ভাইফোঁটার একটা শ্লোক বলেছিলে, সেটা আবার বল না!"

দাদামহাশয় চারুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার কোমল পুষ্প-

চারু, তোকে আর বেঁধে রাখবার যো নেই, লক্ষ্মী এখনো পর হয় নি, ও এখনও মধ্যে মধ্যে আমার মাথার পাকা চুল দুই এক গাছা তুলে দেয়, লক্ষ্মীকে এখন একটি রাঙ্গা বরের কোলে তুলে দিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচি! এক মাথা পাকা চুল নিয়ে বুড়ো মাথাটা তা হলে জ্বালাতন হয়ে মরবে—কি বলিস্ লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী সুরেনের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরদাদাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "ঠাকুদ্দা, আজ আমি তোমার মাথা থেকে একপণ পাকা চুল তুলে দেব, শোলোকটা বল!" দাদামহাশয় বলিলেন, "বড় ভাইকে ফোঁটা দিয়া প্রণাম কর্‌বার সময় বল্‌তে হয়,

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্থ যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

তা তোরা ত ভাইফোঁটা দিলি, এখন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পার্‌বি ত ?" চারু বলিল, "তা পারবো ঠাকুরদাদা, তুমি আজ বাজার থেকে আমাদের ভাল তরকারী আনিয়ে দাও।"

ঠাকুরদাদা নিজে হাটে চলিলেন,—আজ হাটে নানা রকম জিনিস আসিয়াছে,—তিনি ভাল মাছ, পটল, লাল আলু প্রভৃতি তরকারী কিনিয়া আনিলেন। হাটে বেশী তরকারী কিনিতে হইল না; বুনো-বাড়ী হইতে লাউ, সুযি্য-কুমড়ো আনাইয়া লওয়া হইল; পালঙ্ শাক, বেগুণ বাগানেই যথেষ্ট ছিল। নানা রকম তরকারী, ডাল, মাছ, মুড়িঘণ্ট, তিলপিঠিলি বেগুণ ভাজা, লাল আলুর গুড় অম্বল, নলেন গুড়ের পায়েস, একটা ভোজের আয়োজন হইল। মুড়িঘণ্ট পায়েস মা রাঁধিয়া দিলেন, মাছ, কলায়ের ডাল চারু নিজে রাঁধিল। বিধবা পিসিমা নিরামিষ তরকারী, সুক্তনি, গুড় অম্বলে সিদ্ধহস্ত, সেগুলি তিনিই রাঁধিলেন। দাদামহাশয় কলায়ের ডাল খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, ডাল কে রেঁধেছে রে ? অনেক দিন এমন ডাল রান্না খাইনি।" চারু আড়াল হইতে বলিল, "ভাল হয়নি বলে বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে, কত্তামার মত রান্না কর্ত্তে পারিনে ব'লে অত ঠাট্টা কেন ঠাকুরদাদা একবার তাঁর দেখা পাই ত ভাল ক'রে রান্নাটা শিখে নিই।"

কার্ত্তাদাদা হাসিয়া বলিলেন, "তোর কত্তামা ভালই রাঁধ'তো বটে, তা তুইও বড় সুন্দর রেঁধেছিস্, তোর রান্না খেয়ে তোর শ্বশুর ভারি খুসী হবে।"

এই প্রশংসায় চারুর মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিল, সে আর এক বাটী ডাল

চারু ? বুড় বয়সে খাওয়া দাওয়ার উপর একটু লোভ হয় বটে, তা, এত কলায়ের ডাল খাইয়ে কি তোর বুড়ো দাদাকে মের ফেল্‌বি ?”

সকলে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া উঠিল। চারু পান ছেঁচিয়া এক খানি রেকাবে করিয়া তাহার ঠাকুরদাদাকে আনিয়া দিল। তিনি আহারান্তে শয়ন করিলে লক্ষ্মী তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া এক দুই করিয়া গণিয়া পাকা চুল তুলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “কত চুল তুল্‌বি ভাই, ও আর গুণে ফুরুবে না—যা, তুই খেলা করগে।”

সন্ধ্যাকালে কর্ত্তা মহাশয় কাপড়ের দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই খানি ঢাকাইশাড়ী আনিয়া দুই ভগিনীকে দান করিলেন, বলিলেন, “তোদের ভাই বোনের মধ্যে যেন চিরদিন এমনি ভাব থাকে, তোদের হাসিমুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন এ বুড়োর বাকি দিন কটা সুখে কেটে যায়।”

অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে পড়িতে চারু শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু পিতৃগৃহের এই আনন্দস্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল।

নাতিনী-সংবাদ।

দ্বিপ্রহর ; শুয়ে শুয়ে ধবল শয্যায়,
টানিতেছি আল্‌বোলা; চিত্ত-জানেলায়
চিন্তার লূতিকাজাল বুনিতেছি সুখে ;
হেনকালে বুটপায়ে মৃদুহাস্য মুখে,
সৌখিন নাতিনী মোর উপস্থিত আসি।
বসাইনু কাছে তারে যতনে সম্ভাষি।
নবীনা নাতিনী মোর, নাম নৃত্যকালী,
New-year's দিনে যেন নারিঙ্গির ডালি,
উচ্চ ক্লাসে পড়ে বালা, মহিলা-কালেজে ;
লঙ্কা মরিচের ঝালে মাংস যথা মজে—
(আমি গো বাঙাল নহি, দোহাই পাঠক,)
কিম্বা যথা হিঙ্ দিলে, প্রকাশে চটক
সুরসাল কলাইর ডাল সুমধুর,
তেমতি তেজাল' মোর নাতিনী চতুর।
কথায় কথায় বলে Tennyson, Shell...

“হনুকরণেতে পটু, মৌলিকতা নাই,
সাহিত্য-বড়বাজারে মহাধূর্ত্ত চাই।”
“পুরাতন সন্দেশেতে পুরি কিছু ক্ষীর,
বদন ময়রা করে সন্দেশ বাহির ;—
তেমতি বঙ্কিমচন্দ্র করে গুণপনা,
ডুমা স্কট হিউগোর কদর্য্য নমুনা।”
“ঠাকুর-গোষ্ঠীর ভাষা ইংরাজিতে ভাজা ;
ড্যাফোডিল্ পুষ্পে যেন মন্‌শার পূজা,
মাখমেতে জুব্‌ড়ানো যেন দিশি রুটি—”
(নৃত্যকালী ভাল বড় বাসে পাঁওরুটি—
তাই গো এ Similoটি তার চাঁদমুখে
লেগেছিল বড় ভাল !) আমি হেঁট মুখে,
শুনিতেছিলাম সব, হইয়ে ফাঁফর,
বাসর-ঘরের যেন বাক্‌শূন্য বর।

তাই গো আমার হৈল এ ঘোর দুর্দ্দশা!
তাড়াতে অশক্ত,—সুখে রক্ত খায় মশা!
নামের মাহাত্ম্য তব ভুবনবিদিত,
যে নাম স্মরণমাত্র, হয় পরাজিত
গর্ব্বিত বিপক্ষদল, গ্রাবু-খেলা-কালে,
চার ছক্কা, দুই বোম্ যায় রসাতলে!) *
হেনকালে, ছাড়ি মফঃস্বল-আলোচন,
নাতিনী সদরে আসি কৈল আক্রমণ;
অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রে ভানুসিংহে ছাড়ি,
মোরে লক্ষি, রসনার তোপ্ দিল দাগি!
(ছাড়ি আর দাগিতে হ'ল না ভাল মিল—
বঙ্গীয় সমালোচক কিল খেয়ে কিল
অনায়াসে করে চুরি সাহিত্য-বাজারে,
তাইতে সাহস হৈল তব দরবারে
হে পাঠক! ছত্র দুটি করিবারে পেশ!)
হাসিয়া নাতিনী কহে—"বেশ দাদা বেশ!
এ বুড়া বয়েস, তবু নাহিক সরম;
ঘুচিবে না এ জনমে কর-কণ্ডুয়ন?
কত পদ্য ছাপাইলে, কলঙ্কের কালি,
বঙ্গবাসী পত্রিকায় খেলে কত গালি?
বঙ্গবৃক্ষে ফলে কবি যেন black berry,
ঝরে না'ক একটিও মুকুল মঞ্জরী!
কবি হেম, দ্বিজেন্, নবীন আর রবি,
অতঃপর দাদামণি তুমিও যে কবি!
বুঝি গো এ ঠান্‌দিদির house-keeping,
শিখাইয়া দিল তোমা কবিতা-pudding."

নাতিনীর ঠান্‌দিদি, আমার গৃহিণী,
পাশে ছিল বসি; এই কথা গুলি শুনি
উত্তরিল—"লো নাতিনী, বুড়া পেয়ে বুঝি,
করিস্ ভৎর্সনা? তোর আইলে গুরুজি
(নাতিনী-জামাই মোর) করিস্ লো রঙ্গ,
বুঝা যাবে কার কত বাক্যের প্রসঙ্গ!
আমিও রতন চিনি, আমিও জহুরি!
নয় তোর বুড়াদাদা সামান্য হুনরি!

অসামান্য কবি উনি, জানি বিলক্ষণ,
মন দিয়া শোন্ যত কবির লক্ষণ—
খোকা চেয়ে খুকীরে বাসেন উনি ভাল;
ওঁর চক্ষে ভৃঙ্গ হ'তে প্রজাপতি কাল;
জীর্ণ শীর্ণ শাটী পরি দাঁড়ালে সমুখে,
ভাবেন অপ্সরা মোরে না জানি কি চখে;
বারাণসী চেলি পরি জ্যাকেট আঁটিয়া
দাঁড়াইলে, দেখেন না বারেক চাহিয়া!
খোকা যবে চক্ষু বুজি স্তনদুগ্ধ খায়,
ভোলানাথ, এক দৃষ্টে পাগলের প্রায়,
চাহিয়া থাকেন মরি (ভেবে হাসি পায়)
কহেন—"ওঃ! কি রহস্য! এমনি করিয়া
প্রকৃতির উপাধানে মাথাটি রাখিয়া,
এমনি, শিশুর মত, নিশ্চিন্ত, বিহ্বল,
থাকিতে শিখিব কবে আমরা সকল?"
গোলাপ কেতকী পদ্ম ভালবাসে লোকে;
উনি সুধু একদৃষ্টে দোপাটীর দিকে
রহেন তাকায়ে; তার একটি পাপড়ি
দুষ্ট সমীরণ যদি লয় কভু হরি,
অমনি কবির নেত্রে বহে অশ্রুজল;
সম্রাটের রাজ্য যেন গেছে রসাতল!
চালের ডালের দর না জানেন উনি!
দিবানিশি ওঁর মুখে এই কথা শুনি,
বৃন্দাবনে ফুটিয়াছে গন্ধরাজ ফুল,
গোকুলে অশোকতরু ধরেছে মুকুল!
মোর আদরের কথা কি কব নাতিনি?
কবি-সোহাগের আমি বড় সোহাগিনী!
কাড়ি লয়ে কনকের চারু রত্ন-চুর,
বাঁধি দেন দুই হস্তে পুষ্পের কেয়ূর!
প্রায় বুড়া; তবু ভরা রসের পশরা,
কি সাহসে ওঁর সাথে করিস্ ঝগড়া?"

এত বলি গৃহিণীটি, নাতিনীর সঙ্গে,
রঙ্গে দেহ ঢালি দিল হাসির তরঙ্গে,
এক পাশে, শয্যাতলে, ভয়ে হয়ে সারা,
দেখিতে লাগিনু সেই হাসির ফোয়ারা;—
স্থজিয়া আশঙ্কা, আশা, উৎসাহ, আহ্লাদ,
ফুরাইল এতক্ষণে "নাতিনী-সংবাদ"!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

জৈব তড়িৎ।

জীবশরীরে স্বভাবতঃ তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব আছে কি না,—এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আজ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। কয়েক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের শরীরে অনেক সময় এক প্রকার তড়িৎ দেখা যায়; কথিত আছে, ইহারা এই বিদ্যুৎ দ্বারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে, এবং কখনও কখনও দুর্ব্বল জলচরদিগকেও তদ্দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ভক্ষণ করে। মৎস্যশরীরস্থ এই তড়িতের অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিদ্‌মাত্রই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েক জাতীয় মৎস্য ব্যতীত অপর জীবশরীরে যে ইহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাতে আবার অনেকেই সম্পূর্ণ সন্দেহের আভাস দিয়াছেন।

প্রাচীন জীবতড়িৎবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে জগৎবিখ্যাত তড়িৎবিদ্ গাল্‌ভনি ও তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌ডিনির নামই উল্লেখযোগ্য। তড়িৎবিজ্ঞানের উন্মেষ-কালে, বিদ্যুতের সাহায্যে আল্‌ডিনি সাহেব যে সকল বিস্ময়কর কার্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবতড়িৎবাদী পণ্ডিতের সংখ্যা অনেক হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বহুকাল অবধি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফরষ্টার নামক লণ্ডনের জনৈক অপরাধীকে গুরু অপরাধে দণ্ডিত করিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পরে, ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া, অপরাধীর দেহ জীবনশূন্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, আল্‌ডিনি প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত, উক্ত মৃতদেহে তড়িৎ-প্রবাহ চালন করিতে আরম্ভ করেন। জীবদেহে তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়ার পরীক্ষা করিয়া, তদ্দ্বারা জৈবিক বিদ্যুতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা, আল্‌ডিনির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, ব্যাটারির একটি তার ফরষ্টারের মৃতদেহের নিম্নাংশে ও অপরটি তাহার কর্ণমূলে সংযুক্ত রাখিয়া, কিয়ৎকাল তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিলে, ফরষ্টার হঠাৎ এক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, এবং পরে তাঁহাদিগকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া এরূপ যাতনাব্যঞ্জক মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাঁহারা ফরষ্টারের পুনর্জীবনের আশায় আশান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ রোধ করিবামাত্র সমগ্র মৃত্যুচিহ্ন পুনরায় দেখা গিয়াছিল। আল্‌ডিনি এই পরীক্ষার আশাতিরিক্ত ফললাভে উৎসাহিত হইয়া, বিদ্যুৎপ্রবাহ ও অ্যামোনিয়া ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ মৃতদেহে এক যোগে ব্যবহার করিয়া, আরও অনেক সজীবতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আল্‌ডিনির পরীক্ষার এই বিস্ময়কর ফল জগতে প্রচারিত হইলে,—জীবদেহে সর্ব্বদাই যে বিদ্যুৎ প্রবহমান, এবং এই বিদ্যুতই যে জীবনীশক্তির মূল কারণ, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। আল্‌ডিনির শিষ্যগণের অত্যাচ্চ জয়নিনাদে প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত-

এ বিষয়টির পুনরালোচনা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। সম্প্রতি রিচার্ডসন নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীবশরীরে স্বভাবতঃ কোনও তড়িৎ প্রবহমান নাই। জৈব তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা বাতুলতা, তাঁহার মতে আর কিছুই হইতে পারে না। আল্‌ডিনি যে প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতদেহে সজীবতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, রিচার্ডসন ঠিক সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছেন, তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা শবের হৃদ্‌পিণ্ড ও শরীরের সকল পেশী উত্তেজিত হয় না। যে সকল পেশী প্রাণিগণ যথেচ্ছ সঞ্চালিত করিতে পারে, তড়িৎ দ্বারা কেবল সেইগুলিই সজীব হয়; মৃতদেহের এই জাতীয় পেশী উত্তেজিত করিতে তড়িৎপ্রবাহের কোনও আবশ্যকতা হয় না, সহস্রাধিক অন্য উপায়ে ইহাদের ক্ষণিক সজীবতা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। রিচার্ডসন এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে, আল্‌ডিনির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত বিদ্যুৎপ্রবাহের যে ঘনিষ্ঠতা কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাও যে সম্পূর্ণ ভুল, ডাক্তারটি তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই। স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ও জ্ঞানের কার্য্যবিকাশ সম্বন্ধে রিচার্ডসন এক নূতন মতবাদ প্রচার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি বলেন, স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়া এক প্রকার তরল পদার্থ সর্ব্বদাই জীবশরীরে প্রবহমান আছে; ইহাই স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে রক্তের সহিত সংযুক্ত রাখে; আমাদের দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি জ্ঞানের উদয়, উক্ত স্নায়বীয় পদার্থ দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানানুভূতি কালে, উক্ত পদার্থের একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থান্তর সংঘটিত হয়;—রিচার্ডসনের মতে, স্নায়বীয় পদার্থের এই আণবিক অবস্থাবৈচিত্র্যই, জীবের জ্ঞানবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ। ইনি আরও অনুমান করেন, প্রাণিগণের নিদ্রাদি অচেতন অবস্থাও উক্ত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; আমরা যেমন শৈত্যসহযোগে যে কোনও তরল পদার্থকে ক্ষণিক কঠিন অবস্থায় আনিতে পারি,—তেমনই স্নায়বীয় পদার্থটি কোনও প্রকারে কঠিন ও নিশ্চল অবস্থায় নীত হইলেই, সম্ভবতঃ প্রাণিগণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে, রিচার্ডসন আদ্যন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতের পোষক প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, ইহাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রথায় গঠিত না করিলে, এ সিদ্ধান্ত কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। জৈব বিদ্যুতের বিরুদ্ধে, রিচার্ডসনের মত প্রচারিত হইবামাত্র, তাঁহার প্রচারিত যুক্তি সকল খণ্ডিত করিবার জন্য, আল্‌ডিনির শিষ্যগণ মহা আয়োজন করিতেছেন। ইতিমধ্যেই টার্কিনফ নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ তড়িৎমান যন্ত্রের সাহায্যে জীবশরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আল্‌ডিনির শিষ্যগণের পরীক্ষাদি আজিও শেষ হয় নাই। উভয় পক্ষের যুক্তি প্রকাশিত হইলেই, সম্ভবতঃ এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হইবে।

কেরোসিন।

কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া, গত কয়েক বৎসর হইতে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কয়েক জন বিজ্ঞানবিদ্, ইহা পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় উদ্ভিজ্জধ্বংসাবশেষ পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; আবার কতকগুলি পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া, কেরোসিনটা মৃত্তিকাপ্রোথিত জীবশরীরজ পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিয়া, নানা যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গত বৎসরের "সাহিত্যে", * তৃতীয়মতাবলম্বী এক পণ্ডিত-

সম্প্রদায়ের মতবাদ সমালোচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তিদ্বয়ের মতামত আলোচিত হইবে।

কেরোসিন বিশ্লেষণ করিয়া, বিশ্লেষণলব্ধ পদার্থ সকলের পাথুরিয়া কয়লার উপাদানগুলির সহিত ঐক্য দেখিয়া, অনেকেই কয়লা ও কেরোসিনের উৎপত্তিও এক বলিয়া, স্থির করেন।

অনেকদিন অবধি কেহই এই মতবাদের যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই,—কেবল অধ্যাপক হোফার নামক জনৈক ভূতত্ত্ববিদ্ "সম্ভবতঃ" কেরোসিন একটি জীব-মূলক পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন মাত্র। হোফার তাঁহার মতের অনুকূলে কোনও বিশিষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিতে না পারায়, বিশেষতঃ জীবদেহের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেনের চিহ্নমাত্র উহাতে দেখিতে না পাইয়া, প্রথমতঃ সকলেই তাঁহার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হোফার ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, গত বিশ বৎসর হইতে, কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্বের নিরূপণার্থ, নানা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণাদি করিতেছিলেন, এবং অল্প দিন হইল, ডাক্তার ইংলার নামক জনৈক রসায়নবিদের সাহায্যে, জীববসা হইতে কৃত্রিম কেরোসিন প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার অনাদৃত পুরাতন সিদ্ধান্তটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই কৃত্রিম কেরোসিনে নাইট্রোজেনের লেশমাত্র নাই, এবং ইহা সর্ব্বাংশে আকরিক তৈলের ন্যায় হইয়াছে। হোফার বলেন, কেরোসিনে নাইট্রোজেনের অভাব বলিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, বিজ্ঞানবিদ্গণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন;—জীবশরীরের সর্ব্বাংশে নাইট্রোজেন থাকে না, বহুকাল ভূ-প্রোথিত থাকায় জীবশরীরের নাইট্রোজেন-যুক্ত মাংসল অংশ শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং মৃত্তিকাযুক্ত হইয়া শীঘ্রই স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহার নাইট্রোজেনহীন বসা-অংশ, অপর তৈলজ পদার্থের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয় না ও ভূগর্ভস্থ অপর পদার্থের সহিত মিশ্রিতও হয় না; এজন্য মাংসল অংশের ন্যায়, ইহা বিকৃত হইয়া পড়ে না। হোফারের মতে, এই জীববসাই চুঁয়াইয়া গিয়া, ভূগর্ভস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে সঞ্চিত হয়, এবং পরে কেরোসিনে রূপান্তরিত হয়।

আজকাল আবার আমেরিকার কয়েকটি কেরোসিন-আকরে, নাইট্রোজেনযুক্ত তৈল দেখা যাইতেছে; ইহাতে অধ্যাপক হোফারের দল কেরোসিনের জীবমূলকতা সম্বন্ধে অনেক নূতন যুক্তির উত্থাপন করিতেছেন। এখন ইঁহাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য এই যে,—কেরোসিন জীবদেহজ না হইলে, উদ্ভিজ্জ-কঙ্কাল হইতে নাইট্রোজেন কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? হোফারের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আজও এ সকল প্রতিবাদের খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিগণের আর একটি মতবাদের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমেরিকা ও রুসিয়ার অনেক স্থানে এক প্রকার আকরিক বাষ্প পাওয়া যায়; আজকাল তাহা জ্বালাইয়া অনেক কলকারখানা চলিতেছে, এবং রাজপথে আলোকপ্রদান প্রভৃতি অনেক কার্য্যও ইহা দ্বারা সুসাধিত হইতেছে। পাথুরিয়া কয়লা এবং এই বাষ্পের উপাদান প্রায় একই দেখিয়া, বাষ্পটিও কয়লার ন্যায় উদ্ভিজ্জমূলক বলিয়া, সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং উক্ত বাষ্পে যে কিছু নাইট্রোজেন মিশ্রিত দেখা গিয়া থাকে, তাহা বহিঃস্থ বায়ুর সহিত মিশ্রণের ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অধ্যাপক হোফার পূর্ব্বোক্ত আকরিক বাষ্পের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া, উহাতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন মিশ্রিত দেখিতে পাইয়াছেন, এবং উহা যে কিছুতেই বায়ুর মিশ্রণ দ্বারা হইতে পারে না, তাহাও স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। হোফার বলেন, কেরোসিন ও আকরিক বাষ্প উভয়ই জীবমূলক পদার্থ,—ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জমূলক পদার্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

সাগরগর্ভের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক হোফারের মতবাদের প্রতিপোষক অনেক কথা দেখা যায়। গম্বেল তাঁহার সামুদ্রিক পর্য্যবেক্ষণকালে দেখিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই সমুদ্রতলে এক প্রকার স্নেহপদার্থ অল্লাধিকপরিমাণে দেখা গিয়া থাকে; ইহা সমুদ্রচর জীবের দেহজ পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বহু পুরাতন কবর খনন করিলে, তাহাতে যে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রায় সেই প্রকার। হোফারের শিষ্যগণ বলেন,—সম্ভবতঃ এই পদার্থ সহস্রাধিক বৎসর কর্দ্দমাবৃত থাকিয়া, ভূগর্ভস্থ নানা রাসায়নিক পরিবর্ত্তনবশে, শেষে কেরোসিন ও আকরিক বাষ্পে পরিণত হয়।

স্বমতপোষক নানা যুক্তি প্রদান করিলেও, হোফারের মতবাদ আজও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। বিজ্ঞানজগতের শীর্ষস্থানীয় অনেক বিজ্ঞানাচার্য্য, আজও প্রাচীন সিদ্ধান্তিগণের দলভুক্ত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা হোফারের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা নূতন সিদ্ধান্তটা বিবেচ্য ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদের মূলধ্বংসী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

আকাশ-ভ্রমণ যন্ত্র।

একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকাশ-ভ্রমণ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য বহুদিন হইতে নানা দেশে বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই অভীষ্টফললাভে কৃতকার্য্য হন নাই। আজকাল যে ব্যোমযান দেখা যায়, তাহাতে চালকের ইচ্ছানুসারে গতি নিয়মিত করিবার বিশেষ কোনও উপায় নাই; বায়ুর গতি দ্বারাই আধুনিক বেলুনের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। কাযেই এই সকল ব্যোমযান দ্বারা লক্ষ্যহীন হইয়া আকাশে বিচরণ করা ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। আবার এই অসম্পূর্ণ ব্যোমযানে আরোহণও সকল সময়ে নিরাপদ নয়—স্পেন্সার সাহেবের ন্যায় অনেক গগনপর্য্যটকের বিপদকাহিনী প্রায়ই শুনা যাইতেছে।

নানা যত্নে এ পর্য্যন্ত ব্যোমযানের বিশেষ কোনও উন্নতি করিতে না পারায়, কেবল বাষ্প বলে না চালাইয়া, ইহাতে অপর যন্ত্রাদি সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্ক্রু-আকারের চাকা ঘুরাইয়া, আজকাল বৃহৎ জাহাজাদি চলিতেছে দেখিয়া, একজন মার্কিন শিল্পী স্ক্রু পাখা ঘুরাইয়া আকাশবিহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কোনও বাষ্পাদির সাহায্য না লইয়াই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু যন্ত্রটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত পক্ষ দ্বারা শূন্যে উড্ডীন হইবার জন্য, য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানসমাজে পরীক্ষাদি চলিতেছে; সম্প্রতি দুই একটি যন্ত্রও নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের একটিতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই,—তবে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আকাশচর প্রাণিগণের ভ্রমণকৌশলাদি পরীক্ষা করিয়া, ইহার মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য যে প্রকার প্রয়াসবান হইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, আকাশভ্রমণ কার্য্যটা চিরকালই ইতর পক্ষিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কৃত্রিম পক্ষের সঞ্চালন দ্বারা কি উপায়ে একটি পূর্ণাবয়ব মনুষ্যের ভার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে,—এই প্রশ্নের সমাধানার্থ এখন সকলেই ব্যস্ত; এবং পক্ষী সকল ক্ষুদ্র ডানা দুটি আন্দোলন করিয়া কি কৌশলে তাহাদের শরীর বহন করে, তাহার নিরূপণার্থ অনেকে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

বার্লিনবাসী লিলিয়েন্থাল নামক জনৈক শিল্পী, পক্ষীর উড়িবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া, তাহার সাহায্যে একটি আকাশভ্রমণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য গত ২৩ বৎসর হইতে পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার স্বকীয় গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হইয়াছে। এই পুস্তকে লিখিত পরীক্ষার বিবরণগুলি, পর্য্যায়ক্রমে এমন সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, কোনও পাঠকই লিলিয়েন্থালের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন না। গ্রন্থকার বলেন,আকাশচর প্রাণিদের পক্ষসঞ্চালনে বিশেষ কোনও কৌশল নাই, —ইহাদের পক্ষের বক্রতাই একমাত্র পরীক্ষণীয়; পক্ষিগণ উড়িবার সময় শরীরের গুরুত্ব ও বায়ুর গতি অনুসারে তাহাদের পক্ষযুগল নানা প্রকারে বক্রাকার করিয়া থাকে,—এই বক্রতা-বশতঃই বৃহৎ বৃহৎ পক্ষিগণ অত্যল্প শক্তির সাহায্যে, আকাশে ভ্রমণ করিতে পারে। লিলি-য়েন্থাল্ আরও বলেন, প্রবল বায়ুতে দুইটা সুদীর্ঘ পক্ষ দ্বারা অণুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না হইয়া, পক্ষিগণ যে বেশ স্থিরপক্ষে শূন্যে বিচরণ করে, তাহারও গূঢ় কারণ,—পক্ষ বাঁকাইবার কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

লিলিয়েন্থাল ও তাঁহার ভ্রাতা এ বিষয়ের পরীক্ষার জন্য অনেক গুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যকে উর্দ্ধোত্থিত করিতে হইলে, মিনিটে কতবার পক্ষ আন্দোলন আবশ্যক, এবং এ কার্য্য কত শক্তির সাপেক্ষ, এখন তিনি এই সকল গণনা করিতেছেন। লিলিয়েন্থাল যে আকাশভ্রমণ যন্ত্র নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে হস্তসঞ্চালনের কোনও আবশ্যকতা থাকিবে না;—দ্বিচক্র যান চালনের ন্যায়, কেবল পদদ্বয় সঞ্চালিত করি-লেই, কৃত্রিম পক্ষযুগল অন্দোলিত হইয়া চালক সহ উর্দ্ধে উত্থিত হইবে।

কৃত্রিম পক্ষ দ্বারা আকাশভ্রমণের উপযোগিতা সম্বন্ধে নানা আবিষ্কার করিয়াও লিলিয়েন্থাল আজও একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই,—কল্পিত যন্ত্রটির পক্ষের আকৃতি কি প্রকার হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বৃহৎ পক্ষীদিগের মধ্যে আমরা সচ-রাচর দুই শ্রেণীর পক্ষ দেখিতে পাই; শকুনপ্রভৃতি মাংসভোজী পক্ষীর পক্ষদ্বয় প্রায়ই সুপ্রশস্ত হইতে দেখা যায়, এবং উড়িবার সময় ইহাদের পক্ষ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়; কিন্তু সমুদ্রচর পক্ষীদের পক্ষ অধিক বিস্তৃত হয় না,এবং ইহা প্রায়ই অল্প প্রশস্ত ও সূক্ষ্মাগ্র হইতে দেখা যায়। পক্ষ সকলের এই আকৃতিগত পার্থক্যের কারণ কি, এবং কোন্ শ্রেণীর পক্ষই বা কল্পিত যন্ত্রে অধিকতর উপযোগী হইবে, লিলিয়েন্থাল এখন এই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধানার্থ সচেষ্ট আছেন। একটি অল্পশক্তিসাধ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকাশভ্রমণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কৃত্রিম পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া, পক্ষীর উড়িবার কৌশলের অনুকরণ করাই যে একমাত্র উপায়, লিলিয়েন্থাল তৎপ্রণীত গ্রন্থের উপসংহারভাগে, তাহা বেশ সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার কল্পনা যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহারও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন,—এখন তাঁহার আশ্বাসবাণী সফল হইলেই মঙ্গল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

তিহরী।

গঙ্গোত্রীর পথে তিহরী প্রধান সহর। একদিন বৈশাখ মাসের সুন্দর অপরাহ্ণে আমি প্রথম এই স্বাধীন রাজ্যে প্রবেশ করি। মসূরী হইতে তিহরী

সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই একটি দ্রব্যে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল; ব্যাপার তেমন গুরুতর নহে, কিন্তু আমার সঙ্গীর চক্ষে তাহার মূল্য অনেক। বহুদিন পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক পর্ব্বতগহ্বরে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, কত নির্ঝরিণীর পূত শীতল বারি করপুটে পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিয়াছি, পাষাণহৃদয় হিমালয়ের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে মহাপ্রেমের অনন্ত উৎস লোকলোচনের অদৃশ্য অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহারই দুই একটি সামান্য চিহ্ন এই সব নির্ঝর। আমরা অনেক নির্ঝরের জল পান করিয়াছি, কিন্তু এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে, পথিপার্শ্বে একটি নির্ঝরের যে জল পান করিয়াছিলাম, তাহা অমৃত-ধারা; এমন সুমিষ্ট জল আমি কখনও পান করি নাই। তিহরী-রাজ সেই নির্ঝর বাঁধিয়া দিয়া তাহার মুখের কাছে একটি গোমুখ পাথরে ক্ষোদিত করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। সেই গোমুখ হইতে দিবসরজনী অজস্রধারে ভগবানের করুণাধারা অবিশ্রান্ত পতিত হইতেছে। হিন্দুর রাজধানীর প্রবেশদ্বারে হিন্দুর পরমদেবতা দয়াবতী গাভীর মূর্ত্তি অকাতরে তৃষ্ণাতুর পথিককে জল দান করিতেছে। পতিতপাবনী গঙ্গার ধারা গোমুখের ভিতর দিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে; এখানে সেই গঙ্গোত্রীর পথে প্রথমেই আমরা তাহার একটা ছোটো খাটো নমুনা দেখিলাম।

সেই নির্ঝরের নিকট হইতে বাহির হইয়া ছোট একটি পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াই আমরা সম্মুখে একটি সুন্দর উদ্যানবেষ্টিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। কখনও তিহরীরাজ্যে যাই নাই; সেই বৃহদায়তন অথচ সুদৃশ্য অট্টালিকা, তাহার চারি দিকে সুন্দর উদ্যান ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘিকা দেখিয়া, আমরা তাহাকেই রাজবাড়ী মনে করিয়াছিলাম। বাড়ীর বহিরংশ ইংরাজী ধরণে প্রস্তুত; বাগানও বোধ হয় কোন সাহেবের পছন্দ মত নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভিতর-বাড়ীর গঠন সেকেলে বড় মানুষের অন্তঃপুরের মত। আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই বাড়ী দেখিতেছি ও তাহার সমালোচনা করিতেছি, এমন সময়ে আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই আর একজন পর্ব্বতবাসী আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারও গন্তব্য স্থান তিহরী; সেখানে রাজদরবারে তাহার কি আবেদন আছে, সেই জন্য সে দূর পর্ব্বতগৃহ হইতে রাজধানীতে আসিয়াছে। সে বলিল, আমরা যে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া

আসেন ; সহর এখনও প্রায় এক মাইল দূরে। আমরা আর কখনও তিহরী সহর দেখি নাই শুনিয়া সে লোকটি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার করিল, এবং সেখানে পৌঁছিয়া আমাদের সুবিধা করিয়া দিতে পারিবে, এ ভরসাও যথেষ্ট দিল। বনে জঙ্গলে পর্ব্বতগুহায় কোনও গোল নাই, কোনও অসুবিধা নাই ; প্রকৃতি মাতা তাঁহার সুবিশাল গৃহদ্বার সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন ; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, অসঙ্কোচে সেই মাতৃক্রোড়ে স্থান পায় ; বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতগহ্বরে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করা যায় ; ভগবানের করুণাধারায় তৃষ্ণা দূর হয়, প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রতিদিন কত ফল মূল সঞ্চিত হইতেছে, অনায়াসে গ্রহণ কর, কেহ বাধা দিবে না। কিন্তু লোকালয়ে তাহা হইবার যো নাই, প্রতিপদে তোমাকে সাবধান হইতে হইবে ; লোকালয়ে সব নিয়ম, সব আদব কায়দা, সামাজিক কৃত্রিমতা ; তাহারই মধ্যে তোমাকে চলিতে হইবে, তাহার একটিকেও অবহেলা করিবার শক্তি তোমার নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নহে। লোকালয়ে তুমি সামাজিক জীব, বনে জঙ্গলে তুমি মুক্তপক্ষ অসামাজিক জীব। তাই লোকালয়ে প্রবেশ করিতে সে সময়ে আমাদের মনে একটু সঙ্কোচের ভাব উদিত হইয়াছিল। পথ ঘাট দেখাইয়া দিবার জন্য, একটা বাসস্থান গোছাইয়া দিবার জন্য একজন লোক পাইয়া, মনটা একটু ভাল বোধ হইল। রাজারাজড়ার দেশ, আর আমরা রুক্ষকেশ মলিনবসন লোটা-কম্বল-ধারী সন্ন্যাসী ; রাজদ্বারে যাইতে কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আমাদের মনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আগন্তুক পথিকের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আমরা সহরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। দ্বিতল বাড়ী, নিম্নতলে হাইকোর্ট বসে, উপরে রাজকুমারেরা থাকেন। রাজকুমার তিন জনই আজমীর কলেজে পড়েন, গ্রীষ্মের অবকাশে এখন বাড়ীতে আছেন ; শীঘ্রই কলেজ খুলিবে, এবং তাঁহারাও চলিয়া যাইবেন। কুমারেরা রাজ-অন্তঃপুরে থাকেন না।

সন্ধ্যা প্রায় আগত দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটি স্থানে আমাদের সঙ্গী আমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া একটা ছোট গলির মধ্যে প্রবেশ করিল ; আমরা তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি ; সে আর ফিরিল না।

করিয়া জানিলাম, এখানে কোনও দোকানে বাসা মিলিবে না; মুসাফির লোকের বাসের জন্য রাজার নির্ম্মিত অনেকগুলি বাড়ী আছে, সেখানেই সকলকে থাকিতে হয়; থানাদারের নিকট যাইয়া বলিলেই, সে একটা বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

এইবার আমাদিগকে থানায় যাইতে হইবে। আমার সঙ্গী এ সমস্ত ব্যাপারে তেমন অগ্রসর নন। বনে জঙ্গলে ধর্ম্মোপদেশ দিতে তিনি খুব তৎপর, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় থাকিব, কি খাইব, এ সকলের বন্দোবস্ত করিতে তাঁর অনিচ্ছা। 'যাহা হয় হইবে,' এই তাঁর 'মটো', কিন্তু আমি সে ভাবের হইলে হয় ত সে দিন রাস্তার ধারেই কতক রাত্রি পড়িয়া থাকিতে হইত, শেষে নগররক্ষকগণের রুলের গুঁতা ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া পলায়নের পথ পাইতাম না। যাহা হউক, সঙ্গীমহাশয়কে এক স্থানে বসাইয়া রাখিয়া আমি থানাদারের বাসায় গেলাম; দেখিলাম, আফিসেই তাঁহার বাসা, তিনি অন্তঃপুরে আছেন; কখন বাহিরে আসিবেন জিজ্ঞাসা করায়, "থোড়া সবুর করনে হো গা" জবাব পাইলাম। সবুরে মেওয়া ফলিবে কি না, বুঝিতে পারিলাম না, তবুও বসিয়া থাকিতে হইল। দীর্ঘ আধ ঘণ্টা অন্তঃপুরের পথ পানে চাহিয়াই কাটিয়া গেল, অবশেষে থানাদার মহাশয় দর্শন দিলেন। উচ্চ গদীর উপর তাকিয়া লইয়া যখন তিনি বেশ ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন, তখন আমিই সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া আমার আরজ নিবেদন করিলাম। কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সঙ্গে কয় জন মানুষ, তাহা লিখিয়া লইয়া নিকটস্থ এক জন পেয়াদার উপরে আমাদের ভার দিলেন; আমি যখন বাহির হইয়া আসিব, তখন থানাদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় আদ্‌মিকা সিধা ভেজ্‌নে হোগা?" থাকিবার স্থানেরই সুবিধা হইতেছিল না, এখন আবার সিধাও পাঠাইতে চায়। আমি ভদ্রভাবে সিধা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম, বাজার হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া খাইবার সঙ্গতি আমাদের আছে, তাহাও বলিলাম, এবং পয়সা দিয়া যদি থাকিবার স্থান মিলিত, তাহা হইলে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, এ কথাও জানাইয়া দিলাম। তিনিও একটু খাটো স্বরে বলিলেন যে, রাত্রিও হইয়াছে, এত রাত্রিতে রাজবাড়ী হইতে সিধা বাহির হইবে কি না সন্দেহ, সুতরাং আমরা বাজার হইতেই খাবার

একখানি দ্বিতল টিনের ঘরের উপর আমাদের বাসা হইল। রাত্রের অন্ধকারে রাজপথের দিকের বারান্দায় আসিয়া আমরা বসিলাম; পেয়াদা চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, কোথায় কি আছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। পেয়াদা মহাশয় যে লণ্ঠনটি আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি লইয়া গেলেন। অনেক কষ্টে রাস্তা খুঁজিয়া নীচে নামিলাম। যে দোকানে খাবার কিনিতে যাই, সেই বলে, অপরিচিত বিদেশী লোককে সরকারের বিনা হুকুমে খাবার বেচিতে পারিব না। বিষম জ্বালা, আবার সরকারের হুকুম কোথায় আনিতে যাই? এমন সময়ে দেখি, আমাদের গৃহপ্রদর্শনকারী পেয়াদা-মহাশয় সেই পথে যাইতেছেন। তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলায়, সে এক দোকান-দারকে বলিয়া দিল। আমি সেখান হইতে খাবার কিনিয়া ঘরে ফিরিব, এমন সময়ে এক জন লোক সেখানে আসিয়া জুটিল, এবং আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া কোথা হইতে আসিতেছি প্রভৃতি খবর লইল। দেরাহুনে থাকি, আমি বাঙ্গালী বাবু, এই কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপ নিয়াজি-কো জান্‌তা?" কোন্ নিয়াজি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "দেরাহুন্‌কা বাঙ্গালী বাবু কালীকান্ত সাহেব যো স্কুল বানায়া, উস্‌মে স্কুলমে নিয়াজি পড়্‌তা।" বুঝিলাম, নিয়াজি অপর কেহ নহেন, বর্ত্তমান রাজকুমারের মাতুল 'মিয়াজিৎ সিং।' আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে, আমি তাহাকে জানি, কিন্তু সে যে আমার বিশেষ পরিচিত, আমার ছাত্র, তাহা আর ভাঙ্গিলাম না, বলিবার দরকারও ছিল না; চুপচাপ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা। কিন্তু তাহা হইল না। আমি বাসায় পৌঁছিয়া খাবার রাখিয়া জল আনিতে গিয়াছি, এমন সময়ে সেই লোকটি আসিয়া আমাদের বাসার সন্ধান লইয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম যে, একটি লোক আমার সন্ধান লইয়া গিয়াছে।

ক্ষুধার অত্যাচার যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা দুই জনে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম; গল্পের প্রধান বিষয় তিহরীর ইতিহাস; আমি যাহা যাহা জানিতাম, সমস্ত বলিতে লাগিলাম, কথায় কথায় বিলম্ব হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আটটা, এমন সময়ে তিন চারি জন অশ্বারোহী ও মশাল হস্তে দুই তিন জন বরকন্দাজ আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল; মশালের আলোকে দেখিলাম, অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী 'মিয়াজিৎ সিং।' ছাত্র হইলেও এ অবস্থায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করা আমার কর্ত্তব্য

দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সংবাদ না দিয়া আসিয়া এ ভাবে থাকা যে আমার পক্ষে নিতান্তই যুক্তিবহির্ভূত হইয়াছে, অন্য কথার পূর্ব্বে মিয়াজি তাহাই আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। অবশ্য, তাহার সে অনুযোগের কোনও জবাব আমার তহবিলে ছিল না; আমি সে কথা চাপা দিয়া অন্যান্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিলাম; আগন্তুক অপরিচিত ভদ্রলোক কয় জনকে সাদর সম্ভাষণ করিলাম, এবং আমাদের জীর্ণ ছিন্ন কম্বলাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

তখনই চারি দিকে ধুম পড়িয়া গেল; থাকিবার জন্য ভিন্ন বাড়ীর ব্যবস্থা হইল; কিন্তু আমার সঙ্গী আর সে স্থান ত্যাগ করিয়া 'পাদমেকং' যাইতেও স্বীকৃত নন; কাজেই সেখানেই আমাদের শয়নের জন্য চারপাই, বিছানা আসিয়া হাজির হইল। বাজার হইতে আহারের জন্য যে দ্রব্যগুলি আনিয়াছিলাম, চাকরদের পদতলে পড়িয়া তাহাদের মিষ্টান্ন-জীবন ধূলিকণায় পরিণত হইল!

এত রাত্রে সিধা আনিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিতে গেলে সমস্ত রাত্রিই সেই কার্য্যে অতিবাহিত হইবে ভাবিয়া, রাজবাড়ী হইতে আর সিধা আসিল না। আজ সন্ন্যাসীর অদৃষ্টে রাজভোগ;—অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছি না,—সত্য সত্যই রাজভোগ। মনে পড়ে, কিছু দিন পূর্ব্বে এক দিন হিমালয়ের মধ্যে এক স্থানে দুইপ্রহরে রুটীর সঙ্গে বনের শাক ভাজা খাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলাম; সেই দিন আমার সঙ্গী পূজনীয় স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "আজ আমাদের রাজভোগ!" সেই শাকরুটী বা বনের ফল মূল বা অনেক দিন কেবলমাত্র ঝরণার জল খাইয়াই কত দিন অতিবাহিত করিয়াছি।

প্রত্যুষে বন্দী ও স্তুতিপাঠকগণের গীতধ্বনি এবং নহবতের মনোহর ও শ্রুতিসুখকর প্রভাতী গানে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যায় শয়ান অবস্থাতেই যথার্থ হিন্দুরাজ্যের প্রভাব বুঝিতে পারিলাম। সংস্কৃত পুস্তকাদিতে প্রভাতে স্তুতিপাঠকদিগের সুমধুর গীতধ্বনিতে রাজা মহারাজাগণের নিদ্রাভঙ্গ হইত, পড়িয়াছিলাম; কিন্তু জিনিসটি কি, তাহা আজ বুঝিলাম। ওদিকে নহবতে সুন্দর তানলয়ে বিভাসটোড়ী আলাপ করিতেছে, এ দিকে তার- [illegible] কম্পিত করিয়া গান করিতেছে। বৈশাখের

তলে অনেক নিশা যাপিত হইয়াছে, প্রভাতে বিহঙ্গের বৈতালিক গানে বৃক্ষপত্রের মৃদুকম্পনে ও বৃক্ষচ্যুত পত্রস্পর্শে অনেক দিন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; সে এক প্রকারের আনন্দ, সে এক রকমের সুখ; আর এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে সুকোমল শয্যায় নিশাযাপন, প্রভাতে নহবতের বাদ্য ও বৈতালিকের কণ্ঠধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ, এ আর এক রকমের আনন্দ। কোনটি উৎকৃষ্ট, আর কোন্‌টি অপকৃষ্ট, তাহার তুলনা আমি এতদিন পরে করিতে পারিতেছি না।

শ্রীজলধর সেন।

সীতারাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গলা দেশের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচন করিয়া এক জন বিচক্ষণ ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর যাহাই হউক,"বহিঃশত্রুর পক্ষে বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করা বড়ই দুষ্কর ব্রত। ভারতভাগ্যবিধাতা বৃটীশসিংহ যদি সকল স্থান হইতেই অধিকারচ্যুত হন, তথাপি কেহ বাঙ্গলা দেশ হইতে তাড়িত করিতে পারিবে না।" *

উত্তরে উত্তুঙ্গ তুষার শৃঙ্গ সমুন্নত করিয়া ভীমকলেবর হিমালয় সতর্ক প্রহরীর মত বীরদর্পে দণ্ডায়মান; দক্ষিণে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বঙ্গোপসাগর প্রলয় গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিশব্দিত করিতেছে; পূর্ব্বে ব্রহ্মসীমায় অভেদ্য গিরিপ্রাচীর; কেবল পশ্চিম সীমা কথঞ্চিৎ অরক্ষিত, কিন্তু তাহারও স্থানে স্থানে কত মহাবন, কত খণ্ড গিরি, কত বন্ধুর পথ! বীরধাত্রী বসুন্ধরা যদি বঙ্গভূমি বীরসন্তানের জন্মভূমি করিতেন, তবে বহিঃশত্রুর পক্ষে বঙ্গ দেশ আক্রমণ করা সত্যই দুষ্কর ব্রত হইত!

সেকালে পথঘাটের সুব্যবস্থা ছিল না; নদীবহুল বঙ্গ দেশে বর্ষাসমাগমে জলস্থল পরস্পরকে এমন অভিন্নভাবে প্রেমালিঙ্গন করিত যে, মনে হইত, বুঝি সমুদায় দেশ জলার্ণব,—কোন দিকেই কূল কিনারা নাই। সেই জন্য দিল্লীর ফৌজ সহসা বঙ্গভূমি আক্রমণ করিতে পারিত না; যাহারা আক্রমণ করিবার জন্য আসিত, বাঙ্গলার জল বায়ু তাহাদিগকে অল্প দিনের মধ্যেই

আক্রমণ করিয়া বসিত; শত্রুর আক্রমণ বীরপ্রতাপে প্রতিহত করা সহজ, জলবায়ুর আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ নহে; দিল্লীশ্বরের অনেক ফৌজ এই রূপে বঙ্গ দেশে জীর্ণ কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত!

পাঠান বা হিন্দু জমিদারগণ যদি দলবদ্ধ হইয়া পশ্চিম সীমা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে দিল্লীর ফৌজ বহু বৎসরেও গৃহপ্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িত না; সুতরাং মোগল আসিত; কখন কখন বাঙ্গলা দেশ পদানত করিত, আবার অবসর বুঝিয়া বাঙ্গালী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিত।

মহারাজা মানসিংহ পাঠানের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে পাঠান আর ভাল করিয়া মাথা তুলিতে সাহস পায় নাই। উড়িষ্যা পাঠানের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল; অবসর পাইলে তাহারা সুবর্ণরেখা পার হইয়া বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিত। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আর পাঠানরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারে নাই। পাঠান-শক্তি চূর্ণ হইলে, বাঙ্গলা দেশে জমিদার-দিগের শক্তিই একমাত্র প্রতিকূল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। যত দিন দিল্লীর প্রবল প্রতাপ ছিল, ততদিন জমিদারদিগের বিচ্ছিন্ন শক্তিতে মোগল শাসন-কর্ত্তা বিচলিত হইতেন না। কিন্তু শাহজাহানের শেষ জীবনে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল।

বাদশাহের পুত্রগণ পিতার জীবনকালেই সিংহাসন ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন; যে যেথানে ছিলেন, সাহাজাদাগণ সকলেই সসৈন্যে রাজ-ধানীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতা পুত্রে গৃহকলহ উপস্থিত হইল; বাঙ্গালা দেশের উপর কাহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিল না। আরঙ্গজীব যখন পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, ভারতবর্ষে তখন বাহু-বলের প্রবল প্রতাপ। বাঙ্গলার জমিদারদিগের মধ্যেও বাহুবলের অভিনয় আরম্ভ হইল। কে কাহার রাজ্য কাড়িয়া লয়, তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকিল না। মোগল রাজপ্রতিনিধি ঢাকার রাজধানীতে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন, নবাব ইব্রাহিম খাঁ একদিনের জন্যও সে বাহু-বলের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন না;—দয়া করিয়া যে রাজা মোগলকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন, ইব্রাহিম খাঁ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং মোগলের শাসনক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়িল।

গণ তাহা দেখিলেন, বিদ্রোহলোলুপ বাঙ্গালী জমিদারগণ তাহা দেখিলেন, কেবল দেখিলেন না নবাব ইব্রাহিম খাঁ। সুতরাং উপযুক্ত অবসর পাইয়া দেশের মধ্যে তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমান অঞ্চলের সভাসিংহ সেই বিদ্রোহের মূল।

সভাসিংহ এক জন ক্ষুদ্র জমিদার; বর্দ্ধমানাধিপতির এক জন সামন্ত মাত্র। কিন্তু ক্ষুদ্র জমিদারীর মানসম্ভ্রম লইয়া সভাসিংহ সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উড়িষ্যাবাসী পাঠানদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। রহিম খাঁ তখন পাঠানদিগের সর্দার; পাঠান সর্দার মহোল্লাসে সুবর্ণরেখা উত্তীর্ণ হইলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণরাম প্রকাশ্য যুদ্ধে নিহত হইলেন, রাজকুমারী বন্দিনী হইলেন, রাজকুমার জগৎ রায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, বর্দ্ধমান মোগলের হস্তচ্যুত হইল।

এব্রাহিম খাঁ সংবাদ পাইয়াও বিদ্রোহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমার জগৎ রায় ঢাকায় উপস্থিত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার আশায় যখন সত্য সত্যই করুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তখন ইব্রাহিম খাঁ যশোহরের ফৌজদার নুর উল্যার উপর এক পরোয়ানা জারি করিয়াই নিরস্ত হইলেন। নুর উল্যা নিরাপদে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন; সিপাহীগণ যুদ্ধশিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি সসৈন্যে হুগলী পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী-সেনার ভেরীনিনাদে ফৌজদারের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! তিনি শত্রুসেনা আক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না; স্বয়ং সসৈন্যে হুগলী দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া শত্রুসেনার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষা হইল, ফৌজদার রজনীযোগে নৌকারোহণে যশোহরে পলায়ন করিলেন। হুগলী দুর্গ সভাসিংহের হস্তগত হইল! ভাগীরথীর উভয় তীরে,—কলিকাতা, চন্দননগর এবং চুঁচুড়ায়,—ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অনুমতি চাহিলেন, এবং সেই অনুমতি উপলক্ষে ক্ষিপ্রহস্তে দুর্গপ্রাচীর রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই বুঝিল,—"জোর যার মুল্লুক তার,"—মোগল আর কাহাকেও বাহুবলে রক্ষা করিবে না, মোগলের প্রবল পরাক্রম এতই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে!

রহিম খাঁ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রবল গর্জ্জনে সিংহনাদ ক... ...জ, সেনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল, নদীয়া ও ব... এই বিস্তৃত জনপদ বিধ্বস্ত হইল, সভাসিংহ বর্দ্ধমানে রাজধানী নিরূপণ করিয়া রহিম খাঁকে মুকসুদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রিয়বিকার সভাসিংহের কাল হইল! তিনি কামান্ধ হইয়া বর্দ্ধমান-রাজকুমারীকে সবলে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। বীর-বালিকা বসনাঞ্চলে শাণিত ছুরিকা লুকাইয়া রাখিতেন, সভাসিংহ তাহা জানিতেন না। সেই ছুরিকা উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সভাসিংহ বিকট আর্ত্ত-নাদ করিয়া বালিকাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন, বালিকা সেই শাণিত লৌহ আপন বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিলেন!

সভাসিংহ পরলোক গমন করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ নিরস্ত হইল না। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ দেশ লুণ্ঠনে ব্যস্ত হইলেন; রহিম খাঁ রহিম শাহ নামে বাঙ্গলার স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। ভাগী-রথীর পশ্চিম তীর রহিম শাহের করায়ত্ত হইল। ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় বসিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দিনযাপন করিতেছিলেন, সুতরাং বিদ্রোহবার্ত্তা অবগত হই-য়াও প্রতিবিধানের আয়োজন করিলেন না। যাঁহারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে কেবল এই বলিয়াই নিরস্ত করিলেন যে, "গৃহবিবাদ বড় ভয়ানক বিপদ; তাহাতে লিপ্ত হইলে পরমেশ্বরের সন্তানগণ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে; নরহত্যা মহাপাপ; ঘরে ঘরে বিবাদ বাধাইয়া অনর্থক নরহত্যা করিয়া ফল কি? বিদ্রোহীদিগের বাহুবল পরি-শ্রান্ত হইলে তাহারা আপনিই সরিয়া পড়িবে;—না হয়, দিন কতক বাদশা-হের অল্পবিস্তর রাজকরের ক্ষতি হইবে।" *

বিদ্রোহীদল মুকসুদাবাদ ও কাশিমবাজার লুটিয়া লইল, সুতানটীর চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিল, টানার দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিল, রাজমহল ও মালদহ পর্য্যন্ত করায়ত্ত করিয়া লইল। আরঙ্গজীব এই সকল কথা অবগত হইয়া, ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপন পৌত্র আজিমশ্বান্‌কে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

সভাসিংহ পাঠানের সহয়তা লইয়া স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার আয়োজন

কেবল [illegible]ন। মোগল নিদ্রামগ্ন, পাঠান নতশির ;—এসময়ে কাহারও সাহায্য [illegible]ক্ষা না করিয়া বাহুবলে হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে কি হইত, সভাসিংহ তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। সভাসিংহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গলা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সভাসিংহ যখন মোগলপ্রতাপ বিদ্ধস্ত করিতেছিলেন, তৎসমকালে দক্ষিণ-বঙ্গে আর এক জন বাঙ্গালী স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার আয়োজন করিতে-ছিলেন। ইনিই ইতিহাসবিখ্যাত সীতারাম রায়। মুর্সিদ কুলী খাঁ যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করেন, তখন সীতারামের নাম দক্ষিণ বঙ্গে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সীতারাম পাঠানকে আহ্বান করেন নাই, একাকী বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সীতারাম দেশ লুণ্ঠন করেন নাই, ধীরে ধীরে যাহা হস্তগত করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। সীতারামের স্বাধীন রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই; প্রভাতের সুখস্বপ্নের মত অল্পক্ষণেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন তাহার সকল কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিবারও উপায় নাই। কিন্তু সেই সুখস্বপ্নলুব্ধ কায়স্থসন্তান ষোল বৎসর ধরিয়া কেমন করিয়া নিপুণ হস্তে রাজ্যের গঠন ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবার অবসর পায় নাই,—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কি সে-কালে, কি একালে, বাঙ্গালী সীতারামের ইতিহাস সংকলনের জন্য সময় ও অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় নাই। সেই জন্য সীতারামের জন্মভূমিতে সীতারামের উপন্যাস আছে, সীতারামের ইতিহাস নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুর্সিদ কুলী খাঁ ব্রাহ্মণসন্তান। দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান, সুতরাং অতি অল্প বয়সেই দাস-বিপণীতে নীত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ব্রাহ্মণবালক হাজি সুফিয়া নামক এক জন সম্পন্ন মুসলমানের ক্রীতদাস হন। বালকের স্নিগ্ধো-জ্জ্বল কিশোরকান্তি দেখিয়া মুসলমান স্নেহার্দ্র হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর দাসকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ আপন পুত্রদিগের সঙ্গে ইস্পাহান নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে দেশে ব্রাহ্মণবালকের তীক্ষ্ণ প্রতিভা অল্প দিনেই বিবিধবিদ্যা অধিকার করিল,

পুত্রগণ ক্রীতদাস বলিয়া কোনও রূপ অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিলেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণবালক জাফর খাঁ নামে পরিচিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাফর যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ কলহ; গোদাবরী, নর্ম্মদা ও কাবেরীর জলস্রোত উত্তীর্ণ হইয়া, মোগল সেনা সুদূর দাক্ষিণাত্যের বিবিধ জনপদে মোগল-পতাকা বিস্তার করিয়াছে; মুসলমান শাসন সমূলে উৎখাত করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবার আশায়, গিরিদুর্গবিজয়িনী মহারাষ্ট্রবাহিনী "হর হর মহাদেও" রবে অসি হস্তে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে; স্বয়ং সম্রাট আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই জাফর খাঁ দাক্ষিণাত্যে বেরার প্রদেশের মুসলমান দেওয়ান হাজি আব্দুল্লার অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের বিশেষ কোনও গৌরব ছিল না; কিন্তু প্রতিভাগুণে এই সামান্য পদে থাকিয়াই জাফর খাঁ সম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তখন আর পদোন্নতিলাভে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমে করতলপ খাঁ উপাধি পাইয়া হায়দ্রাবাদের দেওয়ান হইলেন, এবং তথা হইতে বিশৃঙ্খল বাঙ্গলা দেশের রাজস্বনির্ণয়ের জন্য ১১১৩ সালে ঢাকার নবাব দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। * করতলপ খাঁ সেই সূত্রে মুর্সিদ কুলী খাঁ নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন। †

হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, শিক্ষা দীক্ষা এবং সহবাসবশে কুলী খাঁ খাঁটি মুসলমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমান শাসনে ঐকান্তিক অনুরাগ, মুসলমান শক্তির বিস্তারে অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিল বলিয়া, কুলী খাঁ মুসলমানদিগের নিকটে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তিনি যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করেন, এ দেশের তখন এতই বিশৃঙ্খল অবস্থা যে, অন্যান্য দেশের রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া বাঙ্গলা

---

* দেওয়ানের প্রধান কার্য্য ছিল রাজস্বসংগ্রহ। নবাব-দেওয়ানের সনন্দে কি কি কথা লিখিত থাকিত, তাহার একটি আদর্শ, Dow's History of Hindoostan নামক ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে।

† অর্ম্মি সাহেব ইঁহাকে জাফর খাঁ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

দেশ রক্ষা করিতে হইত। রাজকর সংগৃহীত হইত না,—যাহা হইত, তাহাতে সামরিক ব্যয়ই কুলাইয়া উঠিত না।

অধিক দিন বিশৃঙ্খল ভাব থাকিল না। সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্বান্ তখন বাঙ্গলার নবাব নাজিম। তিনি বাহুবলে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থান পদানত করিলেন, কুলী খাঁ কঠোর হস্তে রাজকর সংগ্রহ করিয়া বৎসরে এক কোটী টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাঙ্গলা দেশে মোগলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সূত্রপাত হইল। ইহাতে কুলী খাঁর প্রশংসাবাদে দিল্লীর দরবার পূর্ণ হইয়া পড়িল। আজিমশ্বানের তাহা সহ্য হইল না। তিনি গোপনে কুলী খাঁকে হত্যা করিয়া কণ্টক দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। কণ্টক দূর হইল না, আজিমশ্বানই বাঙ্গলা দেশ হইতে তাড়িত হইলেন। কুলী খাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা দেশের রাজস্বনির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করিলেন।

মোগল যত দিন সেনাসাহায্যে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততদিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তরবারি সাহায্যে দেশ জয় করা সহজ কথা, তরবারি সাহায্যে দেশ শাসন করা সহজ কথা নহে। লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া কিছু কাল তাহাদিগকে পদানত রাখিয়া ফল কি? তাহারা ত অবসর পাইলেই আবার অধীনতা অস্বীকার করিবে? কুলী খাঁ তাহা বুঝিলেন। তিনি তরবারির শাসন রহিত করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন। সমুদায় দেশ ১৩ চাক্‌লায় বিভক্ত করিয়া চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন, এবং রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা দেখিলে, তৎক্ষণাৎ একের জমিদারী অন্যের নামে লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দখলী সনন্দ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যাঁহারা এতদিন বহিঃশত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া সেকালের অধীনতা অস্বীকার করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে এখন গৃহভেদী জ্ঞাতিশত্রুর গোপন আক্রমণের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে হইল। সে আক্রমণের গতিরোধ করা সহজ নহে। নূতন নূতন সাহসী প্রতিভাশালী ধনাকাঙ্ক্ষিগণ নবাবের উৎসাহে বিদ্রোহী জমিদারগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া নূতন নূতন রাজবংশ সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ও রাজধানী সংস্থাপিত হইতে লাগিল। এই সকল নবোদগত রাজ্য মোগলের অধীন হইল, কিন্তু বিচক্ষণ মোগলপ্রতিনিধি এই সকল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা থাকিল, জীবন মরণের বিচারক্ষমতা থাকিল, স্বদেশে ইচ্ছানুরূপ রাজ্য-শাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল, কেবল বর্ষে বর্ষে মোগল বাদশাহকে রাজকর দিবার বাধ্যতা রহিয়া গেল। সুতরাং অনেকেই সহজে ইহাতে সম্মত হইয়া মোগলকে করপ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করা ত সহজ হইল, কিন্তু মোগলকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন করা কি সম্ভব নহে? বাঙ্গালী সে কথা ভাল করিয়া বিচার করিতে সম্মত হইলেন না। মোগলের বাহুবল কত? মোগল সেনার শিক্ষাকৌশল কিরূপ? কি উপায়ে দুর্গরচনা করিলে, কি প্রণালীতে সেনার শিক্ষা দিলে, কর প্রদান না করিয়াও স্বাধীন রাজ্য গঠন করা যায়, সে কথা কাহারও মস্তকে স্থানলাভ করিল না। আশু নিরুদ্বেগ হইবার জন্য সকলেই করপ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু করপ্রদান করিয়াও নিষ্কৃতি হইল না। মুর্সিদ কুলী খাঁ "শুভ পুণ্যাহ" নামে এক নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। বৈশাখ মাসে রাজধানী মুর্সিদাবাদের শেঠভবনে এই পুণ্যাহের সূচনা হইল।* যাহার নিকট যত রাজকর প্রাপ্য, তাহা পরিশোধ না করিলে আগামী বর্ষের জন্য কাহাকেও জমিদারী-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইত না। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জমিদারী ভোগ করিবার ভরসায় পদানত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, জমিদারীর জীবন কেবল এক বৎসর। যে কারণেই হউক, বৎসরের রাজকর কপর্দ্দক মাত্র বাকী থাকিলে, পর বৎসরে জমিদারী অন্যের হস্তগত হইবে। তখন মোগল রাজনীতির গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন।

মুর্সিদ কুলী খাঁ আপন দৌহিত্রীপতির উপর রাজস্ব সংগ্রহের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহার অত্যাচারের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। কত জমিদার বন্দী হইলেন, কত জনের রাজবাটী ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল, কত জনকে বাঁধিয়া মুর্সিদাবাদে লইয়া চলিল! সেখানে নানাপূতিগন্ধময় অপবিত্র দ্রব্যে এক নরকহ্রদ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে;—গর্ব্বান্ধ মুসলমান

হিন্দু জমিদারগণ সশরীরে সেই বৈকুণ্ঠে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন! মান গেল, সম্ভ্রম গেল, ধর্ম্ম গেল, স্বাধীনতা ত পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল; মুসলমান শাসনের উপর লোকের মন ক্রমেই বিচলিত হইয়া উঠিল। (১)

এই সকল বিশৃঙ্খলার অবসর পাইয়া, সীতারাম ধীরে ধীরে মহম্মদপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন; এক জন ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সীতারাম কায়স্থ বটে,—কিন্তু পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থ; (২) পাছে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিলে সীতারামের বীর চরিত্রে বাঙ্গালীর কলঙ্ক বিদূরিত হয়, ইহাই বোধ হয় 'ইতস্ততের' মূল!

যাঁহারা পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ, তাঁহাদের জীবনচরিত সমালোচনা করিবার সময়ে সহসা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে বাঙ্গালী করযোড়ে মোগলের দ্বারদেশে সসম্ভ্রমে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান, সীতারাম যে সেই বাঙ্গালী, সে কথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সমসাময়িক বাঙ্গালী যে ভাবে চিন্তা করিতেন, যে ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, সে উপায়ে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, সীতারাম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই;—বোধ হয়, সেই জন্যই ইংরাজ লেখক তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তথাপি সীতারাম যে বাঙ্গালী কায়স্থ, সে বিষয় আর নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই,—তাঁহার বংশ বাঙ্গলা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ক্রমশঃ।

---

(১) যাঁহারা এই বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থার সবিস্তার কাহিনী পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা ষ্টুয়ার্ট-কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করিবেন; ইংরাজ দপ্তরের কাগজপত্রেও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

আয়না। *

লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, জাপানী প্রাচ্য ভূখণ্ডের ফরাসী। সে যাহাই হউক, ফরাসীর কতকগুলা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে জাপানী ও ফরাসীর মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই লক্ষিত হয় না।

ফরাসী বালিকা জন্মগ্রহণমাত্র সহজাতসংস্কারবশে, একখানি আয়নার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করযুগল প্রসারিত করে। সেই আয়নায় সে আপনার সুন্দর ক্ষুদ্র মুখ এবং অঙ্গচালনশোভা দর্শন করিবে, এবং তদুভয়ের প্রশংসা করিবে। বালিকা যেমন বর্দ্ধিত হয়, তাহার এই স্বভাবজ রুচিও তেমনিই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বালিকার সপ্তদশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই চারি দিকে মুকুরমণ্ডিত কক্ষে অবস্থানই তাহার সুখের চরম আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। সত্য-সত্যই ভারসেলসের প্রাসাদে একটি কক্ষ আছে, সেটি ফরাসী রমণীর নিকট স্বর্গতুল্য। সেই দীর্ঘ কক্ষ হর্ম্ম্যতল হইতে ছাদ পর্য্যন্ত মুকুরে মণ্ডিত ; আবার হর্ম্ম্যতল এমনই পালিশ করা যে, তাহাতে পদতলের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়।

জাপানে উক্বি নামক গ্রামে, আয়না কাহাকে বলে, লোকে তাহাই জানিত না। সেখানে আপনাপন চেহারা সম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে হইলে, বালিকাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগের প্রেমিকগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করিতে হইত। বলাই বাহুল্য যে, প্রেমিকগণের প্রেমের প্রগাঢ়তার তার-তম্যের অনুসারে সৌন্দর্য্যবর্ণনারও তারতম্য হইত।

এক জাপানী যুবক জাপানের জিন্‌রিকস্‌ গাড়ী টানিত। সে এক দিন রাস্তায় একখানা ক্ষুদ্র আয়না কুড়াইয়া পাইল ; বোধ হয়, কোনও ইংরাজ-মহিলা জাপানে ভ্রমণকালে উহা ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

কিকিট্‌সাম ইতিপূর্ব্বে কখনও আয়না দেখে নাই। সে আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সে দেখিল যে, মুকুরমধ্যে তাম্রবর্ণ, বুদ্ধিব্যঞ্জক চক্ষুবিশিষ্ট, বিস্ময়বিস্ফারিত একখানা মুখ দেখা যাইতেছে।

কিকিট্‌সাম সেখানে জানু পাতিয়া বসিল, এবং সেই মুখ খানার দিকে

চাহিতে চাহিতে আপানাপনি মৃদুস্বরে বলিল, "এ আমার পরলোকগত পিতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার ছবি এখানে কেমন করিয়া আসিল? বোধ হয়, কোনও কারণে তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।"

সে রুমাল দিয়া সযত্নে আয়নাখানি মুড়িয়া ঢিলা জামার পকেটে রাখিল। বাটী ফিরিয়া অন্য কোনও গোপনীয় স্থানের অভাবে সেখানা একটা কলসের মধ্যে স্থাপন করিল; সে কলসটা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত না। কিকিটুসাম তাহার স্ত্রীকে এ কথা বলিল না। কারণ সে ভাবিয়া দেখিল যে, রমণীগণের কৌতূহল বড় বেশী, তাহাতে আবার স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। কিকিট্সাম বুঝিল যে, তাহার মৃত পিতার প্রতিমূর্ত্তি রাস্তায় কুড়াইয়া পাইবার কথা, প্রতিবাসীদের মধ্যে জানাজানি হওয়া উচিত নহে।

কিছু দিন ধরিয়া কিকিট্সাম বড়ই উদ্বিগ্ন রহিল। সে সর্ব্বদাই কেবল পিতার আলেখ্যের কথা ভাবিত, এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিয়া যাইত।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও সকল রহস্যজালজড়িত বা অসাধারণ কার্য্যের জন্য স্বামীকে স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কেন যে তাহার স্বামী যখন তখন বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিল, লিলিট্সি তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশ্যই স্বামী যখনই গৃহে আসিত, তখনই স্ত্রীর মুখচুম্বন করিত। কিকিট্সাম স্ত্রীকে বলিত যে, সে তাহাকে দেখিবার জন্যই এইরূপে গৃহে আসে। প্রথম প্রথম লিলিট্সি সে কথায় বিশ্বাস করিত—ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিকই বটে। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, স্বামী চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীরবদনে প্রতিদিন যখন তখন গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল—তখন তাহার সন্দেহ হইল যে, তাহার স্বামী তাহাকে সত্য কথা বলিতেছে না। লক্ষ্য করিয়া লিলিট্সি দেখিল যে, স্বামী গৃহে আসিয়া, একবার একাকী গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে না গিয়া চলিয়া যাইত না।

কোনও রহস্য ভেদ করিবার সময় জাপানী রমণীগণও অন্য দেশের রমণীগণের ন্যায় অধ্যবসায়শালিনী হইয়া উঠে; লিলিট্সি এই রহস্য ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে প্রতিদিন সেই কক্ষে অনুসন্ধান করিত, কিন্তু নূতন কিছুই দেখিতে পাইত না।

এক দিন লিলিট্সি সহসা দেখিল যে, সে যে কলসের মধ্যে গোলাপের

তেছে। কিকিট্সাম বলিল যে, সেটা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে যথাস্থানে স্থাপন করিতেছিল; তাহার স্ত্রী স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিবার ভাণ করিল; কিন্তু স্বামী গৃহ হইতে গমন করিবামাত্র, একখানা টুলের উপর উঠিয়া, কলসমধ্য হইতে আয়না খানি বাহির করিল। না জানি এ কি হইবে ভাবিয়া, সে সেই আয়না খানি ভাল করিয়া দেখিল; দর্শনমাত্র সেই ভীষণ সত্য বুঝিতে পারিল। সর্ব্বনাশ!

ইহা ত কোনও স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি—আর সে কিকিট্সামকে এত ভাল, এত অনুরক্ত ভাবিয়া থাকে!

তাহার দুঃখ কথায় ব্যক্ত হয় না।

লিলিটুসি মেজের উপর বসিয়া পড়িল, আয়না খানা তাহার অঙ্কে পড়িয়া রহিল। তবে এই জন্যই তাহার স্বামী এতবার গৃহে আসেন! হায় হায়, এই রমণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্যই তাঁহার এত ব্যগ্রতা!

তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; সে আবার আয়না খানি দেখিল। আয়নার মধ্য হইতে সেই মুখ তাহার দিকে চাহিল; সে অবাক হইয়া গেল,—তাহার স্বামী কেমন করিয়া ঐ মুখের, ঐ দুষ্টামীব্যঞ্জক চক্ষের প্রশংসা করিতে পারেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এবার সে আয়নার সেই চেহারায় একটা নূতন ভাব দেখিতে পাইল, পূর্ব্বে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই; সে ভয় পাইয়া স্থির করিল যে, সে আর সেখানার দিকে চাহিবে না।

আর কোনও কাজ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না; সে তাহার স্বামীর আহার্য্য প্রস্তুত করিল না। সেই আয়না ও আপনার ক্রোধ লইয়া হর্ম্ম্যতলে বসিয়া রহিল। কিকিট্সাম্ গৃহে ফিরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; দেখিল, তাহার আহারের কোনও আয়োজনই নাই, তাহার স্ত্রীও নাই। সে কক্ষে কক্ষে স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ব্যাপারখানা কি, তাহা বুঝিতে পারিল।

লিলিটুসি বলিল, "এই তোমার প্রণয়? আজও এক বৎসর আমাদের বিবাহ হয় নাই, ইহারই মধ্যে তুমি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছ?"

পত্নী পাগল হইয়াছে ভাবিয়া ভীত হইয়া তাহার স্বামী বলিল, "লিলিটুসি, কি বলিতেছ?"

"আমি কি বলিতেছি? তুমি কি বলিতেছ? তুমি আমার গোলাপের দলের মধ্যে কি প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছ? এই লও—যত্ন করিয়া ইহা রাখিয়া

দাও—আমি এই দুষ্ট রমণীর প্রতিমূর্ত্তি চাহি না।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

বিস্মিত হইয়া তাহার স্বামী বলিল,"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আমি কিন্তু পারিতেছি। তুমি ঐ কুৎসিত ভীষণদর্শন রমণীকে তোমার পত্নীর অপেক্ষা অধিক ভালবাস। সে যদি সুন্দরী হইত, তবে আমি কিছু বলিতাম না; উহার মুখশ্রী হীন, কুৎসিত; উহার চক্ষুতে দুষ্টামী জাজ্বল্যমান; উহাতে সকল কুভাব প্রকাশিত হইতেছে।"

ক্রোধান্বিত হইয়া কিকিট্সাম্ বলিল "লিলিট্সি, বলিতেছ কি! উহা আমার পরলোকগত পিতার প্রতিকৃতি। আমি ওখানা রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়া কলসমধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম।"

মিথ্যাকথা শুনিয়া ক্রোধে লিলিট্সির নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; সে চেঁচাইয়া বলিল,"বটে! তুমি কি বলিতে চাহ যে, আমি রমণীর মুখ আর পুরুষের মুখ চিনিতে পারি না?"

কিকিট্সামও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তখন কলহ প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। গৃহের সদরদরজা একটু খোলা ছিল; একজন পুরোহিত পথে যাইতে যাইতে তাহাদের কলহের স্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি মুক্ত দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, এত রাগ কেন! এ কলহ কেন?"

কিকিট্সাম বলিল, "আমার স্ত্রী পাগল হইয়াছে।"

পুরোহিত বলিলেন,"সকল স্ত্রীলোকই কম বেশী পাগল। যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা তোমার উচিত। কলহ করিয়া কোনও ফল নাই; পত্নীগণ পতির পরীক্ষাস্থল।"

"কিন্তু সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে!"

লিলিট্সি বলিল, "না, তাহা নহে। আমার স্বামী অন্য এক রমণীর প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছেন; আমি তাহা পাইয়াছি।"

কিকিট্সাম বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিমূর্ত্তি আমার নাই।"

গম্ভীরভাবে পুরোহিত বলিলেন, "আমাকে সে খানা দেখাও।"

সম্মুখে মস্তক নত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কলহ পরিত্যাগ করিয়া, সুখে ও শান্তিতে একত্র বাস কর। তোমরা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছ। ইহা কোনও পবিত্রচেতা পুরোহিতের আলেখ্য। তোমরা কি এমন পবিত্র মুখ দেখিয়াও ভুল করিয়াছ? আমি ইহা লইয়া গিয়া ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়া দিব।

তিনি হস্ত তুলিয়া দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাহার পর এই অনিষ্টের মূলকারণ আয়নাখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিদ্যাপতি।

"মহারাজাধিরাজ" শিবসিংহ যে দানপত্র বা শাসন অনুসারে "নবজয়দেব" "সুকবি" "পণ্ডিতঠক্কুর" বিদ্যাপতিকে জরইল তপ্পান্তর্গত নদীমাতৃক, সারণ্য সসরোবর, প্রচুরোর্ব্বর, পৃথুতরাভোগ বিসপী গ্রাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে দান করিয়াছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণপত্রিকায় মান্যবর গ্রীয়ার্শন সাহেব তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

এই দানপত্রে তিন স্থানে সন তারিখের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

(১) লসং ২৯২ শ্রাবণ শুক্ল ৭ গুরৌ।
(২) অব্দে লক্ষণসেনভূপতিমতে বহ্নিগ্রহ দ্ব্যঙ্কিতে মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকেমুনিতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
(৩) সন ৯০৭ সংবৎ ১৪৫৫ শাকে ১৩২১।

ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অথচ প্রথমটি অঙ্কে রাখিয়া দ্বিতীয়টি অক্ষরে রাখিবার জন্য লিখা হইয়াছিল। এখন, বহ্নি অর্থে তিন বুঝায়, সুতরাং বহ্নি-গ্রহ-দ্বি-অঙ্কিতের অর্থ ২৯৩ হইয়া পড়ে। বোধ হয়, অঙ্কের লিখায় ভুল হইয়াছে।

সন, সংবৎ ও শকাব্দ হইতে জানা যায়, ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দানপত্র রচিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেনের অব্দ কখন আরব্ধ হইয়াছিল, ইহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে বিস্তর কলহ হইয়াছে। এই দানপত্র অনুসারে ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। রাজার অভিষেকসময় হইতে কি মৃত্যুর পরে এ অব্দের আরম্ভ, এখানে তাহার বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই।

श्रीराम।

श्रीगौरीशङ्कराभ्यां नमः ॥ सिद्धि ॥

श्रीगजरथपुरात् समस्तप्रक्रियाविराजमानश्रीमाभेश्वरीवरलब्धप्रसादभवानी-भक्तिभावनापरायणरूपनारायणमहाराजाधिराजश्रीमत्शिवसिंहदेवपादाः समरविजयिनः जरइलतप्पायां विसपीग्रामवास्तव्यसकललोकान् भूकर्षकांश्च समादिशन्ति ज्ञातमस्तु भवतां ग्रामीऽयमस्माभिः सप्रक्रियाभिनवजयदेवमहाराजपण्डितठक्कुरश्रीविद्यापतिभ्यः शासनीकृत्य प्रदत्तो ग्रामकस्था यूयमेतेषां वचनकरीभूकर्षणादि कर्म्म करिष्यतेति लसं २९२ ॥ श्रावणशुक्ल७गुरौ ॥ श्लोकास्तु ॥

अब्दे लक्ष्मणसेनभूपतिमते वह्निग्रहद्वयङ्किते
मासि श्रावणसंज्ञके मुनितिथौ पक्षेऽवलक्षे गुरौ।
वाग्वत्याः सरितस्तटे गजरथेत्याख्याप्रसिद्धे पुरे
दित्सोत्साहविबद्धबाहुपुलकः सभ्यायमध्ये सभम् ॥
प्रज्ञावान् प्रचुरोर्व्वरं पृथुतराभोगं नदीमातकं
सारण्यं ससरोवरं च विसपीनामानमासीमतः।
श्रीविद्यापतिशर्म्मणे सुकवये पुत्रादिभिर्भुञ्जतां
स श्रीमान् शिवसिंहदेवनृपतिर्ग्रामं ददौ शासनम् ॥
येन साहसमयेन शस्त्रिणा तुङ्गवाहवरपृष्ठवर्त्तिना
अश्वपतिबलयोर्बलं जितं गज्जनाधिपतिगौड़भूभुजाम् ॥
रौप्यकुम्भ इव कज्जलरेखा श्वेतपद्म इव शैवलवल्ली।
यस्य कीर्त्तिनवकेतकान्तरा म्लानिमेति विजितो हरिणाङ्कः ॥
द्विषन्नृपतिवाहिनीरुधिरवाहिनीकोटिभिः
प्रतापतरुवृद्धये समरमेदिनी प्लाविता।
समस्तहरिदङ्गनाचिकुरपाशवासक्षमं
सितप्रसरपाण्डरं जगति येन लब्धं यशः ॥
मतङ्गजरथप्रदः कनकदानकल्पद्रुम-
स्तुलापुरुषमद्भुतं निजधनैः पिता दापितः।
सुखानि च महात्मना जगति येन भूमिभुजा
परापरपयोनिधिप्रथममैतपावं सदा ॥
नरपतिकुलमान्यः कर्णाश्चिन्तावदान्यः

निजचरितपवित्रो देवसिंहस्य पुत्रः
स जयति शिवसिंहो वैरिनागेन्द्रसिंहः ॥
ग्रामे गच्छत्यमुष्मिन् किमपि नृपतयो हिन्दवोन्ये तुरुष्का
गोशीलस्वात्ममांसैः सहितमनुदिनं भुञ्जते ते स्वधर्मं ।
ये चैनं ग्राममत्रं नृपकरहितं पालयन्ति प्रतापै-
स्तेषां सत्कीर्त्तिगाथा दिशि दिशि सुचिरं गीयतां वन्दिवृन्दैः ॥
सन ९०७ सम्वत् १४५५ शाके १३२१ शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥

এই দানপত্রে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে "নব-জয়দেব" ও "সুকবি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি যে নিজগুণে "স্বপ্রক্রিয়াভিঃ" জয়দেবের সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন; সভাসদ্দিগকে উৎসাহ দিয়া তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। এই সকল কারণে তিনি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য বিসপী গ্রাম বিদ্যাপতিকে দান করিয়াছিলেন। বিসপীর বর্ত্তমান নাম বিসফী।

রাজদরবারে এতাদৃশ সম্মানলাভ বালকের ভাগ্যে ঘটে না। আমরা অনুমান করিতে পারি, এই সম্মানলাভের সময়ে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন পঁচিশ বৎসর হইয়া থাকিবে। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য অনুমান করেন, খ্রীষ্টীয় ১৩৮২ অব্দে বিদ্যাপতির জন্ম হয়; অর্থাৎ আঠার বৎসর বয়সের সময় এ দানপত্র প্রাপ্ত হন। এ কথা কত দূর সঙ্গত, পাঠকগণ অনুমান করিবেন।

বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি সম্পূর্ণ করেন; ইহার অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, ১৩৭০/৭৫ হইতে ১৪৭০/৭৫ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনকাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভৈরব সিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার রাজত্বকালে "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হয়। বিদ্যাপতির অমানুষী জীবনীশক্তি কল্পনা না করিলে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এবং এরূপ কল্পনা করিলে, বিদ্যাপতিকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক করিয়া লওয়া হয়। অথচ, বিদ্যাপতি যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বৈষ্ণবমাত্রই স্বীকার করেন। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহ দর্পনারায়ণ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচিত হইয়া থাকিলে, বিদ্যাপতি উহা রচনা করিয়াছিলেন, সম্ভব

পিতার জীবিতাবস্থায় শিবসিংহকে মহারাজ বলিত। এইরূপে নরা-নারায়ণের জীবিতকালে, তাঁহার দুই পুত্র বীরসিংহ ও ভৈরব সিংহ, রূপ-নারায়ণকে রাজা বা ভূপতি বলিয়া উল্লেখ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রূপনারায়ণকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া, ভৈরবসিংহে হরিনারায়ণ উপাধির আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ভৈরব-সিংহের উপাধি রূপনারায়ণ ছিল।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ শিবসিংহের দানপত্রের কিয়দংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার সহিত মিলাইলে, তাহাতে এই কয়েকটি ভ্রম লক্ষিত হইবে।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১ম পংক্তি—ভূপতিমিতে।	ভূপতিমতে।
ষ্যঙ্কিত।	এটি শুদ্ধ পাঠ, কিন্তু মূলে দ্যঙ্কিত আছে।
২য় পংক্তি—শুভতিথৌ।	মুনিতিথৌ (সপ্তমী তিথিতে)
৪র্থ পংক্তি—বিবর্দ্ধ।	বিবৃদ্ধ।
৬ষ্ঠ পংক্তি—বিসপীনামানমসীমতঃ।	বিসপীনামানমাসীমতঃ।
৭।৮ পক্তি—	
শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে স্থকবয়ে রাজাধিরাজ-কৃতী বীর-শ্রীশিবসিংহনৃপতিগ্রামং দদৌ শাসনম্।	শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে পুত্রাদিভির্ভুং ক্ষতাং স শ্রীমান্ শিবসিংহদেবনৃপতিগ্রামং দদে শাসনম্।

"শাসনপত্র।

"শ্রীরাম।

"হরপার্ব্বতীকে নমস্কার। সিদ্ধি।

"ঝামেশ্বরীর অনুগ্রহে প্রশান্তচিত্ত ক্রিয়াবান্ ভবানীভক্ত ধ্যানপরায়ণ সমরবিজয়ী মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শিবসিংহদেব (যাঁহার অপর নাম রূপনারায়ণ) গজরথপুর হইতে জরইল তপ্পার অন্তর্গত বিসপীগ্রামনিবাসী জনগণ ও কৃষকসমূহকে আদেশ করিতেছেন যে, এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমরা স্বীয় কৃতি দ্বারা জয়দেবের সমকক্ষ মহারাজ-পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরকে এই গ্রাম শাসনপত্র দ্বারা দান করিলাম। আপনারা ইঁহার আদেশ অনুসারে কর্ষণাদি কার্য্য করিবেন ইতি। লসং ২৯২, শ্রাবণ মাস, শুক্লপক্ষ ৭মীতিথি, বৃহস্পতিবার।

শ্লোক।

"বাগ্বতীনদীর তীরস্থিত প্রসিদ্ধ গজরথপুরবাসী, দানে মুক্তহস্ত, প্রজ্ঞাবান্, নৃপতি শ্রীমান্ শিব সিংহ দেব ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের ৭মীতিথিতে বৃহস্পতিবারে সভামধ্যে সভাসদ্ সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার নিমিত্ত অবগোর

সাহসী, শস্ত্রসঞ্চালনক্ষম ও অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বর গজনীতর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন। রজতকুম্ভে কজ্জলরেখাসদৃশ, ও শ্বেতপদ্মে শৈবাললতিকার ন্যায়, অভিনবকেতকীকুসুমবৎ তাঁহার যশঃপ্রভা শশলাঞ্ছনকে মলিন করিয়াছিল। তিনি বিপক্ষ-সৈন্য-শোণিতের কোটি কোটি নদী দ্বারা স্বীয় প্রতাপতরু বৃদ্ধির নিমিত্ত সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিয়াছিলেন।

"তাঁহার যশোমালা দিগঙ্গনাগণের কেশপাশ বাসিত করিয়াছিল; তাঁহার যশঃপ্রভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইয়াছিল।

"তিনি অসংখ্য গজ ও রথ দান করেন; তিনি কল্পবৃক্ষের ন্যায় সুবর্ণরাশি বিতরণ করেন; তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত মনুষ্যের প্রতিকৃতি পিতা দ্বারা দান করাইয়াছিলেন; তিনি সুখ ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন; তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র সংযোজিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

"রাজকুলপূজ্য কর্ণসদৃশ দাতা পরমার্থপরায়ণ নৃপতি প্রভূত অর্থ বিতরণ দ্বারা যাচকগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; পবিত্রচরিত্র বৈরি-করি-কেশরী দেবসিংহপুত্র শ্রীমান্ শিবসিংহদেবের জয় হউক।

"যদি কোন হিন্দু অথবা তুরুষ্ক নরপতি এই গ্রাম বলপ্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি গোমাংস, শূকরমাংস, আত্মমাংস ভক্ষণ করিবেন ও তিনি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন।

"যাঁহারা রাজদত্ত এই গ্রাম সুশাসনে রাখিবেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিগাথা বন্দিগণ দিগ্দিগন্তে চিরকাল গান করিবে॥ সন ৯০৭ সংবৎ ১৪৫৫ শাক ১৩২১।

"শুভ হউক, শ্রী হউক॥"

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

"শ্রীমান্ নরসিংহ দেব মিথিলার অধিপতি। রাজগণের মুকুটমণি দ্বারা তাঁহার চরণ অর্চ্চিত। তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে আগত অর্থিগণকে মণি, সুবর্ণ, ভূমি ইত্যাদি বাঞ্ছাধিক দান করিয়া, কর্ণ ও কল্পবৃক্ষকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন।

"তদীয় পুত্র শ্রীমান্ ভূপতিধীরসিংহ। তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও প্রতাপবান্ ছিলেন। সমরক্ষেত্রে বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া দিগ্দিগন্তে যশোরাশি বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি সম্মানভাজন ও বিদ্যার আশ্রয় ছিলেন, সমরবিজয়ী ও সফলক্রিয় ছিলেন।

"শ্রীমান্ মহারাজ রূপনারায়ণের জয় হউক। যিনি স্বীয় শৌর্য্য দ্বারা পঞ্চগৌড়েশ্বরকে দমন করিয়াছিলেন; মহারাজ ভৈরব সিংহ যাঁহার অনুজ; যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় চিরস্থায়ী।

"তিনি বেদজ্ঞ, দেবীভক্তিপরায়ণ, আরদ্ধচিন্তাপর ও সমরে শত্রুবিজয়ী ছিলেন। প্রত্যক্ষ নারায়ণস্বরূপ ভূপতি রূপনারায়ণ সকলের কল্যাণসাধনার্থ বিদ্যাপতিকে দুর্গোৎসবপদ্ধতি রচনা করিতে আদেশ করেন।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

ইতিহাস।

মামুদ ও সোমনাথ।

ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের অত্যাচারে ভারতবর্ষের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। স্বধর্ম্মের প্রতি আত্যন্তিক ভক্তিবশতঃ, মুসলমান নৃপতিগণ, ভারতের প্রাচীন আর্য্য কীর্ত্তিকলাপ যেখানে যাহা পাইয়াছেন, যথাসাধ্য সকলই বিলুপ্ত করিয়াছেন। পরন্তু, এই ধর্ম্মান্ধতার বশেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ, সত্যের সহিত মিথ্যার যোজনা করিয়া, স্বজাতীয় বীরবৃন্দের সেই ধ্বংসের কার্য্যগুলিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্মান্ধ নৃপতির চূড়ান্ত উদাহরণ, স্থলতান মামুদ; এবং এইরূপ ধর্ম্মান্ধ ঐতিহাসিকের চূড়ান্ত উদাহরণ, ফেরিস্তা। আর মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথের মূর্ত্তিবিনাশ, এবং ফেরিস্তা-লিখিত তাহার বিবরণ, এইরূপ ধর্ম্মান্ধতার চূড়ান্ত কীর্ত্তি।

ভারতবর্ষে মস্‌লেম্।

স্থলতান মামুদ তাঁহার ষোড়শ আক্রমণ উপলক্ষে সোমনাথের মন্দির ও মূর্ত্তি বিচূর্ণ করেন, এ কথা আমরা বাল্যকাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি। মামুদের অস্ত্রাঘাতে সোমনাথের উদর বিদীর্ণ হইয়া রাশি রাশি মণি-মাণিক্য বর্ষণ করিয়াছিল, এ কথা কে না জানে? আর সোমনাথের সেবকগণ অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তিরক্ষার্থ মামুদকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাও কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু কথাগুলা একেবারেই অলীক। ব্রাহ্মণেরা ঘুষের প্রস্তাব করেন নাই; সোমনাথও আপন উদর হইতে মণি মুক্তা প্রসব করেন নাই। এ সকল কেবল "মুসলমানের রচা কথা।"

মামুদ ও সোমনাথ।

কেবল মুসলমানের রচা কথা নহে; ইহাতে সত্যপ্রিয় ইংরাজ ঐতিহাসিকেরও হাত আছে। আমরা বিগত অক্টোবর মাসের "কলিকাতা রিবিউ" অবলম্বন করিয়া সোমনাথ-বিনাশের প্রকৃত ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

১৭৬৭—৭২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ডো তাঁহার "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" প্রকাশিত করেন। ঐতিহাসিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি ফেরিস্তারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ফেরিস্তা যাহা বলেন নাই, এমন অনেক কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ গুলি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত; অথবা পারস্য-ভাষায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞানাভাবের ফল। বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত এই;—"সোমনাথের মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। মূর্ত্তিটি প্রস্তরে গঠিত; প্রায় পাঁচ গজ লম্বা; তন্মধ্যে দুই গজ মৃত্তিকা-তলে প্রোথিত। মামুদ মূর্ত্তি দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং হস্তস্থিত দণ্ডাঘাতে উহার নাক ভাঙ্গিয়া দিলেন। তার পর চূর্ণমূর্ত্তির দুই খণ্ড গজনীর মস্‌জিদ ও রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে স্থাপন করিবার জন্য চালান দিলেন। মক্কা ও মদিনায়

কর্ণেল ডো ও সোমনাথ।

ওমরাহগণ টাকা লইবার জন্য তাঁহাকে জিদ করিতে লাগিল। সোমনাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গিলেই পুতুল-পূজা বন্ধ হইবে না। কিন্তু সুলতান ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অর্থ লইয়া স্বদেশীয় সাধুদের মধ্যে বিতরণ করিলে অনায়াসে বেশ নাম কিনিতে পারিবেন। সুলতানের মন কতকটা ভিজিল বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমি পুতুল-বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে চাহি না; উহার ধ্বংসকর্ত্তারূপেই পরিচিত হইতে চাই।' সুতরাং পুতুল-ভাঙ্গার কাজ বন্ধ হইল না। অতঃপর তাঁহার অনুচরগণ সোমনাথের পেট চিরিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্য দেখ! পেটের ভিতর হইতে নাড়ি ভুঁড়ির পরিবর্ত্তে রাশি রাশি হীরা, চুণি, মুক্তা বাহির হইয়া আসিল! ব্রাহ্মণেরা মামুদকে যাহা দিতে চাহিয়াছিল, উহাদের মূল্য তাহার শতগুণ বেশি। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরা কেবল ধর্ম্মের জন্য মামুদকে টাকা দিতে চাহে নাই।" এই বৃত্তান্ত মোটামুটি ফেরিস্তারই অনুবাদ। তবে অনুবাদে প্রমাদ আছে। ব্রিগস্ ফেরিস্তার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা মূলের অধিকতর অনুগত। ডো-সাহেবের প্রদত্ত এই অনুবাদ দেখিয়াই গিবন্, জেম্‌স্ মিল, প্রাইস্, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকের দল প্রমাদে পড়িয়াছেন। কেবল সার্ উইলিয়ম্ হণ্টার তাঁহার 'গেজেটিয়রে' এই সোমনাথ-ব্যাপারের প্রকৃত ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রফেসার উইলসন সাহেবই কয়েক জন পারস্য ঐতিহাসিকের প্রমাণ দিয়া, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত বর্ণনার ভুল ধরিয়া দেন।

সম্রাট আকবরের আদেশে "তারিখ-ই-আলফি" নামক হিজিরা এক সহস্র বৎসরের এক ইতিহাস লিখিত হয়। ইহাও ফেরিস্তালিখিত বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তিমাত্র। ফেরিস্তা, মিরখন্দ-প্রণীত প্রসিদ্ধ "রৌজতস্-সাফা" নামক ইতিহাসের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু মিরখন্দের কথা এই—"মন্দির ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করা হইল। সোমনাথের মূর্ত্তিপ্রস্তর টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, কতকগুলি গজনীর মস্‌জিদের প্রবেশপথে স্থাপিত হইল।" ইহাতে ঘুষের প্রস্তাব, অথবা পেটের ভিতর মণি-মুক্তা প্রভৃতির কোনও প্রসঙ্গ নাই। মিরখন্দের পুত্র কিম্বা মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্র খোদামিরও ওরূপ কোনও কথা বলেন না। এ বিষয়ের সর্ব্বপ্রাচীন বিবরণ ইবুন্ আসির কর্ত্তৃক ১২৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেও ঘুষ বা পেট চেরার কোনও কথা নাই। ইবুন্ আসিরের সমসাময়িক লেখক ইবুন্ খলিকান আর একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "সোমনাথের কানে তিরিশটা মাক্‌ড়ী ছিল।" আবুল ফেদা বলেন,—"সোমনাথকে পোড়াইয়া ফেলা হয়।" এইরূপ নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। তাহা লইয়া আমরা আর পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। আমরা কেবল ঘটনার সমকালীন লেখক আল-বিরুনীর কথা পাঠককে উপহার দিয়া বিদায় লইতেছি। এ বিষয়ে আলবিরুনীর "তারিখ-ই-হিন্দ" নামক গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণই প্রকৃত ও প্রামাণিক। পাঠক দেখিবেন, সোমনাথের হস্তপদবিশিষ্ট কোনও মূর্ত্তিই ছিল না;—উহা প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ মাত্র।

মিরখন্দ ও সোমনাথ।

"হিন্দুরা বলেন, নক্ষত্র সকল প্রজাপতির দুহিতা। উহারা সকলেই চন্দ্রের বিবাহিতা। কিন্তু চন্দ্র রোহিণীতেই অধিকতর অনুরক্ত। অপরাপর স্ত্রীগণ চন্দ্রের এই পক্ষপাতের কথা প্রজাপতিকে জানাইল। প্রজাপতি প্রথমতঃ তারাপতিকে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে কোনও প্রতিকার না হওয়াতে, তিনি চন্দ্রকে এই অভিশাপ দিলেন যে, 'তুমি কুষ্ঠগ্রস্ত হও।' তখন চন্দ্রদেবের অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি প্রজাপতিকে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

আলবিরুনীর উপাখ্যান।

তখন চন্দ্র বলিলেন,—'কি প্রকারে আমি পাপমুক্ত হইব, বলিয়া দিন।' প্রজাপতি উত্তর করিলেন,—'তুমি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা কর।' চন্দ্র তাহাই করিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম, 'সোমনাথ'। সোম=চন্দ্র, নাথ=প্রভু। সুতরাং সোমনাথ শব্দের অর্থ, চন্দ্রের প্রভু। সুলতান মামুদ এই লিঙ্গমূর্ত্তি বিনষ্ট করেন। ভগবান মামুদের কল্যাণ করুন। (হিজিরা ৪১৬।) মামুদ, মূর্ত্তির উত্তরার্দ্ধ একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। অপরার্দ্ধ বেশভূষা ও সুবর্ণ রত্নাদি সহ গজনীতে নীত হইল। প্রস্তরমূর্ত্তির এক খণ্ড, থানেশ্বর হইতে আনীত পিত্তল-গঠিত 'চক্রস্বামী' বিগ্রহের ন্যায়, সহরের সার্কাস-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। আর এক খণ্ড গজনীর মস্‌জিদের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে—on which people rub their feet to clean them from dirt and wet."—(ভক্তগণ মার্জ্জনা করিবেন. আমরা ছত্র টুকু অনুবাদ করিলাম না বটে, কিন্তু ইতিহাসের অনুরোধে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।)

মন্তব্য।

রিবিউর লেখক বলেন, "এই সোমনাথসংক্রান্ত চন্দন-তোরণের কথাগুলাও মিথ্যাতে পরিপূর্ণ। মামুদ উক্ত তোরণ গজনীতে লইয়া যাইবার আট শত বৎসর পরে, একজন অভি-নয়প্রিয় গবর্ণর জেনেরল (লর্ড এলেনবরা) আফ্‌গানিস্তান হইতে উহাকে পুনরানয়ন করিয়া হিন্দুপ্রজার সান্ত্বনার্থ ভারতবর্ষের সহরে সহরে দেখাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই তোরণ যে কৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে উহা চিরদিন একটা কদর্য্য জাল ও প্রকাণ্ড তামাসা বলিয়া গণ্য হইবে।"

সাহিত্য।

জর্জ্জ ইলিয়ট।

ইংরাজী সাহিত্যের মহারথীদিগের চিত্রশালায় প্রবেশ করিলে যে সকল যশঃসমুজ্জ্বল চিত্র প্রথমেই দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, জর্জ্জ ইলিয়টের চিত্রও তন্মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তাঁহার বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়,—তাঁহার মত রমণী কেমন করিয়া অমন সুন্দর উপন্যাস রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সে সকল ছাড়িয়া আমরা কেবল সাহিত্যের হিসাবে তাঁহার কথা আলোচনা করিব। সে সম্বন্ধে "ফোরাম" পত্রে প্রকাশিত মিষ্টার ফ্রেডরিক হ্যারিসনের প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

যশ।

লেখক বলেন যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে অসঙ্গত অধিক যশঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতিকূল স্রোত বহিতেছে, তাঁহার যশোহানি হইতেছে। এই প্রতিকূল স্রোত এতদূর বহিয়াছে যে, এখন লোকে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য এবং উৎকৃষ্ট ক্ষমতার কথাও স্বীকার করিতে চাহে না। সেক্সপীয়রের সহিত তাঁহার তুলনা করা সমীচীন নহে, তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার তুল্য শক্তি সাহিত্যসংসারে সহজ-প্রাপ্য নহে। তাঁহার প্রচুর ও প্রকৃত শিল্পকৌশল ছিল এবং তাঁহার দর্শনজ্ঞান ও বিজ্ঞানব্যুৎপত্তিতে বরং সময় সময় সে কৌশল নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যে তাঁহার উচ্চস্থানলাভ দর্শন হইতে নহে, পরন্তু এই শিল্পকৌশল হইতে। অধিক বয়সের সময় তিনি যে সকল রোমান্স রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকলই তাঁহার যশঃস্তম্ভ। তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থনিচয় জটিলতাবর্জ্জিত।

সাইলাস মার্নার। কয় ঘর লোকের কথা লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত। ইহার পল্লিস্থলভ ছায়াস্নিগ্ধ মাধুরী, রচনার পারিপাট্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামঞ্জস্য, পবিত্র গভীর করুণভাব, এই সকলের সমাবেশে ইহা সাহিত্যশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার করুণ কবিতাময়, নৈতিক ভাব মহৎ ও সত্য, গ্রন্থান্তর্গত চরিত্র সকল সজীব এবং উপন্যাসাংশ মৌলিক, স্বাভাবিক ও নাটকোচিত।

পরিণতিপ্রাপ্ত রোমান্সের কথা ধরিলে সাইলস্ মার্নার ছাড়িয়া Adam Bedeর কথাই ধরিতে হয়। সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর মতে ইহাই জর্জ্জ ইলিয়টের চমৎকার গ্রন্থ।

অ্যাডাম বীড। তিনি আপনিই বলিয়াছেন যে, তিনি যে আর কখন অমন সত্য ও সুন্দর কিছু লিখিতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। ইহা সত্য বটে। কেবল তাঁহার এই পুস্তকই স্বতঃরচিত, এবং সুখসম্ভোগ ও অভিজ্ঞতার প্রবহমান প্রবাহ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার পুস্তক সকলের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচুর্য্যময়, হাস্যরসবহুল এবং বিষাদান্ধকারহীন। বোধ হয়, এই পুস্তকের রচনায় তিনি তাঁহার পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও স্বীয় ক্ষমতার সমগ্র ব্যয় করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ ইলিয়টের Mill on the Flossএ যে আত্মজীবনসম্বন্ধীয় ও ব্যক্তিগত বিষয় আছে—তাহা সত্য, কিন্তু তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরদিন সমান গৌরবোজ্জ্বল থাকিবার মত নহে। তবে Romola স্বতন্ত্র কথা, ইহা জর্জ্জ ইলিয়টের বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু

রোমলা। ইহা কষ্টকল্পনাপ্রসূত, অত্যধিক মাত্রায় সুন্দর এবং একেবারে মলিনত্ববর্জ্জিত। কাজেই রোমলা অতি সুন্দর ও মহৎ সাফল্যহীন উদ্যম। লেখিকার ইহার পরে রচিত গদ্য বা পদ্য সকল রচনাই ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সে সকলে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কৌশলগঠিত চরিত্রও আছে, তবু যেন সে সকল রচনায় ক্লান্তিলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

মিষ্টার হ্যারিসনের মতে "Deronda" বা "Middlemerch" বা "Theophrastus Such" বিশেষ প্রশংসার উপযোগী নহে। "Felix Holt"এ কতকগুলি সুন্দর দৃশ্য ও

অন্যান্য। চরিত্র সন্নিবেশিত থাকিলেও, তাহা অ্যাডাম বীড বা সাইলাস মার্নারের তুল্য নহে। তাঁহার কবিতায় প্রকৃত কবিতা ভিন্ন আর সকলই আছে। বহু কষ্টে লেখিকা অতি কোমলভাষায় আপনার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত কবিতারচনার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

কবিতায় ও রোমান্সে জর্জ্জ ইলিয়টের বিফল হইবার প্রধান কারণ,—তাঁহার ভাব ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং সে সকলের সম্পূর্ণীকরণের বিবেকানুমোদিত্ব। তাঁহার সময়ের লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সমসাময়িক রোমান্স-লেখকদিগের

সাফল্যাভাব। মধ্যে চিন্তায়, জ্ঞানে ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে, তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। রোমান্স-রচনার কৌশলকে তিনি চিন্তা, উৎকর্ষ ও দর্শনের হিসাবে অনেকটা উন্নত করিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, জ্ঞানের আধিক্য এবং আদর্শের উচ্চতাই অধিকাংশ স্থলে সাফল্যাভাবের কারণ। তাঁহার পূর্ব্বে কখন অমন নৈতিকউদ্দেশ্যপূর্ণ, দায়িত্ববোধবিশিষ্ট রোমান্স রচিত হয় নাই।

মিষ্টার হ্যারিসন বলেন যে, 'এখন রোমান্স রচনার প্রভাতারুণরাগ সাহিত্যাকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে সূর্য্য উদিত হইয়া আলোক বিকীর্ণ করিবে।

জন চ্যাপ্‌ম্যানের গৃহে লেখিকার সহিত জর্জ্জ ইলিয়টের প্রথম সাক্ষাৎ। তখনও লোকে তাঁহাকে বিদুষী, শ্রমশীলা, চিন্তাশীলা বলিয়া জানিত, সন্দেহ নাই। তবে তখন কেহ তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্মান করিতে সম্মত ছিল না; লেখিকা বলেন যে, তিনি জর্জ্জ ইলিয়টের বিদ্যায় আকৃষ্ট না হইয়া বরং তাঁহার ব্যবহারে বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন। লেখিকা বলেন যে, জর্জ্জ ইলিয়টের 'হামবড়া' ভাবটাই তাঁহার পক্ষে সে সময় বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

প্রথম দর্শন।

কিন্তু অতিরিক্ত সাফল্য ও তোষামোদেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল—তাঁহার সারল্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি ক্রমে অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সামাজিক হিসাবে ও মানসিক হিসাবে কৃত্রিম জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। লুইসের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের প্রথম অবস্থায় তাঁহার যে স্বাধীনতাবোধ ও পূর্ণহৃদয়তা ছিল, শেষকালে তাহা ছিল না। লোকে যেমন মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, তিনি তেমনই আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তাহা কৃত্রিম। জর্জ্জ ইলিয়টের মত কৃত্রিম রমণী লেখিকা আর দেখেন নাই। তিনি অতি সুন্দর আদর্শের অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু সে আদর্শ স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম মাত্র।

তিনি সর্ব্বদাই উপাসকদিগের কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাহাদিগের কথার উত্তর দান করিতেন, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। অপরিপক্ক জ্ঞানের জটিলজাল-জড়িত জনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, তাহাদিগের হৃদয়কে সেই জাল হইতে মুক্ত করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কখন তাঁহার কৃত্রিম আত্মত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই।

সে যাহাই হউক, জর্জ্জ ইলিয়ট যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন, তৎবিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল রচনায়, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পুস্তক সকল আজও ইংরাজী-ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আদৃত। স্রষ্টা আজ অতীতের অন্ধকারপ্রদেশে বিলীন, কিন্তু সৃষ্টি আজও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

জীবনচরিত।

সুলতান।

তুরস্কে এখন যে ঘোর বিভ্রাট বাধিয়াছে, তাহা সংবাদপত্রপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। "ফর্টনাইটলি রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা সেই তুরস্কের সুলতানের গার্হস্থ্যজীবনের কয়টা কথা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অনেক আষাঢ়ে গল্পের নায়ক রাক্ষসের আহারের পরিমাণ করিতে হইলে, অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। তুরস্কের সুলতানের রন্ধনশালায় যে পরিমাণ আহারীয় প্রস্তুত হয়, তাহাতে কয়টা রাক্ষসের উদরপূরণ হইতে পারে, তাহা স্থির করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। সুলতানের প্রাসাদে রন্ধনশালায় পাচক ভৃত্যের

সূপকার-সম্প্রদায়।

ও ইটালীয় সর্দ্দার সূপকারের কেল্লা, কিন্তু একজন আস্বাদনকারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে কোনও খাদ্যই সুলতানের উদরস্থ হয় না।

আরব্য-উপন্যাসের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান অবরোধের বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে তৎসম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তেমন প্রীতিপ্রদ নহে। প্রবন্ধলেখক মিষ্টার ডেভি সুলতানের অবরোধ সম্বন্ধে গোটাকতক মোটামুটি কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অবরোধের মহিলাগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ;—প্রথম কদাইন,—ইঁহারা প্রকাশ্যভাবে গৃহীতা না হইলেও কতকটা আইন-সঙ্গত পত্নী ; দ্বিতীয় ইক্‌বাল বা অনুগৃহীতা,—ইঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রথম শ্রেণীস্থাগণ নির্ব্বাচিতা হয়েন ; তৃতীয় গিউয়েও বা প্রভুর নয়নানন্দদায়িনী যুবতী ;—ইঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতা হইয়া থাকেন। এই সকল শ্রেণী ক্রীতদাসী হইতে আনীতা ; কাজেই তুরস্কের সুলতান দাসীসন্তান, কিন্তু কোন ক্রীতদাসী রাজপুত্র বা রাজকন্যা প্রসব করিবামাত্র, তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, এবং তিনি রাজ্ঞীপদে উন্নীতা হয়েন। অবরোধমধ্যে কোন রমণী উন্নীতা হইলে তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট তাঁহার কথা ব্যক্ত করা হয়, তখন তিনি স্বীয় স্বজনগণকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

অবরোধ।

সুলতানের জননী অবরোধের কর্ত্রী। মুসলমান আইন-অনুসারে কাদাইন-শ্রেণীস্থা সকল মহিলার দাসী হইতে অশ্ব পর্য্যন্ত সমান হওয়া চাহি ; কাজেই ইঁহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য আর এক জনকে অবরোধকর্ত্রীর কার্য্য করিতে হয়। তুরস্কের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সুলতানের জননীই এ ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই সুলতানের জননীর মৃত্যু হয়, তবে পালিকা জননীই তাঁহার কার্য্য করেন। কারণ, ভাল মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ, জননীর সহিত সম্বন্ধেরই মত। বর্ত্তমান সুলতানের অবরোধকর্ত্রী তাঁহার গর্ভধারিণী নহেন ; লেখক শুনিয়াছেন যে, তিনি বুদ্ধিমতী ও অবরোধের সুশাসনে সক্ষম ; তবে তাঁহার মত কতকটা সেকেলে রকমের।

লেখকের মতে সুলতানের সব অভ্যাস খুব সাদাসিদা রকমের ; তবে তাঁহার পরিশ্রম যথেষ্ট ; তিনি প্রভাতে ছয়টার সময় শয্যাত্যাগ করেন ; তাহার পর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেক্রেটারীদিগের সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়া আহার করেন ; তাহার পর তিনি হয় গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আইসেন, নয় ত তাঁহার সুবৃহৎ উদ্যানমধ্যস্থ হ্রদে নৌবিহারে রত হয়েন। তৎপরে তিনি কাছারি করেন। রাত্রি আটটার সময় তিনি হয় একাকী, নয় ত এক জন দূতের সহিত আহার করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি প্রায়ই তাঁহার সন্তানগণের সহিত পিয়ানো বাজান। ইহাই সুলতানের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। গৃহেই প্রকৃত মানবকে দেখিতে হয়, বাহিরে মানব সতর্ক, সে আপনার মনোবৃত্তিকে আবরণমুক্ত করিয়া প্রায়ই দেখায় না।

সুলতান।

সুলতান সাধারণ ইংরাজের মত সাদাসিদা পোষাক পরিধান করেন। তবে কোন বিশেষ কার্য্যের সময় তিনি জমকাল জরীর কাজ করা কোট ব্যবহার করেন। অল্প দিন হইল, একজন মহিলা সুলতানের সহিত এক টেবিলে আহার করিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে কোন সুলতান, কোন খৃষ্টিয়ান মহিলাকে এ সম্মান প্রদান করেন নাই। আহারের পর মহিলা দেখিলেন যে, একখানা চেয়ারের উপর একটা ইন্দুর-ধরা কল পড়িয়া আছে।

আমি ঐ কলে দশটা ইন্দুর ধরিয়াছি।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সুলতানের প্রাসাদ কত পরিষ্কার।

সমাজনীতি।

ফরাসী।

মিষ্টার ভ্যান্‌ড্যাম ফরাসীদিগের বিষয়ে যে নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ফরাসীদিগের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ফরাসীর নাড়ীনক্ষত্র সকলই জানেন; তিনি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল প্যারীতে বাস করিয়াছেন, এবং সমাজের উচ্চতম শ্রেণী হইতে জোলা কর্ত্তৃক বর্ণিত নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মিশিয়াছেন। তবে তাঁহার এ পুস্তক প্রধানতঃ ইংরাজ ও আমেরিকানদিগের জন্য লিখিত; তাই মনে হয় যে, ম্যাক্সওরেলের চিত্রিত ইংরাজ-চিত্রের ন্যায় তাঁহার চিত্রিত ফরাসী-চিত্রেও যথেষ্ট অতিরিক্ত বর্ণসংযোগ হইয়াছে। আমরা কয়টি বিষয়ে তাঁহার মতের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গ-সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব (অল্প হইলেও) অস্বীকার করা যায় না। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের অল্পবিস্তর ছায়া পড়িতেছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা মাসিকপত্রসমূহে অনেকগুলি ফরাসী গল্প অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ের গল্পরচনার আদর্শও অনেকটা ফরাসী গল্প। ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত এখানে প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য।

বিদেশীয় সমালোচকগণ সর্ব্বদাই বলেন যে, ফরাসী শিল্পে ও সাহিত্যে, বিশেষতঃ কবিতায়, 'ফিলিংএর' বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার বলেন যে, ফ্রান্সে বিদ্যালয়ের নিয়মের দোষেই তাহা হইয়া থাকে। ইংরাজ বালকগণ বিদ্যালয়ে যে দীর্ঘকালস্থায়ী বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হয়, তাহা তাহাদিগের জীবনের সুদীর্ঘকালে বিচ্ছিন্ন হয় না; সে বন্ধুত্ব ফ্রান্সের বিদ্যালয়ে অসম্ভব। সহস্র সহস্র ইংরাজের নিকট বিদ্যালয়ের স্মৃতি সুখসমুজ্জ্বল; উদ্ভেদোন্মুখ যৌবনের সেই সুখস্মৃতি তাহাদিগের হৃদয় হইতে অপনীত হয় না। বিদ্যালয়ত্যাগের পরেও ইংরাজগণ, পারিলে, বৎসরে একবার সম্মিলিত হইয়া সেই সুখময় অতীত জীবনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। যে সময় হেমচন্দ্রের ভাষায়ঃ—

"সবে সখ্য ভাব:—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একই আসন পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময়।"

সে সময়ের স্মৃতি ইংরাজ ভুলিতে চাহে না। যে সকল ইংরাজ তাঁহাদিগের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ও নরম্যান্ পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে লব্ধ অস্থির ভ্রমণস্পৃহাবশতঃ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগেরও নিকটে, যে বিদ্যালয়ে তাঁহারা হোরেস ও

প্রাচীর, সেই অত্যাচারী শিক্ষক ও সেই ঘৃণ্য সহকারী শিক্ষক,—এই সকলের স্মৃতি ফরাসীর জীবনে বিষাদের ছায়া পাতিত করে। কাজেই যে অতীতজীবনের কথা ইংরাজ মনে করিতে চাহে, ফরাসী তাহা ভুলিতে চাহে।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইতে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত বালিকাগণকে চোখে চাখে রাখা হয়। বর—বালিকার অপরিচিত, উভয় পক্ষের পিতা মাতাই প্রায় বিবাহ স্থির করেন। বালিকা কখনও একাকিনী পথে বাহির হইতে পায় না, এবং সঙ্গীত বা অন্য কোনও বিদ্যার শিক্ষা-কালেও তাহার সঙ্গে এক জন থাকা চাই। পিতা মাতার সহিত বালিকা যখন বেড়াইতে বাহির হয়, তখন এই আদেশ দেওয়া হয় যে, সে দক্ষিণে বা বামে তাকাইতে পারিবে না; কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তাহার দিকে চাহিলে সে মুখ ফিরাইবে বা মৃত্তিকাসংলগ্নদৃষ্টি হইয়া চলিবে; এবং পিতা মাতার বন্ধুগণ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে উত্তর দিবে। তাহার পাঠ্যপুস্তক অভিভাবক বাছিয়া দেন; সে গুলা নিতান্তই একঘেয়ে। সময়ে তাহার বিবাহ স্থির হয়; বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্বে ভাবী স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় না। বিবাহে তাহার বিকল্প থাকে না,—সে পিতা মাতার মতে মত দেয়; কারণ, খুব সম্ভবতঃ পিতা ভিন্ন অন্য যে সকল পুরুষের সহিত সে কথা কহিতে পাইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই পঞ্চাশ পার হইয়াছেন। এ দেশে লোক প্রায় ত পঞ্চাশ পার হয় না; যাহারা হয়, তাহাদের জন্য ব্যবস্থা "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।"

ফরাসী রমণী।

বালিকার শাসন যেমন ভীষণ কঠোর, পত্নীর স্বাধীনতা তেমনই বিস্ময়কর। এই কঠোর শাসনের পর এই অপরিমিত স্বাধীনতা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। সময় সময় পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহের ফল শুভই হয়। পতিপত্নী পরস্পরের রুচি ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। পরিবারে বিশেষ অশান্তি-প্রদ কোনও ঘটনা ঘটে না। কিন্তু সময় সময় এমনও ঘটে যে, অন্য কোনও রমণীকে দেখিয়া স্বামী ভাবেন যে, তাহাকে তিনি সত্যই ভাল বাসিতে পারিতেন; আবার হয় ত পত্নীও সেইরূপ জালে জড়িতা হয়েন। ধনবান ও অলস লোকদিগের মধ্যেই এরূপ ঘটনা অধিক ঘটিয়া থাকে। তখন,—তখনকার কথায় পরিহাসচ্ছলে ডুমা বলিয়াছেন;—"বিবাহ-যোয়াল এতই ভারী যে, তাহা বহিতে দুই জন লাগে—সময় সময় তিন জনও লাগে।"

পত্নী।

গ্রন্থকারের মতে, পতিপত্নীর প্রকৃত প্রেমের উপর সংস্থাপিত সুখকর বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে, ফ্রান্সের সমাজের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়া চাহি, পিতামাতার অতিরিক্ত ক্ষমতা কতকটা কমান চাহি, এবং ফরাসীদিগের ধনতৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত করা আবশ্যক। এখন দেখা যাইতেছে, পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ফরাসীদিগের মধ্যে বিবাহে বিতৃষ্ণা ক্রমেই প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে। আবার যাঁহারা বিবাহ করেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় দুইটির অধিক সন্তান দৃষ্ট হয় না; কারণ, তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর যে তাঁহাদিগের সম্পত্তিও নানাভাগে বিভক্ত হইবে, ইহা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। ফরাসী রাজনৈতিকগণ স্বীকার করেন যে, জাতির হিসাবে এটা বড়ই আশঙ্কাপ্রদ ব্যাপার। কারণ, ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রায় সমান রহিয়াছে, পক্ষান্তরে জার্ম্মানির জনসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; কাযেই ফ্রান্সের শত্রু জার্ম্মানির সেনাবল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

শেষ কথা।

যবনিকা।

১

আজি এই নিশীথের নিভৃত শয়নে,
নিদ্রাহীন নয়ন আমার ;
শূন্যমনে, শূন্যপ্রাণে, চাহি বাতায়ন পানে
চিন্তার তরঙ্গরঙ্গে দিতেছি সাঁতার !
হেরিতেছি হেমন্তের শিশির আকাশে,
দূরব্যাপী দিগন্তের গায়,—
আমারি আঁখির মত দেবতার আঁখি শত
জেগে আছে পরিপূর্ণ কৃপা মমতায়।

২

সমুখে পবিত্র-জলা জননী জাহ্নবী ;
মুখে তাঁর স্নেহের বচন ;
কি অপূর্ব্ব প্রীতিভরে ধরার মৃত্তিকা পরে
বহিছেন বিশ্বপতি-বাঞ্ছিত জীবন।
কুহেলিকা-ঢাকা চারু মূর্ত্তি প্রকৃতির ;
কভু দূরে নাচিছে কেবল,—
গঙ্গার অপর পারে, কোথা কোন্ দীপাধারে,
কা'র কুটীরের আলো মুমূর্ষু, চঞ্চল।

৩

কি গভীর শান্তিমগ্ন সমস্ত সংসার !
কি স্বপন-সঙ্গীতে বিহ্বল !—
সাঙ্গ দিবসের রণ ; শ্রান্তদেহ, ক্লান্তমন,
অকাতরে নিদ্রা যায় সৈনিক সকল।
কিন্তু শান্তি কোথা এই হিয়ার মাঝার ?
সুখসুপ্তি কোথা এ নয়নে ?
হেরি শুধু চারি ধার গুপ্ত অশ্রু-পারাবার
উচ্ছ্বাসিয়া উঠিয়াছে নিশ্বাস-পবনে।

৪

প্রকৃতি !—পাষাণময়ী প্রসূতি আমার !—
আশৈশব ধরিয়া ও বুকে,
পূতনা-রাক্ষসী প্রায়, কালকূটে ভরা, হায়,
একি স্তন্য দিয়েছিস্ সন্তানের মুখে ?
নিদারুণ আত্মঘাতী অতি এ বাসনা !
এ যে তৃষা জ্বলন্ত অনল !
জহ্নু-গণ্ডুষের প্রায় নিমেষে গ্রাসিতে চায়

৫

ভুলাইতে হেন মুগ্ধ প্রমত্ত হৃদয়
করেছিস্ কত-না প্রয়াস !
প্রত্যেক কলিজা ঘেরে পাকে পাকে শত ফেরে
পরাইয়ে দিলি শুধু সৌন্দর্য্যের ফাঁস !
কত নব নব দেশে লইয়া ফিরিলি,
প্রমোদের তরী ভাসাইয়া ;—
হায় ! সে সাধন-ধন সৌন্দর্য্যের বৃন্দাবন
কোথায় মিলিবে মর্ত্ত্য-মরুভূ খুঁজিয়া ?

৬

দেখাইলি মা'র মুখ—সংসার-কাননে
একমাত্র স্বরগের ফুল ;—
স্নেহের তিয়াসা ঘোর তা'তেও মিটে না মোর,
নূতন আকাঙ্ক্ষা আসি করিল আকুল ;—
বিশ্বের যশোদা সেই কোথা মা আমার ?
কোন্ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া,
ভব-গোষ্ঠ গোচারণে পাঠায়ে জীবন-ধনে,
আগ্রহ-ক্ষরিত-স্তনে আছেন চাহিয়া ?

৭

তা'র পরে দিলি তুই যৌবনের বনে
হেমে-গড়া প্রেমের হরিণী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটি ছুটি, বুকেতে, কোলেতে উঠি
কত খেলা খেলিত সে দিবস-যামিনী !—
নাহি তৃপ্তি !—ভাবিতাম, কোথা সে নন্দনে
বিছাইয়া বাসর-শয়ন,
আমার সে বিশ্বপ্রিয়া, মালাগাছি গুছাইয়া,
চকিতনয়নে করে যামিনীযাপন।

৮

এইরূপে উপেক্ষায়, অভিমান ভরে,
শূন্য করি' অন্তর-আগার,
যাহা কিছু দিয়েছিলি, সকলি গিয়েছে চলি,—
জগতের, জীবনের, যৌবনের সার।
বরষার গুরু-গুরু নাহি সে গর্জ্জন ;
বসন্তের নাহি সে বিলাস ;

৯

তাই আজি, রে পাষাণী, নয়ন-সলিলে
তোরে আমি সাধি এইবার,—
এ জনমে যার লাগি করেছিস্ সর্ব্বত্যাগী
খোল্ তবে সেই চির-রহস্যের দ্বার।
মরমের অতি স্তব্ধ গোপন ভবনে
মিলনের স্বপন সমান,
কোথাকার কথা, হায়, নিশিদিন হৃদে ভায়
তাই দেখিবারে চায় ব্যাকুল নয়ান।

১০

আছে প্রেম, নাহি যথা ইন্দ্রিয়-বিকার;
আছে সত্য, নাহিক সংশয়;
সুষমা-মণ্ডিত সব; কর্ণে শুধু গীতরস;
সর্ব্ব বাসনার সেই বিশ্রাম-নিলয়।—
দারুণ দুরাশা তোর, হায় রে মানব!
বৃথা তোর বিলাপ-বেদন;
জীবন-বন্ধন-পাশ আগে না করিলে নাশ,
জীবনের যবনিকা কে করে মোচন?

১১

এই সে সংসার মাঝে সাধিয়া সংযম
ধর তুমি তপস্বীর বেশ;
করি ধর্ম্ম আরাধনা পুণ্যের শিশির-কণা
যথা পাও, পান কর করিয়া নিঃশেষ;
কর্ম্ম-সুরধুনী-নীরে আত্মার কলুষ,
প্রাণপণে কর প্রক্ষালন;
শুভ্র ফুলদল দিয়া সর্ব্বশুভ্রে আরাধিয়া
হও শুভ্র দেহমনে ফুলের মতন।

১২

একদা আসিবে মুক্তি, মুক্তামালা গলে,
হাতে মাল্য-চন্দনের থাল,—
ধুলিময়, ধুলি পরে' অলক্ষ্যে পড়িবে ঝ'রে
জীর্ণ বস্ত্র সম যত জড়তার জাল।
সহসা বিমুক্ত তব মর্ম্মের মাঝার
দিব্য নেত্র উঠিবে জ্বলিয়া;
স্ফুরিবে আলোক-শিখা, দূরে যা'বে যবনিকা
সমুখে সে স্বপ্নরাজ্য হাসিবে ভাসিয়া।

২৮ কার্ত্তিক, ১৩০২।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র বসুর "রামপ্রসাদ" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। লেখক রামপ্রসাদের রচনা হইতে তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্যতম এই যে, রামপ্রসাদ বৈদ্য নহেন,—কায়স্থ। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ দেখিয়া আমরা রামপ্রসাদকে কায়স্থ মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিলাম না। যাহা হউক, তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, এমন মনে করা যায় না; তাঁহার সকল প্রমাণ ও অনুমানও সেরূপ প্রবল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু তিনি যে ভাবে রামপ্রসাদের জীবনকাহিনীর সূত্র অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত স্বরূপ চন্দ্র রায় "হিন্দুসমাজের নিকট নিবেদন" নামক একটি সাময়িক প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন,—"ধর্ম্ম যাহা, তাহা চিরদিই থাকিবে; আস্তিক মাত্রেরই ঈশ্বরে আস্থা আছে, তাহা যাইবার নহে। সামাজিক আচরণ, দেশ ও কাল অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে। অতএব যাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ উন্নতি ও ঐক্যের দিকে ধাবিত হইতে পারে, যাহাতে বাঙ্গলা, কনোজ, গুজরাট, পুনার সামাজিক আচরণবিধির বিভিন্নতা বিনাশিত হয়, যাহাতে অসংখ্য গ্রন্থের পরিবর্ত্তে চলিত ভাষায় "কলির ধর্ম্ম" নামক একখানা গ্রন্থে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যায়, * * * হিন্দুসমাজ হইতে এরূপ

অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না, সমাজের নেতৃগণ একবার চিন্তা করেন, এই আমাদের নিবেদন।" লেখকের এই আশার স্বপ্ন অত্যন্ত মনোহর, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এ স্বপ্ন কখনও সফল হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হিন্দু সমাজের 'নেতৃগণ' কাহারা? অসংখ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পরস্পরবিরুদ্ধ মতসমূহের কে সমন্বয় করিবেন? করিলেও বা কে সেই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিবে? বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষ মানবজাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও মানবসমাজে সম্প্রদায়ভেদ রহিয়াছে। যত দিন মানবের চিন্তাশক্তি আছে, তত দিন মতের বিভিন্নতাও থাকিবে। বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়াও সমগ্র মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে;—একটি সার্ব্বজনীন উন্নতির উদারক্ষেত্র সকল মতাবলম্বীর সমক্ষেই উন্মুক্ত আছে,—বিভিন্ন মত বা সঙ্কীর্ণ দেশাচার বা দূষিত সংস্কার জগতের উন্নতির প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারে নাই, এবং কখনও পারিবে না। শ্রীযুক্ত কালী গোপাল রুদ্রের "আসামী ভাষা" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। আসামী ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লেখকের মতে অনাবশ্যক এবং অনিষ্টাবহ। 'নব্যভারত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "ধনগৌরবস্পৃহা" একটি অদ্ভুত সন্দর্ভ। লেখকের মতে টাকায় সব হয়—এবং "সম্পাদক বল, লেখক বল, টাকায় এ জগতে সকলই ক্রয় করা যায়।" কোন্ হাটে? কেহ কখন নব্যভারতের সম্পাদকের নিকট কোনও সম্পাদকের দর চাহিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু হায়! এখনও অনেক দুর্ভাগ্য সম্পাদক 'অবিক্রি' পড়িয়া আছেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই লেখকেরা অনবরত এমার্সন ও কার্লাইলের ভান করেন, কিন্তু কলমের সংযম যে একটি মহা গুণ, তাহা অনায়াসে এবং অসঙ্কোচে ভুলিয়া যান। হইতে পারে, 'ভবের হাটে' মাঝে মাঝে 'সম্পাদকের' কেনাবেচাও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ কোনও ঘটনাবিশেষকে চিরসত্যের উদাহরণস্বরূপে গ্রহণ করা কি একজন 'সম্পাদকের' সুবুদ্ধির কার্য্য? এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষকুমার বড়াল 'সারদামঙ্গল'-প্রণেতা স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর উপর একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

২

"এসেছিল সুধু গাহিতে প্রভাতি,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

৩

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ!
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন!

৫

মৃত তোর ভক্ত কাঁদ মা জাহ্নবি,
মৃত তোর শিশু কাঁদ গো অটবি,
হে বঙ্গ-সুন্দরি, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর।
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

৬

কাঁদ তুমি কাঁদ!—জ্বলিছে শ্মশান—
কত মুক্তাছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান—
অবসান চিরতরে।

৭

যাও, গুরো, যাও, বুঝিয়াছি স্থির—
মানব হৃদয় কতই গভীর,
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ।
কেবা বাণীপায় রাখে নিজ শির,
নিজ পায়ে পর-মত।

৮

বুঝিয়াছি গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কি রূপা কবিতা—কত সুধারস,
প্রেমে কত ত্যাগ—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী।
পূত মত্ততায় মুগ্ধ দিক্‌দশ,
ভাবা কিবা গরীয়সী।

৯

বুঝিয়াছি, গুরো, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে।
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পায়ে লোটে চরাচর।

১০

বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা শ্রেয় ভবে—
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে।
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি।
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চিরস্বপ্নে জাগি।

১১

তাই হোক হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে;
রাজহংস সম প্রেম-গুঞ্জরণে
চরণ-দুখানি ঘেরি।—
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি।

১২

তাই হোক হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক;
জগতে থাকুক জগতের দুখ
জগতের বিসম্বাদ।
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।

১৩

তাই হোক হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে;
দেখুক প্রেমিক সুগভীর যামে
স্বপনে জগত ঢাকি—
নামিছে অমরী ওই গীত ধরি
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

১৪

তাই হোক হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল।
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব-জনমের হাহা।
লহ লহ, গুরো, মরণ-সম্বল
জীবনে খুঁজিলে যাহা।"

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বালক-পাঠ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এই সচিত্র পুস্তক খানি শিশুদের জন্য কল্পিত হইয়াছে। লেখকের শিশুপাঠ্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁহার "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" অনেক বিদ্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে। "বালকপাঠ" তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিবে। নবকৃষ্ণ বাবু "বালক-পাঠে" গদ্য ও পদ্য, উভয়বিধ রচনাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং আহ্লাদের বিষয়, তিনি এই উভয় বিষয়েই সফলতা লাভ করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ বাবুর শিশুপাঠ্য কবিতা সুপ্রসিদ্ধ,—আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার গদ্যও সেইরূপ আদর লাভ করিবে। বালকপাঠের গদ্য প্রাঞ্জল, মনোহর ও বিশুদ্ধ। সচরাচর দেখা যায়, স্কুলপাঠ্য পুস্তকের ভাষার 'মা বাপ' নাই।— "বালকপাঠের" ভাষা সেরূপ নহে। লেখক ভাষা বিশুদ্ধ করিয়াই বিরত হন নাই, তাহাতে যথেষ্ট মধুর রসের সঞ্চার করিয়াছেন। বালক-পাঠের দুই একটি সন্দর্ভ পড়িয়া স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহজ সুন্দর সরল ভাষা মনে পড়ে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আকার সৌন্দর্য্যেরও যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। ইহার চিত্রগুলি যত্ননির্ব্বাচিত ও অতি সুন্দর হইয়াছে।
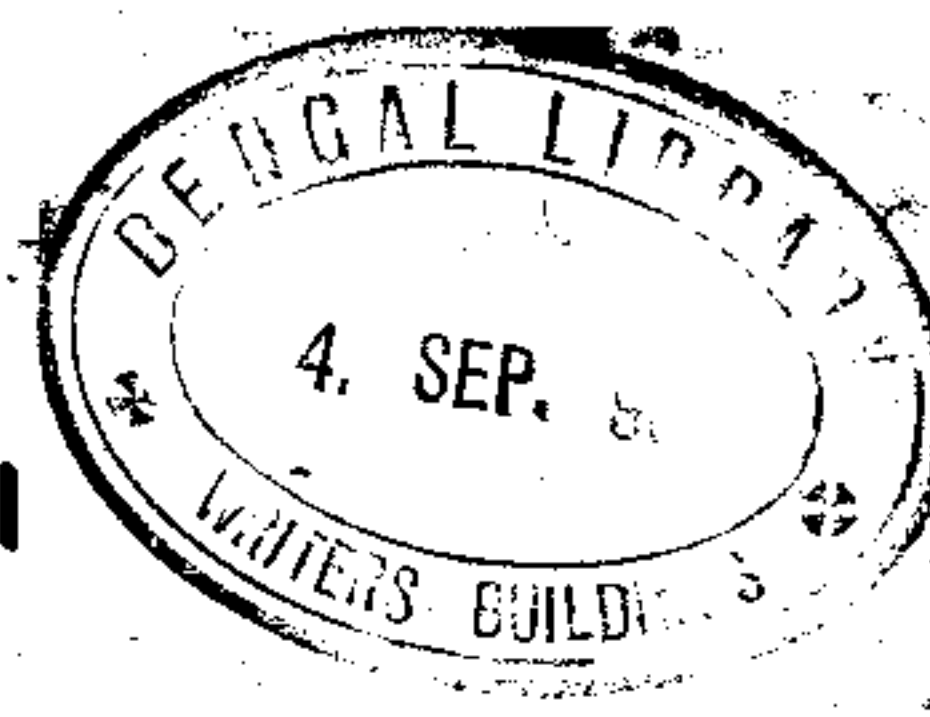
সাহিত্যের আদর্শ।

ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি সাহিত্যেও ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস প্রকাণ্ড মহাভারত লিখিয়া পতিপ্রাণা গান্ধারীর মুখে গাইলেন—

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। তাঁহার সেই ছত্র কাহার না মুখস্থ আছে, যে ছত্রে তিনি ভগবানকে কীর্ত্তন করিয়া প্রেমোল্লাসে গাইয়াছেন;—

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

ভগবানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, এবং যাহারা ভগবানের আশ্রিত, তাহাদিগেরই জয় হউক। কেবল এই কথা সঙ্গীত হইয়াছে, এমন নহে; প্রকাণ্ড মহাভারতে সেই ধর্ম্মপক্ষই, সেই ভগবদাশ্রিত দেবপক্ষই প্রবল হইয়াছে। মনুষ্যের পাপচিত্রও উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে, কুরুপক্ষীয় চিত্র অপেক্ষা আর কোন্ চিত্র উজ্জ্বল? কিন্তু তদপেক্ষাও আর এক উজ্জ্বলতর চিত্র আছে—সে চিত্র পাণ্ডবপক্ষীয় কৃষ্ণার্জ্জুনসহায় ধর্ম্মপক্ষ; এই চিত্রের বর্ণগৌরবে পাপচিত্র নিষ্প্রভ; ধর্ম্মের জয়ে পাপ বিধ্বস্ত—একেবারে সমূলে নিপাতিত। পবিত্র কুরুক্ষেত্রনামক ধর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর এক প্রকাণ্ড চিত্র বাল্মীকির। বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণ ভক্তির সুপ্রসারিত মহাদেশ—সে দেশেও ধর্ম্ম বিজয়ী। ধর্ম্মের বিজয়পতাকা অযোধ্যা হইতে লঙ্কার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত উড়িতেছে। রাক্ষসকুল এত যে প্রবল, তাহা ভগবদ্ভক্তির প্রবলতর তরঙ্গে নিপাতিত হইয়াছে। রাম-পক্ষের পুণ্যময় রাজ্য, কি লঙ্কা, কি অযোধ্যা, সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামরাজ্যের সময় হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ, কুমারী অন্তরীপ কি, লঙ্কার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পুণ্যক্ষেত্র। মহাদণ্ডকারণ্যেও আর অসুরভয় নাই। কোথায় অরণ্যে বসিয়া কোন্ শূদ্র তপস্যা করিতেছে, সেও রামচন্দ্রের স্পর্শে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

পৌরাণিক কাব্য ছাড়িয়া, প্রকৃত সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ কর; সেখানেও সেই দৃশ্য। যে ক্ষেত্রের অধিনায়ক, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবিগণ, সে ক্ষেত্রেও সেই ধর্ম্মের জয়। কালিদাস কি

ধর্ম্মময় তুলিকারাগে কুমারের অতুলনীয় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন! সেখানে উমার তপস্যা, হিমালয়ের শিবানুরাগ কেমন অসাধ্যসাধন করিয়াছে! সেই বর্ণগৌরবে সমগ্র কাব্য উদ্ভাসিত। আর শকুন্তলা,—বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলা—যাহার চিত্রে জগৎ মুগ্ধ, সেই শকুন্তলায় কিসের চিত্র? তাহাতে ঋষির আশ্রমচিত্র, শকুন্তলার সহৃদয়তার চিত্র,—যে সহৃদয়তা সমস্ত পশুপক্ষীকেও প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিল; শকুন্তলার প্রগাঢ় প্রেমানুরাগের চিত্র—যে জগৎ বিসারী প্রেমানুরাগ এক প্রবল পতিভক্তিতে সমুন্নত হইয়া তাহাকে তপস্বিনী করিয়াছিল। আর ধর্ম্মময় চিত্র দুষ্মন্তের—যিনি প্রবল ধর্ম্মানুরাগে পূর্ণ হইয়া তেমন জগৎললামভূতা, ঋষিজনপ্রেরিতা, তদাত্মসমর্পিতা, অনায়াসলব্ধা, লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে সভার মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আবার যখন সেই শকুন্তলাকে মনে পড়িল, তখন তাহার অনুতাপচিত্র দেখিলে কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়? কালিদাস সেই ধর্ম্মানুতাপচিত্র "চিত্রদর্শন" অঙ্কে কত উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আর যদি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ধর্ম্মানুতাপ দেখিতে চাও, তবে দেখ, ভবভূতির "ছায়ার" অঙ্কে। রামের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়চিত্র সেই অঙ্কে প্রতিফলিত। এই সমস্ত চিত্র দেখিয়া বল দেখি, আর্য্য সাহিত্য পড়িয়া ধর্ম্মানুরাগে তোমার হৃদয় পূর্ণ হয় কি না? সহস্র পাপকলঙ্কে তোমার হৃদয় কলুষিত থাকুক না কেন, তবু এই আর্য্য সাহিত্য পাঠে তোমার হৃদয় একটু ধর্ম্মানুরাগে উত্তপ্ত হইবেই হইবে। একটু ধর্ম্মের দিকে বিচলিত হইবেই হইবে। আর্য্য সাহিত্যের ইষ্টার্থ বা অধ্যয়নফল এতই সুন্দর, এতই উৎকৃষ্ট, এতই শান্তরসপরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ!

কিন্তু ইউরোপীয় বা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের ফল কিরূপ? যে আদর্শ আর্য্য সাহিত্যের প্রাণ ও গৌরব, যাহা সেই সাহিত্যকে জগৎললামভূত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই উচ্চাদর্শের ধর্ম্মনৈতিক সুন্দর আদর্শ কি আমরা ইংরাজী সাহিত্যে দেখিতে পাই? তাহাতে মনুষ্যসমাজ ও মানবপ্রকৃতির চিত্র আছে বটে, কিন্তু সে চিত্র কি ততই ধর্ম্মগৌরবে পূর্ণ? ইংরাজী সাহিত্যে স্থলে স্থলে ধর্ম্মসৌন্দর্য্য নাই, এমত নহে; কিন্তু তাহা এত নিবিড়বনাচ্ছন্ন যে, তাহার কান্তি তত পরিদৃশ্য হয় না। ঘন বনমধ্যে যেন একটি নবমল্লিকা নিভৃতে তাহার সৌন্দর্য্য লইয়া বিলীন হইয়াছে। চারি দিকে কণ্টকপূর্ণ বিটপী লোকলোচনের অপ্রিয়তা সাধন করিয়াছে।

চারি দিকে হিংস্র জন্তুগণের মহাভীষণ রবে অরণ্য পরিপূর্ণ—এতই পরিপূর্ণ যে, সে রবে পক্ষীর সুকণ্ঠনিঃসৃত কাকলী মিলাইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়গণ স্পর্দ্ধা করেন যে, আমরা প্রকৃতির চিত্রকর; যেন প্রকৃতি-চিত্র প্রাচ্য সাহিত্যে নাই। প্রকৃতি-চিত্র আর্য্য সাহিত্যে আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও আছে; তবে প্রভেদ এই, ইংরাজী সাহিত্যে সেই প্রকৃতির সমলা নগ্নমূর্ত্তি, আর্য্য সাহিত্যে তাহার ধর্ম্মোন্নত মধুরিমা। ইংরাজী সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির পাশব ও আসুরিক বর্ণগৌরব, আর্য্য সাহিত্যে সেই প্রকৃতির দেবতুল্য ভাবের উৎকর্ষ। মানব প্রকৃতি দেবভাবে সমুন্নত হইয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে, তাহা আর্য্যচরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই সৌন্দর্য্যে তাহার আসুরিক ভাব প্রচ্ছন্ন; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত। ইংরাজী সাহিত্যে মানব প্রকৃতির পাশব ভাবের এবং ঐন্দ্রিয়িক প্রবৃত্তিসমূহের এত প্রাধান্য যে, তাহাতে তাহার দেবভাব সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী কাব্য সাহিত্যের যিনি অগ্রগণ্য, ইংরাজ জাতির গর্ব্বস্বরূপ সেই সেক্‌স্‌পিয়ারের দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় এ কথা প্রতিপাদিত করা যাইতেছে। আমরা তাঁহার কাব্যবিশেষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র নাটকাবলির অধ্যয়নফলস্বরূপ যাহা পাই, তাহারই বিষয় বলিতেছি।

সেক্‌স্‌পিয়ার পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জগতের জনসমাজ এবং মানবপ্রকৃতির চিত্রকর; কেবল চিত্রকর নহেন, তিনি একজন মহাকবি। তিনি সেই জনসমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও লোকজনের সজীব চিত্র দিয়াছেন। চিত্র সকল এত পরিপাটী, এত প্রকৃত, এত প্রস্ফুটিত, যেন ফটোগ্রাফের মত বোধ হইতে থাকে। তাঁহার নাটকীয় ব্যক্তিগণকে যেন সজীব মনে হয়। এ বড় কম ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাঁহার যে সকল নাটক বিয়োগান্ত নহে, তাহাদিগের ধাতু এই প্রকার। কিন্তু কবির প্রধান সম্পত্তি তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি। এই দৃশ্যকাব্যসমূহে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এ রাজ্যে তিনি শুদ্ধ চিত্রকর নহেন, এখানে তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেদীপ্যমান। কাব্যরসে তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি উচ্ছলিত, সৃষ্টি চাতুর্য্যে তাহা পরিশোভিত। এজন্য ট্র্যাজিডিসমূহই তাঁহার যশের প্রধান নিদানস্বরূপ হইয়াছে। ট্র্যাজিডি ও কমিডি, এই উভয়বিধ রচনাকৌশলে তিনি ইউরোপীয় কাব্যজগতে অসামান্য কবি। তাঁহার এই অগ্রগণ্য ট্র্যাজিডিসমূহ সম্বন্ধেই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

সেক্‌স্‌পিয়ার মানবপ্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য্য, এবং সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য কি না, সে কথার বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে তিনি যাহা বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত, আমরা তাহারই কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্রাঙ্কনে তিনি অসাধারণ কবিরূপেই সুবিখ্যাত। কোনও প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁহার মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্রাঙ্কনে মোহিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন :—

"O Nature ! O Shakespeare ! Which of ye drew from the other !"

"হে প্রকৃতি ! হে সেক্‌স্‌পিয়ার, তোমরা কে কাহার অনুচিত্র !"

যদি তিনি মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিয়া থাকেন, তবে তিনি কিরূপ চিত্র দিয়াছেন ? মানবপ্রকৃতি দোষগুণের আধার ;—তাহাতে একাধারে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব বিদ্যমান। আহার, নিদ্রা, রোগ, শোক, কামাদি রিপুর সহিত মানব পশুবৎ ; বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচারাদি সম্পন্ন হইয়া মানবের মনুষ্যত্ব ; এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি গুণে মনুষ্য দেবতুল্য। এই ত্রিবিধ গুণে—এই সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে—মানবপ্রকৃতি সমলা। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারেও মানবের পাপাংশই অধিক। জনসমাজের অধিকাংশ লোকে কিছু শ্রেষ্ঠগুণের পরিচয় নাই, সমাজের অধিকাংশই রাজসিক, এবং তমোগুণান্বিত ; সুতরাং জনসমাজ অধিকতর সমল। যিনি সেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিতে যাইবেন, তাঁহাকে ততোধিক সমলা প্রকৃতিরই ছবি আঁকিতে হইবে এবং যাঁহাকে জনসমাজের চিত্র দিতে হইবে, তাঁহাকে রাজসিক ও তমোগুণান্বিত সাধারণ লোকসমাজেরই প্রতিকৃতি দিতে হইবে ; নহিলে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্র যথাযথ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয় জনসমাজ যে সকল বিশেষ দোষগুণের আধার, তাহাতে যে বিশেষ প্রকার তমঃ ও রজোগুণের বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপীয় কবির চিত্রে তাহারই প্রকৃত ছবির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সেক্সপিয়ারে যদি প্রকৃতি যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার চিত্রগুলিতে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের আলোকান্ধকার এবং দোষ গুণই ঠিক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ; আলোক আঁধার এবং দোষ গুণ সেইরূপ পরিমাণে প্রতিবিম্বিত, যেরূপ পরিমাণে প্রকৃতিতে তাহা জাজ্বল্যমান। তাহার কমও নহে বেশীও নহে। পরিমাণের ন্যূনাধিক্য ঘটিলে

চরিত্রে যে পরিমাণে এবং যে প্রকার বিশেষ দোষ গুণের সমাবেশ, সেক্স-পিয়ার তাহারই অনুকৃতি। তৎকালে খৃষ্টানের মনে মানবপ্রকৃতি যত দূর মলিন, তত দূর মলিনতা সেক্সপিয়ারে। চিত্রকররূপে সেক্‌সপিয়ার এইরূপ ; কিন্তু সেক্সপিয়ার ত নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকর নহেন ; তিনি যে স্রষ্টা ; তিনি কিসের সৃষ্টি করিয়াছেন ?

জনসমাজকে তন্ন তন্ন করিয়া যিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এরূপে পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছেন, যেন তাহার যথাযথ ফটোগ্রাফ ছবি তুলিতে পারেন, তিনি অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, তাহাতে দোষের ভাগই প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান। কবি জগতের শিক্ষাদাতা। কবি কিরূপে শিক্ষা দিবেন ? যাহাতে জন-সমাজের সেই দোষের পরিমাণ কমে, এমন উপায় তাঁহাকে করিতে হইবে। জনসমাজকে অধিকতর সত্ত্বগুণসম্পন্ন করা কি উপায়ে সম্ভবে, তাহারই নির্ণয় করা কবির কার্য্য। কবি সেই উপায়াবলম্বনে জগতের গুরু। এই উপায়ের ভেদেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কবির প্রভেদ। এই উপায়াব-লম্বনে কবি সৃষ্টিকর্ত্তা ও শিক্ষাদাতা। পাশ্চাত্য কবি যাহার সৃষ্টি করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, প্রাচ্য কবি তাহা করেন নাই ; প্রাচ্য কবি বিভিন্ন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক জন মানবসমাজের রজঃ ও তমোগুণকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার কুফল কত ভয়ানক ; অন্য জন সত্ত্বগুণকে সমুজ্জ্বল করিয়া সেই দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সাত্ত্বিক রাজ্য কি সুখের আলয়। এক জন ঘোর নরকের সৃষ্টি করিয়া তাহার দাহ ও যন্ত্রণা দেখাইয়া লোক-সমাজকে পাপ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য জন স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও সুখের দিকে লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই রাজ্যে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবি সেক্‌সপিয়ারে নরক ও তাহার যন্ত্রণার সৃষ্টি, প্রাচ্য কবি ব্যাস বাল্মীকি পুণ্যময় পবিত্র স্বর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা নিজ নিজ সৃষ্টিকৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে কোন্ কবি অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, লোকসমাজের ফলাফল দর্শনে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। হিন্দু জনসমাজ কি ইউরোপীয় জনসমাজ অধিক-তর ধর্ম্মশীল, অধিতকর সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ, অধিকতর দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও ভক্তিগুণে সম্পন্ন ? কোন্ জনসমাজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবলা ? এই

পাশ্চাত্য কবির উপকরণ তদীয় স্থষ্টির অনুকূল। তাঁহার উপকরণ ট্র্যাজিডি। ট্র্যাজিডি যে ধরণের রচনাপ্রণালী, তাহাতে নরকের স্থষ্টি ও তাহার দাহ এবং যন্ত্রণা দেখাইবারই উপযোগী। ট্র্যাজিডি অসুরস্থষ্টির যত উপযোগী, দেবস্থষ্টির তত উপযোগী নহে। কারণ ট্র্যাজিডিতে মানবীয় প্রচণ্ড পাশব প্রবৃত্তিকে এত প্রবলা করিতে হয়, যেন তাহা খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। অনেক সময়ে সেই প্রচণ্ডতা প্রায় অমানুষী হইয়া পড়ে। আমরা সচরাচর সংসারক্ষেত্রে রিপুপ্রাবল্যের যে প্রকার দৃষ্টান্ত পাই, তাহাতে খুন দেখিতে পাই না। খুন জনসমাজে কিছু সর্ব্বদা ও সচরাচর ঘটিতেছে না। বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত জনপূর্ণ সমাজে দুই দশটি খুন ঘটে। সেই খুনে দেখিতে পাওয়া যায়, হয় লোভ, না হয় বিদ্বেষ, না হয় হিংসা, না হয় স্ত্রীর প্রতি সন্দেহজনিত কোপাগ্নি, অতিমানুষী সীমায় উঠিয়া খুনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেক্সপিয়ার সংসারক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত পাইয়া তাঁহার ট্র্যাজিডির স্থষ্টি-রাজ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি লেডি ম্যাকবেথ ও লর্ড ম্যাকবেথের স্থষ্টি করিয়াছেন। ওথেলো এবং ইয়াগো, রোমিও এবং জুলিয়েট, ব্রুটস এবং রিচার্ড প্রভৃতি সকলই তাঁহার অমানুষী স্থষ্টি—ট্র্যাজিডির সম্যক্ উপকরণ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নরকযন্ত্রণা ও দাহ। এই স্থষ্টির মধ্যে রিপুপ্রাবল্য আসুরিব সীমায় আসিয়াছে। শ্লিগেল্ (Schlegel) বলিয়াছেন, লেডি ম্যাক্বেথ একটি Female Fury স্ত্রী অসুরী। তত সাহস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নির্দ্দয়তা কেবল অসুরেই সম্ভব। সেই লেডি ম্যাক্বেথ বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে আমি যাহাকে স্তন পান করাইতেছি, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারি। আমাদের পূতনাসুরীর সঙ্গে তাহার কত সাদৃশ্য! পূতনা স্তনপান করাইয়া না শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে গিয়াছিল? ততই বিশ্বাসঘাতকতা, ততই দেবদ্রোহিতা পূতনায়ও লক্ষিত হয়। যে আসুরিক প্রেমে প্রজ্বলিত হইয়া জুলিয়েট সুন্দরী রোমিওর কাছে নানা বাক্‌ছলে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার যৌবনলালসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি যদি সেইরূপ করিয়া এক জন রাম বা লক্ষ্মণের কাছে যাইতেন, তাঁহার কি দশা ঘটিত? নিশ্চয়, সূর্পণখার মত তাঁহার দশা ঘটিত। সূর্পণখা বিফল হইয়া মহা

করিয়াছিলেন। সামান্য সূত্রে ইয়াগোর চাতুরীজাল এত অমানুষী সীমায় আসিয়াছিল যে, তাহাতে তাহার অন্নদাতা ওথেলোকে স্ত্রী-হত্যা পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। রিচার্ড না বলিয়াছিল যে, আমি যখন প্রকৃতির হস্তে বিকলাঙ্গ হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, তখন আমি কর্ত্তব্যেও অসুর হইয়া উঠিব।

——"Since I can not prove a lover,
* * *
I am determined to prove a villain."

প্রকৃতপক্ষেও সেক্‌স্‌পিয়ার তাহাকে অসুররূপেই প্রদর্শিত করিয়াছেন। আর আমরা কত বলিব ?

শুদ্ধ সেক্‌স্‌পিয়ারে কি এই আসুরিক আদর্শ? বিলাতী শ্রব্য কাব্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহাকবি মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে (Paradise Lost) কি আদর্শ দিয়াছেন? তুমি বোধ হয় বহুকাল পূর্ব্বে কলেজে মিল্টনের কিয়দংশ পড়িয়াছিলে? পরে, ঘরে বসিয়া তাহার অপরাংশের অধ্যয়ন শেষ করিয়া থাকিবে? সেই পাঠের কিরূপ স্মৃতি তোমার অন্তরে জাগিতেছে? তোমার অন্তরে সেটানের (Satan) ভীষণ আসুরিক মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোন্ মূর্ত্তি তত জাজ্বল্যমান? সয়তান মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানরূপে কার্য্য করিতেছে। ত্রিভুবন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র—সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অপরিমেয় শক্তি ও কৌশলে ভগবানের সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত। যে ভগবান বাস্তবিক সর্ব্বশক্তিমান, সেই বজ্রধর মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে যে কোথায় আছেন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সয়তানের প্রভূত বিক্রম ও আসুরিক ক্ষমতা, তাহার দেবদ্রোহিতা ও দেবদ্বেষ কাব্যময় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। সয়তানের পরই "এড্যাম এবং ইভের" দেবদ্রোহিতা এবং দেবভক্তির বিচ্যুতি-চিত্র—সয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া কেমন তাহারা পাপে অনুরক্ত হইল, এবং তাহার ফলাফল কি হইল,—পাপের এই বিষময় পরিণাম দেখাইবার নিমিত্ত মিল্টনের এত আয়োজন। মিল্টনের মনে মানবপ্রকৃতির যে তমোময় মলিন ভাব, সেই ভাবে সেই প্রকৃতিকে চিত্রিত করিবার জন্য, তাঁহার মহাকাব্যের সৃষ্টি। তবে তিনি তাহার দেবভাব দেখাইবেন কিরূপে? যে প্রকৃতির প্রভূত বল আসুরিক প্রবৃত্তিস্রোত, যে অদম্য কুপ্রবৃত্তিস্রোত

চিত্র মিল্টন আঁকিয়াছেন। যেমন কুরুপক্ষে গদাধারী আসুরিক দুর্য্যোধনই প্রবল, যাহার প্রাবল্যে লোভী দ্রোণ ও কর্ণের সামরিক বীর্য্য অধীন হইয়া যথেচ্ছ কার্য্য করিতেছে, কোন নৈতিক শাসন ও কাহারই সুপরামর্শ মানিতেছে না—গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সেই আসুরিক বলপ্রধান কুরুপক্ষ যেমন দেবদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মের বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভারতের মহা ব্যাপার এবং তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়া পৃথিবী তোলপাড় করিতেছে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর চিত্র মিল্টনের মহাকাব্যে। এই চিত্রে কলঙ্কারোপ করে, এমত প্রতিযোগী দেবচিত্র নাই।

এই পাপপূর্ণ সংসারের অনুচিত্র আঁকা তত কঠিন নহে। কারণ, পাপপূর্ণ সংসার তো পড়িয়া রহিয়াছে—যে দিকে দেখিবে,সেই দিকেই পাপের কলঙ্কিত মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ফটো তোল। কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়ার এ ফটো তুলিয়া তো সন্তুষ্ট হয়েন নাই; তিনি তদপেক্ষা অনেক দূর আসিয়াছেন। তিনি সেই ফটো হইতে লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা সামান্য সংসারে নাই, অথবা যদি থাকে, ক্বচিৎ কখন তেমন আসুরিক সৃষ্টি জন্মে। আর্য্যকবি ঠিক ইহার বিপরীত দিক দেখান। তিনি দেখান, ধর্ম্মের অসাধারণ মূর্ত্তি। যে সকল ধর্ম্মমূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ছবি আর সাহিত্যে দিবার প্রয়োজন কি? একবার চক্ষু চাহিলেই চারি দিকে সে প্রকার সামান্য মূর্ত্তি বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। সাহিত্যে যে ছবি আঁকিবে, তাহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকিবে। সেই ছবিতে অসামান্য রূপের সমাবেশ চাই। সেই অসামান্য রূপ সামান্য চিত্রের রূপ দেখিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। এই অমানুষী রূপ-সৃষ্টির আদর্শ আর্য্য কবিগণ তিলোত্তমায় দেখাইয়াছেন। তিলোত্তমা যেমন্ বাহ্য রূপের সৃষ্টি, আর্য্য সাহিত্যের আদর্শ সকল তেমনি মানসিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। তিলোত্তমা গড়িতে যে সেক্‌স্‌পিয়ার জানিতেন না, এমত নহে—তিনি অনেকগুলি বাহ্য তিলোত্তমা গড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিলোত্তমা মির্‌যাণ্ডা—"Of every creature's best" রোস্যালিণ্ড্ এবং হার্মিয়ন্। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা গড়িতে গিয়া তিনি আর্য্যকবিগণের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। তাঁহার মির্‌যাণ্ডা

হেলেনা তত অসামান্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি নহে। কিন্তু ট্র্যাজিডিতে তিনি আর এক প্রকার তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়া লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি যত আসুরিক দৈত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রোমিও, জুলিয়েট, টাইবল্ট, ইয়াগো, ওথেলো, ম্যাক্‌-বেথ, গনারিল, জন, রিচার্ড দি থার্ড্ প্রভৃতি নহিলে কি ট্র্যাজিডির ভয়ঙ্কর চিত্র ও খুন সংঘটিত হয়? আমাদের সাহিত্যে এরূপ অসুরের সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাহারা অসুর বলিয়াই কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী ও দেববিদ্রোহী। মিল্টনের মহাকাব্যে একমাত্র প্রকাণ্ড অসুরের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদের মহাকাব্যদ্বয়ে তদ্রূপ কত শত অসুর। বৃত্র, তারক, রাবণাদি অসুর ও রাক্ষসসমূহ দেবদ্রোহী হইয়া কি তুমুল কাণ্ডই না ঘটাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অসুরনাশন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ধর্ম্মবীর সকলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং লোকের দৃষ্টি সেই অসুর হইতে সুর-সৌন্দর্য্যের দিকেই পতিত হয়। তাহাতে ধর্ম্মের জয় হয়। আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্মের জয় অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাপের বিক্রমকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রদর্শন করা যদি মহাকবির পরিচায়ক হয়, তবে তাহার সহিত ধর্ম্মকেও মূর্ত্তিমান করিতে কি কবিত্বের পরিচয় হয় না? মানবপ্রকৃতির এক দিককে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া অন্য দিককেও সমুজ্জ্বল করা উচিত। তাহা হইলেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেওয়া হয়। ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রে সুধু সয়তানকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইলে কি হইবে? তাহার সঙ্গে ভগবানের অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সৌম্য মূর্ত্তিরও শোভা দেখান উচিত। তবে ত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শোভা ও ভীষণ মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান হইবে। আর্য্য-সাহিত্যে এইরূপ সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য। তাহাতে প্রকৃতি, পুরুষের পার্শ্বে সংসারের কদম্বমূলে পরিশোভিতা। তাহাতে মূর্ত্তির দুই দেশই সমান উজ্জ্বল। দেহের সকল অবয়ব সমান পরিস্ফুট ও সমপরিমাণবিশিষ্ট। তাহাতে স্কন্ধ-কাটার সৃষ্টি নাই; কিম্বা প্রকাণ্ড ধড়বিশিষ্ট অঙ্গহীন অসুরের সৃষ্টি নাই। সেক্‌স্‌পিয়ারে অসুরনাশন চিত্রেরও সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির তত বর্ণগৌরব নাই, যদ্দ্বারা ম্যাক্‌ডফ্ কি ব্যাঙ্কো, ম্যাক্‌বেথের উপর উঠিতে পারে। রিচার্ড দি থার্ড, জন এবং ব্রুটসের প্রতিযোগী চিত্র কই? তাঁহার আসুরিক কৃষ্ণমূর্ত্তি সকল অসামান্য সৃষ্টি, কিন্তু তদ্বিপরীত শ্বেত মূর্ত্তি সকল

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া মানবকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া, ইউরোপীয় ট্র্যাজিডির আসুরিক সৃষ্টির সমর্থন করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা কত দুর পাপনিবারণ হয়, সে কথার বিচার না করিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে, ট্র্যাজিডি পাঠের সেইরূপ সুফল সম্ভাবিত, তাহা হইলেই বা কি হইল? মানবকে শুধু পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই কি যথেষ্ট হয়? মানবের পারমার্থিক ক্ষুধা কিরূপে সন্তৃপ্ত হয়? যে পারমার্থিক লালসায় উত্তেজিত হইয়া মানব জগৎকে শোভিত করিয়াছে, জগতে শান্তি ও অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছে, মানবের সেই পারমার্থিক লালসা যে অত্যন্ত প্রবলা। মানব-অন্তর যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তিরসের আধার, সে রসের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানব অহরহ ব্যস্ত রহিয়াছে। জেল দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, লোককে ধর্ম্মশীল করিতে হইবে। কিসে সদ্‌বৃত্তিসমূহের তৃপ্তিসাধন হয়, তাহার উপায় কি? তন্নিমিত্ত কি ধর্ম্মাদর্শসৃষ্টির আবশ্যকতা নাই? এক জন পরম পবিত্র পুণ্যবান লোকের চরিত্রপাঠে যত পরিতোষ ও আনন্দ জন্মে এবং মন যত আকৃষ্ট হয়, তত কি পাপচরিত্রের ভীষণ পরিণাম-কল্পনায় হইতে পারে? মহাজনের উদারতায় এবং দানবীরের মহত্ত্বে মন যত মোহিত হয়, অন্তরের যত স্ফূর্ত্তি হয়, তত কি আর কিছুতে হইতে পারে? পাপকণ্টক কাটিয়া মনুষ্যের মনে সুবীজ-রোপণের বিশিষ্ট উপায়—পুণ্যের পবিত্রতাদর্শন ও ধর্ম্মাদর্শ।

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিলে যেমন পাপস্পর্শ ঘটে, তেমনি ধর্ম্মের পুণ্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদা দেখিলে মনের মলিনতা অপনীত হইয়া পবিত্রতার সঞ্চার হয়। ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির ও রামের চিত্র সর্ব্বদা কল্পনায় রাখিলে কি মন পবিত্র হয় না? অথচ যুধিষ্ঠির ও রামের পবিত্রতা সচরাচর মানবে পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের পুণ্যময় চিত্র অসাধারণ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইলেও, মানবসমাজ তাঁহাদের আদর্শে উন্নীত ব্যতীত কিছু অবনত হইবে না। পুণ্যের আকর্ষণ এমনি, পবিত্রতার লাবণ্য এমনি, ধর্ম্মের জ্যোতিঃ এমনি যে, অতিমানুষ হইলেও তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মানব সেই ক্ষমতায় নীয়-মান না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদের অতিমানুষ ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া মানবসমাজ সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, সেই লাবণ্যে মোহিত হয় এবং সেই

জ্যোতিঃতে আলোকিত হ·
সেই দেবত্বের সহিত এই
পৌরাণিক ধর্ম্মবল কিরূপে
পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে
পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

যাহা অলোকসাধারণ, তাহাই অতিমানুষ। অতিমানুষ বা অসামান্য না হইলে প্রাকৃত জনগণের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। যাহা সর্ব্বদা ও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে না। যাহা অসামান্য ও অদ্ভুত, তাহাই বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, সুতরাং অনেক কাল স্মরণ থাকে। যাহা সাধারণ লোকের কল্পনাতীত, তাহাই কবির সৃষ্টিরাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং কবির সৃষ্টি প্রায় অদ্ভুত হইয়া পড়ে। অদ্ভুতকে আরও অদ্ভুত এবং চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি প্রকৃতির সীমা একটু অতিক্রম করিয়া অতি-মানুষে আসিয়া পড়েন। লেডি ম্যাক্‌বেথ সেই একটু প্রকৃতি-অতীত সীমার দৃষ্টান্ত। ওথেলোও কিয়দংশে অস্বাভাবিক চিত্র। তদ্রূপ রিচার্ড দি থার্ড, গনারিল, ব্রুটস, জন প্রভৃতি। মহাকাব্যের কল্পনায় এই অতিপ্রাকৃতিক বা অতিমানুষ কল্পনা কিছু অধিকতর দেখা যায়। কারণ, অতি অদ্ভুত নহিলে লোকের চিরস্মরণীয় হয় না। মিল্টনের সয়তানের কল্পনা অতি-অদ্ভুতে পরিপূর্ণ। অতি অদ্ভুত বলিয়া সেই সৃষ্টি এত মহান্ ও প্রকাণ্ড যে, মানবকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। তদ্রূপ, এড্যাম এবং ইভের সরলতা এবং পবিত্রতা অতি-অদ্ভুত। তাঁহার নরকের চিত্র যত অদ্ভুত ও বিস্তৃত, Paradiseএর বর্ণনা তত নহে। এ জন্য তাঁহার নরকচিত্রই অধিক-তর স্মরণীয় হইয়াছে।

পাপের অতিমানুষ চিত্রের দোষ এই, মিল্টনের সয়তানের মত, তাহার প্রকাণ্ডতা, উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্যে মন এত আকৃষ্ট হয় যে, সেই চিত্রকে যত দূর ঘৃণার্হরূপে সৃষ্টি করা অভিপ্রেত, তাহা তত ঘৃণার্হ বোধ হয় না। কারণ, তাহার প্রকাণ্ডতা বা অদ্ভুতরসে কতকটা চিত্তরঞ্জন ঘটে। সয়তানের অদ্ভুত ও বৃহৎ কল্পনায় মন মোহিত হওয়াতে, তাহা তত ঘৃণার্হরূপে প্রতীয়মান হয় না। অথচ সয়তান স্বয়ং পাপমূর্ত্তি। কিন্তু অতিমানুষ পুণ্যের চিত্রে এরূপ কুফল ফলে না। পুণ্যচিত্রমাত্রই ত সাধারণ জনগণের চিত্তরঞ্জন, তাহাতে সেই চিত্রে অদ্ভুতের সঞ্চার হওয়াতে সামান্য জনগণ দ্বিগুণ মোহিত

করিতে যায় না ও চায় না।
ত মোহিত হইয়া পড়ে যে,
দত হয় না। সেই পবিত্রতা
নবকে এমনি অধিকার ... থাকে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনুষ্যের পশুবৃত্তি। দয়া, দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি তাহার দেবভাব। কাম, ক্রোধ লোভাদির অতি-অদ্ভুত কল্পনা আসুরিক এবং দয়া ধর্ম্ম ভক্তি প্রভৃতির অতি অদ্ভুত কল্পনাই দেবোচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই আসুরিক কল্পনার সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য্যে দিব্য কল্পনা বিমলিন ও প্রচ্ছন্ন; কিন্তু আর্য্য-সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত। তথায় পাশব মানবপ্রকৃতি, দিব্য প্রকৃতির ছটায় নিষ্প্রভ। রামের পুণ্যজ্যোতিঃ মানবকল্পনাকে এত অধিকার করিয়াছে যে, রাবণের চিত্র আর স্মরণ থাকে না; তাহা যেন পাপান্ধকারে বিসর্জ্জিত হয়। ভরত ও রামের প্রগাঢ় পুণ্যরসে মন এত বিগলিত হয় যে, তাহাতে কৈকেয়ী ও মন্থরাকে অধিকতর ঘৃণিত বোধ হয়। তাহাদের পাপকল্পনা, ভরত ও রাম, এবং কৌশল্যা ও সীতার চরিত্রকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পাপের নিশান্ধকারে অস্ত গিয়াছে।

অতিমানুষ ধর্ম্মাদর্শ যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরে, অতিমানুষী ভ্রাতৃভক্তি তেমনি ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নে, এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবে। পিতৃভক্তি পুরু ও ভৃগুরামে। ভৃগুরাম বুঝি পিতৃভক্তির অবতার ছিলেন। তিনি সেই পিতৃভক্তিতে চালিত হইয়া পিত্রাদেশপালনার্থ মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিতে পারিবেন, এমন আশ ছিল বলিয়া তিনি মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বাস্তবিক তিনি সে মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের সৃষ্টিচাতুর্য্য দেখাইতে হইলেই অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করা চাই। তাই অদ্ভুত রসেই গাম্ভীর্য্যসাধন হয়। মিল্টনের সয়তান-সৃষ্টিতে যেমন অদ্ভুতের প্রকাণ্ড রচনা দেখা যায়, আমাদের মহাকাব্যেও তেমনি অদ্ভুত কাণ্ড সকল বর্ণিত হইয়াছে। না হইলে রসের প্রগাঢ়তা হয় না। পিতৃভক্তির অমানুষী পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্যই তদ্রূপ অদ্ভুত মাতৃহত্যার কাণ্ড কল্পিত হইয়াছে। পরশুরাম সেই পিতৃভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। মাতৃভক্তির অবতার পঞ্চ পাণ্ডব। পিতৃগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ ভগীরথ কি

অসাধ্যসাধনই না করিয়াছিলেন। পতিভক্তির দৃষ্টান্ত আমাদের আর্য্যসাহিত্যে অসংখ্য;—সতী, পার্ব্বতী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কুন্তী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী প্রভৃতি। তাঁহাদের অমানুষ প্রেম, ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। দানবীর—কর্ণ, বলি ও হরিশ্চন্দ্র। অমানুষ সত্যপালন রামচন্দ্রে। অমানুষ ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ।

আর্য্যসাহিত্যের এক দিকে এই সমস্ত ধর্ম্মাদর্শের পবিত্র সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে আসুরিক সৃষ্টিসমূহে পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম। এক দিকে পাপের দমন, অন্য দিকে পুণ্যের আকর্ষণ—এই উভয়বিধ চিত্রে সম্পন্ন হইয়া আর্য্যসাহিত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সেই আদর্শ যেমন জনসমাজকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে, তেমনি পুণ্যের পথে আকৃষ্ট করে। সে আদর্শ মানবকে কেবল নিষ্পাপ নহে, তাহাকে দেবতা করিতে চাহে। তদপেক্ষা উচ্চাদর্শ আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না।

এই দেখুন, আর্য্যসাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনাচিত্র আমাদের এই কথা কেমন সমর্থন করিতেছে।

ভীমসেনের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে, যখন তিনি শোণিতাক্ত হইয়া কাতরস্বরে রোদন করিতেছেন, তখন অশ্বত্থামা তাঁহার সন্তোষার্থ পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক আনিবার জন্য সেনাপত্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ঘোর নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া যে বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই হত্যাকাণ্ড ও শিশুমস্তকচ্ছেদনের কথা শুনিলে কাহার শরীর না শিহরিয়া উঠে? যে দুর্য্যোধনের সান্ত্বনার্থ তিনি এ কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তিনি পর্য্যন্ত তাহাতে সন্তোষলাভ করা দূরে থাক, বরং বিষণ্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কুরুপক্ষীয় এই ভয়ানক আসুরিক বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া কাহার মনে ঘৃণার সঞ্চার না হয়? কিন্তু এই পাপচিত্রের পরই পাণ্ডবপক্ষে কেমন এক বিপরীত সুন্দর দৃশ্য অভিনীত হইতেছে! দ্রৌপদী পঞ্চ শিশুর হত্যা শুনিয়া কাঁদিয়া অধীরা হইয়াছেন, তাঁহার কাতরতা দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার প্রবোধার্থ এই বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন,—"দেবি! আমি এখনি তোমাকে সেই নৃশংসের পাপমুণ্ড আনিয়া দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি স্নান করিলে তাহার পাপকার্য্যের কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে।" তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তিনি অশ্বত্থামাকে আবদ্ধ করিয়া আনিয়া দ্রৌপদীর সমক্ষে উপনীত করিয়া

দিলেন। সেই পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী তাঁহার পঞ্চশিশুহন্তাকে দেখিয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে :—

"সুশোভনা দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে পশুর ন্যায় সেইরূপ রজ্জুবদ্ধ, নিজ পাপকার্য্য হেতু লজ্জায় অবনতমস্তক এবং অপমানসহকারে আনীত দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং তাঁহার রজ্জুবন্ধন দেখিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন,—'নাথ! এ ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করুন। ইনি আমাদিগের গুরু। যাঁহার নিকট আপনি গূঢ়মন্ত্র এবং ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া রণকৌশল লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্রোণ এই পুত্ররূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার শরীরার্দ্ধ কৃপীও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন; সাধ্বী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর সহগমন করেন নাই। মহাত্মন্! গুরুকুলের অপকার করা আপনাদিগের উচিত নহে। প্রত্যুত তাহার পূজা ও বন্দনা করাই উচিত। নাথ! গৌতমনন্দিনী পুত্রশোকপীড়িতা হইয়া যেন আমার ন্যায় অশ্রু ত্যাগ না করেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকুলের অপমান করেন, তাহা হইলে, তিনি সপরিবারে নিরন্তর বিষম শোকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকেন'।"

পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর এত দূর ক্ষমা, এত দূর ধর্ম্মানুরাগ দেখিলে কাহার চিত্ত না মোহিত হয়! এই অমানুষী সহৃদয়তা, ক্ষমা ও ধর্ম্মানুরাগের চিত্র নিশ্চয়ই অশ্বত্থামার ঘোর বীভৎস চিত্রকে ঢাকিয়া ফেলে, এবং চিত্তকে এত উদারতায় পূর্ণ করে, এত শান্তরসে আর্দ্র করে, এত ধর্ম্মানুরাগে অনুরক্ত করে যে, সেই পাপচিত্রের স্মৃতি যেন মন হইতে অপনীত হয়, এবং ধর্ম্মের প্রভূত বল—যে বলে দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে দেখিবামাত্র উত্তেজিত হইলেন, শোক তাপ সব দূরে গেল—সেই বল অন্তরে অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে।

ট্র্যাজিডির উচ্চতা ভয়ানক এবং করুণ রসে। ট্র্যাজিডিতে করুণের কিরূপ স্থান, তাহা আমরা "সাহিত্যে খুন" নামক প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ট্র্যাজিডির পরিণামে খুন ঘটাতে বীভৎস রসের ঘোর সঞ্চারে কি ভয়ানক, কি করুণ, উভয়কে মন্দীভূত করে। স্বচক্ষে খুন দেখিলে, কি খুনের নাম শুনিলে, কি স্মৃতিপথে খুনের উদয় হইলেই, অমনি বীভৎসের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে এবং হৃদয় কম্পিত হয়। সেই ভাব একেবারে তিরোহিত না হইলে আর অনুকম্পার উদয়

হয় না। অনুকম্পা কাহার জন্য হয়? যে ব্যক্তি খুন হয়, সর্ব্বস্থলে যে তাহার প্রতি অনুকম্পা হয়, এমত নহে। একটি প্রকৃত ঘটনা লইয়া দেখ, "নবীন এলোকেশীর" খুনে পাপীয়সী এলোকেশীর প্রতি সাধারণ লোকের অনুকম্পার উদয় হয় নাই, নবীনই অনুকম্পার ভাগী হইয়াছিল। তদ্রূপ "হ্যাম্‌লেট" নাটকে খুনকারী ছোট হ্যাম্‌লেটের প্রতিই অনুকম্পার উদয় হয়। লর্ড ম্যাক্‌বেথ্‌ নিহত হইলে কি তাহার নিমিত্ত তত অনুকম্পা হয়, না কীচক ও দুঃশাসন বধে তাহাদের প্রতি অনুকম্পার সঞ্চার হয়? কিন্তু যেখানে ধর্ম্মপক্ষ নিগৃহীত বা নিহত হয়, সেইখানেই সেই নিগৃহীত ও নিহত ব্যক্তি অনুকম্পা-ভাজন হন। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, কৌশল্যা, কুন্তী, উত্তরা, পঞ্চপাণ্ডব, ডেস্‌ডিমোনা, কিং লিয়র, কনষ্ট্যান্স, অফেলিয়া প্রভৃতি এ কথার প্রশস্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু ট্র্যাজিডির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তদধিক আর কিছু হয় না। ট্র্যাজিডি পাপের ঘোর নরককুণ্ড এবং পাপ ক্রমে ক্রমে কেমন ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা দেখাইবার যেমন প্রকৃষ্ট উপায়, বিভিন্ন অবস্থায় পুণ্যের জ্যোতিঃ কেমন ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিবার তেমন উপায় নহে। "কিং লিয়রে"ও তাহা ঘটে নাই। রাজা নিগৃহীত হইয়া কেবল মাত্র অনুকম্পাভাজন হইয়াছেন। এক দিকে কর্ডেলিয়া, অন্য দিকে অপর দুই কন্যার চরিত্র এবং সংসারের গতি বিলক্ষণ বিকাশ করিয়া দেখাইবার নিমিত্তই যেন রাজার নাটক-মধ্যে সমাবেশ। যেরূপে রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নানাবিধ দুরবস্থায় দলে দলে পদ্মফুলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এবং এক এক মহান্‌ ধর্ম্মাদর্শের সৃষ্টি হইয়া শান্তরসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা যেমন আর্য্য-সাহিত্যের অন্তর্গত মহাকাব্যের প্রকাণ্ড প্রসারে সম্ভাবিত হইয়াছে, এমত আর কিছুতেই হয় নাই। "শকুন্তলায়" দুষ্মন্তচরিত্রে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান, তাহা যুধিষ্ঠির কিম্বা রামের উচ্চতায় উঠে নাই। সেক্‌স্‌পিয়ারের ট্রাজিডির কথা দূরে থাক, তাহার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ত এ কথা মূলেই সম্ভাবিত নহে; এমন কি, বিলাতী ল্যাটিন্‌ এবং গ্রীক মহাকাব্যে কি সেরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়? তাহাতে শৌর্য্য বীর্য্যের বিকাশ আছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং রামের মত তেমন ধর্ম্মবীরত্বের প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সৃষ্টি কই? রাম এবং যুধিষ্ঠির মানবের কল্পনাকে একেবারে জুড়িয়া বসে;—যেন সেখানে আর কিছুরই

সমাবেশ হইবার যো নাই। তাঁহারা কি কেবল লোকের অনুকম্পাভাজন, না ধর্ম্মবীরের প্রকাণ্ড চিত্র? তাঁহাদের সেই সমগ্রকল্পনাবিস্তৃত চরিত্র দর্শনে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, পাঠকের মনে এত শান্তরসের সঞ্চার হয় যে, তাহাতে অনুকম্পা আর স্থান পায় না।

অনুকম্পায় ডেস্‌ডিমোনা উদ্ভাসিতা। রাজা লিয়র এত কষ্টভোগ করিয়াছেন যে, তাঁহার দুরবস্থায় কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। কনষ্ট্যান্‌স পুত্রশোকে পাগলিনী, যেমন পাগলিনী পতিবিয়োগবিধুরা উত্তরা। তাহারা সকলেই পরকে কাঁদাইয়া বড় হইয়াছে। তাহারা নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইয়াছে। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই শেষ। ট্র্যাজিডির ঘোর অন্ধকারক্ষেত্রে ডেস্‌ডিমোনা একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। দিনদেবের প্রখর জ্যোতিঃ যখন রাহুগ্রস্ত হয়, যখন সেই রাহুর ছায়াপাতে দিবসের মুখ ম্লান হয়, দিবা দ্বিপ্রহর যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন যেমন একটি ক্ষুদ্র তারকার সামান্য জ্যোতিঃ দেখা যায়, ডেস্‌ডিমোনা সেইরূপ একটি নক্ষত্র। নাটকের কৃষ্ণতায় তাহার শ্বেতচিহ্ন একটু ফুটিয়াছে। অনুকম্পা সেই চিহ্নকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ট্র্যাজিডির কার্য্যই এইরূপ। ট্র্যাজিডি পাপছবির ঘোর অন্ধকারে ধর্ম্মের একটু জ্যোৎস্না ফুটাইতে চাহে। কিন্তু ধর্ম্মের সম্যক্ ছবি ও তেজ তাহাতে দেখা যায় না। ট্র্যাজিডি একাধারে তত স্থান পায় না। ধর্ম্মের ঈষদাভাস ব্যতীত তাহার মুখ সম্যক্ বিকাশ করিয়া দেখাইতে গেলে, ট্র্যাজিডির রসভঙ্গ ঘটে। ভয়ানকই তাহার প্রধান রস, করুণা তাহার পরিণাম। সেই রসে ধর্ম্ম যত দূর ফুটে, তত দূর পর্য্যন্তই তাহার সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মকে অধিকতর ফুটাইতে গেলে শান্তিরসের আবির্ভাব ঘটে; আর ট্র্যাজিক রস থাকে না। সুতরাং ট্র্যাজিডি শান্তিরসকে প্রবল করিতে পারে না। শান্তিরস প্রবল হইয়াছে—আর্য্যসাহিত্যে, নাটকে ও মহাকাব্যে। সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সম্যক্ বিকীর্ণ হইয়াছে।

ট্র্যাজিডিতে পাপচিত্র যেমন ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে,—পাপের গতি ক্রমে ক্রমে যেমন উচ্চতায় উঠিয়াছে, আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্ম তদ্রূপ। এ সাহিত্যে ধর্ম্মের বীরত্ব। মিল্টনে যেমন পাপের বীরত্ব ও জয়, আর্য্যমহাকাব্যে তেমনি ধর্ম্মের বীরত্ব ও জয়। সেই বীরত্বকে সম্যক্‌রূপে ফুটাইবার জন্য, তাহার পার্শ্বে আর দ্বিবিধ বীরত্বের বিরাট বিকাশ আছে। এক বীরত্ব ভীমের শারীরিকবলবীর্য্য, অন্য বীরত্ব অর্জ্জুনের শৌর্য্য

ও সামরিক বীরত্ব। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে বীরত্ব "ইতিহাসে" (History) প্রকাশিত, সেই বীরত্ব অর্জ্জুনের। আর ইউরোপীয় মহাকাব্যে যাহা Ajax, Hercules, Samson প্রভৃতির বীরত্ব, তাহা ভীমের মহাশক্তি। এই শক্তি দুর্য্যোধনে ছিল বলিয়া, দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিযোগী। ভীমের বীরত্ব ধর্ম্মাধীন, দুর্য্যোধনের বীরত্ব তাহা নহে। সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতিযোগী কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিযোগী দ্রোণ। দ্রোণের আসুরিক বীরত্বের প্রতিযোগী ঘটোৎকচ। ভীষ্মের প্রতিযোগী সমস্ত পাণ্ডববীর; যেমন অভিমন্যুর প্রতিযোগী সমস্ত কুরুবীর। কিন্তু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতিযোগী কে? তিনি অর্জ্জুনের বা ভীমের বীরত্বে প্রধান নহেন। সে বীরত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি অনেকবার লজ্জিত হইয়াছেন,—কর্ণের কাছে অপ্রতিভ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বীরত্বে প্রধান, সে বীরত্বের প্রতিযোগী কুরুপক্ষে কেহ ছিল না। সে বীরত্বের উচ্চতায় অর্জ্জুন, ভীম, সকলেই অবনত। অবনত বলিয়া ভীম ও অর্জ্জুনের গৌরব এবং আসুরিক বীরত্ব হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-বীরত্বের পার্থক্য। ধর্ম্মবীরত্বের উচ্চতা ভীষ্মে ছিল বটে, কিন্তু ভীষ্ম পাপ-পক্ষে আবদ্ধ হইয়া তাহা দেখাইতে পারেন নাই। পাপপক্ষ ধর্ম্মের বীরত্বে যে কিছুতেই উঠিতে পারে না,—পাপপক্ষের তেজে ধর্ম্মবীরত্ব যে কেমন অবসন্ন হয়, তাহা কুরুপক্ষে ভীষ্মদেবের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ধর্ম্মতেজ কেমন ক্রমশঃই উচ্চতায় উঠিয়াছে, তাহা পাণ্ডবপক্ষে প্রতীয়মান। ধর্ম্মের এই প্রশান্ত আদর্শ আর্য্যসাহিত্যে। আর আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের মহান্ চরিত্রের আলোচনায় প্রতীত হয়, পাপপক্ষের বল ও কৌশল যত কেন শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না, তাহা দৈববল ও কৌশলের নিকট একেবারে পরাভূত। দৈববল সর্ব্বোচ্চ বল; দেবপক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পক্ষ। দেববীর্য্য, মানবীয় সর্ব্ববিধ বীর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পার্থিব সকল বলের উপর দৈববল বিজয়ী। ধর্ম্ম অবশ্য দৈববলের আশ্রিত, সেই দৈবাশ্রিত ধর্ম্মপক্ষের সমকক্ষ কি পাপপ্রবণ ও পার্থিব বলে বলীয়ান কুরুপক্ষ হইতে পারে? কুরুপক্ষে ধর্ম্মের বীরত্ব ছিল না, সুতরাং দেবপক্ষেরও সহায়তা ছিল না; এই নিমিত্ত তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম কি ভারতের নায়ক?—না, ভীম যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শাসিত; অর্জ্জুনও তদ্রূপ; নিজে যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণাধীন। তবে ধরিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই ভারতের নায়ক। যিনি বিশ্বরাজ ও ব্রহ্মাণ্ডপতি,

যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমানরূপে প্রতীয়মান, তিনি ভারতেও সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। ভারতক্ষেত্রে তিনি ধনুর্দ্ধারী হয়েন নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বঘটে ও সর্ব্বস্থানেই তাঁহার শক্তি ও কৌশল অখণ্ডনীয় এবং বিজয়ী। সহস্র সহস্র নারায়ণী সেনা এক নারায়ণের সমতুল্য নহে। সমস্ত কুরুবীর তাঁহার কৌশলশক্তিতে পরাভূত। মহাভারত মধ্যে যেমন পদে পদে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, মিল্টনের মহাকাব্যে কি সেরূপ হয়? তথায় ভগবান্ নির্জ্জীব ও অদৃশ্য। তিনি তেমনই নির্জ্জীব, যেমন রামচন্দ্র মাইকেলের "মেঘনাদবধে"। কিন্তু এই রামচন্দ্র রামায়ণের মহাকাব্যে কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন?

মহাভারতে যে পর্ব্ব, রামায়ণেও সেই কাণ্ড। প্রভেদ এই, রামায়ণে এক রামচন্দ্রে সকল বীরত্ব একত্রীভূত; মহাভারতে যাহা ভীমের বল, অর্জ্জুনের বীরত্ব এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মগৌরব, সে সমস্তই একাধারে রামচন্দ্রে সমাবিষ্ট। তিনি তদপেক্ষাও অধিক। রামচন্দ্রে শুধু যে বল, বীর্য্য ও ধর্ম্ম, এমত নহে; তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের দৈবশক্তিও দেদীপ্যমান। এই রামচন্দ্রের প্রভূত শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ব্যাস কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামচন্দ্র রামায়ণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার মূর্ত্তি যেমন উজ্জ্বল, তেমন উজ্জ্বল রামায়ণে আর কে? বাল্মীকি সেই রামচন্দ্রে সমস্ত বলবীর্য্য ও শক্তি নিহিত করিয়া দিয়া, আবার সে সমুদায় একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যে ত্রিবিধ বীরত্ব ভারতের ভীমার্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরে, সেই ত্রিবিধ বীরত্ব রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানে। রামে একদা সর্ব্ববিধ বীরত্ব;—আবার লক্ষ্মণ ও হনুমানের পার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্মবীরত্ব অধিকতর জাজ্বল্যমান। ধনুর্ভঙ্গপণে ও অসুরনাশনে তাঁহার ভীমের বীরত্ব সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। ভার্গববিজয়ে ও রামরাবণের যুদ্ধকালে, তাঁহার অসামান্য শৌর্য্য ও সামরিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অথচ তিনি ধর্ম্মবীরত্বে লক্ষ্মণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের বীরত্বের পরিচয় অযোধ্যা হইতে তাঁহার বনগমনকালে যেমন, বনে বনে আশ্রমবাসী ঋষিগণের কাছে, সুগ্রীবপক্ষীয় বানর জাতির কাছে এবং রাক্ষসকুলের কাছেও তেমনি। সেই বীরত্বে সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, এবং রাক্ষসপক্ষীয় মারীচ প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মপ্রবণ রাক্ষসকুলও অবনত। মন্দোদরী বারম্বার রাবণকে সন্ধিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। কেন

করেন? কেবল কি রামকে মহাবীর জানিয়া সকলে রামের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন? তদপেক্ষা অন্য এক বিক্রম রামচন্দ্রে ছিল। সেই বিক্রম তাঁহার দৈববল। যে বলের তেজ রামচন্দ্রে ছিল, সেই দৈববলের বিক্রম অনুভব করিয়া মন্দোদরী পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন,—

"আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাম জন্ম বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্যামী প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপুরুষ সনাতনই হইবেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভিত সেই ক্ষয়রহিত, পরিমাণশূন্য, সত্যপরাক্রম, অজেয়, সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীমান্ মহাদ্যুতি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক সকলের হিতকামনায় মানুষরূপ ধারণ করিয়া বানররূপাপন্ন দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস পরিবারগণের সহিত মহাবল মহাবীর্য্য ভয়াবহ দেবশত্রু রাক্ষসরাজকে বধ করিয়াছেন।"—লঙ্কাকাণ্ড—১১৩ অধ্যায়।

তবেই, এক রামচন্দ্রে বাল্মীকি, সমগ্র পার্থিব বল দৈববলের সহিত নিহিত করিয়া, তাঁহাকে এক অদ্বিতীয় বীররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে সৃষ্টির বিশ্লেষণ—শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মপুত্র, অর্জ্জুন ও ভীম। এ এক অপূর্ব্ব মহান্ সৃষ্টি; সমুদায় বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ও পরমেশ্বরের বল একাধারে সন্নিবিষ্ট। তত বড় মহা-কল্পনা আর কি হইতে পারে? ট্রাজিডি এত উচ্চতায় কি উঠিতে পারে? ধর্ম্মের এত উচ্চ গৌরবে, ট্রাজিডির উপনীত হওয়া অসম্ভব। বিলাতী আসুরিক ও পার্থিব বলবীর্য্যপূর্ণ-কল্পনা-সমন্বিত মিল্টন কখন সে উচ্চতায় যাইতে পারেন নাই। তিনি শিব গড়িতে গিয়া তাঁহার মহাকাব্যে ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রীক এবং লাটিন মহাকাব্যেও পার্থিব বল ও আসুরিক বীর্য্য। অন্যদেশীয় মহাকাব্যে এই বাল্মীকির সৃষ্টি ও সুরসৌন্দর্য্য কোথায়! এই ধর্ম্মাদর্শ, বীরত্বসৃষ্টি, ও সুরশোভাবিকাশের বিস্তারিত লীলা-ক্ষেত্র রামায়ণ ও মহাভারত। আর্য্যকবিগণ সেই মহাকাব্যের মহাসাগর হইতে বারি আহরণ করিয়া এক এক ক্ষুদ্র কাব্যের সৃষ্টি করিয়া ভূলোকে মন্দাকিনীর স্বর্গস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই স্রোতে অবগাহন করিলে লোক স্নিগ্ধ হয় ও অমৃতাস্বাদন করে। সে অমরসুধা কি আর কোন জাতির সাহিত্যে পাওয়া যায়? তাহা কেবল ভারতের অমূল্য নিধি, অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও দিব্য সৌন্দর্য্য। তাহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে জগৎ মোহিত!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

পোষলা ।

পোষলা জিনিষটি সম্পূর্ণ এদেশী হইলেও, এই শব্দটি নাগরিকবর্গের নিকট কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসযুক্ত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, সুতরাং পল্লীগ্রামের পোষলা কাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, এই শব্দটির একটি পরিস্ফুট ব্যাখ্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সহরাঞ্চলে যাহার নাম বনভোজন, পল্লী অঞ্চলে তাহাই পোষলা নামে আখ্যাত ; তবে এই ভোজনক্রিয়া সাধারণতঃ পৌষ মাসেই সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম পোষলা হইয়াছে। বৎসরের অন্য কোন সময়ে, পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজেও বনভোজনের রীতি নাই ; কেবল পৌষ মাসেই পল্লীবাসীর হৃদয়ে এই সখের আধিক্য ঘটিবার কারণ কি, কোন কোন ভোজনতত্ত্ববিৎ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এ পক্ষকে নীরব থাকিতে হইবে, এবং অনুমান হয়, কেহই ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন না।

তথাপি আমার মনে হয়, পৌষমাসই পোষলার উপযুক্ত কাল। এই সময় পল্লীগ্রামে গৃহস্থ সাধারণের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের প্রায় কোন অভাব থাকে না ; আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণ প্রীতিকর, এবং তরুলতাবেষ্টিত ছায়াচ্ছন্ন কাননভূমি অত্যন্ত শোভাময় এবং সুপরিষ্কৃত। অন্তঃপুরের বৈচিত্র্যহীন চির-অভ্যস্ত পাকশালায় নিয়মিতরূপে বারো মাস আহার করিতে করিতে একটা অতৃপ্তির ভাব আসিয়া মনকে অন্তঃপুর হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় ; আমাদের অবরোধবদ্ধ, ক্ষুদ্র, রুদ্ধ পাকগৃহ ছাড়িয়া একবার বহিঃপ্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাসাদদ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, এবং বালক, যুবক ও বৃদ্ধ অতি অল্প লোকেই সে উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারে।

বৎসরের মধ্যে এই সময়ই পল্লীগ্রামে খাদ্য সামগ্রী সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হইয়া থাকে। ধান কাটাই মাড়াই হইয়া গোলায় উঠিতেছে, অনেকের বাড়ীতেই গুড়ের 'বাইন', নিত্য নূতন খেজুরে গুড়ে হাঁড়ী কলসী পূর্ণ, ক্ষেতে আইরি, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবি শস্যের অবস্থা বেশ ভাল। সকলের

ঘরে অপর্য্যাপ্ত তরকারী, যাহার বাড়ীতে একখানি সামান্য কুটীর, তাহারও ঘরের পাশে দুটি বেগুন গাছে কালো কালো বেগুন ঝুলিতেছে, সম্মুখে দুই হাত জমিতে পালঙ শাক লক লক করিতেছে, সিম ও লাউ গাছ ঘরের চালে লতাইয়া উঠিয়াছে, খুঁজিলেই দুই একটা লাউ এবং দশ বিশ গণ্ডা আলতা-পাতি শিম পাওয়া যায়, কানাচের সজিনা গাছে থোকা থোকা সজিনা ফুল। মেটে আলু, শাদা ও লাল আলু, মূলো, কচু, বেগুণ, পেঁয়াজের কলি প্রভৃতি নানা রকমের তরকারীতে বাজার সরগরম; এ সময় মাছেরও অভাব থাকে না, বাগ্দিনীরা সকাল বেলা গৃহস্থবাড়ীতে ছোলা মটরের শাক এবং তারামণির ফুল চেঙ্গারি বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসে, সুতরাং নিতান্ত সহর-ঘেঁসা না হইলে, কোন পল্লীবাসীই সহরাঞ্চলসুলভ শীতকালের প্রধান তরকারী কপি ও কড়াইশুটীর জন্য কিছুমাত্র হা হুতাশ করে না।

পৌষমাস আরম্ভ হইবামাত্র ছেলেদের মধ্যে পোষলা করিবার জন্য মন্ত্রণা চলিতে থাকে। পাঠশালায় গুরুমহাশয় আসিবার আগে, স্কুলে টিফিনের সময়, বৈকালে খেলা করিবার অবসরকালে, এমন কি রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়াও, এই গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ চলে। কেহ এক মাঠের নাম করিল, এক জন প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না ভাই, ও মাঠ বড় জলটানা" (অর্থাৎ নিকটে কোন জলাশয় নাই), হয় ত আর একটা মাঠের নাম হইল, তাহার নিকটে কোন জলাশয় আছে বটে, কিন্তু নিবিড়ছায়াপূর্ণ বৃক্ষরাজির বড় অভাব, মধ্যাহ্নকালে রাঁধাবাড়া এবং খাওয়াদাওয়া গাছের ছায়া ভিন্ন ফাঁকা জায়গাতে হওয়া সম্ভব নহে; অনেক তর্ক বিতর্কের পর বসন্তপুরের মাঠেই পোষলা করিতে যাওয়া স্থির হইল; কারণ, তাহার নিকটেই দীঘি আছে, এবং তাহা জোড়া বটগাছ হইতে বড় বেশী দূরও নহে, পোষলা করিবার পক্ষে এমন উত্তম স্থান আর নাই। এই শুভকার্য্যের জন্য একটা রবিবার নির্দ্দিষ্ট হইল।

পল্লীবাসীদিগের মধ্যে যে সকল গরীবের ছেলে বেশী পয়সা সংগ্রহ করিয়া বাজার হইতে আবশ্যক জিনিসপত্র কিনিয়া বিশেষ ধূমধামে পোষলা করিতে না পারে, তাহারা সকলেই নিজের নিজের আহারের উপযুক্ত চাল, ডাল, লবণ, তেল, বেগুণ, আলু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট মাঠে উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে দুই একটি করিয়া পয়সা চাঁদা দিতে হয়; এই

পয়সার মাছ, পায়েসের জন্য দুধ, গুড় ইত্যাদি জিনিস ক্রীত হইয়া থাকে। নানা রকমের চাউল, এবং নানা বর্ণের ডাল তাহাদের খাদ্য দ্রব্যে এক নূতন আস্বাদন প্রদান করে।

এইরূপে চাল ডাল বাঁধিয়া এবং মায়ের কাছ হইতে দুইটি করিয়া চারিটি পয়সা চাহিয়া লইয়া, বিপিন ও বিনোদ দুই ভাই এক রবিবারের সকাল বেলা তাহাদের বন্ধুবর্গের সহিত বসন্তপুরের মাঠে পোষলা করিতে গেল। দামিনী ও বিধু বিনোদ বিপিনের ছোট; দামিনীর বয়স আট বৎসর, বিধুর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সকাল বেলা দাদাদের সঙ্গে পোষলা করিতে যাইতে না পাইয়া ভাই বোনে ভারি হাঙ্গামা বাধাইল। মা পুত্র কন্যা দুটিকে ভুলাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, বাক্স হইতে ফরাসী ছিটের পুরাতন দোলাইয়ের এক অংশ ছিঁড়িয়া সেই ব্যাকুলা কন্যার সদ্যোবিবাহসম্ভাবিতা মেয়ের জন্য প্রদান করা হইল, বিপিনের এক বন্ধু তাহাদের বাড়ীর জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের বিসর্জ্জনের সময় চালীর এক অংশ হইতে খানিক রাঙ্গতা তুলিয়া সৌহৃদ্যের নিদর্শনস্বরূপ তাহা বিপিনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য দান করিয়াছিল, বিপিন সেই তুচ্ছ পদার্থ অমূল্য রত্নের মত যত্নে রাখিয়াছিল;—দামিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুতুলের গহনা গড়াইবার উদ্দেশ্যে সেই রাঙ্গতার কিয়দংশও তাহাকে অর্পণ করা হইল। বিধুকে অন্য দিন অপেক্ষা বেশী করিয়া সরাগুড় দিয়া মুড়ি দেওয়া হইল; কিন্তু তাহারা ঝোঁক ছাড়িল না। বেলা বেশী হইয়া উঠিল, রাখাল গোয়াল হইতে গরু বাহির করিয়া মাঠে চরাইতে লইয়া গেল, ভিখারিণীর দল পিতলের চক্‌চকে ঘটি হাতে করিয়া "রাধাকৃষ্ণ, চাট্টি ভিক্ষে পাই গো মা!"—বলিয়া গোময়লিপ্ত অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল, বাগ্দিনী ঝুড়ি বোঝাই করা শাক আনিয়া "ছোলার শাক নিতে হবে গো মাঠাকুরুণ"—বলিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এমন সময় দত্তদের নগিন্নি স্নানান্তে মুক্তকেশে শুভ্রবেশে একখানি হাতা হাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৌ মা, এখনো আগুন জ্বালনি, আজই একবার সকাল ক'রে খোলা জ্বালবো মনে কচ্চি।"—বিপিনের মা বলিলেন, "না মা! আজ রবিবার.ইস্কুলের ত তাড়াতাড়ি নেই, তাই এখনো আকায় আগুন দিইনি, বিপিনরা দু ভায়ে আজ পোষলা করতে গিয়েছে, এরা ভাই বোন যেতে পায় নি বলে কেঁদে খুন হোল, তা বল দেখি ঠাকুরণ, ওদের কি করে তাদের সঙ্গে ছেড়ে দিই?"—দত্তগৃহিণী বলিলেন,

"তা এক কাজ কর না কেন ? তোমাদের ঐ গোয়ালবাড়ীটাতে আজ ওদের পোষলা রেঁধে দাও, তা হ'লেই ওরা শান্ত হবে।"

বিপিনের মা দেখিলেন, এ যুক্তি মন্দ নয়। ছেলে মেয়ের জন্য গোয়াল-বাড়ীতেই পোষলা রাঁধা স্থির করিলেন। গোয়াল-বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার, ঝরঝরে ; এক দিকে গরুর গোয়াল, অন্য দিকে ঢেঁকিঘর, তার পাশেই এক-খানা লম্বা চালা, এই চালাতে না আছে, এমন জিনিস নাই,—কতকগুলো কাঠ, ঘুঁটে, গোটাকতক মাটীর কলসী, অধিকাংশেরই কাঁধাভাঙ্গা ; একটা ছোট বাঁশের মাচা, তাহার উপর দুই ছালা শিমুলের তুলো, কতকগুলো পাট ঝাটি, চুকোশাকের বিছন আটি করিয়া বাঁধা, আধ কলসী পালঙের বীচি, আধখানা ভাঙ্গা জাঁতা, দুখানা বরগা, খান দুই তিন ছেঁড়া চাটাই এবং এক কোণে একটা ইন্দুরের গর্ত্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত একরাশ ঝুরো মাটি।

গোয়ালবাড়ীর পাশে বেগুণ ও শাক সবজীর বেড়। প্রাঙ্গণখানি ছায়াচ্ছন্ন ; একটা ঝাঁকড়া কুলগাছ, একটা শিউলীগাছ, একটা লম্বা নিমগাছ এবং গোটাকত পেয়ারা ও কাঁঠালের অনতিদীর্ঘ চারা সমস্ত উঠানটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণ বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের কিছু ঊর্দ্ধে উঠিলেই দূরে দিঘীর প্রান্তবর্ত্তী বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া, নিম্ব বৃক্ষের শাখাপত্রের ব্যবধানপথে সকৌতুকে এই গোয়ালবাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তখন বৃক্ষশাখায় পক্ষিকুল বসিয়া সহর্ষে গান আরম্ভ করে, রাখালবালক বাছুর বাঁধিয়া গোদোহনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ফকিরের মা গোয়ালকাড়ুনি আইরির ডালের স্বভাবরচিত প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী দ্বারা এই প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে ; এবং বিপিনের ছোট বোন দামিনী তাহার মেয়ের বিবাহকার্য্য স্থগিত রাখিয়া পুতুলের কাপড় ছোপাই-বার উপযুক্ত বুটি শুকাইবার জন্য শিউলী গাছের তলায় কোঁচড় ভরিয়া পুষ্প-সংগ্রহে রত হয়। তাহার পূর্ণ মুখখানিও প্রভাতের প্রস্ফুটিত শিউলী ফুলের মত সুকোমল এবং সুন্দর, এবং খাবার কম হইয়াছে বলিয়া মায়ের উপর অভিমান করিয়া ছলছল চক্ষে ফুল কুড়াইতে আসিলে, মধুর প্রভাতে তাহার সেই মুখখানিও এমনি শিশিরসিক্ত দেখায় ; কিন্তু কোন মুখখানি দেখিবার আশায় অরুণদেব যে প্রত্যহ প্রভাতে নিয়মিতরূপে নিমগাছের অন্তরাল হইতে আপনার হাস্যকৌতুকপূর্ণ মুখখানি বাড়াইয়া দেন, তাহা

নিঃসন্দেহে বলা যায় না ; তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, গোবিন্দপুর গ্রামের একটি গৃহস্থের গোয়ালবাড়ীর এই প্রাভাতিক দৃশ্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর হয় না।

কুলগাছের তলে একটি তিউড়ী খুঁড়িয়া দামিনী ও বিধুর জন্য তাহাদের মা পোষলা রাঁধিতে বসিলেন। বেড়ের মধ্যে বেগুণ গাছে কাল কাল বেগুণ এবং চালের উপর শিম ফলিয়াছিল, তাহাই তুলিয়া আনিয়া ভাজিয়া দিলেন, গাছ হইতে একটা পাতি লেবু তুলিয়া অম্বলের কাজ শেষ করা হইল। কিন্তু ভাই বোন পায়েসের জন্য বড় ধূম লাগাইল, তাই তিনি গোবরার মাকে শীতল ঘোষের বাড়ী হইতে আধ সের টাটকা খেজুরে গুড় আনিতে বলিলেন। শীতল ঘোষ চৌধুরীদের অনেকগুলি খেজুর গাছ কাটিয়াছিল, প্রত্যেক গাছের খাজনা স্বরূপ তাহার নিকট হইতে দুই সের করিয়া গুড় পাওয়া যাইত ; যাহারা গুড় না লইয়া পয়সা লয়, তাহারা দুই আনা হিসাবে খাজনা পায়, কিন্তু ছেলেপিলের বাড়ী গুড় না লইলে চলে না বলিয়া, বিপিনের মা পয়সার পরিবর্ত্তে গুড় লইতেন।

গোবরার মা গুড় লইয়া আসিল। সকালে মাঠে লইয়া যাইবার আগে রাখাল বুধী গাইকে দুহিয়া রাখিয়া গিয়াছে, বিপিনের মা আধ সের দুধ, এক মুঠো আতপ চাউল ও টাটকা খেজুরে গুড় দিয়া ছেলে মেয়েকে পায়েস রাঁধিয়া দিলেন। দামিনী ও বিধু পোষলা করিয়া শান্ত হইলে গৃহিণী এঁটো কাঁটা পরিষ্কার করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখন বেলা অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। নদীতে স্নান করিতে যাই-বার আর সময় ছিল না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি কূপ হইতে দুই ঘড়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিয়া ভিজে চুলগুলি মাথার সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধিয়া রান্না-ঘরে চলিলেন। চুল ঝাড়টা শুকাইবারও অবসর হইল না, কারণ বাড়ীর কর্ত্তাটি শীঘ্রই জমিদারবাড়ী হইতে বুভুক্ষু অবস্থায় আসিবেন, এবং মাঠ হইতে রাখাল কৃষাণের ফিরিতেও অধিক বিলম্ব নাই।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পোষলা অনেক বাড়ীতে এই রূপেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু বুড়াদিগকে পোষলায় মাতিতে দেখাই অধিক পরিমাণে আমোদ-জনক। মাসের অর্দ্ধেক অতীত হয় দেখিয়া বৃদ্ধ জমীদার রামকিঙ্কর বাবুর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর পোষলার আয়োজনে মন দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রিয়তম বয়স্য গদাধর চন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গেল, তাহার প্রতি

কপি, কড়াইসুটী এবং কমলালেবু আনিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে সেই দেবদুর্লভ তরকারী আসিয়া পঁহুছিলে, বন্ধু বান্ধব-বর্গকে লইয়া বাবু পোষলা করিতে চলিলেন; দলে অনেক লোক—প্রায় পঞ্চাশ জন হইবে; পাড়ার অনেক আমোদপ্রিয় যুবক সঙ্গে যুটিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিন সকালবেলা বাবু সদলবলে নেপাল মাঝির নৌকায় চড়িয়া ভৈরব পার হইলেন। সঙ্গে রন্ধনের সরঞ্জাম অনেক রকম চলিল; চাউল আধমণ, প্রচুর পরিমাণে তৈল, ঘৃত, তরকারী, দুই তিন রকমের ডাল, মসলা বাটা, বড় বড় কড়া, ভাত ডাল রাঁধিবার পিতলের ডেক্‌চী ইত্যাদি। বেলা দশটার সময় নদীর পশ্চিম পারে, মাধবপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল; নৌকা তীরে লাগিবামাত্র সকলে ঝুপঝাপ করিয়া নামিয়া পোষলার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিতে চলিল, দুই জন গোয়ালা চাকর জিনিষপত্র পাহারা দিতে লাগিল।

মাধবপুর গ্রামখানি সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীর পাউড়ীর ঠিক উপরেই দুই তিন খানি বড় বড় আটচালা ঘর, এটি মণ্ডলদের গোলাবাড়ী, ভিতরে সারি সারি গোলা, প্রাঙ্গণে তিন চারিটা উচ্চ নারিকেল গাছ—গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীর হইতে এ গুলি চিত্রের ন্যায় সুন্দর দেখায়। পাউ-ড়ীর উপরে ঝাউ ও দেবদারু গাছের সারি,—উর্দ্ধশাখায় বসিয়া নানা রকম বিচিত্র বর্ণের পাখী কলরব করিতেছে; দোয়েল গান ধরিয়াছে, শ্যামা শিষ দিতেছে, হল্‌দে পাখী 'বৌ কথা কও'র অবিরাম ঝঙ্কারে কোন্ অনু-দ্দিষ্টা, অভিমানগ্রস্তা, নীরব পল্লীবধূর অভিমানভঙ্গের নিষ্ফল আশায় আপ-নার কণ্ঠস্বরকে ক্লান্ত করিয়া তুলিতেছে। নদীর ক্রমনিম্ন তীরদেশে সাদা-কালো ছাগলের দল মাথা নীচু করিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, একটা কুকুর দীর্ঘ ঘাস ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া প্রাণপণ শক্তিতে এক খানা হাড় চিবাই-তেছে, নদীকিনারায় শৈবালরাশির মধ্যে সম্মুখের দুই পা বাঁধা একটা ঘোড়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুখ নামাইয়া কি খাইতেছে, এবং দূরে দূরে দুই তিনটা ডাহুক ও জলপিপি আবক্ষ দীর্ঘ পদে দামের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর অপর পারে এক জন ধোপা এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পাটের উপর ময়লা কাপড় আছড়াইতেছে, তাহার সঙ্গিনী দুইটি স্ত্রীলোক সদ্যোধৌত কাপড়ের দুই পাশ ধরিয়া মাঠের উপর মেলিয়া দিতেছে, এবং এক একবার হাঁড়িতে করিয়া জল লইয়া তাহার উপর ছড়াইয়া

দিতেছে। একটু দূরে কতকগুলা গরু চরিতেছে, একটা ইটের পাঁজার কাছে দাঁড়াইয়া দুই জন রাখাল 'পাল্লা দিয়া' নদীজলে ঢিল ছুড়িতেছে, কাহার নিক্ষিপ্ত ঢিল বেশী দূরে যায়, ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ব্যস্ত,—এদিকে তাহাদের দুই একটা গরু চরিতে চরিতে দল ছাড়িয়া ধোপার কাপড়ের উপর গিয়া পড়িল, আর ধোপার ছয় বৎসরের একটি ছেলে বাম হস্তে একটা প্রকাণ্ড পেট মোটা ডাবা হুঁকা ও দক্ষিণ হস্তে চিতের ডাল লইয়া গরু তাড়াইয়া চলিল।

মাধবপুরে গৃহস্থপল্লীর অল্প দূরে একটা প্রকাণ্ড বাগান। সেই বাগান পোষলার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। বাগানটি ছায়াপূর্ণ, আবর্জ্জনাবর্জ্জিত, নদী হইতে অধিক দূরে নহে; এই বাগানে আম, তেঁতুল, কতবেল, চালতা এবং লিচু গাছের সংখ্যাই অধিক, অন্যান্য গাছও অনেক আছে। একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নীচে তিন চারিটা বড় বড় তিউড়ি খোঁড়া হইল। যুবকের দল বৃক্ষশাখায় সাদা, লাল, হল্‌দে রঙ্গের শীতবস্ত্র ঝুলাইয়া, জুতা ছাড়িয়া, কেহ তরকারী কুটিতে, কেহ চাউল ধুইতে, কেহ কাঠ কাটিতে বা উনান জ্বালিতে—প্রবৃত্ত হইল। চারি দিকে সকলেই শশব্যস্ত, হাস্যকলরবে চারি দিক পরিপূর্ণ,—যেন এই শান্ত অরণ্য-ভূমিতে কতকগুলি লোক মৃগয়া করিতে আসিয়াছে। দূরে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে ঘুঘুর দল এই কলরবের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া, গলা ফুলাইয়া, মাথা নোয়াইয়া 'ঘুঘু' 'ঘু' শব্দে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়বেগ প্রশমিত করিতেছে। জামরুল গাছের ডালে কাঠঠোকরা 'ঠক্' 'ঠক্' শব্দে তাহার দীর্ঘ কঠিন চঞ্চুর আঘাতে বৃক্ষবল্কল ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং অদূরে একটা কদম্বের আগডালে একটা চিল বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এবং মাঝে মাঝে অতি করুণ, তীব্র স্বরে শীতকাতর জীবনের কঠোর বেদনা ব্যক্ত করিতেছে।

কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর অনুগত দুই চারি জন ব্রাহ্মণযুবক রন্ধনকার্য্যে বিশেষ দক্ষ, সকল বিষয়েই তাহারা ধনুর্দ্ধর। গাঁজা টানিতে, মদ খাইতে, মারামারি করিতে, অপরাধে বা নিরপরাধে বাবুর জুতা খাইতে এবং বাবুর প্রসন্নতালাভকালে প্রহারের সুদ ও আসল পোষাইয়া রসগোল্লা গিলিতে অত্যন্ত মজবুত; সকাল নাই, বিকাল নাই, দুপর নাই, সন্ধ্যা নাই, সকল সময়ই তাহারা গোবিন্দপুরের গ্রাম্য রাস্তায়, নদীর ধারে, পুকুরের পাড়ে,

গৃহস্থের বাগানের প্রান্তবর্ত্তী সরু গলি পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; পরিধানে চওড়া পেড়ে কাপড়, পায়ে সদ্যোত্রস জুতা, গায়ে কামিজ বা কোট, কখন তাহার উপর কোঁচান চাদর, কখন র্‌্যাপার, কাহারও হস্তে ছাতা, কাহারও হাতে ছড়ি,—কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছে, সর্ব্বজ্ঞের প্রপিতামহও তাহা বলিতে পারেন না! কিন্তু কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর এই সকল কিঙ্করের গতি ত্রস্ত, মুখের ভাব ব্যস্ত, চক্ষু সর্ব্বত্রগামী, দেখিয়া মনে হয়, কোনও ধনবানের বংশধর বুঝি পিতার অগণিত অর্থে আপনাদিগের তীক্ষ্ণ বিষদন্ত ক্ষয় করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাহারও চাল চুলা নাই, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্র কৃষ্ণকিঙ্করের তৈলাক্ত স্কন্ধে ভর করিয়াছে;—এ দিকে তাহাদিগের দুঃখিনী মাতা পৈঁতা কাটিয়া কিম্বা কোনও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাচিকার কাজ করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছেন। ইহারা কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; তাহাদিগকে পথে দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খেলাধূলা ছাড়িয়া রাস্তা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যুবতীর দল সভয়ে ঘোমটা টানিয়া পথ হইতে দশ হাত তফাতে দাঁড়ায়। গাছিরা খেজুর গাছে ঠিলি বাঁধিতে উঠিয়া দৈবাৎ ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠে, এবং রস চুরী যাইবার ভয়ে ঠিলির মধ্যে পর্য্যাপ্তপরিমাণে মানকচু রাখিয়া দেয়, কিন্তু 'নষ্টস্য কান্যা গতিঃ'—সন্ধ্যার পর পাঁচ সাত জনে মিলিয়া রস চুরী করিতে গিয়া যখন ইহারা দেখিতে পায়, বেবাক ঠিলির মধ্যেই মানকচু চাকা চাকা করিয়া কাটা রহিয়াছে, তখন নিরাশ ক্রোধে চঞ্চল হইয়া ঠিলিগুলি ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রস্থান করে,—প্রভাতে নির্ব্বোধ গাছিরা বুঝিতে পারে, ঠিলিতে মানকচু না দেওয়াই ছিল ভাল, রস চুরী যাউক, ঠিলিগুলি ভাঙ্গিত না।

যাহা হউক, এই সকল আটপিটে 'দশকর্ম্মান্বিত' ব্রাহ্মণযুবক এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বন হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল, খন্তা দিয়া মাটি খুঁড়িয়া উনন প্রস্তুত হইলে—রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল। বেলা অনেক হইয়াছে, এবং শীত কিছু কমিয়াছে দেখিয়া, তৈলচর্চ্চিত দেহে অনেকে স্নান করিতে আসিল।

তখন বেলা বারটা। গ্রামের গৃহস্থ রমণীগণ সংসারের কাজ সারিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন, নিশ্চিন্ত মনে স্নান করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে

কত গল্প, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা, কত হাসি, কত বেদনাভরা সাশ্রু-কাতর বচন ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার সংখ্যা নাই; ছোট ছোট মেয়েরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গামছা ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিতেছে, কোনও বার গামছা ভরিয়া গুগ্‌লি উঠিতেছে, কোনও বার শুধু বালি উঠিতেছে, আর তাহাদের ওষ্ঠস্খলিত কৌতুকতরল সরল হাস্যে নদীতট প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দুই তিন জন বৃদ্ধা জলের ধারে এক খানা কাঠের গুঁড়ির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া তেল মাখিতেছে, মাটি দিয়া মাথা ঘসিতেছে, কেহ বা বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছে, কয়েকটা বক নিম্নতটবর্ত্তী শুশুনির জমির উপর তাহাদের দীর্ঘ লঘু পদ শনৈঃ শনৈঃ নিক্ষেপ করিয়া আহার-অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পোষলার দল নদীতে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, নিতাই মাঝির মাছের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে;—খালুয়ের ভিতর নানা রকম মাছ,—মোটা মোটা গল্লা চিংড়ি, মাঝারী রকমের কালবাস, নৌচি, মিরগেল, বড় বড় খয়রা—দেখিয়া বাবুদের মনে যৎপরোনাস্তি লোভের সঞ্চার হইল, তাহারা খালুই সমেত সমস্ত মাছ পোষলার কাছে লইয়া গেল, নিতাই বাবুদের অনুসরণ করিল, তাহার পুত্র বাঁশি দাঁড়ের উপর জাল খানি ঝুলাইয়া গৃহে চলিল। কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু গ্রামের বাজারে মাছের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, বিশেষতঃ মাছ গুলি খুব টাট্‌কা। বাবুদের মাছের দরকার অত্যন্ত বেশী, এ কথা বুঝিতে পারিয়া নিতাই খালুয়ের সমস্ত মাছের দাম দু টাকা চাহিল। কিন্তু অবশেষে বারো গণ্ডা পয়সাতেই সমস্ত মাছ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, যদিও এইরূপ 'থাওক' সমস্ত মাছ বেচিয়া তাহার লাভ হইল না; কিন্তু কি করিবে? কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু জমীদার, তিনি ইচ্ছা করিলে নিতাইকে 'ভিটে-মাটি' ছাড়া করিতে পারেন। যাহা হউক, এতখানি লোকসান দিয়াও সে ভরসা করিল যে, এবার বাবুকে ধরিয়া তাহার বাড়ীর কাছের আম কাঁঠালের বাগান খানি কিছু কম টাকায় জমা করিয়া লইবে।

রান্নাবাড়া সমস্ত ঠিক হইলে হঠাৎ দেখা গেল, একটা জিনিষের বড় অভাব রহিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে পেঁয়াজ আনা হয় নাই। নৌকা করিয়া নদী পার হইয়া গ্রামের বাজার হইতে পেঁয়াজ আনিতে অনেক বিলম্ব হইতে

পারে, হয় ত এত বে
ভাবিয়া দুই জন মোসা
ঘণ্টার মধ্যে এক কোঁচড়
উপস্থিত হইল। "রামকান্ত বড়
ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রা
পংক্তি বিকাশ করিয়া বলিল, "অ
পারি? হুজুর রাতে বাঘের দুধ মিল
তৎকালে ব্যাঘ্রদুগ্ধের বিশেষ কোনও আবশ্যকতা অনুভূত না হওয়াতে, ..
কান্তের এই বাহাদুরী পরীক্ষা করিবার কাহারও অবসর হইল না। বিশেষ তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়—একটি তিউড়ীর উপরে এক প্রকাণ্ড কড়াইয়ে পায়েস চড়িয়াছে, টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, আর একটা টুলের উপর গামছা কাঁধে এক জন লোক প্রকাণ্ড একখান হাতা দিয়া নূতন খেজুরে গুড় এবং আতপ চাউল মিশ্রিত সেই দুগ্ধরাশি আলোড়িত করিতেছে, অন্যান্য সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সন্নিবদ্ধ। কেবল একটু দূরে একটা আমগাছের ছায়ায় দুই তিনটি ছেলে 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতেছিল, এবং আরও খানিক দূরে বৃক্ষাদিবর্জ্জিত, রৌদ্রতপ্ত 'উকুনে'-পূর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলি অধিকবয়স্ক বালক মহা উৎসাহে ব্যাট্‌বল খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় মিষ্টান্ন ও দধি লইয়া ময়রা এবং গোয়ালা পোষলা ক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইল। ময়রার পো আধাছানার সন্দেশ যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টার ক্রটী করে নাই; গোপবৃদ্ধও 'শুকোদই' পাতিবার সমস্ত অব্যর্থ কৌশল বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু সন্দেশ ও দধি দেখিয়া কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর গদাধরপ্রমুখ বয়স্যবর্গ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এ সন্দেশ গোয়ালাবাড়ীর দিক দিয়াই যায় নাই; এই যে দই, ইহাকে 'শুকো' বলিলে কাহাকে "রাশি" উপাধি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিস্তর গবেষণা দ্বারাও নিরূপণ করিতে অক্ষম। গোয়ালা এবং ময়রা উভয়েই তাহাদের সযত্নরচিত সামগ্রীর এইরূপ অবৈধ সমালোচনা শুনিয়া, এই সকল চাটুকারপুঙ্গবের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির প্রতি স্বগত যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিল, তাহা শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্দেশে বর্ষিত হওয়া ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কখনও খাদ্যদ্রব্যের তালিকাভুক্ত হয় নাই।

।, ছেলেরা দাণ্ডাগুলি
.। বসিয়া গেল। কয়েক
। দিল ; ধীরে ধীরে আহার

আকাশপ্রান্তে নামিয়া পড়ি-
। ছায়া মাঠের উপর পড়িয়া ক্রমে
. . .. ক্রমে গোধূলির ছায়া জলস্থল সমস্ত
..।চ্ছন্ন করিল। পোষলার দলস্থ সকলে মোটা কাপড়ে সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া নৌকায় উঠিল। যখন গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগান হইল, তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, আকাশে অনেক নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাগানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকচ্ছটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং নদীর অপরপারস্থ বাগানের অভ্যন্তরবর্ত্তী বুনোপাড়া হইতে ম্লান মৃৎপ্রদীপ মৃদু আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

পারঘাটের কাছে বটগাছের নীচে আসিয়া নৌকা লাগিল। তখন পারঘাটের খেয়া নৌকায় মসকপূর্ণ একগাড়ী গুড় নদী পার হইতেছিল, অদূরস্থিত গৌরদাস বাবাজীর আখড়া হইতে খোল করতালের আওয়াজ আসিয়া একটা/আসন্ন কীর্ত্তনের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল, এবং পারঘাটার উপরে শিমুলগাছের নীচে মাঝিদের অন্ধকারময় শয়নকুটীর হইতে কে এক জন গাহিতেছিল ;—

"বেলা গেল সন্ধে হ'ল পার কর আমারে !"

অন্ধকারপূর্ণ স্তব্ধ সায়াহ্নে নদীপ্রান্তবর্ত্তী কুটীরশায়ী একটি নিরক্ষর ব্যক্তির তাললয়হীন এই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে একটি অস্পষ্ট বেদনার প্রতিধ্বনি, শান্ত সন্ধ্যার মর্ম্মপ্রবাহী সংযত আকাঙ্ক্ষার একটি অত্যন্ত মৃদুকল্লোল শ্রোতার সমবেদনা ও দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় মনোহরগঞ্জের ডাকহরকরা অনেক দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাঝি, নৌকা বাঁধো।"

গান বন্ধ :করিয়া নীলমণি মাঝি শশব্যস্তে ডাকের নৌকা ঘাটে লইয়া আসিল। ঝম্ ঝম্ করিয়া ঘুঙুর বাজাইয়া ডাকহরকরা নৌকায় উঠিয়া

ক্রম কালের যাথার্থ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর উৎকৃষ্টতর তত্ত্বের অনুরোধে সাধিত হইয়াছে। আর সেই ব্যতিক্রমের ফল প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের অনুকূল হইয়াছে। যে স্থলে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার সহিত কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনের প্রচলিত ইতিহাসের বহির্ভূত অংশ ও প্রণালী প্রকটিত করা; বাস্তব চরিত্রের অনুদ্দিষ্ট অংশ, ... চরিত্রে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি সে উদ্দেশ্য ... ।কিসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপস্বী যে, সেক্ষপিয়র

সহিত বাসুকিভগিনী জরৎকারুর বিবাহসম্বন্ধ ঘটনা ... সহিত ঐ বিবাহজাত আস্তিক মুনি নাগগণকে সর্পযজ্ঞ হইতে উদ্ধার ...

...ধি বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে কন্যাবস্থায় রাখিলেন। পরে বিবিধ কৌশলে, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া জরৎকারুর সহিত ভগিনীর পরিণয় সম্পাদন করিলেন। কিন্তু বনের পাখীকে কত দিন পিঞ্জরে রাখা যায়? ঋষি ...নেই সামান্য কারণে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় উগ্র তপ...নিরত হইলেন। বাসুকি এ সংবাদে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ভগিনীকে ...াসা করিলেন,—হে সুভগে! সেই মুনিসত্তম হইতে তোমার গর্ভ ...য়াছে কি না? আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করি-ছি, তাহা নিষ্ফল না হয়। জরৎকারু কহিলেন, ভ্রাতঃ! তিনি আমাকে ...লিয়াছেন যে, অগ্নি ও সূর্য্য তুল্য তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।' ...াগেন্দ্র বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে ভগিনীর বাক্য গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তক্ষক কর্তৃক পরিক্ষিতের গুপ্ত-হত্যার পর, তৎপুত্র জনমেজয়ের প্রতিহিংসার ভয়ে নাগজাতি আকুল হইয়াছিল; পরে নাগরাজ স্বীয় ভগিনীর ব্রাহ্মণ ঋষির সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার ঔরসজাত পুত্র আস্তিকের সাহায্যে নাগকুলকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ ও অনার্য্য মিলনের ইহা অপেক্ষা আর কি স্পষ্টতর আভাষ হইতে পারে।

(সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি, শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনে ও খাণ্ডব-দাহনে আমরা আর্য্য অনার্য্য শক্তির সংঘর্ষের পরিচয় পাই, গোবর্দ্ধনধারণে ও ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবধর্ম্মপ্রচারের ইঙ্গিত পাই, এবং ঋষিশাপে যদুবংশধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যু, দস্যু কর্তৃক

নজিরের বলবত্তা যদি কেহ অঙ্গীকার না করেন, তবে তিনি বাঙ্গালীর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন। আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী অথবা সীতারামের প্রসঙ্গ করিব না, কারণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেও ঐ সকল উপন্যাস স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর মতেই ঐতিহাসিক নহে। কিন্তু যে উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক নামে বিশেষ ভাবে আখ্যাত করিয়াছেন, সে[illegible] আলোচনা করুন। মূল প্রতিপাদ্য ছাড়িয়া দিলে ঐ উনার্য্য ও ব্রাহ্মণ্যের মিলিত [illegible] কগুলি ঘটনা, ইতিহা[illegible] ইহা সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। আর ব[illegible] প্রতিপাদ্যের অবতারণা করিয়া ইতিহাসের অনুসরণই [illegible]য়াছেন।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের মূল প্রতিপাদ্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে আলোচনা করিলাম। অতঃপর কাব্যগত চরিত্র ও ঘটনাবিশেষের আলে[illegible] প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে, কাব্যোক্ত চরিত্র ও ঘটনা[illegible] টুকু ঐতিহাসিকতা থাকা আবশ্যক। এখন বঙ্কিম বাবুর সেই মত স্মরণ করুন। 'কাব্যোক্ত চরিত্র চিত্রণে তাহাও (ইতিহাসের বিপরীত করিতে পার।' চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা, ঘটনা সম্বন্ধেও তাহাই। কাব্যো[illegible] ঘটনাবিশেষ অনৈতিহাসিক হইলেও ক্ষতি নাই। এ বিষয়ে যুক্তির অ[illegible]তারণা অপেক্ষা মহাকবির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অধিক উপযোগী হইবে; কার[illegible] এরূপ স্থলে মহাকবির নজির অকাট্য।

সেক্সপিয়র অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিচার্ড, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম হেনেরি সর্ব্বজনবিদিত। ঐ সকল নাটকের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে এক জন সুবিজ্ঞ সমালোচক এইরূপ লিখিয়াছেন। * 'সেক্সপিয়র যে স্থলে কালের ক্রম ও ঘটনার বাস্তবতার ব্যতি-

---

* Even when he makes free with chronology and varies from the actual order of things it is commonly in quest of something higher and better than chronological accuracy; and the result is in most cases favourable to right conceptions; * * If he brings in fictitious persons and events mixing them up with real ones it is that he may set forth those parts and elements and aspects of life which lie without the range of common histoty; enshrining in representative ideal forms the else neglected substance of actual characters.

ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান না হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন না। যখন পৃথিবীর পাপরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া ধরাতলকে গুরুভারাক্রান্ত করে, তখনই ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ মানুষের দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে যখন আমরা অবতার বলিয়া স্বীকার করি, তখন আমাদের ইহাও স্বীকার্য্য যে, তাঁহার সাময়িক ভারতে ঘোরতর ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কবি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্তর বিগ্রহ বহ্নি জ্বলিতেছে রাজ্যে রাজ্যে
কিবা ঘাত কিবা প্রতিঘাত;
অন্তর বিগ্রহ বহ্নি জ্বলিতেছে সমাজেতে
কি স্বার্থের ভীষণ সংঘাত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই বিদ্যুতাগ্নি-পূর্ণ মেঘ
ছুটিছে কি বেগে খরতর;
আঘাতিতে পরস্পরে মত্ত আধিপত্য তরে
নিবারিতে বাড়াবে না কর?
ধর্ম্মেও মোহান্ধ নর কামনার মরীচিকা
নিরন্তর করি অনুসার;
কি দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে নিরন্তর
কাঁদে নাকি হৃদয় তোমার।

অতএব,

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এই পাপভার,
করিতে মোচন বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার;
ভারতে মহাভারত কৃষ্ণ অবতার!

আর,—

বেদভারে প্রপীড়িত যজ্ঞধূমে মেঘাচ্ছন্ন
উষ্ণ জীবশোণিতে প্লাবিত;
প্রদীপ্ত কামনানলে ভারতে করিতে হায়
এই মহাধর্ম্ম প্রচারিত।

সেই মহাধর্ম্ম কি, আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি।

নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম নহে যজ্ঞ পূর্ণ কর্ম্ম
ধর্ম্ম কৃষ্ণ! সর্ব্বভূত-হিত।
তাহার সাধন কর্ম্ম, নারায়ণে কর্ম্মফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।

শ্রীকৃষ্ণচরিতের এই মুখ্যতত্ত্ব। এ তত্ত্বকে কেহ কি অনৈতিহাসিক বলিয়া অপলাপ করিবেন ?

শ্রীকৃষ্ণের মানুষ-লীলার প্রধান প্রধান ঘটনা কবি এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

শুনিলাম যেই দিন
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শিশু
বৃন্দাবনে ইন্দ্র-যজ্ঞ করেছে বারণ,
ভক্তিতে বিহ্বল গোপ গোপাঙ্গনাগণ ;
দেবভাবে আকর্ষণ
করিতেছে প্রাণ মন
পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান ;
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত-প্রাণ।
* * *
কুরুনাথ ! বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাসিত সতত,
কি শক্তি শরীরে মনে করিত সঞ্চার।
সে আলোকে সে শক্তিতে হইয়া চালিত,
নাচিতাম গাহিতাম করিতাম রণ।
হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভক্তিতে বিহ্বল
নাচিত হাসিত গোপ গোপাঙ্গনাগণ।
বৃন্দাবনে গোচারণে বসি নিরজনে
শুনিতাম যেন দূর সমুদ্রগর্জ্জন
ভারতের কি বিরাট হাহাকারধ্বনি !
শুনিতাম গোপমুখে বসি নিরজনে
মথুরার নিদারুণ শোক-সমাচার
পীড়িতের আর্ত্তনাদ দুঃখীর রোদন,
কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর।
* * * *
বধিলাম কংসরাজে, করিনু মথুরা
রাহুমুক্ত, শান্তিশশী হাসিল আবার।
হইতেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়িনু সরিয়া
বিমুখি মগধপতি সপ্তদশ বার।
পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন
লইলাম মহর্ষির চরণে শরণ।

দিয়া প্রেমপুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে
পাণ্ডবের ভুজবল করিনু বরণ।
জ্ঞানবল ভুজবল করিয়া আশ্রয়
হইলাম কর্ম্মক্ষেত্রে ধীরে অগ্রসর
বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থ করিয়া বিজয়
করিনু পাণ্ডব শক্তি শান্তি দৃঢ়তর।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধে করিয়া নিধন
নিবারিনু রাজমেধ ঘোর অনাচার।
করিল বিমুক্ত বন্দী নৃপতি মণ্ডল
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রচার।
আনন্দে ভরিল প্রাণ, বসি বৃন্দাবনে,
গোচারণে যেই ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্বপন
সতত দেখিত শিশু, হইল স্থাপিত
এক বিন্দু রক্ত নাহি হইল পতন। *

*　　　*　　　*

আবার অশান্তি-শিখা পশ্চিম ভারতে
দেখা দিল করিতেছি যবে নির্ব্বাপণ;
হইল নির্ম্মলাকাশে অশনির মত
পাণ্ডবের বনবাস মস্তকে পতন;
বিস্মিত, স্তম্ভিত ভীত কম্পিত হৃদয়
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিনু ভীষণ।

*　　　*　　　*

ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত
বিরাট বিজয়ে চক্ষে করিনু দর্শন

---

* অন্যত্র এই সকল ঘটনার এইরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ।
অপূর্ব্ব জীবন-লীলা কংসের নিধন
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্ব্বাসন,
নিবারিতে রক্তস্রোত সমুদ্রের পার।
সেই জরাসন্ধবধ অদ্ভুত কৌশল—
কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ নিবারণ
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনাযুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপিত।

অধর্ম্মও করিতেছে শক্তির সঞ্চয়
ধর্ম্মের সহিত হায় অনিবার্য্য রণ।
কি যত্ন না করিলাম? পঞ্চখানি গ্রাম
চাহিনু এ নরমেধ করিতে বারণ।
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী
শুনিলাম অধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
বাজিল সমর-ভেরী যুড়িয়া ভারত
শুনিলাম, দেখিলাম পঙ্গপাল মত
ছুটিল নৃপতিবৃন্দ মরিতে পুড়িয়া,
বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছা ধ্বংসব্রত।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বুক, কাঁদিল পরাণ
করিলাম দ্বারকায় শোকেতে প্রস্থান।
হইলে আহূত যুদ্ধে ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের
পালিলাম করিলাম যুদ্ধে যোগদান
নিরস্ত্র ও নিরপেক্ষ; স্বধর্ম্ম-পালন
করিতে অশক্ত নহে পাণ্ডব কৃপাণ।

পরবর্ত্তী ঘটনা অন্যত্র এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজসূয়ে বিনির্ম্মিত ধর্ম্মরাজ্য বাতাহত
পড়িল ভাঙ্গিয়া যবে বালির সৃজন মত,
বুঝিলাম তব ইচ্ছা বিনা এই রক্তদান
এ অগ্নিপরীক্ষা বিনা হইবে না নিরমাণ
ধর্ম্মরাজ্য ধরাতলে; হইবে না কদাচিত।
খণ্ড এ ভারতে মহাভারত রাজ্য স্থাপিত
দিলাম অনলে ঝাঁপ :হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্তধারা অষ্টাদশ দিন ধরি।

তাহার ফলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ভস্মীভূত হইল।

পড়িয়াছে যবনিকা, জ্বলিয়াছে কি শ্মশান,
কুরুক্ষেত্রে, নারায়ণ কর পূর্ণ মনস্কাম।

কুরুক্ষেত্রে যে মহাদাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল,

উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি, মাতা রাজরাজেশ্বরী।

এখন ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরি-উক্ত কোন ঘটনার মূল মহাভারতাদিতে নাই। অধিকের মধ্যে এই যে, কবি প্রতিভার আলোকে

কৃষ্ণ-জীবনের * অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন, অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, অনেক দুর্ব্বোধ্য ঘটনার অর্থ উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

তব ধর্ম্মমন্দিরের, ধনঞ্জয় ভুজবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন,
বিশ্বকর্ম্মা দ্বৈপায়ন করিবেন জ্ঞানবলে
এই পরিখায় তব মন্দির সৃজন।

কবি বাসুকিকে অনার্য্যের নেতা ও ঈশ্বররূপে বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণের প্রতিকূল ও দুর্ব্বাসার অনুকূল রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। বাসুকিকে যদি অনার্য্য শক্তির মনঃসৃষ্ট প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে আর ঐরূপ চিত্রণে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। আর্য্য ও অনার্য্য শক্তির তদানীন্তন সংঘর্ষ এবং ব্রাহ্মণ ও অনার্য্যের সম্মিলন যে ইতিহাস-অবিরুদ্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি যে, বাসুকির চক্ষে

শত্রু মম আর্য্যজাতি ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আসমুদ্র গিরি,
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্য্য-শোণিতে।

আর দুর্ব্বাসার সহিত বাসুকির মহাসন্ধি ঐ অনার্য্য ও ব্রাহ্মণ্যের সম্মিলনের রূপক বলা যাইতে পারে। বাসুকির চেষ্টা নাগরাজ্য-উদ্ধার।

একটি বিশাল রাজ্য করিব উদ্ধার।

দুর্ব্বাসার অভিপ্রায়—

আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্য শিলায়
মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতি পিসিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।

বাস্তবিক সে যুগের অনার্য্য জাতির অবস্থা অতি শোচনীয়ই ছিল।

এ ভারত ভূমি
যাহাদের পিতৃভূমি, সে অনার্য্য জাতি
আজি কোথা, দেখ আহা কি দশা তাদের।

* শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রত-উদ্যাপনে তাঁহার প্রধান সহায় ব্যাসার্জ্জুন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কবির মন্তব্য এইরূপ।

রাজ্যহীন গৃহহীন আহারবিহীন
আজি তারা বনে, আজি পশুনির্ব্বিশেষ।

এরূপ অবস্থায় অধঃপতিত জাতির যেরূপ উদ্যমহীনতা হইয়া থাকে, অনার্য্য জাতির তাহাই হইয়াছিল।

আছি ভাল সুশীতল কানন-ছায়ায়
কি ফল লভিব বল পুড়িয়া মরিয়া।

* * * *

দুই চারি জন যদি হয় অগ্রসর
দুই চারি শত যায় পশ্চাৎ সরিয়া।

বাসুকি ঐতিহাসিক চরিত্র কি না? এ প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, ঐতিহাসিক না হইলে ক্ষতি কি? অনার্য্য শক্তির মনঃসৃষ্ট প্রতিরূপ স্বীকার করিলেই কাব্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। দ্বিতীয় কথা এই যে, বাসুকি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি—জরৎকারুর পরিণয়ে এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রনিবারণে। কুরুক্ষেত্রে কবি বাসুকিকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং যে সকল ব্যাপার তাহার জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কত দূর ইতিহাসমূলক বলা যায় না। যখন বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণ শিশুকে যমুনা পারে লইয়া যান, তখন আমরা বাসুকিকে ফণা বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত দেখি বটে; কিন্তু এই অকিঞ্চিৎ ভিত্তির উপর কবিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণবাসুকিসম্বন্ধ গঠিত করা ইতিহাসের দৃষ্টিতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আর এক কথা। মহাভারতে আমরা বাসুকিকে জরৎকারু ঋষির করে আপন ভগিনীকে সম্প্রদান করিতে দেখি। এই জরৎকারু ঋষি যদি দুর্ব্বাসার ছদ্মরূপ হয়েন, (কবি তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন) তবে দুর্ব্বাসাবাসুকিসম্মিলন ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয়। কিন্তু জরৎকারু ঋষি ও দুর্ব্বাসা কি একই ব্যক্তি? এ কথার আমরা যথাস্থানে বিচার করিতেছি। যদি এক ব্যক্তি না হন, তবে দুর্ব্বাসা ও বাসুকি এই ব্যক্তিদ্বয়ের সন্ধিসংস্থাপনের কথা অনৈতিহাসিক হইয়া পড়ে।

শেষ কথা, দুর্ব্বাসাচরিত্র ঐতিহাসিক কি না? কবি দুর্ব্বাসার জীবনবৃত্ত এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সহিত ভারতে

নিষ্কাম ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের আধিপত্যের খর্ব্বতা হইতেছিল।

ভস্মিয়া ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম এই পাপানল
প্লাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত।
হবে ক্ষত্রী জাতি শ্রেষ্ঠ ধরার ঈশ্বর
শীর্ষস্থানে তার সেই ভণ্ড নারায়ণ।

এই সকল কারণে দুর্ব্বাসার কৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ (ইহার ব্যক্তিগত কারণও বিদ্যমান ছিল) দিন দিন সংধুক্ষিত হইতেছিল। ঐ বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি অনেক উদ্যম উদ্‌যোগ উপক্রম করিতেছিলেন। ইহার জন্য তিনি বাসুকির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং বাসুকির ভগিনী জরৎকারুকে বিবাহ করিয়া অনার্য্য শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণের আধিপত্য রক্ষিত বর্দ্ধিত
করিতে লয়েছি ব্রত; তার উদ্‌যাপন
না হইবে যত দিন, হইবে সহিতে
অনার্য্য-সংসর্গ-পাপ এই বিড়ম্বনা।

অন্য দিকে—

ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে সুশাণিত ক্ষত্রিয়-কৃপাণ
দেখিলাম যোগবলে হবে প্রয়োজন।

সেই জন্য আপন ঔরসজাত কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণকে কুরুপাণ্ডবের গৃহবিবাদ বাধাইবার জন্য দুর্য্যোধনের প্রিয়সখারূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তোমার আদেশে প্রভু ক্রীড়ারঙ্গভূমে
প্রবেশিনু কৌরবের বৈশ্বানররূপে
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অন্তর বিগ্রহে।
সে অবধি হায় তব অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে.
তব করধৃত জড় পুত্তলিকা মত
করি ছদ্ম অভিনয় কৌরবসভায়
জ্বালাইনু প্রভু এই মহাদাবানল।

তাঁহারই মন্ত্রণায় কর্ণ দুর্য্যোধনের রাজ্যলোভে ঘৃতাহুতি দিয়া কৃষ্ণের

পঞ্চগ্রামভিক্ষা বিফল করিল। তাঁহারই অনুমতিতে কর্ণ দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দিয়া দ্বারকায় পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারায়ণী সেনা সংগ্রহ করিল। তাঁহারই প্ররোচনায় কর্ণ, সংসপ্তক যুদ্ধে অর্জ্জুন স্থানান্তরিত হইলে, অন্যায় সমরে অভিমন্যুর প্রাণবধ করিল। তাঁহারই আদেশে কর্ণ ভীষ্মের সহিত কপট কলহ সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধে বিরত থাকিয়া ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের সহায়তা করিল। দুর্ব্বাসার বড় আশা ছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে

বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু যাবে রসাতল
কর্ণের সাম্রাজ্য-ধ্বজা উড়িবে উজ্জ্বল।

কিন্তু অর্জ্জুনের তীব্র শরে ছিন্নমস্তক হইয়া কর্ণ দুর্ব্বাসার আশার সহিত রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত হইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই ইতিবৃত্ত, কর্ণ দুর্ব্বাসার এই সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা, দুর্ব্বাসা বাসুকির এই সন্ধি ও সম্পর্ক কি ঐতিহাসিক? একে একে দেখা যাউক। দুর্ব্বাসার কৃষ্ণদ্বেষ ও প্রতিহিংসার অনেক প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার বাসুকি-ভগিনীর সহিত পরিণয় ইতিহাসমূলক কি না? মহাভারতে দেখি যে, জরৎকারু ঋষি ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে লম্বমান পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য স্বনাম্নী একটি পাত্রী খুঁজিয়া বেড়ান। বাসুকি এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া আপন ভগিনীকে (তাঁহারও নাম জরৎকারু) তাঁহার করে অর্পণ করেন। ঋষি পত্নীর সহিত কিছুদিন শ্বশুরঘর করিয়া অতি যৎসামান্য কারণে পত্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া তপস্যার জন্য বন-গমন করেন। ইঁহারই ঔরসে বাসুকিভগিনীর গর্ভে আস্তিক ঋষির জন্ম হয়। এই আস্তিক ঋষিই নাগযজ্ঞে সর্পকুল রক্ষা করেন। এ উপাখ্যানের অর্থ কি? আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ এইরূপ;—'জরৎকারু ঋষির নামটা ছদ্ম নাম। তাঁহার প্রকৃতি ঠিক দুর্ব্বাসা ঠাকুরের মত। কথায় কথায় ক্রোধ। সন্ধ্যা হইয়াছে, আহ্নিকের সময় অতীত হইতেছে। গরিব পত্নী তাঁহাকে জাগাইলেন। তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন, কি সাধ্য, তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় সূর্য্য অস্ত যাইবেন। এই গুরুতর অপরাধে, পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। এই কার্য্যের সঙ্গে শকুন্তলার প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্ব্বাসার ক্রোধ ও অভি-শাপ তুলনীয়। অতএব জরৎকারু ঠাকুরকে দুর্ব্বাসা বলিয়া ধরিয়া লইলে

প্রাপ্ত যুধিষ্ঠির হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস জলের মত বুঝিতে পারা। আমরা বুঝিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ নবধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত করিতে গিয়া দুর্ব্বাসার পূর্ব্ব পুরুষদের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদের অবমাননা (মাথা-হেঁট) শিক্ষাবিপর্য্যয় ও সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন বলিয়া দুর্ব্বাসা ঋষির ধারণা হয়। এই জন্য তিনি * * একদিকে বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করিয়া অনার্য্য জাতিকে সহায় করেন, (ইহার ফলে অনার্য্যসাহায্যে ক্ষত্রিয়া-বশেষ যাদবদিগের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ এবং তাহাদিগের রমণীগণের পর্য্যন্ত অপহরণ।) অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়-দিগের প্রতিকূলতা করিবার জন্য কর্ণরূপ এক শাণিত মহাস্ত্র সৃষ্টি করেন; (তাহার ফলে রাজসূয়ে স্থাপিত সাম্রাজ্যের পতন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়বিনাশ।')

জরৎকারু উপাখ্যানের এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইতি-হাস বালির ভিত্তির উপর গঠিত করা নিষ্ফল।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, নাগদংশনে পরিক্ষিতের মৃত্যুর পর বাসুকি জনমেজয়ের প্রতিহিংসাভয়ে ভীত হইয়া ভগিনীকে জরৎকারু ঋষির হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য উৎসুক হয়েন। পরিক্ষিতের মৃত্যু হয় ৬০ বৎসর বয়সে। আর জন্ম হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্ততঃ ৬০ বৎসর পরে জরৎকারুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। উপরিউক্ত ব্যাখ্যায় এ বিবাহ কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বেই ঘটাইতে হইয়াছে। আমরা আরও দেখি, বিবাহের অল্পদিন পরেই জরৎকারু পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ অল্প দিনের মধ্যে বাসুকিভগিনীর গর্ভসঞ্চার হইয়া পরে যে পুত্র প্রসূত হয়, সেই সর্পসত্রে নাগকুল রক্ষা করে। সেই সময়ে তাহাকে 'বালক' বলিয়া বর্ণিত দেখি। পরিক্ষিতের মৃত্যুর অনুমান ৩০ বৎসর পরে সর্পযজ্ঞ হইয়াছিল। অতএব ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে, জরৎকারুর বিবাহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল। আমার মতে, জরৎকারু নামে এক বিরাগী ঋষি পিতৃপিণ্ডের অনুরোধে বিবাহ করিতে মনঃস্থ করিয়া-ছেন জানিয়া, জনমেজয়ের ভয়ে ভীত বাসুকি ব্রাহ্মণের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া ছদ্মনামে আপন ভগিনীর তাঁহার সহিত পরিণয় সম্পন্ন করে। ঋষি সংসারে নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন, কেবল পুত্রার্থে ভার্য্যা অঙ্গীকার করিয়া-

করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আবার বনগামী হন। তাঁহার ঔরস পুত্র আস্তিক মাতুলাশ্রয়ে পালিত হইয়া মাতুলকুলের প্রাণরক্ষা করিয়া মাতুলের উপকারের প্রতিদান করে। যদি এ মত ঠিক হয়, তবে দুর্ব্বাসা ও জরৎকারু স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এবং দুর্ব্বাসা ও বাসুকিভগিনীর পরিণয় অনৈতিহাসিক।

কবি কর্ণকে দুর্ব্বাসার পুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ মত সম্পূর্ণ নূতন, কিন্তু ইতিহাসের অবিরুদ্ধ বলিয়াই অনুমান হয়। মহাভারতে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে। 'কুন্তী পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি দুর্ব্বাসাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেই মুনি সন্তানপ্রতিবন্ধকতারূপ ভাবি আপদ্ধর্ম্মের অপেক্ষায় তাঁহাকে অভিচারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন ও কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রপ্রভাবে যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার প্রভাবে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। যশস্বিনী বালা কুন্তী কৌতূহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন।' সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে কুন্তীর সমীপস্থ হইয়া কুন্তীর ভয় বিস্ময় ও ক্ষমা ভিক্ষা সত্ত্বে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাহাতেই কর্ণ নামক পুত্র উৎপন্ন হইল।

যাঁহারা ভাস্করের সৌররাজ্য পরিহার পূর্ব্বক মানবীতে উপগত হওয়ার কথা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মেই কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হন, আর ঐ উৎপত্তির সহিত দুর্ব্বাসার কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; কারণ, দুর্ব্বাসাই কুন্তীর অভিচারমন্ত্রের গুরু। তৎকালে যে দুই এক জন এরূপ কানীন পুত্র উৎপন্ন হইত স্বয়ং ব্যাসদেবই তাহার প্রমাণ। সত্যবতীর কন্যাবস্থায় তিনি পরাশর-ঔরসে উৎপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণের মুখেও আমরা ঐরূপ পুত্রের উল্লেখ শুনিতে পাই। 'স্ত্রীলোকের কন্যাবস্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে দুই প্রকার পুত্র জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদিগের পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।' (উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়)। অতএব কর্ণকে দুর্ব্বাসার পুত্র বলিয়া আখ্যাত করিয়া কবি ইতিহাসের কোনই অপলাপ করেন নাই।

মহাভারতে দেখিতে পাই, কর্ণ জন্মিবার পর কুন্তী বন্ধুকুলভয়ে সদ্যঃ-প্রসূত কুমারকে গোপন করিয়া জলে পরিত্যাগ করেন। রাধাভর্ত্তা অধি-রথনামা একজন মহাযশাঃ রথকার জলে পরিত্যক্ত সেই সন্তানকে গ্রহণ করিয়া রাধার পুত্র করিয়া দেয়। পরে সূতকুলে থাকিয়াই কর্ণ বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হন। এক দিন বিস্তীর্ণ কৌরব-রঙ্গভূমিতে যখন কৌরব পাণ্ডবেরা অস্ত্রগুরু দ্রোণের সমক্ষে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা দিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা 'যুবাপুরুষ মহাবাহু কর্ণ বদ্ধখড়্গ হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সগর্ব্বে অর্জ্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সখ্যপ্রার্থনা করেন। দুর্য্যোধন তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তদবধি কর্ণ দুর্য্যোধনের সখারূপে পাণ্ডবদিগের চিরশত্রুতা আচরণে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী ঘটনার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটনের জন্য কর্ণই প্রধানতঃ দায়ী। আমরা উদ্‌যোগ পর্ব্বে ধর্ম্মবীর ভীষ্মের মুখে শুনিতে পাই যে, 'কৌরবদিগের যে মহান্ অনর্থ আগত হইতেছে, সে কেবল এই দুর্ম্মতি সূতপুত্রেরই কর্ম্ম জানিবে।' কর্ণও নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'ভূখণ্ডের এই যে সম্যক্ বিনাশ উপস্থিত হইতেছে, ইহার কারণ কেবল শকুনি, আমি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্য্যোধন।' পরে আমরা দেখিতে পাই যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দশ দিন ভীষ্মের সহিত মনোবাদ * বশতঃ কর্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। পরে ভীষ্মের শরশয্যার পর, চারি দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পঞ্চম দিবসে অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট হন।

কবি কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের এই অস্পষ্ট ছায়াকে প্রস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার মতে কুন্তী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দুর্ব্বাসা কর্ণকে কুড়াইয়া লইয়া শিষ্যা রাধা দ্বারা সযত্নে পালন করেন। পরে ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের সহায়তার জন্য পুত্রকে পরশুরামের নিকট ক্ষত্রিয়নন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়া ধনুর্ব্বেদশিক্ষার্থ অর্পণ করেন। পুত্র সুশিক্ষিত হইলে তাহাকে কৌরবের ক্রীড়ারঙ্গভূমে 'ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অগুর বিগ্রহে' বৈশ্বানররূপ প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় কর্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া ক্ষত্রিয়কুলের সহিত আপনি ভস্মীভূত হয়।

কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, দুর্ব্বাসাই কর্ণের দ্বারা ঐ যুদ্ধ ঘটাইয়াছিল। মহাভারতে এরূপ

---

* ভীষ্মপর্ব্বে ৪২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি (তিনি কর্ণকে বলিতেছেন) কর্ণ! আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের দ্বেষপ্রযুক্ত যুদ্ধ করিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত

মতের কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না। অবশ্য, যুদ্ধঘটনায় কর্ণের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল; কিন্তু কর্ণ যে দুর্ব্বাসার করধৃত জড়পুত্তলিকা, তাঁহার কোন প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। কর্ণকে দুর্ব্বাসার পুত্র এবং দুর্ব্বাসাকে শ্রীকৃষ্ণের শত্রু বলিয়া স্বীকার করিলে, কবিপ্রচারিত মতের অনেকটা পোষকতা হয় বটে, কিন্তু পোষকতা ও প্রমাণ এক পদার্থ নহে। বরং মহাভারতের বৃত্তান্তই সমূলক বলিয়া বোধ হয়। কর্ণ মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অধিরথপত্নী রাধা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হয়। পরে তাহার ভুজবল ও অস্ত্রকৌশল দেখিয়া দুর্য্যোধন তাহাকে অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া তাহার সহিত সখ্যস্থাপন করে। এই সখ্যস্থাপনের ত্রয়োদশবর্ষ পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কর্ণ কখনও কোনও বিষয়ে প্রভুদ্রোহ সাধন করে নাই। বরং ভীষ্ম ও কৃষ্ণের বার বার প্ররোচনা সত্বেও 'দুর্য্যোধনের নিমিত্ত ধন শরীর পুত্র দারা এ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। অনেকেরই ধারণা যে, কুরুক্ষেত্রেই ভারতের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। আমার এক সময়ে ঐরূপ ধারণা ছিল। ভারতের বিজেতা জাতির অধীনতা দুরদৃষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমি অনেক সময়েই বলিতাম যে, ভারত যুদ্ধে সমগ্র ক্ষত্রিয়ক্ষয় সাধিত হইয়া দেশ নির্ব্বীর হইয়া পড়িলে, সহজেই বিদেশী আসিয়া এ দেশে আধিপত্য স্থাপন করে। এই মতে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে আমরা পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া থাকি, তিনিই ভারতের চিরপরাজয়ের মূল হেতু! কুরুক্ষেত্রের কবি যেন তত্বদৃষ্টির সাহায্যে যে মত প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

> বিপুলা পৃথিবী, মহাকাল অন্তহীন;
> অনন্ত মানব জাতি; মুষ্টিমেয় তার
> অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মানব-মঙ্গল
> রোধিতেছে—কুরুক্ষেত্র করুণা অপার।
> মানবের ভবিষ্যৎ কি আনন্দময়!
> দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে করি আত্মক্ষয়
> অধর্ম্মের ঘনঘটা। হিংসা বজ্রানল
> নিভিল; উঠিল কিবা ধর্ম্মসুধাকর!

পুণ্য-জ্যোৎস্নায় স্নাত অনন্ত মানব
লভিতেছে কিবা সুখ যুগযুগান্তর !
ভূতল আনন্দরাজ্য; বিস্তৃত ত্রিপথ
হইয়াছে এক মহা বেদীমূলে লয়।
ত্রিপথে ত্রিবৈজয়ন্তী উড়িছে সুন্দর
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি কিবা স্বর্গ শোভাময়।
সুমধুর কৃষ্ণনাম ভূতল গগন
করিতেছে কি পবিত্র কি আনন্দময়।
গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম যুগযুগান্তর।
দেখিতেছি পাপতাপপূর্ণ ধরাতল
হইতেছে ক্রমে স্বর্গ স্বর্গ উচ্চতর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কৃষ্ণলীলার অতিপ্রধান ঘটনা। অতএব জাতীয় জীবনে কৃষ্ণলীলার যাহা ফল, আংশিক রূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও সেই ফলই বলিতে হইবে। ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন ও নবধর্ম্মপ্রচার, আর্য্য অনার্য্য মিলিয়া মিশ্রিত জাতির উদ্ভব, বহুসহস্রবৎসরব্যাপী দীর্ঘ স্বাধীনতা ও শান্তিসুখ, কুরু-ক্ষেত্রের ফলেই ঘটিয়াছিল বলিতে হয়। রোম নাই, রোমকেরা নাই, গ্রীস নাই, গ্রীকেরা নাই; আজিও যে এই প্রাচীনতম আর্য্যজাতি জীবিত রহিয়াছে, আজিও যে গৃহে গৃহে বনে বনে আশ্রমে আশ্রমে গীতাপাঠ ও কৃষ্ণপূজা হইতেছে, ইহাকেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবান্তর ফল বলিতে হইবে। কবি বিচিত্র ভাষায় এই সকল ভাবী ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহা আবৃত্তি করিলে কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া মানসপটে সেই কুরু-ক্ষেত্রের জনসম্বাধের মধ্যে শ্বেতহয়যুক্ত মহৎ স্যন্দনে স্থিত নরনারায়ণের বিশ্বমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে।

অগ্রবর্ত্তী আর্য্যগণ অনার্য্য পশ্চাৎগামী
প্রীতির দক্ষিণ কর করি প্রসারিত,
আনন্দে লইয়া সঙ্গে কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ধ্যান
করি মনুষ্যত্ব-পথে হইবে ধাবিত।
বুঝিবে মানবগণ সর্ব্ব জীবে নারায়ণ
সর্ব্বজীব-হিত মহাধর্ম্ম নিরমল,
এই নব ধর্ম্মে ভগ্ন হবে ক্রমে পরিণত

উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি মাতা রাজরাজেশ্বরী।
নব ধর্ম্ম বেদিমূলে বসিয়া দেবতাগণ
আর্য্য অনার্য্যের ধ্যানে ; বেদিবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি, তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী অতুলা প্রতিভান্বিতা।
অনন্ত মানব ব্যাপী' ভবিষ্যত বর্ত্তমান
নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম।

কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা এইখানে সমাপ্ত করিলাম। সৎ কাব্যের অনুশীলনে প্রভূত লাভ আছে ; কুরুক্ষেত্র সৎ কাব্য, ইহার আলোচনায় আমার অবশ্যই যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। আমার সমালোচনা সৎও নহে, কাব্যও নহে ; ইহার নিষ্ফলতা জানিয়াও যে পাঠক ইহার সমগ্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার ধৈর্য্যকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য আমার একটি কথা বলিবার আছে। এই সমালোচনাপাঠে তাঁহাকে বোধ হয় সহস্রাধিক কৃষ্ণনাম করিতে হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন যে, শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার কৃষ্ণ নাম করিলে অতি পাপীও তরিয়া যায়। সহস্রাধিক কৃষ্ণনামের কত ফল, ভাবিয়া দেখুন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেই অমূল্য বাক্যটি উদ্ধার করিয়া অবসর গ্রহণ করি।

ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম
মধুরমধুরমেতন্ মঙ্গলং মঙ্গলানাম্।
সকলনিগমবল্লী চিন্ময়ং সৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দু' নৌকায় পা।

যে জাতি পরাধীন, সে জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান ক্রমশঃ লোপ পায়।

ইতর জন্তুদিগের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, স্বাধীন মুক্ত অবস্থায়

তাহারা নিরামিষাশী হইয়া পড়ে—এমন কি, জঠরজ্বালানিবারণের জন্য সময়ে সময়ে কাঁচা আলুটি মূলাটি পর্য্যন্ত উদরস্থ করে।

মনুষ্যও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। ফরাসীবিপ্লবকালে সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষমতা যখন দরিদ্র বুভুক্ষু প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল, যখন ছিন্ন কন্থা এবং শীর্ণ দেহ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে অখাদ্য ভোজন ও অসহন ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। করভয়ে প্রতিদিন যে কত প্রাণান্তপরিশ্রমসঞ্চিত শস্যসম্পত্তি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত এবং কত নির্দ্দোষ সরল শিশুপ্রাণ উপবাসদৃশ্যদর্শনাক্ষম পিতামাতা কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই।

কিন্তু আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্য জাতির মত এরূপ বহুকালব্যাপী, এত গভীর অধঃপতন আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। অন্নচিন্তা যে কিরূপ চমৎকারা, তাহা আমরা যেরূপ চমৎকাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, অন্য কেহ সেরূপ পারিয়াছে কি না সন্দেহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরজাতির পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া আমাদিগের অস্থিমজ্জা এবং সেই সঙ্গে যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল, তাহাও পিষিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেহে বল নাই, মনে সাহস নাই, ঘরে ভাত নাই, অথচ লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পতনশীল বস্তুর পতনবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই বৈজ্ঞানিক নিয়মটি জাতীয় অধঃপতন সম্বন্ধেও ঠিক্ খাটে। কোন্ বিস্মৃত কাল হইতে আমাদিগের পতন আরম্ভ হইয়া তাহার বেগ এক্ষণে এত প্রচণ্ড হইয়াছে যে, শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে কি না সন্দেহ।

যেমন সূক্ষ্ম বস্ত্রে মসীবিন্দু পড়িলে শীঘ্রই ব্যাপিয়া যায়, এবং যে স্থানে পড়ে, সে স্থানটি ক্রমে পচিয়া ধসিয়া যায়, দুর্ব্বল চরিত্রে তেমনই যদি একবার বিন্দুমাত্র কলঙ্ককালিমা পতিত হয়, দেখিতে দেখিতে তাহা সমস্ত চরিত্রকে ছারখার করিয়া ফেলে। এই জন্য যাহার মন দুর্ব্বল, সে যদি মদ্য পান করিতে আরম্ভ করে, তাহার চরিত্র যদি একবার কলুষিত হয়, শত দিক্ হইতে সহস্র পাপরাশি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে;—তখন অভাগিনী স্ত্রীর সজল দীননেত্র এবং ক্ষুধাতুর উপবাসী শিশুসন্তানের কাতর ক্রন্দন সকলই ব্যর্থ হয়।

আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছি, মনে হয়, ইহার উপর সাগরে বারিবিন্দুপ্রায় সহস্র ধারে হীনতা অপমান বর্ষিত হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই জন্য অনেক সময়ে সাধ করিয়া আমরা হীনতাকে ডাকিয়া আনি, শতবন্ধনের উপর আরও বন্ধন গড়িয়া তুলি। সামান্য অধিকার, সামান্য অভিলাষ পূরণের জন্য যখন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তখন মনে মনে এমনি ধিক্কার উপস্থিত হয় যে, ইচ্ছা করে, মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া পরপদপ্রান্তে কুকুরের মত পড়িয়া থাকি।

মনের অবস্থা যখন এইরূপ বিকৃত হয়, তখন আত্মসম্মান অপেক্ষা আপাত সুবিধাকে অধিকতর প্রিয় বলিয়া জ্ঞান হয়। জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলে রেলপথে যাত্রার সুবিধা হয়, জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিলে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুবিধা হয়, জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিলে অধিকতর সমাদর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন এই দিকেই দৃষ্টি পড়ে, এবং যে মহাত্মা এই সুবিধা-প্রবঞ্চককে পদদলিত করিয়া আত্মসুখ বলি দিয়া অহর্নিশ দৃঢ় নিষ্ঠায় কঠিন সংগ্রামে নীরবে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া শরীরপাত করেন, তাঁহা অপেক্ষা এক জন উচ্চপদাধিরূঢ় ইংরাজ অধিক সম্মানার্হ মহৎ লোক বলিয়া বিবেচনা হয়।

তাহার দৃষ্টান্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় মোটা ধুতি, মোটা চাদর এবং চটি জুতা পরিয়া এই বহুরূপী জাতির মধ্য দিয়া কোথাও পীড়িতের সেবা, কোথাও দরিদ্র দীন বিপন্নের সাহায্য, কোথাও শোকার্ত্তের নয়নজল মোচন করিয়া ক্ষিপ্রবেগে নির্ভীক চিত্তে কঠিন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, আর আমরা এত কৃতঘ্ন যে, তাঁহাকে যথার্থরূপে চিনিতে তাঁহার স্মরণচিহ্নমাত্রও স্থাপন করিতে সক্ষম হইলাম না। লাট সাহেবের প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন কিম্বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজকে সান্ধ্য ভোজন দিতে আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে পারি, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণচিহ্নস্থাপনের কথা উঠে, তখন সহসা কোথায় যে সে বদান্যতা অন্তর্হিত হয়, তাহা বলা যায় না। হায়, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় পাঠ করিয়া যাঁহারা মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে অন্ততঃ যদি এক পয়সা করিয়াও দেন, তাহা হইলে এই মহান্ তেজস্বী পুরুষের সোণার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা যায়।

ব্রাহ্মণ কি নিতান্ত দরিদ্র অসমর্থ ছিলেন? না, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, তিনি যে ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া নিত্য নূতন কোট প্যাণ্টেলুন পরিয়া বাবুয়ানা এবং সাহেবিয়ানা দুইই করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে যে দুর্লভ হৃদয়রত্নটি লুকায়িত ছিল, তাহা এক দিকে এমনি কোমল যে, পরের সামান্য দুঃখে নিত্য বিগলিত হইত, এবং অন্য দিকে এমনি কঠোর এমনি কঠিন ছিল যে, হীনতা নীচতা অসত্য কপটতাকে কাছেও ঘেঁষিতে দিত না।

ইহা আমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমরা ইহা বুঝি না যে, শত অধীনতার মধ্যে বাস করিয়াও মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। মন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভিন্নজাতীয় পদার্থ। যে রাজ্যের রাজা, প্রজার এই মনকে সদা বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন, সে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। ফরাসীবিপ্লবই ইহার সাক্ষী। এই জন্য রাজা, প্রজার ধর্ম্মের উপর, দেশাচারের উপর, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না। আমাদেরও এই মনের স্বাধীনতা আছে। ইহাকে শতবন্ধনে জড়াইয়া হেলায় হারাইয়া লাভ কি? যাঁহার চরিত্র মহৎ, আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও, তাঁহার মনের স্বাধীনতা কেহ অপহরণ করিতে পারে না। বিদ্যা-সাগর জাতীয় পরিচ্ছদ পরিয়া বড় বড় সাহেব-ভবনে গমন পূর্ব্বক বীরদর্প দেখাইয়া স্বাধীনতার এই দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে রাখিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেস হইতে প্রত্যাগত সুরেন্দ্র বাবুর সে দিন কলিকাতায় কি সাদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল! কি উচ্ছ্বাস, কি উৎসাহ, কি সমারোহ! দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল। আনন্দ এই জন্য যে, সুরেন্দ্র বাবু যে পোলিটিক্যাল আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের মনে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, তাহার যোগ্য প্রতিদান তিনি পাইলেন, এবং দুঃখ এই যে, যাঁহারা নীরবে নিঃসহায়ে মহত্তর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারা যথোচিত পুরস্কার পান নাই। যাহা হউক, ভয় হয়, সেদিনকার এই উচ্ছ্বাস নদীবক্ষে মৃৎপ্রদীপের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র না হয়।

কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে দেশের অসামান্য উপকার করিতে পারে। শুধু পলিটিক্সের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া সেই সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলের প্রতি

হইতে পারে। কংগ্রেসে যে অর্থব্যয় হয়, তাহা ভাগ করিয়া য... দেশের অন্যান্য অসুবিধা অভাব দূর করিবার জন্য ব্যয়িত হয়,— তাহা হইলে এই হতশ্রী দেশের শ্রী ফিরিয়া যায়! কিন্তু শুধু পলিটিক্সই এক্ষণে সর্ব্বেসর্ব্বা।

তাই বলিয়া কংগ্রেস্ দ্বারা দেশের যে একটি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিবর্ষে "জাতিভেদ, দেশভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ভুলিয়া, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এক মহাচন্দ্রাতপে পঞ্চবিংশতি কোটি প্রাণের" একত্র সম্মিলন দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি যে অবশ্য শুভফলদায়ী, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে পলিটিক্স্-মস্তিষ্কের উপর এত বেশী চাপ না দিয়া সামাজিক উদরের প্রতি সেই সঙ্গে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই সোণায় সোহাগা হয়।

আমাদের এই অধঃপতন, এই দারিদ্র্যদুঃখ, এই সর্ব্বনাশের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, স্বাভাবিক শক্তির বৃথা অপব্যয় করিতে আমাদের মত আর দ্বিতীয় নাই। আমরা সকলেই এক দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছি। বিধিদত্ত শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়। এ যেন ছেলেখেলা। সুস্থ বলিষ্ঠ বালককে দৌড়াইতে দেখিয়া রুগ্ন শীর্ণ শিশু যেমন বলে "আমিও দৌড়াব" এবং দৌড়াইতে গিয়া মুহুর্ম্মুহু পতনের পর শিক্ষা লাভ করিয়া তবে নিরস্ত হয়, আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। অন্যে যে কাজ করে, শক্তি থাকুক্ বা না থাকুক্, আমাকেও সেই কাজ করিতে হইবে, এবং করিতে গিয়া কথামালার কচ্ছপের ন্যায় সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইব সেও স্বীকার, তবুও অন্য কাজে শক্তিক্ষেপ করিব না। কয়লা পুড়িয়া এঞ্জিন্ চালায় দেখিয়া তুলাও যদি বলে "আমিও পুড়িয়া এঞ্জিন্ চালাইব", তাহা হইলে সে যেমন দশা প্রাপ্ত হয়, আমাদেরও দশা তদ্রূপ। যে স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে আমরা অহর্নিশ অনুধাবন করিতেছি, সর্ব্বনাশের অন্ধকূপে আমাদিগকে না ফেলিয়া সে নিরস্ত হইবে না।

তাহার উদাহরণ, আমরা সকলেই পাশ করিয়া বড় বড় কর্ম্ম করিতে চাহি—আমরা সকলেই মনে করি, উকীল হইয়া হাইকোর্টের জজ হইব। ইহার ফলে দেখা যায়, যাহারা অন্য দিকে গমন করিলে বেশ সফল হইতে পারিত, তাহারা শক্তি অভাবে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী কিম্বা অন্ততঃ এণ্ট্রান্স

বেতনে এপ্রেণ্টিস্ খাটিয়া জীবন নিঃশেষ করে। এ দিকে ঘরে বৃহৎ পরিবার অনাহারে মারা যায়।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা পুস্তক প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যদি একটি কাজ করেন, তাহা হইলে এই বিষয়ে বিশেষ উপকার হইতে পারে। কাজটি কিছু কঠিন হইলেও সকলের সমবেত চেষ্টায় সুসাধ্য হইতে পারে। কাজটি এই ;—যাঁহারা উচ্চকর্ম্মের প্রার্থী এবং যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী পরীক্ষায় যোগ দিন্, কিন্তু যাহারা অসমর্থ, যাহারা অর্থাভাবে বা শক্তির অভাবে বা দুয়েরই অভাবে বহুকালসাধ্য এই প্রতিযোগী পরীক্ষায় সফল হইতে অক্ষম, যাহারা অতি নিম্ন-ক্লাশ হইতেই স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এই সকল লোকের জন্ত একটি টেক্‌নিকাল্ স্কুল খোলা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এই স্কুলে জমিদারী সরকারী কৃষি শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য ব্যবসা চিত্র প্রভৃতি সকল রকম প্রয়োজনীয় বিষয়ে মোটামুটি রকমের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক। এই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ভূগোল গণিত ইতিহাস প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে অল্পমাত্রায় ইংরাজি শিখিয়া প্রথমে একটি প্রাবেশিক পরীক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে পাশ হইলে পরে যে যে বিষয় লইবে, সে সেই বিষয়ে একটি সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কর্ম্মপ্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া এই স্কুলে ঢুকিবে, তাহাদের কেবলমাত্র ইংরাজিতে সামান্ত পরীক্ষা দিলেই প্রথমে চলিবে। যাহারা অন্ত স্কুলের পরীক্ষায় পাশ হইয়া কিম্বা যে উপায়েই হউক, বাঙ্গালা এবং ইংরা-জীতে অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিবে, তাহারা প্রথম পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে যে সকল কাজ নিম্নশ্রেণী মূর্খলোক-দিগের দ্বারা ভালরূপে হয় না, অভিজ্ঞ লোকদিগের দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন হইবে, এবং অর্থপ্রাপ্তিও সুগম হইবে।

নবপ্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য-পরিষদে" যে সকল ধনী এবং সাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, আশা করা যায়।

কিন্তু সাহেবের জুতা ছাড়িয়া লাঙ্গলে হাত দিতে আমরা কি সহজে

আসলে আমরা দু' নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছি—কেবলই সুবিধা খুঁজিতেছি, ভাবিতেছি, এক নৌকা সরিলে অন্য নৌকায় উঠিব—কিন্তু তাহাতে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবিতেছি না। দু' কূল রক্ষা করিতে গেলে কোন কূলই রক্ষা পায় না। সুবিধা-বালুকার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অক্ষয় অবিনাশী চরিত্রমহত্ত্বের উপর যে জাতির প্রতিষ্ঠা, তাহারই শেষে জয় হয়, ইহা নিশ্চিত।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

শিক্ষক।

ডিসেম্বর সংখ্যা কণ্টেম্পোরারি রিবিউ পত্রে দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট্ স্পেন্সার ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের আলোচনায় শিক্ষকের উৎপত্তিবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিগত কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য' সংখ্যায় সাময়িক সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা স্পেন্সার সাহেবের দার্শনিক মতের কিছু সমালোচনা করিয়াছিলাম। স্পেন্সার যে বিরাট দার্শনিক সত্য প্রচারে গত বিংশ বৎসর নিযুক্ত আছেন, তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থাবলি তাহার ফল। স্পেন্সারের মূল প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তবাদ—জড়ের ন্যায় চেতনও ঐ নিয়মের ক্রীড়াক্ষেত্র। সাকারের ন্যায় নিরাকারও ঐ নিয়মের অধীন। জীবতত্ত্বের ন্যায় সমাজতত্ত্বও বিবর্ত্তনের দিক হইতে আলোচিত হইতে পারে। স্পেন্সার তাঁহার সমাজতত্ত্বে ঐরূপ আলোচনাই করিয়াছেন। সমাজের সকল প্রণালী পদ্ধতি তাহারা যে বিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ, তাহা প্রকটিত করিবার জন্য তিনি রাজনৈতিক যাজনিক প্রভৃতি প্রথার আলোচনা করিয়া সম্প্রতি ব্যবসায়িক (Professional) প্রণালীর অনুশীলনে নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ হইলে তাঁহার বিরাট বিবর্ত্ত গ্রন্থাবলী ইংরাজি দর্শনমন্দিরের এক অতি উচ্চ ও আয়ত কক্ষ অধিকার করিবে। ... স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্পেন্সারের দার্শনিক গ্রন্থাবলী।

বিবর্ত্তবাদ।

Sociology ; সমাজতত্ত্ব।

প্রথম চিত্র গত নবেম্বর মাসের "কণ্টেম্পোরারী" হইতে গৃহীত হইল। উহার লেখক পাদরী ম্যাকল সাহেব, কোনও কোনও পত্রে আপন মতের প্রতিবাদ দেখিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি দৃঢ়তাসহকারে তাহার উত্তর দিয়াছেন। পাদরী মহোদয় বলিতেছেন,—

"তুরস্ক সম্বন্ধে প্রতিবাদকারীর আমার ন্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইত যে, অটোমান সাম্রাজ্যে খৃষ্টান প্রজার ধন ও প্রাণ কোথাও নিরাপদ নহে। কনস্তান্তিনোপলে তাহার সুবিচার পাইবার আশা নাই। তাহার ধন, প্রাণ ও সম্মান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীন। অতি নীচ শ্রেণীর নিকৃষ্ট মুসলমানও ইচ্ছা করিলে তাহা কাড়িয়া লইতে পারে। রাজদ্বারে মুসলমানের বিরুদ্ধে খৃষ্টানের প্রমাণ গ্রাহ্য হয় না। অপরাধ প্রমাণ করিলেও তাহাতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। খৃষ্টানকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিলেও কোরাণ-ধর্ম্মীর কোনও শাস্তির বিধান নাই। একজন ইংরাজদূত তুর্ক-রাজ্য হইতে লিখিয়াছেন,—'আমি পঁচিশ বৎসর তুরস্কে অবস্থান করিতেছি। এ পর্য্যন্ত কেবল খৃষ্টানের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টান-হত্যাকারী কোনও মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হইতে দেখি নাই।'

তুর্ক রাজ্যে খৃষ্টানের দুর্দ্দশা।

"যাহাদের ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তাহাদেরও বুঝা উচিত যে, আমি তুর্ক শাসন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার একটিও ঘুণাক্ষরে অতিরঞ্জিত নহে। তুর্করাজ্যে খৃষ্টান-প্রজার কোনওরূপ অস্ত্রাদি রাখা একেবারে নিষিদ্ধ। কোনও মুসলমান কর্ম্মচারী বা পরিব্রাজক আতিথ্য প্রার্থনা করিলে, খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে তিন দিবসের জন্য বিনামূল্যে আশ্রয় দিতে বাধ্য। কর্ম্মচারী অর্থে সৈনিক, পুলিস, কর-সংগ্রাহক প্রভৃতি সকলকেই বুঝিতে হইবে; আর স্বয়ং পাশা হইতে আরম্ভ করিয়া পথের ভিখারী পর্য্যন্ত পরিব্রাজক হইতে পারেন। এই ঘৃণার্হ অতিথির দল বাড়ীর ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘরগুলি চাহিয়া বসেন, এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যের হুকুম করেন। অধিকন্তু কুলনারীগণের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বাড়ীর পুরুষবর্গ নিতান্ত অসহায়। তাহাদের কোনওরূপ অস্ত্র নাই; কিন্তু অত্যাচারীর দল সশস্ত্র। আদালতে নালিস করিলে কোনও প্রতীকার হয় না; হয় ত অভিযোক্তাকেই প্রহারিত ও কারারুদ্ধ হইতে হয়। চাষীদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা বাট ভাগেরও অধিক খাজানা দিতে হয়। পুলিসের লোকেরাই টেক্স আদায় করিয়া থাকে। তুর্ক-পুলিসের মত পাষণ্ড জগতে দুর্লভ। রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তৃত্ব নিলামে বিক্রয় হয়। সুতরাং ডাক অতিরিক্ত চড়িয়া উঠে। ইহাতে প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচারের একশেষ হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা ভূস্বামী হুকুম করিলে খ্রীষ্টানগণকে বিনা বেতনে মজুর দিতে হয়। মুসলমান হইতে প্রভেদের জন্য খৃষ্টান প্রজার নির্দ্দিষ্ট পোষাক আছে। তাহাদের ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ,—তবে গাধায় চড়া নিষিদ্ধ নহে বটে। কিন্তু গাধায় চড়িয়া যাইবার সময় পথে কোনও মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতে হইবে। খৃষ্টান ক্রোরপতি, আর মুসলমান পথের ভিক্ষুক হইলেও এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নাই।

তুর্করাজ্যে খৃষ্টান।

"ইস্লামের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে তুর্করাজ্যে য়িহুদী বা খ্রীষ্টানগণ কোনও ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে না। পুরাতন মন্দিরের সংস্কার প্রয়োজন হইলে কনস্তান্তিনোপল হইতে হুকুম আনিতে হয়। ইহাতে অর্থ ও সময় দুই-ই অপব্যয়িত হয়। খৃষ্টানেরা গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারিবে না।

অত্যাচার।

য়িহুদী বা খৃষ্টান স্বধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইলে, তাহার আত্মীয় স্বজন যে তাহাকে দু কথা বুঝাইয়া বলিবে, তাহারও যো নাই। সরকারী কাগজপত্রে খ্রীষ্টানগণের উপর যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহার অপেক্ষা কদর্য্য আর কিছু হইতে পারে না।"

খৃঃ ১৮৯২ অব্দে এক নিয়ম জারি হয় যে, সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইলে কোনও লোক সরকারী চাকুরী পাইবে না। খৃষ্টান বিদ্যালয় যাহাতে লোপ পায়, ইহা প্রকারান্তরে তাহারই চেষ্টা মাত্র। ইস্‌লাম-সাহিত্য ব্যতীত অন্য সাহিত্যের প্রতিও সুলতানের বিষদৃষ্টি। এ বিষয়ে তিনি খলিফা ওমারের নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন,—"কোরাণের সহিত যাহা মিলে, তাহা অতিরিক্ত, আর কোরাণের সহিত যাহা মিলে না, তাহা অনিষ্টকর; সুতরাং উভয়কেই পোড়াইয়া ফেল।" কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম না হইলে এ সকল বিষয়ের কোনও পুস্তক ঘরে রাখা খৃষ্টানের পক্ষে নিষিদ্ধ। সেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ বা স্কট, সুলতান এ সকল গ্রন্থও রাখিতে দেন না। খৃষ্টানেরা আপনাদের ধর্ম্ম-পত্রিকায় বাইবেলের বচন তুলিয়া কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে পারেন না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, পাছে অসাবধানতাবশে মুখ দিয়া আইন-বিরুদ্ধ কোনও কথা বাহির হইয়া পড়ে।

পক্ষপাত।

মূল প্রবন্ধের লেখক পাদরী সাহেব এক স্থলে তুর্ক-বিচারালয়ের একটি চমৎকার চিত্র প্রদান করিয়াছেন।—"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মুসলমান বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিতে শুনিতে অভিযুক্তের মুখমণ্ডলে ঘন ঘন তীব্র মুষ্ট্যাঘাত করিতেছেন। তার পর স্বপক্ষসমর্থনার্থ বেচারীকে কোনও কথা বলিতে না দিয়াই তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কোনও কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।"

বিচার না বিদ্রূপ?

একজন বিদেশস্থ ইংরাজ-কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন,—"কোনও আর্ম্মানী পল্লীতে একবার কতকগুলি অশ্বারোহী পুলিসের লোক এক রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে চারি জন কোনও বিবাহিত আর্ম্মানী যুবকের বাটীতে বাসা লয়। যুবক গোপনে শুনিলেন, তাঁহার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবার পরামর্শ হইতেছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া যুবতীকে গোপনে এক প্রতিবেশীর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা জানিতে পারিয়া তাহাকে আনিয়া দিতে বলিল। যুবক সম্মত না হওয়াতে পিশাচেরা তাঁহাকে নির্দ্দয় প্রহার করিল। তিনি এক বন্ধুর বাটীতে পলায়ন করিলেন। দুই দিবস পরেই সেই প্রহারের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ-পরীক্ষার স্থলে তিন জন তুর্ক-ডাক্তার উপস্থিত ছিল; কিন্তু কেহই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিল না।

চূড়ান্ত অত্যাচার।

"অন্যান্য লোক যে সকল গৃহে বাসা লইয়াছিল, সেখানকার কুলকামিনীগণের কাহারও নারীধর্ম্ম রক্ষিত হইল না।"

লেখক এইরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকলের বিবরণ দিয়া আমরা আর পাঠকের হৃদয় ব্যথিত করিব না। পাদরী সাহেব বলেন, "সুলতান নানা উপায়ে আর্ম্মানীদিগকে কতকাংশে বিলুপ্ত এবং একেবারে অধঃপাতিত করিবার চেষ্টায় আছেন।" ইহার প্রতীকার হওয়া আবশ্যক। এ জন্য লেখক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিয়াছেন। আবেদন করিয়া বা দূত পাঠাইয়া কোনও ফল পাওয়া যাইবে না। এ সকল উপায় পূর্ব্বেই বিফল

প্রতীকার আবশ্যক।

তাঁহার মতে ভয় দেখাইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে কিছু করিতে হইবে না। এরূপ ভয় দেখাইয়া ইতিপূর্ব্বে দুই একবার কাজও হইয়াছে। ভয়ে কাজ না হইলে লেখক যুদ্ধেও প্রস্তুত। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িয়া দিলে ইংরাজের সম্মানহানির সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে তিনি একটা বড় অদ্ভুত যুক্তি দিয়াছেন। তাহা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের ভাবিবার বিষয়। তাই আমরা সে কথাগুলি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইংরাজের প্রেষ্টীজ রাখা আবশ্যক।

"বর্ত্তমান বিষয়ে ইংরাজের জিদ বজায় না রাখিলে ভারতীয় মুসলমান মহলে একটা বড় অশুভকর ভাবের উৎপত্তির সম্ভাবনা। আমরা যে তাহাদের উপর নিরাপদে রাজত্ব করিতেছি, তাহার কারণ, মুসলমান ইংরাজের প্রতিজ্ঞা ও শক্তিমত্তার গৌরব বুঝে। যদি মুসলমানের মনে এরূপ ধারণা একবার বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, ইংরাজের আর সে বল নাই, তুরস্কের সুলতান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছে, তবে দ্বিতীয় একটা মিউটিনি অনিবার্য্য। ফ্রান্স, সার্দিনিয়া ও তুরস্ক, এই ত্রিশক্তির সাহায্য লইয়াও যে ইংরেজের রুষ জয় করিতে দুই বৎসর লাগিয়াছে, তাহারা ভারতবর্ষে কদাপি দুর্দ্ধর্ষ নহে, এই বিশ্বাসেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। জগতের মুসলমান সম্প্রদায় যে রুষ-জারকে এত ভয় করে, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, জার পুনঃপুনঃ তুর্ক সুলতানকে পরাজিত করিয়াছেন। সুলতানকে সর্ত্ত অনুসারে চলিতে বাধ্য করিলে ভারতবর্ষে ইংরাজের বিপদ ঘটিবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। ভারতবাসীর যদি এরূপ ধারণা হয় যে, ইংরাজ সুলতানের ভয়ে ভীত, তাহা হইলেই প্রকৃত বিপদের সম্ভাবনা।"—পাদরী সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড় বিচিত্র, সন্দেহ নাই।

ফরাসীর সাক্ষ্য অন্যরূপ।

পাঠক মহাশয় প্রথম চিত্রের পরিচয় পাইলেন। এইবার আমরা দ্বিতীয় চিত্রের অবতারণা করিতেছি। উহা একখানি ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, তিনি তুর্করাজ্যে পঁচিশ বৎসর বাস করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পাদরী সাহেব যে অভিজ্ঞতার বড়াই করেন, সে বিষয়ে ইনিও কম নন। ফরাসী পত্রের লেখক বলিতেছেন,—"ঐতিহাসিক হিসাবে আর্ম্মাণীদিগের স্বাধীনতা পাইবার কোনও অধিকার নাই। তুর্কগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেও আর্ম্মেনিয়া বৈদেশিক শাসনের অধীন ছিল। পারসীক ও রোমীয়দিগের শাসনকালে আর্ম্মাণীগণ ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তুর্কেরা তাহাদিগকে এই হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। আর্ম্মাণীগণ বহুকাল ধরিয়া সুলতানের প্রসাদলাভ করিয়া আসিতেছে। তাহারা যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজিও বড় বড় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহাতেও যদি আর্ম্মাণী বিদ্রোহাচরণ করে, তবে মুসলমানের মনে কি হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

অসুবিধা আছে, কিন্তু তত নয়।

"তুর্ক-শাসনে আর্ম্মাণীগণের যে কোনও অসুবিধা নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু সে অসুবিধা, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, উভয়কেই সমভাবে ভোগ করিতে হয়। পরন্তু, খৃষ্টানকে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিতে হয় না; মুসলমান তাহাও করিতে বাধ্য। আর্ম্মেনিয়ায় গোলযোগের জন্য ইঙ্গ মার্কিন সভা সকল অনেকাংশে দায়ী। ইহারাই ইংরাজদিগের প্রকৃতিসুলভ মানবহিতৈষণা প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতেছে। লোক সকলকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাইতেছে। উদ্দেশ্য, আর্ম্মেনিয়া

লোকের মনে বর্ত্তমান কালের উগ্র ভাব সকল প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। আর্ম্মেণিয় তাহা পরিপাক করিতে পারিতেছে না। তুর্কেরা ত আমেরিকায় কোনও ইসলাম প্রচারক পাঠায় না; তবে তাহারা মার্কিন পাদরীদিগকে প্রশ্রয় দিবে কেন, ইহা বুঝা যায় না। ইংরাজ ও মার্কিন পাদরী মহাশয়েরা যে সকল কথা বলেন, তাহাতে রঙ ফলাইবার চেষ্টা বিলক্ষণ দৃষ্টি-গোচর হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলের হাঙ্গামাগুলাকে বড়ই বাড়াইয়া তুলা হইয়াছে। হাঙ্গামাস্থলে

অতিরঞ্জন কেন?

তুর্ক পুলিস ও তুর্ক সৈনিকেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য। যে আর্ম্মাণী আইন মানিয়া চলিয়াছে, তাহার কোনও ক্ষতি হয় নাই। পত্রসম্পাদক মহাশয়েরা 'অরাজকতা, অরাজকতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন; কিন্তু এদিকে যে সকল বিদেশী ভদ্রলোক বা মহিলা তুর্করাজ্যে ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমণের ত কোনও ব্যাঘাত হইতেছে না।"

সীতারাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীতারাম রাজ্যগঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রাজ্যের কোনও ইতিহাস সঙ্কলন করেন নাই; সুতরাং লিখিত ইতিহাসের অভাবে জনশ্রুতি কত অলৌলিক বিবরণ পুঞ্জীকৃত করিয়া তাঁহার বাল্যজীবন অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে। লোকে যাহা বলে, কৃষক হলচালনা করিতে করিতে সহসা কোন শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সীতারামকে লক্ষ্য করিয়া, যে সকল উপন্যাস রচনা করে, তাহাই ক্রমে লোকসমাজে প্রচলিত হইয়া যায়। এমন করিয়া সীতারামের কথা অনেক শাখা প্রশাখায় বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সে সকল জনশ্রুতির মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই,—মিল হইবার সম্ভাবনাও নাই। তথাপি কেহ যদি সীতারামের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাকে সে সকল জনশ্রুতির মূলানুসন্ধান করিতে হইবে;—সেই জন্য আমরা জনশ্রুতিগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলাম। সারনাথের ধূলিমুষ্টির মধ্যে বৌদ্ধকীর্ত্তির ইতিহাস নাই, তথাপি তাহা পরিব্রাজকের বিস্ময়ের ও অনুসন্ধানের সামগ্রী। সীতারামের বাল্যজীবনের জনশ্রুতির মধ্যেও সীতারামের ইতিহাস নাই, তথাপি তাহা আলোচনার সামগ্রী।

চাকুলা ভূষণার ভিতর দিয়া একটি শাখানদী প্রবাহিত হইত; উহা

.ওতর। প্রবিস্তৃত নহে, কিন্তু

.স্বতী; বর্ষাকালে .াত বড়ই প্রবল হইয়া থাকে।

.মতীতীরে হরিহরনগর নামে এ.খানি গণ্ডগ্রাম ছিল। গ্রামখানি বাঙ্গলার ইতিহাসে অপরিচিত; দেশে যেমন লক্ষ লক্ষ গণ্ডগ্রাম ছিল, ইহাও সেইরূপ; তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস নাই, অথবা থাকিলেও তাহা অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মহাকবি কালিদাস মহাবীর রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিবার সময়ে বাঙ্গলা দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, এখনও বাঙ্গলা দেশের প্রায় সেইরূপ অবস্থা;—চারি দিকে নদ, নদী, খাল, বিল; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নগর, যেন বর্ষাসলিলপ্লাবিত জলাশয়ের মধ্যে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জ। কেবল তফাৎ এই যে, সেকালে নৌসেনার পরিচালনায় বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ছিল, এখন নৌকারোহণে নদীপার হইতে বলিলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই উইল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন!

অন্যান্য প্রদেশ যেমন নদীবহুল, ভূষণা চাক্‌লাও সেইরূপ নদীবহুল স্থান। সকল নদীর নাম হয় ত ভূষণার লোকেও জানিত না। দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর ও সাগরচুম্বিত সুন্দরবন, আর চারি দিকে কেবল গঙ্গা ও ভাগীরথীর শত শত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা; সুতরাং সে প্রদেশ যেমন উর্ব্বর, তেমনই শস্যশালী বলিয়া পরিচিত ছিল। সহসা সে দেশে শত্রুসেনা প্রবেশ করিত না। বহিঃশত্রুর পক্ষে সমতলক্ষেত্রে পদাতিক ও অশ্বারোহী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যেমন সহজ কথা, নদীবহুল স্থানে সহসা বহুশত সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করা সেরূপ সহজ কথা নহে। সুতরাং ভূষণা অঞ্চলে সহসা বহিঃশত্রু প্রবেশ করিতে সাহস পাইত না।

ভূষণা চাক্‌লা যশোহরের ফৌজদারের অধীন ছিল। ফৌজদারের রাজ-ধানীর ভগ্নকীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। যশোহরের ফৌজদার কথঞ্চিৎ নিরাপদেই বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। তাঁহার রাজধানী একটি ক্ষুদ্র নবাবের রাজধানী হইয়া উঠিয়াছিল। নবাবী ধরণে নবাবী অনুকরণে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইত। সেইরূপ গড়, সেইরূপ প্রাচীর, সেইরূপ মসজিদ, সেই রূপ দেওয়ানখানা, সেইরূপ মতিঝিল, সেইরূপ সকলই; সেইরূপ সেনাবল এবং সেইরূপ শাসনকৌশল ছিল না। ভূষণার ফৌজদার অল্প কয়েক সহস্র

প্রেরিত হউক বা . . করি .
মাত্রাতেই পরিপূর্ণ হইত। . . কে ফৌজদার ব.
না,—সকলেই বলিত নবাব, এখ . ও তাঁহার বাটী সে দেশে নব.
বলিয়াই পরিচিত!

এই ভূষণা চাক্‌লায় মধুমতীতীরে হরিহরনগরে কায়স্থকুলে বিশ্বাস-বংশে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের জন্মস্থান কোথায়, তাহা লইয়াও একজন বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে, হরিহর নগরে সীতারামের জ্ঞাতি বন্ধুদিগের বসতি ছিল; কিন্তু হরিহর নগরেই যে তাঁহার জন্ম হয়, তাহার প্রমাণ কি? বাস্তবিক, তাহার কোনও প্রমাণ নাই; তবে সীতারাম যে হরিহর নগরে বাস করিতেন, তাহা অস্থাপিও শুনিতে পাওয়া যায়।

সীতারাম দরিদ্র গৃহস্থের সন্তান। এখনকার সম্পন্ন ভদ্রবংশও প্রায় দীনদরিদ্র; কিন্তু সে কালের দরিদ্র গৃহস্থ একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন না। সীতারামের কতকগুলি জোত ও তালুক ছিল। হরিহরনগরে ও শ্যাম-নগরে সীতারামের কয়েকখানি ক্ষুদ্র তালুক ছিল; তাহাই তাঁহার একমাত্র পৈতৃক সম্পদ। তদ্ভিন্ন অসীম সাহস ও অসাধারণ বাহুবল ভিন্ন সীতারামের আর কোন সম্বলই ছিল না। আর ছিল কেবল গঠনশীল প্রতিভা। যে প্রতিভাবলে অনেক বালক নদীসৈকতের বালুকারাশি সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র ধূলার ঘর, ধূলার সিংহদ্বার রচনা করে, তাহার ভিতরেও আশ্চর্য্য কৌশল বিন্যস্ত হইয়া থাকে! কেহ কেবল রন্ধনশালা, কেহ বা শয়নাগার রচনা করিয়াই নিরস্ত হয়; কেহ বা বালক নেপোলিয়নের মত দুর্গপ্রাচীর রচনা করে। ইহা তুচ্ছ কথা, অনেক সময়ে আমাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়াই মনে হয় না; কিন্তু ইহাতেই প্রতিভার বিকাশ। সীতারামের বাল্য-জীবনে এইরূপ গঠনশীল প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু লোকচক্ষু তাহার ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিবার অবসর পায় নাই!

আমরা একালের লোক। দেশে অন্ন বস্ত্রের এতই অনাটন যে, ভাল করিয়া দন্তোদ্গম না হইতেই আমাদিগকে অর্থকরী-বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে হয়। অর্থ অর্থ করিয়া সকলেই
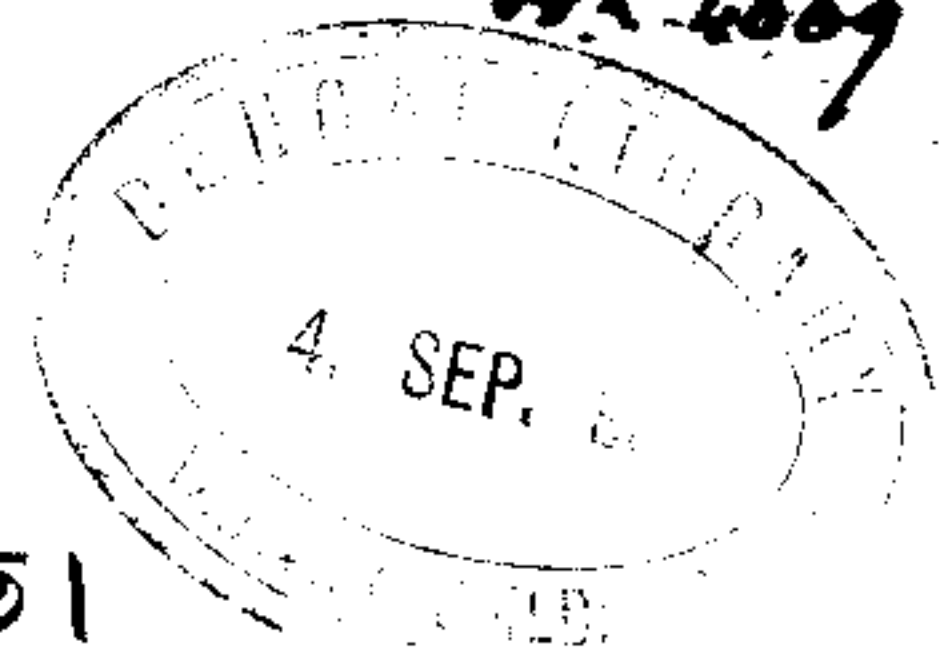
হুসেনসাহী মহাভারত।

বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস দিন দিন নূতন আলোকে আলোকিত হইতেছে দেখিয়া পরম পরিতোষ জন্মে। আমরা বাল্যকালে কাশীরাম দাসকেই ভারতের প্রথম অনুবাদক বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তদপেক্ষা পুরাতন কয়েকখানি বাঙ্গলা মহাভারতের আবিষ্কার হইয়াছে। অল্প দিন হইল, বগুড়া জেলায় আমি আর একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা মহাভারতের হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি; সাহিত্যরসিক পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বগুড়া জেলায় নবাবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের কয়েক মাইল পূর্ব্বে গোপীনাথপুর নামে একটি গ্রাম আছে;—তথায় 'সখীভাব' নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন গুরুবংশ বিদ্যমান আছেন। ইঁহাদের উপাধি 'প্রিয়া'। ইঁহাদের গৃহে হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অনেক আছে শুনিতে পাই, এবং তাহা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা আমাকে কয়েকখানি পুঁথি পাঠাইয়া দেন। তাহারই মধ্যে দেখিলাম, একটি সমগ্র বাঙ্গলা মহাভারত রহিয়াছে।

দর্শনমাত্রেই গ্রন্থখানি প্রাচীন বলিয়া প্রতীতি হয়। কাগজ অতি পুরাতন—ধূসরবর্ণ, কীটদষ্ট, এক্ষণে জীর্ণ হইতে বসিয়াছে। স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়াছে। লেখাও স্পষ্টই পুরাতন,—তবে আজিও বেশ স্পষ্ট পড়া যায়। সমগ্র পুঁথির পত্রসংখ্যা এইরূপ:—

১। আদি পর্ব্ব	২১ পত্র।	১১। শক্তি পর্ব্ব	৫ "
২। সভা পর্ব্ব	৯ "	১২। স্ত্রীপর্ব্ব	৮ "
৩। বনপর্ব্ব	১৫ "	১৩। শান্তি পর্ব্ব	১১ "
৪। বিরাট পর্ব্ব	২০ "	১৪। অভিষেক পর্ব্ব	৩ "
৫। উদ্যোগ পর্ব্ব	১৭ "	১৫। মৌশলপর্ব্ব	৫ "
৬। ভীষ্ম পর্ব্ব	১৬ "	১৬। অশ্বমেধ পর্ব্ব	৭৮ "
৭। দ্রোণ পর্ব্ব	২৮ "	১৭। অর্চ্চর্য্য পর্ব্ব	৭ "
৮। কর্ণ পর্ব্ব	১৭ "	১৮। ব্যাসাশ্রম পর্ব্ব	৫ "
৯। শল্য পর্ব্ব	৫ "	১৯। স্বর্গারোহণ পর্ব্ব	৮ "
১০। গদা পর্ব্ব	৮		

গ্রন্থসমাপ্তির পর শেষ পত্রের লিপি এইরূপ ঃ—

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো * * হস্তিবিচলিতপাদেন জিহ্বভা বিচলিত সরস্বতি। ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ সটসমুদ্রতাবিক সোড়কা সত সকাব্দিয়ে সৌরফাল্গুনস্য প্রবিংসতি * সকে আদিত্যৌ বাশরে দিবাত্রিশ্তয়প্রহরান্তরে এতত্‌কালানুসারে ইদং পুস্তকং সমাপ্তং॥ ইত্যাদি স্বাক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ণ দত্ত দাশ সাকীন রামপুর পরগনে আপোল সরকার পাউরা (পাঠরা?) সন ১১৬১ এগার সত একসটি শাল জমিদার শ্রীরাজা রামনাথ রায়॥ গোমস্তা শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরি॥ মোকাম দক্ষিণপূর্ব্বে পিড়াই।"

ইহাতে পুঁথিটি শকাব্দা ১৬৭৬ বাঙ্গলা সন ১১৬১ বৎসরে লিখিত হইয়াছিল, জানা যায়। তদনুসারে ইহার বর্ত্তমান বয়স ১৪১ বৎসর হইতেছে। গ্রন্থের আদি এইরূপ,—

"গণেষ রামকৃষ্ণশ্চ দুর্গা স্বিত্যো মহেশ্বরঃ।
পিতা গুরু পরং ব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমস্তুতে॥
নমো দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকর * *।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেনম॥
অথ আদিপর্ব্ব লিখ্যতে॥
প্রণমহো নারায়ণ পুরুস প্রধান।
প্রণোমহো ব্যাসমুনি * * নিধান॥
অস্ত্রে সাস্ত্রে বিসারদ মহিমা অপার।
কালজুগে হৈব জেন বিষ্ণু অবতার॥
প্রতাপে প্রসস্ব জেন বিপক্ষের জম।
প্রথিবী ভরিল জসে অতি অনুপাম॥
সুলতান হুসেন পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরা রাধার নামে জবে গেল হাথ॥
রাজা টোপর সনে দিল লস্করি কাপড়া।
সোনা রূপা লক্ষ দিল এক সত ঘোড়া॥
শ্রীজুত লস্করি খাঁ বড় মহামতি।
দরিদ্র ভঞ্জন রূপ অনাথের গতি॥
কুতুহলে ভারথের সুনান্তি কাহি * *।
* * মতে পাণ্ডবের হারাইল রাজধানি॥
বনবাস বঞ্চিল দ্বাদশ বৎসর।
কীমতে বঞ্চীল তারা বনের ভিতর॥
বৎসরেক ছিল তারা অজ্ঞাত বস *।
* * * ন বহুমতি॥
এত সব কথা কহ সঙ্খেপ করিয়া।
তাহার আদেশ আমি মস্তকে ধরিয়া॥
করিয়া পরম জত্নে ভারথ রচিল।
* * * *
শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—
তিন লক্ষ ত্রিস সহস্র কৈল শ্লোক।
কহিল নারদ মুনি শুনে দেবলোক॥
পঞ্চ লক্ষ শ্লোক সুনে দ্বিজগণে।
পিতৃলোকে শ্লোক করেন দেবলোকে সুনে॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক পাতাল ভুবনে।
বলির সভাতে পাট করেন মুনি সনাতন॥
সপ্তদশ লক্ষ শ্লোক হরিল রাক্ষসে।
মৌত্রেয় পঠন্তি তাহা পরম হরিসে॥
জন্মেজয় রাজা দস সহস্র অবধান।
ব্যাস মুনি আইল তবে রাজা বিদ্যমান॥
যথাবিধি পূজা করি কহিল নৃপতি।
তুমি বেদ ইতিহাস কহ মহামতি॥"
ইত্যাদি।—

দুঃখের বিষয়, এই বিবরণে গ্রন্থকারের আত্মবিবরণ কিছুই দেখা যায় না। "করিয়া পরম যত্নে ভারত রচিল" এই চরণের পর যে চরণটি নষ্ট হইয়া

দেখিতে পারিয়াছি, তাহাতে অন্য কুত্রাপিও গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তাঁহার নাম না পাইলেও দেখা যায়, তিনি গৌড়াধিপতি সুলতান হুসেন সাহার আমলে, অর্থাৎ শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হুসেনসাহার এক মুসলমান সেনাপতি এ স্থলে "শ্রীযুত লস্করি খাঁ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি—ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণে নিয়োজিত হইয়া কৃতকার্য্য হইলে—হুসেনসাহা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি মহাভারতের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন—এবং গ্রন্থকারকে সংক্ষেপে মহাভারতের বৃত্তান্ত বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আদেশ করেন। তাহাতেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

এই মহাভারতে ঊনবিংশ পর্ব্ব, এবং অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা অশ্বমেধ পর্ব্বই অতিবাহুল্যে লিখিত হইয়াছে, দেখা যায়। এই এক পর্ব্ব সমগ্র গ্রন্থের চতুর্থাংশেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। অধিকন্তু, শেষ চারি পর্ব্বে বক্তা বৈশম্পায়ন নহেন, জৈমিনি।

গ্রন্থের রচনা অপকৃষ্ট। ইহার পদ্যে লালিত্য বা কবিত্ব কিছু নাই। লিপিপ্রণালীও অতি অশুদ্ধ। একালের পাঠকগণের ইহাতে মনোরঞ্জন হওয়া অসম্ভব। তবে কাশীরাম দাসের উৎকৃষ্ট রচনার পূর্ব্বে বাঙ্গলাতে মহাভারত রচনার কিরূপ উদ্যম হইয়াছিল,—তাহা যাঁহাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা আছে,—গ্রন্থখানি তাঁহাদের পাঠের যোগ্য, সন্দেহ নাই। অপিচ, আলাউদ্দীন হুসেনসাহার আমলে বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও এই গ্রন্থে জানা যায়, এবং তজ্জন্য ইহা আদরের যোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে একটি অতি বিচিত্র কথা দেখিতে পাই। আলাউদ্দীন হুসেনসাহাকে গ্রন্থকার "পঞ্চম গৌড়নাথ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আমি এই বিবরণ পাঠে চমকিত হইয়া উঠিয়াছি। তাহার কারণ কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলা উচিত।

প্রায় এক বৎসর হইল, আমি ধর্ম্মপালের একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছি—এবং তৎসঙ্গে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া ইংরেজি ভাষায় তাহার মর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি এইরূপ নির্দ্দেশ করি যে, সাধারণ পাঠকে মালদহ

গঙ্গার উত্তরে, কান্যকুব্জ হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমান্ত পর্য্যন্ত 'গৌড়' এই সাধারণ নামে বিখ্যাত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ছিল। এবং তাহা পঞ্চগৌড়, এবং তাহার নরপতিগণ "পঞ্চগৌড়াধিপাঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত শব্দে কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে, কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডেরই একদা 'গৌড়' এই নাম ছিল। যাহা আদি 'গৌড়', তাহা কোশল বা অযোধ্যা দেশের অন্তর্গত। এই আদি 'গৌড়ের' ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হইয়া, পাঁচটি গৌড় রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাহাই অবশেষে পঞ্চ গৌড় নামে বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মপাল এই সমগ্র গৌড়ের সম্রাট বা একছত্র অধিপতি ছিলেন। পশ্চিম দিকে তিনি কান্যকুব্জ পরাজয় করিয়া সেই প্রদেশের প্রাচীন রাজবংশকে তাহাদের রাজসিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেন; এবং পূর্ব্ব দিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনও তাঁহার করতলগত হয়। উত্তরভারতে ধর্ম্মপালের মত প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট তৎকালে কেহ ছিল না। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে আপনাদের রাজত্ব হারাইয়া কেবল বাঙ্গলা দেশের অধিপতিমাত্র হইয়া উঠেন। গৌড়ের পূর্ব্ব সীমায়, মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তাঁহাদের যে একটি রাজধানী ছিল, তাঁহাদের রাজত্বের শেষাশেষি কেবল তাহাই বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের কিয়দংশের সহিত তাঁহাদের অধিকারে ছিল।

আমার এই মতের প্রামাণিকতার প্রতি কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ, আদি গৌড় যে বাঙ্গলা দেশে ছিল না, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ খুঁজিতে গেলে বাঙ্গলা দেশে এক জন পাওয়া যায় না, কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহাদের সংখ্যা ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। তাহাতে ঐ প্রদেশকেই আদি গৌড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। আদিম গৌড় নগর কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা ব্যাকরণ-কর্ত্তা পাণিনি মুনির সময়ে বিদ্যমান ছিল, দেখা যায়। পাণিনির একটি সূত্র এই,—"পুরে প্রাচাম্"। ৬।২।৯৯। অর্থাৎ, পূর্ব্ব দেশ বুঝাইলে সমাসে পুর শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের অন্তোদাত্ত স্বর হয়। যথা, দেবদত্তপুরম্। নান্দী-পুরম্। পূর্ব্বদেশ না বুঝাইলে কি হইবে?—শিবপুরম্। ইহার পরের সূত্র এই,—"অরিষ্ট গৌড় পূর্ব্বে চ। ৬।২।১০০। অর্থাৎ, পূর্ব্ব সূত্রের নিয়ম 'অরিষ্ট-পুর' 'গৌড়পুর' 'অরিষ্টাশ্রিতপুর' 'গৌড়ভৃত্যপুর' ইত্যাদি স্থলেও খাটিবে।

বাঙ্গলা দেশের নগরবিশেষ হইত, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় সূত্রে গৌড়ের উল্লেখ অনাবশ্যক হইত। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাণিনির সময়ে 'গৌড়' 'প্রাচাংপুর' ছিল না। প্রমাণান্তরে জানা যায় যে, শ্রাবস্ত নামে সূর্য্যবংশীয় রাজা গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্ম্মাণ করেন। অতএব, আদি গৌড় যে উত্তর-কোশলের অন্তর্গত ছিল, তাহার আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

গৌড়দেশীয় সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্ব দিকে ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ বিস্তার করায়, পঞ্চগৌড়ের উৎপত্তি হয়; এবং যে গৌড় রাজধানী পালবংশের পর সেনবংশের হস্তগত হয়, এবং অবশেষে ব্যখ্‌তিয়র খিলজী যাহা লুণ্ঠন করেন, এবং যাহার ভগ্নাবশেষ আজিও মালদহ জেলায় দৃষ্টিগোচর হয়,—উহা পাঁচ গৌড়ের শেষ বা 'পঞ্চম গৌড়' মাত্র ছিল।

এক্ষণে আমরা নবাধিগত বাঙ্গলা মহাভারতের মধ্যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইলাম যে, সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহের সময়েও বাঙ্গলাদেশস্থ 'গৌড়' 'পঞ্চম গৌড়' বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

বাঙ্গলার ইতিহাসে আলাউদ্দীন হুসেন সাহার গৌরব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি সৈয়দবংশীয় হইলেও, একজন দেশীয় মুসলমান ছিলেন। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলাই তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। তিনি কোনও সৈয়-দের ঔরসে কোনও বাঙ্গালী মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন না, তিনি বাল্যে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রাখালি করিতেন বলিয়া আজিও মালদহ জেলায় প্রবাদ আছে। আজিও তিনি 'রাখাল বাদসা' নামে বিখ্যাত। রাখা-লির পর তিনি সুবুদ্ধিবর নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের অধীনে কোনও এক সামান্য চাকুরি স্বীকার করেন। এই ব্রাহ্মণ তৎকালীন মুসলমান রাজার রাজস্ব বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; এবং এরূপ লিখিত আছে যে, হুসেন কোনও দোষে প্রভুর হস্তে বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এক কাজীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজসরকারে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং তৎ-কালীন অরাজকতার মধ্যে আপন শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া, অব-শেষে গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তিনি খাঁটি পাশ্চাত্য মুসল-মান হইলে, কদাচ ব্রাহ্মণের রাখাল হইতেন না। তিনি বাঙ্গালী মুসলমান হইয়া বাঙ্গলার রাজসিংহাসন অধিকার করিলে, তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। আমাদের এই পুরাতন মহাভারত তাহারই কিঞ্চিৎ

উত্তরায়ণ মেলা।

১লা মাঘ সূর্য্যদেব উত্তরায়ণ পথে গতি পরিবর্ত্তন করেন, সেই দিনের স্মরণার্থ ত্রিহট্টে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ত্রিহট্ট একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, আমাদের গ্রামের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটি থানা এবং একটা ছোট ডাকঘর আছে; পল্লীগ্রামের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টারদের আর একটা ছোট রকমের চাকরী করিবার অধিকার আছে, তাঁহারা পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরিও করিয়া থাকেন; ডাকঘর এবং পাঠশালা একই স্থলে সংস্থাপিত, সুতরাং গ্রাম্য ডাকমুন্সীর পক্ষে এই দুই কাজ এক সঙ্গে নির্ব্বাহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। ডাকমুন্সী এই পল্লীগ্রামের এক জন হাকিম, আর এক জন হাকিম এখানকার থানার দারোগা।

ত্রিহট্ট গ্রামখানি ছোট হইলেও সুন্দর। ইহার পশ্চিম ধারে খড়িয়া নদী প্রবাহিত, মাঘ মাসে নদীতে অধিক জল থাকে না, উপরে উচু পাড়, উভয় ধারে প্রকাণ্ড বালির চর। পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ, তিন দিকে প্রশস্ত ক্ষেত্র, নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ; যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু শস্যশীর্ষ ধরণীর বিচিত্র বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি। ধনীর অট্টালিকা একখানিও নাই, অধিকাংশই দরিদ্রের পর্ণকুটীর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের চৌরী; আটচালা ঘরও দুই চারি খানি আছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটা গোলা-বাড়ী, আঙ্গিনাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এক পাশে একখানা প্রকাণ্ড আট-চালা কাছারী, তাহারই দুই পাশে ছোট বড় সারি সারি গোলা বসান, গোলা-কার মৃত্তিকাস্তূপের উপর মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর এই সকল গোলা সংস্থাপিত হইয়াছে। চাটাই এবং কাবারি দিয়া এই সকল গোলা দৃঢ়রূপে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত, ভিতরের দিকটা মাটী ও গোবর দিয়া ভাল করিয়া লেপা, উপরে খড়ের চাল, চালের সর্ব্বোপরি একটা উচু ঝুঁট, অনেকেই মাটীর পোড়ান গামলা উল্‌টাইয়া সেই ঝুঁট ঢাকিয়া রাখি-য়াছে—দেখিলে বোধ হয়, যেন গোলাগুলা টুপি মাথায় দিয়া উদরে শস্যরাশি সঞ্চয় পূর্ব্বক ঠিক মহাজনদের মতই মুরুব্বিয়ানাভাবে অতি গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে, এবং চারি দিকের উচ্ছ্বসিত দারিদ্র্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। গোলার ভিতরে ধান, গম, মসিনা, শর্ষপ প্রভৃতি শস্য বোঝাই করা; পাছে

দ্বারে চাবি লাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছে; দরকার পড়িলে চাবি খুলিয়া শস্য বাহির করে, কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করা কঠিন, তাহারা চাল ছেঁদা করিয়া গোলার শস্য নষ্ট করে, এবং এক পাল বেজী নিঃশঙ্কচিত্তে গোলার নীচে আসিয়া কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে আপনাদের বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া লয়।

অনেক গৃহস্থের বাড়ীর চারি দিক মাটীর দেওয়ালে পরিবৃত, কিন্তু গোবরের চাপড়ীতে এই সকল দেওয়াল একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের চালে শিমগাছ লতাইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের সাদা ও বেগুণে রঙ্গের ফুল সবুজ পাতার মধ্যে হইতে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বাড়ীর পাশ দিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ; সেই রাস্তার এক পাশে বাঁশ-ঝাড়, জঙ্গলপরিবৃত গর্ত্ত, উননের ছাই এবং বাঁশের পাতাতে গর্ত্ত পরিপূর্ণপ্রায়; সরু পথের অপর দিকে জামালকোটার গাছে ঘেরা বেড়, বেড়ের ধারে ধারে দুই পাঁচটা দীর্ঘ সজনে গাছ, পাতা প্রায় দেখা যায় না, সমস্ত শাখা সাদা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, এবং ফুলভারে ডালগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছে; এই ফুল পল্লীবাসীর অতি মনোরম তরকারী; ইলিশ মাছের সহযোগে ইহার চচ্চড়ি এমন সুস্বাদ যে, অরুচির পক্ষে তাহা পরম রুচিকর, কিন্তু কোন ডাক্তারই ভরসা করিয়া কোন অরুচিগ্রস্ত রোগীকে এই পথ্যের ব্যবস্থা দেন না। মটরের ডালের বড়ি দিয়া সজিনা ফুলের যে অম্বল হয়, তাহার আস্বাদন পল্লীবাসিগণ সারা বছর ভুলিতে পারে না; সজিনা ফুলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধু থাকে, এই মধু অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া অম্লমধুর আস্বাদন উৎপাদন করে; বিশেষতঃ, এই সময় গাছে গাছে তেঁতুল পাকিতে আরম্ভ হয়, এই পরিপুষ্ট পক্কপ্রায় তেঁতুলের অম্লরস তেমন দুঃসহ তীব্র নহে, তাহার মধ্যেও একটু মিষ্টতা আছে। কিন্তু আজ কয় বৎসর এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়া এই অম্বলের রাজ্যে অরাজক বাধাইয়া দিয়াছে; তেঁতুল পাড়াইয়া কেহ যে মনের মত করিয়া অম্বল রাঁধিয়া খাইবে, সে যো নাই; এমন কি, টোপাকুলগুলি গাছে পাকিয়া পাকিয়া অভিমানে ঝরিয়া পড়িতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুচিগ্রস্তা গুর্ব্বিণীদের জিহ্বায় জল রক্ষা করা দুরূহ হইতেছে, কিন্তু হায়, নিরুপায়; সরকার বাহাদুর ডাক ঘরে এক পয়সায় আড়াই রতি কুইনাইন পাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,

জ্বর কিন্তু কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। সেকালেও কাঁচা তেঁতুল ছিল, গাছ-ভরা কুল ছিল, ইলিশ মাছ এবং কলায়ের ডাল ছিল, কিন্তু কুইনাইন ছিল না, কেহ ম্যালেরিয়ার নামও জানিত না; সেকালে কদাচিৎ কাহারও জ্বর হইলে 'ধাউত' গরম হইয়াছে বলিয়া রোগী বেশী করিয়া শরিষার তেল মাখিয়া নদীতে গোটাকত ডুব দিয়া আসিত, তাহার পর বাসি মাছের ঝোল এবং গোঁড়া লেবু দিয়া এক পেট পান্ত ভাত খাইয়া জ্বর তাড়াইত; কেহ বা মিছ-রীর সরবৎ এবং ডাব খাইয়া 'শৈত্যক' করিত, যদি নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখিত ত কবিরাজ ডাকাইত, কবিরাজ মহাশয় নগদ আট গণ্ডা পয়সা দর্শনী লইয়া চাদরের খুঁট হইতে 'লোহান্তক' চূর্ণ বাহির করিয়া তাহাই সেবনের ব্যবস্থা দিতেন, এবং যতদিন রোগী আরাম না হইত, ততদিন তিনি দুই বেলা আসিয়া নাড়ী টিপিয়া যাইতেন, ব্যারাম সারিলে আর কিছু দিলেই চলিত। কিন্তু একালে সকলই আশ্চর্য্য; পাড়াগাঁয়ের দোকানে দোকানে সাবু ও বার্লি বিক্রয় হইতেছে; সকালে উঠিয়াই যে ব্যক্তি দু' রতি কুইনাইন না খাইল, তাহার সে দিনের মত জ্বরভীতি লাগিয়া থাকে। প্লীহার আবির্ভাবে উদরটি ঢকাকার, তাহার উপর ব্লিষ্টারের পদাঙ্কলেখা, শরীর ক্ষীণ, রক্তশূন্য, হাত পায়ের নলা সরু, এবং মস্তক কেশবিরল; গ্রামের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এই রকম।

কিন্তু গ্রামের এ রকম অবস্থা সত্ত্বেও উত্তরায়ণের মেলা বন্ধ থাকিবার যো নাই। এ বহুদিনের মেলা, অনেক দেশ বিদেশ হইতে দোকানী পসারী আসিয়া এ মেলায় খরিদ বিক্রয় করে। পাঁচ সাত ক্রোশ দূরের লোক সম্বৎ-সর হইতে আশা করিয়া থাকে,—'উৎরুণির' মেলায় জুতা কিনিবে। এখানে মেলার সময় যে হাঁড়ি বিক্রয় করিতে আসে, তাহা খুব 'বয়' বলিয়া অনেক দূরবর্ত্তী গ্রামের পল্লী বৃদ্ধাগণও মেলার সুযোগের প্রতীক্ষা করে; 'বার্ণিয়ার' হাঁড়ির প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস! এ মেলা কি কখন বন্ধ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, এ মেলা বন্ধ করিলে কৃষ্ণরায়ের অপমান করা হয়। কৃষ্ণরায় ত্রিহট্টের গ্রাম্যদেবতা; এমন জাগ্রত দেবতা সচরাচর দেখা যায় না। মেলার সময় ঘটা করিয়া তাঁহার পূজা হয়, কাহারও কাহারও মতে এই মেলা কৃষ্ণরায়ের জন্মোৎসব। সকলের বিশ্বাস, যতদিন কৃষ্ণরায় আছেন,

তিনি প্রধান দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের অঞ্চলে আট দশ ক্রোশের মধ্যে কাহারও কিছু কামনা থাকিলে কৃষ্ণরায়কে মানিলেই অবিলম্বে সে কামনা সফল হয়। কাহারও গরুর প্রথম বিয়েনে ভাল দুধ হইল না, গৃহকর্ত্তা মানিল, "দোহাই কৃষ্ণরায়, ফিরে বিয়েনে যেন আমার গরুর বেশী দুধ হয়, আমি তোমাকে সেই দুধ দিয়ে পুজো দেব।" কাহারও বাড়ীতে প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ হইয়াছে, কিন্তু ফলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, যে দুই পাঁচটা 'মুচি' পড়ে, তাহা পচিয়া যায়; গৃহস্থ মনে মনে মানিল, "এবার কাঁঠাল হ'লে সকলের বড় কাঁঠালটি কৃষ্ণরায়ের জন্য পাঠাব। হে ঠাকুর এবার আমাকে গাছভরা কাঁঠাল দেও।" এইরূপে আম কাঁঠাল ডাব হইতে আরম্ভ করিয়া আতা পেয়ারা ডালিম—এমন কি লাউ কুমড়ো পর্য্যন্ত কোন ফলই কৃষ্ণ-রায়ের মানত না হইয়া যায় না। যাহার যে জিনিস মানত্ থাকে, সাময়িক হইলে সে সেই সকল জিনিস লইয়া ১লা মাঘ কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে উপস্থিত হয়। যদিও মেলার দোকানপত্র কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে আমদানী হয়, কিন্তু ১লা মাঘই প্রকৃতপক্ষে মেলা বসে। এই মেলা দশ বারো দিন পর্য্যন্ত থাকে; তাহার পর ভাঙ্গা মেলা, ভাঙ্গা মেলা দুই এক দিনের বেশী থাকে না, কিন্তু এই সময়ই লোকের ভিড় বেশী হয়; কারণ সাধারণের বিশ্বাস, দোকান পসারী দোকান পাট তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় ভাঙ্গা মেলায় কিছু সস্তা দরে জিনিস ছাড়িয়া দিয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, উত্তরায়ণ মেলার সময় আমাদের পল্লী অঞ্চলে ভারি একটা আনন্দকল্লোল বাধিয়া যায়; অনেক স্কুল পাঠ-শালের ছেলে পড়া কামাই করিয়া দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে ছোটে, এবং গ্রাম্য যুবকেরা সারা বৎসরের ব্যবহারোপযোগী জুতা কিনিবার জন্য ধোপদস্ত কাপড়, ইস্ত্রী-করা কামিজ, কোর্ট এবং তাহার উপর দোলাই কিম্বা র‍্যাপারে সজ্জিত হইয়া, কেহ ছাতি কেহ ছড়ি লইয়া, দলে দলে পারঘাটার খেয়া নৌকায় পার হইয়া যাইতেছে; বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত 'হাঁড়ি' কিনিতে যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না; এই সকল দেখিয়া আমরা কয় বন্ধুতে একবার ত্রিহট্টে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইতেছিলাম; অবশেষে একদিন গৃহত্যাগ করাই স্থির হইল; গৃহত্যাগের একটু সুবিধাও হইয়াছিল, বাড়ীর কর্ত্তাটি বাড়ীতে ছিলেন না।

তাই ৩০এ পৌষ সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া "জিরেন কাট

সুমিষ্ট খেজুর-রস পান করিতে করিতে স্থির করা গেল, আগামী কল্য রাত্রি থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। পৌষ পার্ব্বণের হর্ষকোলাহল তখন প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এবং খর্জ্জূররসের সঙ্গে পৌষের প্রবল শীত আমাদের বুকের মধ্যে কাঁপুনি উপস্থিত করিয়াছিল। আমরা স্থূল শীতবস্ত্রে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া দেশভ্রমণের এক মোহকর স্বপ্নে মুগ্ধ হইতেছিলাম। শুধু বোধ হইতেছিল, আমরা কয়টি বন্ধু যেন এই বিশ্বসংসারের রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র অভিনয়ের দর্শক, আর কিছু নাই; ঠাকুরমার গল্পের নায়ক সেকালের রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটোলের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র, এই চারি বন্ধুতে যেমন একত্র মিলিয়া কোনও এক স্বপ্নদৃষ্ট আকাশসম্ভব রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, প্রতি মুহূর্ত্তে অসম্ভব বিপদে পড়িত, এবং তাহা হইতে অসম্ভবতর উপায়ে উদ্ধার পাইত, আমাদেরও মনে হইতে লাগিল, আমরাও যেন রাত্রিপ্রভাতে সেইরূপ কোনও অনুদ্দিষ্টা কল্পনাসুন্দরীর আবিষ্কারের আশায় গৃহ ছাড়িয়া এক দূরবর্ত্তী প্রবাসে প্রস্থান করিব;—সেখানে সকলই অজানিত, বিচিত্র, রহস্যপূর্ণ; অথচ আমরা যেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, তাহা আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশের বেশী নয়!

বাল্যকালে ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে। আমরা এ পর্য্যন্ত কখন গ্রামের বাহিরে পদার্পণ করি নাই, এবং বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কখন পরিচয় হয় নাই। চারি দিকের বন্ধন যেখানে যত নিবিড়, স্বাধীনতার আলোক এবং হিল্লোল সেখানে তত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং রাত্রে শুইয়া শুইয়া শুধু মনে হইতে লাগিল, উষাকালে আমাদের জীবনেও একটি অভিনব উষালোক ফুটিয়া উঠিবে; তাই নিদ্রাবস্থাতেও গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, নূতন নূতন শস্যক্ষেত্র, অগণ্য অপরিচিত লোকের মুখ,—সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড মেলার আশ্চর্য্য দৃশ্যের অপরূপ কল্পনা, বুকের মধ্যে পুনঃপুনঃ একটা উৎসাহকম্পন জাগাইয়া তুলিতেছিল। অর্দ্ধ ঘুমে অর্দ্ধ জাগরণে শীতের প্রকাণ্ড রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে রাত্রিশেষে যখন বন্ধুত্রয় জানালার কাছে আসিয়া উৎসাহভরে আমার নাম ধরিয়া ডাক দিল, তখন আমি লাফাইয়া উঠিলাম। বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরমা বলিলেন, "শেষরাত্রে কে ডাক দিল কি না, অমনি চলেছিস্ কোথা?"—শীতে এবং উৎসাহে তখন আমার বুক কাঁপিতেছিল, সংক্ষেপে বলিলাম, "সঙ্গীরা এসেছে, তেহট্টে যাব।" "এত রাত্রে তেহট্টে যাবি কি, এখনও এক প্রহর রাত

আছে, পাখ পাকালি ডাকেনি, গাঁড়ার বাড়ী ঢেঁকি পড়ে না, এখন কি এক ডাক শুনে ঘরের বার হতে হয়?"—আমি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "এক ডাকে দুয়োর খুল্লে কি হয়?"—ঠাকুরমা ভারি 'ডিপ্লোমাটিষ্ট', আমাকে ভুলাইবার জন্য ভারি এক আসমানি গল্প জুড়িয়াছিলেন, তাহার ভাবখানা এই যে, শেষরাত্রে 'নিশিরা' দুই একটা ডাক দিয়া ছেলেদের ভুলাইয়া লইয়া যায়, ডাক শুনিয়া অনেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাদের অনুসরণ করে, শেষে নদীর ধারে লইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুই দই খাবি না দুধ খাবি?" যদি নিশিগ্রস্ত বালক বলে,—"আমি দই খাব", তাহা হইলে তাহাকে পাঁকের মধ্যে ঠাসিয়া ধরে; দুধ খাইতে চাহিলে জলে ডুবাইয়া মারে। বিলম্বে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, বলিলাম "আমি দুধ দই কিছুই খাইতে চাই না।" ঠাকুরমা একটা আসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় ত্রস্তভাবে 'ষাট ষাট' বলিয়া উঠিলেন, তাহার পর কোন্ জমিদারের পুত্রকে কবে 'নিশিতে' তাহার বাপের কাছ হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা করিতে লাগিলেন; উপসংহারে বলিলেন, "রাত্রে তিন ডাক শুনিবার আগে দরজা খুলিয়া বাহিরে যাওয়া ভাল নয়, নিশিরা তিন বারের বেশী ডাকিতে পারে না।" ঠাকুরমাদের ভৌতিক শাস্ত্রে ইহাই প্রেতলোকের বিধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঠাকুরমার এই গল্প এখনকার দিনে হইলে "a case ef Somnambulism, pure and simple." বলিয়া অবজ্ঞাভরে খুব একদম হাসিয়া লইতাম, কিন্তু তখন ততটা বিজ্ঞতা জন্মে নাই। বিশেষতঃ, ঠাকুরমার ভূত, প্রেত, শাঁখিনী ও ডাকিনীদের গল্পগুলি তখন মনের মধ্যে সজীবভাবে অঙ্কিত ছিল, তখন বাড়ীর পাশে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের প্রচুরশাখাপত্রসমাচ্ছন্ন ডালের ভিতর প্রসারিতমস্তক, বিকটদশন এবং সুদীর্ঘলাঙ্গূল 'লেজ-ঝোলার' বিভীবিকাপূর্ণ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িতাম, এবং সেই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারস্তূপের মধ্যে শত শত জোনাকি পোকা মিটমিট করিয়া জ্বলিয়া শান্ত রশ্মি বিস্তার করিলে মনে হইত, তাহা উক্ত বিকটাকার প্রাণীরই শতস্তিমিত চক্ষু।

অতএব দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহির হই কি না ভাবিতেছি, এমন সময় ডাকের উপর ডাক পড়িয়া সন্দেহ মিটাইয়া দিল। চারি বন্ধুতে মিলিয়া ত্রস্তপদে যখন আমরা গ্রাম্যপথে বাহির হইলাম, তখন পূর্ব্ব দিক ঈষৎ লোহিতাভ হইয়াছে মাত্র। সেই লোহিতাভার নীচে বহু দূরে অসংখ্য বৃহৎ বৃক্ষের

কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, পূর্ব্ব গগনের অনেক উচ্চে লক্ষ কোটী ক্রোশ দূর হইতে একটি অতি উজ্জ্বল বৃহৎ নক্ষত্র ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং কৃষ্ণপক্ষের স্নিগ্ধ পাণ্ডুর চন্দ্রকলা পশ্চিম গগনপ্রান্ত হইতে অতি ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। রাত্রি অবসানপ্রায়, সুতরাং নক্ষত্রবিরল আকাশে প্রচুর ব্যবধানে যদিও দুই চারিটি তারকা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তাহারা ম্লান, দীপ্তিহীন; যেন তাহাদের দীর্ঘজাগরণক্লান্ত চক্ষু তন্দ্রাভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, এবং আর একটু পরেই তাহারা উষার আলোকলেখালাঞ্ছিত নীল বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে।

পথের দুই দিকে খর্জ্জুরবন। ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য খেজুর গাছ সোজা দাঁড়াইয়া আছে, কচিৎ দুই একটা হেলিয়া পড়িয়াছে, গলদেশে ঠিলি বাঁধা, যাহাতে ঠিলিগুলা নড়িয়া চড়িয়া না যায়, এ জন্য গাছিরা খেজুরের 'ডেগড়ো' টানিয়া তাহা দিয়া ঠিলিগুলি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গাছগুলির আগা গোড়া রসলিপ্ত, 'গাছি'দিগের বঙ্কিম তীক্ষ্মাস্ত্রের ক্ষতচিহ্নে পূর্ণ, ক্ষতস্থান শুকাইয়া বহুদিনের রৌদ্রে ফাটিয়া গিয়াছে; প্রত্যেক গাছে এই রকম বিশ পঁচিশটা ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে, বিশ পঁচিশ বৎসরের অতীত ইতিহাস তাহাদের সহিত সন্নিবদ্ধ; সে সকল স্থান শুকাইয়া কালো কাঠে পরিণত হইয়াছে, এবং শীতকালের দীর্ঘ রাত্রিতে কখন যে সেখান হইতে অবিরলধারায় স্নিগ্ধ মধুর রস উৎসারিত হইত, প্রভাতকালে শালিক, বুলবুল, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর দল যে তাহাদের রসসিক্ত নলির মুখে বসিয়া আকণ্ঠ রসপান পূর্ব্বক তৃপ্তমনে গান করিতে করিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া যাইত, এবং রাখালেরা খোলা মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া বাঁশের লম্বা লম্বা চোঙ্গা টাঙ্গাইয়া সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত ফেনময় রস সংগ্রহ করিত, সে কথা এই সকল শুষ্ক চিহ্ন দেখিয়া একবারও বিশ্বাস করা যায় না। ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা পলিতকেশা জরাজীর্ণা বিবর্ণা বৃদ্ধাকে দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না যে, এক সময় তাহারই রূপ মানবের আরাধনার বস্তু ছিল, তাহার ঐ শোণের নুড়ির মত কয়েক গাছি কেশ এক সময় মদনের সুদীর্ঘ নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলের মহিমাপূর্ণ শরাসন ছিল, এবং ঐ কোটরগত, শোভাহীন, নিষ্প্রভ চক্ষু একদা অপ্সরাদের কুহকমদিরায় পরিপূর্ণ থাকিত।

লাম। তখন বাজারের সমস্ত দোকান ঝাঁপে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া সুষুপ্তি-মগ্ন ছিল। শুধু অদূরবর্ত্তী মস্‌জিদ-সমাগত মুসলমান উপাসকবর্গের সমবেত কণ্ঠস্বর হইতে আজানের যে গম্ভীর গাথা উত্থিত হইতেছিল, তাহাই চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও সূর্য্য উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। নদীতীরে বহুকালের প্রাচীন এক শিবমন্দির, মন্দিরে প্রাত্যহিক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান, এক সময়ে তাহা জনৈক বিলাসী জমিদারের বিলাসকানন ছিল, এখন তাহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেখানে নানারকম ফুল ফুটিয়া থাকে। দেখিলাম, সেই প্রভাতে মুণ্ডিতমস্তক দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত নামাবলীতে আচ্ছাদিতদেহ বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় বামহস্তে একটি ফুলের সাজি এবং দক্ষিণহস্তে একখানি অনতিদীর্ঘ 'নগি' লইয়া পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। একটা বকফুলের গাছে একটু উঁচুতে থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছিল, বাচস্পতি গম্ভীর স্বরে সুর করিয়া স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে সাজিটি জাফ্রির বেড়ার উপর রাখিয়া, বকফুলের একটা থোকায় 'নগা'খানা বাধাইয়া দিলেন, আমাদের একটি বন্ধু কৌতুকভরে বলিল, "কি দাদাঠাকুর, গাছে উঠে না পাড়লে পড়া ফুলে কি পূজা হয়?" দাদাঠাকুর এত সকালে আমাদিগকে এ রকম স্থানে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তাহার পর শ্যালক সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "তোদের এখন রক্তের জোর আছে, গাছে উঠ্‌তে পারিস, আমি বুড়ো মানুষ, সে ক্ষমতা নেই—তাই বলে কি মা সিদ্ধেশ্বরী আমার ফুলে পূজা নেবেন না; যা হোক্, তোরা এত সকালে যাচ্ছিস্ কোথা?"—আমরা উত্তর দিলাম, "ত্রিহট্টে মেলা দেখতে।"

আজ ১লা মাঘ; অনেকেই মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীর জন্য ভাবনা নাই। নফর মাঝি পয়সার লোভে এই দারুণ শীতের মধ্যে শেষরাত্রি হইতে সর্ব্বশরীরে কাঁথা জড়াইয়া নৌকা ঠেলিবার 'নগা' গাছটা হাতে লইয়া বসিয়া আছে; নিকটে একটা মোটা পোয়ালের মশালে আগুণ রাখা হইয়াছে, এবং তাহার সাহায্যে মধ্যে মধ্যে তামাক খাওয়া হইতেছে। প্রত্যেক লোকের কাছে সে এক পয়সা হিসাবে পারাণী আদায় করিতেছে; আমাদের পয়সা দিতে হইল না; কারণ, গ্রামের লোককে পার হইবার সময় পারাণী দিতে হয় না, মাঝি প্রত্যেক গৃহস্থের কাছে পূজার সময় বকশিস্ লয়; তাহা ভিন্ন বিবাহ কিংবা অন্য কোনও উৎসব উপলক্ষে পয়সা কড়ি, চাউল ডাল প্রভৃতি

জলপান পায়, এবং পূজার সময় ধুতি চাদর ও নারিকেলও অনেক বাড়ীতে বরাদ্দ আছে।

নদী পার হইয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া উত্তরপশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলাম। শিবমন্দিরের উচ্চ চূড়া প্রভাতসূর্য্যের কনককান্তিতে উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ; কত মাঠ, কত শিশির-সিক্ত আইরি বন, দীর্ঘশীর্ষ গোধূমের ক্ষেত্র, আম কাঁঠালের বাগান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিয়া, বেলা আট্‌টার পর ত্রিহট্টে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ত্রিহট্টের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, বালক বালিকা পর্য্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সকলেই মূল্যবান রঙ্গ বেরঙ্গের বস্ত্রে সুসজ্জিত, অনেকে জানুর উপর কাপড় তুলিয়া কোমরে চাদর বাধিয়া কাঁধে লাঠি লইয়া চলিয়াছে ; পথের ধূলিতে তাহাদিগের জানু পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রমণীগণ চিত্র বিচিত্র কাপড় পরিয়া কোন বর্ষীয়সী রমণীর অনুগমন করিতেছে ;—তাহার পায়ে বাঁকমল, কপালে উল্‌কী, সিঁথিতে সিন্দুরের স্থূল রেখা, কেশরাশি মোটা দড়ির গোছা দিয়া মাথার উপরে উঁচু করিয়া বাঁধা ; কাহারও নাকে প্রকাণ্ড এক নথ, কানে পাশা, কাহারও নাকে নাকছাবি, হাতে রূপার অতিবিস্তীর্ণ খাড়ু। চাষার ছেলেরা অসমানভাবে কখন দ্রুত, কখন অতি মন্থর গতিতে চলিয়াছে, কেহ হুঁকা টানিতে টানিতে যাইতেছে, কেহ হুঁকার অভাবে নিকটবর্ত্তী কলা বাগান হইতে একটা কলার 'ডেগড়ো' কাটিয়া হুঁকার অভাব মোচন করিতেছে, মাথায় চেরা সিঁথি, দীর্ঘ চুলগুলি কাঁকুই দিয়া আঁচড়াইয়া ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিয়াছে, ত্রস্ত পদসঞ্চালনে 'বাব্‌রিকাটা' কেশগুচ্ছ নাচিয়া উঠিতেছে।

মাঠের মধ্যে কৃষ্ণরায়ের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটি অনেক কালের, তাহার চারি দিকে প্রশস্ত প্রাচীর, অনেক স্থান জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দ্বারপ্রান্তে একটি অতি বৃহৎ তমালগাছ, যেন দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন বৃন্দাবনের মধুর প্রেমকাহিনী এখনও ভুলিতে না পারিয়া তমাল গাছটিকেও এখানে পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। জানি না, এখানে এই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কোন প্রেমবিহ্বলা, অভিমানিনী গোপাঙ্গনা তাহার সহচরীবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল কি না—

"সখি, প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে,
ভাসা'ও না যমুনা-সলিলে,

তুলসিদাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে,
লিখিয়ে তাহায় হরিনাম,
বাঁধিয়ে রেখো, সখি, তমালের ডালে।"

তুলসীগাছও যথেষ্ট আছে, এবং নদীও দূরে নহে, কিন্তু রাধিকার এ আশা সফল হয় নাই ; সে কথা আমরা পরে বলিব।

কৃষ্ণরায়ের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। প্রস্তরনির্ম্মিত দেহ অতিমসৃণ, এবং সুকৌশলে চিত্রিত। মস্তকে শিখিপুচ্ছ মোহনচূড়া এবং হাতের বাঁশি সোনা দিয়া বাঁধান, পরিধানে পীতাম্বর, করতল এবং পদারবিন্দ হিঙ্গুল-রাগরঞ্জিত, প্রশান্ত চক্ষে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাঁকাভাবটুকু দূর হয় নাই ; মুখের ভাব অতি সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ, দেখিলে এই প্রতিমার চিত্রকরকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না ;—যে ব্যক্তি এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যানুভূতিকে একত্র সঞ্চিত করিয়া এই প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে একটা মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বৃদ্ধ পুরোহিত, তাহার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র—কৃষ্ণরায়ের প্রণামী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। প্রায় পনের দিন পর্য্যন্ত এই মেলা থাকিবে ; এ কয়েক দিন পূজার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, যে যখন পূজা দিতে আসিতেছে, পুরোহিত তখনই পূজায় বসিতেছেন। পূজা শেষ হইলে উপাসকমণ্ডলী সাষ্টাঙ্গে দেবচরণে প্রণাম করিতেছে, পুরোহিত তাহাদিগের গলায় কলার 'ছোতড়ায়' গাঁথা পুষ্পবিরল এক এক গাছি মালা পরাইয়া দিতেছেন, তাহারা দেবতার যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে। উপহারদ্রব্যের সীমা নাই, শত শত লোক 'খাবরে' 'ভাঁড়' ঘটিতে করিয়া দুধ লইয়া গিয়াছে, সেই দুধে বড় বড় জালা ভরিয়া উঠিয়াছে। এক এক দিন কৃষ্ণরায় দুধ এবং গঙ্গাজলে স্নান করেন। নারিকেল, ইঁচড়, পেঁপে, বেল, পেয়ারা, ডালিম, এমন কি শিম, বেগুণ, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরকারীও পর্য্যাপ্তপরিমাণে জমা হইয়াছে—যাহার গাছের যে কলাটি ভাল ও বড়, যে যে জিনিসটি কৃষ্ণরায়ের নামে রাখিয়াছে, এখন সেইটিই তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছে ; এত সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট ফল কখনও বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায় না। বিভিন্নজাতীয় এত রকম ফলের আমদানী দেখিয়া এই উৎসবকে কাহারও কাহারও কৃষিপ্রদর্শনী বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। এই মেলার কয় দিন পুরোহিতেরা যে দক্ষিণা পায়, এবং ঠাকুরকে যে সকল জিনিস উপহার দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের সংবৎসরের খরচের পক্ষে যথেষ্ট।

কৃষ্ণরায় কত দিনের প্রতিমা, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সম্পত্তি ; যাহাতে সংবৎসর বিগ্রহের সেবা চলিতে পারে, সে জন্য কৃষ্ণনগরের রাজসরকার হইতে দেবত্র সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণরায় সমস্ত বৎসর এখানেই বাস করিতেন, কেবল বৎসর বৎসর বারো দোলের সময় অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় তাঁহাকেও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে লইয়া যাওয়া হইত ; সেখানে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া পুরোহিতরূপী বাহকদিগের স্কন্ধে তিনি আবার স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ-নগরের বর্ত্তমান মহারাজের আমলে এই নিয়ম লোপ পাইয়াছে ; এখন কৃষ্ণ-রায়ের উপর পুরোহিতবর্গের কোনও অধিকার নাই। কৃষ্ণরায় বৎসরের অধি-কাংশ সময়ই কৃষ্ণনগরে থাকিতে বাধ্য হন ; মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ হইলে তিনি উত্তরায়ণ মেলার সময় কৃষ্ণরায়কে কয়েক দিনের জন্য ত্রিহট্টে পাঠা-ইয়া থাকেন ; কিন্তু শুনিয়াছি, সকল বৎসর পুরোহিতদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।

কৃষ্ণরায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই, এবং সকলগুলিই সমান বিশ্বাসযোগ্য। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে এই অঞ্চলের এক জন লোক নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার ফলে সে নারায়ণের প্রস্তরমূর্ত্তি মাটীর নীচে প্রোথিত আছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পায় ; অনন্তর এই মূর্ত্তি তুলিয়া তাহা উপযুক্ত চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে কৃষ্ণরায় নিজের মহিমায় চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণের হৃদয় ও তাহাদিগের প্রদত্ত উপহার আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিগ্রহ কৃষ্ণনগর-রাজের পারিবারিক সম্পত্তি কিরূপে হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। হয় নদীয়া জেলার এই অংশ কৃষ্ণনগর রাজ-ষ্টেটের অংশ বলিয়া এরূপ হইয়াছে, না হয় কৃষ্ণরায় প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান মহারাজার কোনও ভক্তিমান্ পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরায় এখন ঠাকুরাণীহীন ; সাধারণ কথায় যাহাকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে, তাহাই ; কিন্তু লক্ষ্মীহীন হইয়াও তিনি স্বমহিমায় নিত্যভাবে বিরাজিত ; তাঁহার ঠাকুরাণীটি অনেক দিন হইল গত হইয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে একবার

মান, সুতরাং প্রভুর এলাকার বাহিরে, তিনি তাহাদিগকে কোনও শাস্তি দিতে পারিলেন না—কিন্তু পুরুষের রাগ কোথায় যাইবে? 'চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া' শুধু হিন্দুর পক্ষে খাটে না, হিন্দুর দেবতার নিকটও এ কথাটা সঙ্গত; মুসলমানেরা ঠাকুরাণীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অপবিত্রজ্ঞানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, ঠাকুরাণী মনোদুঃখে তদবধি মন্দিরের অদূরবর্ত্তী দিঘীতে আশ্রয় লইয়াছেন; তাহার পর ঠাকুর আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই; পাত্রীর অভাবে অথবা সেবাইতের অমনোযোগে, ঠিক বলা যায় না।

মন্দিরের সন্নিকটেই মেলা বসিয়াছে। দুই ধারে সারি সারি অনেক দোকান, মধ্যে সরু রাস্তা; ভিন্ন ভিন্ন দোকানের জিনিস বিভিন্ন দিকে। দোকানগুলি অস্থায়িভাবে নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাতে এমন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, যাহাতে মাঘের হিমে দোকানদারগণ কোনও কষ্ট না পায়। মনিহারী জিনিসের দোকানই বেশী, তাহাতে নূতন পঞ্জিকা হইতে রামরাজা-মার্কা তাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতির ছবি, নানারকম কাচের জিনিস, খেলেনা, কাঠের ও টিনের হাতবাক্স, তোরঙ্গ, লোহার কড়াই, হাতা বেড়ি, খাঁচা, এমন কি, রঙ্গ বেরঙ্গের কম্ফর্টার, ছেলেদের উলের টুপি, মোজা, দেশলায়ের বাক্স, কিছুরই অভাব নাই। যাত্রীরা দোকানের সম্মুখে অনেকে একত্র দাঁড়াইয়া নিজের পছন্দমত জিনিস দর করিতেছে; বৃদ্ধারা ছোট ছোট নাতি নাতিনীদিগের জন্য কাঠের ঘোড়া, মানুষ, মাটীর ছোট ছোট পুতুল কিনিতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

মনিহারী দোকানের পর নানারকমের দোকান। বাসনের দোকানে রাশি রাশি বাসন বিক্রয় হইতেছে, বড় বড় ঘড়ার উপরে পরাত থালা প্রভৃতি রাখিয়া তাহাতে নানারকম বাসন সাজান হইয়াছে; একটা দোকানে পুরাণো লণ্ঠন এবং ভাঙ্গা পোর্টম্যাণ্টো মেরামত হইতেছে, শুধু টিন এবং কাচের কারখানা। দোকানদার কিরূপ কৌশলে কাচ কাটিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য অনেকে আগ্রহের সহিত দোকানের চারি দিকে জমিয়া গিয়াছে।

একটা দোকানে শুধু বাঁশের বাঁশি; ছেলেরা বাঁশী পছন্দ করিতেছে; সেখান হইতে শুধু চোঁ বোঁ পোঁ শব্দ উঠিতেছে, দোকানদার একটা লম্বা বাঁশি আড় করিয়া ধরিয়া তাহার সাতটা ছিদ্রে দ্রুত অঙ্গুলি বিক্ষেপ করিয়া গ্রীবাভঙ্গীপূর্ব্বক ক্রমাগত বাজাইয়া যাইতেছে; তাহার গলার শিরা ফুলিয়া উঠিতেছে, দম

আটকাইবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু বিরাম নাই। বাঁশির সুরে আকৃষ্ট হইয়া অনেক চাষকর্ম্মনিরত কৃষকযুবকও বাঁশি কিনিবার উমেদারিতে রাশীকৃত বাঁশি ওলট পালট করিতেছে, কিন্তু ঠিক মনের মতটি যুটিতেছে না। এদিকে দোকানদারও ছাড়িবার পাত্র নহে, ক্রেতার কোনটা পছন্দ না হইলেই সে সেই বাঁশিটা হাতে লইয়া তাহা বাজাইয়া, দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, এমন বাঁশি আর নাই, এত উৎকৃষ্ট আওয়াজ এই একটিতেই সম্ভবে। স্ত্রীলোকদের দল ঘোমটা টানিয়া তফাৎ দিয়া সরিয়া যাইতেছে; বৃন্দাবনে একটা বাঁশের বাঁশিতে অনেক দিন আগে একটা দারুণ অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাই এতগুলি বাঁশি একত্র দেখিলে মনে বড় আতঙ্ক হয়! ঠিক জানি না, এই অগণ্য যাত্রী-দিগের মধ্যে বাঁশের বাঁশি শুনিয়া নূতন করিয়া কাহারও মনে উদয় হইয়াছিল কি না :—

> "যে দেশে বাঁশির ঘর সে দেশে না যাব,
> ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসা'ব।"

ময়রাপটীতে সারি সারি সন্দেশের দোকানগুলাতেও ক্রেতার সংখ্যা অল্প নয়। জুতাপটী একটু তফাতে। সেখানে নানারকমের জুতা বিক্রয় হইতেছে, 'নাগরা' জুতার খদ্দেরই অধিক। দুই তিনখানা 'বটতলার' বহির দোকানে অনেক 'খুঁট-আখুরে' ক্রেতা জড় হইয়াছে; কেহ "এবার পূজায় বাঁচা ভার, বৌ চেয়েছে চন্দ্রহার," কেহ "হায়রে মজার শনিবার" প্রভৃতি চটি বহির কদর্য্য রসিকতাপূর্ণ ছত্রগুলি বানান করিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বত্র ভাবগ্রহ হইতেছে না, কিন্তু তাহাতেই যে রস পাইতেছে, তাহা তাহাদের সন্তোষের পক্ষে অনেক অতিরিক্ত; তাহা পড়িয়াই মুখবিবরে হাস্য আবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এবং পুস্তকের সম্মুখ পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে ছয় আনা দাম লেখা থাকিলেও তাহা নগদ দুই পয়সা মূল্যে কিনিতে পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাভবান্ মনে করিতেছে।

একটু তফাতে একটা যায়গায় ছোট ছোট টোঙ্গ তুলিয়া কয়েক জন বেদে খেলা দেখাইবার জন্য আড্ডা গাড়িয়াছে; তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি ছোট বড় ঝুড়িতে নানারকমের সাপ, দুইটি বৃহৎ ছাগল, দুইটি বানর এবং একটা ভালুক, ভালুকটির মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জ্বর আসিতেছে, আর সে উবু হইয়া পড়িয়া

বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, দ্বিতীয় বানরটি তাহার সঙ্গীর মস্তকের উকুন বাছিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। চারি দিকের এই জনতা এবং কলরবের প্রতি তাহার কিছুমাত্র খেয়াল নাই। ইহার একটু দূরে একটা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কুটীরের সম্মুখে একটা বৃহৎ নিশান উড়িতেছে; নিশানের নীচে একটা লাল-নীল রঙ্গের পর্দ্দার সম্মুখে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে,—"অতি অশ্চর্জ্জ ভেল্‌কি! ভানুমতীর হরেক রকম ভোজবাজি!! এক এক পয়সা!!!" এক জন লোক এই কুটীর-দ্বারে বসিয়া একটা খেলো হারমোনিয়ম্ বাজাইতেছে, আর একটা লোক—গায়ে একটা গঞ্জীফ্রক, গলায় নানা রঙ্গের বাহারে কম্ফর্টার জড়ান—ষাঁড়ের মত মোটা গলায় বিদ্যাসুন্দরের একটা টপ্পা গাহিয়া রসপিপাসু কৌতূহলাক্রান্ত পল্লীযুবকদিগের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। দলে দলে লোক দ্বার-প্রান্তে জমা হইতেছে, এবং সেখানে একটি পয়সা দর্শনী দিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভেল্‌কী দেখিতেছে; কিন্তু ভেল্‌কী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেরূপ ভাবখানা প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতে বেশী কিছু প্রকাশ পাই-তেছে না।

ক্রমে বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইল। যাত্রিদল কিছু ক্ষণের জন্য স্নানাহারের চেষ্টায় চলিল। মেলার কাছে যে দিঘী আছে, তাহাতে বেশী জল নাই। সেই জানুপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া অনেকে স্নান করিতেছে, এবং চিঁড়া-দৈয়ের ফলার ভিজাইয়া সেই দিঘীর পাড়ে বসিয়াই তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করি-তেছে। অনেকে গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী মধ্যাহ্নের মত আশ্রয় গ্রহণ করিল। দলে দলে লোক ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের হোটেলে বসিয়া তেল মাখিয়া তামাক টানিতে লাগিল। চন্ চন্ করিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্র পড়িতেছে। দূরে অনেকগুলি গরুর গাড়ী; সেই সকল গাড়ীতে যাত্রীরা বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলা দেখিতে আসিয়াছে, গাড়োয়ানেরা অশ্বত্থ গাছের নীচে তিউড়ি কাটিয়া ভাত রাঁধিতেছে; বলদ ও মহিষগুলি ধূলার উপর শরীর ঢালিয়া দিয়া জাওর কাটিতে কাটিতে পথশ্রম দূর করিতেছে। কিন্তু এই গভীর মধ্যাহ্নেও মেলার কাছে জনতার হ্রাস হয় নাই। এখনও জোড়া জোড়া চাষার ছেলে নাগরদোলার উপর বসিয়া মহানন্দে দুলিতেছে, এবং কাঠের ঘোড়াবিশিষ্ট এক রকম দোলায় বসিয়া সাত আটটি ছেলে ঘুরপাক খাওয়া একটা মস্ত আমোদজনক কাজ বলিয়া মনে করিতেছে। তাহারা শক্ত হইয়া

ঘুরাইতেছে। ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা কুমোরের দোকানে পাঁচ ছয়টা চাকা হাঁড়ি কিনিয়া সেগুলি লম্বা কাপড়ে সারি করিয়া বাঁধিয়া বেলা থাকিতেই গৃহমুখে ছুটিয়াছে, এবং চাষার ছেলেরা ও দূরগ্রামস্থ ভদ্রলোকের চাকরেরা চারি পাঁচ পয়সা মূল্যে এক এক আঁটি 'আখ' কিনিয়া কাঁধে তুলিয়া ঘরে ফিরিতেছে। কেহ বা এক আধখানা 'আখ' লুব্ধদন্তে ছুলিয়া তাহার রস উপভোগ করিতে করিতে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবল হিন্দু দেবদেবীর নিন্দাবাদপূর্ব্বক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের অভিপ্রায়ে রতনপুরের পাদরী সাহেব, টমাস্ বিশ্বাস, ডানিয়েল রাহা এবং সলোমন দাস প্রভৃতি খিঁচুড়ী-ভাবাপন্ননামবিশিষ্ট দেশীয় খৃষ্টানবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সকাল হইতে অতি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, আপাততঃ তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এখন তাঁহারা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু নেড়ানেড়ির দলের গানের আর বিরাম নাই। তাহারা দলে দলে কাঁথা পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে, পাশে প্রকাণ্ড ঝুলি, ময়লা কাপড়ের পুঁটুলী, গায়ে নানা রঙ্গের কাপড়ের বহুতালিবিশিষ্ট আলখেল্লা, সম্মুখে একখান কাপড় বিছান, গৌরপ্রেমে মগ্ন বাবাজিউদিগের প্রতি কৃপা করিয়া,—যাহার যাহা ইচ্ছা,—এই বিস্তৃত বস্ত্রখণ্ডের উপর দান করিয়া যাইতেছে। পাঁচ সাত জন স্ত্রীপুরুষ চক্রাকারে বসিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গান গাহিতেছে, পুরুষদের হাতে ময়লা লাল একরঙ্গাবেষ্টিত 'গাবগুবাগুব্'। তাহারা মাথা নাড়িয়া সুদীর্ঘ দাড়ীর নানারকম ভঙ্গী করিয়া একটা ছোট কাটী দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে পুনঃপুনঃ আঘাত করিতেছে, আর নাকে রসকলি কাটা, ভ্রূযুগলের মধ্যে বা অধরের নিম্নে উল্‌কী পরা, রৌপ্যবলয়বেষ্টিতপ্রকোষ্ঠা বৈষ্ণবীর দল খঞ্জনীতে মৃদুমন্দ আঘাত দিয়া তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠে চারি দিক ধ্বনিত করিয়া গাহিতেছে,—

> "ব্রজের শ্যাম ব্রজে চল দিনেক দুদিন তরে,
> বারেক দেখা দিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে এসো তুমি ফিরে,
> ধ'রে রাখবো না হে!—"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রতিশোধ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পূজার পর কার্ত্তিক মাসে গ্রামে গ্রামে ঊষাসংকীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। ঘনবরষার অবসানে কুমুদকহ্লারভূষিতা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি শারদ কৌমুদীতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রকৃতি মাতৃরূপা, তাহাই শরতে মা ব্রহ্মময়ীর উৎসব। তার পর সেই মাতৃভক্তি ধীরে ধীরে স্নেহ প্রেমে পরিণত হইতেছে। বঙ্গসন্তান বিশ্বকারণের শরৎসুন্দরী মাতৃমূর্ত্তি সসম্ভ্রমে দূরে রাখিয়া, ভক্তির আপেক্ষিক ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, আবার তাঁহাকে আবাহন করিতেছে— এস বৎস, এস সখে, এস হে প্রাণবল্লভ! এই যে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কালে পল্লীতে পল্লীতে প্রভাতবায়ু সংকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বাৎসল্য, সখ্য মধুররসে সুধাসিক্ত হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসন্তানের মানসিক ইতিহাসে যথার্থই কি ইহা অর্থহীন?

ইহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, কার্ত্তিকমাস প্রধানতঃ যে বৈষ্ণব-উৎসবময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান মদক সে জন্য সম্প্রতি কিছু বেশী মাত্রায় ব্যস্ত। প্রত্যূষে উঠিয়া খঞ্জনী হস্তে গ্রামে গ্রামে ঊষাসংকীর্ত্তন তাহার প্রধান কাজ হইয়াছে।

বাগ্দেবীর খালের ধারে হোড়ঙ্গের নিবিড় বনের ভিতর, যেথায় বিশ্বনাথের আড্ডা, সহসা একদিন প্রভাতে সেথায় ভগবানের মধুরকণ্ঠ শুনা গেল। বালসূর্য্যের হেমাভ কিরণরাশি বহির্দ্বারসমীপস্থ প্রকাণ্ড বকুল গাছের ঘনপল্লবে সবে মাত্র আসিয়া পড়িয়াছে, অঙ্গনের কুসুমবর্ষী শেফালিকা তরু এখনও মূলদেশে বিন্যস্ত শিশিরসিক্ত ফুলশয্যার উপর অতি সন্তর্পণে কখন একটি ফুল ফেলিতেছে। গৃহপশ্চাতে প্রকাণ্ড তিন্তিড়ীবৃক্ষশাখায় শাখামৃগের দল ভোজনে বসিয়া গিয়াছে—তাহাদের পূর্ণোদর শাবকগুলি শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া পড়িতেছে। ক্বচিৎ হরিয়াল ঘুঘুর দল লঘুপক্ষ শব্দিত করিয়া পাইকড় গাছ হইতে বট গাছের ঘনপত্রমধ্যে আত্মগোপন করিতেছে। বিশ্বনাথের সেই আরণ্যদুর্গ সহসা জনসমাগমশূন্য বলিয়া মনে হইতেছিল। বাস্তবিকও তথায় সম্প্রতি এক ব্রাহ্মণসন্তান ছাড়া আর কেহ ছিল না।

বিনোদবিহারী বন্দিভাবে এই নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলেন। গৃহের

সর্ব্বত্র তাঁহার অবারিত গতি, কিন্তু তাহার বাহিরে এক পদও যাইবার অনুমতি ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বিনোদ গায়ত্রী জপিতে বসিয়া গিয়াছেন। বিপদের দিনে তন্ময় হইয়া বিপত্তিহারী শ্রীমধুসূদনের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছিলেন। আগে আর কথন জীবনে এমন একাগ্রচিত্ততা সংগ্রহ করিয়া ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে জানিতেন না। ভগবান গায়িতেছিল,—

সুখের দিনে তোমারে ডাকি
পরাণ মন ভরে না।
দুখের দিনে আপনা ভুলে
করি তোমারে কামনা।
এ কি ভূমানন্দ, এ কি অপরূপ,
দুঃখে হরি এ কি ছলনা।
দুখ পেয়ে যদি এই পরিণাম
সুখে কেন আর বাসনা?

উৎকর্ণ হইয়া বিনোদ কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তথনকার মনের অবস্থায় সেই সুরময়ী আত্ম-কথা দৈববাণীবৎ ধ্বনিত হইতেছিল। এমন মোহ জীবনে তিনি আর কথন অনুভব করেন নাই। আপন ভুলিয়া, স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া, বিনোদবিহারী গায়কের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

এতক্ষণে ভগবান দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। চেনামুখ দেখিয়া বিনোদ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, কিন্তু গায়ককে সহসা চিনিতে পারিলেন না। ভগবান তাহা বুঝিল। গান সমাপ্ত করিয়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। হাসিয়া বলিল, "দেবতার এই আশ্রম? বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, হরিনাম করার জায়গা বটে! ঠাকুর! আমায় চিন্‌তে পার কি?"

তথন আর ভ্রম রহিল না। গোবরডাঙ্গার হাটের সেই উদার মিষ্টান্নদাতাকে মুখোপাধ্যায় একটু একটু করিয়া চিনিয়া ফেলিলেন। নামটি মনে ছিল না, কিন্তু তাতে মদকপুত্রের সম্বোধন কথন বাধে না। মহাকৌতূহলী হইয়া বিনোদ হাঁকিলেন, "ময়রার পো, এ বেশে তুমি এখানে?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান কহিল, "ঠাকুর, আমার কেই বা আছে? একটা মেয়ে বই ত নয়।

এই কথার সুরে ব্যঙ্গ যতটা মিশ্রিত ছিল, কৌতূহল ততটা ছিল না। কিন্তু বিনোদ ব্যঙ্গ বুঝিলেন না। আট দশ দিনের নির্জ্জন বন্দিজীবন ভোগের পর সহসা এক জন পরিচিত লোকের দেখা পাইয়াছেন, মনটা স্বতঃই সহানুভূতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি সংক্ষেপে আপনার বিপদের পরিচয় দিলেন, এবং তাঁহার অনুমানে বিশ্বনাথই যে তাহার মূল, ইহাও নবাগত পুরাতন বন্ধুকে বিশ্বস্তভাবে জানাইতে ভুলিলেন না। কিন্তু গোড়ার কথা কিছু বড় বলিলেন না, বিশ্বনাথের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ভগবান মনে মনে হাসিল। গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুধাইল, টাকা কড়ি বেশী কিছু সঙ্গে ছিল কি না?

বিনোদ মাথা নাড়িলেন।—"না।"

ভগবান। তবে এ কি রকম হলো ঠাকুর? বিশে ডাকাত নিরীহ বামুনকে কষ্ট দেবার লোক ত নয়। ঠাকুর আপুনি ভুল বুঝেচো। বিশে ডাকাতের এ কাজ নয়। আর সে তোমায় এমন বন্ধ করে রাখ্‌বে কেন? কারু সঙ্গে বুঝি তোমার শত্রুতা আছে ঠাকুর? শত্তুরের এ কাজ।

বিনোদ ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন, "এমন শত্রুতা আমার কখন কারু সঙ্গে নেই ময়রার পো! গরিব ব্রাহ্মণ আমি, ভিক্ষা করে সংসার চালাই, বিঘে কতক ব্রহ্মোত্তর মাত্তর পুঁজি। কারু সঙ্গে বিবাদ করি নে—কেনই বা করব?"

ভগবান শূন্যে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "কখন কি কারু মনে কষ্ট দাও নি ঠাকুর? কটু কথা বলে হোক, গাল মন্দ দিয়ে হোক, কারু প্রাণে কখন কি ব্যাথা দাও নি?"

এবারে বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন। কেন না, সেই প্রত্যাখ্যানের রাত্রি হইতে মর্ম্মপীড়িতা বালিকার শেষ কথা শেলবৎ তাঁর হৃদয়ে বাজিতেছিল। যখন তখন মানস-নেত্রে তিনি সরলার সে অভিমানিনী সিংহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, দৈববাণীবৎ যখন তখন শ্রুতিপথে ধ্বনিত হইত—"এই স্বামী, এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা!" বিনোদ মুখ নত করিলেন, ভগবানের দিকে চাহিতে পারিলেন না। তাঁর মনে হইতেছিল, লোকটা তাঁহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছে।

মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে। তা ত করনি ঠাকুর? সতী সাধ্বীর ত কোন অপমান করনি?"

বিনোদ লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত যে দৈন্য, তার সঙ্গে খানিকটা সামাজিকতা জড়িত আছে। কিন্তু হৃদয়ের দৈন্য নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার, একবার অনুভূত হইলে মানুষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অনেক ক্ষণ বিনোদ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে সহসা ভগবানের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি মানুষ না কোন দেবতা, আমায় ছলিতে এসেছো?"

ভগবান মৃদু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। তখন বিনোদ আপনা হইতে বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের আমূল বৃত্তান্ত বলিয়া গেল—কোন কথা লুকাইল না। শেষে বলিল, "ময়রার পো, আমার পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েচে, কিন্তু এখন ভাবি কি যে, যদি একবার কোন মতে তার দেখা পাই, সর্ব্বস্ব দিয়েও তার মনঃকষ্ট দূর করি। সত্যিই তুমি বলেচো, সতী সাধ্বীর অপমান করেই আমার এ দশা হয়েচে!"

ভগবান বুঝাইল, "ঠাকুর, এখানে তোমার কষ্টটা কি? কই, কয়েদের ত কিছুই দেখ্‌চি নে। বেশ নিরিবিলি একলা একলা আছ। কষ্ট কি ঠাকুর? সেবার কোন ত্রুটি হয় কি?"

বিনোদ। না, সে কষ্ট কিছু নেই। সেবার কথা যদি বল্‌লে, সে সম্বন্ধে রাজার হালে আছি, ময়রার পো। কিন্তু সোণার খাঁচায় পাখীর মতন—বাইরে এক পা বেরুতে পাইনে, কারু মুখ দেখতে পাইনে। ঐখেনে একটা সুড়ঙ্গ আছে, প্রাতে উঠে দেখি, যা কিছুর দরকার, সব কে রেখে গেছে। পায়ের শব্দও যে না পাই, তা নয়। কিন্তু কারু কথা শুন্‌তে পাই নে। সেই রাত্রে যারা এখানে আমায় রেখে গেল, তারা শাসিয়ে গেছে, এ বাড়ী ছাড়া এক পা গেলেই আমার মরণ নিশ্চয়। ভাই, কয়েদ আর কাকে বলে বল?"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে সেই সুড়ঙ্গের দিকে একটা উচ্চ হাস্য শুনা গেল। অমানুষ কণ্ঠে কেহ বলিল, "ইচ্ছা হয় বৈরাগীর সঙ্গে যাও, কিন্তু খবরদার, তাকে না বলে পালিও না, তা হলে প্রাণে বাঁচবে না।"

বিনোদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। করযোড়ে বলিলেন, "যে

ভগবান গাইতে গাইতে চলিল,

"তুয়া বঁধু পড়ে মনে, ধাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি।"

বিনোদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ব্যাপারটা তাঁহার নিতান্ত ভৌতিক রকমের বোধ হইতেছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে সামুয়েল ফেডি সাহেবের নীলকুঠী। তিনি বিবাহিত, এবং সস্ত্রীক সেখানে বাস করেন। বিস্তৃত নীল-ক্ষেত্র সকল নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া সাহেবের প্রবল প্রতাপ এবং ধনগৌরব সূচিত করিতেছে। মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট্ সাহেবের সঙ্গে ফেডি সাহেবের বড় সৌহার্দ্দ্য; কালীপূজার ছুটীতে দুই জনে শীকার খেলিতে বাহির হইয়াছেন। ফিরিয়া রাত্রে আজ্ রাজবাড়ীতে উভয়কে সস্ত্রীক ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে।

ফেডি সাহেব শীকারে গেলেন বটে, কিন্তু অন্য দিনের মত তেমন হৃষ্টচিত্তে পশু পক্ষীর শোণিতদর্শনজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রভাতে কলিকাতা হইতে টাকার চালান আসার পরই তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে, দস্যুসঙ্কুল দেশে ধনরক্ষার উপযোগী কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ইলিয়ট্ মাঝে মাঝে ফেডির অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করিলেন, এবং শেষে তাহার কারণ শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। "নন্‌সেনস্ ফেডি, ইংরেজ রাজ্যের ভিত্তি কি এতটা দৃঢ় নয় যে, একজন ইংরেজের কুঠী নেটীভদের বুকে ভয় সঞ্চার করবে না? বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের কাছারীর এক মাইলের মধ্যে?" ফেডি সাহেব শুষ্ক হাস্য করিয়া লজ্জিত হইলেন।

অতএব কলিকাতা হইতে যে কয় জন তেলেগু সিপাহী টাকার চালান আনিয়াছিল, কুঠীর ধনাগার তাহাদের জিম্মায় রহিল। আর কোন ব্যবস্থা করা হইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীতে কালীপূজার ভোজ খাইয়া সস্ত্রীক কুঠীতে ফিরিতে ফেডি সাহেবের রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল। কার্ত্তিকী অমাবস্যার ঘোর তিমির ভেদ

ছিল, সাহেব তখন মুহুর্মুহু চারি দিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। দেখিয়া মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেডি কতকটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, এবং হৃদয়ভাগিনীকে মনের কথা খুলিয়া বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে ভাবিয়াই, তাহা করিলেন না। ইহার একটু কারণও ছিল। ভোজন-টেবিলে বসিয়া ইলিয়ট্ সাহেব দস্যুভীতির ইঙ্গিতে তাঁহাকে একবার বিদ্রূপ করিয়া সমবেত মহিলা কয় জনের কলকণ্ঠে মধুর হাস্যরস উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন।

কুঠীতে পৌছিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না করিতে ফেডি সাহেব খাজনাঘরের দিকে একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনিলেন। সহসা আস্তাবলে একটা গোলযোগ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার মুক্তবন্ধন অশ্বচতুষ্টয় খুরশব্দে নদীতট কম্পিত করিয়া চকিতে কোথায় অন্তর্হিত হইল। ফেডি বুঝিলেন, তাহারা সুদক্ষ অশ্বারোহীর হাতে পড়িয়াছে।

এদিকে খাজনারক্ষক তেলেঙ্গু সিপাহীকে পিস্তলের গুলিতে হত করিয়া ডাকাতেরা বাকী লোকগুলাকে শয়নাবস্থাতেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। খাজানার ঘর নির্ব্বিবাদে লুণ্ঠিত হয় দেখিয়া, স্বয়ং ফেডি সাহেব অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, দ্বাররোধ করিয়া সশস্ত্র কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। নৈরাশ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া ফেডি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং শয়নাগারে ফিরিয়া গেলেন। ভরসা, একখানা কিরীচ সেখানে ঝুলিতেছিল।

মিসেস্ ফেডি আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া স্নানাগার হইতে একটা কালো হাঁড়ি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলোর অদূরে দীর্ঘিকার কাল জলে নীহারিকা-ছায়া স্পন্দিত হইতেছিল। অকস্মাৎ দীর্ঘিকার সে সুষুপ্তিশান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে মিসেস্ ফেডি মাথায় কালো হাঁড়ি আবৃত করিয়া সরোবরজলে প্রবেশ করিলেন।

ফেডি সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে না করিতে ৫।৭ জন লাঠিয়াল তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সাহেব তরবারি সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই দস্যুহস্তে বন্দী হইলেন। বাহিরের সেই সশস্ত্র পুরুষ তীক্ষ্নস্বরে বলিয়া উঠিল,—"সাহেবকে বেঁধে রাখ্, কিন্তু খবরদার! মেমসাহেবের ঘরে যাস্‌নে।" ফেডি বন্ধনদশায়—ডাকাতেরা পেছমোড়া করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—ঘাড় ফিরাইয়া বক্তাকে দেখিলেন; বলিলেন, "thanks! কে তুমি?"

বিস্তর টাকা তোমরা উপার্জ্জন কর। কিন্তু গরিবেরও মা বাপ আছে সাহেব! আমার ভাগ আমি নিতে এসেচি।"

সাহেব বলিলেন, "আমরা দেশের রাজা। যদি রাজাকে ভয় থাকে, এখনও এ দুষ্কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হও। আমার হুকুমও যা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমও তা। এখনও বল্‌চি পালাও।"

হো হো করিয়া ডাকাতেরা হাসিয়া উঠিল। হাসিল না কেবল বিশ্বনাথ। সাহেব হাঁকিলেন, "চুপ রও শূয়ার কি বাচ্চা!" খানকতক লাঠি প্রত্যুত্তরে তাঁহার পিঠে পড়ি-পড়ি করিতেছিল। বিশ্বনাথ মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। "খবরদার! বাঁধা মানুষকে মারিস্ নে।" ফেডিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সাহেব গালিগালাজ ক[illegible] আমি চল্লাম। প্রাণের যদি মায়া থাকে, লেঠেলগুলোকে কিছু বলো ন[illegible] [illegible]হেবের জন্য তোমার কোনও ভাবনা নেই সাহেব।"

তখন মেঘাকে মাত্র সাহেবের পাহ[illegible] রাখিয়া বিশ্বনাথ অন্য ডাকাতদের সে কক্ষ ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষরাত্রে বাগ্‌দেবীর খালের জঙ্গলে সদলে বিশ্বনাথ অপেক্ষা করিতেছিল। চারি দিকে দুরে দুরে আরণ্য অন্ধকার মধ্যে "ঘাটি" বসিয়া গিয়াছে;—বাছা বাছা সড়কিওয়ালা এবং লাঠিয়ালের দুর্জ্জয় দুর্গ। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে বসিয়া জন কয়েক কালীর পাইক সঙ্গে বিশ্বনাথ সোৎসুকে মেঘা ও তাহার সহচরদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বয়ং দলপতি লুণ্ঠিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া পূর্ব্বেই রওনা হইয়া আসিয়াছিল; বামাল নিরাপদ না জানিলে মেঘা নীলকুঠীর "ঘাটি" উঠাইবে না, ইহাই ভিতরের কথা। কিন্তু বিশ্বনাথ টাকাগুলোর কিনারা করিয়া সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলেও মেঘা আসিল না। এদিকে রাত্রিও বেশী ছিল না। উদ্বিগ্ন হইয়া দলপতি নীলকুঠীতে ফিরিবার সংকল্প করিতেছিল।

এমন সময়ে একখানা খাটুলি সঙ্গে সদলে মেঘা দেখা দিল। বিস্মিত বিশ্বনাথ আলোকসহায়ে দেখিল, বন্ধনদশায় ফেডি সাহেব তাহাতে শয়ান;—নাগপাশবদ্ধের মত অঙ্গমাত্রসঞ্চালনে অশক্ত। মহা বিরক্ত হইয়া দলপতি

আস্‌তে বলনি। আমিও ছেড়ে আসা ভাল মনে করিনি। এই কেউটের বাচ্চা ছেড়ে দিলে ক' দিন আমরা বাঁচব বল? আমার কাজ আমি করেছি, এখন তোমার যা ভাল মনে হয় কর।"

মেঘা এক পাশে গিয়া বসিল। তখন কালীর পাইকেরা একবাক্যে বলিল, "সাহেবটাকে মেরে ফেল। ওকে ছাড়লে একদিনও আমরা বাঁচব না।"

বিশ্বনাথ ধীরভাবে বলিল, "সাহেব মারিলে তোরা বাঁচবি, কি ছেড়ে দিলে বাঁচ্‌বি? একটু ভেবে কথা কোস্! সাহেব ঘাঁটিয়ে নবাব বাদসারা উচ্ছন্ন গেল—প্রাণে মেরে আমরা বাঁচব? কি ভুল! তা হবে না। ওর বাঁধনগুলো কেটে দে। তার পরে চোক বেঁধে দিয়ে সীমানা পার করে দিয়ে আয়।"

পাইকেরা চুপ করিয়া বসিয়া রহি[illegible]তির আদেশটা কাহারও ভাল লাগে নাই। মেঘা বলিল, "বিশু[illegible] কথা শুনে যদি বদেকে মেরে ফেল্‌তে, এত বিপদ হতো না। স[illegible] ছেড়ে দিলে যত বিপদ, মার্‌লে তার সিকিও নয়। নবাব বাদ[illegible] সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। আজ আমরা ডাকাত, কাল গেরস্ত চাষী। কে মার্‌লে ঠিকানা কি? তুমি দল নিয়ে চলে যাও, ও ভার আমার থাক্। এক ফোঁটা রক্তও আমি মাটীতে পড়তে দেব না।" মিতভাষী মেঘা দলের মধ্যে রক্তপিপাসুদের অগ্রগণ্য। কথা শেষ করিয়া সে কোষ হইতে তীক্ষ্ণধার তরবারি উন্মুক্ত করিল।

এই কথায় কালীর পাইকেরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "সাহেব-টাকে না মার যদি, আমাদিগকে মার। তোমার হাতে মরি সে ভাল, নইলে ফিরিঙ্গীগুলো যে ধরে ধরে ফাঁসি লট্‌কে দেবে, তা হবে না। তুমি মা-কালীর বরপুত্তুর, তোমার কে কি করবে? মর্‌তে কুকুর বিড়েলের মত আমরাই মরব। শেয়াল কুকুরেও এর পরে আমাদের দুঃখে কাঁদ্‌বে।" লোষ্ট্রা-হত মধুক্রমবৎ দস্যুদের অস্ফুট অসন্তোষবাক্যে বন শব্দিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ ইহাতে কিছু উদ্বিগ্ন হইল। সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। মেঘা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল,—বুঝিল, দলপতি ইতস্ততঃ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছে না। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মেঘা মুক্ত অসি হস্তে বন্দী ফেডি সাহেবের প্রতি ধাবিত হইল—আলোকসম্পাতে তীক্ষ্ণধার ফলক প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। ফেডি ডাকাতদের কথা শুনিতে বুঝিতে পারিতে-

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘার এই হঠকারিতার জন্য বিশ্বনাথ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং দার্ঢ্যবলে অনুদিন মা ভবানীর বরপুত্র বলিয়া দস্যুমহলে সে পরিচিত ছিল, এই মুহূর্ত্তে সহসা তাহা জয়যুক্ত হইয়া উঠিল। ফেড়ি সাহেবের আর্ত্তস্বর কর্ণগোচর হইতে না হইতে দস্যুপতি পার্শ্ববর্ত্তী দীর্ঘ যষ্টিখণ্ড সংগ্রহ করিল, এবং তাহাতে ভর দিয়া এক লাফে খাটুলির পার্শ্বে উপস্থিত হইল। মেঘার উদ্যত অসি সবেগে আসিয়া তাহার মাথার উপর পড়িল বটে, কিন্তু তাহা ঘূর্ণ্যমান লাঠিতে প্রহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে বিশ্বনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব্যর্থলক্ষ্য মেঘা অধোবদনে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

বিশ্বনাথ কোনও রাগ প্রকাশ করিল না। প্রশান্ত স্মিতমুখে কালীর পাইকদের ডাকিয়া বলিল, "সাধ থাকে আয়, এই শেষ দিন আমার তরওয়ালের বল পরীক্ষা কর্। আজ আমি এক দিকে, আর তোরা এই জঙ্গলে জমায়েৎ আছিস্ পাঁচ শ' জওয়ান এক দিকে! আমি এই সাহেবটার বাঁধন কেটে দিচ্চি, সাহস থাকে ত আয়, দেখি কে কি করতে পারিস একবার!" তখন বিশ্বনাথ ক্ষিপ্রহস্তে দৃঢ়সংকল্পে ফেড়িকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বসাইল।

নীরবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই দস্যুসেনা দলপতির আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। মশালের আলোকে বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বনাথের প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে অমানুষী নির্ভীকতা এবং দৈববল সূচিত করিতেছিল। সে মোহ,—যার মহিমায় মানুষ যথার্থ মহত্ত্বে দেবত্ব আরোপিত করিয়া প্রতিভার পদে আত্মসমর্পণ করে,—তাহাই আসিয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহোন্মুখ রোষচঞ্চল দস্যুদলে কুহক বিস্তার করিল। বিশ্বনাথ গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলিল,

"চুপ কর্‌লি কেন রে? এতক্ষণ ত ভারি গজ গজ লাগিয়েছিলি! আমার হুকুমে এতই যদি হতশ্রদ্ধা, তোরা এক সঙ্গে সবাই আমায় ছেড়ে যা। আমার 'যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন'। কথায় বলে,—'মরণের বাড়া গাল নেই', সেই মরণকে কখন ডরাই দেখেছিস্? যতক্ষণ মা কালী প্রসন্ন আছেন, বিশে এ

বিশ্বনাথ প্রতি কথায় শ্রোতাদের হৃদয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিতেছিল। কালীনাম শুনিবামাত্র বনস্থল কম্পিত করিয়া ডাকাতেরা একবাক্যে গাহিয়া উঠিল, "কালী মায়ী কি জয়! বিশ্বনাথ কি জয়!"

মেঘা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বিশু, তুমি এত অভিমান করবে, তা জান্‌তাম না। যা হোক্, আমার কসুর মাফ করো। তোমার নিমকে আমাদের শরীর, যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোমায় আমরা ছেড়ে যাব, এমন সন্দেহ করো না। সাহেবটাকে তোমার অজ্ঞাতে কেটে কুটে আমি আপদ চুকিয়ে দেবার ফিকিরে ছিলাম। এখনও তোমার মিনতি করচি, আমার কথা ভেবে দেখ! এই ফিরিঙ্গী-বাচ্চা ছাড়া পেলে, তোমার সর্ব্বনাশ হবে!"

বিশ্বনাথ একটু চিন্তিত হইল—কিন্তু সে নিমেষের জন্য। মেঘার কথার উত্তর না দিয়া ফেডিকে কহিল, "সাহেব, ভাগ্যে ভাগ্যে তুমি বেঁচে গেছো। পরমেশ্বর রাখ্‌লে মারে কে?" সাহেব কলের পুত্তলীর মত বিশ্বনাথকে ধন্যবাদ দিলেন।

দলপতি আবার বলিল, "সাহেব, দলের লোকেরা তোমায় ছাড়তে চায় না, কিন্তু আমি যখন বলেচি ছাড়ব, আমার কথা খেলাফ হবে না। আমি থাক্‌তে তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু একটি কড়ার কর্‌তে হচ্চে সাহেব। তোমায় পরমেশ্বর সাক্ষী কসম নিতে হবে, বাপ মা, ভাই বন্ধু, যে কেউ তোমার পেয়ারের জিনিস আছে, সব্বাইর কসম নিয়ে বল্‌তে হবে, আজকের এই ডাকাতি নিয়ে তুমি কোনও গোল করবে না, কখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট কি তার চেষ্টা কর্‌বে না।"

বিশ্বনাথের মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং সেই যমদূতের মত ডাকাতগুলোর উপর তাহার প্রভাব দেখিয়া ফেডি সাহেব বুঝিয়াছিলেন, তাহার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মুক্তির আশায় কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া তিনি মিশ্রিত হিন্দী বাঙ্গলায় বলিলেন, "কসম লইতে আমি প্রস্তুত আছি!"

মেঘা পরিষ্কার হিন্দীতে বলিল, "দলপতি, তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি, ফিরিঙ্গীর কসমে ইৎমাদ্‌ করো না! কোন্‌ ফিরিঙ্গী আজ্‌ পর্য্যন্ত কথা ঠিক্‌ রাখ্‌তে পেরেছে? পলাসীর লড়াইয়ের কথা কি ভুলে গেলে? শোননি কি যে, ক্লাইব সাহেব জাল করতেও পিছপাও হয় নি?"

বিশ্বনাথ মেঘার কথায় কর্ণপাত করিল না। ফেডিকে বলিল, "সাহেবদের

উপর বরাবর আমার বিশ্বাস আছে; বীরজাতি তোমরা, মিছে ঠকামি পেজোমি তোমাদের ভেতর নেই। কোথায় কোন একটা সাহেব কি মন্দ কাজ করেচে, তার জন্য ইংরেজ জেতের দোষ হ'তে পারে না। তাই জন্যে আজ্ পর্য্যন্ত আমি পারতপক্ষে তোমাদের শত্রুতা করি নি। তোমরা নীল-কুঠিয়ালরা কিন্তু গরিবের উপর বড় দৌরাত্ম্যি আরম্ভ করেচো, তোমার টাকায় আজ্ ভাগ বসালাম সাহেব। সে যা হোক্, বেশ ভেবে চিন্তে দেখ, প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারবে কি না। আমি যখন তোমায় অভয় দিয়েছি, ছেড়ে দেবই দেব, কসম নাও, আর না নাও।"

ফেড়ি নির্ভাবনায় বলিলেন, "কসম নিতে আমি এখুনি প্রস্তুত! বল কি বল্‌তে হবে।"

বিশ্বনাথ একবার মেঘার দিকে কোমল কটাক্ষ করিল। প্রভুভক্ত কুকু-রের মত সে মহা উদ্বেগে উন্মুখ হইয়া দলপতির প্রত্যেক বাক্য শুনিতেছিল। বিশ্বনাথ হিন্দীতে বলিল, "বল সাহেব, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের যে পরমেশ্বর, তাঁর কসম, তোমার পিতা মাতার কসম, আমাদের আজ্‌কের কাজের জন্তে তুমি কোনও মামলা মোকদ্দমা করবে না, কথনও আমাদের কোনও অনিষ্ট কি তার কামনা করবে না।"

ফেড়ি সাহেব একটি একটি করিয়া এই শপথের প্রত্যেক কথা পুনরুক্ত করিলেন। বিশ্বনাথ বলিল, "সাহেব তুমি মুক্ত হলে, কিন্তু একাকী এখন তোমায় যেতে দেওয়া ঠিক্ নয়। চল, আমি তোমায় বন পার করে দিয়ে আসি।"

মেঘা যুক্ত করে বলিল, "কিন্তু একটা কথা রাখ। সাহেবকে ছেড়েই যদি দিলে, ওর চোক বেঁধে দাও, আমি ওকে পৌঁছে দিই। আল্লার কসম! ওর গায়ে কাঁটার ছড়ও লাগতে দেব না। তুমি চোক খুলে ওকে পথ দেখিয়ে যেও না।"

বিশ্বনাথ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। স্নেহকোমলস্বরে বলিল, "মেঘু, মানুষকে অত অবিশ্বাস করতে নেই। সাহেব জাতটেকে তুই চিনিস্‌নে মেঘু। কিছু মনে করিস্ নে!"

তখন দলপতির সঙ্কেতবাক্যে বিচ্ছিন্ন ডাকাইত দল চকিতে সারি দিয়া

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ডাকাতির কয় দিন আগে ভগবান মাঠাকুরাণীদিগকে গঙ্গাতীরের নূতন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। মীরার ইচ্ছা ছিল, যথাবিধি গৃহপ্রতিষ্ঠার পর সেখানে বাস করেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন ভগবান দ্রব্যাদি নূতন গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া বসিল। মীরা ও সরলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিল, "মা, গঙ্গাতীরে আবার দিন ক্ষণ দেখা কি? এ ডাকাতের বাড়ী; বিশ্বনাথের শত্তুর বিস্তর, আমি সব সময় থাকিনে। কি জানি, কোম্পানির লোক কখন খানাতল্লাসী করতেই যদি এলো!" কাজেই মাঠাকুরাণীরা দ্বিরুক্তি করিলেন না। নূতন বাড়ীতে মীরা ও সরলা যোগাম্বর সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। ভগবান স্বরূপগঞ্জের আড্ডাতেই রহিল—সব দিন মাঠাকুরাণীদের দেখা দিতে পারিত না। পীতাম্বর ২।৪ দিন অন্তর দিদিকে দেখিয়া যাইত।

নীলকুঠির ডাকাতির দিন সন্ধ্যাকালে ভগবান আসিয়া মীরা ও সরলার সঙ্গে দেখা করিল। সরলা বড় লাজুক, ভগবানের মধুর চরিত্রগুণে তাহাকে ভক্তি ও স্নেহ যথেষ্ট করিত বটে, কিন্তু বুড়ো মানুষটো যে মা মা করিয়া অস্থির করে, সেটা ভারি জুলুমের কথা। "ভাল আছ মা?" বলিয়া ভগবান যখন প্রণাম করে, তখন মুখ নত করিয়া কোনরূপে সরলা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, "তুমি কেমন আছ?" তার পর ভগবান আরম্ভ করে, "দূরে পড়েছি বলে ভুলিস্‌নে মা, কই ছেলেকে কখন হাতে করে কিছু ত খেতে দিলিনে!" লজ্জায় সরলা কথা কহিতে পারে না, দিদির কাণে কাণে বলে, "ছেলেকে আজ্ না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না দিদি!"

সন্ধ্যার সাক্ষাৎকারে বড় মা এবং ছোট মাকে প্রণাম করার পর শেষোক্তাকে গৃহান্তরে পাঠান ভগবানের অভিপ্রেত। সে জন্য যোগাম্বরকে বহির্ব্বাটী হইতে সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছে। আজ খাওয়ার জন্য ভারি আবদার করায় মীরা ভগবানকে বলিল, "সরলা বলে, ছেলের খাওয়ার খোঁট্‌টা মিছিমিছি, কেবল লজ্জা দিতে। কই একদিও ত খান না। কারু হাতে বুঝি খান না?" সরলা মীরাকে টিপিল—"আজ কিছু না খাইয়ে কিছুতে ছেড়ো না দিদি!" ভগবান হাসিল। "কারু হাতে খাইনে বটে, কিন্তু তাই বলে কি মার হাতেও খাব না? আচ্ছা ছোট মা তুমি রাঁধ, খেয়ে আমি

এইখানে বলা আবশ্যক, বিনোদবিহারীর সংবাদ ভগবান সকলই জানিত বটে, কিন্তু আজ্ পর্য্যন্ত মীরাকেও সে কথা কিছু বলা হয় নাই। বিশ্বনাথের মতলব ছিল, দীর্ঘকাল বিনোদকে বন্দিভাবে রাখিয়া প্রত্যাখ্যাতা নির-পরাধা পত্নীর সহিত মিলিত করিবে। কিন্তু চারি দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সাধ বুঝি পূর্ণ হয় না। সেই জন্য বিশ্বনাথ "খুড়োর" হাতে সে ভার ন্যস্ত করিল। ভগবান আহ্লাদের সহিত ব্রতটি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু বিশুকে বলিল, "তুই কি ভাবচিস্, আমি নিরাপদে থাকব? আমি মনঃ-স্থির করে বসে আছি। তোর কি দলের আর কারুর খবর আমি প্রাণান্তে বলব না বটে, কিন্তু নিজের কথা কিছুই লুকোব না বিশু। আমায় যদি ধরে, পাপ লুকিয়ে রেখে এই বুড়ো বয়সে আমি বাঁচবার কোনও দরকার দেখ্‌চিনে।

এই সন্ধ্যাকালে মীরা ও যোগাম্বরের সঙ্গে ভগবানের যে কথোপকথন হইল, তাহা আমরা আপাততঃ গোপন রাখিব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শয়ন করিয়া মীরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে দিন সরলার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। দেখা হইলে সরলা মীরার প্রশ্নমতে স্বামীর প্রত্যাখ্যানের গল্প করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে এত সংক্ষেপে যে, বিনোদের প্রকৃত দুর্ব্যবহারের কোনও কথা তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। সরলা মীরাকে দিদি বলিত, কিন্তু মাতার সমবয়স্কা বলিয়া সকল বিষয়ে জননীর মত তাঁহাকে সমীহ করিত। কাজেই তাহার স্বামিগৃহের সবিশেষ সংবাদ এতদিন মীরার জানা ছিল না।

সন্ধ্যায় ভগবানের কাছে আসল কথা শুনিতে পাইয়া মীরা বড় মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়াছিলেন। বালিকার নিতান্ত শিশুর মত সরলতা, লজ্জাবতী লতার মত তার সদাই সঙ্কোচভাব, অথচ স্নেহমায়ায় পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র তাহার হৃদয়টুকুতে ইহারই ভিতর পিতৃহীনা শোকবিহ্বলা মীরা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। স্বামিনিন্দাভয়ে সাধ্বী যে তাঁর কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলে নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার চরিত্রসৌন্দর্য্যে অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় সরলাকে বলিলেন, "বোন, বিনোদ তোমার উপর অমন দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তা আমি এতদিন জানতাম না। আয়ি বুড়ি হয় ত বলতো, কিন্তু আমি বাড়ী থেকে আসার দু' দিন পরেই সে মনোহরপুর গেল। সব কথা

বটে, মনঃকষ্টেও বটে, উপাধানে মুখ লুকাইল। দেখিয়া মীরা চক্ষু মুছিলেন। করুণকণ্ঠে কহিলেন, "না সরলা, তোমার কাছে আমি কিছু শুনতে চাইনি। আমি জানি, লজ্জায় আমায় সব কথা তুমি বল্‌তে পারনি—কেমন ?"

বিবশা বিহ্বলা হইয়া সরলা উপাধানে অশ্রুপাত করিতেছিল। কিন্তু মীরা অপ্রতিভ হইবেন ভাবিয়া সহসা আত্মসংবরণ করিল। বলিল, "দিদি, মা বল্‌তেন, সরলা, যদি কখন শ্বশুরবাড়ী যাস্, দুটো কথা মনে রাখিস্ মা !—সোয়ামীকে আপনা থেকে কখন কিছু চাস্‌নে, হাজার কষ্টেও সোয়ামীর নিন্দে করিস্‌নে !" অনেক চেষ্টা করিয়াও সরলা এবার চোখের জল থামাইতে পারিল না। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া গাঢ় স্বরে আবার বলিল, "দিদি, আমি জান্‌তাম, সোয়ামী স্ত্রীলোকের দেবতা ! কুক্ষণে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম দিদি, এখন আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিনে।"

এই কথা কয়টিতে মীরা সতীহৃদয়ের দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন। গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ছি বোন্, ও কথা ভাব্‌তে নেই। সোয়ামি সুখে দুঃখে চিরদিনই মেয়েমানুষের দেবতা। তুমি কি শোননি, সতী ভগবতী বাপের মুখেও পতিনিন্দা সইতে পারেন নি ? দুঃখু কি বোন, সোয়ামি স্ত্রীতে অমন মনান্তর সব ঘরেই হয় ! তুমি যদি অত ছেলেমানুষী করে তখনই চলে না আস্‌তে, বরকনেতে সেই রাতেই ভাব হয়ে যেত !"

শেষের কথায় কিঞ্চিৎ হাস্যরস যোগ করিয়া মীরা সরলার মনটা একটু ভিজাইতে চেষ্টা করিলেন ;—কেন না, আসল কথাটা তখনও বলা হয় নাই। সরলাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার তিনি বলিলেন, "দেখ সরলা, তোমার যে বয়স, আমার মতন গঙ্গাবাস চিরদিন তোমার পোষাবে না বোন। বিশেষ, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বরাবর থাক্‌তে পারব না। সোয়ামীর দোষ ভুলে যাও। আমি খবর পেয়েছি, বিনোদ এই অঞ্চলে এখন আছেন। তোমার সম্মতি পেলেই কল কৌশল করে আমি এখানে তাঁকে আনাতে পারি।"

সরলার মনে প্রত্যাখ্যানের সেই কালসন্ধ্যা জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। স্বামী যে প্রথম সম্ভাষণেই তাহার সতীত্বগর্ব্বে আঘাত করিয়াছিলেন, সে অপমান বালিকা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। সে সব কথা মনে পড়িবা-মাত্র সরলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল ; স্থির কণ্ঠে বলিল,—

সেই মনোহরপুরের ভিটায় ফিরে যাব। না পারি, মা গঙ্গার কোলে শুয়ে চোক বুজব! ও সব কথা আমায় আর বলো না দিদি!"

মীরা করুণার হাসি হাসিয়া বলিল,—"বাবুজী বল্‌তেন, 'বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দ লালা!' কে এক পশ্চিমে বাই—আমার নামে নাম,—তারি নাকি এ গান! মীরা নাম মনে পড়্‌লে সর্ব্বদা নন্দলালকে মনে থাক্‌বে বলে, তিনি এ হতভাগীর এ নাম রেখেছিলেন। যখন তখন বল্‌তেন, 'মীরা কহে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!' ভাই, বিনা প্রেমে জগতের যিনি পতি, তাঁকে পাওয়া যায় না; তুমি কখন দেখ্‌লে না শুন্‌লে না, একেবারে স্বামিপ্রেম পাবে! আমার অনুরোধ রাখ দিদি! সহগুণে পৃথিবী বশ। ঢিল খেয়ে পাঠ্‌কেল মারা পুরুষের শোভা পায়। মেয়েমানুষের প্রতিশোধ ও পথে নয় বোন্‌! প্রেম ছাড়া আমাদের পথ নেই।"

বালিকা সরলা অত কথা বুঝিল না। দলিতফণিনীবৎ প্রত্যাখ্যানের নিশিতে বিনোদকে শুনাইয়া বলিয়াছিল, "এই স্বামী? আমার দেবতা!" আজও মনে মনে সেই কথা বলিল। প্রকাশ্যে বলিল,—"না দিদি, কোথাও তুমি লোক পাঠিও না! আমার সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল দিদি!"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই নিশাপ্রভাতে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ হোড়ঙ্গের বনে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে বিশ্বনাথ ফেডি সাহেব সঙ্গে আড্ডার অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধনের দরুণ ফেডির সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তাহাতে উপলকণ্টকময় সঙ্কীর্ণ পথ; কষ্টে তিনি পথপ্রদর্শকের অনুগমন করিতেছিলেন। কষ্ট যত হোক্‌, ইহাতে তিনি বেশ ভাল করিয়া পথ ঘাট গুলি দেখিয়া লইবার সুবিধা পাইতেছিলেন। বিশ্বনাথ ভয় এবং সন্দেহমাত্রশূন্য, সাহেবকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; দুই এক বার অনুরোধ করিল, একবেলা তাহার অদূরবর্ত্তী কুটীরে বিশ্রাম করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না? ফেডি ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদের মাত্রা চড়াইয়া এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইতেছিলেন, সেই বিপজ্জনক তস্করটার বাসগৃহ দেখিয়া লইবার প্রলোভন অতি সহজেই তিনি জয় করিলেন। কেন না, রাত্রে যে দস্যুপতি এতটা ঔদার্য্য

নাই এবং গৃহে পাইলে এখন সহজে ফেডিকে সে ছাড়িবে, কে বলিতে পারে? শপথ করিবার পূর্ব্বে বা পরে কখনই সাহেব আপনাকে তজ্জন্য ধর্ম্মতঃ বাধ্য মনে করেন নাই। তদীয় অসঙ্গত ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সে প্রতিজ্ঞা স্বেচ্ছাকৃত নহে, বলে অপহৃত মাত্র, তাহার কোন "নৈতিক মূল্য" নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ ভাবিতেছিল, সাহেব মেমের জন্য বড় ভাবিতেছে, এবং সেই জন্যই নিজের ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেছে না।

উভয়ের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ভগবানের মধুর কণ্ঠ তখন পঞ্চমে উঠিতেছিল। বিশ্বনাথ সাহেবকে বলিল, "সদর রাস্তা এখান থেকে বেশী দূর নয়, সাহেব, বরাবর তুমি চলে যাও। আর কোন ভয় নেই!" সামুয়েল ফেডি ধন্য-বাদ উচ্চারণ করিয়া বিশ্বনাথের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সেই সঙ্গীতধ্বনির অনুসরণ করিয়া ফেডি সাহেব আড্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইবে। অগত্যা তিনি বিশ্বনাথের প্রদর্শিত পথে ফিরিয়া আসিলেন।

সে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম, এবং একবারে মনুষ্যসমাগমচিহ্নবিরহিত নহে। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন; ইচ্ছা, গায়কটা সে পথে আসিলে কৌশলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। এ দিকে কিন্তু বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করিতেও সাহস হইতেছিল না। দস্যুপতি হয় ত লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, এবং সহসা আবির্ভূত হইয়া আবার তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইবে। ফেডি সাহেব দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না, অথচ গতিবেগ প্রায় সমান রাখিলেন।

ওদিকে প্রত্যূষে নীলকুঠীর ডাকাইতির খবর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের গোচর হইবামাত্র, অবিলম্বে তিনি সদলে বাহির হইয়া পড়িলেন। মিসেস্ ফেডির মুখে রাত্রির দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ইলিয়ট সাহেব ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং ফেডির উদ্ধারের জন্য দিকে দিকে সওয়ার রওনা করিলেন; নিজে চারি জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সিপাহী সঙ্গে তিনি স্বরূপগঞ্জের পথে ছুটিয়া চলিলেন।

হোড়ঙ্গের বন হইতে বাহির হইয়া ফেডি সাহেব সরকারী পথের ধারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক কণ্ঠীধারী বাবাজী একটি ব্রাহ্মণতনয় সঙ্গে আসিয়া জুটিল। সাহেব যে পথে চাহিয়াছিলেন, সেই পথে

দিনে সামান্য পান্থবেশে ইংরেজ-দর্শন একটা অভাবনীয় ঘটনা। বিশেষ, সাহেবটির কতকটা দীন মলিন বেশ। রাত্রিজাগরণ এবং দুশ্চিন্তাবশতঃ তাঁর মুখে একটা কালিমা পড়িয়াছিল, বস্ত্রাদিও ধূলি কর্দ্দম কণ্টকে যথেষ্ট দুর্দ্দশা-গ্রস্ত। ভগবান অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। ততক্ষণে সামুয়েল ফেডি সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘমূর্ত্তি বৈষ্ণবটার আপাদমস্তক দেখিয়া লইতে-ছিলেন। দেখিয়া গরিব ব্রাহ্মণ বিনোদবিহারী একটু সরিয়া বসিলেন।

ভগবান দয়ার্দ্র হইয়া সাহেবকে প্রশ্ন করিল, কোথা হইতে তিনি আসিতে-ছেন; ফেডি ভাবিতেছিলেন, আপনা হইতে কোন কথা কহিবেন না। কিন্তু ভগবান যদি কথা তুলিল, তবে আর তিনি অনুসন্ধানের এমন একটা সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তাহার প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন যে, সে কোথা হইতে আসিতেছে। ভগবান বলিল, সে ভিক্ষুক বৈষ্ণব, ভিক্ষায় গিয়াছিল।

তখন ফেডি সাহেব ভগবানের উপর অজস্র কূটপ্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়া চলিলেন। একটুতে ভগবান বুঝিল, বিশ্বনাথের সংবাদে সাহেবের প্রয়োজন। মনে পড়িল, গত রাত্রিতে বিশ্বনাথের নীলকুঠি লুটিবার কথা ছিল। মদকপুত্র উত্তরে প্রশ্নগুলির গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা দ্রুত-গামী অশ্বপদশব্দে চারি দিক যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে ঘোড়সওয়ার চারি জন সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট্ ইলিয়ট্ আসিয়া পৌঁছিলেন। ফেডিকে দেখিয়া তিনি উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেন না, তাঁহাকে জীবিত দেখিবার আশা করেন নাই।

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইলিয়ট্ ফেডিকে একটু একান্তে লইয়া গেলেন। এতক্ষণে বিনোদ ভগবানকে ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন, চল, আমরা প্রস্থান করি। এ হাঙ্গামায় আমরা থাকি কেন? ভগবান কিছু বলিল না।

সাহেব দুই জনের পরামর্শ কি হইল, তাহা খুলিয়া বলার স্থান এ নহে। ফেডি সদর্পে ভগবানের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "তুম লোক ভি ডাকু হ্যায়!" ভগবান মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে অভিবাদন করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। স্বরূপগঞ্জের সেদিনকার পরিচয় ইলিয়টের মনে ছিল। তিনি বলিলেন, "ফেডি

তুমি নিজে ডাকাত না হতে পার; কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে তোমার জানা শুনা আছে, সন্দেহ নাই। তোমায় ছাড়িতে পারি না।” ভগবান করযোড়ে বলিল, “আমার জন্যে ভাবি না, কিন্তু আমার সঙ্গীটিকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হউক। উনি কোনও দোষে দোষী নন।” স্বয়ং বিনোদ কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, সাহেব দেখিয়া তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ইলিয়ট্ কহিলেন, বিচারে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন দেখা যাবে।”

তখন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় ভগবান ও বিনোদ বন্দী হইয়া কৃষ্ণনগরে চলিলেন। ভগবান গাইতে গাইতে গেল, “সুখের দিনে তোমারে ডাকি পরাণ মন ভরে না!”

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। ফেডি সাহেব স্বকৃত শপথের কোনও মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না। জাতক্রোধ হইয়া বরঞ্চ তিনি দস্যুদের উপর প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মিসেস্ ফেডিকে কলিকাতায় রাখিতে গিয়া সস্ত্রীক তিনি লাটসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়ট তৎপূর্ব্বেই কোম্পানির গভর্মেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দস্যুদমন জন্য সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারী এক জন এবং কিছু ফৌজ নদীয়ায় পাঠান হউক। সামুয়েল ফেডির মনিব সরকার আফিস হইতেও রাজপ্রতিনিধিসভায় আবেদন গেল যে, তাঁহাদের ধন এবং কার্য্যকারকদের প্রাণ সেরূপ আপদসঙ্কুল হইলে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান একটা সাধন যে নীলের আবাদ, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত হইতে হয়। ইহার ফলে কলিকাতার তখনকার একজন মাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার সি. ব্লাকুয়ার* নদীয়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসিলেন; তাঁর সঙ্গে জন কতক ইউরোপীয় “সেলার” ও কিছু সৈন্য প্রেরিত হইল।

শান্তিপুরের উপরগস্তিদলে মিশিয়া কৃষ্ণ সর্দ্দার এ সকল শুনিতে পাইল। তাহার মনিব আসাননগরের নীলকুঠির সাহেব সামুয়েল ফেডির এক জন বন্ধু। সব ঠিক্ ঠাক্ করিয়া সর্দ্দার মনিবের দ্বারা ফেডিকে জানাইল, একটু বেশী বেতনে উপরগস্তিদের রাখিতে পারিলে, বিশ্বনাথ অতি সহজে ধরা পড়িবে। ফেডি সাহেব উপরগস্তিদের ডাকাইয়া আনাইয়া কথাবার্ত্তায় বুঝি-

লেন, বিশ্বনাথের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য বাস্তবিক তাহাদের মত স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকের দরকার। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কৃষ্ণ সর্দ্দার আবার কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বিশ্বাসভাজন হইয়া চিরপোষিত প্রতিশোধপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত হইল। তাহার প্রার্থনায় বৈদ্য-নাথকে কারামুক্ত করিয়া উপরগস্তিদের সহায়তায় নিযুক্ত করা হইল। কেন না, তাহার ন্যায় দস্যুপতির ভিতর-বাহিরের খবর আর কেহ জানিত না।

উপরগস্তি দল অতঃপর কোম্পানির বেতনভোগী হইল বটে, কিন্তু সাধা-রণে সে কথা জানিল না। পূর্ব্ববৎ তাহারা শান্তিপুরে থাকিয়া অতিগোপনে বিশ্বনাথ ও তাহার দলবলের গতিবিধির অনুসন্ধান করিতেছিল। স্বয়ং বিশ্ব-নাথ গা-ঢাকা দিয়াছিল, মাতৃআজ্ঞায় ডাকাইতি হইতে একেবারে বিরত হই-য়াছিল, এ সকলের কোন খবর সে পাইল না। নিতান্ত অন্তরঙ্গ অতি অল্পসং-খ্যক সঙ্গী ছাড়া আর কেহ তাহার অজ্ঞাতবাসের সংবাদ জানিত না। এ দিকে তাহার দলের অন্য ডাকাইতেরা বেশ একটা দাঁও পাইয়া গেল। তাহারা নিজেদের ভিতর দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে ডাকাইতি করিতে লাগিল। উপর-গস্তি দলের ভিতর এক জন একদিন খবর আনিল, বিশ্বনাথের দল পরদিন কৃষ্ণনগর হইতে কিছু দূরে পল্লীগ্রামে ডাকাইতি করিবে। ব্লাকুয়ার সাহেব পরদিন সন্ধ্যার পর নিজের দলবল ও উপরগস্তি দল সঙ্গে যথাস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। গভীর রাত্রে সত্য সত্যই ডাকাইত পড়িল। অধিকাংশ ডাকাইত গৃহস্থের উচ্চ ইষ্টকরচিত প্রাচীরবেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন সুরু করি-য়াছে, এ দিকে ঘাঁটিতে কালীর পাইকরা উন্মুক্ত অস্থিহস্তে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। এমন সময় "জইণ্ট" সাহেব সহসা বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলিলেন। তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ব্লাকুয়ার সিপাহীদিগকে আদেশ করিলেন, দলের সর্দ্দারগুলাকে জীবিতমানে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কিছুতে তাহারা ইহা পারিয়া উঠিল না। শেষে সিপাহীরা গুলি চালাইবার হুকুম প্রার্থনা করিল। ব্লাকুয়ার তখন "সেলার"দের উপর ডাকাত ধরিবার ভার দিলেন। হণ্টার সাহেব বলেন, ইহারা দীর্ঘযষ্টি সহায়ে ডাকাইতদের হাত হইতে তরবারি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই রাত্রে অনেক ডাকাইত ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু বিশ্ব-নাথ বা তাহার প্রধান সহচরদের কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। যাহা হউক, জইণ্ট সাহেবের এই উদ্যমে দলগুলি ছোড়ভঙ্গ হইল; নদীয়া জেলার

নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফেডি সাহেব তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়াছিলেন। উপরগস্তিরা তাঁহার কাছে বিস্তর টাকা খাইয়াছিল। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতবাসের অনুসন্ধানে দিবারাত্রি তাহারা নিযুক্ত রহিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান মদক স্বরূপগঞ্জে অল্প দিন ছিল বটে, কিন্তু ইহারই ভিতর সে অঞ্চলে তাহার বিস্তর আত্মীয় বন্ধু জুটিয়াছিল। এই লোকপ্রিয়তার কারণ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহার সরল অমায়িক ব্যবহার। বিশ্বনাথের মত তাহার অর্থবল ছিল না, দীন দুঃখীকে নিয়ত অন্ন বস্ত্র দিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু প্রাণ দিয়াও পরোপকার করিবার আন্তরিকতা ছিল। অতএব জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন শুনিয়া, লোকের আপসোশের সীমা রহিল না।

মীরা ও সরলা প্রথম দুই দিন ইহার কিছুই জানিল না। সহসা পীতাম্বরের কাছে শুনিয়া উভয়ে বজ্রাহত হইল। দিদিকে পীতাম্বর গোপনে বলিল, ভগবানের সঙ্গে বিনোদবিহারীও গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া শোকে মীরা ম্রিয়মাণ হইল। প্রথমতঃ সরলাকে কিছু না বলিয়া ভ্রাতাকে সঠিক সংবাদ লইবার জন্য কৃষ্ণনগর পাঠাইল। পীতাম্বর অনুসন্ধানে জানিয়া আসিল, ডাকাইত দলের লোকগুলাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অভিপ্রেত। দিগ্‌নগর অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোক ভগবানকে সাধু ভক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও পীতাম্বর শুনিয়া আসিয়াছিল। বিনোদকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। এক জন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইবে শুনিয়া লোকে বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে যে নির্দ্দোষী, তার কোনও প্রমাণ নাই। মোক্তার মহাশয়েরা পীতাম্বরকে টাকার মায়া না করিয়া মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

এ সর্ব্বনেশে খবর সরলাকে বলাই মীরা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিল। পীতাম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতাকে আহারাদি

কিছু বলিতে পারিল না। তাহার অসাম্রান্ত মুখশ্রীতে, কথা কহিবার ভঙ্গীতে, এমন একটা কারুণ্য জড়িত ছিল, সংসারিকতা এবং কঠোরতা যাহার প্রতি নির্ম্মম দৃষ্টিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইত। অন্যান্য দিনের মত মীরা রাতে কিছু "জল" খাইল না দেখিয়া সরলা ভারি ব্যস্ত হইল—এতক্ষণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, দিদি বড় অন্যমনস্ক। অতএব দিদির বিছানায় বসিয়া আদর করিয়া সরলা তাহার চুলের গোছ লইয়া পড়িল। অতি কোমল কণ্ঠে আগ্রহাতিশয়ে সরলা থাকিয়া থাকিয়া মীরাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"আমার মাথা খাও, কি হয়েছে বল না দিদি?"

তখন প্রথমতঃ একটি একটি করিয়া মীরা ভগবান সম্বন্ধে ভাইয়ের কাছে যাহা শুনিয়াছে, সরলাকে সকলই বলিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সরলা তাহার প্রত্যেক কথা তন্ময়চিত্তে শুনিতেছিল। ভাবিতেছিল, সে কি দুর্ভাগিনী, যে কেহ তাহার হিতাকাঙ্ক্ষা করে, জগদীশ্বর তাহাকেই বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। এমন সময়ে মীরা প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে বিনোদবিহারীর কথাও বলিল।

শুনিয়া সরলা দিদির মাথা হইতে হাত তুলিয়া লইল। তার পর চক্ষু বুজিল। মীরা ফিরিয়া বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি অতি যত্নে আপনার কোলে তুলিয়া লইল। তাহার ফোঁটা ফোঁটা চোকের জলে সরলার কপোল ভাসিয়া যাইতেছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় যন্ত্রণায়, প্রায় অনিদ্রায়, দুই জনের সে রাত্রি কাটিতেছিল। সরলা নীরবে মাতাকে মনে করিয়া কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিল, মীরা নানা কথায় প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল—"ভয় কি, বিনোদ কোন দোষে দোষী নন, কোম্পানি অবিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড করবেন, এমনও কি হয়?" আবার কখন বা সরলার পুণ্যজ্যোতিঃপূর্ণ, অনিন্দিত আননশোভা দেখিতে দেখিতে আপন মনে বলিতেছিল, "সতীলক্ষ্মীর তিনি অপমান করেছিলেন, বিধাতার মনে কি আছে, কে জানে?" শুনিয়া সরলা একবার বাষ্পগদগদ স্বরে বলিল, "দিদি, সে জন্যে কখ্‌খন ত আমি তাঁর মন্দ কামনা করি নি! রোজ ভেবেচি, দুঃখিনী আমি, আমার অদৃষ্টই এই। তিনি সুখে থাকুন!" মীরা তাহাতে চক্ষু মুছিয়া

শেষরাত্রে ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বর মীরাকে ডাকিল,—"দিদি একবার দুয়ার খোল!" নূতন কোনও বিপদ আশঙ্কা করিয়া মীরা দ্বারের অর্গল মুক্ত করিল। ভাই বলিল, "বিশ্বনাথ এয়েচেন দিদি, তোমাদের একবার প্রণাম করে যাবেন। বল ত অন্দরে তাঁকে আনি। বাইরে কথাবার্ত্তা কওয়া নিরাপদ নয়।" মীরা সরলাকে লইয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া বসিল, পীতাম্বর বিশ্বনাথকে লইয়া আসিল।

বিশ্বনাথ চিরবিদায় লইতে আসিয়াছিল। বলিল, "এ জীবনে মা তোমাদের চরণ আর দেখ্‌তে পাব, সে ভরসা ছিল না; এই শেষ। এও ঘটত না, কেবল ব্রহ্মহত্যানিবারণের জন্যে, প্রাণের যারা বন্ধু, আজও যারা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফিরচে, তাদের কথা অগ্রাহ্যি করে এসেচি!" এখন বিশ্বনাথ বিনোদবিহারীর কথা তুলিল। ভগবানের কথা কহিতে গিয়া বালকের মত অধীর হইয়া বলিল, "সে বাঁচ্‌তে পারত, কিন্তু মিছে কথা বলে প্রাণ বাঁচাবার লোক সে নয়। কিন্তু এ আমার জানা আছে, সাহেবেরা দগ্ধে দগ্ধে মার্‌লেও ভগবান আমার অনিষ্টের একটি কথাও বল্‌বে না। তার সাক্ষীতে ঠাকুরের ভাল হতে পারত, কিন্তু তা কি কোম্পানি মান্‌বে?"

তখন বিশ্বনাথ বিনোদের জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া দিল। বলিল, "আমার বিশ্বাস, মাঠাকুরাণীরা নিজে মাজিষ্টার সাহেবকে বল্‌লে ঠাকুর নিশ্চয় বাঁচবেন। সাহেব জাত, ভদ্দর বংশের মেয়ে ছেলের কথায় অবিশ্বাস করবে না।" পীতাম্বর ইহাতে আপত্তি করিল। "দিদি যদি হলফ নিয়ে মাজিষ্টর সাহেবের এজলাসে সাক্ষী দিতে যান, তবে মান ইজ্জত কি রইল? প্রাণ থাক্‌তে আমি তা করতে দেব না।" বিশ্বনাথ পীতাম্বরের নিতান্ত কাছে বসিয়াছিল, তাহার পিঠে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। "ভাই, তোমার মান ইজ্জতের হানি হতে পারে, এমন শলা আমি দিতে আসি নি। মাঠাকুরাণীরা সাক্ষী দিতে যাবেন, এ তো হতেই পারে না। কিন্তু তুমি কি শোন নি, পূজোর সময় সাহেব যখন এসেছিলো, মাঠাকুরাণীদের বলে যায়, বিপদের সময় মনে কর্‌তে। আমি বলি কি, তুমি নিজে একবার কৃষ্ণনগর গিয়ে মাঠাকুরাণীদের তরফে সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে এসো। বরঞ্চ একখানা চিঠিও লিখে নিয়ে যাও। এঁরা কি লিখতে পড়তে জানেন না?"

মীরা ও সরলা, উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল। পীতাম্বর

ত্যাগ করিল। বিশ্বনাথ বলিল, "তবে বেশ হয়েচে। দিদির চ
নিয়ে ভাই কালই তুমি সাহেবের কাছে চলে যাও। চিঠি হ
মুখে মুখে তাঁকে তাঁর শেষ কথাটা মনে করে দিও। সাহেব ৬
ভুল্‌বে না। নিশ্চয় দেখো, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আস্‌বে।"

পীতাম্বর মোক্তারদের পরামর্শ বিশ্বনাথকে বলিল। বিশ্বনাথ ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। "ছি ছি! ও দিক দিয়ে যেও না। ইংরেজ যদি মিছে বুঝতে পারে, হিতে বিপরীত হবে।" পীতাম্বর পুনশ্চ বলিল, "শুন্‌তে পাই, নীল-কুঠীর ফেডি সাহেবকে ছেড়ে দিয়েই তোমার এত বিপদ। কৃষ্ণনগরে রাষ্ট্র যে, সে বাইবেল হাতে দিব্বি করেছিল, তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। মাজিষ্টর সাহেবও ত সেই সাহেব, তাকেই বা কি বিশ্বাস! শেষে আমরা শুদ্ধ বিপদে পড়বো না ত?" বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল। ক্ষীণ ঈষৎ হাসি, কিন্তু তখনও তাহা আশার উৎসাহে সরস। "ভাই, ভাল মন্দ লোক সব জেতেই আছে। আজ ইংরেজ আমার ভয়ানক শত্রু বলে কি আমি তাদের অশেষ গুণ ভুলে যাব! আমি চল্‌লাম, আমার শেষ অনুরোধ ভুলো না—নিশ্চয়ই ঠাকুর রক্ষা পাবেন।"

তার পর বিশ্বনাথ ভক্তিভরে মাঠাকুরাণীদের প্রণাম করিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আগামীবারে সমাপ্য।

কাবুলীর জয়।

দুপুরের মেলে যেতে হ'বে রেলে
আপন করম-ঠাঁই,
বেশবাস পরি' স্মরিয়া শ্রীহরি
হাবড়ার পানে ধাই।
কড়ি গুণি' দিয়া টিকিট কিনিয়া
ঘড়িতে ফিরা'নু আঁখি,
দেখিনু সময় বড় কম নয়
তখনও রয়েছে বাকী।

হরষের ভরে গাড়ীর ভিতরে
বসিনু গদীতে গিয়া।
জীবন-অমিয়, পরাণের প্রিয়,
জগতে যে সার ধন,
খুলিয়া তখন গ্রন্থ-রতন,
কবিতায় দিনু মন।
কে আসে, কে যায়, কে ভাষে, কে চায়
কে করে মিছার গোল,

চকিতে নিরখি
ড়ীর দ্বার ;
কাবুলী কঙ্কাল,—
স্থর অবতার।
মূর্ত্তিমান, পাষণ্ড পাঠান,
দারুণ যমের দূত।
অসভ্য মূরতি, বর্ব্বর অতি,—
ছি ছি! মামুদের ভূত।
কাঁধে ঝোলে চুল,— কিবা দিব তুল?
কেতকীর কাঁদি প্রায়,
টুপিটি খুলিতে, মাথাটি নাড়িতে,
কত ধূলা উড়ে তায়।
পা দু'টো তুলিয়া বসিল জাঁকিয়া
চারি হাত জমী চাপি ;
পেয়ে তার ভর, অচল পাথর,
গাড়ীখানা উঠে কাঁপি।
ধুসর ধূলায়, গন্ধ ছুটে গায় ;
পরিধেয় মোটা থান,
কটিতে কসিত চরণে জড়িত
হ'বে দুই তিন থান!
প্রাণ জ্ব'লে যায়, মরি যে ঘৃণায়,
উঠিছে পেটের ভাত ;—
সে স্বভাব নয়, নহে মনে হয়
তখনি ছুটিত লাথ।
কোথা এ সময় বীরতা-নিলয়
ফিরিঙ্গীর দলবল?
ঘাড়েতে ধরিয়া, দক্ষিণা দিয়া,
দি'ক্ এরে রসাতল।

হেন কালে এক আইল বালক,
নয়নে সলিল-ধার ;
বলে,—"মহাশয়! কৃপা যদি হয়,
বিপদে করহ পার।
বাস রাখি' তীরে গঙ্গার নীরে
আনমনে করি স্নান ;
চোর কোথা ছিল, সুযোগ পাইল,
হরিল টিকিট-খান।
বিপদে এমন কে তারে এখন?
কে বুঝিবে ব্যথা মোর?
যার কাছে যাই, তাড়ায় সবাই,—
বলে,—'বেটা জুয়াচোর!'
নাহি নিজ-জন, সুদূর ভবন,
কড়ি যে নাহিক আর ;
কি করিব হায়! কে বা ফিরে চায়?
করুণা মাগিব কা'র?—"
পরিচয় দিতে লাগিল কাঁদিতে ;
তারে যে থামানো দায়।
সে নয়ন-লোর নিরখিয়া মোর
পরাণ ভাসিয়া যায়।

অকস্মাৎ একি! চমৎকার দেখি
কাবুলীর ব্যবহার ;—
ছিল সে শুইয়া, বসিল উঠিয়া,
মুছি আঁখি বারবার।
কপোলে তাহার ওকি বহে ধার?
মুখে ওকি ক্রোধ ঢালা!—
বলে,—"রাম রাম! খারাবি এ কাম
ক'রেছে সে কোন্ শালা!"
এত বলি তবে, যে হাতে আহবে
নাশে সে নরের প্রাণ,
সেই হাতে খুলি' মুদ্রার থলি,
দিল সে করুণা-দান।

নিজ আচরণ ভাবিয়া তখন
পাইনু বিষম লাজ ;—
বাহির নেহারি' ভিতর বিচারি
করেছি দোষের কাজ।
সংশয় ইথে না রহিল চিতে
স্মরি খেলা প্রকৃতির ;—
মোর ভগবান ভেদিয়া পাষাণ
বহান স্নেহের নীর।
হিন্দু খৃষ্টান, মোগল পাঠান,
এক সুত্রে গাঁথা সব ;
যেথা তার টুটে, অমনি সে উঠে
বসুধা ব্যাপিয়া রব।
পাঠানে তখন ডাকি মনে মন
কহি মার্জ্জনা চাই,—
"বৃথা এই সব বিলাস বিভব,
তুমিই জিতিলে, ভাই!"

নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী।

জ্যব্যবসায়ী ইংরেজ কোম্পানীর কতিপয় স্বার্থপর ভৃত্যের হস্তে অষ্টাদশ
ীর বঙ্গের ইতিহাস অযথা কলঙ্কিত হইয়াছে। কচিৎ কোনও ধর্ম্মান্ধ সম-
 মুসলমান ঐতিহাসিকও কোনও কোনও স্থলে সামান্য ইন্ধন সংগ্রহ
াছেন। আবার কোথাও কোনও প্রভুমুখপ্রত্যাশী ভৃতিভুক্, অনুকূল
ষিত ঐতিহাসিক দাবানলের সহকারিতা করিয়া, আমাদিগকে
য়াছেন। পরবর্ত্তী ইংরেজ লেখকগণের অনেকেই পূর্ব্বসংস্কার
সঞ্চালন করিয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিবাৎসল্যের সমধিক
গিয়াছেন। স্থলবিশেষে পক্ষপাতদুষ্ট অতিরঞ্জনে সত্যনির্দ্ধা-
রাখিয়াছেন। এই হিসাবে এ শ্রেণীর মহাত্মারাও ধন্যবাদার্হ!
া মহানুভব ঐতিহাসিকের কথা ছাড়িয়া দিলে, সত্যনিষ্ঠা
। চতুরচূড়ামণি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বমতপরিপোষক
ট্; সুতরাং কোথাও অলঙ্কারযোগে, কোথাও বা
রাধে, প্রকৃত বিষয়ের বর্ণন অত্যধিক সুরঞ্জিত ও
ন। কেহ বা ওজস্বিনী ভাষার স্রোতে পথভ্রষ্ট হইয়া
 বা গ্রন্থরচনাকণ্ডূয়নের প্রকোপে লজ্জার আবরণ
র্ববয়স্ক, ঘোর অত্যাচারী, সিরাজউদ্দৌলার দাড়ি-
প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতিরও অবতারণা করিয়াছেন।(১)
মধ্যেও আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রস্তাবিত

Empire. এখানে সিরাজউদ্দৌলা ও অযোধ্যার সুজা-
এই শ্রেণীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই; অথচ
চবল এই-জাতীয় ভ্রমও কথঞ্চিৎ মার্জনীয়; কিন্তু অন্য-
 যাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক;—ষ্টুয়ার্ট সাহেব
গ্রণী;—ভূমিকায় নানা পারসী গ্রন্থ হইতে স্বীয় গ্রন্থ
নে মুসলমান শাসনের উপর কটাক্ষ করিবার অব-
ষে লিখিতেছেন, "ক্লাইবের স্মরণার্থ বলা উচিত,
কাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।"
দয়ের প্রধান অবলম্বন, তাহাকেই
র পরামর্শ অনুসারে

বিশেষ আবশ্যক কালের একখানিও প্রামাণিক ইতিহাস সংগৃহীত হই
অথবা কোন্ কালেরই বা ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে? আমাদের এ অ
কি চিরদিনই রহিয়া যাইবে? সত্য বটে, আজি কালি একটু সুবাতাস
য়াছে, সাময়িক পত্রিকায় কথন কথন কচিৎ চেতনাসঞ্চারের লক্ষণ দৃষ্ট
কিন্তু অপেক্ষায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, এই সময়েই একটু
তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজন। বার্ক, বেণ্টিঙ্কের ত কথাই নাই, আমর
মিল, মেকলেও হারাইয়া, ষ্টিফেন ষ্ট্র্যাচি প্রভৃতির অত্যুজ্জল রত্নোদ্ধা
করিতেছি।

খদ্যোতের আলোক নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই আলো
থাকে। তজ্জন্য কোম্পানীর আমলের অতীত ইতিহাস
দেখাইবার প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। অধুনা সে
শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট বহুলপরি
চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে দাঁড়
য়াছে; পূর্ব্বাপর তুলনায় শঙ্কিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবার
সত্যানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিবার এই প্রকৃত অবসঃ
কয় জনে সত্যনির্দ্ধারণার্থ এ পথে অগ্রসর হইয়াছে
কয় জন টরেন্স মিলে? আমরা কি চিরকালই অ
বিষয়, আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকেও এ পক্ষে বড়
ইহাঁদের মৃতবৎ নিশ্চলতা বহুলপরিমাণে প্রচলিত

মুসলমান নরপতিগণের যথেচ্ছাচারমূলক
আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রজার সুখশান্তি কিছুই f
রণের এবং তথাকথিত শিক্ষিত মহোদয়গণের
কথা, রাজকীয় দেশশাসন বাঙ্গলা অনুবাদে
সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। এইখানেই 'বিস্মিল্ল
সহিত আধুনিক কর্ম্মচারিবহুল শাসনের তুল
দেশের অবস্থাবর্ণন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের অভি
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক না হইতেও পারে
প্রকৃতপক্ষে মুসলমান অধিকারে বাঃ

ষ্টুয়ার্ট মহোদয়ের

নাই, আর ইংরাজী গ্রন্থে ...

া কোথায়? আমরা এখন 'স্বায়ত্ত...

ন বস্তুটা কি, এই এবং কথিত স্বায়ত্তশাসনে তাহার

বং মুসলমান অধিকারে দেশীয় জমিদার ও গ্রাম্য-

ায়ত্তশাসন কতদূর লব্ধপ্রসর ছিল, এ কথা মনেই

কথার এ সময় নহে। অদ্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা

উপযুক্ত পাত্রে রাজকার্য্যপ্রদানবিষয়ে মুর্শিদাবা-

র্শস্থানীয়। সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় রাজন্য-

ট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হইবে।

বহারে বর্ত্তমান সুসভ্য প্রজারঞ্জকবর্গেরও

...হাসগুলি, সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে লোকে

...না ও সময়ের যথাযথ বিবরণী সম্বন্ধে যথেষ্ট হইলেও,

ও প্রজাসাধারণের অবস্থা ইত্যাদি ইতিহাসের বিশেষ

...য়ে কিছুই সাহায্য করে না। প্রায় প্রত্যেক মুসলমান ঐতি-

...দসাহ ও তৎসংসৃষ্ট প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ এবং দরবারের বিবরণী দি...

...লেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, মনে করিতেন। তজ্জন্যই আকবর বাদসাহে...

সময়ের ইতিহাস ভিন্ন প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস ইহাদের মধ্যে নিতান্ত

বিরল। অনেকেই হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

এই শ্রেণীর লোকে ইতিহাস কথার প্রকৃত অর্থ কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করেন, বুঝ...

যায় না। দেশের ও দেশীয়গণের অবস্থাবর্ণনই যদি ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হ...

তবে হিন্দুকালের ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। আধুনিক মনীষিগ...

এই উপাদানের উপরেই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কাব্যাদিতে মুসলমানে...

কোনও কালেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই। নাটকাদির ত কথ...

নাই—ত্রৌর্য্যত্রিক মুসলমান ধর্ম্মে বিহিত নহে। স্থপতিবিদ্যাতেও তাঁহা...

অনেকাংশে হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। মোগল অধিকারের পূর্ব্বে পূর্ব্বক...

ইতিহাসের সাহায্যে আমরা দেশের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে ...

না—তজ্জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বকোপলকল্পিত মতে ঐ সময়ের

লোচনা করিয়াছেন। স্থায়িভাবে দেশের অধিবাসী হওয়ায় ক্রমশই জে...

বিজেতার স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল ... স্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা...

. . . . র হইতে, অন্ততঃ মহাত্মা ব

. . . . হল, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে

হিন্দুগণ রাজভাষায় সম্যক্ প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন

পূর্ব্বাবধিই তাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সামরি

অব্যাহত অধিকার ছিল। (আইন্-আকবরীর অ

সাহেবের পদানুসরণ করিয়া ইদানীং কেহ কেহ অ

সাহের হিন্দুপ্রীতি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস প

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গীয় নবাবগণের ক

হইতেন, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান

মুরশিদাবাদের নবাবগণের শাসনসময়ে

ছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে

(১) দেওয়ান ই আলি বা মোদার উল্ মোং

(২) দেওয়ান খাল্সা শরিফা বা উজীরমালী (

(৩) দেওয়ান ই তন্ (তন্খার দেওয়ান) Pay-n

(৪) দেওয়ান ই বেউতাৎ (Minister of domestic
te Secretary.)

(৫) দেওয়ান খান্সামান্ (Steward) আসবাব্, কারখানাজাত প্রভৃ
ধ্যক্ষ।

(৬) দেওয়ান ই মুবাজাৎ (প্রাদেশিক রাজস্বসচিব)।

(৭) নায়েব সুবাদার বা নায়েব নাজিম (Deputy Governor)।

(৮) মীর্ বক্সী কুল্ বা সেপাসালার অজম—প্রধান সেনাপতি।

(৯) বক্সী আহাদিয়ান্ (Court martialএর ক্ষমতাপ্রাপ্ত)।

(১০) বক্সী সুবাজাৎ (প্রাদেশিক সেনাপতিবর্গ)।

(১১) প্রধান সেনাপতির অধীনে, বক্সী দুয়েম, সুয়েম ও চাহারাম্।

(১২) বক্সী সাগের্দ্দপেসা (চোপদার প্রভৃতির অধিনায়ক)।

১৩) হাজারিয়ান্—পঞ্চ শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সেনানায়ক।

৪) জমাদার (পদাতিক সেনানায়ক)।

৫) মুস্তোফী, দেওয়ানী সেরেস্তার সেরেস্তাদার ও মুস্রেফ্।

৬) ফৌজদার (মফঃস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেট্)।

ড়শটি প্রধান পদ [illegible] বীস্ (সনদ্-লেখক) খাস্নবীস্, বেকায়া

নবীস্ (দরবারের দৈনন্দিন বৃত্তান্তলেখক) দারোগাই আদালত (আদালত উন্ আলিয়াই নিজামত ও দেওয়ানী এই দুই প্রধান বিচারালয়ে বিচারকার্য্য জন্য) দারোগা কারখানাজাৎ, মীর তোজক (দরবারের বন্দোবস্তকারক) মীর এমারৎ, সদরস্ সদুর (রাজধানীর প্রধান বিচারপতি) কাজীউল কোজাৎ, মুফতী, মোহতমীর্ (কুপথগামীদিগের বিচারক) রাজস্ববিভাগে, আমিন কাছারী, আমিন্ সুব্জাৎ, কাননগুয়ান্ করোবিয়ান্, পেস্কারান্ আহাদিয়ান্, খাজাঞ্চী, তহবিলদার কোতাদার (পোদ্দার) বা মুদ্রাপরীক্ষক, কতোয়াল্ (Police Superintendent) এল্চিয়ান্ (দূত Ambassador) সওয়ানে নেগার্ (Newspaper Editor) ও মুন্সী প্রভৃতি পদ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে বক্সী, মুন্সী, শিক্‌দার, মজুমদার প্রভৃতি পদবীর বহুল প্রচার থাকায়, হিন্দুগণ ঐ সমস্ত কার্য্যে কি পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। মুস্তোফী ও খাস্‌নবীস পদবীও হিন্দুদের মধ্যে বিরল নহে, বরং মুসলমানের মধ্যে দেখা যায় না। যাহা হউক, নিম্নতন পদে হিন্দুদের নিয়োগ কতদূর লব্ধপ্রসর হইয়াছিল, তাহা দেখান বাহুল্যমাত্র। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন—ইহার প্রমাণ পাইলেই, অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অপরটিও অনুমিত হইবে। দেওয়ান্ ই আলি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্ব-পদে এবং প্রাইভেট্ সেক্রেটরীর কার্য্যে, সাধারণতঃ নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়েরাই নিযুক্ত হইতেন। কেবল আধুনিক ইতিহাসে যিনি পাষণ্ড বলিয়া বর্ণিত, একমাত্র সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাই সর্ব্বোচ্চ পদেও হিন্দু রাজা মোহনলালকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (২) রাজস্ববিভাগে হিন্দুরাই ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ প্রবেশলাভ করিতেন। তাই বলিয়া মুসলমান কর্ম্মচারী এ বিভাগে একবারেই ছিলেন না, এমন নহে। প্রাদেশিক দেওয়ানী কার্য্যে অনেক মুসলমানও নিয়োজিত হইতেন। ফল কথা, এখানে অধিকাংশ স্থলে গুণানুসারে রাজকার্য্য নিয়োগ দেখা যায়, জাতি বা ধর্ম্মানুসারে নহে।

ইংরেজী ইতিহাসে স্বনামখ্যাত মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা মুর্শিদকুলী খাঁর যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং যাহা এতদিন বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক। এক জন অজ্ঞাতনামা লেখকের পারসী গ্রন্থ

---

(২) ইংরেজ মহাত্মারা বীরপ্রবর মোহনলালের যে অপবাদ রটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

হইতেই ইহার উৎপত্তি। লেখক ইংরেজ গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশানুসারে এই গ্রন্থ রচনা করেন। সমসাময়িক অন্যান্য বিরুদ্ধ প্রমাণ ইহার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাসে আলোচিত হয় নাই। অবশ্য দুই এক জন বিজ্ঞ লোক লেখকের প্রবাদবাক্যে আস্থা স্থাপন করেন নাই। বিখ্যাত সার জন শোর মহোদয় ইহাকে এক আশ্চর্য্য ধরণের ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে এ বিষয়ে একটি কথা মাত্র বলিতে চাই; যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান (মুর্শিদকুলী) বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসস্বরূপে জীবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, স্বীয় অতুল প্রতিভাবলে সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছেন, যাঁহার ন্যায়পরতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি চারিত্র্যগুণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার প্রতিকূলে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে সমধিক চিন্তা করার প্রয়োজন।

যত দূর জানা যায়, মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতেই বঙ্গের সুবাদারগণের অধীনে হিন্দুকর্ম্মচারিনিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত না হউক, লব্ধপ্রসর হয়।

আমরা এক্ষণে ক্রমশঃ প্রধান হিন্দুকর্ম্মচারিগণের উল্লেখ করিব।

(১) দেওয়ান ভূপতি রায়—বাদসাহ সরকারে রাজস্ববিভাগে সুদক্ষতার সহিত কার্য্য করার জন্য ইনি আরঙ্গজেবের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন, এবং তাঁহার পার্শ্বচর কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালী কায়স্থ। কুলী খাঁ ইহার স্থানীয় অভিজ্ঞতায় বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্তির আশায়, ইহাঁকে আপন সহকারী মনোনীত করেন। কুলী খাঁর সুবিখ্যাত জমিদারী বন্দোবস্তের এক জন প্রধান সহায় বলিয়া জীবদ্দশায় তিনি খাল্‌সা দেওয়ান বা রাজস্বসচিব ছিলেন। জমিদারী বন্দোবস্তে সুশৃঙ্খলাবিধানের জন্য বঙ্গদেশ ইঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ানীর প্রথম বর্ষে নিকাশ দিতে গিয়া দাক্ষিণাত্যে উর্দ্দুরীমল্লো (বাদসাহশিবির) হইতে ইঁহাকে সঙ্গে আনেন বলিয়া, ষ্টুয়ার্ট সাহেব ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

(২) কিশোর রায় অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। ইনি পূর্ব্বে এলাহাবাদে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পরে কুলীখাঁর দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ (Private Secretary) হন। এখানে দেখা যায়, যে কার্য্যে পরবর্ত্তী নবাবেরা সাধারণতঃ স্বসম্প্রদায় মুসলমান কর্ম্মচারীই নিযুক্ত করিতেন, সে কার্য্যের ভার মুর্শিদকুলী খাঁ

র্ট মহোদয় বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অনুমান করিয়া- ভূপতি রায় ও কিশোর রায় মুর্শিদের পূর্ব্ব জাতি ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্য ণগণমধ্যে রায় উপাধি তৎকালে প্রচলিত ছিল কি না, আমরা জ্ঞাত নহি। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান মুর্শিদের তিন কুলে কেহ থাকিলে তিনি মুসলমান বণিকের নিকট বিক্রীত হইতেন না, এবং প্রস্তাবিত সময়ে দুই জন ভিন্ন হিন্দুকর্ম্মচারী প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত না দেখিলে বরং ঐতিহাসিক মহোদয়ের উক্তরূপ অনুমানের কারণ থাকিত।

(৩) দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়। ইনি মুর্শিদাবাদ নগরের অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ ডাহাপাড়ার সুবিখ্যাত প্রধান কানুন্‌গো বঙ্গাধিকারী মহাশয় বংশের বংশধর। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী খাজুরডিহী গ্রামে ইঁহাদের প্রাচীন বাস। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ,—খাজুরডিহীর মিত্রবংশীয়। বাদসাহ সরকার হইতে প্রধান কানুন্‌গোর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইঁহারা যথাক্রমে মালদহ ও ঢাকায় বাস করেন। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইলে দর্পনারায়ণই প্রথমে ডাহাপাড়ায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন (ঢাকা হইতে আগত হিন্দুদের বাস ছিল, এই জন্য এই পল্লীর নাম ডাহাপাড়া হয়;—ডাহা =ঢাকা)। ভূপতি রায়ের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র গোলাপ রায় দেওয়ানী কার্য্যে সম্পূর্ণ পারগ হইবেন ভরসা না করিয়া, মনীষী মুর্শিদকুলী সমসাময়িক বাঙ্গালীগণের মধ্যে রাজস্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ দর্পনারায়ণকে দেওয়ানীর ভার দেন। ইনি একে প্রবীণ, তাহাতে কানুন্‌গো ও খাল্‌সা দেওয়ানী একাধারে ন্যস্ত হওয়ায়, ইনি বৎসরের মধ্যে বিংশতি লক্ষ টাকা আয় বেশী দেখান। প্রথিত আছে, কুলী খাঁ দেওয়ানীর প্রথম বর্ষে বাদসাহের নিকট দাখিল করিবার জন্য কাগজ প্রস্তুত করিয়া দর্পনারায়ণকে সহি করিতে অনুরোধ করেন। কানুন্‌গো বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত, রাজস্ব ও ভূসম্পত্তির রেজিষ্ট্রার; তাঁহার দস্তখত ভিন্ন বাদসাহ দরবারে প্রাদেশিক হিসাব গ্রাহ্য হইত না। দর্পনারায়ণ বলিয়া বসেন, কানুন্‌গো রসুম বাবদে তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দস্তখত করিব না। দেওয়ান কুলী খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেও তিনি দস্তখত করেন না। দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দস্তখত করেন—কেবল ঐ দস্তখতে

গেল। পুঁটিয়ারাজ দর্পনারায়ণ তদীয় প্রিয়পাত্র খ্যাতনামা না৻
নন্দনকে উকীলস্বরূপ নবাব-দরবারে রাখিয়াছিলেন। তিনি কালক্রমে
স্বনামা মৈত্রপ্রধান কানুন্‌গোর সুনয়নে পতিত হইয়া সহকারী কানুন্‌গোর
কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নবাব সরকারে সুপরিচিত হওয়ায়, মুর্শিদকুলী
খাঁ নানা কৌশলে ও প্রলোভনে তাঁহার দ্বারা কাগজে কানুন্‌গো মোহর
দেওয়াইয়া কার্য্যোদ্ধার করেন। এই অবধি রঘুনন্দনের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। (৩)

(৪) রঘুনন্দন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা
উক্ত রাজা রঘুনন্দন দেওয়ানী কার্য্যে নিয়োজিত হন। প্রথিত আছে, তিনিই
বঙ্গে প্রথম রায় রায়ান উপাধি পান। রঘুনন্দনের কার্য্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া
নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ পূর্ব্ব জমিদারগণের নিঃসন্তান লোকান্তরপ্রাপ্তি অথবা
বিদ্রোহজন্য উচ্ছেদসাধনের পর, ভাটুরিয়া, রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি সুবিস্তীর্ণ
জমিদারী ক্রমশঃ তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

(৫) যশোবন্ত সিংহ—মুরশিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র অন্যতম রাজস্বসচিব।
ইনি মুরশিদকুলীর স্বহস্তশিক্ষিত; সুতরাং অনেকপরিমাণে তাঁহার সদ্‌গুণ-
সমূহের অধিকারী হইয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন, যশোবন্ত
সিংহ তাঁহার প্রভুর সততা, সত্যনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা প্রভূতপরিমাণে অণুকরণ
করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের পক্ষে সুবিধাজনক যে কোনও বন্দোবস্ত করিতেন,

---

(৩) একমাত্র ষ্টুয়ার্ট যাঁহাদের সম্বল, এই বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত
করিবেন, সন্দেহ নাই। এ স্থলে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিস্তৃত গ্রন্থে
এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বকথিত পারসী গ্রন্থকারের অনুবর্ত্তী
হইয়া পরবর্ত্তী দুই এক জন ঐতিহাসিক বলেন,—"দর্পনারায়ণ কাগজে দস্তখত করিতে
অসম্মত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি কুলী খাঁ জাতক্রোধ হন। কোনও উপায়ে প্রতিশোধ লইবার
কল্পনা তিনি কিছু কাল হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন—সুতরাং বাহিরে সদ্ভাব ও শিষ্টাচার
প্রদর্শনে অসতর্ক করিয়া তাঁহাকে খালসা দেওয়ানের পদগ্রহণে সম্মত করা হয়। এবং এক
বৎসর কার্য্য করিবার পর হিসাব লইবার ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল—ঐ
কারাবাসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।" কেহ কেহ আবার আর একটু বেশী দুর অগ্রসর—দর্প-
নারায়ণের মৃত্যুঘটনার পরে বাদসাহের ভয়ে তাঁহার পুত্রকে কানুনগো রসুমের অংশের দশ
আনা দিয়া শান্ত করিবার কথাও আছে। আমরা উক্ত বিনামা গ্রন্থকারের প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস
করিতে অসমর্থ। সার জন শোর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় লেখকগণের
সংগৃহীত নাটোর রাজবংশের ইতিহাস ও স্থানীয় চিরাগত প্রবাদ আমাদের পক্ষে। দর্প-
নারায়ণের কারাবাসে মৃত্যুঘটনা ডাহাপাড়ার কানুন্‌গো বংশের কেহ কখনও শুনেন নাই।
কোম্পানীর রাজস্বসচিব (সেরেস্তাদার) গ্রাণ্ট সাহেবও নিজ রাজস্ববিষয়ক প্রস্তাবে এ
বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই—এটিও উক্ত প্রবাদের অলীকতার

তাহাতেও তিনি প্রভুর ন্যায় প্রজাবর্গের সুখসচ্ছন্দতাবৃদ্ধির সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন, এবং সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। ইনি সরফরাজ্ খাঁর শিক্ষক ছিলেন। বিধর্ম্মী রাজপুত্রের শিক্ষকতাকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগ বড় সুলভ দৃষ্টান্ত নহে। ইহাঁকেও যদি কেহ জ্ঞাতিত্বের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চাহেন, তবেই নাচার! নবাব সুজাউদ্দোলার পুত্র সরফরাজকে ঢাকার নায়েব নাজিম করিয়া, প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যশোবন্তকে দেওয়ান স্বরূপে প্রেরণ করেন। ভাবী রাজা রাজবল্লভ এই সময় হইতেই রাজস্ববিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হন। যশোবন্তের সুশাসনে ও প্রজাবর্গের প্রতি সদয় ব্যবহারে পূর্ব্ববঙ্গ শস্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-সচ্ছন্দতার সীমা ছিল না। অপক্ষপাত বিচারে দেশে সর্ব্বথা শান্তিপ্রচার হইয়াছিল। শস্যের মাশুল উঠাইয়া দিয়া ও বাণিজ্যবিষয়ে কৈবল্য রহিত করিয়া যশোবন্ত শস্যের দর বিলক্ষণ শস্তা করিয়া ফেলেন। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায়, তিনি ঢাকার পশ্চিম তোরণ বন্ধ করিয়া উপরে একটি দিব্য দিয়া লিখিয়া যান, যিনি শস্যের দর ঐ প্রকার শস্তা না করিতে পারিবেন, তিনি যেন ঐ দ্বার উদ্ঘাটন না করেন। যশোবন্ত মহাসমারোহে দ্বারোদ্ঘাটন করান। এই সমস্ত কারণে সরফরাজ খাঁর নায়েবী আমল ঢাকার ইতিহাসে রামরাজ্যস্বরূপ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী নায়েব সুবাদার মুরাদ আলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শাসনপ্রথার পরিবর্ত্তন ও প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারের সূত্রপাত হইতে লাগিল দেখিয়া, যশোবন্ত পদত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিশ্চেষ্টভাবে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

মুরশিদকুলী খাঁর সময়ে সামরিক বিভাগেও হিন্দুসেনানীনিয়োগের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। ইনি সুব্যবস্থায় রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, পাশববলের উপর নির্ভর করিতেন না। সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক মাত্র রাখিয়াছিলেন। এই সামান্য সৈন্যেরও অধিকাংশই হিন্দু-সেনানীর অধীনে কার্য্য করিত।

(৬) লাহরী মল্ল রাজা রঘুরাম। রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্যে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যের মধ্যে লাহরীমাল নামক এক সেনানীর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সমভিব্যাহারী কৃষ্ণনগররাজ বীরশ্রেষ্ঠ রঘুরামের হস্তে বিপক্ষ পক্ষের সেনাপতি জমাদার

দারী প্রদান করেন,—ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। আবার রাজসাহী রাজবংশের ইতিহাসে রঘুনন্দন এই যুদ্ধে বিশেষ কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করেন, এরূপ বর্ণিত আছে; এ দুই স্থানে প্রবাদের মিশ্রণ সম্ভব।

(৭) দলিপ সিংহ হাজারী। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ আলিবেগ্ নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে, ভূতপূর্ব্ব বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ফৌজদার জেয়াদিন সহজে কার্য্যত্যাগ না করিয়া, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকগণের সাহায্যে বিদ্রোহী হন। নবাব, বিদ্রোহদমন জন্য ও আলিবেগের সাহায্যার্থ, দলিপ সিংহ হাজারীকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। ছলপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাবে অতর্কিত করিয়া একজন গোলন্দাজ দ্বারা ইঁহাকে হত্যা করিবার কথা ইতিহাসে বিবৃত আছে। এখানে দেখা গেল, দলিপ সিংহ একজন হাজারী সেনানী। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছয় হাজারের অধিক ছিল না। এই দলিপ সিংহ যে হিন্দুস্থানী, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। "হাজারী" উপাধি এখনও অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। মুরশিদাবাদের সাধকবাগে এক সম্ভ্রান্ত হাজারী বংশ আছে। রায় রায়নে আলমচাঁদ নবাব সুজাউদ্দীনের প্রধান রাজস্বসচিব। ইনি স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও প্রভুপরায়ণতায় কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। নবাব ইঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্যই করিতেন না, এবং মৃত্যুর সময় পুত্রকেও ইঁহার উপদেশ-অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষরূপে বলিয়া যান। ইনি যুদ্ধকার্য্যেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। সরফরাজ্ ও আলিবর্দ্দী খাঁর মধ্যে 'সুতী' অথবা 'গিরীয়া' ক্ষেত্রে যে প্রবল যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি প্রভুকার্য্যে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। এই গিরীয়া যুদ্ধে বিজয় সিংহ নামক জনৈক সৈনিক ও তাঁহার নবমবর্ষীয় বালক জালিমের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী রিয়াজগ্রন্থে বর্ণিত আছে। দেখিতে পাই, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই হিন্দুসেনাপতি ও সৈনিকের অভাব ছিল না। হিন্দুসৈনিকেরা কখনও এই বিশ্বাসের অপব্যবহার করেন নাই। এই বিষয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজ্যকালে হিন্দুকর্ম্মচারিগণের ব্যবহারে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। মুসলমান ইতিহাসে ইঁহারই প্রথমে রায় রায়ান্ উপাধিপ্রাপ্তির কথা আছে।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সমদর্শিতা ও প্রজারঞ্জন প্রবাদবাক্যের মত হইয়াছে। এই মহাত্মাও আকবর বাদসাহের প্রদর্শিত পদবীর অনুসরণ করিয়া

নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে বিনিয়োগে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাঁর তুল্য দৃষ্টান্ত অতি অল্পই পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বতন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এই সমদর্শিতার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। মুসলমানরাজ সমদর্শী, ইহা বড়ই অসম্ভব। অতএব প্রমাণ হইল যে, ইহার মধ্যে কোনও গূঢ় অর্থ আছে! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কৃত হইল! 'পলিসী'-কুশল এই ব্যবহারের মধ্যে কূট পলিসী দেখিলেন। স্থির হইল যে, উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে সজ্জিত করিয়া নবাব স্বীয় আসন অটল রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অনেকে আকবর বাদসাহসম্বন্ধেও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব ধীশক্তি ও কূটতর্ককুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

(৯) নন্দলাল (নন্দুলাল)। আলিবর্দ্দী খাঁর একজন একান্ত বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি। সরফরাজ্ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় আলিবর্দ্দী খাঁ ইহাকে সমগ্র হিন্দুসৈন্যের অধিনায়ক করিয়া বঙ্গে লইয়া আসেন। সুতীর বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে আলিবর্দ্দী খাঁ যাবদীয় সেনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নন্দলালের অধীনে স্থাপন করিয়া, আপন ছত্র ও পতাকা রক্ষার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। আফগান্ সেনাপতিগণের উপর এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। নন্দলাল যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া, সরফরাজ খাঁর সেনাপতি প্রসিদ্ধ বীর গয়েস্ খাঁর প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অদৃষ্টক্রমে সম্মুখসমরে ধরাশায়ী হন। মুতাক্ষরীণে দেখা যায়, প্রকৃত যুদ্ধ পশ্চিমপারেই হইয়াছিল; পূর্ব্ব পার্শ্বে স্বয়ং আলিবর্দ্দী কর্তৃক নীত সৈন্যদল অতর্কিতভাবে শত্রুশিবির আক্রমণ করে ও অল্পক্ষণমধ্যে সরফরাজ খাঁ নিহত হইলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এখানকার যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হয়।

(১০) রাজা জানকীরাম। বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। ইনি বাঙ্গালা হইতে দেওয়ান হইয়া আলিবর্দ্দীখাঁর নায়েবী আমলে পাটনায় গমন করেন। নাজিম হইয়া আলিবর্দ্দীখাঁ ইহাকে প্রথমতঃ দেওয়ান ই তন্ ও সামরিক বিভাগের প্রধান মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র কটকের আক্রমণে বিতাড়িত আলিবর্দ্দীর কটক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, ইনি নবাবের সমভিব্যাহারে ছিলেন। পরে স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ দ্বারা নবাবের সৈন্যসংগ্রহাদি কার্য্যের সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইনিই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের

কল্পনা প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ভিন্ন কেবল ইঁহারই নিকট পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল এই এক কার্য্যে প্রভু ও ভৃত্যকে পাপে লিপ্ত দেখা যায়। তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবারও অনেক কথা আছে। যাহা হউক, অতঃপর রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এত অধিক হইয়াছিল যে, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও কোনও বিষয়ে দরবার করিতে হইলে মন্ত্রিবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। পাটনার ডেপুটী স্থবাদর, সিরাজের পিতা জৈনউদ্দীনের মৃত্যুর পর, ঐ পদে সিরাজকে নামমাত্র নিযুক্ত করিয়া, প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজা জানকীরামকেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজা সসম্মানে এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন। পাঠকগণ দেখিবেন, পাটনার নায়েব স্থবাদারী নবাবের অধীনে সর্ব্বপ্রধান ও গুরুতর দায়িত্বের কার্য্য। অন্যান্য প্রাদেশিক নৃপতি ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ জন্য বেহার বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। সুতরাং একভাবে, বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণে পাটনার শাসনকর্ত্তার উপরেই বঙ্গদেশরক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত। সহৃদয় পাঠক অসভ্য মুসলমানের অধীনে বাঙ্গালীর হস্তে এই গুরুভার ন্যস্ত দেখিয়া, এবং আধুনিক সুসভ্য প্রজাবৎসলতার দিনে সামান্য সহকারী পুলিস-অধ্যক্ষতার পদও দেশীয়দের পক্ষে অবারিত নহে ভাবিয়া, দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

(১১) রাজা দুর্লভরাম। ইনিই ইতিহাসে খ্যাত ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের বঙ্গীয় বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়ক রায়দুর্লভ। ইনি রাজা জানকীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। উড়িষ্যা হইতে মহাষ্ট্রীয়গণকে দূরীভূত করিবার পর, আলিবর্দ্দী খাঁ সেনাপতি মুস্তাফাখাঁর অনুরোধে, তদীয় পিতৃব্য আবদুল নবী খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব স্থবাদার নিযুক্ত করেন। চির-সৈনিক নবী রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া,নবাব, দুর্লভরামকে তাঁহার পেস্কার বা দেওয়ানরূপে প্রেরণ করেন। এইখানে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে দুর্লভরামের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, এবং এই প্রথম অবস্থাতেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অভাববশতঃ তাঁহার নিয়োগ স্পষ্টই দেখা যায়। এরূপ সাবধান হইবার কারণেরও অভাব ছিল না। অত্যল্প কালের মধ্যেই সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইলেন; আবদুল নবী সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অতঃপর দুর্লভরামকেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা করিয়া স্থায়িভাবে কটকে রাখা হয়। দুর্লভরাম বাল্যাবধিই ধর্ম্মানুষ্ঠানে

পড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। এক বৎসর এই-রূপে বন্দী থাকিয়া, দাক্ষিণাত্যের মহাজনগণের সাহায্যে তিন লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়া, মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। নবাব তাঁহার পিতার প্রভুভক্তির পুরস্কারস্বরূপ রাজকোষ হইতে ঐ তিন লক্ষ মুদ্রাপ্রদানের আদেশ দেন।

অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে আমরা বারংবার মিরজাফর প্রভৃতির ন্যায় দুর্লভরামকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত দেখিতে পাই। ১১৬৫ হিঃ অব্দে (১৭৫২ খৃঃ) রাজা জানকীরামের মৃত্যু হয়। নবাব দুর্লভরাম প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে শোকের খেলাত দেন। ইতিপূর্ব্বেই দুর্লভরাম সৈন্যবিভাগের প্রতিনিধি দেও-য়ান হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ দেওয়ানী কার্য্যে স্থায়ী হইলেন। কালক্রমে তিনিই প্রধান দেওয়ান হন, ইহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। প্রথম অবধিই তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হয়।

(১২) মহারাজা রাজবল্লভ, দুর্ল্লভরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। সিরাজের রাজত্ব-কালেই পিতৃসাহায্যে ইনি খালসার রায় রায়ান্ অর্থাৎ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন বলিয়া কথিত আছে। পিতা পুত্র উভয়েই ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ক্লাইবও তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। দুর্ল্লভরামের কলিকাতায় পলায়নের পর, ক্লাইব মুরশিদাবাদের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস সাহেবকে উপযুক্ত অনুচরাদি সহ রাজার পরিবারবর্গকে পাঠাইবার আদেশ দিয়া লিখি-য়াছিলেন,—'রায়দুর্ল্লভ ও ইংরেজগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বোধ হয়, তোমার বিদিত নাই। আমরা কেবল তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার পরিবারবর্গেরও রক্ষার জন্য লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিশেষ বাধ্য।' কোম্পানীর আমলেও রাজ-বল্লভ আজীবন খালসার রাঁই রায়ান্ পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ৭০১৭ নং রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায়, নূতন রাণী (তাঁহার স্ত্রী) মৃত-পতির কার্য্য উল্লেখ করিয়া পেন্সন প্রার্থনা করিতেছেন। ইঁহার পোষ্যপুত্র-বংশীয়েরা এক্ষণে কলিকাতা রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস করেন।

(১৩) রায় রায়ান্ চিন্ময় রায়। অতি সামান্য কার্য্য হইতে ক্রমশঃ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতায় গুণে রাজস্ববিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া-ছিলেন। রাজা জানকীরাম নায়েব নাজিম হইয়া পাটনায় গমন করিলে, ইনিই প্রধান মন্ত্রী হন। মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম মহম্মদ ইঁহার কার্য্যদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সহস্র উপরোধ সত্ত্বেও প্রভুর

কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারে, এমন কর্ম্মে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিতেন না। নবাব তাঁহার এত দূর সম্মান করিতেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও অনেক সময়ে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মন্ত্রিবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এক সময়ে মুতাক্ষরীণ-লেখক নবাবের খাস্‌কামরায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রাদি স্বজন সহ বিশ্রম্ভালাপের সময় উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ কথাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান দেওয়ানের (চিন্ময় রায়ের) সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ান ও নিজ দেওয়ানের তুলনা করায়, নবাব উত্তর করেন, 'না বৎস, তুমি যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলে, তাঁহারা আমার ভৃত্যমাত্র ; বর্ত্তমান মন্ত্রী আমারই প্রভু।'

(১৪) বীরেশ্বর দত্ত (বীরু দত্ত—সিয়ার)। খালসার সহকারী দেওয়ান চিন্ময় রায়ের মৃত্যুর পর দেওয়ানী পদে অস্থায়িভাবে উন্নীত হন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কিছু দিন ইহার কার্য্যসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, মাহারাষ্ট্রীয় কটকের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযানের পর প্রত্যাগত হইয়া, মতিঝিলে অবস্থানকালে ইহাকে খেলাত প্রভৃতি দিয়া, ঐ কার্য্যে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন। রাজস্ববিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া, ইনি অধিক দিন কার্য্য করিতে পারেন নাই। শোথ রোগে অচিরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনিও একজন সামান্য লোক,—কার্য্যদক্ষতা গুণেই উচ্চপদে সমাসীন হন, সুপারিসে নহে।

(১৫) রাজা কীর্ত্তিচাঁদ। বীরুদত্তের পরলোকগমনের পর, তাঁহার সহকারী অমৃতরায় কিছু দিন কার্য্য করেন। পরে, রায় রায়ান্ আলমচাঁদের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচাঁদ দেওয়ান হইলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে বিহারের মন্ত্রিত্বপদে ব্রতী থাকিয়া সিরাজের পিতা জৈন্ উদ্দীনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। আফগান সর্দ্দার্‌গণের বিদ্রোহসময়ে ইহার প্রভুপরায়ণতার খ্যাতি প্রচারিত হয়। ইদানীং কাশীতে বাস করিতেছিলেন। রাজস্বসম্বন্ধে অনেকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, ইনি নবাবের অনুরাগ আকর্ষণ করেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়া যথোপযুক্ত খেলাত সহ দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হয়েন। কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতা আলমচাঁদ বহুকাল হইতে রাজস্ববিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকায়, ইহার নিকট অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল। সুতরাং অত্যল্পকালের মধ্যেই কয়েক জন প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক ও জমিদারের নিকট প্রচুর পূর্ব্ব বাকী উদ্ধার করিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্দ্ধমানের রাজার নিকট পাওনা বেশী ছিল। এই বাকীর এরূপ অকাট্য প্রমাণ দেখান হইল যে, কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় থাকিল না। সকলেই নিজ দেয় স্বীকার করিলেন। এইরূপে এক কোটীর উপর টাকা রাজ-

কোষে আদায় হইল। আবিষ্কর্ত্তার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। সেই অবধি নবাবের ইঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। পূর্ণ দুই বৎসর কাল সসম্মানে ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ইঁহার কালপ্রাপ্তি হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সহকারী অমৃত রায়কে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

(১৬) অমৃতরায়। বহুদিন রাজস্ববিভাগে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং কীর্ত্তিচন্দ্রের পরলোকান্তে রায়রাইয়াঁ উপাধি ও খেলাত সহ তিনিই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

(১৭) রায় চিন্তামন্ দাস। পাটনায় আলিবর্দ্দী খাঁর অধীনে দেওয়ানির সময় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এজন্য সিরাজের পিতা জৈনউদ্দীন নায়েব নাজিম হইয়া নবাবের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইঁহাকেই দেওয়ান করিয়া লইয়া যান। মুতাক্ষরীণকার বলেন, জৈনউদ্দীন গুণের পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি উপযুক্ত লোককেই কার্য্যে নিয়োগ করিতেন।

(১৮) রায় গোকুলচাঁদ্ (গোকুলচন্দ্র রায়—বাঙ্গালী)। আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে বহুদিন ঢাকায় প্রশংসার সহিত দেওয়ানী করেন। ইনি যশোবন্ত রায়ের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নোয়াজিম্ মহম্মদও তাঁহার প্রতিনিধি হোসেন কুলী খাঁ, প্রায়ই নবাব-দরবারে থাকিতেন। তজ্জন্য সমস্ত ভার ইঁহার হস্তেই ন্যস্ত হয়। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণ সুপ্রসিদ্ধ।

(১৯) রায় গোকুলচাঁদের পরে, ঢাকার দেওয়ানী কার্য্য, ইতিহাসখ্যাত বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের হস্তে পড়ে। ইঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ সিরাজের রাজ্যকালে ঘেসিটী বেগমের পক্ষসমর্থন, শঠতাপূর্ব্বক সরকারী কাগজপত্র ও তহবিল গোপন, তজ্জন্য তদীয় পুত্র কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতায় পলায়ন, লোভপরবশ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের তাঁহাকে আশ্রয়দান ও নবাবের সহিত সংঘর্ষণ, আধুনিক ইতিহাসে যথাযথ বিবৃত না থাকিলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় নহে। মিরকাসিমের সময়ে ইঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু অর্ম্মি সাহেবের আরোপিত "চরিত্রদোষ" অমূলক অপবাদমাত্র।

(২০) রাজা রামসিংহ। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে গুপ্তদূতবিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ভিন্ন এ পদ অন্যে পাইত না। মারহাট্টা হাঙ্গামার পরে ইনি মেদিনীপুরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত হন। ফৌজদারের পদে হিন্দু কর্ম্মচারীর নিয়োগ ইতিপূর্ব্বে বড় দেখা যায় না।

ষ্ঠিত হন। কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতা পলায়নের পর, ইনিই দুতস্বরূপে কলিকাতায় যান। কৃষ্ণবল্লভপ্রদত্ত অর্থের সিংহযোগ্য অংশগ্রাহী, তদানীন্তন কলিকাতার জমিদার হল্‌ওয়েল মহোদয়, ইনি ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাড়াইয়া দেওয়া অপরাধ হইতে স্বপক্ষকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়াট্‌স, বিয়ার প্রভৃতির মন্তব্যে সত্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

(২২) রাজা মহেন্দ্র। ইনিই দ্বিতীয় কাননগু মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। সিরাজের সময়ে মন্ত্রিত্বও করিতেন। বিপ্লবের অবস্থায় ইনি মন্ত্রণাসভার একজন প্রধান নায়ক ছিলেন।

(২৩) দেওয়ান মাণিকচাঁদ। প্রথমে বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে ইনি নবাবদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং ক্রমশঃ প্রধান কার্য্যে উন্নীত হন। সিরাজ কলিকাতা-রক্ষার ভার ইঁহারই হস্তে অর্পণ করেন। বীরত্বের জন্য যে কস্মিন্ কালে ইঁহার কোনও খ্যাতি ছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ, আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে মারহাট্টাগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে এক সময়ে 'উভলেজ' করার উল্লেখ আছে। তবে বজ্‌বজ্ ক্ষেত্রে মাথার কাছ দিয়া গুলি যাওয়াতেই যে ইনি পলায়ন করেন, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। ভিতরে গূঢ় কথা আছে। আমরা স্থানান্তরে তাহার প্রমাণ দিব।

(২৪) রাজা মোহনলাল—সিরাজের প্রধান মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত হিতৈষী বন্ধু। ইঁহার বীরত্বকাহিনী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর যত দিন পূর্ব্বস্মৃতি থাকিবে, ইঁহার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের হৃদয়পটে মুদ্রিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইঁহার কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে বর্ণন করা উদ্দেশ্য নহে। শেষে ইঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়া অদ্য আমরা 'মধুরেণ সমাপন' করিতে চাই। এই প্রবন্ধের সঙ্গে মহামতি বেণ্টিঙ্ক সাহেবের* নিম্নলিখিত উক্তি পাঠ করিয়া, পাঠক মহোদয়েরা 'সেকাল ও একালের বিষয় একটু চিন্তা করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

* "In many respects the Mahomedans surpassed our rule ... ... They admitted the natives to all previleges; the interests and sympathies of the conquerors and the conquered became identified. Our policy, on the contrary has been the reverse of this—cold, selfisn and unfeeling, the iron hand of power on the one side, monopoly and exclusion on the other." Lord W. Bentinck.

দুটি কবিতা।

পাথাকুলি।

দূরে বাজিল দুইটা ঢঙ্ ঢঙ্ করি'।

গ্রীষ্মরাত্রি ; উষ্ণশ্বাসে তনু দগ্ধ করি'
তপ্ত বায়ু বহে' যায় ধরণীর বুকে।
আরাম-পালঙ্কে শুয়ে প্রভু দিব্যসুখে
নিদ্রা যা'ন তৃপ্ত হ'য়ে পাখার বাতাসে।—
অভাগা সে সারা দিন খেটে অর্দ্ধগ্রাসে
ক্ষুধা ল'য়ে পাখা টানে, নিদ্রা নাহি চোখে ;—
আর্দ্রবস্ত্র থাকি' থাকি' বুলাইছে মুখে।
কভু উঠে কভু বসে, তাম্বুল চিবায়,—
নিদ্রাসাথে যুদ্ধ করি' তাড়াবারে চায়।

অভাগার চক্ষে হায়, তবু তন্দ্রা আসে
দুঃখ-জীবনের পর মরণ-আভাসে।
দীর্ঘ রজনীর শেষে মাথা পড়ে ঝুঁকে,
শিথিল হাত থামিয়া পড়ে শ্রমদুখে।
ক্ষণিক তন্দ্রায় আধ-নিদ্রা-জাগরণে
স্বপন দেখে সে গৃহে গেছে ; গৃহাঙ্গনে
ক্ষুধাক্লিষ্ট শীর্ণকায় শিশুরা দাঁড়ায়ে
"বাবা" বলে' ডাকি' হরষেতে সারা হ'য়ে
কেহ কোলে ওঠে, কেহ ধরে হাতখানি,
বসন ধরিয়া কেহ করে টানাটানি।—
দুটি বিন্দু অশ্রুজল পড়িল গড়ায়ে—
স্বপনের মাঝে দুখী পড়িল ঘুমায়ে।

ভাঙিল নিদ্রা, শ্বেতাঙ্গ উঠিলেন রুখে ;—
আশ্রিতের স্পর্দ্ধা দেখে' রক্ত ছোটে বুকে!
কৃষ্ণকায় ঘুমাবে সে এ ত নহে প্রথা!
তাড়াতাড়ি বুট পরে' নাহি কোন কথা
সবুট মারিল লাথি বুকের উপরে—
সহজে নিঃশঙ্কে যেন জড়ের উপরে!—
অভাগা পড়িল ভূমে করুণ ক্রন্দনে,—
রক্ত ছুটে পড়ে শত উৎস-প্লাবনে!
বক্ষে হাত চাপি' ধরি' অতি ক্ষীণস্বরে
বারেক বলিল, গৃহে ল'য়ে যাও মোরে।—
কোথায় রহিল স্বপ্ন কোথা গৃহখান্!—
দেখিতে দেখিতে তার বাহিরিল প্রাণ।

তার পর দূরবনে ফেলি' দিয়া শব,
পূর্ণ দুটি পাত্র টানি' ভুলি' গিয়া সব,
আবার তুলিল প্রভু নাসিকার রব
শয়ন-মন্দিরে গিয়া।

বহু দিন পরে
পড়িল ধরা ;—বিচারে আনিল তাহারে।
"প্লীহার কারণে মৃত্যু" ধরিল এ যুক্তি ;—
সবাই বুঝিল তাহা, পাইল সে মুক্তি।

নরঘাতী।

নিষ্ঠুর নির্ম্মম ওরে! আশ্রিত যে জন
আসিল দুয়ারে তোর, গৃহে অনশন
মাতৃহারা শিশুমুখ স্মরণে করিয়া,—
স্বল্প প্রত্যাশায় সারা রজনী জাগিয়া
করিল রে সেবা তোর, রক্ত জল করি,—
অকারণে অকাতরে পদাঘাত করি'
তাহারে বধিলি তুই! এক বিন্দু জল
চোখে নাহি দিল দেখা! হায়, সে দুর্ব্বল
কি করিয়াছিল দোষ? সারা রাত্রি বসে
অবিশ্রাম পাখা টানি' অসহ আলস্যে
পড়িল ঘুমায়ে ;—এই অপরাধ তার।
এরি তরে প্রাণ তার করিলি সংহার!
এ যে শোণিত-পিপাসা পশুর অধিক ;
ধিক্ তোর জন্ম, ধিক্ তোরে শত ধিক্!

তিহরী।

গত দুই বারে তিহরীর বিবরণ লিখিয়াছি ; এবারেও সেই সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব। এই রাজ্যের বর্ত্তমান ইতিহাস যাহা পাইয়াছি, তাহা সমস্তই লিখিয়াছি ; পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যেরূপ উৎসাহ থাকা আবশ্যক, যতখানি অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ থাকা কর্ত্তব্য, আমার আপাততঃ তাহা নাই। নেপাল ও গড়োয়াল রাজ্যের কোনও বিস্তৃত ইতিহাস আমি আজ পর্য্যন্তও পাঠ করিতে পাইলাম না। হুইলার সাহেব বা সেই রকমের দুই চারি জন দায়িত্ববোধশূন্য ইতিহাসলেখকের সংগৃহীত বা কল্পিত ইতিহাস পড়িয়া কতকগুলি ভ্রমাত্মক বিবরণ জানিয়া রাখা আমার ভাল বোধ হয় না। এই সমস্ত কারণে আমি তিহরীর পূর্ব্ব ইতিহাস লিখিতে পারিলাম না।

তিহরী সহর দেখিলেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ গড়োয়াল রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান নগর শ্রীনগরের কথা আমার মনে পড়ে। অনেক দিন পূর্ব্বে এই শ্রীনগরসম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই স্থানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তিহরীর সঙ্গে শ্রীনগরের কি সম্বন্ধ, এবং তিহরীর এই সমস্ত সুরম্য রাজপ্রাসাদ দর্শন করিলে কেন শ্রীনগরের কথা মনে হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"অনেক দিন আগে একবার নেপালের রাজা গড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। গড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্ব্বতে পলায়ন করেন ; এই সময় হইতে গড়োয়াল নেপালের অধিকারভুক্ত হয়। গড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং তাঁদের সাহায্যে গড়োয়াল স্বাধীন হলো, কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্দ্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্ত্তে ক্রীত হোয়েছিল। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ গড়োয়ালের অনেকখানি অংশ ইংরেজ গ্রহণ করেন—এই অংশের নাম "বৃটীশ গড়োয়াল" আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গড়োয়াল, তবে নেপাল বা ভোটের মত স্বাধীন নয়। যাঁরা অনুগ্রহ করে পরের হাত থেকে রাজ্য জয় করে দিলেন—আবশ্যক হোলে যে তাঁরা তা কেড়ে নিতেও পারেন, একথা বলাই বাহুল্য, তবে এ রকম অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা গড়োয়ালের তা

প্রলোভনের এমন কিছুই নাই যে জন্ত এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্ত্তে রাতারাতিই ইংরেজের টুপী ও ছড়ির আমদানী হোতে পারে; বরং প্রলোভনের যেটুকু ছিল সেটুকুর আপদ অনেক আগেই চুকে গেছে; নেপালের কবল হোতে গড়োয়াল উদ্ধার কোরে ইংরেজ গড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশ টুকুই অধিকার কোরেছেন—এই স্বাধীন গড়োয়ালই তিহরী রাজ্য।

"নেপালরাজ গড়োয়াল আক্রমণ করার পর, গড়োয়ালরাজ রাজ্য ত্যাগ কোরে পলায়ন করিলে নেপালীয়া অরক্ষিত প্রাসাদ ও সুরম্য রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট কোরে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গড়োয়াল পুনর্বিজিত হলো তখন গড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরে এলেন না, তিনি শ্রীনগর হইতে ৩২ মাইল দূরে উত্তরপশ্চিম কোণে অলকনন্দার অপর পারে তিহরীতে পলায়ন করেছিলেন সেইখানেই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। তিহরী রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে ইহার অধিক আমি জানি না।

"আজ তিহরীতে অবস্থান; স্বামীজি তাহাতে প্রথমে সম্মত ছিলেন না, তিনি এখন লোকালয় অপেক্ষা বন জঙ্গলই বেশী ভাল বাসেন; আমিও যদি তাঁরই মতে মত দিয়া বলি বন জঙ্গল লোকালয় অপেক্ষা ভাল তবে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা বলা হয়। হিমালয়ের মহামহিমাময় সৌন্দর্য্য অবশ্যই ভালবাসি; যখন পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের চিরতুষাররাশির উপরে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করে তখন হৃদয় সে দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু আর সে দিক হইতে ফিরিতে চাহে না, কিন্তু তাহারই পাশে পাশে হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে আমার সেই ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্রতম বাসভবনের একটা স্নিগ্ধ শ্যামছায়ার সুশীতল দৃশ্য আমাকে যে অন্ত-দিকে ফিরাইয়া লয় সে কথা অস্বীকার করি কি করিয়া; এই জীর্ণ কম্বলের মধ্য হইতে যে একটা মমতার গন্ধ ছুটিয়া বাহির হয় তাহা ঢাকি কি দিয়া? লোকালয়ের উপরে যে একটা আজন্ম টান তাহা যে আমরণের সঙ্গী তাহা গোপন করিবার উপায় কি? তাই লোকালয় দেখিলেই সেখানে দুই দিন বাস করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষুদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালীর পুণ্য দৃশ্য অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে দেখিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ অবস্থায় তিহরীতে একদিন বাসের ইচ্ছা হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। আমার আগ্রহাতিশয়দর্শনে স্বামীজিও তাহাতেই

ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে চাপিয়া বসিলেন, আমি সহর দর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম।

"পূর্ব্বদিন এখানে আসিবার সময়েই সহরের সমস্তটা একরকম দেখা হইয়াছিল, তবুও আজ আবার বাহির হইলাম। প্রথমেই রাজবাড়ীর দিকে গেলাম সহরের মধ্যে একটা উচ্চস্থানে রাজবাড়ী ; সিপাহী-সান্ত্রী অনেক দেখিলাম, পাছে অধিক অগ্রসর হইলে দুই চারিটি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এই ভয়ে একটু দূরে দাঁড়াইয়াই রাজবাড়ী দেখিতে লাগিলাম। রাজার বাড়ী বলিলে সহজেই মনে যে একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়, তাহার কিছুই এ বাড়ীতে নাই ; এই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসগৃহ শ্রীনগরের ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের কথা মনে হইল। কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীনগরে গিয়াছিলাম, যাহা দেখিয়াছিলাম, সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার ! রাশি রাশি ইট আর পাথর স্তূপাকারে পড়িয়া আছে—দুই চারি বৎসর পরে কোন পর্য্যটক সেখানে গেলে ঐ স্তূপাকার ইঁট পাথরকে সুশ্যামল শৈবালসজ্জিত দেখি একটা ছোট রকমের গিরিশৃঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেওয়ালগুলি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার বহুকাল হোতে একই অবস্থায় ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর যাঁদের জন্য তাহারা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ এই গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়া দিন কাটাইতেছেন ; একবারও হয় ত সে দুঃখের কথা সেই পরিত্যক্ত রাজ-অট্টালিকার কথা তাঁদের মনে হয় না। কিন্তু কত পরিব্রাজক, কত সন্ন্যাসী সেই ভগ্ন রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং কল্পনানেত্রে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের একটা

'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা———'

দৃশ্য দেখিতে থাকে। এই তিহরী রাজভবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সত্য সত্যই এ রাজবংশের অতীত গৌরবের দুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

অপর দিকে কুমার সাহেবের বাড়ী ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার

কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব মনে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাই সে দিকে গেলাম না। একবার মনে হইল, এই দূর পর্ব্বতের মধ্যে আমার স্বদেশবাসী একজন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি; কিন্তু কেমন বাধ-বাধ বোধ হইল। নিকটেই গঙ্গা, গঙ্গার ধারে গিয়া বসিলাম। আমাদের দেশে যেমন গঙ্গায় স্নানের ঘটা, শত শত নরনারী কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গার স্তব গান করিতেছে, এখানে সে দৃশ্য দেখিবার যো নাই; শীতপ্রধান দেশের লোক স্নানকার্য্যটি সংক্ষেপেই শেষ করে; কেহ বা মাসান্তে, কেহ বা দুই দশ দিন অন্তে, স্নান করে। স্নানের ঘাটের উপরেই একটা দেবালয়; আমি সেই দেবালয়ের সিঁড়িতেই বসিয়াছিলাম। বিদেশী লোক একাকী বসিয়া আছে দেখিয়া মন্দিরের পূজকমহাশয় আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং নানাপ্রকার কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাড়ী সহর হইতে অনেক দূরে; আজ ১৫ বৎসর এই মন্দিরের পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী আছেন। স্বর্গীয় মহারাজ প্রতাপ সা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাঁহারই আগ্রহে পুরোহিত মহাশয় তাঁহার নির্জন শৈলকুটীর ও তিন বিঘা জমি ছোট ভাইয়ের হস্তে দিয়া এখানে আসিয়াছেন; কিন্তু সে কাল আর নাই। বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সো দিন চলা গেয়া!" সেকালের জন্য এই প্রকার আক্ষেপ, কাতরোক্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শুনি, তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে অনেকেই সেকালের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন। এমন একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা, যাহা কিছু সেকেলে, যাহা কিছু পুরাতন, সে সকলকেই কেমন একটা অতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন। যাহা চলিয়া গিয়াছে, যাহা আর ফিরিবে না, তাহার উপর বোধ হয়, মানুষের মমতা হয়, এবং তাহারই জন্য সেগুলিকে অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অতীত কার্য্যের স্মৃতি থাকে, কৃত-কর্ম্মের সাফল্যমাত্র নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়, তার ঝঞ্ঝাটগুলি ত আর থাকে না; তাই সে এত মনোরম, তাই বর্ত্তমানের সহস্র সুবিধার উপরেও তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরোহিত মহাশয় সে কালের অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন; তখন পর্ব্বতে সোনা ফলিত, তখন গাভীগণ অকাতরে দুগ্ধদান করিত, মেঘ বারি বর্ষণ করিত; এই কলিযুগের শেষভাগে দেবগণ নিদ্রিত, পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, দেশের ঘোর দুর্দ্দশা। বিনা বাদপ্রতিবাদে এই সব কথা বহুদিন

হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কাজেই ইহার মধ্যে আর নূতনত্ব কিছুই দেখিলাম না। স্বাধীনরাজ্য, বাতাসেও সংবাদ বহন করে, এই ভয়েই হয় ত পুরোহিত একটি কথা গোপন করিলেন; নতুবা তিনি যদি বলিতেন যে, স্বর্গীয় রাজা প্রতাপ সার মত রাজা আর নাই, তাঁর সময়ের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান সময় হীনপ্রভ হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই সে কথার প্রতিবাদ ছিল না। বিদেশী লোকের সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে এ সব কথা বলা ভাল নহে, তাই পুরোহিত মহাশয় অন্য কথা পাড়িলেন। পুরোহিত পণ্ডিতব্রাহ্মণ, দুই চারিটি শাস্ত্রকথা, দশটি অনুষ্টুপচ্ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক না আওড়াইলে তাঁর প্রতিপত্তি থাকে কৈ? তাই তিনি শাস্ত্রালোচনার ভূমিকা আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রালোচনা বেশ কথা, কিন্তু তারও সময় অসময় আছে। শনিবারের দিন দেড়টার সময়ে আফিস বন্ধ হইলে কেরাণীগণ যখন ঊর্দ্ধমুখে রেলগাড়ী ধরিবার জন্য ছোটে, তখন দুই পয়সা দিয়া প্রকাণ্ড একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া তাহার মধ্যের পাঁচ কলম বোম্বাই অনিত্যতার বক্তৃতাপাঠ যেমন অসাময়িক, এই বেলা প্রায় দশটার সময়ে অস্নানে অনাহারে শাস্ত্রগ্রন্থ খুলিয়া বসাও তেমনি সময়োপযোগী নহে। সুতরাং দুই এক কথায় পুরোহিত মহাশয়কে নিরুত্তর করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি, প্রকাণ্ড একটা সিধা আসিয়াছে; দ্রব্য নানাপ্রকার, এবং তাহাদের পরিমাণও বেশী, আমরা দুইটি মানুষে এক মাসেও তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারি না। বুঝিলাম, এ প্রকাণ্ড সিধা রাজগৌরবপ্রকাশের জন্য, নতুবা আমাদের মত দুইটি মানুষের দুই বেলার আহারের জন্য এত জিনিসের দরকার হয় না।

তিহরীতে সদাব্রত নাই; সাধু সন্ন্যাসী অতিথি সকলেই প্রতি দিন অপরাহ্লে রাজবাড়ীতে সিধা পায়, এবং সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু গাঁজার পয়সাও পায়। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে; তবে শুনিলাম, পূর্ব্বে অতিথিসেবার যে প্রকার বন্দোবস্ত ছিল, এখন তাহা নাই। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীতে এ প্রকার হওয়াই সম্ভব; কুমারগণ যখন রাজ্য নিজহস্তে পাইবেন, তখন আবার সমস্তই পূর্ব্ববৎ হইবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সে দিন শুনিলাম, বর্ত্তমান রাজা পিতার ন্যায়ই দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ।

আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, এক জন অশ্বারোহী বিগল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে আসিতেছে; তাহার পশ্চাতে আরও দুই জন অশ্বারোহী; অস্তগামী সূর্য্যকিরণে তাহাদের সুবর্ণখচিত উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে; তাহার পশ্চাতে একখানি জুড়িগাড়ী, শেষে আরও কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক। শুনিলাম, প্রতিদিন অপরাহ্ণে রাজকুমারগণ মাতৃচরণে প্রণাম করিতে আগমন করেন, এবং এক ঘণ্টা থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান। রাজকুমারেরা আসিতেছেন শুনিয়া, বাজারের লোক সমস্তই রাজপথে কাতার দিয়া দাঁড়াইল, এবং রাজার গাড়ী যখন দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তখন সকলেই "জয় জয়, মহারাজা" বলিয়া নতশিরে অভিবাদন করিতে লাগিল। ইহাই এখানকার প্রথা। এ দৃশ্য আমার অতি সুন্দর বোধ হইল। আমিও যথারীতি অভিবাদন করিলাম।

রাজকুমারগণ চলিয়া গেলে, আমি তিহরী জেল দেখিতে গেলাম। এখানকার জেলের বন্দিগণ যথেচ্ছ বাহিরে বেড়াইতে পারে, তবে ভয়ানক অপরাধিগণের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা। এই জেলের মধ্যে নরহত্যাকারী নাথু উইলসনকে দেখিলাম। এই ভদ্রলোকের পরিচয় আবশ্যক। আমার মনে পড়ে, তিন বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান মিরারের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এই নাথু উইলসন সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধের কোনও কথাই আমার মনে নাই।

পর্ব্বতের মধ্যে দেরাহুন মসুরী প্রভৃতি সহর বসিলে, উইলসন নামে এক জন সাহেব দেরাহুনে বাস করেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠের কারবার আরম্ভ করেন, শেষে শিকারী রাখিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম, পাখীর পালক প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অগাধ ধন সঞ্চয় করেন, এবং সেই জন্যই ঐ দেশে Wilson money একটা প্রবাদবচন হইয়া গিয়াছে। এই উইলসন সাহেব একটি পাহাড়ী রমণীকে বিবাহ করেন; সেই রমণীর গর্ভে দুইটি পুত্র হয়; এক জনের নাম John কি Henry Wilson, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাথু উইলসন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চেহারাও সাহেবের মত, এবং চালচলনও তাই, তিনি বিবি বিবাহ করিয়া দেরাহুনে পৃথক বাড়ীতে বাস করেন। নাথু উইলসন অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হন, কিন্তু টাকার জোরেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, মুক্তি পান। অবশেষে কয়েকটি খুন করার অভিযোগে তিহরীতে অভিযুক্ত হন। অনেক চেষ্টা ও

অনেক অর্থব্যয়ে প্রাণদণ্ড হয় না, দশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। লোকটা ১২।১৩ জন লোককে হত্যা করিয়াও অনায়াসে অব্যাহতি পাইল। যে দিন তিহরীর কারাগারে তাহাকে দেখি, সত্য সত্যই আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সে দিন পশ্চিমদেশবাসী এক জন বন্ধুর নিকটে শুনিলাম, নাথু উইলসন কারামুক্ত হইয়া দেরাদুনে আসিয়াছেন; তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে; এখন বিষয়ের উত্তরাধিকার লইয়া দুই ভ্রাতায় মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছেন।

রাত্রে জিতসিং মিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; তিনি রাজসরকার হইতে এক পরওয়ানা বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এবং একজন পেয়াদা নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পেয়াদা পরওয়ানা লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে; তিহরীরাজ্যের মধ্যে আমরা যত দিন থাকিব, সেই পেয়াদা আমাদের সঙ্গে থাকিবে, এবং আমরা যে বেলা যেখানে থাকিব, সেই স্থানের লম্বরদার (আমাদের দেশের তহসিলদার) আমাদের খানাপিনার সরবরাহ করিবে। আমরা কিছুতেই সম্মত হইব না, মিয়াজি কিছুতেই ছাড়িবেন না; তাঁহার স্নেহের আবদার ছাড়াইতে পারিলাম না। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমরা ষোড়শোপচারে আহারাদি করিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলাম। প্রত্যূষে নহবতের সুন্দর টোড়ী আলাপে জাগ্রত হইয়া হিন্দু রাজার রাজধানী ত্যাগ করিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

সাহিত্যে প্রেম।

দেবত্ব।

সাহিত্যে যদি প্রেম দেখিতে চাও, তবে একবার সীতার পানে চাহিয়া দেখ। রাজর্ষির শান্তিময় সংসারে সীতা সুশিক্ষিতা ও প্রতিপালিতা। প্রেমময় রামের সহিত সীতা বিবাহিতা। তাই সীতা প্রেমের মোহিনী প্রতিমা। যে সীতা রামের সহিত রাজকিরীটিনী হইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পতির বনবাস হওয়াতে তিনি কি পতির সঙ্গে বনবাসে যাইতে কুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন? রাম ত তাঁহাকে বনবাসে লইয়া যাইতে চাহেন নাই,

সারিণী হই লেন। রাম যে তাঁহাকে এত বনকষ্ট ও ভয় দেখাইয়াছিলেন, সকলই বিফল হই ল। সীতা অকুতোভয়ে পতির অনুসারিণী হইলেন। বনভ্রমণকালে কেবল রা মের মুখপানে চাহিয়া সীতা কোনও কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করেন নাই, কোন ভ ীতা হয়েন নাই। প্রত্যুত, কাননবাসী ঋষিগণের আশ্রম দেখিতে রামের য ত খবোধ হইত, সীতারও ততই আনন্দ জন্মিত। পতির যাহাতে সুখ, আর্য্যনারীর তাহাতে সুখ—আর্য্যনারী পতির ছায়া। রাম যেমন আশ্রম-পীড়ানিবারণ করিয়া কাননে শান্তিবিধান করিতেন, তদাশ্রিতা প্রেমলতা তেমনি সেই দেশে প্রেমপুষ্প বিকীর্ণ করিতেন। প্রেমালাপে ও প্রেমব্যবহারে সীতা মুনিপত্নী ও বা লিকাগণকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। বন-বাসে রামের সম্মুখে শা ত, সীতার সম্মুখে প্রেম যাইত। তিনি প্রেমদূতী-রূপে সর্ব্বত্র উদিতা হ হার প্রেম বিশ্ববিসারী ছিল। তিনি রামের প্রেমরূপ— রাধা। অশোকবনেও তাঁহার প্রেমরূপে চেড়ীগণ ব । প্রেমরূপে তিনি শত্রুকেও মিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার জগৎ-বিসারী প্রেমরূপের যদি সম্যক ছবি দেখিতে চাও, তবে তাঁহার সহিত একবার গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে চল। সেই নদীতীরে কর্ণিকাবনবেষ্টিত রামের পর্ণ-কুটীরে সীতা নন্দনকানন বিরচন করিয়াছিলেন। ইতর প্রাণিগণও সীতাকে ভালবাসিত। বনহরিণীগণ সীতার হস্তে কুশাঙ্কুর গ্রহণ করিত। ময়ূর ময়ূরী সীতার সম্মুখে পুচ্ছবিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত। কপোতকপোতী বিশ্রব্ধমনে প্রেমালাপ করিত। বনমৃগগণ হিংসাপরিহার করিয়া সীতার কুসুমকাননে সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। প্রেমের কাননে শান্তিপুষ্প বিকশিত হইত। সীতার প্রেমসুখ বুঝি ধরিত না, তাই অমৃতধারায় গোদাবরী নৃত্য করিতে করিতে, সীতার প্রেমের পরিচয় দিতে দিতে, সুমধুরস্বরে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। কাননতরুগণ সীতার পূজোপকরণ পুষ্প সকল বর্ষণ করিত। সীতা সুখমনে পতিসেবা ও বনদেবীর পূজা করিতেন। রামের সুখ অযোধ্যার সিংহাসনে, কি এই পঞ্চবটীর কুসুমকাননে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। সীতা সেই কুসুমকাননে স্বর্গসুখ আনিয়াছিলেন। সীতার পঞ্চবটী প্রেমময় রাজ্য। কিন্তু সীতা দারুণ কষ্টে পড়িবেন বলিয়াই বুঝি এত সুখভোগ করিয়া লইলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি প্রেমের এই অপূর্ব্ব চিত্র দিয়াছেন। কালিদাসের ঋষি-

এড্যাম এবং ইভের প্রেমময় চিত্র কি বাল্মীকির প্রেমচিত্রের সমতুল্য হইতে পারে? এড্যাম এবং ইভ সদ্যঃ সৃষ্ট হইয়া শান্তিময় প্যারাডাইসের সুন্দরবনে অবস্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, প্রেমহিংসা প্রভৃতি কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রেম, প্রেমই নহে ... খ, সুখই নহে। যাহাদের কিছুই জ্ঞান নাই, তাহাদের অজ্ঞানতায় প্রেমর ...র সুখবোধ হইত না। তাই তাহাদের প্রেমচিত্র ও রামসীতার প্রেমচিত্রে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। সীতা দুঃখময় কাননকে প্রেমময় সুখধামে পরিণত করিয়াছিলেন। ইভ সুখময় কাননের অযোগ্যা বলিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন। একজন পাপসংসারকে প্রেমময় পবিত্র করিয়াছিলেন; অন্য জন পুণ্যময় সংসারে পাপকণ্টক আনিয়া তাহা দ্বেষহিংসায় ... করিয়াছিলেন।

অন্য এক আদর্শের প্রেম আর্য্য ভক্তি ... য সাত্বিক প্রেম স্থূল মানুষচিত্রে প্রদর্শিত। সেই প্রেমময়ী প্র... রী -গোপীগণ যে প্রেমের সহচরী। রাধিকা মধুর গোপীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। প... স্ত্রীর প্রেম যত উচ্চতায় উঠিতে পারে, রাধিকা সেই উচ্চতায় উঠিয়া কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। তাই সেই ভক্তির নাম প্রেমভক্তি—মানুষ দাম্পত্য প্রেমের পরিপূর্ণতা ভগবানে সমর্পিত—ভগবান প্রাণবল্লভ। রাধিকা ও গোপী ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে নাই, ভগবান আমার প্রাণবল্লভ। আর বলিয়াছিলেন সত্যভামা, কিন্তু যে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম দেখিয়াছেন, তিনি সত্যভামার দর্পিত বাক্যে হাসিতেন—সে দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। সত্যভামার প্রেম দর্পিত ভক্তি—রুক্মিণীর আত্মসমর্পিতা ভক্তির সহিত তুলনায় তাহা অতি দীন। রুক্মিণীর আত্মসমর্পিতা ভক্তির সহিত দাম্পত্য প্রেমের মধুরতা মিশিয়া, গোপীপ্রধানার ভক্তি পূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকা সেই প্রেমভক্তিতে উল্লাসিনী, কৃষ্ণলীলাময়ী, কৃষ্ণপ্রেমে সংসারিণী, শ্যামপ্রেমানুরাগে পাগলিনী, শ্যামপ্রেমে অভিসারিণী, অভিমানিনী, বিহারিণী ও বিলাসিনী। কৃষ্ণই রাধার সর্ব্বস্ব ধন, সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বচিন্তা। তিনি সেই শ্যামপ্রেমে মোহিতা। নিত্য শ্যামসহবাসসম্ভোগিনী হইবার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন। কে বলে রাধিকা কৃষ্ণবিরহিণী? তিনি শত বৎসর কৃষ্ণধ্যানে ও স্বপ্নে কৃষ্ণকেই দেখিতেছিলেন। যে প্রেম এক পলের নিমিত্তও কৃষ্ণকে হারাইতে পারে না, সেই প্রেমের সাধনাই কৃষ্ণবিরহ—বিরহেই প্রেমের পরিপুষ্টি। বাসন্তী কৃষ্ণরূপময় বৃন্দাবন ধামে, গোপীগণের নিয়ত ব্রজবুলীময় মধুর ভাষে ... কৃষ্ণ-

কথায় ধিকা কৃষ্ণস্বপ্নে ভোর হইয়াছিলেন। বিরহে তাঁহার তন্ময়তা পরিপূর্ণ হ ছিল। রাধিকা দেখাইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণবিরহ অসম্ভব কথা; রাধাকৃষ্ণ ..নং সংসারের কদম্বমূলে বিরাজিত। তাই উন্মত্তা রাধিকা সর্ব্বদাই দেখিতেন,—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।"

সীতার বির অন্যরূপ। সীতার বিরহ সুখের বৃন্দাবনধামে নয়; সে বিরহ রাক্ষসপুরীর চেড়ী পূর্ণ অশোকবনের যন্ত্রণাগারে। কিন্তু সেই যন্ত্রণাগারে সীতা অশোকবনকে রামময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই সেই রামময় স্মরণে জীবিতা ছিলেন ও যাহং ক্ষসকুলের ভয়ে ভীতা হইয়া আরও একান্ত মনে সেই শ্রীরামকে ইতেন। তাঁ । আতঙ্ক তাঁহার ভক্তি ও পতি-প্রেমকে আরও পরিপুষ্ট ক কৃষ্ণের প্রেমরূপ অহরহঃ ভাবিতেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি। তাঁহার পতিধ্যান আরও তীব্রতর হইয়াছিল। বিশ্রব্ধ মনে রামের কথা কহিতেন কেবল সরমার সঙ্গে—ততই মধুর ভাবে, যত মধুর ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন শ্রীমধুসূদন। অগ্নিপরীক্ষাকালে এই প্রেমপ্রগাঢ়তার পরীক্ষা হইয়াছিল। রামের প্রেমাঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া অশোকবনে রক্ষিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আশা ছিল, রামের পুনর্লাভে আবার সেই প্রেমাঙ্কে পুনঃস্থাপিতা হইবেন। তিনি সেই প্রেমাশাতেই জীবিতা ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে যখন বনবাসে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার কোন আশা ছিল? তবু সীতা নিজ আর্য্যপুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলেন। ছিন্না লতার ন্যায় তিনি রামাশ্রম হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তাপসাশ্রম অশোকবন নহে সত্য, কিন্তু এ বন যে অশোকবন হইতেও ভয়ঙ্কর—আশাহীন দেশ! তাপসবনে সীতা নিরাশ প্রেমের চিত্র। রাম নিজে তাঁহাকে প্রেমাঙ্ক হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সীতার আর অভিমানের স্থান নাই—হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! তথাপি সীতা কেবল রামপ্রেমে সকলের আদরিণী হইয়াছিলেন। রামপ্রেমে তিনি দিবানিশি বিষণ্নমনে ও অধোবদনে অশ্রুবর্জ্জন করিতেন। এক একবার সন্তানের মুখপানে চাহিয়া রামকে স্মরণ করিয়া সেই রূপের পূজা করিতেন। সন্তানের মুখে রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে দেখিতেন, আর দর দর অশ্রুধারায় নির্জ্জনবাস ভাসাইয়া দিতেন।

তাঁহার প্রেম কত প্রগাঢ় হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পাতালপ্রবেশকা প্রতীত হইয়াছিল। রামের মুখ হইতে আবার পরীক্ষার কথা শুনিয়া স বুক ফাটিয়া গেল। পিতৃসম বাল্মীকি, অন্যান্য গুরুজন, দেবরগণ, পু এবং সভার সর্ব্বজনসমক্ষে তত হতমান হইয়া সাধ্বী আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া প্রেমপ্রতিমা সতী কেবল রামের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। সতীর প্রেম পবিত্র নিকেতনে বিসর্জ্জিত হইল।

সতীর পতি-অনুরাগ কত অমানুষ সীমায় যাইতে পারে, তাহা এই সীতার দৃষ্টান্তে প্রতীত হয়। প্রেমময়ী সীতা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সীতা সতীত্বের এবং পতিপরায়ণতার চরম সীমা। আর্য্যসাহিত্য এই সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর্য্য নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সেই জন্য এক মহাবল হইয়াছে। সতীর নামমাত্রে গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সতী একধ্যানে একমনে কেবল নিজ পতিকেই জানেন। পতিনিন্দায় ভবানী প্রাণত্যাগিনী হইয়াছিলেন। সতী পতির গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া যমও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সতী গলিতকুষ্ঠ পতিকে তপ্তকাঞ্চনশোভাময় দেহবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সাবিত্রী যমালয় হইতে পতিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। যত দিন সতীর গৌরব আর্য্যনারীকে পরিপূর্ণ করিবে, ততদিন আর্য্যনারী এক মহাশক্তি। সতীই যথার্থ পতিব্রতা। সতী যেমন আপনি দেবী, তিনি নিজ পতিকেও দেবতুল্য ভাবেন। দেবতুল্য ভাবিয়া নিজ পতির দেবসেবা করেন। আর্য্যশাস্ত্র আর্য্যদেশকে সতীত্বগৌরবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আর্য্যধাম তাই আজও সতীর অধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এই গৌরবে আমাদের শিশু কন্যাগণ বালিকাবস্থা হইতে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। গান্ধারী তাই বিবাহকালেই পতির অন্ধতা শুনিবামাত্র নিজ চক্ষু চিরদিনের নিমিত্ত বসনে ঢাকিয়াছিলেন। সাধ্বী সাবিত্রী বিবাহ হইবার পরই মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া পরিশেষে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন। আর্য্যবালা তরুণবয়সেও পতিহীন হইলে অমনি হাহাকার করিয়া উঠেন। এই গৌরবপূর্ণ ভারতে সীতা সর্ব্বজনপূজনীয়া হইয়া রহিয়াছেন। কেবল সীতা কেন? সকল সতীই এখানে পূজনীয়া—সতী ভবানী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, গান্ধারী, দময়ন্তী প্রভৃতি সবাই ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া আছেন। তাঁহাদের

নাম করিবামাত্র মনে পবিত্র ভাব সঞ্চারিত হয়। আমরা তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়া সীতার কথা উল্লেখ করিয়াছি।

যে সতীত্ব পাতিব্রত্যধর্ম্মের গৌরব আমাদিগের পৌরাণিক কাব্যে, নাটকে এবং উপন্যাসে ঘোষিত হইয়াছে, যে গৌরবে পূর্ণ হইয়া ভারতীয় আর্য্যললনা ধৈর্য্য, তিতীক্ষা, অধ্যবসায়, কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিতা হইয়া রমণীরত্ন—যদ্দ্বারা তিনি পরিপূতা হইয়া দেবোপমা হইয়াছেন, সেই সতীত্ব ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের গৌরব ভারতে নানা উপায়ে রক্ষিত হইয়া থাকে।

(১) কথকতা ও গান। আমাদের বাক্‌চতুর ও বুদ্ধিমান কথকগণ স্ত্রী-জাতীয় শ্রোতৃবর্গের মনে এই দুই ধর্ম্ম চিরদিন বদ্ধমূল করিয়া দিয়া আসি-তেছেন। পৌরাণিক রামায়ণ এবং মহাভারত গানেও সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। আজিও এই দুই উপায় বঙ্গধামে বিদ্যমান আছে। তদ্দ্বারা আমাদের পুরাণোক্ত পতিভক্তি ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত এবং কীর্ত্তিত হইতেছে। গায়ক এবং কথকেরা নানালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সেই দুই ধর্ম্মের গৌরব মনোহর গানে এবং সুন্দর বাক্‌কৌশলে বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

(২) গল্প কথায় আমাদের বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ কর্ত্তৃপক্ষগণ রামায়ণ মহাভারতের গল্পাদি মুখে মুখে গল্প করিয়া, এবং যাঁহারা পড়িতে জানেন, তাঁহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়া, গৃহধামে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব বিলক্ষণ প্রচার করিয়া থাকেন।

(৩) ব্রতানুষ্ঠান। শুধু কাণে শুনিয়া সেই গৌরবে আর্য্যকন্যাগণ পূর্ণ হয়েন, এমত নহে; অনুষ্ঠানেও তাহাতে শিক্ষিতা হইবেন বলিয়া, আমাদের সমাজে ঋষিগণ রমণীকুলের জন্য নানা ব্রতপদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে সত্যভামা ও সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিপূজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আমাদিগের বৃদ্ধাগণ আজিও তাহা মুখে গল্প করিয়া বলিয়া থাকেন। শুধু গল্পে নহে, সেই ব্রতাদির নিজে অনুষ্ঠান করেন, এবং বধূ ও কন্যাগণকে তাহাতে প্রবৃত্ত করান। প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠান, ব্রতাদি ও পূজার শেষে যে সকল কথা শ্রবণ করিতে হয়, তাহাতেও

রণে ঐ দুই ধর্ম্ম যথাসাধ্য পালন করিয়া, বালিকা ও নববধূগণকে তাহার গৌরবে পূর্ণ করেন। আমাদের কন্যা ও বধূগণের সমক্ষে নিত্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা তাহারা দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে থাকে, এবং তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি স্বতঃই ধাবিত হয়। এ শিক্ষা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া দিতে হয় না।

এই সমস্ত উপায়ই আমাদিগের গৃহধামের নারীশিক্ষা। এইরূপ নারী-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী। এই শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের আর্য্যনারী নানা গুণে ভূষিতা হইতেন, এবং আজিও যেথানে বিলাতী নারীশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেখানে উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ শিক্ষা ভক্তিপূর্ণ পৌরাণিক সাহিত্যপাঠ—যে সাহিত্যে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব অতি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সাহিত্যপাঠ। তাহা বিলাতীরুচি-সম্পন্ন উপন্যাস-পাঠ নহে। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালীতে গ্রন্থপাঠ যত না থাকুক, মৌখিক গল্প কথায় আচারে অনুষ্ঠানে ও দৃষ্টান্তে শিক্ষার প্রভাব ততোধিক। তাহাতে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের সংস্কার দৃঢ়রূপে আমাদের তরুণবয়স্কা তরল-মতি কামিনীকুলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেয়। তাহারা সেই গৌরবে পূর্ণ হইয়া নিজ আচরণ ও দৃষ্টান্তে ঐ দুই ধর্ম্মকে কুলক্রমাগত করিয়া আনিতেছেন।

কিন্তু এই নারীশিক্ষাপ্রণালীর আজি অনেকাংশে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। এমন সুন্দর ও পরিপাটী শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তে এখন বিলাতী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিলাতী সাহিত্যে আমাদিগের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব ঘোষিত হওয়া দূরে যাউক, তাহাতে বরং বিপরীত কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ, ভারতললনার সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের। একমাত্র পতি-অনুরাগে পূর্ণ হইয়া তাহাতেই একনিষ্ঠ থাকা ভারতললনার সতীত্ব। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সতীত্ব তাহা নহে। সে সমাজের সতীত্ব এইরূপ :—

প্রথমতঃ, সেই সমাজে রমণীকুল অনেকবার পতি গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং পত্যন্তর-গ্রহণরীতি প্রচলিত থাকাতে, আর্য্যসমাজে যেরূপ একনিষ্ঠ-তার গৌরব, পাশ্চাত্য সতীত্বে তাহা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় সমাজে রমণীরা ইচ্ছাবরা; তাঁহারা নিজ ইচ্ছায়

মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত অধিক। এই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত হিন্দু রমণীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সমঞ্জসীভূত নহে। কাজে কাজেই এই দুই আদর্শে বিরোধ উপস্থিত হয়।

ভারতীয় সমাজ স্বেচ্ছাচার হইতে উন্নীত * হইয়া, মনুষ্যোচিত ব্যবহার সংস্থাপন পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রকার সতীত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেই আদর্শস্থানীয় সতীত্বগৌরব তাঁহাদের সাহিত্যে ঘোষিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের সতীতে আর্য্যসতীত্বের বিশেষ প্রকার এবং অসামান্য গৌরব না থাকাতে সে সতীত্ব ইউরোপীয় সাহিত্যে কীর্ত্তিত হয় নাই। সামাজিক আচার ব্যবহারেই তাহার পরিচয় ও কীর্ত্তন। এই আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্তে ইউরোপীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ হওয়াতে, তৎপাঠে যে ফলোদয় হয়, সেই ফল আমাদের সতীত্বের গৌরব ক্রমশঃ ধ্বংস করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, আমাদের নারীশিক্ষাপ্রণালী একপ্রকার তরিবদ মাত্র। লেখাপড়া জানিলে, পুরাণাদি পাঠে নিজে সমর্থা হইয়া, আর্য্যনারী সেই শিক্ষাপ্রণালীর কেমন অধিকতর গৌরব বাড়াইতে পারেন, তাহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে। কিন্তু লেখাপড়া না শিখিলেও অধিক ক্ষতি নাই। কারণ, প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী আচরণে ও ব্যবহারে, শ্রবণে ও দৃষ্টান্তে। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিশেষতঃ সমস্তই সতীর আচরণে নির্ভর করে। যে ইউরোপীয় সমাজে ভারতীয় সতীত্বের অভাব, সেখানে সুতরাং ভারতীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সমধিক অভাব হইবে। কারণ, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আর্য্যসতীত্ব হইতেই সমুদ্ভূত। এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হেতু ভারতীয় ললনা যে সমস্ত অসামান্য গুণের আধার হইয়াছেন, সেই সমস্ত গুণ ইউরোপীয় ললনায় অল্পপরিমাণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে যে ললনার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, সে ললনাচরিত্রে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের তেমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নাই। ফল এই, সে সাহিত্যপাঠে আমাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব কমিয়া যায়। সেই সাহিত্যের যতই অনুশীলন হইবে, ততই হিন্দুললনার গুণাংশও ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। বাস্তবিকই এক্ষণে আমরা এই কুফল প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ইউরোপীয় সমাজে যে সতীত্ব প্রচলিত আছে, সভ্যতার আদিম অবস্থায় সেইরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন ভারতের স্থানে

---

* মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত শ্বেতকেতুর বিবরণ কে না জানে?

স্থানে তাহা যে বিদ্যমান ছিল, এমত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়-কালে সহদেব যে প্রাচীন মাহিষ্মতী পুরীতে গিয়াছিলেন, তথায় স্ত্রীলোকেরা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিত। পাণ্ডুরাজ কুন্তীকে বলিতেছেন ঃ—

"পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। তির্য্যগ্‌যোনিগত কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি যে ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাও তদনুসারে চলিত। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।"

তৎপরে শ্বেতকেতুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাণ্ডুও বলিয়াছিলেন, মহিলা-গণের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা তির্য্যগ্‌যোনিগত ব্যবহার। সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ ভারতে এ ব্যবহার পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল। এই ব্যবহার পরিবর্জ্জন করিয়া ভারত একদা দেবত্বে উঠিয়াছিল। সেই দেবত্ব ছাড়িয়া আবার কি আমরা তির্য্যগ্‌যোনিগত ব্যবহারে ফিরিয়া যাইব ?

ইউরোপীয় সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য ; আর্য্য সাহিত্যে প্রেম, মানবপ্রকৃতিকে উচ্চে তুলিয়া পবিত্র করিয়াছে। মহা-শ্বেতার প্রেম পবিত্র হইয়া দেবারাধনায় পরিণত হইয়াছিল। মহাশ্বেতা কি দেবারাধনার মূর্ত্তি, না প্রেমের পবিত্র ছবি! অচ্ছোদসরোবরতীরে কাননাভ্য-ন্তরস্থ দেবমন্দিরে মহাশ্বেতা দেবী না মানবী! দেবপূজাচ্ছলে তিনি একচিত্তে সেই নির্জন গহনে কাহার পূজায় নিরতা আছেন? পতিপ্রেমে ও পতির আরাধনায় বাণভট্টের মহাশ্বেতায় যেরূপ পবিত্রতা, তদ্রূপ পবিত্রতা কালি-দাসের উমাচরিত্রে। অপ্সরোধামে শকুন্তলা ততই পবিত্রতায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পবিত্র প্রেমস্পর্শে মানবপ্রকৃতি পবিত্র হইয়া গিয়াছে!

সতীতে পতি অনুরাগ এত প্রগাঢ় যে, সেই অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া সতী আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। প্রেমে আত্মহারা সতী পতির সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে মিশিয়া যান। পতির ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা এবং পতির সুখে নিজ সুখ মিশাইয়া দিয়া, সতী দাম্পত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান। আর্য্য-ধামে পতির সহিত পত্নীর স্বার্থ এক, সুখ এক, স্বর্গ এক। এরূপ একতা না থাকিলে দম্পতী একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাইবে কি প্রকারে? ইউ-রোপে স্বার্থের বিভিন্নতা ও রুচির বিভিন্নতা এবং পারলৌকিক ইষ্টের

বিভিন্নতা থাকাতে, ভারতীয় দাম্পত্য প্রেমে যেরূপ আত্মোৎসর্গ, একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা দেখা যায়, পাশ্চাত্য সমাজের দাম্পত্য প্রেমে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেখানে দম্পতীমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় ললনা একাগ্রচিত্তে সর্ব্ববিধায়ে পতির অনুগামিনী হইয়া পতির সহধর্ম্মিণী হন। সর্ব্বপ্রকারে পতির এইরূপ সহধর্ম্মিণীর পদে ইউরোপীয় ললনার উঠিবার যো নাই। ইষ্টের বিভিন্নতা, তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেয়। সেই জন্য আমরা সতীর প্রেমপ্রগাঢ়তার ছবি ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই না। সহধর্ম্মিণীর দেবতুল্য সতীর চিত্র কেবল আর্য্য সাহিত্যে লক্ষিত হয়। সেই প্রেমচিত্রে দেখা যায়, সতী সুধু ইহজীবনে পতির সহিত মিলিয়া এক হয়েন নাই, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, পরলোকেও এক হইয়া দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করেন।

সতী পতিভক্তিতে যে আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করেন, তাহাই ভগবদ্ভক্তির নিদান। ভগবানে ততই আত্মোৎসর্গ না করিলে ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায় না। যে ভগবৎপ্রেমে ভক্ত আপনাকে ভগবানের পদে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা মিশাইয়াছেন, তাঁহার আনন্দে আপনার সুখ মিশাইয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ভগবৎপ্রেমের ছায়া সতীর পতিভক্তিতে লক্ষিত হয়। তাই সতী দেবীরূপে প্রতীয়মান। সীতা ও রাধিকা এই দ্বিবিধ প্রেমের আদর্শ, অথচ দুই জনেই পরস্পরের প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই, সীতার পতিপ্রেম অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত—এত উজ্জ্বল বর্ণে যে, তাহাতে দেবভক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রাধিকায় ভগবৎপ্রেম এত উজ্জ্বল যে, তাহাতে পার্থিব পতিপ্রেম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পতিপ্রেম ভগবৎপ্রেমে আরোহণ করিয়া রাধিকাসুন্দরীর প্রেমভক্তি। প্রেমের এই ক্রম আর্য্য সাহিত্যে। আর্য্য সমাজেও এই ক্রম। আর্য্য সমাজে যে নারী বিধবা, জগৎপতিই তাঁহার স্বামী। তাঁহার দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তি সহজে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়। যেরূপে সহজে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপে সমাজগঠন, সমাজের রীতিনীতিতে আবদ্ধা হইয়া আর্য্যনারী পতিভক্তিতে দেবভক্তি অভ্যাস করেন। স্বামীকে একদা প্রণয়ের পরমবস্তুরূপে যত্ন, আদর, সেবা ও পূজা করেন। স্বামীর প্রতিমাপূজা হইতে তাঁহার পক্ষে দেবপ্রতিমাপূজায় সমুত্থিত

অনুরক্ত, সেই দেবভক্তিপূর্ণা সতীর স্বামিপূজা সহজ কথা। তাই, সেই স্বামীকে পূজা করিয়া সতী দেবতার পূজা করেন। এই পতিব্রতা সতীর প্রেমে আর্য্য সাহিত্যে দেবত্বের সৌন্দর্য্য।

পশুত্ব।

আর্য্যকবিগণ অনেক আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আর্য্যসতী-চরিত্রে যে প্রেমাদর্শের সৃষ্টি, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছি। তাহাতে উক্ত হইয়াছে, সতীর প্রেম গোপীপ্রেমের অনুরূপ—ততই নিঃস্বার্থ, ততই একনিষ্ঠ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও স্বামিগৌরবে পরিপূর্ণ। এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া তাহা দেবভক্তিতে পরিণত হয়। তখন সেই প্রেম দেবতায় উৎসর্গীকৃত হইয়া মানবকে দেবত্বে লইয়া যায়। আমরা এই সতীপ্রেমের ধর্ম্মালোচনা করিলে প্রেমতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি,—

(১) প্রেম, কামানুরাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। পতিকে সুখী করিয়া পতিব্রতা সতী আপনি সুখিনী হইতে চান। বাৎসল্য প্রেমের যে উচ্চ ধর্ম্ম, সতীপ্রেমেরও সেই লক্ষণ। সন্তান-সন্ততিকে সুখে রাখিতে পারিলে যেমন জনকজননীর সন্তোষ, পতি সম্বন্ধে সতীরও অনুরাগ তদ্রূপ। সুতরাং প্রকৃত প্রেম চাহে না, আপনি সুখী হই; প্রেম প্রণয়ভাজনকে সুখী করিতে চায়। সেই সুখে প্রেমের পরিতৃপ্তি। কিন্তু কাম এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। অন্যদ্বারা কামানুরাগ সুখসম্ভোগ করিতে চায়। ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া কামরিপু চরিতার্থ হইতে চাহে। প্রেম পরার্থপর, কামানুরাগ স্বার্থপর।

(২) প্রেম পরার্থপর বলিয়া সতী পতির দোষগুণে নিরপেক্ষ। গুণে যাহার অনুরাগ, দোষে তাহার বীতরাগ। গুণ দেখিলে যে ভালবাসিবে, দোষ দেখিলে সে ঘৃণা করিবে। দোষ সকল পুরুষেরই আছে, সুতরাং রূপজ কি গুণজ অনুরাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রেম দোষগুণের পক্ষপাতী নহে। জনকজননী যেমন সন্তান সন্ততির দোষ গুণের নিরপেক্ষ হইয়া তাহাদিগকে অতি যত্নে ও আদরে স্নেহমমতা করেন, তাঁহাদের প্রেম যেমন সন্তানের দোষগুণনিরপেক্ষ, প্রকৃত সতীর প্রেম তেমনি পতির দোষ-

সতীর পরম পূজনীয়। সুধু মনু কেন? মহাভারত প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্র এই উপদেশ। কামানুরাগ, প্রেমের এই উচ্চতায় উঠিতে পারে না। কামানুরাগ রূপ ও গুণের বশীভূত। রূপ চিরস্থায়ী নহে, এবং গুণ কখন একাধারে দোষবিহীন হইতে পারে না; এজন্য, তাহার পাত্রাপাত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজি যাহাকে রূপে বা গুণে ভাল বোধ হইল, কামনা তাহাকে বরণ করিল। কালে, অন্য এক জন তদপেক্ষা অধিকতর রূপবান্ বা গুণবান দেখা গেল, কামনা অমনি সেই দিকে নিজ প্রবৃত্তি পরিচালিত করিল। সুতরাং কামনা কখন স্থির নহে, তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম স্থিরতা। প্রেম নিশ্চল ও একনিষ্ঠ হইয়া থাকে; কারণ, তাহা দোষে বিচলিত হয় না, এবং গুণের পক্ষপাতী নহে। আর্য্যসতীর প্রেম তাই একান্ত অনুরাগপূর্ণ, স্থির, অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ। কিন্তু কামান্ধ জনগণের অনুরাগ সর্ব্বদাই অস্থির এবং বিচলিত হইয়া থাকে।

(৩) প্রকৃত প্রেম নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ বলিয়া তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ। যাহা দোষগুণের নিরপেক্ষ, অন্য দ্বারা যাহা সুখী হইতে চাহে না, তাহার আকাঙ্ক্ষা কি? সতীর প্রেম বিনিময় ও ব্যবসা নহে। সতী বলিবে না, আগে তুমি ভাল বাস, তবে আমি ভাল বাসিব;—আগে দাও, তবে গ্রহণ কর। প্রকৃত প্রেম এরূপ বিনিময়ব্যাপার নহে। শকুন্তলা তরুলতা ও মৃগকে ভালবাসিয়া কি সে ভালবাসার বিনিময় চাহিতেন? পতিপ্রেম স্পৃহনীয় বটে; কিন্তু তাহা না হইলে যে সতী পতিকে ভাল বাসিবেন না, এমন কিছু কথা নাই। তবে সতীপ্রেমের সহিত পতিপ্রেম সংযুক্ত থাকিলে সে মিলন 'সোনায় সোহাগা হয়'; তাহাতে যেরূপ সুখোদয় হয়, গানে তাহা বলিতেছে,—

> "কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
> ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।"

তথাপি সতী পতিপ্রেমের নিরাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পতিকে ভালবাসেন। সেই দৃষ্টান্তে নিধু গাইয়া গিয়াছেন,—

> "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
> আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

বাৎসল্য প্রেম যেমন নিরাকাঙ্ক্ষ, দাম্পত্যপ্রেম তেমনি হওয়া যাই। সন্তান সন্ততি ভালবাসিবে বলিয়া কি জনক জননী অপত্যস্নেহের বশীভূত হন? কই

আমাদের সন্তানেরা ভালবাসিতে শিখিবে, তবে আমরা তাহাদিগকে ভালবাসিব ও যত্ন করিব? তাঁহারা সে ভালবাসার নিরপেক্ষ হইয়া নিজ অপত্যকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন। আর্য্যসতীও তদ্রূপ পিতা কর্ত্তৃক উপযুক্ত বরে প্রদত্তা হইয়া পতিগৃহে আসিয়া পতিপ্রেমলাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না—কবে পতি ভালবাসিবেন, তবে তাঁহাকে ভালবাসিব। তিনি বিবাহের পর হইতেই পতিসেবায় নিযুক্ত হয়েন, এবং তাঁহাকে জীবনসর্ব্বস্বধনজ্ঞানে যত্ন ও আদর করিতে থাকেন। পতিরও অনুরাগ তাঁহাতে ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতে থাকে। পতিও পত্নীর ভালবাসা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না। বৈবাহিক যজ্ঞসূত্র-ধারণাবধি পতি, পত্নীর প্রতি সস্নেহনয়নে দেখিতে থাকেন। কারণ, তিনি যেমন নিজ পত্নীকে আপনার সহধর্ম্মিণী বলিতে পারেন, এক জন ইংরাজ পতি নিজ পত্নীকে সেরূপ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন না। যে হেতু, ইংরাজ পতিপত্নীর সম্বন্ধ চিরকালের জন্য না হইতে পারে, এবং এ দেশে স্ত্রীজাতির বহুবার বিবাহ প্রচলিত থাকিলে সেইরূপই ঘটিত। আর্য্য দাম্পত্যপ্রেম সুতরাং বিনিময়-নিরপেক্ষ এবং প্রেমাকাঙ্ক্ষাহীন। কিন্তু কামানুরাগ ঠিক বিপরীত। সে অনুরাগ পরমুখাপেক্ষী। অপরের অনুরাগ না পাইলে কামানুরাগ উদ্দীপিত হয় না; তাহা পরস্পরবিনিময়ব্যাপার। এই বিনিময়ব্যাপার সম্পন্ন না হইলে, পশুপক্ষীর দাম্পত্যপ্রেম সংঘটিত হয় না বলিয়া, এই অনুরাগ মনুষ্যলোকে পশুত্ব নামে কলঙ্কিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের ন্যায় কামানুরাগ নিরাকাঙ্ক্ষ নহে।

প্রেম আর এক কারণেও কামানুরাগ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। সতী পতিগৌরবে পরিপূর্ণা। ব্রজগোপীগণ যেমন জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মহান্ আর কিছুই নাই, পতির গৌরব সতীর নিকট ততোধিক। সন্তান জননীর নিকট প্রিয়তম পদার্থ, এবং জননীও সন্তানের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। সুতরাং প্রকৃত প্রেম "মাহাত্ম্যজ্ঞানে" পরিপূর্ণ। কে বলে, সমানে সমানে নহিলে প্রেম হয় না? প্রভু দাসকে ভালবাসেন, দাসও প্রভুকে ভালবাসে; তদ্রূপ গুরু শিষ্যকে এবং শিষ্য গুরুকে। সম্পর্কের উচ্চনীচতা থাকিলেও প্রেমের বাধা নাই। প্রেমভাজন প্রেমিকের নিকট অতি ব্যথার সামগ্রী। তাহাকে ছোট করিতে গেলে প্রেমিক অমনি বেদনা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠেন, কি, আমার অমুক কেহ নয়? অমুকের চেয়ে

ভাজন তাঁহার চক্ষে স্বর্ণময়। স্পর্শমণির ন্যায় প্রেমনিধি যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে স্বর্ণময় করিয়া তোলে; কিন্তু কামানুরাগের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। যেখানে বাস্তবিক উচ্চনীচতা আছে, কামানুরাগ সেখানে নিজ বিষয়কে সমান করিয়া তুলে; সাম্যভাবে আনিয়া অনুরাগের বিনিময় চাহে। কাম, নীচকে উচ্চে তুলে, এবং উচ্চকে নীচ করে; ছোট লোক বড় হইয়া এবং বড় লোক ছোট হইয়া যখন সমান হয়, তখন কামানুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে।

প্রকৃত প্রেমের সহিত কামানুরাগের এইরূপ বিভিন্নতা। প্রেম মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে, কিন্তু কামানুরাগ তাহাকে পশুর সহিত সমতুল্য করে। নিজে প্রেমময় হরি মানবে প্রেমরূপে দেখা দেন। মানব এই দেবাংশকে যত বিস্তৃত করেন, ততই তিনি প্রেমময়ের নিকটবর্ত্তী হয়েন, এবং ততই তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতে যান। কিন্তু যত কামরিপুপরতন্ত্র হয়েন, ততই তিনি নিজ প্রকৃতিকে পশুভাবে পরিণত করিতে যান।

আর্য্যসাহিত্যে সতীপ্রেমের ধর্ম্ম কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি। সেই প্রেমের সহিত কামানুরাগের বিভিন্নতা দেখাইবার কারণ এই যে, সেই সাহিত্যেই উক্ত দ্বিবিধ অনুরাগেরই চিত্র আছে। আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, আর্য্যসাহিত্যে মূলেই ইন্দ্রিয়লালসার ছবি নাই। আমরা বলি, সে ছবির যে কলঙ্ক এবং প্রেমের যে উচ্চ গৌরব, তাহা সেই সাহিত্যে তদ্রূপেই দেখান হইয়াছে। যাহা নিশ্চয় পাপচিত্র এবং পশুত্ব, তাহা সেই কলঙ্করেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্র দেবতা হইয়াও শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং অহল্যার পাপস্পর্শও শাপে বিশোধিত হইয়াছিল। চন্দ্র ও তারার প্রণয় তদ্রূপ ঘৃণার্হ, এবং পাপরূপেই কলঙ্কিত। দেবতাতেও বিভিন্নতা নাই! দেবতারাও কখনও কখনও পাপকলঙ্কিত হন। যেখানে কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, সেইখানেই কেবল আর্য্য-সাহিত্যে কামানুরাগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাম, রিপুরূপে কোনখানে দেখা দেয় নাই। তাহা অপত্যোৎপাদনের উপায়স্বরূপ দেখা দিয়াছে। কোনও মহাজনের জন্মদান আবশ্যক হওয়াতে কামের উদ্ভব হইয়াছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্তই তাহার স্থিতি, এবং তৎপরেই তাহার তিরোভাব। যেখানে আসক্তি ও লালসা, সেইখানেই পাপ। আসক্তিবিরহিত কাম

পাপ নাই, পুণ্যও নাই। কারণ, কোন স্বাভাবিক কার্য্য স্বতঃ দৈহিক কার্য্য-মাত্র ; মনুষ্যের আসক্তি এবং অনুরাগস্পৃষ্ট হইয়া তাহা পাপপুণ্যের ফলপ্রসূ হয়। পাপপুণ্যের এই সূক্ষ্মতা আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সূক্ষ্মতা দেখাইবার জন্য দেবতা ও মানুষের দৃষ্টান্তে আমাদের আর্য্য কবিগণ কামের অবতারণা করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত গীতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের স্থূল অবয়বী দৃষ্টান্ত। স্বভাবজাত, আসক্তিরহিত এবং পাপপুণ্যহীন দৈহিক কার্য্য হেতু ব্যাসের জন্ম। ব্যাসের মত এক জন মহাজনের সমুদ্ভব জন্য মৎস্য-গন্ধার সহিত পরাশরের ক্ষণেকের নিমিত্ত মিলন। তদ্রূপ ভরতের জন্ম জন্য শকুন্তলার জন্ম, এবং কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব হেতু মহেশের শরীরে ক্ষণেকের নিমিত্ত মদনাবির্ভাব। পাণ্ডুরাজ পাপপুণ্যের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব কুন্তীকে উপদেশ দিয়া দেবতার সত্ত্বায় পঞ্চ পাণ্ডবের উদ্ভব করাইয়া লইয়াছিলেন। বলিরাজ অন্ধ মুনির ঔরসে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্রোৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন। যে অন্ধ মুনি কিছুই দেখিতে পান না, রূপের প্রতি আসক্তি তাঁহার সম্ভব নহে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত পাপস্পৃষ্ট কামের দৃষ্টান্ত নহে।

যদি বল, আমাদের সাহিত্যে গান্ধর্ব্ববিবাহের চিত্র কি? পূর্ব্বকালে আর্য্যনারী কি স্বয়ম্বরা হইয়া নিজ মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিতেন না? এই স্বয়ম্বরচিত্র কি আর্য্য সাহিত্যে নাই? আছে, অনেক স্থলে আছে। কিন্তু স্বয়ম্বরপ্রথা কেবল রাজকুলেই ছিল। সাধারণ জনসমাজে ছিল কি না, জানি না ; কিন্তু যে চিত্র আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহারই কথা ধর্ত্তব্য। সে চিত্রে দেখা যায় যে, রাজকন্যারাই ইচ্ছাবরা হইতেন। তাও সকলে নহে। রাজকুলে এরূপ প্রথা প্রচলিত করাতে প্রাচীন বীরসমাজে এক মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। তাহা এক প্রকার রাজনীতি ছিল— যে নীতিপ্রভাবে রাজগণের মধ্যে যেন ড্রাইডেনের (Dryden) এই গীত সর্ব্বদা উদাত্ত স্বরে সঙ্গীত হইত,—

"None but the brave deservé the fair."

"বীরেরি কেবল সুন্দরী রতন।"

স্বয়ম্বরসভায় যথন নৃপতিগণ কোনও সুন্দরীরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত একত্রিত হইতেন, তখন তাঁহাদের কেবল গুণেরই পরিচয় হইত। সুনন্দা ইন্দু-

মহাবীরত্বের পরিচয় না দিয়া—কেহ সীতা ও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেবল স্বয়ম্বরসভায় এই রূপগুণ ও বীরত্বের পরিচয় হইয়াই পরিশেষ হইত না। যিনি সুন্দরীরত্ন লাভ করিতেন, তাঁহার সেই সুন্দরীকে লইয়া গৃহে যাওয়া দুঃসাধ্য হইত। সুন্দরী যাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, সেই সমস্ত ভূপতি, ভাগ্যবান বরমাল্যধারীকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিত। তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তবে সেই সুন্দরীকে গৃহে লইয়া যাওয়া যাইত। এ বড় কম কথা নহে। বিবাহের এইরূপ মহা ব্যাপারের ঘোর গৌরবে সেই সুন্দরী ললনার পাত্রনির্ব্বাচন। স্বয়ম্বরসভায় যে সমস্ত ভূপতি একত্রিত হইতেন, তাঁহাদের গুণাগুণের পরিচয় হওয়াতে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণধর, কেবল যে তাহাই প্রতীত হইত, এমত নহে; যাঁহারা গুণাধিক্যে হীনগৌরব হইতেন, তাঁহাদের মুখ কেমন সভামধ্যে ম্লান হইয়া যাইত, এবং সুন্দরীলাভে নিষ্ফল হইয়া তাঁহারা কেমন লজ্জিত হইতেন, তাহারও চিত্র আর্য্য সাহিত্যে প্রদত্ত হইয়াছে। সে ত বিবাহ নহে, তাহা নৃপতিগণের এক প্রকার পরীক্ষা-রীতি। বীরসমাজে এই বীরজনোচিত রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর্য্য সাহিত্যে যে যে স্থানে এই প্রকার বিবাহের বিরাট বর্ণনা আছে, তথায় বীর প্রভৃতি উচ্চ রসের এত সঞ্চার হয় যে, তাহাতেই মন প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়লালসা বা কামানুরাগ তথায় কুত্রাপি অনুভূত হয় না।

আর্য্যেরা কামকে প্রকৃত প্রেম হইতে বিভিন্ন বলিয়া বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়া তাই প্রেম ও কামের যেরূপ ধর্ম্মনৈতিক কলঙ্ক ও গৌরব, তাহা সাহিত্য মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কাম কিরূপে পাপস্পৃষ্ট হয়, কিরূপে না হয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; বুঝিয়া সেই অনুরাগের সেই সেই মূর্ত্তি পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য কবিগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়া এতদূর সূক্ষ্মতা দেখাইতে পারিয়াছেন এবং সেই সূক্ষ্মতা দেখাইবার নিমিত্তই কামের বিভিন্ন মূর্ত্তির অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে সেরূপ অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে যে কাম বাস্তবিক পাপস্পৃষ্ট, তাহাকে সেইরূপেই কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে পাপ-ছবির ঈষৎ স্পর্শে সাহিত্যের গৌরবহানি হইয়াছে, সেখানে আবার উচ্চ-রসের সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই গৌরব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন চিত্র। সে সাহিত্যে যে প্রেমের চিত্র নাই,

সাহিত্যের সতীপ্রেমের যে সকল ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, সে ধর্ম্মাক্রান্ত দাম্পত্য প্রেম পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতি দুর্ল্লভ। এ সাহিত্যে যে প্রেমচিত্র, তাহা সখ্যপ্রেম—সখার সহিত সখার যে প্রেম, সমানের সহিত সমানের যে প্রেম, সেই প্রেমচিত্র। এই সখ্যপ্রেম অতি মধুর বটে। এই মধুর সখ্যভাব আর্য্যসতীতেও আছে, কিন্তু তাহা কান্তাভাবের অধীন। স্বামী সতীর পরম সখা, সতীও স্বামীর পরম সখী ; সেই সখ্যপ্রেমে তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাসিতেছেন। সতী স্বামীর আদরের আদরিণী ; স্বামীও সতীর শত আদরের সামগ্রী। কত বিশ্রব্ধ আলাপনে, কত প্রিয়সম্ভাষণে তাঁহাদের দিন রাত কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই মধুর প্রেমের মধুরতার সহিত সতীর অধীনতা এবং স্বামীর দেবসম্ভ্রমও মিশ্রিত আছে। সখ্যভাবের সহিত ভক্তির মিলনেই আর্য্য প্রেমের সৌন্দর্য্য। সখ্যভাবে তাহার মধুরতা, এবং ভক্তিতে তাহার পবিত্র কান্তি। মধুরতার সহিত এই সম্ভ্রমের মিলনে আর্য্যনারী এক অদ্ভুত রমণীয় সামগ্রী। শুশ্রূষাকালে স্বামী পরমপূজ্য দেবতা, কিন্তু আলাপনসময়ে তিনি পরম সখা। আর্য্যনারীর দম্ভ, অহঙ্কার ও অভিমান সকলই স্বামীর উপর। মানিনী স্বামীর শত আদরের ধন। মানিনীর জন্য রাজগৃহে মর্ম্মরনির্ম্মিত স্বতন্ত্র মানাগার প্রস্তুত থাকিত। কথায় কথায় আর্য্যনারীর অভিমান ও দর্প—প্রাণপতি স্বামীর উপর দর্প ও মান। সমস্ত রাজ্য দিয়াও যদি মানভঙ্গ হয়, তাহাতেও আর্য্যপুত্র কুণ্ঠিত নহেন। দশরথ কত শত পরিতোষবাক্যে কৈকেয়ীর মানভঞ্জন করিতেছেন, বাল্মীকি তাহার উজ্জ্বল চিত্র দিয়াছেন। "চিত্রদর্শন" অঙ্কে সীতা কত মধুর আলাপে প্রিয়সখা রামচন্দ্রের সহিত স্বামিসুখ সম্ভোগ করিতেছেন, ভবভূতি উত্তরচরিতের প্রারম্ভেই তাহার সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামচন্দ্র বিমানোপরি সীতাকে কত সুখালাপনে তাঁহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তিস্থল দেখাইয়া দিয়া যাইতেছেন, কালিদাস কেমন অতুলনীয় চিত্রে রঘুতে তাহা বর্ণন করিয়াছেন! এই সমস্ত দাম্পত্য প্রেমের সখ্য মধুরতার পরিচয়ে যে অপূর্ব্ব সুখানুভব হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সেই সখ্যমধুরতাসম্ভোগকালে সীতা রামচন্দ্রকে এমনি সসম্ভ্রমে কথা কহিতেছেন যেন, এখনি আবশ্যক হইলে, সেই রামচন্দ্রের তিনি পূজা করিতে পারেন। যে মানিনী কৈকেয়ী একদা সগর্ব্ব বচনে

শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরিয়া রাধিকার মান ভাঙ্গিয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতেন। ভক্তির সহিত সখ্য প্রেম মিলাইয়া আর্য্যনারী যেরূপে বিশ্রব্ধমনে স্বামিসম্ভোগ করেন, তাহারই প্রেমচিত্র আমাদের আর্য্যসাহিত্যে। তিনি আর্য্যসাহিত্যের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্যে একদা স্বর্গের পবিত্রতা, নন্দনকাননের শোভা এবং বসন্তের মধুরতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিরূপ দাম্পত্য প্রেমকান্তি? সেখানে সুধুই সখ্যপ্রেম। সে সখ্যপ্রেমে আর্য্যনারীর ভক্তি নাই—সতীর সেই নিঃস্বার্থ, সেই একনিষ্ঠ, সেই নিরাকাঙ্ক্ষ, সেই পতিগৌরবপরিপূর্ণ প্রেম নাই। সে প্রেমে সখ্যভাবের সেই বিশ্রব্ধ সম্ভাষণ আছে; সেই মধুরতা আছে; দর্প, অভিমান, আদর, সকলই আছে; কিন্তু তাহাতে আর্য্যসতীর সেই ভক্তিময় একনিষ্ঠ পুণ্যের প্রতিবিম্ব নাই, যাহাতে প্রেমকে পবিত্র ও দেবোচিত করে। তাহাতে মানবপ্রকৃতির আনন্দ আছে, কিন্তু দেবপ্রকৃতির সুষমা নাই। এই আনন্দময় নৃত্যের সহিত বিমল শোভার বিকাশ হইলে তবে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা ঘটে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেম-সৌন্দর্য্যের এই অসম্পূর্ণতা। এই প্রেম-সৌন্দর্য্য অনেক স্থলেই আবার ইন্দ্রিয়লালসার বিলাস-ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত। এইরূপ বিলাস-ক্ষেত্র সেই সাহিত্যের অনেক দেশকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সে সাহিত্যে প্রেমনদী বিলাসিতায় আবিল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আসক্তিপরিপূর্ণ চঞ্চল কাম, প্রেমনদীর বিশুদ্ধ স্রোতকে গৈরিকে কলুষিত করিয়াছে। রিপুর প্রাবল্যে প্রকৃতিস্রোত ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে প্রকৃতি রিপুরই দাসী হইয়াছে। মানবপ্রকৃতির পশুত্ব এত প্রবল যে, তথায় সেই প্রকৃতির দেবত্ব হীনপ্রভ হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই কথারই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সীতাকে আমরা আর্য্যসাহিত্যে দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য সাহিত্যে সে সীতা কই? বাল্মীকির সীতার স্থানে পাশ্চাত্য সাহিত্যে হোমরের হেলেন, উদয় হন। অমনি ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়—স্বর্গের স্থানে নরকের চিত্র! সেক্সপিয়ার খুলিলে, তুমি পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহা অযথারূপে প্রেম বলিয়া উক্ত, সেই প্রেমছবি বিশিষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। রোমিও প্রথমে রোসালিনের রূপে এত দূর মুগ্ধ যে, সেই হেতু তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তের শান্তি

হইল, অমনি তিনি একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। একরাত্রির মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। আবার জুলিয়েটের জন্য হৃদয়ের সেই অশান্তি। তিনি রিপুবলে তাড়িত হইয়া আবার জুলিয়েটের মন্দিরের চারি পার্শ্বে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে গোপনে তাঁহার গবাক্ষসম্মুখে উপনীত। ডেমিট্রিয়স হার্মিয়াকে দেখিয়াও তদ্রূপ; অমনি তাঁহার মন হইতে হেলেনা উপিয়া গেল। সেক্সপিয়ারের মত এমন উপিয়া-যাওয়া প্রেমচিত্র কেহ দিতে পারিবে না।

বাল্মীকি অগ্রে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রকে সাজাইয়াছেন, সাজাইয়া মানবের মনে এমন ধর্ম্মবীরত্বের অপূর্ব্ব চিত্র দিয়াছেন যে, সেই সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ। তখন আস্তে আস্তে ইন্দ্রিয়লালসার প্রতিমূর্ত্তি রাবণকে বাল্মীকি দেখাইলেন। ধর্ম্মবীরত্বে মোহিত মানব সেই রাবণের প্রতি স্বভাবতঃই ঘৃণার সহিত চাহিয়া দেখিলেন। তদ্রূপ, রামায়ণে অগ্রে সীতার পবিত্র এবং সুন্দর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যে মন আগে সীতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সে মন ইন্দ্রিয়পরায়ণা, কামানুমুগ্ধা ও নির্লজ্জা সূর্পনখাকে স্বভাবতঃই ঘৃণার সহিত অবলোকন করিবে। সুতরাং সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদনের সহিত সকলেরই স্বভাবতঃ সহানুভূতি ঘটে। এই চিত্র আর্য্যসাহিত্যে। কিন্তু সেক্সপিয়ারের নাটক মধ্যে এরূপ ফল ফলে না। অগ্রে তাঁহার বড় বড় রিপুপ্রাবল্যের চিত্র। অগ্রে দিগ্‌গজ রাবণের চিত্র। সেই রাবণের উচ্চতায় আগে মন উঠে। তাহার স্বর্ণলঙ্কা ও মনোহর রাজ্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। ক্লিয়োপেট্রার বর্ণরাগে ও রাজসৌন্দর্য্যে মন মোহিত হয়। লেডি ম্যাকবেথে লোভের উচ্চতায় মন ভয়ানকে উন্নীত হয়। ইয়াগোর চাতুরীতে মন চমৎকৃত হয়। রিপুপ্রচণ্ডতার ঘোর চিত্রে মন এইরূপ স্তম্ভিত হইলে, সে মনে কি সেক্সপিয়ারের কমেডির সামান্য রিপুপ্রবল চিত্র রুচিবিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে। তখন সবই এক বর্ণরাগে সমান বোধ হয়। প্রভেদ এই, এক দিকে বড় বড় চিত্রের প্রকাণ্ডতায় মন মুগ্ধ, অন্য দিকে তাহারই ক্ষুদ্র ছবি সকল ফটোগ্রাফরাগে সুন্দর বোধ হইতে থাকে। এক ভূমিতেই এই বিবিধ চিত্র অঙ্কিত। সেই ভূমির নাম রিপুপ্রবলা মানবপ্রকৃতি। ঘোর রিপুর প্রকাণ্ড চিত্রে অগ্রে যে রুচি সমঞ্জসীভূত হইয়াছে, সে রুচি কেন আর তাহারই ক্ষুদ্র চিত্রে বিরোধী হইবে? সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমূহ হইতে একবার তাঁহার Tragi-comedy এবং Comedyতে অবতরণ কর।

কিছু কম। সেখানে রোমিও জুলিয়েটের মত সাংঘাতিক রিপুর উচ্ছ্বাস নাই বটে, কিন্তু সেই রিপুর কিছু মন্দীভূত বেগ। সেখানেও যৌবনের উন্মত্ত নৃত্য ও অধীরতা, এবং ইন্দ্রিয়লালসার ঘোর প্রমত্ততা ও আবেগ। বেনিডিকের মনে যখন প্রেমতরঙ্গ উঠিল, তখন তাহার আবেগ দেখে কে? বিয়েট্রিস অপেক্ষাও তিনি অধীর হইলেন। রোজালিণ্ড যৌবনরাগে এত উন্মত্তা যে, অরল্যাণ্ডোর দুই ঘণ্টার অদর্শনে একেবারে অধীরা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, সেক্সপিয়ারের কমেডিতে প্রেমের চিত্র, যৌবনের উন্মত্ততা এবং ইন্দ্রিয়লালসায় এত কলঙ্কিত দেখায় যে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রেমচিত্র বলিব, কি ইন্দ্রিয়লালসার চিত্র বলিব, এরূপ সন্দেহ জন্মে। সেই ইন্দ্রিয়লালসা ও যৌবনমদে মাতিয়া নায়কনায়িকাগণ সামাজিক ও পারিবারিক শাসনের নৈতিক বাঁধ ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। ডেসডিমোনা পিতৃশাসন অবজ্ঞা করিয়া, যৌবনমদে উন্মত্তা হইয়া, প্রকাশ্য আদালতে যেরূপ লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, জুলিয়েট এবং আইমজিনও তদ্রূপ পিতৃশাসনের অবজ্ঞাচিত্র। হার্মিয়া লাইসেণ্ডারকে লইয়া বনে পালাইয়া গিয়া তবে পিতৃশাসন ও রাজ্যশাসনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এক স্থানে সেক্সপিয়ার এই উন্মত্ততা ও যৌবনলালসার চিত্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—

লোরেন্সো। গগনে উজ্জ্বল শশী—এমনি নিশায়,
বায়ু যবে বহে ধীরে গাছের পাতায়;
কিন্তু নাহি কোন রব—হেন নিশাকালে,
ট্রলয় উঠিয়া বলে, ট্রয়ের দে'য়ালে,
ফেলেছিল কত শ্বাস, যবন শিবিরে,
যথায় শায়িত তার ক্রেসিডা সুস্থিরে।

জেসিকা। এমতি নিশায় আর দলিয়া শিশিরে,
সভয়ে থিসিবি আগে গিয়া ধীরে ধীরে;
দেখেছিল সিংহাকার কি যেন সম্মুখে,
অমনি সে পিছু ধায় ভয়ে কাঁপি বুকে।

লো। হেন নিশাকালে—ভীম সাগরের তীরে,
উঁলো ছড়ি হাতে ডিডো দাঁড়ায়ে অধীরে,

জে। এমতি নিশায় আর সুন্দরী মিডিয়া,
নিজ হাতে ধনী কত ওষধি বাছিয়া,
তুলেছিল ঈশনেরে প্রাণদান দিয়া।

লো। হেন নিশাকালে আর জেসিকা সুন্দরী,
ইহুদীর তত ধন সব তুচ্ছ করি,
পালা'য়ে এসেছে ত্যজি ভেনিস নগরী,
অতৃপ্ত যৌবনরাগে বেল্মণ্টে আদরি।

জে। এমতি নিশায় আর লোরেন্স সুন্দর,
আদরেতে ধরি সেই প্রিয়ার অধর,
দিব্য করি বলেছিল কত ভালবাসে;
মনোচোর করে চুরি মিথ্যা সুধাভাষে। ইত্যাদি।

এই প্রেমসম্ভাষণ দৃশ্যটি সকল তরুণবয়স্কের নিকট অতি মিষ্ট লাগিবে, তাহা আমরা জানি; কিন্তু তন্মধ্যে যে যৌবনের উন্মত্ততার ছবি আছে—যে উন্মত্ততা সেক্সপিয়ারের সর্ব্বত্র—যে উন্মত্ততা কোনও গুরুজনের শাসন মানে না—যাহা সকল নৈতিক শাসনের অতীত—সেই দুর্দ্দম্য পাপছবি দিবার জন্য আমরা উক্ত সম্ভাষণটি অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। এইরূপ দুর্দ্দান্ত প্রেমের বশীভূত হইয়া জেসিকা সুন্দরী ধনবান ইহুদী পিতার গৃহ হইতে লোরেন্সের কাছে বেল্মণ্টে পলাইয়া গিয়াছিল। এরূপ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় ঘটে বলিয়া, সেক্সপিয়ারের নাটকে তাহার এত ছড়াছড়ি দেখা যায়। হোমারের মহাকাব্যেও প্যারিসের সহিত হেলেনের ব্যভিচার ও পলায়ন। আমাদের তরুণবয়স্ক ছাত্রগণের সম্মুখে এরূপ চিত্র সর্ব্বদা ধরাতে তাহাদের কল্পনা নিশ্চয় দূষিত হইবারই সম্ভাবনা। তবে আর বিদ্যাসুন্দর পড়ায় এত দোষ কি? সেক্সপিয়ার ইউরোপীয় প্রেমছবি তুলিতে গিয়া এইরূপ অনেক গুলি পাপচিত্র দিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জনসমাজে "যার শেষ ভাল, তার সব ভাল" নামক নাটকের হেলেনার মত যে প্রেমের ভাল ছবি নাই, এমত নহে। কিন্তু তিনি সেরূপ চিত্র বড় অধিক ধরেন নাই। সেক্সপিয়ারপ্রমুখ কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সমস্ত এই দোষে কলঙ্কিত। বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ চিত্রাঙ্কণ করিলেই কি মানব-প্রকৃতি এত উজ্জ্বল হইয়া উঠে, না জনসমাজের প্রকৃত ফটোগ্রাফ দেওয়া হয়?

পাশ্চাত্য জনসমাজে মানবপ্রকৃতির যেরূপ পাশব রীতি নীতি প্রচলিত

আছে, সেক্সপিয়ার তাহারই যথাযথ চিত্র দিয়াছেন। সুধু সেক্সপিয়ার কেন, পাশ্চাত্য কাব্য ও উপন্যাসেও সেই একই চিত্র। সেক্সপিয়ার সর্ব্বশীর্ষস্থানীয় বলিয়াই তাঁহার নাটকাবলি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। রূপ গুণের মোহ হেতু যে অনুরাগ জন্মে, সেই অনুরাগ যৌবনে কত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমরা তাহারই ছবি অঙ্কিত দেখি। কালিদাসে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম অনুরাগ তদ্রূপ রূপজ বটে, কিন্তু দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মসংযমের পরিচয় দিয়া পাশব প্রবৃত্তির অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন। শকুন্তলার রূপজ অনুরাগেও এমত একটি লজ্জাশীলতার আবরণ দেওয়া আছে, যে জন্য সেই চিত্রকে অতি মধুর করিয়াছে। সেরূপ মধুরতা আমরা পাশ্চাত্য প্রেমচিত্রে দেখিতে পাই না। সুধু যে মধুর করিয়াছে, এমন নহে, সেই চিত্র হইতে পাপের মলিনতা অপনীত হইয়াছে। কারণ, রূপজ অনুরাগ সেই স্থলেই পাপকলঙ্কিত, যে স্থলে তাহা অবৈধ রিপুরূপে পরিণত হয়। শকুন্তলার অনুরাগ প্রবল আসক্তিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ববিবাহে রাজাদিগের বাধা নাই, এ জন্য দুষ্মন্তের বিবাহে তত দোষ স্পর্শে নাই।

কালিদাসের এই প্রেমচিত্রের কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমচিত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"শকুন্তলা" নাটকখানি খুলিবামাত্র তোমার নয়নসমক্ষে এক অপূর্ব্ব প্রেমচিত্র উদিত হয়। শকুন্তলা কত প্রেম-পরিপূর্ণা হইয়া আশ্রমতরুগণের সেবায় নিয়োজিতা আছেন; কত স্নেহভরে আলবালে জলসেচন করিতেছেন! সখীগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে অথচ সলজ্জভাবে কেমন পরস্পর প্রেমালাপ করিয়া আশ্রমদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহাদের মনে যে পূর্ব্বানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহারা যে প্রণয়োন্মুখী হইয়া সহকারের সহিত মাধবীলতার বিবাহ দিয়া বসন্তে মুকুলোদ্গমের প্রতীক্ষায় উল্লাস করিতেছিলেন, এই চিত্র তাহারই সুন্দর পরিচয়। এমন সময় দুষ্মন্ত দেখা দিলেন। দুষ্মন্তের সমক্ষে শকুন্তলার সলজ্জভাব ও মৌনাবলম্বন কলিদাস কেমন প্রকৃতিসঙ্গত চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন! সেখানে ইউরোপীয় যুবতীর ধৃষ্টতা ও বাচালতা নাই, অথচ শকুন্তলার সেই সলাজ নীরবতা বুঝি শতবাক্যে দুষ্মন্তের নিকট

দেখিয়াছে ? অথচ তাহা প্রকৃত আর্য্য যুবতীর ধর্ম্ম। তাহা জুলিয়েট বা আইমজিনের প্রগল্‌ভতা নহে। ক্রেসিডার জাল প্রেমবিকাশক বাক্যাবলি ও ক্রিয়াকলাপ, জুলিয়েট, আইমজিন, হেলেনা বা হার্মিয়ার সহিত সমান নহে বটে, কিন্তু এই প্রকৃত প্রেমিকাগণ যে নানা প্রগল্‌ভ বাক্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনাদের হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশে অতি নির্লজ্জতারই পরিচায়ক। আর্য্য কুলাঙ্গনার তত দূর ধৃষ্টতা নাই। ইউরোপে সকলি সম্ভব ; কারণ, সেখানে প্রেম ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়। প্রেমশিকার (Courtship) করা রীতি ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত থাকাতে, সেখানে পরের মন ভুলাইয়া রাজি করিতে হয়। সেখানে পতিলাভ নাই, পতিপত্নী শিকার করা আছে। সুন্দরী পত্নী লাভ করিতে হইলে, অর্লেণ্ডোর মত রোসালিণ্ডের মন ভুলাইয়া তাহাকে শিকার করিতে হয়। সুতরাং অন্তরে যত দূর না থাকে, মুখে এবং বাহ্য ব্যবহারে তদপেক্ষা অধিকতর ভালবাসার পরিচয় দিতে হয়। এজন্য অনেকাংশে ভালবাসার ভাণ করিতেও হয়। ভালবাসি, ভালবাসি, প্রাণ যায়, ক্ষণেক অদর্শনও অসহ্য বলিয়া শত শত বার ভালবাসা জানাইতে হয়। অতৃপ্ত যৌবনের নেশা যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন ভালবাসার ভাষা অমৃতবচনে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই সুধাময় বাক্যের মধ্যে কতটা মৌখিক, কতটা আন্তরিক, কতটা নেশার ঝোঁক, তাহা বুঝিবার যো নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, এক সুন্দরীর পর অন্য সুন্দরীকে দেখিয়া পূর্ব্বনেশা ও ভালবাসা রাতারাতি কাটিয়া গিয়াছে। যদি বল, স্বাধীনভাবে পছন্দ ও পাত্রাপাত্রনির্ব্বাচন করিয়া ত বিবাহ হয়। আমরা বলি, তেমন পূর্ণ ও অতৃপ্ত যৌবনকালে নির্ব্বাচনের কথা আসিতেই পারে না। যৌবনে নির্ব্বাচন হয় না, তখন কেবল রিপুর জোর ও চক্ষের নেশা। যাহাকে নির্ব্বাচন বল, তাহা নেশা, বা রিপুরই প্রতিবাক্যমাত্র। নিজে সেক্সপিয়ার সেই কথাই বলিয়াছেন। Friar রোমিওকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "————Young men's love then lies
> not truly in their heart, but in their eyes."

হার্মিয়ার বিবাহের জন্য তাহার পিতা ডেমিট্রিয়সকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন ; কিন্তু হার্মিয়া চান লাইসেণ্ডারকে। রাজার নিকট আবেদন হইল। হার্মিয়া বলিলেন যে, পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন, তবে অবশ্য লাইসেণ্ডারকেই মনোনীত করিতেন।

"Hermia—I would my father look'd but with
my eyes"

এ কথার উত্তরে রাজা বলিতেছেন,—তোমার চক্ষু কোথায়? তুমি ত অন্ধ। তোমার উচিত, তোমার পিতার চক্ষে দেখা।

"Theseus—Rather your eyes must with his
Judgment look."

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যেখানে নির্ব্বাচনের শক্তি নাই, যেখানে রিপুর অন্ধতাই প্রবল, সেখানে পিতা মাতার নির্ব্বাচনেই সম্মত হওয়া উচিত। এই কারণে, আর্য্যজাতির মধ্যে যে বিবাহসূত্রে পাত্র ও পাত্রীকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ থাকিতে হয়, সে কার্য্যে বরকন্যার নির্ব্বাচন পিতামাতা বা অন্য সুবিজ্ঞ অভিভাবকের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। আপনার বিবাহের জন্য যখন লালায়িত হইতে হয় না, তখন আর দোকানদারি করিয়া প্রেমশিকার করিবার আবশ্যকতা কি? আর্য্যসমাজে স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা এজন্য স্বাভাবিক অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সেই লজ্জাশীলতা কেমন মধুর, তাহা শকুন্তলায় প্রতীয়মান!

শকুন্তলা যেমন সংসার হইতে দূরস্থিতা হইয়া বনমাঝে ঋষির আশ্রমে পালিতা হইয়াছিলেন, তিনি সেই আশ্রমবাসিগণ ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতেন না; সেক্সপিয়ারের মির‍্যাণ্ডাও তেমনি এক নির্জ্জন দেশে একাকিনী পিতার নিকট পালিতা হইয়াছিলেন। শকুন্তলার যৌবনরাগে যখন প্রেমোদ্রেক হইয়াছিল, সেই সময়ে দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহার যে স্বাভাবিক নীরব সলজ্জ ব্যবহার, তাহার বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু সেক্সপিয়ার তদনুরূপ স্থানে মির‍্যাণ্ডার কিরূপ ব্যবহার দেখাইতেছেন? তিনি তাঁহার পিতা ভিন্ন জনসমাজের মুখ দর্শন করেন নাই, কিন্তু যখন Ferdinand তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তিনি যেন ঘোর সংসারিণীর ন্যায় তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। শকুন্তলার সাক্ষাতে দুষ্মন্তই গন্ধর্ব্ববিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে কি হইতেছে, দেখুন;—

মি—তুমি কি আমাকে ভালবাস?

ফার্ডিন্যাণ্ড।—আমি সর্ব্ব দেবদেবী ও পৃথিবী, সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি, শপথ ও সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি যে শুধু তোমায় ভালবাসি, এমন নহে;

মি—তবে, যাহাতে আমি হাসিব, তাহাতে কাঁদি কেন?

ফা—কেন তুমি কাঁদ?

মি—আমি কাঁদি, আমার হীনতা ও দীনতা বুঝিয়া। আমি তোমাকে যাহা দিব, তাহা তুমি যে গ্রহণ করিবে, এমন ভরসা আমার নাই, কিম্বা তোমার যাহা না পাইলে আমি মৃতপ্রায় হইব, তাহা যে তুমি দিবে, এমন আশাও করি না, সেই জন্য কাঁদি। কিন্তু এ সব তুচ্ছ কথা! যাহা আমি ঢাকিতে চাহিতেছি, তাহা যেন সুস্পষ্ট বাহির হইয়া পড়িতেছে। লজ্জা ও চাতুরীতে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া সরলভাবে বলি, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি তোমার পত্নী হইব। যদি না কর, আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব।

ফা।—তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা। আমি কি তোমার যোগ্য!

মি। তবে তুমি আমার প্রাণবল্লভ পতি।

এত কথা, বাক্‌চাতুরী ও মনোমোহন বাক্য মিরাণ্ডা কোথা হইতে শিখিলেন? তিনি না বলিয়াছিলেন, আমি কখন নরলোকের মুখদর্শন করি নাই। তিনি না জনহীন দ্বীপে তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে আনীত হয়েন? সেখানে তাঁহার পিতা ব্যতীত আর কাহারও মুখ বার বৎসর দেখেন নাই। তবে সেই বনবাসিনী ষোড়শীর মুখে এত বাক্‌ছলা কোথা হইতে আসিল? শকুন্তলার ঋষিআশ্রমে তবু ত একপ্রকার জনসমাজ ছিল। সেখানে সেই ঋষির শিষ্যগণ ও গৌতমী ছিলেন; অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় ছিল, আর প্রাচীন কালে মুনিগণের আশ্রমে কে না আসিত? তথাপি শকুন্তলারও মুখে এত কৌশলের বাগ্‌ভঙ্গী শোভা পাইত না। সেই শকুন্তলা সাহসিনী হইয়া অগ্রে দুষ্মন্তের কাছে কোনও কথা কহেন নাই। দুষ্মন্ত অগ্রে বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। তুলিলেও শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট তত কৌশলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। শকুন্তলা বরাবর লজ্জাশীলা ও নতমুখী হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতি ত সর্ব্ব স্থানেই সমান। মিরাণ্ডা ত পাশ্চাত্য জনসমাজে শিক্ষিতা হয়েন নাই যে, তিনি সেই সমাজের ধরণ-ধারণ অনায়াসে অনুকরণ করিবেন, বা সেই সমাজস্থা বয়স্কা কুমারীগণের ন্যায় বাগ্‌নিপুণা হইবেন। সেক্সপিয়ার বোধ হয় নিজ অভ্যাস-

সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শকুন্তলার ব্যবহারের মত সরলতা, লজ্জাশীলতা, অথচ স্বাভাবিক যৌবনসুলভ প্রেমপরিচয়ের চিত্র, সেক্সপিয়ারের পাশ্চাত্য সমাজে অত্যন্ত বিরল। সুতরাং তাহা কল্পনায় আনাও বড় সহজ কথা নহে। মানব প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য কেবল আর্য্য সাহিত্যেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

মিরাণ্ডা সরলতায় সাহসিনী। লজ্জা কি, লজ্জার ব্যবহার কিরূপ, মিরাণ্ডা কখন দেখেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে যখন যাহা উদিত হইত, তখন তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। মনের আবেগ তিনি ঢাকিতে জানিতেন না। এই সরলতায় সুতরাং তাহার মনের ভাব দর্পণের মত দেখা দিত। তাই যদি হয়, তবে ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মিরাণ্ডার সম্ভাষণকে অবশ্য সরলতার পরিচয় ও স্বাভাবিক বলিতে হইবে। হৃদয়াবেগে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা অবশ্য অকৃত্রিম ও সরল ভাষা। ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মিরাণ্ডার কথাবার্ত্তা যদি স্বভাবোক্তি হয়, তবে কথা এই, মিরাণ্ডার সেরূপ স্বভাব সম্ভব কি না? মিরাণ্ডার মুখে এত ভালবাসার কথা, বিবাহের নিমিত্ত তাহার চরিত্রের এত অধীরতা, এবং মনের আবেগ গোপন করিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিতে যাইতেছিলেন, বলিয়াছিলেন, এই লুকাচুরি ভাব তাহার মত জনসমাজবিদূরিতা সরলা যুবতীর চরিত্রে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Hence bashful cunning."

সেই "সলজ্জ চাতুরী" তিনি কিরূপে জানিলেন? সলজ্জ চাতুরী দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার তিনি বলিতেছেন,—

"And prompt me plain and holy innocence."

তিনি চাতুরীর সহিত "সরলতার" প্রভেদ শিখিলেন কোথা হইতে? সেই সরলতার পবিত্রতা বুঝিলেন কিরূপে? আবার ফার্ডিন্যাণ্ডকে কিরূপ ধরিয়া বসিয়াছেন দেখুন,—

"I am your wife, if you will marry me.
If not, I 'll die your maid : to be your fellow
You may deny me ; I 'll be your servant,
Whether you will or no."

মিরাণ্ডার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগপ্রকাশে এত বাকচাতুরী তাঁহার মত

ষণে তাঁহার যৌবনসুলভ হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়লালসা কেমন বিশদরূপে প্রকটিত! মিরান্ডা বিবাহের নিমিত্ত তেমনি অধীরা, যেমন ফার্ডিন্যাণ্ড। শূর্পনখার অধীরতা ও জিদের সহিত মিরান্ডার প্রভেদ কি? যৌবনমদের এই উন্মত্ততা ও অধীরতার চিত্র সেক্‌স্‌পিয়ারে। মিরান্ডা ইন্দ্রিয়লালসার প্রাবল্য ও অধীরতা দেখাইবার অতি স্বচ্ছ দর্পণ।

সেক্‌সপিয়ার যেমন মানবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক এবং পাশব রিপুগণের পরাকাষ্ঠা ও অসামান্য প্রাবল্য চিত্রিত করিয়াছেন, * আর্য্যকবিগণ তেমনি প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগণের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। সচরাচর সংসারক্ষেত্রে তত দূর রিপুবৎ স্ফূর্ত্তি অতি দুর্ল্লভ। লেডি ম্যাকবেথ যেমন দুর্ল্লভ, সীতা সাবিত্রীও তেমনি দুর্ল্লভ। কিন্তু কবির সৃষ্টি দুর্ল্লভ নহে। কবি কল্পনা-রাজ্যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়া মানবের চরমোৎকর্ষ দেখাইতে পারেন। মানবের কল্পনাসমক্ষে সেই আদর্শ ধরিবার জন্যই কাব্যের সৃষ্টি। নহিলে সচরাচর পৃথিবীতে যাহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য আবার কাব্যসৃষ্টির আবশ্যকতা কি? তাহা ত মানবের সমক্ষে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। কবি তদুপরি উঠিয়া অসামান্য আদর্শের সৃষ্টি করেন। সেই আদর্শ মানবমনে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, এবং প্রবৃত্তিগণকে সৎপথে নিয়োজিত করে। এইরূপ আদর্শের সৃষ্টি আর্য্যসাহিত্যের সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণ।

সেক্‌সপিয়র জুলিয়েটে দেখাইলেন যে, এ সংসারে সামাজিক, পারিবারিক ও বিবাহের বন্ধন ছেদন করিতে না পারিলে, নিজ রিপু চরিতার্থ করা যায় না। আর্য্যকবিগণ দেখান যে, সংসারের সমস্ত বন্ধন ও শাসনের অধীন হইয়া যে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই প্রেমের নৈতিক সৌন্দর্য্য ও চরম উৎকর্ষ। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু সর্ব্বলোকসাধারণ। সেই রিপুগণকে প্রবল হইতে না দেওয়াই মনুষ্যত্ব। আর্য্যসমাজ ও সাহিত্যে এই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

---

* সেক্সপিয়ারকে উল্লেখ করিয়া যাহা বলা হইল, তাহা সেক্সপিয়ারের আদর্শাবলম্বিত সমস্ত কাব্য ও উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য। সেক্সপিয়ার এই কাব্য ও ঔপন্যাসিক সাহিত্যের অধিনায়কমাত্র।

বেগম সমরু।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে অদ্ভুত রমণীর নাম সংযোজিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের কাহিনী বড়ই বৈচিত্র্যময়ী। ইউরোপে হইলে বেগম সমরুর ন্যায় চিত্র ইতিহাসের পত্রে বিশেষ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইত; হয় ত তাহাতে জোয়ান অফ আর্ক, পপ্ জোয়ান, বা অন্য কোনও ঐতিহাসিক রমণীর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত; কিন্তু হিন্দুস্থানের সেই সময়ের ইতিহাস ইংরাজের লেখা বলিয়া, বেগম সমরুর ছবি তাহাতে অল্পপরিসর পরিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাগ্যপরিবর্ত্তনের বিপর্য্যয়মুখে না পড়িলে এই স্ত্রীশক্তির গতি কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? পাঠক! এই প্রবন্ধের যতই অভ্যন্তরস্তরে প্রবিষ্ট হইবেন, ততই আমাদের এই উক্তির সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবেন।

লর্ড ক্লাইব যে সময়ে পলাশীর আম্রকাননে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বাঙ্গলায় মুসলমান-শাসন ভস্মসাৎ করেন, সেই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে, অনেক ইউরোপীয়, এই ফলজলপূর্ণা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, দেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জর্জ্জ টমাস ও ওয়ালটার রেন্হার্ড, এই দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জর্জ্জ টমাস আইরিশ, রেন্হার্ড ফরাসী। দুই জনেই প্রায় এক সময়ে বাঙ্গলার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং দুই জনেই যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার কালে সম্পূর্ণ অলৌকিক ও অদ্ভুত। জর্জ্জ টমাসের সমস্ত কার্য্যের পরিচয় প্রদান বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্যভুক্ত নহে। রেন্হার্ড যাহা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ইঁহার ন্যায় অদ্ভুতক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি কার্য্যক্ষেত্রে বসিয়া গ্রহনক্ষত্রের সুদৃষ্টি পাইত, বা সুবাতাসের জোরে ভাগ্যতরণী ভাসাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার জীবনের কার্য্যকলাপ অত কলঙ্কিত এবং সামান্য ভাবে পরিকীর্ত্তিত—হইত না।

না থাকিলে বেগমের আদৌ অস্তিত্বই থাকিত না। এই অদ্ভুত বেগমের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, বেগমের স্বামী সমরুর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলা আবশ্যক।

রেন্‌হার্ড ও সমরু একই ব্যক্তি। বেগম সমরুর স্ত্রী। বেগমের খ্যাতি সমরুর জন্য। রেন্‌হার্ড হইতে "সমরু" এই রহস্যময় নাম কেমন করিয়া হইল; রেন্‌হার্ড ইউরোপীয়,—তাহার আবার বেগম কেন; এ সকল কথার মীমাংসা করা যাক্‌। *

রেন্‌হার্ড ফ্রান্সদেশের ট্রিভস্‌ প্রদেশের অধিবাসী। সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূত বলিয়া তাঁহার গৌরব করিবার কিছুই ছিল না। অবস্থা অবশ্য দরিদ্রতার ও নিম্নস্তরের। তখন ভারতবর্ষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যাঁহারা দৌড়িয়া আসিতেন, নিতান্ত নিরাশা, অতৃপ্ত জঠর জ্বালা ও অনিবার্য্য কারণ না ঘটিলে, তাঁহাদের শুভাগমন ঘটিত না। রেণহার্ড এই শ্রেণীর; সামান্য ছুতারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, একখানি ফরাসি জাহাজে তিনি বাঙ্গলায় পদার্পণ করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখন সবে সৌভাগ্য-তারকা দেখা দিয়াছে। ক্লাইব পলাশীর রণাভিনয়ে সে তারকার জ্যোতি আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজের সেনার তখন একটা বিশেষ কদর দাঁড়াইয়াছে। রেন্‌হার্ড প্রথমে তাহাতে সৈনিকরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু ফরাসী হইয়া ইংরাজের অধীনতা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি চন্দননগরে স্বজাতীয় সেনাদলে প্রবেশ করিলেন।

ইহাতেও রেনহার্ডের মন উঠিল না। ফরাসীর প্রতিপত্তি পলাশীর যুদ্ধের পর অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সেখানে ভবিষ্যৎ আশা খুব কম। তিনি সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন; দলস্থ কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না। তাঁহার এই বিষণ্ণ ভাব ও মলিন মুখ দেখিয়া, তাঁহার সমকর্ম্মী সৈনি-

---

* এই প্রবন্ধের সংকলনকল্পে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সহায়তা লইয়াছি। আমাদের সংগৃহীত বিবরণ যত দূর বিস্তৃত হওয়া উচিত, মাসিক পত্রিকার পরিসরের দিকে দৃষ্টি থাকায়, তত দূর হয় নাই। তথাপি যদি পাঠকবর্গ এ বিষয়ে অধিক কিছু জানিতে চাহেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির দ্বারা সে তৃষ্ণার পূর্ণ নিবৃত্তি করিতে পারেন। (1) Seoh's History of Dekkan, (2) Sier Mutakherin, (3) Franklin's Shah Alum, (4) Franklin's History of George Thomas, (5) Major Paolie's letter in the

ক্কেরা তাঁহাকে Sombre বলিয়া ঠাট্টা তামাসা করিত, (১) তথাপি রেনহার্ডের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল না। আমরা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের অনুরোধে, এখন হইতে রেনহার্ড নাম পরিত্যাগ করিলাম। "সমরু" লইয়াই আমাদের প্রয়োজন। ফরাসীর চাকরী ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃতিস্থচিত্ত সমরু অযোধ্যার নবাব সফ্দার জঙ্গের (২) সেনাদলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার বনিয়া উঠিল না।

পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মীরজাফরী আমলের শেষাশেষি, আবার বাঙ্গলা দেশে সমরুর নাম শোনা যায়। পূর্ণিয়ার ফৌজদার কদম হোসেন খাঁ নবাব সরকারের বিদ্রোহী হন। সমরু কদম হোসেনের দলে গিয়া জুটিলেন। কদম হোসেনকে নবাবের ফৌজ বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলে, সমরু অগত্যা তাঁহার দল ত্যাগ করিলেন।

আরমাণি গুরগণ খাঁ (Gregory) বাঙ্গালার নবাব মীরকাশেমের প্রধান সেনাপতি। মীর কাশেম তখন ইংরাজদিগের সহিত ভবিষ্যৎ সংঘর্ষণের আশঙ্কায়, ভূতপূর্ব্ব নবাবী আমলের উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি সেনাদিগের সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। গুরগণ খাঁ এই কাজ অনেকটা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি এক জন ইউরোপীয় তাঁহার বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ইংরাজ অপেক্ষা এক জন ফরাসীর উপযোগিতাই অধিক বলিয়া বোধ হইল। সমরু, গুরগণ খাঁর সহায়তায় নবাবের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সমরুর সামরিক প্রতিভা ছিল, কিন্তু তাহা সংযত ও সুশৃঙ্খল বা কোন বিশেষ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত ছিল না। তথাপি সমরু অনেক কার্য্যের উপযোগী ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধসাহসই তাঁহার সৈনিকবৃত্তির অধিক সহায়তা করিত।

সেরাজউদ্দৌলার পর হইতে বাঙ্গলার নবাবের সেনাদল অতি উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত হইয়া উঠিয়াছিল। না ছিল তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, না ছিল

(১) Sombre শব্দ—বিষণ্ণার্থজ্ঞাপক। এই শব্দ হইতেই ক্রমশঃ "সমরু" এই অপভ্রংশে দাঁড়াইয়াছিল। শেষ তাহাই রহিয়া গেল। "সমরু" মুসলমানী ধরণের নাম। মুসলমানেরা নামপরিবর্ত্তনের বিষয়ে বড় সিদ্ধহস্ত; বিশেষতঃ, ফরাসী জাতির প্রতি এ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ অনুগ্রহ। তাজমহলের নক্সাকারী বিখ্যাত ফরাসী Austin de Bordeux এই সংঘর্ষণে পড়িয়া ক্রমে "উস্তান ইছ" হইয়া পড়েন। তাঁহার পুত্র সাহজাহানের আমলে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে নৃপতির কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর নামের পরিবর্ত্তন বড়ই অদ্ভুত। ইনি একেবারে "মহম্মদ মরিফে" নামিয়া পড়েন।

ভাল অস্ত্র শস্ত্র, না ছিল বেতনের বন্দোবস্ত, না ছিল উপযুক্ত নায়ক। জাফর আলি অহিফেন ও সুখস্বপ্ন, লোহিতমখমলাবৃত মস্‌নদের কোমল শয্যা ও আলস্য, রমণীর কলকণ্ঠ ও অপাঙ্গদৃষ্টি লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গলার প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চাহিলে, এবং ইংরাজের সেনা তাঁহার "মতিঝিলের" আশে পাশে লাল রঙ্গের কুর্ত্তি পরিয়া সঙ্গিন খাড়া করিয়া ঘুরিলেই, রাজ্যশাসনের ও ক্ষমতাবিস্তারের যথেষ্ট উপায় থাকিবে।

কিন্তু কাশেম আলি খাঁ যখন বাঙ্গলার গদি দখল করিলেন, তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইল। তিনি নিজে দুঃসাহসিক ও দৃঢ়সংকল্প—সেনাপতি ও সহায় জুটিয়াছিল তদ্রূপ। গুরগণ খাঁ নবাবের এই দুরাকাঙ্ক্ষার—বা যাহাই বলুন না কেন,—তাঁহার প্রধান সহায়। গুরগণ আর এক জন সঙ্গী খুঁজিতে-ছিলেন; সমরুর উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

গুরগণ খাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সমরুর সেনাচালনাভিজ্ঞতা, উভয় মিলিয়া অভূতপূর্ব্ব ফলের উৎপাদন করিল। সকলে দেখিল, চেষ্টা করিলে, বসিয়া বসিয়া ডালরুটী-হজমকারী, যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন-পরায়ণ সেনার পরিবর্ত্তে, সতেজ, কার্য্যক্ষম, নিমকের মর্য্যাদা-রক্ষাকারী সেনাদল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কি কারণে ইংরাজের সহিত মীরকাশীমের বিবাদ বাধে, ইতিপূর্ব্বে আমি, সাহিত্যে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মুঙ্গেরে নবাব সাহেবের সঞ্চিত ধনরত্ন ছিল। স্বল্পবুদ্ধি ইলিষ সাহেব, নিজের ঔদ্ধত্যের দোষে যে বিবাদ বাধাইয়া মুঙ্গের অবরোধ করিলেন, তাহাতে নবাবের বিশেষ বোধোদয় হইল। ক্রমশঃ যখন তাঁহার পড়তা কমিয়া আসিতে লাগিল, তখন তিনি জিঘাংসাপরায়ণ ও ঘোরতর উত্তেজিত হইয়া, পাটনায় অবরুদ্ধ ইংরাজদিগকে হত্যা করিবার সংকল্প করিলেন।

নবাব গুরগণ খাঁর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলে, সেই সুচতুর আর-মাণি কৌশলক্রমে এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নবাব তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। সংকল্প ছাড়িলেন না, লোক খুঁজিতে লাগিলেন। সমরুর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন। কি গূঢ় কারণে বলিতে পারি না, দুরাচার অবিবেকী সমরু এই নৃশংস কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল।

সঙ্গীনের খোঁচায়, বন্দুকের গুলিতে, তরবারির ধারে, ফাঁসের মুখে অনেকেরই জীবনলীলা শেষ হইল। দুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কেহ কেহ প্রাণ হারাইল। এই হতভাগ্য বন্দীদের মধ্যে মুরশিদাবাদের ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজ স্বরূপ চাঁদ ও সীতাব রায়ও ছিলেন। "পাটনার হত্যা-কাণ্ডে" সমরুর নাম, শোণিতাক্ষরে কলঙ্কিত ভাবে ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় বিবরিত থাকিবে।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্ব্বে সমরুর উত্তেজনায় নবাব আর একটি দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এটি সাধারণ ইতিহাসে তত প্রকাশ নাই। ইংরাজের সহিত প্রকাশ্যভাবে লড়িবার জন্য কাশেম আলি মুঙ্গেরেই দুর্গ দৃঢ় ও অন্যান্য আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও একটা দুঃসাহসিক আয়োজনের কল্পনা হইতেছিল। গুরগণ খাঁ ও সমরুর প্রবর্ত্তনায় মীরকাশেম নেপালাধিপতিকে কৌশলে বিনষ্ট করিয়া নেপালের স্বাভাবিক পার্ব্বত্যক্ষেত্র নিজ আশ্রয়ের ও আত্মরক্ষার জন্য হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আশার সীমা নাই। কিন্তু যখন ইহা দুরাশায় পরিণত হয়, তখন কোনও বিষয়ে জ্ঞানগোচর থাকে না; তার পর সেই দুরাশা যখন নিরাশার যন্ত্রণায় পর্য্যবসিত হয়, তখন আত্মগ্লানি ও তাহার পরিণাম এত বেশী হইয়া পড়ে যে, কার্য্যলিপ্ত সকলেরই বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। নবাব, গুরগণ খাঁ ও সমরুর সেই দশা হইয়াছিল।

মতলব স্থির হইল, বাছা বাছা ৪০০ শত লোক নেপাল যাত্রা করিবে। তাহাদের সঙ্গে চারি শত বাক্সে বন্দুক, বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম থাকিবে। বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে নেপালাধিপের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকন যাইতেছে, এই কথাই বাহিরে প্রকাশ থাকিবে। ভিতরের কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু তখন কিছু আজকালের আমল নহে। বাঙ্গলার সীমার বাহিরে, —বিশেষতঃ নেপালের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিতে হইলে, বিশেষ ছাড় ও সনন্দের প্রয়োজন। চেষ্টা করিয়া তাহারও জোগাড় করা হইল। বাহিরে প্রকাশ রহিল, বাঙ্গলার নবাবের লোক নেপালাধিপতির জন্য নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া যাইতেছে।

নবাব ইতিপূর্ব্বে নেপালের রাজপ্রাসাদে দুই এক জন ষড়যন্ত্রকারীর সহা-

হইত না। নবাবের লোকের উপর আদেশ ছিল, তাহারা পথিমধ্যে কোনও বাক্স কোনও কারণেই বাধ্য হইলেও খুলিবে না। কাটামুণ্ডের প্রাসাদে উপনীত হইয়া রাজ্যেশ্বরের সমক্ষে সেই সমস্ত খোলা হইবে। আসল বন্দোবস্ত এই রহিল, প্রাসাদে ঢুকিয়াই সুযোগ পাইলেই সেই সমস্ত বাক্স হইতে অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া সেনাদল সহসা রাজাকে বন্দী ও পুরবাসীদিগকে নিহত করিবে। এ দিকে তাহাদের সহায়তার জন্য মুঙ্গের হইতে ১২০০ শত সৈন্য বেথিয়ার অদূরে পর্ব্বতের নিম্নে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে, তাহাদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবে।

কিন্তু হায়! ঘটনাবশে এই দুরাশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইল। এটা কেবল ঘটিল, নবাবের নিজের লোকের বুদ্ধির দোষে। ইহাদের সঙ্গে যদি গুরগণ বা সমরুর ন্যায় কোনও স্থিরবুদ্ধি সেনাপতি থাকিতেন, তাহা হইলে এ অনর্থ-পাত হইত না। নেপালের নীচে, মাখনপুরে মহারাজের এক কেল্লা ছিল। নবাবের লোকেরা কেল্লায় উপস্থিত হইয়া ছাড় দেখাইল। নেপালেশ্বরের লোক, নবাবের লোকের যথেষ্ট খাতির অভ্যর্থনা করিল। রাত্রিকালে নবাবের পক্ষের দুই চারি জন মদ্যপান করাতে, তাহাদের সহিত রাজার দুই এক জন সিপাহীর কোনও কারণে বচসা উপস্থিত হয়। তাহার উত্তেজনায় নবাবের লোকের এক জন বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা দেখা যাইবে, কাল এই দুর্গ কাহাদের হাতে আইসে।" এই কথায় নেপালি সেনারা সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাদের সেনাপতির নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিল। তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাক্স খোলা হইল। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পাইলে নেপালীরা উত্তেজিত হইয়া ৩।৪ জন ব্যতীত নবাবের সমস্ত সেনাকে দুর্গমধ্যে হত্যা করিল। পাটনার হত্যা-কাণ্ডে অকারণে যে শোণিতপাত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

যে চারি জন লোক ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, তাহারা প্রাণ লইয়া অতি কষ্টে বেথিয়ায় পঁহুছিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ নবাবশিবিরে প্রচার করিল। সমস্ত সেনা অগত্যা মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাসেম আলি যে প্রকার মতলব আঁটিয়াছিলেন, যদি সুসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে নেপাল নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হইত।

উদয়নালার যুদ্ধের পর মীরকাশেমের অবস্থা যখন ক্রমশঃ নিরাশার গভীর স্তরে নামিতে আরম্ভ করিল, ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি বিরূপ

সাক্ষাৎ বিদায়াভিবাদন বা সহানুভূতিসংকল্পে নহে। মীরকাশেম সমরুর অধীনে যে সেনাদল সংন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েক মাসের বেতন বাকী ছিল। বেগতিক দেখিয়া এবং উপায়হীন হইয়া পড়াতে, মীরকাশেম তাহাদের বেতন বাকি ফেলিয়াছিলেন। সমরু অবসর বুঝিয়া উদ্ধতভাবে নবাবের নিকট প্রাপ্য অর্থ দাবী করিলেন। মীরকাশেম সমরুর এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ দিলেন। অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি তোপখানার প্রধান কর্ম্মচারীকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ দিলেন; কিন্তু তাঁহার কথা কে শোনে? তখন আর তিনি বঙ্গেশ্বর "মীরকাশেম" নহেন। সমরু আদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। সেনাদল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীনস্থ ছিল; তাহাদের লইয়া তিনি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এই সময় হইতে সমরুর নিজের সেনাদলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

সমরু বক্সারে অযোধ্যার নবাবের কার্য্যে নিজের সেনা নিয়োজিত করিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর, সমরু নবাবের মহিলাশিবিরের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ইংরাজের সহিত নবাবের সন্ধি হইল; সন্ধির অন্যান্য স্বত্বগুলির মধ্যে একটা প্রধান স্বত্ব এই যে, মীরকাশেম ও সমরুকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

নবাব এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। মীরকাশেম যদিও নবাব হইতে দুর্দ্দৈববশে ফকির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি রাজবংশীয়। এ প্রকার অসহায় অবস্থায় সুজাউদ্দৌলা তাঁহাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, "মীরকাশেম আমার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছেন; ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে পথিমধ্যে আটক করিতে পারেন। তবে সমরুর সম্বন্ধে তাঁহার ঘোর আপত্তি আছে। সমরুর অধীনে এক দল শিক্ষিত সেনা আছে; তাহাকে সহসা ধৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে ইংরাজদের যদি নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি সমরুকে একাকী এক নাচের মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়া গোপনে হত্যা করিতে পারেন। সাক্ষ্যস্বরূপ, ইংরাজ পক্ষ হইতে যে কোন ইংরাজ সেই স্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজ পক্ষ সুজার এই নীচ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

যাহা হউক, এই ঘটনার পর, সমরু অযোধ্যার নবাবের অধীনতা পরি-

ছিল। নবাব সহজে তাহা পরিশোধ করিয়া দিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, তিনি রোহিলখণ্ডে নবাবের বেগমদিগকে অবরোধ করিয়া টাকা আদায় করেন।

পাঠক! আমরা প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন পলাশী, উদয়নালা ও বক্সারের কয়েকটি যুদ্ধে, ইংরাজের প্রতিপত্তি ও বাহুবলের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে খুব বিস্তৃত হইয়াছিল। ওয়ালটার রেণহার্ড ওরফে সমরু, ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক—তাঁহার ধমনীতে ফরাসী শোণিত প্রবাহিত; ফরাসীর তখন প্রতিপত্তি কম, কিন্তু সমরুর সৈনিকপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ উত্তেজিত; সুতরাং নিরুপায় হইয়া সমরু আর এক নূতন পথে অগ্রসর হইলেন।

এই নূতন পথের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে, তিনি আর একবার রোহি ! সর্দ্দার হাফিজ রহমতের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ইংরাজের সহিত সংঘর্ষণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায়, তিনি নিজের প্রচ্ছন্ন কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতবর্ষ তখন অরাজক। দেশে কাহারও একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। এক এক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্ব স্ব অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বত্রই অধিকার লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত। তখন "জোর যার মুল্লুক তার," এই নীতির ঘোর প্রাদুর্ভাব। কাহারও বা সেনাদল সম্পূর্ণ শিক্ষিত, কিন্তু সংখ্যায় অল্প; কাহারও বা অশিক্ষিত, এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও কোনও কাজের উপযুক্ত নহে। সমরু অবস্থা ও দেশকাল দেখিয়া শিক্ষিত সেনাদলের ব্যবসায় অরম্ভ করিলেন। নিজে নূতন সৈন্যদলের গঠন করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তির শিক্ষাপ্রসূত নিয়মে শিক্ষিত করিয়া, চড়া দামে সেনাদল ভাড়া দিতে লাগিলেন।

সমরুর নবসংগঠিত ভাড়াটিয়া সৈন্যদল লইয়া যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভরতপুরের জাঠ সর্দ্দারগণ, জয়পুরাধিপতি, দিল্লীর অধঃপতিত মন্ত্রী নজফখাঁ ও মরাঠাগণ প্রসিদ্ধ।

এই নবসংগঠিত সৈন্যদলের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহারা প্রতি মাসে নিয়মিত বেতন পাইত না। লুঠের মালে তাহাদের পেট ভরিয়া যাইত, সুতরাং মাহিনার জন্য বড় একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। সমরু অবস্থাভিজ্ঞ

ভরতপুরাধিপতি সূর্য্যমল্লের অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিয়া, সমরু পুনরায় জয়পুরের মহারাজার অধীনে চাকরী স্বীকার করেন। ইংরাজেরা সমরুর উপর আগাগোড়াই বিরক্ত ছিলেন। ইংরাজের চেষ্টায় ও প্রতিযোগিতায় জয়পুরে সমরুর চাকরী গেল। তিনি দিল্লীতে চলিয়া আসিলেন।

আবদুল্লা খাঁ তখন দিল্লীর প্রধান মন্ত্রী। তিনি সমরুর সেনাদলের আবশ্যকতা বুঝিয়া, চারি মাসের জন্য তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাদসাহমন্ত্রীও ইংরাজদের ভয়ে সমরুকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে সমরু উজীর নজকখাঁর সহায়তাকল্পে আহূত হন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কাটাইয়া যান। (১)

১৭৭৮ খৃঃ অব্দের ৪ঠা মে আগরায় সমরুর মৃত্যু হয়। তিনি ধর্ম্ম বিশ্বাসে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। প্রথমতঃ আগরায় নিজ উদ্যানেই তাঁহার সমাধি হয়। তিন বৎসর পরে, বেগম মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তাঁহারই যত্নে আগরার গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে সমরুর দেহাবশেষ সমাহিত হয়।

সমরু একজন বীরপুরুষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সৎবৃত্তি অপেক্ষা অসৎবৃত্তির অধিক আধিপত্য ছিল বলিয়া, তিনি প্রকৃতরূপে ফুটিতে পারেন নাই। যে সামরিক প্রতিভায় তাঁহার মস্তিষ্ক উজ্জ্বল ছিল, যদি তাহা যুক্তি, ভূয়োদর্শন ও ন্যায়পরতার সহিত পরিচালিত হইত, তাহা হইলে হয় ত তিনি ইতিহাসের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় হইয়া থাকিতেন। চরিত্রের কঠোরতা ও রক্তপিপাসুতায় তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। যে প্রকার সুযোগ ও অবসরের সময়ে তিনি ভারতবর্ষের উচ্ছৃঙ্খল, শাসনশক্তিহীন অধিকারে সামান্য পণ্যমূল্যে স্বীয় শিক্ষিত সৈন্য চালিত করিয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া, যদি তাঁহার সমসাময়িক সমধর্ম্মী জর্জ টমাসের সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে হয় ত সার্দ্ধানার পরিবর্ত্তে সমস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ তাঁহার করতলস্থ হইত।

সমরু যদিও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তথাপি কখনও ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখান নাই। অনেক পাপও করিয়াছিলেন, ধনের সদ্ব্যয়ে তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই। এই প্রবৃত্তির অভাব তাঁহার স্ত্রী বেগমের

---

(১) নজকখাঁ "সার্‌ধানা" পরগণা (দিল্লীপ্রদেশভুক্ত) সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমরুকে প্রদান করেন। ইহার বার্ষিক আয় প্রথমে ছয় লক্ষ টাকা ছিল। সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া বেগম ইহার আয় দশ লক্ষে তুলিয়াছিলেন।

চিত্তবৃত্তিতে সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল; পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

সমরু খাস্ ফরাসি হইয়াও এদেশে অনেক দিন বাস করার জন্য ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সামান্য মোগলাই পরিচ্ছদই তাঁহার বেশভূষা ছিল। তিনি যে নীচবংশোদ্ভূত, তাহাও তিনি কখনও গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন না।

সমরুর জীবন আগাগোড়া বিশৃঙ্খলায় পরিচালিত, পাঠক পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাগুলিতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক কি বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Sumroo appears to have been a man, whose evil propensities far outweighed the good. He was stern and bloody minded in no degree remarkable for fidelity or devotion to his employers. * * * * His military talents were well vindicated in the bloody actions in which he had taken leading part, and good laurels would have crowned his head, had there be any prudence and regulated will in his whole career." Vide Fraser's Military Memoirs, P. 284.

অমিতাভ। *

সিদ্ধার্থের পবিত্র ধর্ম্ম যখন পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়, হিন্দু স্বর্গের অনুমানে যখন বৌদ্ধ সুখাবতী কল্পিত হয়, তখন উত্তরদেশের বৌদ্ধগণ ইন্দ্রের আসনে অমিতাভকে বসাইয়াছিলেন। অমিতাভ নাম হইতেই বুঝা যায়, বাবু নবীনচন্দ্র সেন বুদ্ধকে অবতার করিয়া 'মহাবস্তু-অবদান' ও 'ললিতবিস্তরে'র মতে বুদ্ধের জীবলীলা রচনা করিয়াছেন। এডুইন আর্ণল্ডের "লাইট্ অব্ এসিয়া" নামক গ্রন্থ তাঁহাকে যত সাহায্য করিয়াছে, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তিনি তত সাহায্য লন নাই। কবির আনন্দ স্থূলতায়, কুয়াসায়, মোহে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থূল ধর্ম্মরূপে, বুদ্ধকে ভাবপ্রণোদিত কল্পনাচলিত মনুষ্যরূপে বর্ণনা করিতে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রজের গোপাল

কপিলনগরের সিদ্ধার্থ, শুদ্ধোদন সেই নন্দরাজা, প্রজাবতী যশোদা, এবং গোপা সেই শ্রীমতী রাধিকা। প্রভেদ দেখিলাম, বিরহে রাধিকা দিব্যোন্মাদিনী নহে, মহাশ্বেতার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যখন ভারতে যুগান্তর উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণের আসনে মুণ্ডিতশির শ্রমণ উপবেশন করেন, যাগ যজ্ঞের রক্তস্রোত শুষ্ক হয়, সেই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার রচনা হয়। গীতার ধর্ম্ম না হিন্দু, না বৌদ্ধ; অথচ, এমন ভাবে রচিত যে, গীতামুখে বৌদ্ধস্রোত হিন্দু-সাগরে সম্মিলিত হইয়া যায়। সিদ্ধার্থের ধর্ম্ম গীতার পূর্ব্বতন। নবীন বাবু গীতাকে আদর্শ করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে কোনও প্রভেদ নাই। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বৌদ্ধ ও হিন্দুর অভিমত, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম এক। এইরূপ যুক্তিতে ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরক, হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মের অভিমত, সুতরাং হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্ম এক বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিতে পারেন।

বস্তুতঃ, কোন কোন দার্শনিক মত এক হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উপনিষদের ধর্ম্ম ও পুরাণের ধর্ম্মে যত প্রভেদ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্নতা তাহা অপেক্ষা অধিক। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা সিদ্ধার্থের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। কুহেলিকার ন্যায় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের মস্তিষ্কে যে চিন্তা আন্দোলিত হইতেছিল, সিদ্ধার্থ সাধারণে তাহা প্রচার করিয়া, তদনুসারে পবিত্রতার নিষ্কামতার পথে জীবন চালিত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। একটি মত সাধারণ সম্পত্তি হইয়া জীবনকে প্রভাবিত করিবার পূর্ব্বে, অনেক দিন কুয়াসার ন্যায় আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। সিদ্ধার্থের এইমাত্র কারিকরী যে, তিনি তাহাকে ধরিয়া নাম রূপ দিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। কঠোপনিষদের এই কয়টি কথায় বুঝা যাইবে, জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল ভারতের কত প্রাচীন সামগ্রী।

অনুপশ্য যথাপূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥

*　*　*　*

হন্ত ত ইদমপ্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥

*　*　*　*

ইহচেদশকদ্ বোদ্ধুম্ প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥

হইতে ভারতবর্ষে আইসে, এ কথার এখনও সম্যক মীমাংসা হয় নাই। মিসর হইতে এই মত গ্রীস ও রোমদেশে প্রচারিত হয়।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র, সকলই ভারতের সম্পত্তি। এই সকলই হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতের সম্পত্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদের নিকট ঋণী ও পৌরাণিক ধর্ম্মের উত্তমর্ণ। এ অর্থে যাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতে চান, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই। কিন্তু গীতার পর হইতে কলঙ্কিত হইয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন নেপাল ও তিব্বতে প্রচা-রিত রহিয়াছে, সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মকে ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া যাঁহারা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ। নবীন বাবু এই শ্রেণীস্থ। এই শ্রেণীর অগ্রণী আমার সম্মাননীয় বন্ধু পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের সহিত বাদপ্রতিবাদ উপলক্ষে আমার মত বিস্তারক্রমে নব্য-ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। এথানে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

গোষ্পদকে সমুদ্র করিবার, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইয়া দিবার ও ছয় মাসের পথ ছয় দিনে অশ্বমনোরথ দ্বারা অতিক্রম করিয়া দিবার অধিকার, কবির সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু মহম্মদকে খৃষ্টের পূর্ব্বতন এবং রামমোহন রায়কে বেদ-ব্যাসের প্রপিতামহ করিয়া বর্ণনা করিবার অধিকার, বোধ হয়, এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। দেখিলাম, নবীন বাবু এইরূপ ঐতিহাসিক ক্রমবিপর্য্যয় অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।

গৌতম তৎকালপ্রচলিত কৃচ্ছ্রসাধনে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন ভাবিয়া-ছিলেন। আলাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রক তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। আলাড় কালামের পাঁচ জন শিষ্য গৌতমের সঙ্গ লয়। ইঁহারা বৌদ্ধ ইতিহাসে পঞ্চবর্গীয় বা পঞ্চ ছ-বর্গীয় নামে বিখ্যাত। গৌতম উপদেশ মত অনেক কৃচ্ছ্রসাধন ও পঞ্চতপা করিলেন। শরীর এত শীর্ণ হইল যে, মন ধ্যান করি-বার শক্তি হারাইল। তখন গৌতম বুঝিলেন, কৃচ্ছ্রসাধনে নির্ব্বাণ লাভ হয় না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিলেন। স্নান ও আহার করিয়া শরীর সুস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চ ছ বর্গীয়েরা তাঁহাকে মহাজনপথবিচ্যুত দেখিয়া পতিত স্থির করিয়া, তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গলাভের আশায় বারা-

"মাংসহীন কলেবর হইল দুর্ব্বল কৃশ।
নাসিকার পথে তৃণ করালে প্রবেশ
হইত বাহির কর্ণে; নয়ন কোটরে মগ্ন।
সে কাঞ্চনকান্তি এবে অস্থিমাত্রশেষ।
পিশাচ ভাবিয়া মনে গোপাল রাখালগণ
করিত বিকৃত অঙ্গে ধূলিবরিষণ;
কেহ মৃত ভাবি মনে, ঘৃণায় যাইত দুরে,
পলাইল নিরাশায় শিষ্য পঞ্চজন।"

বৌদ্ধ ইতিহাসে উল্লেখ আছে, তথাগত প্রজ্ঞা লাভ করিয়া যখন দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন বৈশালী নগরে মহামারী উপস্থিত হয়। তথাগত তথায় উপস্থিত হইলে মহামারী বৈশালী নগর পরিত্যাগ করে। নবীন বাবু এ ঘটনা গৌতমের প্রজ্ঞালাভের, কৃচ্ছ্রসাধনের, রামপুত্র রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, আরোপিত করিয়াছেন।

ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপিত হইবার অনেক দিন পরেও মহিলাদিগের জন্য ভিক্ষুণী-সঙ্ঘস্থাপনে সিদ্ধার্থের প্রবৃত্তি ছিল না। ভাবপরায়ণ মহিলাগণ বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক নিষ্কাম সাধনে সমর্থ হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। আনন্দের অনুরোধে ও মহাপ্রজাবতীর আগ্রহে, সিদ্ধার্থ ভিক্ষুণীসঙ্ঘস্থাপনের আদেশ দেন। এবং ভিক্ষুণীসঙ্ঘ স্থাপিত হইলে সিদ্ধার্থ বলিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের জীবনকালের অর্দ্ধেক হ্রাস হইল। সম্ভবতঃ, ভিক্ষুণীসঙ্ঘস্থাপনের রহস্য নবীন বাবু জ্ঞাত নহেন। তাই শুদ্ধোদনের অনুরোধে যে বৎসর সিদ্ধার্থ প্রথম কপিলাবস্তু গমন করেন, সেই বৎসর গোপাকে ভিক্ষুণীমন্ত্রে দীক্ষিতা করিবার কথা আরোপ করিয়াছেন।

"রাহুলে লইয়া বুকে বসিলেন জানু পাতি
পতিপদতলে গোপা, মূর্ত্তি করুণার।
রাহুল কাঁদিয়া কহে, 'দেও পিতঃ পিতৃধন।'
নীরব নিস্পন্দ বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় আর।
ছুটিয়া আসিয়া কক্ষে রাজপরিবারগণ,
বৃদ্ধ রাজা রাণী সহ, করি হাহাকার,
আবার আবার শিশু, 'দেও পিতঃ, পিতৃধন'
কহিছে কাঁদিয়া, অশ্রু বহিছে গোপার।
'দিব পিতৃধন বৎস, পালিব পিতার ধর্ম্ম
দিব সপ্তরত্ন,' বুদ্ধ কহিল গম্ভীরে,
'সারিপুত্র, ভিক্ষাপাত্র,' আজ্ঞামাত্র দিল শিষ্য
পত্নীপুত্র-করে পাত্র ভাসি অশ্রুনীরে।"

আর এক স্থানে কবি বলিয়াছেন;—

চাহিয়া গোপার প্রতি কহিলেন তথাগত
বৃদ্ধ পিতামাতা নাহি লভেন নির্ব্বাণ—
যতদিন রবে তুমি সেবিতে চরণ গোপা।
হবে, গৃহ তব পুণ্য তপস্যার স্থান।

আমরা জানি না, নন্দযশোদার পদসেবা করিবার [illegible] নবীন বাবুর শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ব্রজপুরে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাখিয়া গিয়াছি[illegible]।

ভিক্ষুণীসঙ্ঘস্থাপনের কারণ নবীন বাবু এইরূপ নির্দ্দে[illegible] —

"লইয়াছে সবে নবধর্ম্মের আশ্রয়
অনাথা-রমণী পূর্ণ হইয়াছে শাক্যপুরী
বুদ্ধদেব শুনিলেন ভি[illegible]
সৃজিলেন সুপবিত্র শুদ্ধ[illegible]

গ্রন্থখানির আকার সুন্দর। কয়েকটি মুদ্রাকরপ্রমাদ না থাকিলে অতি সুন্দর হইত। কিন্তু ত্রপুর স্থানে এপুর, মৃগদাব স্থানে মৃগদায় এবং অনোমার স্থানে অনামা বোধ হয় মুদ্রাকরপ্রমাদ নহে। চণ্ড চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া গৌতমের যে রোগ হয়, তাহা আর আরোগ্য হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, চণ্ড গৌতমকে শূকরমাংস খাইতে দিয়াছিল। এ ভ্রম এখন অপনোদিত হইয়াছে। বীড়জ ছত্রে উত্তম ভোজ্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু এক-জাতীয় ছত্র বিষাক্ত। চণ্ড ভ্রমক্রমে এইরূপ ছত্র গৌতমকে আহার করিতে দিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, নবীন বাবু এ সংবাদ না রাখিয়া লিখিয়াছেন ;—

"পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা,-ভিক্ষা-প্রত্যাখ্যান
নহে ধর্ম্ম শ্রমণের, করিয়া গ্রহণ
হইয়া পীড়িত, কুশী নগরে আসিয়া
শুইলেন শালবনে অন্তিম শয়নে।"

* * *

মূল গ্রন্থে "শূকরমার্দ্দব" শব্দ আছে ; ইহার অর্থ শূকর যাহা ভালবাসে, বা শূকর যাহা পদমর্দ্দিত করে। কেহ ইহাকে বাঁশের কলা বুঝিয়াছেন। শূকর-মার্দ্দবের অর্থ শূকরমাংস হইতে পারে না।

নবীন বাবুর লেখার মধুরতা প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাঁশরীর মিষ্ট আলাপনে হৃদয় উন্মাদিত করে।

"মধুর বসন্তকাল, মলয় অনিল ধীরে
বহিছে মধুরে মধু ঢালিয়া ধরায় ;
সে মধুর পরশনে ফুটিয়াছে ফুলরাশি,
ছুটিয়াছে সুধাস্রোত বিহঙ্গগলায়।
আকাশের নীলিমায় ভাসিতেছে কি মাধুরী,
ভাসিতেছে কি মাধুরী বসুধা শ্যামায়।
কি মাধুরী চন্দ্রকরে, কি মাধুরী সরোবরে,
বহিতেছে কি মাধুরী তটিনীধারায়!
বসন্তপরশে বিশ্বে ভাসিতেছে কি পুলক,
সাধকের দেহে যেন দেবপরশনে!
বিশ্বের হৃদয়ে যেন হইয়াছে সঞ্চারিত
নির্ব্বাণের মহাসুখ বসন্তের সনে।"

"পথে নির্ব্বাণের স্রোতে ভাসাইয়া বহুরাজ্য
আসিলেন বুদ্ধদেব কপিল নগরে,
নগর-বাহিরে বনে রহিলেন শিষ্যসহ,
ছুটিল নগরবাসী আকুল অন্তরে।
নীরব আনত মুখে, ভিক্ষাপাত্র হেম করে,
গৈরিকে আবৃত হেম-বপু জ্যোতির্ম্ময়,
জটার কিরীট শিরে, কাঞ্চন শেখরে যেন
হইয়াছে শরতের মেঘের উদয়।"

বোধ হয় কিছু ব্যস্ততার সহিত নবীন বাবু গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে দু' একটি পদ শ্রুতিকঠোর হইয়াছে।

"মৃগের পশ্চাতে ছুটি, আকর্ণ টানিয়া শর,
সে মুহূর্ত্তে প্রতিহার করিতে কখন
যাইতেছে অশ্ব ছুটি, শুনি অশ্ব কষ্ট শ্বাস
থামিত হইত কভু স্বপ্নে নিমগন।"

"রাজপুত্র এতদিন ছিলেন জীবনপথে
পথিক একাকী অসহায়,
সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী মিলিল, পাইল তনু

"গোপার সৌন্দর্য্যে প্রেমে সিদ্ধার্থ মুগ্ধ, মোহিত
বুঝিলেন বন হস্তী হইয়াছে শৃঙ্খলিত।"

* * * *

"এ বাঁশীর স্বর, মানবজীবন
সুধাময় অনিল নিস্বন।
অনিল লহরী মত, জীবন বহে সতত,
ঝটিকা-নিশ্বাস-কুস্বপন।"

* * * *

"উঠ, উঠ, মায়াসুত, কাঁদিছে দুখে জগত
কি কাতর করুণ রোদন।"

* * * *

"হইল দীক্ষিত দুই ব্রাহ্মণকুমার,
খ্যাত সারি পুত্র মৌদ্গলায়ণ আর।"

এই গ্রন্থরচনায় নবীন বাবুর মৌলিকতা অতি সামান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যের চিত্র অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ মূলচিত্রের সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিতে পারেন। প্রব্রজ্যার অনতিপূর্ব্বে শয়নকক্ষে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া গৌতমের কামিনীকাঞ্চনে ঘৃণার উদয় হয়, আর্ণল্ডের "লাইট অব্ এসিয়া" নামক গ্রন্থে অনেকে তাহার চিত্র দেখিয়াছেন। সেই চিত্রের সহিত, নবীন বাবুর, অশ্বঘোষের ও বাল্মীকির চিত্র তুলনা করিয়া দেখি ন।—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে অধীর যুবক
আসিলেন কক্ষান্তরে একি দৃশ্য হায়!
গভীর রজনী; চারু কক্ষ আস্তরণে
সুষুপ্তা নর্ত্তকীগণ; স্তিমিত আলোক।
কেহ বা বিবস্ত্রা, কেহ বিচ্ছিন্নকবরী,
কেশজালে সমাচ্ছন্ন বিকৃত বদন।
কাহারো বিকট ভঙ্গী, ঘূর্ণিত নয়ন
ভীতিপূর্ণ, কেহ হাসি হাসিছে বিকট,
বকিছে [illegible] কেহ, কেহ কড়মড়
ঘষিতে[illegible] দন্ত, পড়িতেছে লালা
বদন হ[illegible]কারো, শব্দে নাসিকার
কাহা[illegible] করিছে প্রাণে ভীতির সঞ্চার।

—নবীনচন্দ্র সেন।

অভবচ্ছয়িতা হি তত্র কাচি-
দ্বিনিবেশ্য প্রচলে করে কপোলম্।
দয়িতামপি রুক্মপত্রচিত্রাং
কুপিতেবাঙ্কগতাং বিহায় বীণাম্॥
বিবভৌ করলগ্নবেণুরন্যা
স্তনবিস্রস্তসিতাংশুকা শয়ানা।
ঋজুষট্‌পদপংক্তিজুষ্টপদ্মা
জলফেনপ্রহসত্তটা নদীব॥

স্বপিতি স্ম তথা পুরা ভুজাভ্যাং
পরিরভ্য প্রিয়বন্মৃদঙ্গমেব॥
নবহাটকভূষণাস্তথান্যা
বসনং পীতমনুত্তমং বসানাঃ।
অবশা বত নিদ্রয়া নিপেতু-
র্গজভগ্না ইব কর্ণিকারশাখাঃ।
অবলম্ব্য গবাক্ষপার্শ্বমন্যা
শয়িতা চাপবিভুগ্নগাত্রযষ্টিঃ।
বিরাজ বিলম্বিচারুহারা
রচিতা তোরণশালভঞ্জিকেব॥
মণিকুণ্ডলদষ্টপত্রলেখং
মুখপদ্মং বিনতং তথাপরস্যাঃ।
শতপত্রমিবার্দ্ধচক্রনাভং
স্থিতকারণ্ডবঘট্টিতং চকাশে॥
অপরা শয়িতা যথোপবিষ্টাঃ
স্তনভারৈরবনম্যমানগাত্রাঃ।
উপগুহ্য পরস্পরং বিরেজু-
র্ভুজপাশৈস্তপনীয়পরিহার্য্যৈঃ॥
মহতীং পরিবাদিনীঞ্চ কাচি-
দ্বনিতালিঙ্গ্য সখীমিব প্রসুপ্তা
বিজুঘূর্ণ চলৎসুবর্ণসূত্রাং
বদনেনাকুলকর্ণিকোজ্জ্বলেন॥

সবিলাসরতান্তুতান্তমূর্দ্ধো-
র্ব্বিবরে কান্তমিবাভিনীয় শিশ্যে ॥
অপরা ন বভুর্নিমীলিতাক্ষ্যো
বিপুলাক্ষ্যোঽপি শুভক্রবোঽপি সত্যঃ।
প্রতিসংকুচিতারবিন্দকোশাঃ
সবিতর্য্যস্তমিতে যথা নলিন্যঃ ॥
শিথিলাকুলমূর্দ্ধজা তথান্যা
জঘনস্রস্তবিভূষণাংশুকান্তা।
অশশ্লিষ্ট বিকীর্ণকণ্ঠসূত্রা
গজভগ্না প্রতিপাতিতাঙ্গনেব ॥
অপরাস্তবশা হ্রিয়া বিযুক্তা
ধৃতিমত্যোঽপি বপুর্গুণৈরুপেতাঃ।
বিনিশশ্বসুরুল্বণং শয়ানা
বিকৃতাক্ষিপ্তভুজা জজৃম্ভিরে চ ॥
ব্যপবিদ্ধবিভূষণস্রজোঽন্যা
বিসৃতাগ্রন্থনবাসসো বিসংজ্ঞাঃ।
অনিমীলিতশুক্লনিশ্চলাক্ষ্যো
ন বিরেজুঃ শয়িতা গতাসুকল্পাঃ ॥
বিবৃতাস্যপুটা বিবৃদ্ধগাত্রা
প্রপতদ্বক্তৃজলা প্রকাশগুহ্যাঃ।
অপরা মদঘূর্ণিতেব শিশ্যে
ন বভাষে বিকৃতং বপুঃ পুপোষ ॥

—অশ্বঘোষ।

তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্তৈঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ।
বিরাজত বিমানং তন্নভস্তারাগণৈরিব ॥
মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ ॥
অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী।
বিন্যস্তশুভসর্ব্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী ॥
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সংপ্রকাশতে।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা ॥
অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা ॥
পটহং চারুসর্ব্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী।
চিরস্য রমণং লব্ধা পরিষ্বজ্যেব কামিনী ॥
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী ॥
বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নিদ্রাশালিনী।
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহ কান্তেব ভামিনী ॥
অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরথৈঃ।
মৃদঙ্গং পরিবিদ্ধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা ॥
ভুজপাশান্তরস্থেন কক্ষনেন কৃশোদরী।
পণবেন সহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা ॥
ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা।
প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগৃহ্যেব ভামিনী ॥
কাচিদাড়ম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীড়িতম্।
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা ॥
কলসীমপবিদ্ধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী।
বসন্তে পুষ্পসবলা মালেব পরিমার্জ্জিতা ॥
পাণিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলসোপমৌ।
উপগৃহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবশমুপা[illegible]গা ॥
অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃ[illegible]না।
অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণী নিদ্রাবশমুপা[illegible]তা ॥
আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্যা[illegible]য়ঃ।
নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামু[illegible]নিব ॥

—বা[illegible]কি।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র [illegible]য়।

সীতারাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[illegible]তারামকে কেহ চিনিত না। কিন্তু ক্রমে যখন সীতারামের যশোগৌরব [illegible]য়া উঠিতে লাগিল, তখন মুখে মুখে সীতারামের নাম দেশ বিদেশে ছুটিয়া [illegible] সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা উন্নতিসোপানে আরোহণ করেন,

.টি কারণ উদ্ভাবন করিয়া জনশ্রুতি রচনা করে। মহাবীর নেপোলিয়ান সামান্য অবস্থা হইতে কি কৌশলে জগদ্বিখ্যাত ফরাসীরাজ্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, তাহার রহস্যনির্ণয়ের জন্য ইতিহাসলেখকগণ কতই আড়ম্বরপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; নেপোলিয়ান নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গোপনে গোপনে যখন উন্নতিসোপান গঠিত করিতেছিলেন, তখন কেহ তাঁহাকে চিনিত না;—লোকে যখন নিশীথে নিদ্রাতুর, তিনি তখনও পাঠগৃহের ক্ষুদ্র কক্ষে গভীরভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত! সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীও কতকটা সেইরূপ। প্রতিভা, সাহস, বাহুবল এবং অধ্যবসায় ভিন্ন তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না; কিন্তু যতদিন তিনি উন্নতিশিখরে আরোহণ করেন নাই, ততদিন কেহ তাহা স্বীকার করিত না; অগত্যা সীতারামের উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, এক এক জন এক একরূপ জনশ্রুতির রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জনশ্রুতি হইলেই যে তাহা একবারে অলীক হইবে, এমন কোনও কথা নাই; কিন্তু তথাপি কৌতূহলপরায়ণ জনসমাজ জনশ্রুতি প্রচার করিবার সময়ে তাহার মূলানুসন্ধানের আবশ্যকতা স্বীকার করে না। সেই জন্য জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য থাকিলেও, লোকমুখে ক্রমে তাহা এরূপ রূপান্তরিত হইয়া যায় যে, অবশেষে সে মৌলিক সত্যটুকু আর খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হয় না। সীতারামের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে!

লিখিত ইতিহাস নাই, সুতরাং জনশ্রুতিই সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীর একমাত্র উপন্যাস। সে উপন্যাস হিন্দুর রচা, কি মুসলমানের রচা, তাহারও স্থিরতা নাই। কিন্তু সে উপন্যাসে সীতারামের চরিত্রে কোনও কলঙ্ককালিমা সংযুক্ত হইবার অবসর পায় নাই। অবসর এবং অধ্যবসায় থাকিলে, এই সকল জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এখনও পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীর কথঞ্চিৎ লুপ্তোদ্ধার করিতে পারেন, কেবল সেই ভরসায় জনশ্রুতিগুলি সংগৃহীত করিয়া দিলাম।

এখন যেখানে মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সীতারামের বীরকীর্ত্তির বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট দিয়া মধুমতী নদী প্রবাহিত। সেই মধুমতীর অপর তীরে হরিহরনগরে সীতারামের পৈতৃক তালুক ছিল। বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগরেও সীতারামের কিছু জমী জমা থাকায়

ছিলেন ;—তিনি পৈতৃক তালুক পরিদর্শনের জন্য সর্ব্বদাই অশ্বারোহণে হরনগর হইতে শ্যামনগর অথবা শ্যামনগর হইতে হরিহরনগরে যাতায়াত করিতেন। লোকে বলে যে, একদিন এইরূপে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্থানে আসিয়া অশ্বক্ষুর মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িল; সীতারাম অনেক উত্তেজনা করিয়াও ঘোটককে চালনা করিতে পরিলেন না। সীতারাম তখন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং বাহুবলে অশ্বক্ষুর উত্তোলন করিলেন। অন্য লোকে হয় ত আবার অশ্বারোহণে গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেন ; কিন্তু সীতারাম সে দেশের পথ ঘাট বিলক্ষণ চিনিতেন, কোন স্থানে কখনও এমন করিয়া অশ্বক্ষুর প্রোথিত হয় নাই ;—সুতরাং তিনি সে স্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যেখানে অশ্বক্ষুর প্রোথিত হইয়াছিল, সেই স্থান খনন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভূগর্ভে এক লৌহময় ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। কৌতূহলাবিষ্ট সীতারাম লোকবল সংগ্রহ করিয়া ত্রিশূল লক্ষ্য করিয়া যতই খনন করিতে লাগিলেন, ততই ক্রমে চূড়া, তাহার পর গম্বুজ, তাহার পর স্তম্ভরাজি, অবশেষে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন একটি দেবমন্দির বাহির হইয়া পড়িল! হিন্দুর দেশের প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির, কতকালের মৃত্তিকাস্তর ধীরে ধীরে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, অবশেষে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—কৃষক নিঃসন্দেহে তাহার উপর দিয়া হল-চালন করিয়া বেড়াইত। সহসা সেই দেবমন্দির আবার লোকচক্ষুর সম্মুখীন হইল ; তখন দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল ; সকলে মিলিয়া প্রবল উৎসাহে মৃত্তিকা-রাশি আহরণ করিতে লাগিল ; সেই মৃত্তিকানিহিত দেবমন্দিরে কোন দেব-মূর্ত্তি ছিল না, কেবল একটি "লক্ষ্মীনারায়ণ" বাহির হইল। লক্ষ্মীনারায়ণ শাল-গ্রামশিলা, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দেবতা ; যে গৃহে নিত্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হয়, সে গৃহ কখনও লক্ষ্মীহীন হয় না। সীতারাম পরম হিন্দু, তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন ; লাকে এই অযাচিত দেবানুকম্পা লাভ করিতে দেখিয়া সীতারামের পক্ষ-ক্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে সীতারামের প্রতিভায় দেবানুকম্পাবলে লোকবল যুক্ত হইল। ইহাই তাঁহার উন্নতির মূল।

গলেন ; অবশেষে তাঁহাদের সহায়তায় সীতারাম হিন্দুরাজ্য সংস্থাপ-
াজন করিলেন। যশোহরের ইতিহাস-লেখক এই জনশ্রুতিকে
নশ্রুতি" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট বাদানুবাদ করিয়া
নি বলেন যে, ভূগর্ভ-নিহিত দেবমন্দিরের কাহিনী সত্য হইতে
াণ, এখন যেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে, তাহার চূড়া
ই, এবং তাহা সমতল-ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, আদৌ ভূগর্ভ-
, অথচ লোকে তাহাকেই আদি-মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া
হ সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান মন্দির যে অপেক্ষা-
ধুনিক, গঠনপ্রণালী দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। লক্ষ্মীনারা-
প্রতি লোকের ভক্তি কিছু অচলা, তাই তাহারা আধুনিক মন্দিরকেও
মন্দির বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। পাণ্ডারা সকল স্থানেই এরূপ
রা থাকে। কেবল ইহা হইতেই কোনও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।

সীতারাম সম্বন্ধে দ্বিতীয় জনশ্রুতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। সেকালে
ণবঙ্গে "বার ভূঁইয়া" নামে দ্বাদশ জন করসংগ্রাহক ছিলেন ; তাঁহারা
ক্রমে স্বাধীন হইয়া বাদশাহের ন্যায্যগণ্ডা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন।
াহাদিগকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে পাঠাইয়া
দেন ;—সীতারাম তাঁহাদিগকে দমন করিলেন বটে, কিন্তু নিজে স্বাধীন
হইয়া উঠিলেন। নবাব রাজকর চাহিলে বাদশাহের দোহাই দিয়া তাঁহাকে
নিরস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাদশাহকেও এক কপর্দ্দক রাজকর দিলেন না।

পূর্ব্বকাহিনী যাহাই হউক, যখন হইতে লোকে সীতারামের কথা শুনিতে
পাইল, তখন হইতে তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে আর কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত
হয় নাই। সীতারাম যে দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য গঠন করিবার প্রয়াস
পাইয়াছিলেন, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে রাজ্য নাই, সে
রাজধানীও ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষের
মধ্যে সীতারামের যে সকল গৌরবচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই তাঁহা
একমাত্র পরিচয়স্থল ; সে পরিচয়ে সীতারাম বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়
রাখিয়াছেন ;—বিদেশের ইতিহাসলেখকগণ বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়
সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু সীতারামে
বীরকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন
মহম্মদপুরে সীতারামের বীরকীর্ত্তির যে সকল ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তম

আছে, তাহা বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের চিহ্ন। কেন না, বাঙ্গাল
মূল। মহম্মদপুরে রাজদুর্গ ছিল, দুর্গপ্রাচীরের উপর সারি সারি
পাতা ছিল, সিংহদ্বারে বীরবিক্রমে সেনাপতি ও সেনানায়কগণ ত
সমবেত হইত,—তাহার মধ্যে সকলই বাঙ্গালীর কথা। বাঙ্গা
করিয়াছিল, বাঙ্গালী কামান গোলা বারুদ প্রস্তুত করিয়াছিল
বিক্রমে স্বহস্তগঠিত দুর্গপ্রাচীরের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া স্বহস্ত
মুখে অগ্নি সংযোগ করিয়া মোগলের গতিরোধ করিয়াছিল!
অনেক পুণ্যস্থান আছে, কিন্তু যেখানে দাঁড়াইলে বাঙ্গালীর ললাটক
হইয়া যায়, মহম্মদপুর ভিন্ন এমন পুণ্যতীর্থ আর নাই;—পুণ্যতোয়া
তীরে সীতারামের রাজদুর্গ যেদিন বাঙ্গালী পরিব্রাজকের নিকট অ
সুপরিচিত হইবে, সে দিন সীতারামের স্মৃতি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে

সপ্তম অধ্যায়।

মহম্মদপুরে যে সকল প্রাচীন-কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে সীতারা
রাজদুর্গই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই দুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা; বহু বৎস
অযত্নে অনাদরে তাহার পূর্ব্বশোভা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে কালে ভার
বর্ষের সকল প্রদেশেই রাজদুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল, স্থানে স্থানে এখনও
সেই সকল প্রাচীন দুর্গের সীমাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল দুর্গের
গঠনকৌশল এবং আধুনিক ইংরাজদুর্গের গঠনকৌশল একরূপ নহে। আজ
কাল সামরিক-বিদ্যার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্য
লইয়া মানুষে মানুষ খুন করিবার যত সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গর্ব্ব করি-
বার অধিকার পাইয়াছে, সেকালে মানবজ্ঞানের ততটা শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।
কৌশল অপেক্ষা বাহুবলেরই প্রাধান্য অধিক ছিল; সুতরাং সেকালের লোকে
কেবলমাত্র মৃত্তিকা সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর রচনা করিত। এই মৃন্ময়-দুর্গের বিশেষ
কোন গঠনকৌশল ছিল না; কারণ, সেকালের বীরসিংহেরা কৌশল অপেক্ষা
বাহুবলেরই অধিক সমাদর করিতেন। তাঁহারা বাহুবলে অসীম সাহসে মৃন্ময়
দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে জানিতেন। ভরতপুরের দুর্গ ইংরাজের ইতিহাসে চির-
স্মরণীয় হইয়াছে; ইংরাজসিংহ কত ক্লেশে বারংবার বিপর্য্যস্ত হইয়া ভরত-
পুরের দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। সেই
ভরতপুরের দুর্গও মৃন্ময় দুর্গ!

ফাল্গুন,

হইবে

নের

"বিকৃত

গিয়াছেন। তি

পারে না;

নাই, ত্রিশূল

নিহিত নয়ে

এ
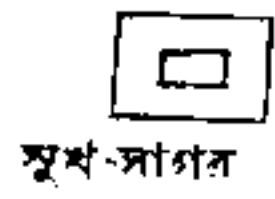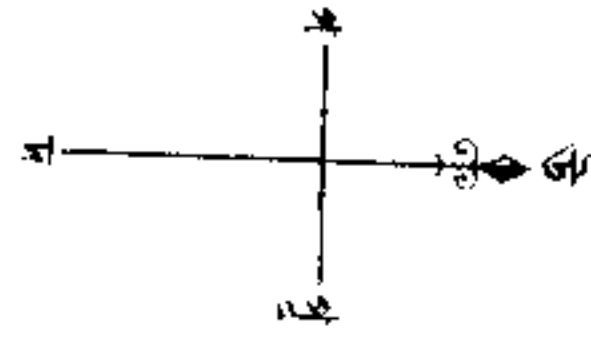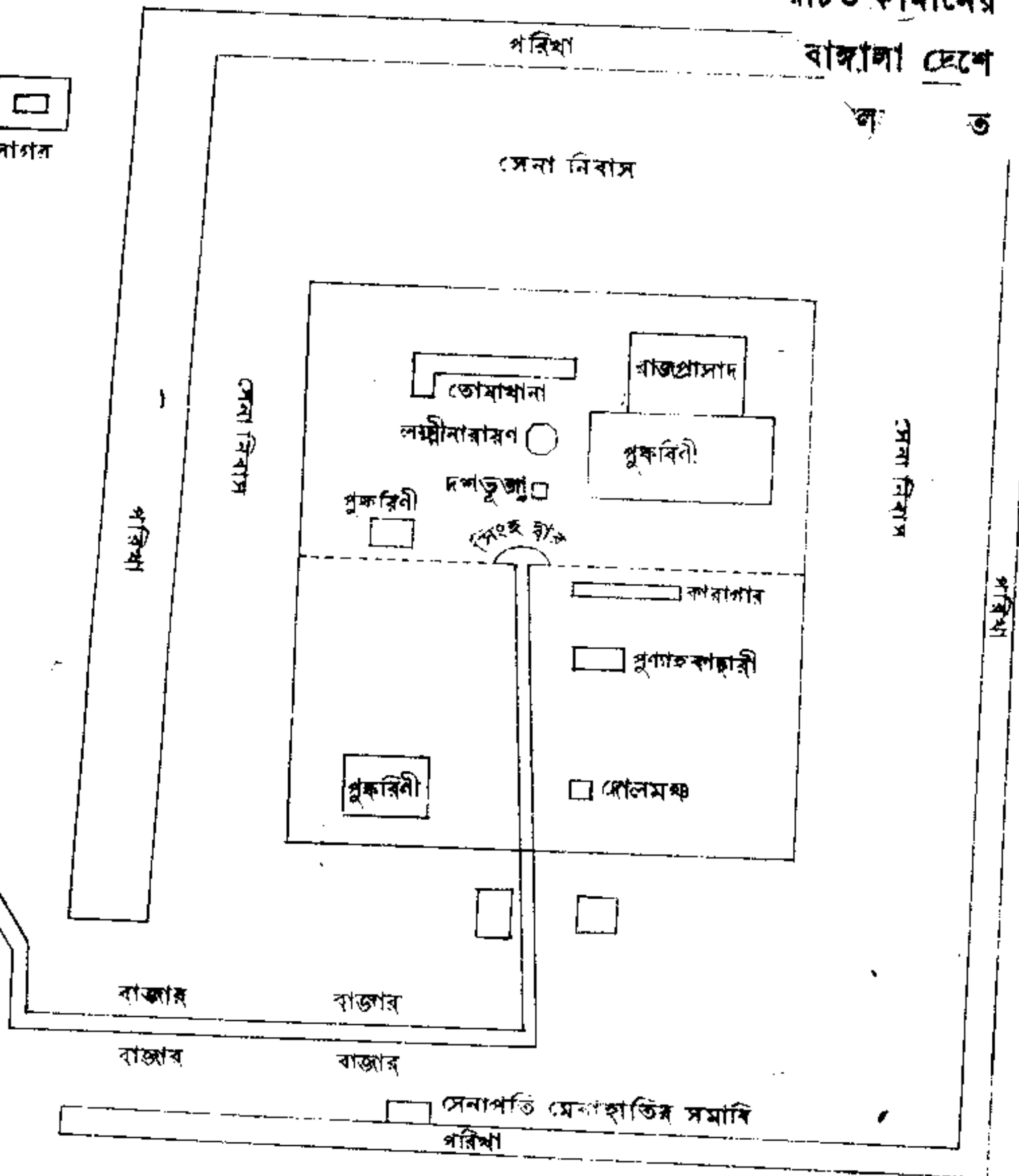
ন্ময় দুর্গ রচনা করেন, তাহা চতুষ্কোণ; চারি দিক প্রদক্ষিণ
হইতে পারে। ইহার চারি দিকে দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে গড়-
.রিখার চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। উত্তর এবং
রিখা কালক্রমে জলশূন্য শুষ্কভূমিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু
এখনও অনেক জল, এবং দক্ষিণ দিকের পরিখা বহুবিস্তৃত, এখনও
দেখিতে ঠিক নদীর মত! এই সকল পরিখা খনন করিবার সময়ে যে স্তূপা-
কার মৃত্তিকা উত্তোলিত হয়, তাহা লইয়াই সীতারাম দুর্গপ্রাচীর রচনা করেন।
এই দুর্গ বাগ্‌জানি মৌজায়। শত্রু আসিয়া অবরোধ করিলে পাছে জলকষ্ট
উপস্থিত হয়, সেই জন্য দুর্গমধ্যে অনেকগুলি সরোবর খনিত হইয়াছিল,
তাহার দুই একটির জল এখনও স্বচ্ছ ও নির্ম্মল রহিয়াছে। দুর্গের তোরণদ্বার
কোথায় ছিল, তাহা এখন আর ভাল করিয়া নির্ণয় করা যায় না; যশোহরের
ইতিহাসলেখক ওয়েষ্টল্যাণ্ড অনুমান করেন যে, দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণেই সম্ভবতঃ
দুর্গদ্বার ছিল। এরূপ অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরাজ দপ্তরে
সীতারামের দুর্গের একখানি প্রাচীন মানচিত্রে ঐরূপ লিখিত আছে। সেই
মানচিত্র দেখিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে লিথোগ্রাফ করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে
আমরাও একখানি চিত্রপট প্রদান করিলাম; ইহা সীতারামের দুর্গের ভগ্না-
বশেষের চিত্রপট মাত্র!

সীতারামের রাজবাটী এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এক জন
ইংরাজ পরিব্রাজক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার গঠন-
কৌশল কিরূপ ছিল, তাহা এখন আর নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সীতা-
রামের রাজধানীতে অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু একা-
লের তুলনা লইয়া বিচার করিতে গেলে তাহার কোনটিই গঠনগৌরবে
উল্লেখযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে না। তখন গঠনসৌষ্ঠব বা বাহ্যাড়ম্বর
ছিল না; মুসলমানপ্লাবিত বঙ্গদেশে তাড়াতাড়ি রাজদুর্গ ও রাজধানী সংস্থা-
পন করিবার জন্য সীতারাম গঠনসৌষ্ঠবের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি-
বার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; কেবল মোগলের আক্রমণ
অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রাণপণে দুর্গপরিখা ও দুর্গপ্রাচীর রচনা করিয়া, তাহার
অভ্যন্তরে কোনরূপে রাজধানী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র।

স্থানে সীতারাম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; পুরা
উদ্দেশ্যে নগরের নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। বাস্তবিক
এখন যেখানে মহম্মদপুর, সেকালে সে স্থান আদৌ লোক
ছিল না। মহম্মদ খাঁ নামক একজন মুসলমান সাধুপুরুষ সে
নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজন করিতেন। সীতারাম যখন রাজ
করিতে অগ্রসর হইলেন, মুসলমান সাধু তখন কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিতে
সম্মত হইলেন না। অবশেষে সীতারাম সাধুপীড়ন করিতে অসম্মত হইয়া
সাধুর নামানুসারেই নবসংস্থাপিত রাজধানীর নামকরণ করিতে সম্মত হই-
লেন;—সাধু স্থানত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই হইতে তাঁহার নামানুসারে
সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর নামে লোকসমাজে পরিচিত হইল। ইহা
যশোহর প্রদেশের জনশ্রুতি; কিন্তু এই জনশ্রুতির সঙ্গে সীতারামের ইতি-
হাসের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে বলিয়াই এ স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম।

কয়েকটি কারণে মহম্মদপুর নূতন রাজধানীর উপযোগী হইয়াছিল। সীতা-
রামের বাল্যজীবনের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়া ঐ প্রদেশ সীতারামের সুপরিচিত
ছিল, নদীবহুল স্থান বলিয়া সহসা বহিঃশত্রুর পক্ষে ঐ প্রদেশ আক্রমণ করি-
বার সুবিধা ছিল না; মুসলমানপ্লাবিত বঙ্গদেশে নূতন করিয়া হিন্দুরাজধানী
গঠন করিতে হইলে যেরূপ স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, মহম্মদপুর সর্ব্বাং-
শেই তদুপযোগী ছিল বলিয়া, সীতারাম সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করিয়া-
ছিলেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

উপন্যাসের উপকারিতা।

বিগত জানুয়ারী-সংখ্যক "নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে "উপন্যাসের উপকারিতা" ইতিশীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধ লইয়া একটু আলোচনা করিতে চাই। পাঠক মহাশয় প্রথমতঃ সেঞ্চুরীর লেখিকা ম্যাক্সওয়েল গ্রে আখ্যাধারিণী কুমারী এম্., জি. তুত্তিয়ে মহোদয়ার আক্ষেপোক্তি শুনুন।—

"আজকাল নবেল ও নবেল-পাঠকের যত ...

'নবেলের' জন্ম পাগল। নবেলও কাহনের দরে জন্মাইতেছে। নবেলের এই আত্যন্তিক বংশবৃদ্ধি কত দিনে হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা বলা যায় না। তবে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, বংশবৃদ্ধির সহিত নবেলের আভ্যন্তরিক গৌরবের বৃদ্ধি হইতেছে না। এই নবেলের যুগে প্রকৃত সাহিত্যের বড় দুঃসময় উপস্থিত। পুস্তকের ভাষা ও ভাবের প্রতি লোকের আর তাদৃশ মনোযোগ নাই। কবিতার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। মাসিকপত্রে কবিতার প্রকাশ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। ইহা সাহিত্যের পক্ষে বড় সুলক্ষণ নহে। সমালোচনার অবস্থা তথৈবচ। কাল যদি সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন দ্বিতীয় মিণ্টনের আবির্ভাব হয়, তাঁহার সমালোচক হইবার যোগ্য ছয় জন লোকও মিলিবে না। সাহস করিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হয়, এমন তিন জন লোকও পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ।

নবেলে জোয়ার।

কবিতায় ভাটা।

"এ দিকে কিন্তু প্রতি বৎসরই এক জন করিয়া নূতন মিণ্টন আবিষ্কৃত হইতেছেন, এবং অবিলম্বে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছেন। সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা সাহিত্যের অবনতির ফল। ইহাতে উপন্যাসেরও গৌরব কমিয়া আসিতেছে। সাহিত্য-সমাজে ভাল লেখক এত নাই যে, ঐ [illegible] ল পত্র পত্রিকার খোরাক যোগাইতে পারেন। যে কাগজ সাধারণ লোকের মনে[illegible] যত দূর সমর্থ, তাহারই তত দূর কাটতি। সাধারণ লোকে সাময়িক পত্র চায়, কি[illegible] মন্দ বুঝিতে পারে না। নীচ অনুসন্ধিৎসা, ব্যক্তিগত কুৎসাপাঠের পিপাসা, অ[illegible]গু হেয় বিষয়ের জন্ম আগ্রহ, এই সকলে মিলিয়া সাময়িকপত্র-পত্রিকা হইতে স[illegible] শিল্পকে ক্রমশঃ দূর করিয়া দিতেছে। যে সকল কাগজ কেবল শিল্প ও সাহিত্য [illegible]বতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও আর সে দিন নাই। কদর্য্য, রহস্যময় চিত্র ও [illegible]জুক সকলকেই গ্রাস করিয়াছে।

সুলেখকের দুর্ভিক্ষ।

[illegible]পাখ্যান-প্রীতি মানুষের অতি স্বাভাবিক ও প্রাচীনতম প্রবৃত্তি। ভাল উপাখ্যান[illegible] মানুষের উচ্চতর, মহত্তর প্রবৃত্তি সকল পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হয়। মানুষ আধ্যাত্মিক প্রাণী; দেহই তাহার সর্ব্বস্ব নহে। কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি লইয়া থাকিলে তাহার চলে না। আধ্যাত্মিক আনন্দেরও প্রয়োজন। এ জগতে মানুষের জীবন কয় দিন? কিন্তু কাল অনন্ত। মানুষ অনন্ত পথের পথিক, অনন্তের ভিখারী। চক্ষুর বিষয়ীভূত এই বসুন্ধরাকে লইয়া সে শান্তিলাভ করিতে পারে না। অতীত ও বর্ত্তমানব্যাপী এই প্রত্যক্ষ মানবজাতি সংখ্যাতীত হইলেও তাহার চক্ষে সামান্য। সে প্রতিভাবশে নূতন নূতন মানবের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কল্পিত সুখদুঃখে অভিভূত হইতে চাহে। তাহার কল্পনাচক্ষে অরণ্যমধ্যে অপ্সরী, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরী, বনদেবী প্রভৃতি অপূর্ব্ব সুন্দরী সকল কেমন নৃত্য করিয়া বেড়ায়। তাহার মানস-কর্ণে বরুণালয়বাসিনী বিচিত্র গায়িকাগণের হৃদয়োন্মাদী সঙ্গীত কি সুন্দর ঝঙ্কার করিয়া উঠে। বিধাতার সৃষ্ট, অসংখ্যজীবরাশিপরিমণ্ডিত এই জগৎ অতি সুন্দর ও বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের কল্পিত, কবির প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত এই যে অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য, ইহাও কি তাহারই মত সুন্দর ও বিস্ময়কর নহে?

[illegible]াখ্যান-প্রীতি
[illegible]াভাবিক বটে।

"কল্পনা আগে, তা'র পর প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস যখন দেখা দেয় নাই, তখন কল্পনামূলক পুরাণেরই একাধিপত্য ছিল। ইতিহাস মহাকাব্যেরই অনুবৃত্তি। ইলিয়াদ ও অদিসি পাঠ করিয়া আমরা প্রাচীন গ্রীসের যে প্রাণ ও হৃদয়ের সহিত পরিচিত হই, আথেন্স বা স্পার্টার ইতিহাস পড়িয়া কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাই না। উপাখ্যানই সত্য, প্রত্যক্ষ তাহার ছায়া। জোলার দল এ কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন, যাহা বাস্তব, তাহাই সত্য; উপা-

আগে কল্পনা, পরে প্রত্যক্ষ।

থ্যান ছায়ামাত্র। আবার সেই বাস্তব যদি অতি কলুষিত ও জঘন্য না হয়, তবে তাহা তত সত্য নহে। জোলার আমাদের কাজ নাই। কিট্‌সের ন্যায় আমরাও বলি, 'যাহা সুন্দর, তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই সুন্দর'। বাস্তবের আধিক্য মানবাত্মার প্রকৃত অনিষ্টকর।

"কবিত্বের সুনীল আকাশপটে যে অপরূপ ইন্দ্রধনু শোভিত ছিল, দার্শনিকেরা তাহাকে এখন কেবল সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলনমাত্রে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের বক্ররশ্মির ক্রিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকুন। আমরা চিরদিন উহাকে ইন্দ্রধনুরূপেই উপভোগ করিব। বাস্তবিক, আমাদের সেই আনন্দের উৎস বাস্তবের অনেক উচ্চে অবস্থিত।

উপন্যাসের আরম্ভ।

"জগতের কবি ও ঔপন্যাসিকগণ অনেক দিন ধরিয়া প্রধানতঃ বড় বড় ঘটনা, বড় বড় সুখ দুঃখ, রাজারাজড়ার মৃত্যু, জাতীয় উত্থান-পতন, ইত্যাদি বিষয় লইয়াই উপাখ্যান রচনা করিতেছিলেন। সাধারণ লোকের সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বড় বেশী দিনের নহে। ইংরাজী সাহিত্যে চসার হইতে উহার আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু চসারের প্রধান প্রধান নায়কগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সেক্ষপীয়র সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। ফিউডাল যুগের অবসানে ডিমোক্রাসীর আরম্ভ হইতেই প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক লোকদিগের জীবনচরিত লইয়া গদ্য উপাখ্যানরচনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। রবিন্সন ক্রুসো ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত। তার পর ফিল্ডিং, রিচার্ডসন প্রভৃতি লেখকের,

জীবনের উপন্যাস।

ডিকেন্স প্রভৃতির হস্তে ইহা ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছে ...রম বিল" বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্র... কর... দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। কিংস্লি ও জর্জ ইলিয়ট এই যুগের কবি। ইংরাজ-স... লাগিলেন যে, বড়মানুষ হইলেই বড়লোক হয় না। সমাজতরুর নিম্নতম প্রদেশে... করিয়াও কেহ কেহ উহার সমুচ্চশাখাবিহারী বড়মানুষের বংশধরকে হৃদয়মহত্ত্বে... দিতে পারেন। টেনিসন তাঁহার 'এনক আর্ডেন' নামক কাব্যে ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ... প্রদান করিয়াছেন।

"আধুনিক লোকের এই উগ্র নভেল পাঠলালসা নিরবচ্ছিন্ন দোষের আকর নহে। কালকার নভেলে মানুষের হৃদয়বৃত্তির আদর্শ-অনুশীলন না হউক, উহা সহস্র সহস্র ইংর... একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ সংবাদপত্রের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকদিগ... কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্মবক্তার সহিত পরিচিত করা, বড় সহজ ব্যাপা... নহে। কিন্তু নবেল তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। উহা হইতে তাহারা অনায়াসেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

"যাঁহারা কবি, মৌলিক চিন্তাশীলতার আধার, তাঁহারাই দেশে জ্ঞান বা নীতির নিয়ন্তা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের পাঠকসমাজ অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা বিশাল সাধারণ লোকশ্রেণীর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। ঔপন্যাসিকের সে অন্তরায় নাই। লোকসাধারণের চরিত্রগঠনে তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

উপন্যাস কিরূপ হওয়া আবশ্যক।

"ঔপন্যাসিক যেন সাক্ষাৎভাবে কোনও নীতিজ্ঞানপ্রচারের চেষ্টা না করেন। তাহা হইলে লোকের মনে আর সে আনন্দটুকু দিতে পারিবেন না। লোকের মন শিল্পনৈপুণ্যের ইন্দ্রজালেই বদ্ধ থাকে। তাহার ভিতর বক্তৃতা প্রবেশ করিলেই সব মাটী হইয়া যায়। তবে এমন কথা বলি না যে, জগতে যা-কিছু আছে, ঔপন্যাসিক সকলই চিত্রিত করিতে পারিবেন। কেবল বাস্তব লইয়া থাকিলে চলিবে না। বাস্তব, উপন্যাস-শিল্পের বিরোধী। *Because selection is the first principle of art.* কাব্যোপযোগী বিষয়নির্ব্বাচনই শিল্প-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান নীতি। লেখক যদি লিপিকুশল হন, তাহা হইলে দস্যু, ডাকাত, হত্যাকারী, খুনী প্রভৃতির চরিত্র চিত্রিত করিয়াও, উহাকে ঋষি-তপস্বীর জীবনের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ করিতে পারেন।

"নূতন ব্রতী ঔপন্যাসিককে এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। চিন্তা কর, পর্য্যবেক্ষণ কর, শিক্ষা কর, লিখনপদ্ধতির চর্চ্চা কর, ইত্যাদি সব কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু একটা অতি প্রধান কথা কেহই বলেন নাই। তাহা এই,—আপনার মন ও কল্পনা-

ঔপন্যাসিক সাধনা।

শক্তিকে মার্জ্জিত, পবিত্র কর; সাধুজীবন যাপন কর। কারণ, অকলঙ্ক পবিত্র হৃদয়, উচ্চ উদ্দেশ্য, মহান আদর্শ, এবং শুভ্রচিন্তা,—এ সকলে ঔপন্যাসিকের যেরূপ প্রয়োজন, সেরূপ আর কাহার? তাঁহার চিন্তা ও উদ্দেশ্য লক্ষ লক্ষ লোকের মনে সঞ্চারিত হইবে। তাঁহার হৃদয়ের ভাবগুলি জগতের শিরায় শিরায় অতি নির্জ্জনে, নীরবে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। কেবল মস্তিষ্ক লইয়া শিল্পীর কাজ নহে। বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত চরিত্রমহত্ত্ব সংযোজিত না হইলে, উহা প্রতিভা-নামের অধিকারী হয় না।"

এখন উপরি-অনুবাদিত কথাগুলিকে ভিত্তি করিয়া, আমাদের এই বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে, পাঠক বোধ হয় বিরক্ত হইবেন না। সেঞ্চুরীর

এ দেশে।

লেখিকা মহোদয়া আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের যে দুর্দ্দশার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গ-সমাজের সঙ্কীর্ণ সাহিত্যও কতকটা সেই পীড়ায় পীড়িত। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ছাড়িয়া দিলে, এক নবেল ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গালাদেশে আজকাল বড় বিকায় না। বাঙ্গালীর গল্পপাঠ-পিপাসা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বটতলার বটুর দল পর্য্যন্ত কেহই তাহার প্রচুর খাদ্য যোগাইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে রেণল্ড প্রভৃতি বিদেশী লেখকের নিকট ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছে। এজন্য আমরা তাদৃশ দুঃখিত নহি। কারণ, কিছু না পড়ার অপেক্ষা নবেল পড়াও ভাল। কেবল মাথাটা বিচলিত হইয়া না উঠিলেই মঙ্গল। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার গ্রন্থগুলি উচ্চ আদর্শ ও

সাধারণের রুচি।

সুশিক্ষার আধার। কিন্তু সে ভাবে পড়িতে পারে কয় জন? অনেকেই কেবল কোথায় রোহিণী ঠাকুরাণী দ্বিতলগৃহের বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া নিশাকর দাসের প্রতি সাভিলাষ নয়ন-ভঙ্গী করিতেছে, তাহারই সন্ধান করেন। এ দিকে কাহার পাপে, হরিদ্রাগ্রামের গৃহনিকুঞ্জে, 'ভোমরার' সাভিমান প্রণয়-গুঞ্জন ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার খবর বড় কাহাকেও রাখিতে দেখি না। প্রকৃত কথা, বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকসমাজ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বঙ্কিমই হউন, আর হেম, নবীন বা রবীন্দ্রনাথই হউন, সকলকেই 'fit audience and few' লইয়া কাল কাটাইতে হইতেছে। ইহাই আমাদের আক্ষেপের কারণ।

সেঞ্চুরীর লেখিকাকে আমরা তবু একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে পারি। তিনি যে ইংরাজ-সমাজের অতিরিক্ত নবেলানুরক্তি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সেই ইংরাজই এক গিনির

বিলাতের সান্ত্বনা।

হিসাবে মৃত রাজকবির কবিতার প্রত্যেক পংক্তি ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কি আছে? বাঙ্গালায় এখন যাঁহারা বই পড়েন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল ইংরাজীর ধার বড় ধারেন না। তাঁহারা এখনও তাঁহাদের সেই দাশুরায় আর ঈশ্বর গুপ্ত লইয়াই পড়িয়া আছেন। দ্বিতীয় দল, ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পত্রধারী বিদ্যাবত্তার অবতার। ইহাঁদের অবস্থা কিরূপ? এক শ্রেণী মাতৃভাষার নাম শুনিলেই নাসিকা সঙ্কুচিত

আমাদের সান্ত্বনা নাই।

করেন। এ শ্রেণীর তবু মার্জ্জনা আছে। কারণ, ভ্রান্তই হউক, আর অভ্রান্তই হউক, ইহাঁদের ধারণা,—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাঁদের পড়িবার উপযোগী গ্রন্থ এখনও লিখিত হয় নাই। আর এক শ্রেণীর সংজ্ঞা আমরা কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় নির্দ্দিষ্ট করিব;—

"One all eyes,
Philosopher ! a fingering slave,
One that would peep and botanize
Upon his mother's grave !"

অথবা,—

"He has neither eyes, nor ears ;
Himself his world, and his own God ;
A reasoning, self-sufficing thing,
An intellectual All-in-all !"

হায় ! যে ভক্তি, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি হৃদ্‌বৃত্তিনিচয়ের জন্যই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠপদবাচ্য হইয়াছে, এই কি তাহার অনুশীলন ? আর ইংরাজ রাজপুরুষ ! তোমরা যে এতদিন ধরিয়া কেবল Mass Education, Mass Education বলিয়া চীৎকার করিতেছ, এই বাঙ্গালাদেশবাসী অগণিত massএর কোন্ বৃত্তিটা সম্যক্ পরিমার্জ্জিত করিয়াছ, আমাদিগকে আজ বলিয়া দিতে পার ?

সমালোচনা।

পত্র-রচনা।

য়ুরোপে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির পত্র গ্রন্থাকারে গ্রথিত ও প্রকাশিত হয়। আমাদিগের দেশে জীবনচরিতে পত্র সন্নিবেশিত করিবার প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইতেছে। লোকের সুচিন্তিত রচনায় ও কার্য্যে কেবল আধখানা মানুষ জানা যায় ; কিন্তু বন্ধুবান্ধবের নিকট লিখিত পত্রে পুরা মানুষ সুপ্রকাশ করে। ম্যাথু আর্ণল্ডের পত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া, বিখ্যাত লেখক জন মর্লি নাইনটিন্থ সেনচুরী পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রথম নিয়ম।

উত্তম পত্ররচনার প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, বক্তৃতা যেমন কেবল শ্রোতাদিগের জন্য, পত্র সেইরূপ বন্ধুর জন্য ; সাধারণের জন্য নহে। বক্তৃতার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে কোনও বিশেষ ভাবের উদ্দীপন। বক্তৃতায় সৌন্দর্য্য থাকে না ; কারণ, তাহাতে বক্তৃতার জীবন যে কণ্ঠস্বর, তাহার অভাব ; পত্রের উদ্দেশ্য বন্ধুর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করা ;—সাধারণে উহা পাঠ করিবে, এ আশঙ্কা থাকিলে, উহাতে পত্রোচিত সরলতা ও আন্তরিকতার অভাব হয়। উত্তম পত্ররচনার প্রধান আবশ্যক বিষয় এই যে, তন্মধ্যে সাধারণের দৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নাই। পত্ররচনায় লেখক স্বাধীন, অমায়িক, সরল হইবেন, কিন্তু তাঁহার অহংত্ব বড় আবশ্যক। উত্তম পত্র এবং সদালাপ, উভয়ই অতর্কিতভাবে মনোভাবের প্রকাশক হইবে। যাঁহাদিগের মধ্যে পত্র চলিতেছে, তাঁহারা যে সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন বা করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধীয় সাধারণ কথাবার্ত্তা পত্রে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে সাধারণকে টানিয়া আনিলে ইন্দ্রজাল নষ্ট হইবে।

বিখ্যাত বিচারকবৃন্দের মতে, পত্রলেখকদিগের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে কাউপারের স্থান সর্ব্বোচ্চ। ইংরাজী সাহিত্যে এতদ্বিষয়ক পুস্তকাবলীর মধ্যে কাউপারের পত্রাবলিই

কাউপার।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্রে লেখকের মনোভাব পরিস্ফুট। মনোভাবের পর মনোভাব যেমন আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সরলতা, পবিত্রতা, আনন্দ ও নৈরাশ্য, সকলই প্রকাশিত হইয়াছে ; তদ্ব্যতিরিক্ত

তাঁহার সামান্য সামান্য ঘটনাও সুন্দরভাবে বর্ণিত। একবার একজন কাউপারকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যাঁহাদিগকে পত্র লিখিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহার পত্রে চমৎকার ভাব পাইতেন। ইহাতে কিছু দিন কাউপার পত্র লেখা বন্ধ করেন। তাহার পর এই নীরবতার কৈফিয়তে কাউপার লিখিয়াছিলেন যে, ঐ গর্ব্বে তাঁহাকে মাটী করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; তিনি পোপের মত বিরক্তিকর পত্রলেখক হইয়া যাইতেন; প্রত্যেক 'বাক্য' সুলিখিত ও প্রত্যেক অংশ বিশেষভাবে লিখিত না হইলে পোপের মতে কিছুই হইল না। সেই জন্ত কাউপারের মতে, পোপের পত্ররচনাপ্রণালী বড়ই বিরক্তিকর। কাজেই যত দিন এই প্রশংসার প্রভাব মন হইতে দূর না হইয়াছিল, তত দিন তিনি পত্র লেখেন নাই; তাহার পর তিনি আবার পূর্ব্বের মত মনের প্রধান চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন। বাস্তবিক, কাউপারের পত্রে তদীয় সরলতা ও আন্তরিকতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

স্কট, ল্যাম্ব ও বায়রণ।

সাহসী, আন্তরিকতাপূর্ণ, প্রতিভাবান স্কটের পত্রগুলিও তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় অকৃত্রিম, বন্ধুত্বভাবে পূর্ণ, আনন্দালোকসমুজ্জ্বল এবং কারুণ্যময়। স্কট বলিতেন যে, তিনি যাহা লিখিতেন, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবিতেন না। ইহাই প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট পত্রলেখকের উপযুক্ত কথা। পত্রলেখকদিগের মধ্যে চার্লস ল্যাম্বের স্থান অতি উচ্চ; তাঁহার পত্রে খেয়াল ও আনন্দ, কারুণ্য ভাব ও কোমল পরিহাস, এবং পরিহাসের মধ্যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আশ্চর্য্যভাবে একত্র মিশ্রিত। এ সম্বন্ধে বায়রণের স্থান কাউপারের নিম্নেই; কেহ কেহ বায়রণকেই উচ্চতর স্থান দিতে চাহেন। বায়রণের পত্রে অনায়াসভাব, হাস্যরস, উজ্জ্বলতা, নির্ভীকতা, একত্র মিলিত। কাজেই অলস সময় কাটাইবার পক্ষে বায়রণের পত্রের মত আর কিছুই কোন ভাষাতে পাওয়া যায় না।

মিল, কার্লাইল প্রভৃতি।

মিল সকল পত্রলেখককেই উত্তর লিখিতেন। কিন্তু লোকে সেই শান্তপ্রকৃতি জ্ঞানী পুরুষকে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে দিত; সেই জন্য তাঁহার পত্র গুরুতর বিষয়ের বিচার ও বিবেচনায় পরিপূর্ণ। এমার্সন কার্লাইলকে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সে সকল পত্রে বিশেষত্ব বা বর্ণোজ্জ্বলতার অভাব। কার্লাইলের পত্রে তাহার অভাব নাই। তাঁহার পত্রে তদীয় আনন্দপ্রবণতা, বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃভাব পরিস্ফুট। ডিকেন্সের পত্রে সূক্ষ্মদর্শন, সুন্দর বর্ণনা, ও আনন্দ দেখা যায়। মেকলের সকল পত্র এমন সাহিত্য-প্রিয়তা এবং মানবজীবনসঙ্গী সাহিত্যের মহিমায় পূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিলেই তৎক্ষণাৎ লেখনী লইয়া সেইরূপ কিছু লিখিয়া ফেলিতে পাঠকের ইচ্ছা হয়।

যে সরলতা ও অনায়াসভাব উত্তম পত্রের প্রধান লক্ষণ, তাহা প্রধানতঃ কাউপার ও বায়রণের পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাথু আর্ণল্ড।

ইহার পর প্রবন্ধলেখক ম্যাথু আর্ণল্ড সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ম্যাথু আর্ণল্ডের নবপ্রকাশিত দুই খণ্ড পত্রসংগ্রহে, তাঁহাকে পত্রলেখকদিগের মধ্যে কিরূপ স্থান দান করিবে, তাহা এখন স্থির করা অসম্ভব। যাঁহারা তাঁহার পত্রে নূতন উপদেশ, নূতন ভাব ও গভীর সামাজিক পর্য্যবেক্ষণে পরিপূর্ণ কোনও রচনা পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ হতাশ হইয়াছেন। আর যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুতে এক জন প্রকৃত স্নেহশীল বন্ধু হারাইয়াছেন, তাঁহাদিগের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই।

করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া, আর্ণল্ডের আত্মীয় স্বজনবর্গের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ন্যাশনাল রিভিউ পত্রে ম্যাথু আর্ণল্ডের পত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া নবনির্ব্বাচিত রাজকবি মিষ্টার আলফ্রেড অষ্টীন, তাঁহার কবিভ্রাতার কবিতার সম্বন্ধেও কিছু বলিয়াছেন। তাঁহার কথার সারোদ্ধার করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

অষ্টীনের মত।

অষ্টীন বলেন যে, ম্যাথু আর্ণল্ডের কবিতায় ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা নৈতিক ভাবই অধিক প্রবল। আবার যখন তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি অধিকবয়স্ক নহেন। কাজেই নিজের ব্যবহৃত যন্ত্রের উপর তাঁহার তেমন ক্ষমতা ছিল না; এবং সেই জন্যই তিনি সেই উচ্চ স্বর তেমন করিয়া আলাপ করিতে পারেন নাই।

নানাবিধ।

হল্ কেন্।

বর্ত্তমান সময়ের বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে হল্ কেন্ এক জন। হল্ কেনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাহারও গতানুগত্য না করিয়া আপনি এক পথ প্রস্তুত করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে যেরূপ প্রভূত নাটকীয় সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, অন্যান্য উপন্যাসে সেরূপ দেখা যায় না। Manxman নামক পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার ভাগ্যে যেরূপ প্রভূত যশোলাভ ঘটিয়াছে, সচরাচর লেখকের ভাগ্যে সেরূপ হয় না। আমরা উইন্‌ডসর ম্যাগাজিন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রথমে লেখকের ইচ্ছা ছিল যে, পুস্তকখানি জু-সংক্রান্ত উপন্যাস হইবে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া ভ্রমণকালে লেখক এই সংকল্প করেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার বোধ হয় যে, রুসিয়ান উপন্যাসলেখকদিগকে তাঁহাদিগের আপনার গণ্ডীর মধ্যে পরাভূত করা সহজ হইবে না। ইতিমধ্যে ঘটনার পরিবর্ত্তনে তিনি মালদ্বীপে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে জু-সংক্রান্ত উপন্যাস ম্যাক্স্ উপন্যাসে পরিণত হয়।

ম্যাক্স্‌ম্যান।

প্রবন্ধলেখক মিষ্টার শেরার্ড বলেন যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন;—তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। লেখক রেনানের খৃষ্টের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন—এই পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হয়েন। তখনই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রেনান অবিশ্বাসের দিক হইতে যেমন জীবনচরিত লিখিয়াছেন, বিশ্বাসের দিক হইতেও তেমনই উজ্জ্বল, ব্যক্তিগত জীবনচরিত রচিত হইতে পারে। তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন; কিন্তু ঐ পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। কাজেই গত বৎসর কোন প্রকাশক উহার পাণ্ডুলিপির জন্য তাঁহাকে তিন সহস্র পাউণ্ড (পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।) দিতে স্বীকার করিলেও, তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। যদিও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কোনও উপন্যাসে তিনি যে সকল বিষয় ব্যবহার করেন নাই, এমন অনেক বিষয় বক্ষ্যমাণ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি ঐ পুস্তক রচনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই পুস্তকে মানবোচিত

খৃষ্ট।

ইচ্ছা আছে, ঐ পুস্তক আবার লিখিবেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইংরাজী পাঠকদিগের উপকার হয়, সন্দেহ নাই; রেনান ও হল্ কেন্, উভয়েরই রচনা শিল্পকুসুমকুন্তলা এবং শক্তিময়ী, মোহিনী এবং অসাধারণ প্রভাবময়ী।

হল্ কেন্ বলেন যে, গত কয় বৎসরের মধ্যে তিনি লিখিবার জন্য ডেস্ক্ ব্যবহার করেন নাই। যাহা লিখিতে হইবে, তাহা প্রথমে মস্তিষ্কে লিখিত হয়, তৎপরে মস্তকের বোঝা যখন কাগজে নামাইতে হয়, তখন যে টুকরা কাগজ হাতের কাছে থাকে, তাহাই লইয়া জানুর উপর রাখিয়া লিখিলেই হইল। তাঁহার রচনাপ্রণালী এইরূপ;—প্রথমে অবশ্য মতলব আঁটিতে হয়, তাহার পর ঘটনা-সন্নিবেশ; ঘটনা-সন্নিবেশ সহজেই সম্পন্ন হয়। রচনাবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তিনি পাগলের মত পরিশ্রম করেন। যে সকল স্থানের বর্ণনা করিতে হইবে, লেখক স্বয়ং সে সকল স্থান দর্শন করেন। বর্ণিতবিষয়সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইলেই, তিনি সে সকল পাঠ করেন। ইহাতে পরিশ্রম ও আনন্দ উভয়ই আছে। তাহার পর তিনি নোট লইতে আরম্ভ করেন। ইহার পর হইতে প্রকৃত যন্ত্রণার আরম্ভ। প্রতিদিন প্রভাতে পাঁচটা হইতে প্রাতরাশ পর্য্যন্ত ঐ বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, তিনি প্রভাতে পাঁচটার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় পড়িয়া সে দিন যে অধ্যায় লিখিবেন, সেই অধ্যায়টি আদ্যোপান্ত মনে মনে রচনা করেন; প্রায় সাতটার সময় সে কার্য্য শেষ হয়। সাতটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত অধ্যায়টি মনে মনে পুনরালোচনা করেন। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি দ্রুত কলম চালাইয়া মস্তকের বোঝা কাগজে অর্পণ করেন। অনন্তর সমস্ত পুস্তকের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। কোনও পুস্তকের রচনাকালে, লেখক অন্য সকল চিন্তা বর্জ্জন করিয়া কেবল তাহারই কথা ভাবেন। অপরাহ্নে তিনি একমাথা চিন্তা লইয়া, হয় ভ্রমণে, নচেৎ অশ্বারোহণে, বাহির হয়েন। সন্ধ্যার অন্ধকারে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে করিতে গল্প রচনা করেন। সে সময় তাঁহার অত্যন্ত আনন্দে অতিবাহিত হয়। তিনি যে প্রতিদিন লিখিবেন, এমন কিছু স্থির নাই,—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ছুটিও লইয়া থাকেন। আবার যখন লেখেন, তখন প্রতিদিন পনের শত কথার অধিক লিপিবদ্ধ করেন না।

সরঞ্জাম।

কোনও পত্রে যখন তাঁহার কোনও উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন তিনি পাণ্ডুলিপির বড় পুনরালোচনা করেন না। তবে যখন উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, তখন কতকটা বদলাইতে, কতকটা নূতন অংশ বসাইতে, কতকটা নূতন করিয়া লিখিতে, তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হয়। Scapegoat লেখকের এক খানি সুন্দর উপন্যাস। উহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার বেসাণ্ট বলিয়াছেন, "প্রায় প্রতি বৎসর প্রকাশিত পুস্তক সকলের মধ্যে একখানি অন্য সকল গুলির অপেক্ষা বহুপরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়, এবং তাহাতেই সে বৎসর বিখ্যাত হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বৎসরের সেই পুস্তক হল্ কেনের 'স্কেপগোট'।" সেই পুস্তকের কি হইয়াছিল, শুনুন। যখন পুস্তকের চার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গেল, এবং পুস্তকখানার খুব প্রশংসাও হইল, তখন লেখকের মনে হইল যে, পুস্তকখানি তাঁহার মনের মত হয় নাই। কাজেই আবার দুই মাস ধরিয়া লেখক স্কেপগোট নূতন করিয়া লিখিলেন। লোকে বলে, এই সংশোধনে স্কেপগোটের কোনও উন্নতি হয় নাই; কিন্তু লেখকের সংস্কার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

পুনরালোচনা।

ডুমা।

বিগত নভেম্বর মাসে আলেক্জাণ্ডার ডুমার মৃত্যুতে ফরাসী সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে,

করিবার অধিকার আইনসঙ্গত বটে ; কিন্তু সাহিত্যের জমায় সাধারণতঃ 'ওটবন্দি' বন্দোবস্তই প্রচলিত ; ক্বচিৎ মৌরসি বন্দোবস্ত দেখা যায়। কিন্তু ডুমার বিষয় স্বতন্ত্র। তাঁহার সাহিত্য-'জমা' পিতার পর পুত্রেই বর্ত্তাইয়াছিল ; এমন কি, পিতার বৃদ্ধাবস্থাতেই পুত্র সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও ইংরাজী সহযোগীর অনুসরণ করিয়া আমরা ডুমার সম্বন্ধীর কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ইংরাজ কবি ড্রাইডেন বলিয়াছেন ;—

"দোষরাশি তৃণসম ভাসে ত উপরে ;
যাহারা মুকুতা তরে সন্ধান করিয়া ফেরে,
তাদের ডুবিতে হ'বে গভীর সাগরে।"

দোষ।

দোষ প্রথমেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দোষ সকলেরই থাকে, ডুমারও ছিল। ডুমা যখন ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যরূপে পরিগৃহীত হয়েন, তখন ডুমার সমসাময়িক কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি তদীয় রচনার দোষ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ডুমা পাঠককে যে জগতে উপনীত করিতেন, তাহার অস্তিত্বই নাই। সে জগৎ এক বিচিত্র জগৎ। তাঁহার মতে, ডুমার লেখনীপ্রসূত মোহিনী বর্ণনায় বর্ণিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, পুরুষে সম্মান এবং রমণীতে পবিত্রতার আদর্শ আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, এবং স্বয়ং ডুমাও অসতর্কভাবে সেই আদর্শেরই পূজা করিতেন।

রচনা।

ডুমার অধিকাংশ পুস্তকই বড় সত্বর রচিত হইত। তিনি বলিতেন যে, কোনও নাটক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাহার আদ্যোপান্ত ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিতেন। পৃষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার মত বড় স্থির ছিল। বড় কাগজখানাকে চার সমান ভাগে বিভক্ত করা হইত। ঐরূপ কুড়িখানি কাগজে প্রত্যেক অঙ্ক শেষ হইত ; কেবল শেষ অঙ্ক সম্বন্ধে বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র ;—সতের খানা কাগজেই শেষ অঙ্ক শেষ হইত। নির্দ্ধারিতসংখ্যক কাগজ লেখা হইলেই তিনি বুঝিতেন যে, অঙ্কটা বেশ বড় হইয়াছে ; তখন তিনি সে অঙ্ক শেষ করিতেন।

পিতা ও পুত্র।

পিতা পুত্রের প্রভেদ সম্বন্ধে ডুমা একবার একজন ইংরাজ সমালোচককে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পিতার রঙ্গালয়প্রিয়তা পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল ; কিন্তু দুই জনের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পিতা কবিতা ও সৌন্দর্য্যশোভাময় যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাই তিনি "আইডিয়্যালিষ্ট"। আর তিনি এ কালের লোক, তাই তিনি "রিয়ালিষ্ট"। পিতা স্বপ্নরাজ্য হইতে বর্ণনার বিষয় সংগ্রহ করিতেন ; পুত্র চতুষ্পার্শ্বস্থ মানবমণ্ডলীর মধ্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিতেন। পিতা মুদিত চক্ষু লইয়া কার্য্য করিতেন ; পুত্র জগতের জটিল জালের মধ্যে নয়ন পূর্ণোন্মুক্ত না রাখিয়া কায করিতেন না। পিতা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন ; পুত্র জগতের একেবারে মধ্যে থাকিতেন। পিতা চিত্র অঙ্কিত করিতেন ; পুত্র ফটোগ্রাফ তুলিতেন। পিতার চিত্রিত চরিত্রের আদর্শ জগতে পাওয়া যায় না ; পুত্রের চিত্রিত চরিত্রের আদর্শ সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য।

রমণী।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ডুমার মত বড় ভয়ানক। তিনি বলিতেন যে, কোনও রমণী যদি কোনও পুরুষকে পছন্দ করে, তবে সে তাহাকে বিবাহ করে ; নতুবা সে তাহাকে বিবাহ করে না। বাস্—বিশ্লেষণ শেষ হইয়া গেল। তিনি পুত্রপৌত্রাদিবেষ্টিতা অনেক মহিলাকে শৈশবাবধি জানেন,—বিবাহ ব্যাপারটা কি, তাহাও তিনি

আরম্ভ করিবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন রমণী পুরুষের উপর নির্ভর করিবে। বিবাহপ্রথার মত আর কোনও প্রহসন আছে কি? রমণীগণের মতে ইহা ত স্বাধীনতা-প্রদাতা। বিবাহ হইতেই তাহাদিগের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমতী' যোগ হয়; আর বিবাহের পর তাহারা পিতামাতার নিকট হইতে যাইতে পারে। পিতামাতাকে তাহারা ভালবাসে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিলে তাহাদিগের আনন্দ দেখে কে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, মেরীর অস্তিত্ব না থাকিলে খৃষ্টধর্ম্ম আরও শীঘ্র জয়লাভ করিত, মেরীই সে ধর্ম্ম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ডুমার ঈশ্বর ও তাঁহার মধ্যে মেরী থাকিতে পাইবেন না। পুরুষ অপেক্ষা রমণীর নীচত্ব অনুভব করিয়া টেনিসনের 'লকস্‌লিহলের' হতাশপ্রেমিক নায়ক বলিয়াছেন:—

"Woman is the lesser man, and all thy passions match'd with mine
Are as moonlight unto sunlight, and as water unto wine.—"

কিন্তু ডুমার মত বড় ভয়ানক। যে নরনারীর আবির্ভাবে এখন ইংরাজি সাহিত্য কলুষিত, সেই নরনারীর প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে যদি ইংলণ্ডে বিবাহপ্রথার লোপ না হয়, তবে কেবল দীর্ঘ-কেশশালী পুরুষগণ হ্রস্বকেশশালিনী রমণীগণকে বিবাহ করিবে; আর রমণীগণ ফুটবল খেলিয়া, দ্বিচক্ররথ চালাইয়া কাল কাটাইবে, এবং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তীব্র ও কদর্য্য ভাষায় সন্তানের জন্মের অনাবশ্যকতা ও অন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সেই নরনারীর আদর্শ, মূর্ত্তিমতী করুণার কল্পনা কোমলপ্রাণা কামিনীর আদর্শ বিকৃত করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেও, ডুমার এই ভয়ানক মত। রমণীদিগের সম্বন্ধে ডুমার বিধান প্রায় ড্রেকোর বিধানের মতই কঠোর। জানুয়ারী মাসের "ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রে শ্রীমতী ভ্যান্ ডিভেল্‌ডি, ডুমা ও তাঁহার নাটক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে, শেষকালে রচিত গ্রন্থসমূহে ডুমা পুরুষদিগকে বড় কঠোর উপদেশ দিয়াছেন। সে উপ-দেশের সার এই দাঁড়ায়,—"যদি তোমার পত্নী তোমাকে প্রবঞ্চিত করে, তবে তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিবে; যদি তোমার এমন বোধ হয় যে, তোমার পত্নী পাপে এমন আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা যে, তাহার অনুতপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে তাহাকেও হত্যা কর; আর যদি নররক্তে হস্ত কলুষিত করিবার প্রবৃত্তি তোমার না হয়, তবে তাহাকে সন্তানহীনা, গৃহহীনা করিয়া দূর করিয়া দাও। তাহার প্রাণের আবরণ ধূলিসাৎ করিয়া তাহাকে গৃহহীন অব-স্থায় বিশাল ভবের মাঝে বিদায় করিয়া দাও—তাহার ফিরিবার পথ রাখিবার প্রয়োজন নাই।" "যে পতিতা রমণী উদ্ধারের প্রার্থিনী, তুমি তাহাকে সাহায্য করিতে পার; কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, যে দুর্ব্বল, যথেচ্ছাচারিণী, বিবেকহীনা, অনিষ্টকারিণী রমণীকে তুমি তোমার পত্নী করিয়াছিলে, তাহার কলঙ্ককাহিনী প্রকাশ করিয়া দিও।" "তাহার পাপ, তাহার দুর্ব্বলতা জগতে প্রকাশিত করা আবশ্যক। পুরুষ যখন আপনার প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় পরাঙ্মুখ হয়, যখন সে রমণীর উপর আপনার কঠোর শাসন শিথিল করে, তখন সে রমণীর হস্তে ক্রীড়নকমাত্র হইয়া দাঁড়ায়; হয় আত্মহত্যা করে, নয় ঘৃণাজনক সম্মানহীনতায় মগ্ন হইতে থাকে। সে তাহার দুর্দ্দশার জন্য তখন আর সহানুভূতিও পায় না।" অর্থাৎ, তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না। রমণীসম্বন্ধে ব্যবস্থা-বিৎ ডুমার এই কঠোর ব্যবস্থা। কি ভয়ানক!

ডুমার জীবনের সর্ব্ব সময়ে রচিত গ্রন্থেই রমণীজাতির প্রতি অবিশ্বাসভাব দেখা যায়।

বাসিতেন। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যুবক বন্ধুকে তাঁহার গৃহে "আহারস্বাধীনতা" প্রদান করিবার সময় ডুমা মোপাঁসাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মদ্য চলনসই, লোক জন অন্য স্থানের লোকের অপেক্ষা অধিক বোকা নহে ; আর, তাঁহার গৃহে নারীর নামগন্ধ নাই। এই অসাধারণ অবিশ্বাসের কারণ বুঝিতে হইলে ডুমার অতীত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। যৌবনে একবার নির্ম্মমভাবে প্রবঞ্চিত হইবার পর, ডুমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও প্রেমজালে জড়িত হইবেন না। 'ভুবনে প্রেমের ফাঁদ পাতা থাকিলেও এবং কে কোথা ধরা পড়ে তাহা কেহ না জানিলেও' ডুমার 'গর্ব্ব টুটে' নাই ; ফ্রান্সের বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী কলানিপুণা মোহিনীগণ আর কখনও ডুমাকে মুগ্ধ বা বন্দী করিতে পারেন নাই। তবুও ডুমা বলিয়াছিলেন যে, রমণীরা অবুঝ, পুরুষ অপেক্ষা অধম এবং মন্দকারিণী ; যেন সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য রমণীরা চিরজীবন তাঁহার তোষামোদ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

অবিশ্বাসের কারণ।

ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায়ের প্রতি ডুমার প্রবল ঘৃণা ছিল। মৃত ব্যক্তির বিশেষ বিধান না থাকিলে, ফরাসী ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় ব্যাপটাইসড্ খৃষ্টানমাত্রকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতে সমাধিস্থ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার রক্ষণশীল বন্ধুসম্প্রদায়কে বিষণ্ণ ও তাঁহার ঘৃণিত পরিবর্ত্তনশীল সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিয়া, ডুমা সে জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিব্যাপারের জন্য তিনি এই বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাতে পুরোহিত, সৈনিক এবং বক্তৃতা, এই তিন জিনিস থাকিতে পাইবে না। কাজেই ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, কেবল কতকগুলি বড় লোক তাঁহার সমাধিসময়ে উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতের কোনও কার্য্য, বক্তার বাক্য, বা সৈনিকের সজ্জা, সেই সমাধিব্যাপারের গম্ভীরতা নষ্ট করে নাই। অনেক গোঁড়া ক্যাথলিকের বন্ধু ডুমার এই বিশেষ বিধানের কারণ প্রকাশিত হইয়াছে।—কোনও ধর্ম্মযাজকের বিরক্তিকর বক্তৃতেই ইহার উৎপত্তি। কোনও ধর্ম্মরত পরিবারের এক যুবকের সহিত ডুমার এক কন্যার বিবাহের সময়, সেই ধর্ম্মযাজকের পুত্র ডুমার পুস্তকে প্রকাশিত নৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে ক্যাথলিক-দিগের মতামত প্রকাশ করেন। পুত্র ডুমা তখন পিতার ন্যায় পুরোহিতসম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় কেবল ভাল গল্পের জন্য ব্যস্ত হইতেন না, পরন্তু তিনি ফরাসী যুবকগণের নীতিশিক্ষক বলিয়া গর্ব্বই করিতেন। কাজেই পুরোহিতের হাড়জ্বালান কথাগুলা ডুমার বড় লাগিয়াছিল। পুরোহিত মহাশয়ের কথাগুলাও বোধ হয় কিছু কঠোর হইয়াছিল, কারণ নিগুর্ণ আদার তিনগুণ ঝালের কথা সুবিদিত! ইহাতে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারিত। শেষকালে পুরোহিত যখন বলিলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তখন সংক্ষেপে ডুমা কেবল বলিলেন যে, সে কথা কেহই স্বীকার করিবে না ; এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। জীবনে এবং মরণে পুরোহিতসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে থাকিবার সংকল্প, এই সময় হইতেই তাঁহার মনে ছিল।

পুরোহিত সম্প্রদায়।

পুরোহিতবিশেষ বা সমালোচকবিশেষের মতামতে ডুমার অপরিসীম যশ ক্ষুণ্ণ হইবে না। সূর্য্যাস্তের সময় যেমন গিরিশরীরস্থ কণ্টকময় গুল্মাদি সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেও, পর্ব্বতের তুষারমুকুটমণ্ডিত সমুন্নতশির অস্তগামিরবিরশ্মি-জালে সমুজ্জ্বল দেখায়, তেমনই কালে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী সমালোচক-গণ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেও ডুমার নাম অপরিমেয় যশঃপ্রভায় সমুজ্জ্বল

শেষ কথা।

দর্শন।

ফেব্রুয়ারি-সংখ্যক কণ্টেম্পোরারি রিভিউ পত্রে দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সর ব্যবসায়িক প্রণালীর অনুশীলনপ্রসঙ্গে, ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি ও পরিণতির আলোচনা করিয়াছেন।

স্থাপত্যের পূর্ব্বে ভাস্কর্য্য।

অনেকের ধারণা আছে যে, ভাস্কর্য্যের পূর্ব্বে স্থাপত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, আর স্থপতিরচিত মন্দিরাদির অলঙ্কারার্থ ভাস্কর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। স্পেন্সরের মতে মৃৎ বা দারুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি কালতঃ স্থাপত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি।

অসভ্যাবস্থায় মানুষ মৃত ও জীবিতের ভেদ বুঝিতে সক্ষম হয় না। আজ যে জীবিত থাকিয়া তাহার সহিত আলাপ আহার করিয়াছে, সে যে মৃত্যুর করালস্পর্শে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল, অসভ্যের ধারণায় এতটা কুলায় না। সে ভাবে, মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া কোথায় অদৃশ্য আছে; একটা জড় আধার পাইলেই তাহাতে আবার অধিষ্ঠিত হইবে। এই ভাব হইতেই মূর্ত্তির গঠন আরম্ভ হয়। মানসকল্পিত বা স্মৃতিস্থিত মৃতের মূর্ত্তি কাষ্ঠে বা মৃত্তিকায় গঠিয়া অসভ্য ভাবে যে, প্রেত তাহাতে অহরহ বা অবসরমত অধিষ্ঠিত হয়। অতএব সে সেই মূর্ত্তিকে পরিচ্ছদে ভূষিত ও আহার্য্যে সেবা করিতে যায়। এইরূপ, কয় শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মৃত রাজাদিগের মূর্ত্তি মহার্ঘবেশে সজ্জিত করিয়া দৈনন্দিন ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা অভ্যর্থিত করা হইত।

প্রেতের সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি প্রাচীনকালে যাজকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। অতএব দেখা যায়, মৃতের মূর্ত্তিগঠন (যাহা হইতে ভাস্কর্য্যের সূত্রপাত) যাজক দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

যাজক হইতে ভাস্কর।

উল্লিখিত তত্ত্বের প্রমাণ জন্য স্পেন্সর প্রথামত বহুতর প্রাচীন ও আধুনিক জাতির বিবরণ ও ইতিবৃত্ত সংগৃহীত করিয়াছেন। আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট নিগ্রোজাতির মধ্যে দেখা যায় যে, মৃতের গোরের উপর তাহার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়। কুক বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাওবিচ দ্বীপবাসীরা প্রত্যেক শক্তিশালী প্রেতের উদ্দেশে এক একটি মূর্ত্তি গঠিত করে। এই প্রেতগণ মৃত রাজা বা রাজন্য বই আর কেহ নহে। মেওরি জাতি মুরিণ জাতি প্রভৃতির বিবরণপাঠে জানা যায় যে, ঐ সকল মূর্ত্তির নির্ম্মাতা ভাস্কর প্রায়ই যাজকসম্প্রদায়ভুক্ত। কুলমক এবং মোগলদিগের যে বৃত্তান্ত পেলাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও জানা যায় যে, যাজকেরাই ভাস্কর ও চিত্রকর উভয়বিধ কার্য্যই সম্পাদন করে।

প্রাচীন জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে এই কথাই সপ্রমাণ হয়। মিসরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, উপাস্য প্রেত বা দেবতার মূর্ত্তি যাজকদিগের উপদেশ ও তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইত। কোন কোন স্থলে যাজক নিজেই বা তাহা গঠিত করিতেন। গ্রীকদিগের বৃত্তান্ত লিখিয়া কুরর্টিস বলিয়াছেন যে, আদিতে ভাস্কর্য্য যাজকসম্প্রদায়ভুক্ত লোক দ্বারাই রচিত হইত। রোমকদিগের ইতিহাস দ্বারা এই কথাই সপ্রমাণ হয়।

অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, এক হইতে বহুর উৎপত্তি, ইহাই বিবর্ত্তনের নিয়ম। পূর্ব্বে এক সম্প্রদায় বা ব্যক্তিতে বহু ব্যবসায় একীভূত ছিল; ক্রমশঃ সে সকল পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। লিওনারদো দা ভিনচি বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়েই পারদর্শী ছিলেন। কবি, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর,

চিত্রণ ও স্বর্ণকারকর্ম্মে নিপুণ ছিলেন। এসিরিক ডেভিড লিখিয়াছেন যে, মধ্য যুগে স্বর্ণ-কার্য্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও কবিতারচনায়, একই যাজকাচার্য্যদিগকে স্থনিপুণ দেখা যায়। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিশেষ কার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

স্পেন্সরের মতে ভাস্কর্য্য এখনও যাজকের সম্পূর্ণ হাত ছাড়াইয়া স্বতন্ত্র হইতে পারে নাই। গির্জ্জায় যে প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা মৃত আত্মীয়ের প্রেত-উপাসনার রূপান্তরমাত্র। ধনীর প্রাসাদে যে পূর্ব্বপুরুষদিগের মূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হয়, তাহাও এই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাও বক্তব্য যে, ক্রমশঃ ভাস্কর স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া ইতিহাস, উপাখ্যান, রূপক বা বাস্তব ঘটনার ছায়া লইয়া, তাহাই প্রস্তর বা দারুতে রচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ। "বিজয়া-দশমী" একটি সুরঞ্জিত পল্লীচিত্র। "প্রবাদ-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদমালার মূল অনুসন্ধান ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছেন। প্রবন্ধটি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই উপাদেয় হইয়াছে। "সিরাজদ্দৌলা" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—লেখকের গবেষণা প্রশংসনীয়। সিরাজদ্দৌলার বিস্তৃত বিবরণ এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে লিপি-বদ্ধ হয় নাই; লেখক সে অভাবের মোচন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "নীলগিরির টোডা জাতি" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি সুখপাঠ্য রচনা। "বাঙ্গলার রঙ্গ-ভূমি" প্রবন্ধটি আলোচনার উপযুক্ত;—থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রবন্ধটিতে দৃষ্টিপাত করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। যাঁহারা থিয়েটারের দর্শক, সুতরাং পৃষ্ঠপোষক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের শিক্ষার বিষয়ও যথেষ্ট আছে;—কিন্তু তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম মূক উপেক্ষার নিকট সকল আবেদন উপদেশ নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন। এ দেশের সাধারণ জনের শুনিবার ও শুনিয়া ভাবিবার, এবং তদনুসারে নূতন পথে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি বা সম্ভাবনা থাকিলে, দেশের অনেক আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত এবং অনেক আবশ্যক সংস্কার সুনির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্ভাবনারও অতীত। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "প্রজ্ঞাসূয়া সভা" প্রবন্ধটিতে, এবারকার কংগ্রেসে পঠিত মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতাটির সঙ্ক্ষিপ্ত এবং কৃপণ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে;—ইহাকে সমালোচনা না বলিয়া "মুরুব্বির মন্তব্য" বলিলেই বোধ হয় সঙ্গত হয়। মুখোপাধ্যায় মহা-শয়ের সহিত এ ক্ষেত্রে অনেকের মতের অনৈক্য হইবে। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন, "তাঁহার সেই উক্তিগুলি সত্যও নহে, সুবুদ্ধি ও সুরুচির পরিচায়কও নহে।"—তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধেও অনেকে এ কথা বলিতে পারেন।

নব্যভারত। পৌষ ও মাঘ। "স্বর্ণরাজ্যের অধিবাসী" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার" মধ্যে শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "প্রেমের আদর্শ" একটি সুন্দর সমুজ্জ্বল কবিতা। এবারকার "নব্যভারতের অগ্রভাগ—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের "নৃসিংহাবতার বঙ্কিমচন্দ্র,"—বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটির দ্বারা "নব্যভারত" কলুষিত হইয়াছে;—গালি না দিলে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা যায় না,—এই যাঁহাদের সংস্কার, তাঁহারা সাধারণের কৃপার পাত্র। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এখন নিন্দা প্রশংসার অতীত দেশে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু হায়,—

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে

বেগম সমরু।

শেষ।

সমরুর সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল তদীয় পত্নী বেগমের জীবনের ঘটনাগুলি বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য। সমরুর সহিত বেগমের সম্মিলন উপযুক্তই হইয়াছিল। উভয়ের চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। বরঞ্চ বেগম খোদ সমরু অপেক্ষা অধিকপরিমাণে পরোক্ষদর্শিনী ছিলেন। সমরু যে সেনাদল চালন করিয়া জীবনে অসন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বেগম অনেকটা তাহার বিপরীতপথাবলম্বিনী হইয়া সুযশ ও সুনাম সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

বেগম কে, এ সম্বন্ধে বড় মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি জনৈক হীনাবস্থাপন্ন মোগল রাজবংশধরের কন্যা। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি একজন অতুলরূপশালিনী নর্ত্তকী ; কাশ্মীর তাঁহার জন্মস্থান ;—সমরু সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য এই ঘৃণিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হন। অন্য ঘটনা সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, বেগম যে সমরুর পরিণীতা পত্নী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেগম স্ত্রীলোক হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে পুরুষের দৃঢ়তা ও কার্য্যক্ষমতা ছিল। সেই ভয়ানক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার সময়ে, নিয়মহীন সেনাদল লইয়া এক জন স্ত্রীলোক কি প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

সমরু দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। পুত্রটি পিতার পরিত্যক্ত সৈন্যদলের অধ্যক্ষতাকার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করিলে, বেগম, সপত্নীপুত্রের নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। সমরুর মৃত্যুর পর, তাঁহার দলের সেনানায়কেরা বেগমকেই কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বেগম অগত্যা তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন।

বাদসাহ তখন আমীর ওমরাহদের বিদ্রোহে মহা ব্যতিব্যস্ত। নিতান্ত

পাউলী নামক এক জন জার্ম্মানের হস্তে সেনাদলের নায়কত্ব প্রদান করিয়া, বাদসাহের সহায়তা করিতে লাগিলেন। *

বেগম সমরুর হৃদয়ে, দৃঢ়তা বলিয়া, একটি নূতন শক্তি নিহিত ছিল! এই দৃঢ়তার বলেই তিনি সৈন্যদল শাসনাধীন রাখিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে সক্ষম হন। একটি ঘটনার দ্বারাই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বাদসাহের সহায়তা করিবার জন্য বেগম তাঁহার সৈন্যদল লইয়া মথুরায় অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, তাঁহার আগরার বাটী আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। এই গৃহে তাঁহার যাবদীয় সঞ্চিত অর্থ আবদ্ধ ছিল। পরে তদারকে প্রকাশ পাইল, বেগমের দুই ক্রীতদাসী, নষ্টচরিত্রা হইয়া, তাহাদের উপপতিদের পরামর্শে, সমস্ত গুপ্ত সম্পত্তি অপহরণ করিবার মানসে এই প্রকারে ঘরে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছে। বেগম ক্রীতদাসীদের মথুরায় ধরিয়া আনাইলেন, নিজেই বিচার করিতে বসিলেন। বিচারে দাসীদের দোষ প্রমাণিত হইল। দণ্ড হইল, প্রচণ্ড কশাঘাত। ক্রমাগত কশাঘাতে রমণীদ্বয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, বেগম সম্মুখস্থ দুইটি খনিত গর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিবার হুকুম দিলেন। হুকুম কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল। তাঁহার সেনাদল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারা এক দৃঢ়চিত্তা শক্তিশালিনী রমণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে।

এই ঘটনায় আর কিছু হউক বা না হউক, এই নিষ্ঠুরতার গৌণফলে ভয়বশতঃ বেগমের সেনাদল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ক্ষমতাধীন হইল। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীন প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত হইল; তাহারা নিয়মাধীন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

পাউলীর মৃত্যুর পর বাডার, ইভান্স ও দুদ্রেণী নামক তিন জন ইউরোপীয় যথাক্রমে বেগমের সেনানায়ক হইয়াছিলেন। অবশেষে লি-ভেসো নামক সদ্বংশজাত জনৈক শিক্ষিত ফরাসীর† হস্তে সেনাচালনের ভার ন্যস্ত হয়।

---

* বাদসাহের সহায়তা করিয়া, বিদ্রোহী নজফ খাঁ ও গোলাম কাদিরকে দমন করিবার জন্য ও কয়েক বার মহা বিপদের সময় বাদসাহের জীবনরক্ষা করিবার জন্য, দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বেগমকেও প্রকাশ্য দরবারে "কন্যা" সম্বোধন করিয়া খেলাত ও উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। কোনও সমসাময়িক লেখক লিখিয়াছেন,—"The Shah himself in full *Durbar* honoured her with a magnificent *khillat* and called her "*his most beloved daughter*" in addition to her various other titles. (Fraser's Mily Memoirs—P. 286, Vol. I.)

লি-ভেসোর অধীনে ছয়টি রেজিমেণ্ট সংগঠিত হইল। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা সবই নূতন। ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ, এই তিন শ্রেণীরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। বেগম তখন সার্দ্ধানায় বসবাস করিতে-ছিলেন। সেনাগণের কিয়দংশ সার্দ্ধানায় রহিল। অবশিষ্ট দিল্লীতে গিয়া বাদসাহের সহায়তাকল্পে লি-ভেসোর কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত হইল।

ঠিক এই সময়ে আর একটি নূতন ঘটনা ঘটিল। জর্জ টমাস নামক এক-জন ইংরাজ জাহাজের কাপ্তেনী করিতেন। তিনি জাহাজ ছাড়িয়া বেগমের সেনাদলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। জর্জ টমাস, যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও সামরিক প্রতিভা একত্রিত হইয়া, বেগমের সৈন্যদলের মধ্যে এক নবজীবন সঞ্চারিত করিল। জর্জ টমাস অতি-শীঘ্রই বেগমের সু-নজরে পড়িলেন।

দিল্লীতে বাদসাহ শাহ-আলমের মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত নজফ-আলি খাঁ এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। প্রাসাদ ঘেরাও করিয়া নজফ্ খাঁ বাদসাকে একবারে নিহত করিবার চেষ্টা করেন। জর্জ টমাস বেগমের উপদেশে, সহসা সৈন্যদল লইয়া, বাদসাহকে সম্মুখবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলেন। বাদসাহ ও বেগম উভয়েই টমাসের বীরত্বে যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন। বাদসাহ এই সময় হইতে তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বেগমকে "কন্যা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

জর্জ টমাসের ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখিয়া লি-ভেসো বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা হওয়াতে গোপনে তিনি বেগ-মকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। বেগম সমরু, কোন অজ্ঞাত কারণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে গ্রেগরি নামক একজন রোমান-ক্যাথলিক পাদরীর দ্বারা অতিগোপনে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ঘটনাক্রমে এই বিবাহের পর হইতে জর্জ টমাস বেগমের দল ছাড়ি-লেন। তাঁহার সৈনিকপ্রতিভা আবার নূতন দল সংগঠন করিল। তিনি শিখ প্রদেশসমূহে বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষমতা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, পেরণ প্রভৃতি ফরাসী সৈনিকদিগের প্রতি-যোগিতায় ভবিষ্যতে তাঁহার পতন না হইলে, হয় ত রণজিৎ সিংহের পরিবর্ত্তে

হইয়াছে, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি অতি-সামান্য বিষয়েও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বেগমের সেনাদলে দু চারি জন ইউরোপীয় সেনানায়ক ছিল। ইহাদের আচার ব্যবহার, চাল চলন, ভদ্রপ্রকৃতির সীমার বাহিরে ছিল। ইহাদের প্রকৃত চরিত্র যাহাই হউক না কেন, এই সকল লোক লইয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে, এই ভাবিয়া বেগম সময়ে সময়ে একত্র আহারাদি করিয়া, তাহাদের সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। লি-ভেসো এ প্রথাটা আগেই বন্ধ করিয়া দিলেন। নানাবিধ সুরসাল খাদ্যভারে পীড়িত খানার টেবিলের পার্শ্বে উপবেশনের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া, রসনার অপরিতৃপ্তির জন্য যতটা না হউক, এই ঘটনায় পূর্ব্ব-সম্মানহানির আশঙ্কায়, তাঁহার অধীনস্থ ইউরোপীয়েরা অবাধ্য হইয়া উঠিল। লি-গো নামক এক ফরাসী সেনাপতি, সেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া অবাধ্যতার বীজ বপন করিলেন। ইহাদিগকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও বেগম যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সেনাদলের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে হইল। লি-ভেসো এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন।

কর্ণেল ম্যাক-গোয়েন, ইংরাজের তরফের সেনাধ্যক্ষ। তিনি সেনাদল লইয়া তখন কোনও কার্য্যব্যপদেশে অনুপসহরে অবস্থান করিতেছিলেন। লি-ভেসো নিজে ইংরাজি জানিতেন না। অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে ইংরাজি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তদবলম্বনেই ম্যাক্-গোয়েন (Mc. Gowen) সাহেবকে ইংরাজাধিকারে আশ্রয় লইবার জন্য পত্র লিখিলেন। বেগমের সেনাদল দিল্লীর বাদসাহের সহিত সংশ্লিষ্ট ; পাছে তাঁহাকে কোনও দোষের ভাগী হইতে হয়, বা বাদসাহ ইংরাজদের উপর বিরক্ত হন, এই ভাবিয়া কর্ণেল সাহেব লি-ভেসোকে ইংরাজাধিকারে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিলেন।

সিন্ধিয়া এই সময়ে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের উপর একটা সাংঘাতিক আঘাত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণর স্যর জন শোর সমস্ত বিষয়ে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মেজর পামার নামক এক ইংরাজ সেনানীকে প্রেরণ করেন। লি-ভেসো অনুপসহরের ব্যাপারে ব্যর্থমনোরথ হইয়া খোদ গবর্ণর সাহেবের কাছে এ সম্বন্ধে পত্রাদি চালাইতেছিলেন। এমন সময়ে (১৭৯৫ খৃঃ) মেজর পামার সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বেগমের তখন

অসমর্থ হইয়া তাহাদের উৎপাতের ভয়ে ইংরাজাধিকারে পলাইতেছেন। এ প্রকার স্থলে উপস্থিত সুযোগ পাইয়া তিনি আরও বিপরীত দিকে বাঁকিয়া বসিলেন। সিন্ধিয়া পামার সাহেবকে বলিলেন, "বেগম যদি সমগ্র সেনাদল ও নগদ বার লক্ষ টাকা দেন, তবে আমি তাহাদিগকে নিজদলভুক্ত করিয়া লই। অন্যথা আমিই তাঁহার ইংরাজাধিকারগমনের পথে অন্তরায় উপস্থিত করিব।"

মেজর পামার সমরু বেগমকে সমস্ত কথা জানাইলেন। বেগম শুনিয়া যৎ-পরোনাস্তি বিস্মিত ও ভগ্নমনোরথ হইলেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হইলেও বেগম সহজপ্রকৃতির ছিলেন না। সিন্ধিয়াকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনাকে টাকা দেওয়া দূরে থাক্, আপনি এই সৈন্যদলগঠনের অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অন্যান্য খরচার জন্য চার লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন কি না ?"

মেজর পামার মাঝে পড়িয়া শেষ একটা রফা করিয়া দিলেন। কথা স্থির হইল, "সিন্ধিয়া বেগমের পুত্রকে যাবজ্জীবন মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি দিবেন; সমস্ত সেনাদল সিন্ধিয়ার নিজের অধীনে থাকিবে; বেগম ও লি-ভেসো গোপনে ইংরাজাধিকারে পলাইবেন।"

এ দিকে হিতে বিপরীত ঘটিল। বেগমের সেনানায়কেরা ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল যখন শুনিল, তাহাদের পূর্ব্বকর্ত্রী সিন্ধিয়ার নিকট তাহাদের বিক্রয় করিয়া গোপনে পলাইবার চেষ্টায় আছেন, তখন তাহারা বিদ্রোহী হইয়া বেগম-পুত্রকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া লইল। লি-ভেসোর রূঢ় ব্যবহার ইউ-রোপীয় অফিসারেরা তখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই সুযোগে বেগমের নিজহস্তগঠিত সেনাদলই তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে অবরোধ করিবার মন্ত্রণা আঁটিয়া অগ্রসর হইল।

গভীর রাত্রি; চারি দিক অন্ধকার। লি-ভেসো ও বেগম, সার্দ্ধানা ত্যাগ করিয়া গোপনে ফরাক্কাবাদের দিকে চলিলেন। বেগম পালকীতে উঠিলেন। তাঁহার হাতে একখানি শাণিত ছুরিকা। বেগম মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। উন্মত্ত বিদ্রোহী সৈন্যেরা প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার যথোচিত লাঞ্ছনা করিতে পারে, এ কথাও তিনি জানিতেন। যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলে এই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র অনেক উপকার করিবে। লি-ভেসোও এই ঘটনায় বেগমের সাহস ও আত্মসম্মানজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তিনি

তাঁহারা এইরূপে মোটে দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়াছেন, এমন সময়ে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকমালা দেখা দিল; সেই নিশীথ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহা কোলাহল উঠিল। বেগমের অধীনস্থ ইউরোপীয় সেনানায়কগণ ত্বরিতপদে আসিয়া পলায়িত প্রভুদম্পতিকে ঘেরাও করিল। বেগমের পালকীর দ্বার খোলা, সেনারা তাহার উপর বলপ্রয়োগে উদ্যত; এমন সময়ে লি-ভেসো দেখিলেন, বেগমের বক্ষঃস্থ শ্বেত পরিধেয়বস্ত্র লোহিত-রাগরঞ্জিত হইয়াছে। লি-ভেসোর মাথার ঠিক ছিল না, ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বেগম সম্ভ্রমরক্ষার্থ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি পিস্তলের মুখ সহসা নিজের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীষণ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া, সেই বিপুল দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল।

বিদ্রোহীরা লি-ভেসোর পরিণাম দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, কিছু অধিক আনন্দ উপভোগ করিত। যাহা হউক, তথাপি তাঁহার মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া চলিল। ভাগ্যক্রমে বেগমের আঘাত তত সাংঘাতিক হয় নাই; ছুরিকা কেবলমাত্র মাংসভেদ করিয়া অস্থিতে ঠেকিয়াছিল; সুতরাং তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ চেতনালোপ হয় নাই। বাহকেরা পালকী ফিরাইয়া আবার সার্দ্ধানায় চলিল।

এইবার বেগমের লাঞ্ছনার একশেষ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে একটি কামানের সম্মুখে রাখিয়া পাহারাবন্দী করিল। আহার বন্ধ, সাত দিন অনাহারে থাকিয়া, নানাবিধ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, বেগম জীবন-রক্ষার আশায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। সময়ে সময়ে সামান্য মুষ্টিমেয় আহার্য্য দ্রব্যের জন্য, ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য, তাঁহাকে এই সময়ে পরিচারিকাগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হইত।

এই সময়ে জর্জ টমাস আবার দেখা দিলেন। লি-ভেসোর মৃতদেহের উপর যত দূর অমর্য্যাদা ও কাপুরুষবৎ লাঞ্ছনা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মৃতদেহের ৫। ৭ দিন ধরিয়া সমাধিই হয় নাই; দেহ পচিয়া উঠিয়াছিল। টমাস লি-ভেসোর দেহের সদ্গতি করাইলেন। *

---

* লি-ভেসোর মৃতদেহের উপর যে যথেষ্ট কাপুরুষোচিত অত্যাচার হইয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে

অধীনস্থ সেনারা, লি-ভেসোর সহিত বেগমের বিবাহের কথা জানিত না। জানিলে তাহারা আরও উত্তেজিত হইত। সমরুর উপর তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। সমরুর বিধবা অপরের পাণিগ্রহণ করিবে, ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিরুদ্ধ। * সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরিশেষে মৃতদেহ সমাধিস্থ হইল।

এখন এই সেনাদলের অধিনায়ক কে হইবে, এই বিষয়ে বিচার চলিল। সার্দ্ধানাস্থ ষ্টেটটি খরচপত্রনির্ব্বাহের জন্য দিল্লীশ্বর বেগমকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। বেগমকে হত্যা করিলে, বা অনাহারে অত্যাচারে তাঁহার জীবন-বিয়োগ হইলে, পাছে বাদসাহ এই সম্পত্তি কাড়িয়া লন, এই প্রকার ভয় দেখাইয়া, জর্জ টমাস বিদ্রোহী সেনাদলকে শান্ত করিয়া, বেগমকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেলিয়র নামক এক ফরাসী, তাঁহার অধীনে সেনাদলের অধ্যক্ষতা স্বীকার করিলেন।

এবার সেলিয়রের আমলে, বেগমের পূর্ব্ব প্রতাপ আবার জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সেনাদল ১৭৯৭ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারি পল্টন হইতে ছয় পল্টনে পরিণত হইল। সেলিয়র এই সমস্ত সৈন্য সিন্ধিয়ার কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। ইহারা আসাই যুদ্ধেও যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিল।

এই সময়ে বেগম নিজে কামান ঢালিবার কারখানা তৈয়ার করেন। নূতন তোপখানার সহিত গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়। সেনারা নিয়মিত বেতন ও পেন্সন পর্য্যন্ত পাইতে থাকে। এই সমস্ত খরচপত্রে বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ব্যয়ই তাঁহার সার্দ্ধানার ষ্টেট হইতে নির্ব্বাহিত হইত।

বেগমের সপত্নীপুত্র, জাফর ইয়ার খাঁর কন্যার সহিত কর্ণেল ডাইসের বিবাহ হয়। বেগম, জাফর ইয়ার, তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রীদিগের ভরণপোষণ জন্য যথেষ্ট অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে বেগম, ইংরাজ গবর্মেণ্টের রক্ষাধীনে আত্মসমর্পণ

"The villains who—the preceding day, had styled themselves his slaves, now committed every act of insult and indignity on his corpse."

* পাদরি Gregory ছাড়া, ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর Sir John Shore ও Major

করেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন। *

স্ত্রীলোক হইলে কি হয়, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পুরুষোচিত সাহস, অদ্ভুত অধ্যবসায়, তাঁহাকে সাধারণের চক্ষে অতি উচ্চসীমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে কঠোরতার সহিত রমণীর কোমল প্রবৃত্তিরও যথেষ্ট সমাবেশ ছিল। প্রথমাবস্থায় বেগম, নিতান্ত স্বার্থপর ও দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন। তাহা কেবল পদমর্য্যাদারক্ষার জন্য। রমণীর দয়াপ্রবৃত্তিরও তাঁহাতে অভাব ছিল না। সার্দ্ধানা, মীরট প্রভৃতি স্থানে গির্জ্জানির্ম্মাণের জন্য, খ্রীষ্টান বালকদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। একবার দুর্দ্দশাপন্ন অধমর্ণদিগের উদ্ধার করিতে তিনি কয়েক সহস্র টাকা কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়া, বেগম ইংরাজি চাল চলন ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে বা হস্তীতে চড়িয়া কখন কখন সাধারণ্যে বাহির হইতেন। গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতেন। অনেক দরিদ্র, অনাথ, নিঃসহায় ব্যক্তি, অনেক অন্ধ, পঙ্গু, পথভ্রষ্ট, বেগমের প্রচুর দয়ার জন্য আজীবন তাঁহার মঙ্গলকামনা করিত।

ভারতের তদানীন্তন লাটসাহেব বেগম সমরুকে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

---

* বেগম প্রথম প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধে যদিও সিন্ধিয়ার সহায়তা করিয়াছিলেন, পরে বিশেষ বুঝিয়া সুঝিয়া ইংরাজের দিকে টলিয়া পড়েন। মারহাট্টা যুদ্ধে ইংরাজের ক্ষমতা ও বাহুবলের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী যে ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। দিল্লীর যুদ্ধের পর বেগম নিজের সেনাবল ইংরাজের কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য, তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত লর্ড লেককে (Lord Lake) পত্র লিখিয়াছিলেন। তার পর লর্ড লেক যখন যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীতে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তখন বেগম নিজে পালকী করিয়া গিয়া সেনাপতির সহিত দেখা করেন। এই সময়ে একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল,—সেটির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেগম দলবল লইয়া যখন শিবিরের অভ্যর্থনাগৃহে (Reception-room) উপস্থিত হইলেন, লর্ড লেক তাঁহার সহানুভূতিতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লেক্ সাহেব যুদ্ধজয়োৎফুল্ল হইয়া একটু অতিরিক্ত মদিরা পান করিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রকাণ্ড জনতার সম্মুখে বেগমকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। বেগমের সহচরবর্গ এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইলে, প্রত্যুৎপন্নমতি বেগম সহসা বলিয়া উঠেন, "তোমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না। তোমরা ত জান, আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী। ইনি আমাদের পাদরীশ্রেণী-

To Her Highness the Begum Sumroo—

My esteemed friend,

I cannot leave India without expressing the sincere esteem for your Highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands have excited in my mind sentiments of warmest admiration and I may trust that you may be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, the sure source of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England and my prayers and best wishes attend you, and all others who like you exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain
With much consideration
Your sincere friend
Sd. M. W. Bentinck.
Calcutta, March 17th, 1835.

এই পত্রই বেগম সমরুর চিত্রে তীব্র জ্যোতি ঢালিয়া দিয়াছে। ইংরাজ ইতিহাসকারেরা,—কি জন্ম জানি না—বেগমকে ইতিহাসে স্থান দান করেন নাই;—কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেগমের উত্তরাধিকারীরা আজও সার্দ্ধানায় বর্ত্তমান।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ যেমন অলক্ষ্যে আসিয়াছিল, তেমন অলক্ষ্যে ফিরিতে পারিল না। উপরগস্তিরা নিশিদিন ছদ্মবেশে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; ডাকাইতির প্রধান সম্বল যে দ্রুতযান রন্‌পা, তাহাও তাহাদের অবিদিত ছিল না। বিশ্বনাথ আসিবার সময় বাঁকা পথে আসিয়াছিল, ফিরিবার সময় অপেক্ষাকৃত সোজা পথে গেল। আর কেহ হয় ত এটি করিত না, কিন্তু বিপদজালে বেষ্টিত হইলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্ম সাহস এবং পৌরুষ তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

আসিয়াছে, তখন বিশ্বনাথের বিদ্যুৎগতি বৃক্ষমূলে আসীন এক জন উপরগস্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবিলম্বে সে তাহার অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহা হইলেও চর এই ঘটনায় বুঝিয়া লইল, বিশ্বনাথের অজ্ঞাত বাসগৃহ দূরবর্ত্তী নহে। এইরূপে বিশ্বনাথ নিজের শেষ দিন কতকটা স্বেচ্ছায় সংক্ষেপ করিয়া আনিল।

বিশ্বনাথকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার মিলিবে, উপরগস্তিটা সুতরাং কাহারও কাছে কিছু ভাঙ্গিল না। পর দিন সোজা পথে অগ্রসর হইয়া সে কুলিয়ার মাঠের চারি দিকে ঘুরিল। দেখিল, প্রকাণ্ড মাঠ, আশে পাশে ধান্যক্ষেত্র আছে বটে, কিন্তু মাঝের অনেকখানি স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মে পরিপূর্ণ। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে দুই দিন বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিল, অন্য দিকে দুই চারি ক্রোশের ভিতর লুকাইয়া থাকিবার মত বন জঙ্গল কিছু নাই। অতএব তাহার নিশ্চিত ধারণা হইল, অন্ততঃ বিশ্বনাথ বা তাহার দলের কেহ সে রাত্রে কুলিয়ার মাঠে আশ্রয় লইয়াছিল।

এই সূত্র ধরিয়া চর নানা বেশে এবং নানা প্রয়োজনের ছলনায়, দিনের পর দিন কুলিয়ার মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণ্টকবনে একাকী প্রবেশ করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে সাহস হইতেছিল না, অথচ গোল করিলে পুরস্কারের অর্থে ভাগ বসিবে। এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া লোকটা কুলিয়া গ্রামের দু একটা দুষ্টগোছের রাখালকে কিছু পয়সা কবুল করিল। তখন বনফুলের সময়, মাঝ বনের ভিতর হইতে যদি কিছু ফুল তাহারা আনিতে পারে। রাখালেরা একবাক্যে সে ভূতের জায়গায় যাইতে অস্বীকার করিল। একজন বলিল, না জানিয়া ইহার ভিতর সে এক দিন বনের ধারে দুপুর বেলায় গাই চরাইতে গিয়াছিল। কোথা হইতে একরাশ ঢিল আসিয়া তাহার পিঠে পড়িল। আর সে বনের মাথার উপর স্পষ্ট ধূমরেখাও দেখিতে পাইয়াছিল।

উপরগস্তি অতঃপর সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিল। নিজে যাহা দেখিয়াছিল, এবং যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল, ব্লাকুয়ার সাহেবের প্রশ্নমতে তাহা বিবৃত করিল। কৃতনিশ্চয় না হইলেও, সাহেবেরা সদলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সহসা এক দিন অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য-

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইলিয়ট্ সাহেব মীরা এবং সরলাকে বিস্মৃত হন নাই। ভগবানকে বন্দী করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে ফিরিবার সময়, বারম্বার তাহাদের কথা তাঁহার মনে হইতেছিল। তেমন সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাদের রক্ষক এবং অভিভাবক এই ভগবান মদক—এ লোকটা কি তবে সত্য সত্যই দস্যুদলে সংসৃষ্ট? বিশেষতঃ তাহার সহচরটি ব্রাহ্মণ, উপবীতধারী ক্ষীণজীবী ভিক্ষুকবেশী,—এ লোকটাও তবে বিশ্বনাথের দলভুক্ত? ঘোর সন্দেহে ইলিয়ট সাহেবের চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি ফেডিকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছিলেন। ফেডি হেলিবার পাত্র নহেন। তাঁহার সেই একই উত্তর—বিশ্বনাথের আড্ডায় ইহাদিগকেই তিনি গান করিতে শুনিয়াছিলেন!

ভগবান এবং বিনোদ হাজতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইলিয়ট্ সাহেবের ব্যবস্থায় তাঁহারা অন্যান্য ডাকাইত আসামীদের দল হইতে পৃথক রহিলেন, এবং তাহাদের মত হস্তপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন না। দিগ্‌নগর অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা ভগবানের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন শুনিয়াও, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। অতএব মীরা যে রাত্রে সরলাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছিল, সেই রাত্রে, প্রায় একই সময়ে, ইলিয়ট্ অকস্মাৎ হাজতগৃহ পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন।

সাহেব ভগবানের কাছে গেলেন। বিনোদ প্রহরীদিগকে সহসা সসম্ভ্রমে কারাগারের দ্বার অর্গলমুক্ত করিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। ভগবান ঝুলিহস্তে হরিনাম করিতেছিল, বাহিরের কিছুতে তাহার মন ছিল না; সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল না; জমাদার সরফরাজি দেখাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিল, সাহেবের কাছে ধমক খাইয়া হটিয়া গেল। প্রহরীরা কেহ সেখানে থাকিতে পাইল না।

সাহেব বিনোদের কাছে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি যদি সব সত্য বল, তোমার পক্ষে ভাল হইতে পারে।" বিনোদ করযোড়ে উত্তর করিলেন যে, ডাকাতির ভাল মন্দ কিছুই তিনি জানেন না, এবং তখন সেই পারঘাটায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ অবধি হোড়ঙ্গের বনপ্রান্তে গ্রেফতারি পর্য্যন্ত, প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা অকপটে বিন্দুমাত্র অপলাপ না করিয়া বলিয়া গেলেন। ঈশ্বর সাক্ষী শপথ করিয়া, দুই হস্তে উপবীত জড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ-

কাহিনী শেষ করিলেন। তাহাতে সাহেব অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ দেখিতে-ছিলেন না। জপ সাঙ্গ করিয়া ভগবানও এই সময়ে সাহেবকে সেলাম করিল।

সাহেবের প্রশ্নমতে ভগবান নিজের অনেক কথা বলিল বটে, কিন্তু বিশ্ব-নাথের অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কথা একটিও বলিল না। ইলিয়ট জেদ করিলে বলিল,—"গলা কেটে দিলেও সাহেব, আমা হতে তা হবে না। যার নুন খেয়েছি, আমরণ তার গুণই গাব।" বিশ্বনাথের উপস্থিত বাসস্থানের কথা সুধাইলে ভগবান বলিল,—"সত্য সত্য তার কিছুই জানি নে। ইচ্ছা করলে জান্‌তে পারতাম, কিন্তু মিছে বল্‌তে হবে এই ভয়ে ইচ্ছে করেই জানিনে। জান্‌লেও বল্‌তাম না সাহেব।"

ভগবান বিনোদকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী জানাইয়া প্রার্থনা করিল, তদ্দণ্ডে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্। সাহেবের দয়া উদ্রিক্ত করিবার আশায় এই প্রথম ভগবান তাহাকে সরলার স্বামী বলিয়া পরিচিত করিল। ইলিয়ট্ হাজতগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু সে রাত্রে তাঁর ভাল নিদ্রা হইল না; অতি প্রত্যূষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একাকী অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * *

এ দিকে শেষ নিশায় বিশ্বনাথকে বিদায় দিয়া মীরা এবং সরলা স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিল বটে, কিন্তু সেই চারি দণ্ড চারি যুগ বলিয়া তাহাদের মনে হইতেছিল। স্বামীকে বাঁচাইবার ভরসায় সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও, পীতাম্বরের আপত্তির কথা হৃদয়ে তাহার কেমন একটা খট্‌কার সঞ্চার করিয়া-ছিল। স্বামীর প্রাণরক্ষা নিশ্চিত না হউক, চিঠি দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডাকিয়া আনিলে হিতে বিপরীত ঘটা অনেকটা নিশ্চিত। কেন সে আপনার স্বার্থের জন্য মীরাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দিবে? যে পিতৃতুল্য বিক্রমসিংহ হতভাগিনীকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়াই অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, জানিয়া শুনিয়া সরলা কি তাঁহার অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে দিবে? না, পীতাম্বরের চিঠি লইয়া গিয়া কাজ নাই। মীরা বা পীতাম্বরের ইহাতে আর আদৌ লিপ্ত থাকা-রই দরকার নাই। বদন এবং আয়ি বুড়ি সম্প্রতি সরলাকে দেখিতে আসিয়া-ছিল। সরলা চিত্ত স্থির করিল যে, তাহাদের দুজনকে সঙ্গে করিয়া দুঃখিনীর বেশে সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করিবে। প্রার্থনা গ্রাহ্য না

করযোড়ে তাঁহাকে বলিয়া আসিবে, প্রত্যাখ্যান-নিশিতে বালিকার সে প্রগল্‌ভতা তিনি মার্জ্জনা করুন! মীরা বলিয়াছিল, "সতীলক্ষ্মীর তিনি অপমান করেছিলেন, বিধাতার মনে কি আছে, কে জানে?" শুনিয়া অবধি সে কথা সরলার প্রাণে বাজিতেছিল। চিরদুঃখিনী সরলা ভাবিতেছিল, স্বামীর হাত ধরিয়া বলিয়া আসিবে যে, সে কখনও তাঁর মন্দ কামনা করে নাই।

* * * *

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইলিয়ট্ সাহেব স্বরূপগঞ্জে আসিলেন। বিশ্বনাথের সে আড্ডাগৃহ জনমানবশূন্য, কয় দিনের ভিতর পড়ো বাড়ীর মত দেখাইতেছিল। বিষণ্ণমনে সাহেব গ্রামাভিমুখে চলিলেন। পীতাম্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অনুরোধে নদীর দিকে যাইতেছিল। মাজিষ্ট্রেটকে চিনিত, দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় প্রমাদ গণিল। সাহেব ভদ্রলোক দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতে পারেন, যে দুইটি ভদ্রলোকের মেয়ে এবার এখানে পূজা করিয়াছিলেন, তাঁরা এখানে এখন আছেন কি না?"

পীতাম্বর সাহেবকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিল। সেখানে মীরা এবং সরলার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইল, আমরা তাহা সবিস্তারে বলিব না। ইলিয়ট ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের কাছে বিশ্বনাথের প্রসঙ্গ করিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন—এবার তাহার দিক্ দিয়াও গেলেন না। ভগবান এবং বিনোদের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—মীরা এবং সরলার বাক্যে সন্দেহমাত্র রহিল না। সরলা প্রাণের দায়ে এবার লজ্জা ত্যাগ করিল। এবারে আর দিদির উপর নির্ভর করিল না;—কেন না, মীরাকে তাহার বিপদে সংস্পর্শশূন্য রাখাই বালিকার অভিপ্রেত।

মীরা আপনা হইতে বিনোদের কথা তুলিল। না তুলিলে সরলা স্বামীর জন্য কিছু বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। যুক্তকরে সরলা কেবল নতমুখে অশ্রুমোচন করিতেছিল। সাধ্বীর সেই নির্ব্বাক প্রার্থনায় নিষ্ঠুর স্বামীর প্রত্যাখ্যানবার্ত্তা ইলিয়টের হৃদয় মথিত করিতেছিল। সেই কথা শুনিয়াই গত রাত্রে তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সাহেব রুমালে চক্ষু মুছিলেন। উভয়কে অভিবাদন করিয়া অভয় দিয়া গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নদীয়া জেলায় অবিস্তৃত মাঠের অভাব নাই, এবং বন জঙ্গলও যথেষ্ট। বিশ্বনাথ

নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মেঘা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহচরের মতে তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। দস্যুদলের অনেকে পূজার সময় সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছিল; দলপতির দুর্দ্দিনে, তাহার অজ্ঞাতবাসের অবসরে, সকলেই যে অর্থলোভ সম্বরণ করিবে, কে বলিতে পারে? অন্যান্য স্থানের চেয়ে কুলিয়ার মাঠের আকর্ষণ এই যে, ইহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন জঙ্গল অধিকাংশ স্থলে কণ্টকবৃক্ষখচিত, শত্রু আসিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিবে, অথবা সহসা আক্রমণ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। এই বনের মধ্যস্থানে মাটীর নীচে বাসস্থান উঠাইয়া বিশ্বনাথ নীলকুঠী লুঠের পর হইতে লুক্কায়িত ছিল। সঙ্গী সবে পাঁচ ছয় জন মাত্র। ছায়ার মত তাহারা দলপতির সঙ্গে মিশিয়াছিল। মেঘা ইহার ভিতর একজন। আত্মরক্ষায় বিশ্বনাথের চিরদিনই ঔদাসীন্য—মেঘার কথাই সে একটু শুনিত। সে দিন স্বরূপগঞ্জে যাওয়ার আগে মেঘার সঙ্গে তাহার খুব বচসা হইয়াছিল।

চর সাহেবদিগকে এই কুলিয়ার মাঠের অদূরে আনিয়া উপস্থিত করিল। দুরবীণযোগে দূর হইতে বন লক্ষ্য করিতে করিতে ব্লাকুয়ার ইলিয়টকে বলিলেন, "শীকারের খবর বুঝি মিছা হয়!" তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সামুয়েল ফেডি চরটাকে "শূয়ারকি বাচ্ছা" প্রভৃতি মধুর নামে অভিহিত করিলেন। চর একাকী পুরস্কার ভোগ করিবার দুরাশা করিয়া দলের লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিল, অতএব সাহেবের এই গালির পর তাহাদের তরফ হইতে একচোট বিদ্রূপবাণও সহ্য করিল। তখন সে "মরিয়া" হইয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্লাকুয়ার ইতিপূর্ব্বেই বাঁকা পথে মাঠের চারি দিকে সিপাহী রওনা করিয়াছিলেন। চর বনের ভিতর গেল দেখিয়া, তিনি উপরগস্তিদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। সেলারদের সঙ্গে সশস্ত্র হইয়া সাহেব তিন জন ধান্যক্ষেত্রে লুক্কায়িত হইলেন। অনুসন্ধানের কিছুই আর বাকী রহিল না।

ও দিকে চর অতি সন্তর্পণে ঝোপের অন্তরালে অন্তরালে গুড়ি মারিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অলক্ষ্যে অগ্রসর হইল। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে, সপ্তপর্ণবৃক্ষচ্ছায়ার নীচে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বিশ্বনাথ তখন সদলে আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিয়া অণুমাত্র দেরি না করিয়া সে পূর্ব্ববৎ সাবধানে ফিরিয়া আসিল।

ছিল। ততক্ষণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সিপাহী এবং উপরগস্তিরা বনের চারি দিক ঘিরিয়া ফেলিল। সাহেবেরাও অসহিষ্ণু হইয়া ধান্যক্ষেত্রের অন্তরাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব চর ফিরিয়া সংবাদ দিবামাত্র বেগে তাঁহারা সেই কণ্টকবনে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বনাথের অস্ত্রশস্ত্র মাটীর নীচে ক্ষুদ্র অস্ত্রাগারে রক্ষিত ছিল—আহারের স্থানে খানকতক লাঠি ছাড়া আর কিছু ছিল না। কেবল মুসলমান মেঘা পার্শ্বে তরবারি রাখিয়া অদূরে একাকী ভোজনে বসিতেছিল। বিপদ বুঝিতে পারিয়া সে বিশ্বনাথকে আপন অসি সমর্পণ করিতে গেল। বলিল, "বিশু, শেষ দিন একবার তরওয়াল ধর্। তোর মুখ চেয়ে ছয় জন আমরা এখনও ছয় শ'।" দলপতি তাহা গ্রহণ করিল না। স্থিরকণ্ঠে বলিল, "আর বাঁচার চেষ্টা বৃথা! মা কালী অপ্রসন্ন না হলে আজ ইঁদুরের মত কলে পড়তাম না। স্বপ্নে ক'দিন তাঁর ভ্রুকুটিই দেখ্‌চি! তোদের যা ইচ্ছে হয় কর, আমি বাঁচবার জন্য একটি আঙুলও আর তুলব না।" মেঘা গর্জ্জিয়া উঠিল। "চিরদিন তোকে মাথার মণি ভেবেচি, আজ আর কি বল্‌ব বল্। নিজের দোষে মর্‌লি। নিজে লাঠি তরওয়াল না ধরিস্, আমায় একবার হুকুম দে বিশু!" বিশ্বনাথ সমাগত সাহেবদের ভিতর ফেডি সাহেবকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল,—মেঘার কথার উত্তর দিল না। হতাশ্বাস হইয়া মেঘা বলিল, "তবে তুই ধরা দিবি দে, আমি কিন্তু কাফেরের হাতে মরব না।" তখন মেঘা দৃঢ়হস্তে চিরজীবনের সঙ্গী সেই তীক্ষ্ণধার অসিফলক আমূল আপনার বুকে বসাইয়া দিল।

মেঘাকে ফেডি সাহেবের খুব মনে ছিল; স্বহস্তে তাহার মাথাটা শরীরচ্যুত করিতে পারিলে, তবে তাঁর রাগ যাইত। বেগে তিনি তাহার বিমুক্তপ্রাণ ভূপতিত দেহের দিকে ছুটিয়া গেলেন। বিশ্বনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "হাঁ, ঐ মরা মানুষকে ঘা কতক লাথি মার্‌তে না পার্‌লে তুমি ঠিক হতে পার্‌চ না! মনে পড়ে ফিরিঙ্গি, ওই সেই তরওয়াল খানা? মনে পড়ে সেই কসম, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের যে ঈশ্বর, তিনি সাক্ষী, তুমি আমাদের কোন মন্দ কর্‌বে না? ছি, ছি, সাহেব, ইংরেজ জেতের তুমি মুখ হাসালে?" সামুয়েল ফেডি এই শ্লেষবাক্যে মাটী হইয়া গেলেন, নতমুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—আর অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া ইলিয়ট ও ব্লাকুয়ার বিস্মিত হইয়া পর-

হইতেছিল। বিশ্বনাথ কহিল, "বুঝেছি, নিজের বীরত্বের কথা তোমাদের বল্‌তে ফেডি সাহেবের সাহসে কুলোয় নি। শপথ করে আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে আজ আমাদেরই ধরিয়ে দিতে এসেছেন! কেমন ফেডি সাহেব, মিথ্যা বল্‌চি কি?"

ফেডি চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "কি ছার এ প্রাণ ফিরিঙ্গি, বিশে পরশু মর্‌তো, না হয় কাল মরবে! বিশে ডাকাত কিন্তু ডাকাতি করে কখন নিজের পেট পূরোয় নি, কখন তোমার মত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নি!"

তখন বিশ্বনাথ ইলিয়ট সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। বলিল, "আমার আয়ু শেষ হয়েচে। যে কোন শাস্তির জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।"

পরিশিষ্ট।

তার পর ইংরেজের বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার সহচরদের ফাঁসি হইয়াছিল। ঠগবগের খালের মাঠে যে বট গাছে ইহা সম্পাদিত হয়, আজও তাহা শ্রান্ত পথিকদের সুশীতল ছায়া দান করিতেছে। হণ্টার সাহেব বলেন, দস্যুদের মৃতদেহ লোহার পিঞ্জরে পুরিয়া এই গাছে লটকাইয়া দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য,—দেখিয়া কুকর্ম্মীদের চৈতন্য হইবে। জনশ্রুতি বলিতেছে, "বিশ্বনাথ ফাঁসির আগে বলে, 'গোয়ালাকে কেউ কখন বিশ্বাস করো না ভাই!' তার মা সাহেবের কাছে ছেলের মৃত্যুর পর হাড়গুলি চাহিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। সাহেবেরা বাক্সবন্দী করিয়া সেগুলি স্থানান্তরিত করেন। মা নাকি বলিয়াছিল যে, হাড় পাইলে বিশুকে সে আবার বাঁচাইতে পারিবে।" *

ইলিয়ট সাহেবের কৃপায় বিনোদবিহারী বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। প্রত্যাখ্যাতা পত্নীকে সযত্নে গৃহে লইয়া গিয়া, শেষজীবন তিনি সুখ শান্তিতে যাপন করেন। সরলার মধুর চরিত্রগুণে তাঁহার তেমন অশান্তির সংসারও অতঃপর সুখের হইয়াছিল। মীরাকে সরলা জীবনে কখন ভুলে নাই। গঙ্গা-স্নানোপলক্ষে প্রতি বৎসর সরলা তাহার কাছে মাস খানেক কাটাইত।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সম্পূর্ণ।

---

* বালক; ৫১৩ পৃষ্ঠা, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা, ১২৯২।

ভট্টনারায়ণের বংশাবলী।

"বেণীসংহার" নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণের নাম কে না জানেন? কি কাব্যকলায়, কি রচনাপারিপাট্যে, কি চরিত্রসৃষ্টিতে, কি বিবিধ রসের অবতারণায়, সকল বিষয়েই এই নাটকখানি সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। ইহা বাঙ্গালীরও গৌরব; কারণ, প্রবাদ এই যে, নাটককার বঙ্গাধিপতির আশ্রিত ছিলেন, এবং নাটকখানি বঙ্গদেশেই রচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নাটককার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা নাটকখানির কোনও সমালোচনা করিব না; কারণ, ইহার সমালোচনা অনেক হইয়াছে। অথচ নাটককারের আবির্ভাব-কাল বা তাঁহার বংশাবলী নিরূপণ করিতে কাহারও আগ্রহ দেখি নাই। যাঁহারা প্রয়াস করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল ভ্রমসঙ্কুল হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সফল হইবে, আমাদের এরূপ অভিমান নাই। তবে, আলোচনাই সত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায়, সেই জন্য আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এরূপ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তাহার কারণ, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এসময়কার প্রামাণিক কোনও ইতিহাস নাই। সুতরাং জনপ্রবাদ, তাম্রশাসন বা সমসাময়িক লেখকের গ্রন্থে উল্লেখাদি, এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথের ক্ষীণ আলোক;—সুতরাং পদে পদে পদস্খলন হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, গৌড়ের প্রথম নৃপতি আদিশূর পুত্রার্থে পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ না থাকায়, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইয়াছিল। ইহাঁরা নিপুণ পণ্ডিত, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপে কুশল, এবং পরম কুলীন ছিলেন। রাজা ইহাঁদের বাসার্থ ব্রহ্মত্র ভূমি দিয়া বঙ্গদেশেই বাস করান। সেই অবধি ইহাদের বাঙ্গালায় বাস, এবং বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণের ইহাঁরাই আদিপুরুষ। ইহাঁদের সঙ্গে যে ভৃত্যগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কুলীন কায়স্থের আদিপুরুষ। এই পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ।

এখন, ইহা প্রবাদমাত্র। ইহা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কুলাচার্য্যগণের বচনমাত্র প্রমাণ। দুঃখের বিষয়, সকল সময়ে কুলাচার্য্যগণের বচন আবার সত্যের অবিরোধী নহে। সুতরাং সর্ব্বত্র কুলাচার্য্যের বচন প্রমাণ নহে। এই আদিশূরের আবির্ভাবকাল লইয়াও প্রত্নতত্ত্বান্বেষীদের মধ্যে অনেক বিবাদ দেখিতে পাই। সে মতসমুদ্রের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে চাহি না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত প্রামাণিক এবং খুব সম্ভব সত্য, এরূপ আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারিত আদিশূরের রাজত্বকালের সময় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আমরা এ বিষয়ের বিচার করিব।

সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রসঙ্গক্রমে এ কথার আলোচনা করিয়াছি। হলায়ুধের জীবনীসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া জানিতে পারি, হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের বংশধর। হলায়ুধ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছি। * পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার "সম্বন্ধনির্ণয়" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, যে হলায়ুধ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। পণ্ডিত মুকুন্দরাম বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বেণীসংহারের সংস্করণে হলায়ুধকে ষোড়শ পুরুষ করিয়াছেন। আই, সি, বসু কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঠাকুরবংশীয় তালিকাতেও এইরূপ করা হইয়াছে। এই তালিকা আমরা দেখি নাই। তবে, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যে সকল কারণে উহা ভ্রমাত্মক স্থির করিয়াছি, তাহা রিবিউ পত্রে সবিস্তারে বিবৃত আছে বলিয়া, এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। সম্প্রতি হলায়ুধের গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রদ্ধাস্পদ স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পাদিত একখানি "কবিরহস্য" প্রাপ্ত হই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর, এ পুস্তক নয়নগোচর হইয়াছিল; নচেৎ হলায়ুধের জীবনীর আলোচনাকালে এ পুস্তকের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতাম। কবিরহস্যের ভূমিকায় সম্পাদক এক বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকার অদ্ভুত বিবরণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল, তাহা স্বয়ং সম্পাদকই বলিতে পারেন। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যের কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ এরূপ ভ্রমাত্মক বংশতালিকা আমরা অধিক দেখি নাই। আমাদের সংগৃহীত বংশতালিকা

হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; সুতরাং আমাদের মতস্থাপন করিতে হইলে উহার আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের বংশতালিকা প্রথমে প্রদত্ত হইল।

১। ভট্টরামেশ্বর—	৯৪১	খৃঃ
২। ভট্টনারায়ণ	৯৬১	"
৩। ভট্টরামকৃষ্ণ	৯৮১	"
৪। ভট্টকমলাকর	১০০১	"
৫। মহেশ্বর	১০২১	"
৬। ধনঞ্জয়	১০৪১	"
৭। হলায়ুধ	১০৬১	"

এই বংশতালিকা ইহাঁদের স্বরচিত গ্রন্থশেষে নিবিষ্ট বংশাবলীপরিচয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে ৯৮৬ খৃঃ সম্পাদিত হয়। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জে গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। আর বেণী-সংহারের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিবার সময় তাঁহার অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অন্যায় নহে। এ কারণে আমরা তাঁহার জন্মকাল ৯৬১ খৃঃ স্থির করিয়াছি। তাহার পর বাল্যবিবাহের সমাজে গড়ে ২০ বৎসর পরে প্রত্যেক পুরুষের জন্মকাল স্থির করা অসঙ্গত নহে।

এখন নিম্নে স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রদত্ত তালিকা আলোচিত হইতেছে। তিনি একটি ধারাবাহিক তালিকা না দিয়া আরও গোল বাধাইয়াছেন। তিনি হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ বলিয়াছেন। তজ্জন্য কোনও প্রমাণপ্রয়োগ বা অনুক্রমিক কোন তালিকা-প্রদান অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন। তবে, তাঁহার ভূমিকা হইতে নিম্নলিখিত-প্রকার অসম্পূর্ণ তালিকা গঠিত হইতে পারে :—

১। ভট্টনারায়ণ।
(মধ্যের পুরুষের কোন উল্লেখ নাই)
|
ধরণীধর—বনমালী
|
(কোন উল্লেখ নাই)
|
ধনঞ্জয় (নিঘণ্টু প্রণেতা)
|

উপরের প্রদত্ত তালিকার কেবল হলায়ুধ পর্য্যন্ত আপাততঃ আলোচিত হইবে। স্তার শৌরীন্দ্রমোহনের তালিকা সম্বন্ধে পাঠকেরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন; কারণ সেই গুলিতেই তাঁহার ভ্রম সম্যক লক্ষিত হইবে। সে বিষয়গুলি এই;—

১। তিনি হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণ হইতে ষোড়শ পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (অথচ হলায়ুধের পিতামহের নামোল্লেখ ব্যতীত মধ্যেকার পুরুষগুলির নামোল্লেখ মাত্র করেন নাই।)

২। তিনি হলায়ুধকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (অথচ আদিশূরের বা ভট্টনারায়ণের আবির্ভাবসময়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই)

৩। তিনি বনমালীকে ধরণীধরের ভ্রাতা এবং "দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণরহস্য" নামক গ্রন্থের রচয়িতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিগর্ত্তাধিপতি জয়চন্দ্রের (জয়ন্তচন্দ্র ?) অনুরোধে লিখিত হয়।

৪। তিনি ধনঞ্জয়কে ধরণীধরের পৌত্র, নিঘণ্টু-গ্রন্থকর্ত্তা এবং বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার স্থির করিয়াছেন।

আমরা দেখাইব, তাঁহার উক্ত মতের অধিকাংশই ভ্রমাত্মক।

প্রথমে, আমাদের সময়নির্দ্ধারণের প্রণালী বিবৃত করি। ১ম—যাঁহাদের জীবনী আলোচিত হইবে, যদি তাঁহাদের বা তাঁহাদের বংশধরগণের লিখিত কোন বংশবিবরণ থাকে, আমরা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব; তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিব না। ২য়—যদি কোন রাজার আজ্ঞায় তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সভাপণ্ডিত বা কবির লিখিত রাজার বা রাজার সমসাময়িক লোকদিগের ইতিহাস বা সময় নির্দ্ধারিত পাই, উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। এই জন্যই তাম্রশাসন বা প্রস্তরফলকে লিখিত কথা ইতিহাসের প্রমাণ। ৩য়—সমসাময়িক লেখকের উক্তি সময়নির্দ্ধারণে আমাদের তৃতীয় প্রমাণ। এমন হইতে পারে যে, এক বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মত পরস্পর-বিরোধী। এরূপ স্থলে যিনি সমসাময়িক, তাঁহার লেখা যত সত্য হইবার সম্ভাবনা, পরবর্ত্তী লেখকের তত নহে; এজন্য সমসাময়িক লেখকের প্রমাণ অগ্রে গ্রহণ করিব। ৪র্থ—জনপ্রবাদ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, যখন দেখিব, পরবর্ত্তী লি-

অংশ অন্ত কোন প্রমাণাভাবে গ্রহণ করিব। এখন, এই আলোচনাপ্রণালীর দ্বারা স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের তালিকার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

১। ভট্টনারায়ণ হইতে হলায়ুধ যে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ হইতে পারেন না, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুপূর্ব্বে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরাও ভিন্ন কারণে রিবিউ পত্রিকায় এই মতের সমর্থন করিয়াছি। স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের নিজের সিদ্ধান্তে ইহার ভ্রম পরে প্রমাণিত হইবে।

২। স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় মত প্রথম মতের বিরোধী। প্রথম মতে হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষোড়শ পুরুষ। অথচ দ্বিতীয় মতে তিনি হলায়ুধকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক স্থির করিয়াছেন। এখন, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের সময়, বহু বিচারের পর, মিত্র মহোদয় ৯৮৬ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। আর, হলায়ুধ তাঁহার "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থের উপক্রমণিকায় আপনাকে লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এতদধিক প্রমাণ আর নাই। এখন মিত্র মহাশয় অনেক গবেষণার পর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১১০৬) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল অনুমান করেন। যখন তাঁহার নির্দ্ধারিত আদিশূরের সময় যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন তন্নির্দ্ধারিত লক্ষ্মণসেনের সময় গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। ইহাতে হলায়ুধ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক, হলায়ুধের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে তাঁহার ও আমাদের মতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

কিন্তু ইহাতে অন্য এক আপত্তি আসিতেছে। হলায়ুধকে তিনি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ স্থির করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের ইহা বোধ হয় নিজের মত নহে—তিনি পণ্ডিত মুকুন্দরাম বিদ্যাবাগীশের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বহুপূর্ব্বে সে মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের নিজের কথায়ও ইহা খণ্ডিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি আদিশূরকে "আসীৎ পুরাস্মিন্ গৌড়দেশে" বলিয়াছেন। এই "পুরা" কালের মধ্যে মান্ধাতার রাজ্যলাভ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মৃত্যু পর্য্যন্ত অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে। সুতরাং এরূপ অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিলে ইহা প্রত্নতত্ত্বের বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। নচেৎ এই "পুরাকাল" অর্থাৎ ভট্টনারায়ণের আবির্ভাবকাল

হয়, এবং শৌরীন্দ্রবাবুর কথামত যদি হলায়ুধ একাদশ শতাব্দীর লোকই হন, তবে এই কলিযুগের পাপে স্বল্পায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও এক শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শ পুরুষের আবির্ভাবকাল কেহই স্থির করিতে পারেন না।

৩। শৌরীন্দ্রবাবু ধরণীধরকে "বৈয়াকরণসর্ব্বস্বের" গ্রন্থকার ও মনুসংহিতার "অতীবস্থবোধিনী" টীকার রচয়িতা স্থির করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই "অতীবস্থবোধিনী" টীকা সম্বন্ধে আমাদের কোনও বোধ নাই। মনুসংহিতার যতগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকারের নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে ধরণীধরের কুত্রাপি উল্লেখ দেখি নাই। আমরা রাজেন্দ্রলাল, উইবার (Weber), মিউওর (Muir), মোক্ষমুলর, কোলব্রুক ও উইল্সন্,—এতগুলি মহামহোপাধ্যায়ের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তকে ধরণীধরের নামের উল্লেখ কোথাও পাইলাম না;—বিশেষতঃ, অধ্যাপক উইবারের History of Indian Literature বা মিউর সাহেবের Sanskrit Text গ্রন্থেও ইহাঁর নাম নাই। সম্প্রতি আমাদের আফ্রেক্ট সাহেবের অমূল্য তালিকা দেখিবার সুবিধা নাই, নচেৎ ইহাতেও অন্বেষণ করিয়া দেখিতাম। সুতরাং কবিরহস্যের সংস্কৃত ভূমিকায় শৌরীন্দ্রবাবু ধরণীধরকে বিদ্যাধারী আখ্যা দিয়া, যাঁহাকে ঠাকুর মহাবংশ "উদধির" উজ্জল রত্ন স্থির করিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সুপ্রাপ্য হইলেও, তিনি যে ধনঞ্জয়ের পিতামহ, এরূপ প্রমাণিত হইতেছে না।

ধরণীধরের ভ্রাতা "আকলিত বিজ্ঞান শালী" বনমালীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বক্তব্য। তবে, ইহাঁর সময় নির্দ্দেশ করিবার শৌরীন্দ্রবাবু একটি উপায় রাখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহাঁর রচিত "দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণরহস্য" ত্রিগর্ত্তাধিপতি জয়চন্দ্রের (জয়ন্তচন্দ্র) আদেশে রচিত হয়। জয়চন্দ্রের কথা বিখ্যাত জৈনলেখক রাজশেখর তাঁহার "প্রবন্ধকোষে" উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি, পণ্ডিতবর বুলারের (Buhler) মতে, রাষ্ট্রকূট ক্ষত্রিয় নৃপতি, ও ইহাঁর অপর নাম জয়ন্তচন্দ্র। মৃত মহাত্মা রামদাস সেন "শ্রীহর্ষ" প্রবন্ধে ইহাঁর আবির্ভাবকাল ১১৬৮ খৃঃ হইতে ১১৯৪ মধ্যে স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ইনি কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু শৌরীন্দ্রবাবুর কথিত জয়চন্দ্র ত্রিগর্ত্তাধিপতি। ত্রিগর্ত্ত কান্যকুব্জ নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জয়চন্দ্র শৌরীন্দ্রবাবুর জয়চন্দ্র নহেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জয়চন্দ্রই ইতিহাসে বিখ্যাত ও পরম বিদ্যোৎ-

শ্রীহর্ষ ইহাঁর সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, রাজশেখর এরূপ বলিয়াছেন। এতৎ-পক্ষে বাধা এই যে, সময়ের হিসাব ধরিতে গেলে ধনঞ্জয়ের পিতামহ (আমাদের কমলাকর বা শৌরীন্দ্রবাবুর বনমালী, যিনিই হউন) দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক, কিন্তু জয়চন্দ্র একাদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং বনমালীকে জয়চন্দ্রের সভাসদ বা ধনঞ্জয়ের পিতামহ বলিতে গেলে, বলবত্তর প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন।

৪। তাঁহার চতুর্থ মত এই (ক) ধনঞ্জয় হলায়ুধের পিতা, (খ) তিনি বল্লাল সেনের ধর্ম্মাধিকার ছিলেন, (গ) তিনি "নিঘণ্টু" কার। এখন, ধনঞ্জয় তিনটি দেখিতেছি। এক ধনিকাপরনামা ধনঞ্জয় "দশরূপনিবন্ধের" রচয়িতা ;—তিনি মুঞ্জকিঞ্জরাজের সমসাময়িক। কোল্‌ব্রুক সাহেব উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ-গণের গণনানুসারে ইহাঁকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের (১০৪২) লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর একজন বিখ্যাত বৈদিক পরিভাষা "নিঘণ্টু"র প্রণেতা। তৃতীয় ব্যক্তি, হলায়ুধের পিতা।

ধনঞ্জয় যে হলায়ুধের পিতা, হলায়ুধের নিজের কথাই তাহার প্রমাণ। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের" প্রারম্ভে নিজের বংশের কথায় তিনি "লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াত্ত-গবতঃ" এ কথা লিখিয়াছিলেন। সুতরাং ধনঞ্জয়-নামা কোন জন তাঁহার পিতা ছিলেন, এ কথা সত্য। তবে শৌরীন্দ্রবাবু তাঁহাকে বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার ও "নিঘণ্টু"র প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতা যে বল্লালসেনের ধর্ম্মা-ধিকার বা "নিঘণ্টু-প্রণেতা, হলায়ুধ এ কথা কুত্রাপি বলেন নাই। এখন কথা হইতেছে, যে লোক নিজের পিতার নিষ্ঠার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন, যিনি নিজের রাজকর্ম্মের কথা এবং স্বীয় ভ্রাতাদের গ্রন্থের কথা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, তাঁহার পিতা যে বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার এবং "নিঘণ্টু"-নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা, তাহা লিখিতে কি আপত্তি হইতে পারে? হলায়ুধ-পিতা ধনঞ্জয় যে "নিঘণ্টু"-কার ও বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার নহেন, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইহার উত্তরে এরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত নহে যে, হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের কথা উল্লেখ করেন নাই কেন? এ কথার উত্তর এই যে, পিতার পরিচয় প্রদত্ত হইল বলিয়া কি ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষের পরিচয়ও অবশ্য প্রদত্ত হইবে? ভট্টনারায়ণ যে হলায়ুধের পূর্ব্বপুরুষ, তাহার প্রমাণ হলায়ুধের গ্রন্থে না থাকিলেও, পরবর্ত্তী লেখকের সাক্ষ্যই

ভট্টনারায়ণ হইতে হলায়ুধ পর্য্যন্ত যে কয় পুরুশ শতাব্দীর লোকই হন, দিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিলাম। ইহার প৽ এক শতাব্দীর মধ্যে ৺ আমাদের 'রিবিউ'র প্রবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই। * রেন না।

(" গ্রন্থকার ও মনুসং- রিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাধ নাই। মনুসং- ধ্য ধরণীধরের মিউওর

দার্জিলিং যাত্রা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে রবিবার রাত্রি ১১টার সময়ে যদি ৺ধ্যায়ের বঙ্গ রেলোয়ের পার্ব্বতীপুর জংশনে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইতে কাথাও দেখিতে পাইতেন, ধুতি-জামা-পরিহিত একটি লোক একটা কার্পেটের ra- হাতে লইয়া সেই ষ্টেশনের বহিঃপ্রাঙ্গনে একটু দাঁড়াইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে; কিন্তু এমনই স্থানাভাব যে, এক পাশে দাঁড়াইয়া যে দু' দণ্ড অপেক্ষা করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই;—পশ্চিমযাত্রী হিন্দুস্থানী ভায়াদের ধাক্কার চোটে স্থির থাকিবার যো নাই; ষ্টেশনটি আবার অতি ক্ষুদ্র; আরোহীদিগের দাঁড়াইবার জন্য একটি ছোট টিনের ছাদওয়ালা আবরণ আছে, তাহার মধ্যে যাত্রা শুনিবার মত গায়ে গায়ে বসিলে খুব বেশী হয় ত দুই শত লোকের স্থান হইতে পারে; কিন্তু যে সকল যাত্রী আগে হইতে ষ্টেশনে আসিয়া জমা হয়, তাহারা, পরে যে সকল যাত্রী আসিবে, তাহাদের স্থানাভাবের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হয় না;—স্ব স্ব গাঁটরী মাথায় দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়ে, আর যাহারা পরে আসে, তাহারা তাহাদিগকে একটু উঠিয়া বসিতে বা সরিয়া শুইতে অনুরোধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুই দশটা চড়া কথা শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়। আসাম অঞ্চলের গাড়ী হইতে চারি পাঁচ শত লোক প্রতিদিন এই পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে নামে, এবং তাহাদিগকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত

---

* এ প্রবন্ধে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা গেল না।

স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ত্রিগর্ত্তকে Julunder Doab বলিয়াছেন। ত্রিগর্ত্ত ঠিক জালন্ধর নহে। জেনারল্ কনিংহামের মতে ত্রিগর্ত্ত, চম্বার দক্ষিণ কাঙ্গরা ও জালন্ধরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। (Vide Arch. Survey Report and prof. Kilhorn in the "Indian Antiquary." of Jany. 1888.) ত্রিগর্ত্ত শব্দের ব্যাখ্যায় শব্দকল্পদ্রুমে আছে :—

এখানে পড়িয়া কর্ম্মভোগ করিতে হয়। দারজিলিং-যাত্রী আসামপ্রত্যাগত লোককে ত প্রায় সমস্ত রাত্রিই প্রকৃতির নিরাবরণ নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে কাটাইতে হয়। পশ্চিম হইতে মনিহারীঘাট দিয়া যাঁহারা দারজিলিং যান, তাঁহাদেরও সেই দশা।

এই লোকতরঙ্গের মধ্যে আমি আমার ছোট কার্পেটের ব্যাগটি হাতে করিয়া এদিক্ ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, কৃষ্ণপক্ষের অপূর্ণ-চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে অনেক দূর উঠিয়াছিল, তাহাতে সুদূরবর্ত্তী ছায়ামণ্ডিত কাননশ্রেণী, শ্যামল মাঠ, শস্যক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ, ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং চক্রঘর্ষিত লৌহপথের উপর ম্লান চন্দ্রের বিক্ষিপ্ত রশ্মিজাল পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল। চারি দিক নিস্তব্ধ; যাত্রীরা কেহ শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, কেহ বসিয়া ঢুলিতেছে, কেহ বা স্থানাভাবে আমারই মত এদিকে ওদিকে পায়চারি করিয়া প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিতেছে, এবং যখন ঘুরিতে ঘুরিতে ষ্টেশনের মধ্যে আসিতেছে, তখনই টেলিগ্রাফ আফিসের 'খট্ খট্' 'খটাখট্' শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; দুই একটা কেরোসিনের আলো যেন নিদ্রিত ষ্টেশনের উপর পাহারা দিতেছে ও পাথুরিয়া কয়লার একটা উগ্রগন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছে; মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এক একটা বাতাসের হিল্লোল বৃক্ষপত্রগুলিকে আন্দোলিত করিয়া যাইতেছে, আর দুই চারিটা শুষ্ক পত্র শর শর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

আজ রাত্রে আর নিদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত অভ্যর্থনা করিতে পারিব না, তাহা জানি; কিন্তু কতক্ষণ এমন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইব? ঘুরিতে ঘুরিতে বিরক্তি বোধ হওয়াতে কোথায় একটু বসিয়া বিশ্রাম করি, এই কথা ভাবিতেছি,—এমন সময় দেখিলাম, ষ্টেশনের একটি বাবু একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া ষ্টেশনের একটা কামরায় প্রবেশ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে মুরুব্বি ধরিলাম, তিনি টিকিট-পরীক্ষক, বুকিং-ক্লার্ক বা সেই শ্রেণীর আর কিছু হইবেন। আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বাঙ্গালা কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মধ্যশ্রেণীর আরোহীদিগের বিশ্রামের জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে কি?' তিনি আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া তাঁহার অভ্রান্ত 'রেলোয়ে-ব্যাকরণ'-সঙ্গত ইংরাজিতে বলিলেন, yes, why remains not? বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিলেন।

চলিলাম। গিয়া দেখি, অন্ধকারে একখান বেঞ্চির উপর সাত আট জন লোক অতি কষ্টে বসিয়া আছেন। সে উপবেশন বিড়ম্বনা ; আমার এ ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা অনেক কষ্টকর ; তবে, বসিতে পাইয়াছি, শুধু এই টুকু সান্ত্বনাতে বোধ হয় তাঁহাদের সে কষ্ট অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল ; সেখানে ত তিলমাত্র স্থান নাই, সেখানে আর নিরর্থক চেষ্টা করিয়া কি হইবে ভাবিয়া বারান্দার দিকে চলিলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটির লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, একদল লোক নানারকম ভঙ্গীতে বসিয়া আছে ;—বারান্দায় উঠিবার পর্য্যন্ত যো নাই, কাহাকেও ঠেলিয়া উপরে উঠিতেও প্রবৃত্তি হইল না। বাবুটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া "Can't help Babu" বলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে অন্য দিকে সরিয়া পড়িলেন ; কিন্তু তিনি রেলের বাবু হইয়াও আমার জন্য যতটুকু আয়াস স্বীকার করিলেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ত্রুটী করিলাম না ; বুঝিলাম, আজকার রাত্রি Stand up হইয়াই কাটাইতে হইবে। এখন সমস্যা,—ব্যাগটি কোথায় রাখি ?

অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলাম, একটি ভদ্রলোক এক পাশে একটা ষ্টীলট্রঙ্কের উপর বসিয়া আছেন ; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিলাম, তিনি পাটনা হইতে আসিতেছেন, জলপাইগুড়ি যাইবেন, পাটনা কালেজে তিনি পড়েন ; তাঁহারই জিম্মায় আমার ব্যাগটি রাখিয়া আমি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক স্থানে দেখি, একজন টিকিট-সংগ্রাহক একটি স্ত্রীলোককে বলিতেছেন,—"তুম্‌কো মোকামা যানে হোগা"। স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"নেহি যায়েঙ্গে"। উক্ত টিকিট-কলেক্টরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এ স্ত্রীলোকটির through ticket মোকামা পর্য্যন্ত, কিন্তু যাইতে চাহে না, দারজিলিং যাইতে চাহিতেছে ;—এই বলিয়া তাহার টিকিটখানা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন ; স্ত্রীলোকটির বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, হিন্দুস্থানী ;—আমি দেখিলাম, সে একজন পুরুষের কাছে গিয়া বসিল, তাহার সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। জানা গেল, তাহার হাতে একটাও পয়সা নাই, সে আসামে চা-বাগানে গিয়াছিল, এগ্রিমেণ্ট শেষ হওয়ায় চা-বাগানের কর্ত্তারা তাহাকে দেশ পর্য্যন্ত টিকিট ও রাস্তাখরচের পয়সা দিয়াছেন,

দুটি স্ত্রীলোক দেখিলাম। আমি সহজেই বুঝিলাম, এ কোন কুলীসংগ্রাহক দলের আড়কাটী। জেরায় প্রকাশ হইল যে, সে দারজিলিংএর কোন চা-বাগানের সর্দ্দার। এ স্ত্রীলোকটিকে সে কেন লইয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করায়, সেই পুরুষটি উত্তর করিল, সে কেন তাহাকে লইয়া যাইবে?—স্ত্রীলোকটিকে এই আড়কাটীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল, পুরুষটিকে অনেক করিয়া বলিলাম, কিন্তু তাহার এই ব্যবসা, তাহাকে অনুরোধ করা নিষ্ফল, চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না। সুতরাং আমি সেই টিকিট-কালেক্টরের নিকটে গিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি ভদ্রলোক, সকল অবস্থা বুঝিয়া দুই জন পাহারাওয়ালার নিকট স্ত্রীলোকটিকে জিম্মা করিয়া দিলেন, এবং সেই আড়কাটীটাকে শিলিগুড়িগামী একখানি লোকাল ট্রেনে (তখন সেই প্ল্যাটফর্ম্মে ছিল) তুলিয়া দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে যখন দারজিলিংএর গাড়ীতে উঠি, তখন সেই আড়কাটী ও তাহার সঙ্গী স্ত্রীলোক দুটির একটিকে দেখিলাম। যাহা হউক, সেই স্ত্রীলোকটি রক্ষা পাইয়াছে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল।

দারজিলিংএ পৌঁছিয়া তাহার পর দিন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছি, মেলট্রেন আসিতেছে। ষ্টেশনে দেখি, সেই সর্দ্দার দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিলাম, সে বুঝি কোন কাজে আসিয়াছে, কিন্তু তখনই হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হইল,—হয় ত আজ সেই স্ত্রীলোকটি আসিবে, তাহার সঙ্গের দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটিকে হয় ত সেই জন্য রাখিয়া আসিয়াছে; যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক; সেই হতভাগিনী তাহার সঙ্গের দ্বিতীয় স্ত্রীলোক-টির সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিল, এবং কোন দিক দিয়া যে লোকারণ্যে মিশিয়া গেল, তাহা দেখিতে পাইলাম না।

পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে অনেক কীর্ত্তি দেখিলাম, তাহা লিখিতে গেলে ফুরায় না; টিকিট লইবার ভয়ানক গোল, ততোধিক বেবন্দোবস্ত। একটি বাবু চশমা নাকে লাগাইয়া টিকিটঘরে ঘুমাইতেছেন, শেষরাত্রে গাড়ী আসিবে, গাড়ী আসে আসে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিকট নিদ্রা আর ভাঙ্গে না! এত গোলমালে, এমন একটা কর্ত্তব্য মাথায় লইয়াও মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারে!—বুঝিলাম, এই প্রাত্যহিক কার্য্যে এই সমস্ত গোলমাল, এই রকম হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাত্রীরা যতই

নিদ্রা ততই গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। অনেক যাত্রীরই through ticket আছে বটে, কিন্তু অনেকেই এখানে টিকিট লইবে, আমাকেও টিকিট করিতে হইবে। একজন যাত্রী তাঁহাকে কয়েক বার জোরে জোরে ডাকিতেই তিনি "কোন্ হার, ক্যা মাঙতা ?" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হুঙ্কার শুনিয়া যে তাঁহাকে ডাকিয়াছিল, সে নিস্তব্ধ হইল; কিন্তু আমার আর সহ্য হইল না, আমি বলিলাম, "মাঙতা আর কি, মাঙতা টিকিট, আপনি এমন কি কল্পতরু যে, এই রাত্রিশেষে লোকে আপনার কাছে অন্ন দৌলত মাঙ্গতে আসবে ? এখন একবার উঠে টিকিট ক'খানা দিলেই আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হই।"—কিন্তু আমাদের এই রকম আপ্যায়িত করাটা তিনি সম্পূর্ণ বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। তখন আমি উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং আমার পূর্ব্বপরিচিত টিকিট-কালেক্টরকে বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের টিকিট-বাবুর নিদ্রাভঙ্গের ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না, এ দিকে গাড়ী আসিয়া পড়িল, আমরা যাহাতে টিকিট পাই, তাহার একটা উপায় করুন।" তিনি অবিলম্বে আমাকে সঙ্গে লইয়া আফিসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আমাকে একখানা রিটার্ণ টিকিট দিলেন। শেষে দেখি, সেখানি দারজিলিংএর নয়, শিলিগুড়ির রিটর্ণ টিকেট। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় টিকিটক্লার্ক বলিলেন, "আপনি ফের সেখান হতে টিকিট ক'রে নেবেন।"—আমি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে সে টিকিট পাওয়ার বাধা কি ?" লোকটা অভদ্রভাবে উত্তর করিল যে, আমার সুবিধা অসুবিধার জন্ম রেল কোম্পানীর নিয়ম পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; নিয়ম!—এ কি রকম নিয়ম ? আমি টিকিট লইলাম না; বলিলাম, আমি কখন শিলিগুড়ির টিকিট লইব না, যাব দারজিলিং, মধ্যের একটা ষ্টেশনের টিকিট কেন লইব ? সে তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজীতে সাহেবিয়ানা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, আমাকেও অগত্যা দুই চারিটা ইংরাজী বাৎ ঝাড়িতে হইল। আমার উচ্চকণ্ঠ ষ্টেশনমাষ্টারের কর্ণগোচর হইল, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমার রৌদ্ররসসিক্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি "ক্যা মাঙ্গতা" হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে আদ্যোপান্ত বলিলাম। শুনিয়া ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব তাঁহার সেই কর্ম্মচারীর উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং আমাকে আমার প্রার্থনা অনুসারে দারজিলিংএর টিকিট কেন দেওয়া হয় নাই,

আমাকে দারজিলিংএর রিটর্ণ টিকিট দিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। লোকটা কিছু অপ্রস্তুত হইল; বলিল, দারজিলিংএর টিকিট দিলে সেই শিলিগুড়ীর টিকিটখানা আর বিক্রয় হইবে না, সেখানার দাম তাহাকেই নিজের পকেট হইতে দিতে হইবে। শুনিয়া আমি নিরস্ত হইলাম, ভাবিলাম, তাহার ক্ষতি করা অপেক্ষা শিলিগুড়ীতে আমার একটু অসুবিধা ভোগ করা ভাল। এই ভাবিয়া শিলিগুড়ীর টিকিটখানা লইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। তখন দেখি, লোকটা কিঞ্চিৎ ভদ্রতা করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়াছে! আমিও তাহাকে দুই একটা মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিলাম।

শিলিগুড়ী পঁহুছিয়া গাড়ী বদল করিতে হয়। এখান হইতে দারজিলিংএ যে গাড়ী যায়, সেগুলি ছোট ছোট, ট্রামকারের মত গাড়ী;—তাহাতে ভাল করিয়া বসিবারই সুবিধা নাই, বাক্স পেটারা রাখা ত দূরের কথা! যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, সুখনা ষ্টেশন পর্য্যন্ত সমভূমি, সেখান হইতেই উপরে উঠিতে হয়; শুনিয়াছিলাম, দারজিলিং রেল ইন্‌জিনিয়ারিং কৌশলের চরম আদর্শ, দেখিয়াও তাহাই বোধ হইল। ছোট একখানা এন্‌জিন বীরদর্পে গাড়ী গুলি লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছে,—ঠিক যেন একটি পিপিড়ার সারি। গাড়ী হইতে মাথার উপরে একটা রেল দেখা যাইতেছে সেইখানে যাইতে হইবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যাইবার যো নাই, পনের মিনিট ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে। রাস্তায় সর্ব্বসমেত পাঁচটা 'লুপ' আছে।

সমভূমির সাধারণ গাড়ীর ন্যায় এই পার্ব্বত্য গাড়ীগুলি সুরক্ষিত ও কাষ্ঠাবরণবেষ্টিত নহে। তবে বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরদা খাটান আছে, এই পরদা গুলি অনেকটা ট্রামকারের পরদার মত।

আমরা ক্রমে স্বর্গে উঠিতে লাগিলাম। সমতলভূমি ক্রমে ছোট এবং তাহার অঙ্কশায়ী বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। নীচে সবুজ ক্ষেত্র, সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী, তাহাদের অন্তরালগুপ্ত নির্ঝরপ্রবাহ, শ্যামল শৈবাল এবং অসংখ্য ফারণের বন, এ সকলের ঊর্দ্ধদেশে আমাদের গাড়ী পাহাড়ের বুকের উপর দিয়া লৌহপথ বাহিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা বিস্ময়পূর্ণনেত্রে খমণ্ডলচারী বেলুনবিহারীর ন্যায় নিম্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, বৃহৎ বৃক্ষের

অনেক ষ্টেশন পার হইয়া চলিলাম ; তিনদরিয়া ষ্টেশন দারজিলিং রেলোয়ের কারখানা। তিনদরিয়া হইতে নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় ;—অতি সুন্দর দৃশ্য, দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, এবং এই অবর্ণনীয় অসামান্য সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না,—শুধু আত্মীয় স্বজনকে চোখ ভরিয়া দেখাইতে সাধ যায় ! মনে হয়, আমরা একা এ সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী নহি। যতই নূতন নূতন ষ্টেশন ছাড়াইতে লাগিলাম, ততই নব নব দৃশ্য, অভিনব শোভা, বিচিত্র আকারের গাছ, লতা পাতা, বাড়ী, পথ, এবং বাগান। যেন পৃথিবী ছাড়াইয়া স্বর্গের তোরণদ্বারে প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে সুকৌশলচিত্রিত নব নব দৃশ্যপট উন্মুক্ত দেখিতেছি, একখানির পর অন্যখানি, চক্ষু ফিরাইতে হইতেছে না, আপনি সরিয়া যাইতেছে, সুতরাং দৃষ্টিশক্তি ক্লান্ত হইতেছে না, বরং আগ্রহ আরও বাড়িতেছে ; জানি না, এইরূপে দিবস শেষ করিয়া দিবাবসানে কখন সেই সুখ, ঐশ্বর্য্য এবং গরিমার লীলানিকেতন দারজিলিংএর অভ্যন্তরে আমাকে ও আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাটিকে বহন করিয়া ট্রেন আসিয়া থামিবে !

কর্শিয়ং ষ্টেশনটা খুব জাঁকাল। পাহাড়ের উপর নানা আকারের অনেক বাড়ী, অধিকাংশই সাহেবদের বাড়ী ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই বাড়ীগুলিকে দেখিয়া একটা কিছুর সঙ্গে উপমা দিবার ইচ্ছা হয় ; মনে হয়, এ যেন কৈলাসপুরী ; পরক্ষণেই মনে হয়, না, ইহা তেমন শান্তিপূর্ণ, তেমন পবিত্র নিস্তব্ধ, ছায়াচ্ছন্ন, মাতা পার্ব্বতীর স্নেহরসার্দ্র নহে। ইহা যেন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অলকা, অজস্রধারে বিলাসিতা শুভ্র কাচপাত্রে লোহিত মদ্যের মত কানায় কানায় উছলিয়া উঠিতেছে ; এবং বোধ হইতেছে, বড় বড় হোটেল হইতে পলাণ্ডুখচিত মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন, শুভ্রবস্ত্রপরিবৃত টেবিলের সুগন্ধি-কুসুম-সমাচ্ছন্ন পুষ্পাধারের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক মিশ্র সুরভিতে পার্ব্বত্য নগরটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দোকানগুলিতে নানারকমের জিনিষ প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে ট্রেন বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, অর্দ্ধ মাইল পরেই ক্ল্যারেণ্ডন্ হোটেল ষ্টেশন। এটা ঠিক ষ্টেশন নহে, গাড়ী থামে বলিয়াই ষ্টেশন বলিলাম। এখানে আসিয়া গাড়ী থামিলে, দলে দলে সাহেববিবি গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষুধার্ত্ত পঙ্গপালের ন্যায় অন্ধ আবেগে হোটেলে প্রবেশ করেন ; ইহাদের আহার শেষ না হইলে ট্রেনের সাধ্য কি, তাঁহাদের অসম্মান করিয়া

নামিয়া আহারাদি করিয়া, তাহার পর হাঁটিয়া আসিয়া ক্লারেণ্ডন হোটেলে যেন ট্রেন ধরিতে পারা যায়।

সাহেবেরা এখানে আসিয়া বেশ আহারাদি করিয়া থাকেন; আমরা শাস্ত্র ও দেশাচার-শাসিত বাঙ্গালী, আমাদের অদৃষ্টে শক্ত পুরি আর শুষ্ক আলু-ভাজা; দাড়িওয়ালা বাবুর্চির হস্তরচিত মোগলাই খানা এবং নিষিদ্ধ পক্ষিমাংস ছাড়িয়া এই বাসি লুচি এবং কাঠখোলায় ভাজা দগ্ধপ্রায় আলুর টুকরা খাইলে মোক্ষলাভ হয় কি না, জানি না; কিন্তু উদরাময় হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনাহারেই দিনপাত করা শ্রেয়স্কর মনে করিলাম। ক্ল্যারেণ্ডন হোটেলের কাছে সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। কর্শিয়ং অঞ্চলে অনেক সাহেব লোক আজ কাল বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা চলিতেছি, গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশই উপরে উঠিতেছে। বেশ রৌদ্র আছে; কিন্তু বেলা যতই কমিতেছে, শীত ততই বাড়িতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে দেশে ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল, গায়ে ফুরফুরে পাতলা চাদর রাখা ভার, আর ইহারই মধ্যে শীতে হৃৎকম্প উপস্থিত! গায়ের উপর সমস্ত শীতবস্ত্রগুলি আঁটিয়াও মনে হইতেছে, আরও কিছু হইলে সুবিধা হইত। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই বেশী ঠাণ্ডা,—এই সহজ প্রাকৃতিক সত্যটা পদার্থবিজ্ঞানের পৃষ্ঠাতেই পড়া ছিল, আজ হাতে কলমে তাহার পরীক্ষা হইল। চারি দিক স্তব্ধ, কোথাও কোন শব্দ নাই, শুধু ক্ষুদ্র এঞ্জিন খানা গর্জ্জন করিয়া চলিতেছে, কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে; দূরে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তাহার পর অভ্রভেদী অসংখ্য শৃঙ্গ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শিরোদেশে বৃক্ষলতা-শৈবালশূন্য শুভ্র জমাট বরফস্তূপ, তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া চিক চিক করিতেছে;—দেখিয়া শুধু অবাক্ হইয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু সেই দূরদূরান্তরন্যস্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের বিরাট মহিমা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যদি অদূরবর্ত্তী রেলপথের উপর স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলেও মনে অল্প বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না, সেই সঙ্গে মনে ভয়েরও উদ্রেক হয়। এত উপর দিয়া মানুষে পাথর কাটিয়া তাহার উপর রেল বসাইয়া গিয়াছে, ইহা কি অল্প অধ্যবসায়? পর্ব্বতের দুরভিগম্য প্রদেশে কঠিন পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, নরহস্তের অঙ্কিত এই সকল কীর্ত্তি দেখিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য বলিয়া মনে হয়। পার্শ্বস্থ গভীর খদের কিম্বা নিম্নতলবর্ত্তী অধিত্যকার এত নিকট দিয়া রেলের

খদের মধ্যে গিয়া পড়িব, নীচে সেই মহান্ধকারময় গুহায় একবার পড়িলে চিরজীবনের মত সখ মিটিয়া যাইবে, হাড় ক'খানারও কেহ খোঁজ পাইবে না।

ঘুম ষ্টেশন পর্য্যন্ত উঠিয়া গাড়ী আবার নীচে নামিতে লাগিল। শীঘ্রই আমরা দারজিলিংএ আসিয়া হাজির হইলাম। তখন আর বেশী বেলা নাই, চারি দিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। এ সময় এমন নিবিড় কুয়াসা সমতল প্রদেশে —অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশের কোথাও দেখা যায় না। আমার যে বন্ধুটি ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন কথা ছিল, তিনি আসেন নাই। কত জনকে কত জন অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন;—হাস্য, করকম্পন, নমস্কার, গল্প, চারি দিকে কতরকমের প্রীতিসম্ভাষণ চলিতেছে, তাহার মধ্যে আমি একাকী, আমার পরিচিত কেহই নাই। মনে বড় কষ্ট বোধ হইল। এমন একা ত অনেককাল হইতেই পাহাড়ে বেড়াইয়াছি, তখন একা বলিয়া কোন চিন্তা ছিল না, আজ এমন হইল কেন?—কেন তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না; বুঝি সে সময় কোন পরিচিত ব্যক্তির, কোন বান্ধবের প্রীতি অভ্যর্থনার আশা ছিল না; যেখানে অর্দ্ধচন্দ্রের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিতে পাইলেই কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। কিন্তু এবার আমার আশাভঙ্গেই বুঝি এই দুঃখ; অতএব আশা জিনিসটাই খারাপ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেশনে একটু অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কুয়াসাও কাটে না, পথও দেখা যায় না; অবশেষে তাহারই মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পোষ্ট আফিসের নিকট বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, তাঁহারা আমার পত্র পান নাই। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, মনের মধ্য হইতে একটা মস্ত ভার দূর হইয়া গেল; বুঝিলাম, আর যাহাই হউক, আমার বন্ধুটির ইহাতে কোন অপরাধ নাই। আমাকে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বন্ধুটি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শুধু আনন্দে চলে না, আমার এদিকে পরিপূর্ণ অনাহার; সেই অপরাহ্নেও স্নান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, Bath-roomএ প্রবেশ করিয়া গরম জলে বেশ ভাল করিয়া স্নান করিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া দেখি, তখনও ঘণ্টাখানেক বেলা আছে; তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনিদ্রা, অনাহার ও গাড়ীতে দারুণ কষ্টের পর, স্নানাহারশেষে কোথায় চরাই টানিতে টানিতে খোসগল্প করিব, অথবা লেপ টানিয়া নিদ্রাদেবীর
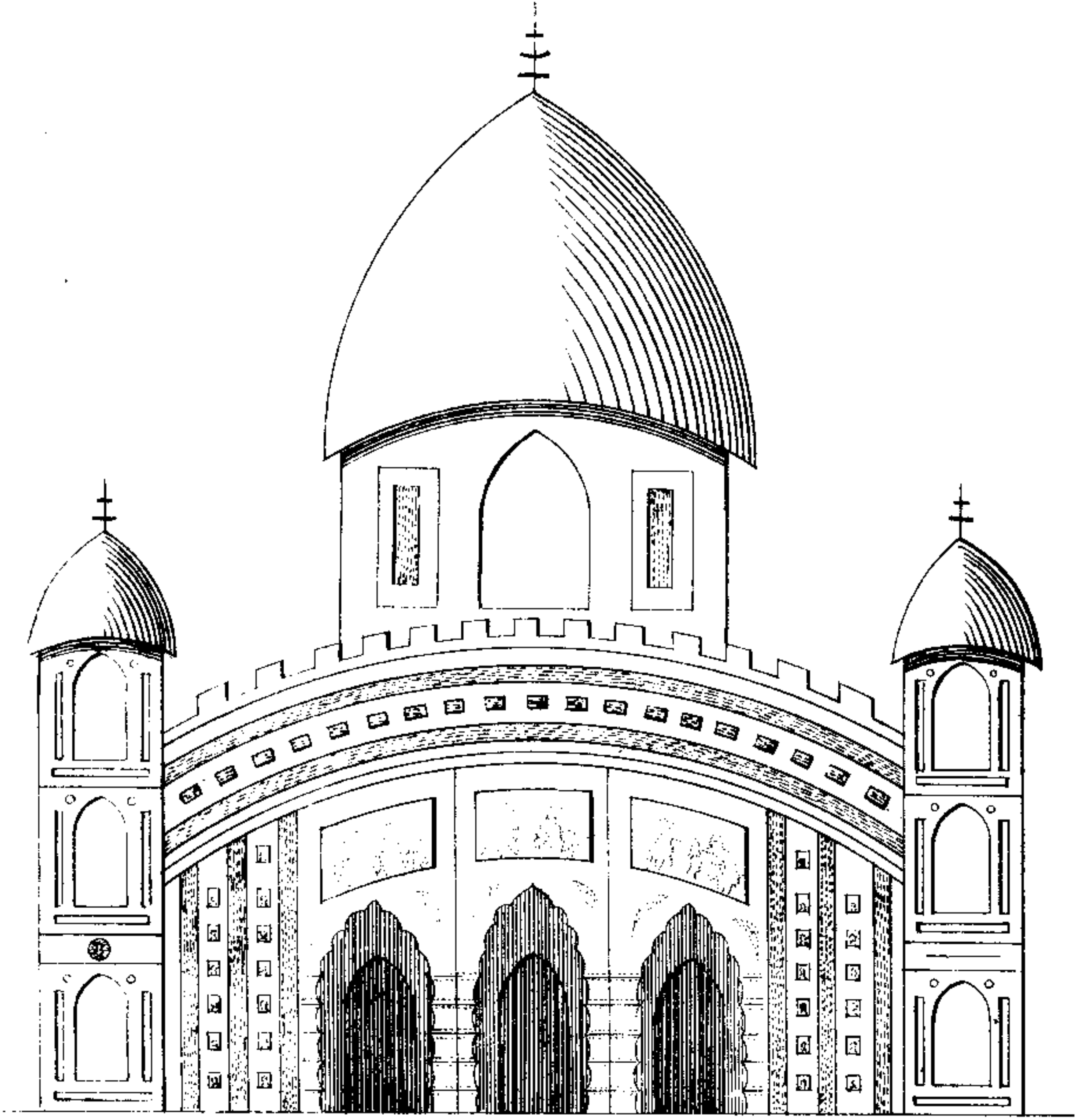
সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমন্দির।

আমার কাজটা যৎপরোনাস্তি বীরোচিত! কিন্তু হায়! এই সমস্ত বীর থাকিতেও দেশ-উদ্ধারের কোনও আশা দেখা যাইতেছে না; দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে!

সীতারাম।

অষ্টম অধ্যায়।

সীতারামের অধিকাংশ কীর্ত্তিকলাপ কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার অন্দরমহলে আর জনমানব প্রবেশ করিবার উপায় নাই; সেখানে কেবল নিরবিচ্ছিন্ন জঙ্গল এবং হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি! কালে কত রাজার বিচিত্র রাজধানী এই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সীতারামের রাজধানীও যে সেই পথে গমন করিবে, তাহাতে বড় বিস্ময়ের কারণ নাই! কিন্তু সীতারামের কথা ত ইতিহাসের নিকট সে দিনের কথা; এখনও দুই শত বৎসর অতীত হয় নাই! ইহার মধ্যেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, কাল পরাজয় করিয়া যে সকল পুরাতন কীর্ত্তিমন্দির এখনও লোক-লোচনের বিস্ময় আকর্ষণ করিতেছে, সেগুলি কত যত্নে, কত দীর্ঘকালে, কত সুনিপুণ স্থপতিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের প্রাণপণ চেষ্টায় গঠিত হইয়াছিল; তাই তাহারা আজিও বর্ত্তমান। আর সীতারামের রাজধানী? তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া রাতারাতি অশিক্ষিত কারিগর লইয়া যে সকল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে না ছিল গঠনকৌশল, না ছিল বাহ্য বৈভব! দুর্গরচনা শেষ হইবামাত্র কোনরূপে বাড়ী ঘরগুলি গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন!

এখন প্রাসাদ কক্ষগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, দীর্ঘিকা এবং পরিখা গুলি বর্ত্তমান আছে। সেই সকল জলাশয়ের মধ্যে "রামসাগর" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুন্দর, এবং সীতারামের দুর্গরচনাকৌশলের পরিচায়ক। দুর্গের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই এই সুবিস্তৃত জলাশয়; উত্তরদক্ষিণে ১৫০০ হাত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬০০ হাত পরিসর। সিংহদ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে এই জলাশয়ের নিকট দিয়া আসিতে হইত। জন কত সাহসী বীরপুরুষ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে গোলাবর্ষণ করিতে পারিলে, কেহ সহজে দুর্গপ্রাচীরের নিকটে আসিতে সাহস পাইত না! ভারতবর্ষে শত শত দুর্গপ্রাচীর আজিও

বর্ত্তমান আছে। তাহার অধিকাংশই গিরিদুর্গ। সমতল শস্যক্ষেত্রের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করা সেরূপ সহজ নহে। তথাপি সমতলক্ষেত্রেও কয়েকটি দুর্গচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহার কোন দুর্গেই সিংহদ্বারের সম্মুখে এরূপ বিস্তৃত জলাশয় খনিত হয় নাই। ইহাই সীতারামের দুর্গরচনার মৌলিকত্ব।

রামসাগরের নানারূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। সীতারাম যেখানে রামসাগর খনন করেন, সেখানে এক সময় একটি দরিদ্রা বিধবার পর্ণকুটীর ছিল। বিধবার একটিমাত্র পুত্র। বৃদ্ধা এক দিন "সীতা সীতা" বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিতেছিলেন; সীতা নিকটে ছিল না, কিন্তু রাজা সীতারাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা কি প্রয়োজনে সীতারামকে স্মরণ করিতেছিলেন, তাহা জানিবার জন্য সীতারামের কৌতূহল হইল। কিন্তু বৃদ্ধা তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্র সীতারামকে স্মরণ করিতেছিলেন; রাজা সীতারামকে স্মরণ করেন নাই। সীতারাম সে কথা শুনিবার পাত্র নহেন, তিনি বৃদ্ধার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। চিরদুঃখিনী বিধবা আর কেমন করিয়া রাজাধিরাজ সীতারামকে অভ্যর্থনা করিবেন? তাঁহার কুটীরেই বা কি আছে যে, তাহা লইয়া রাজহস্তে উপঢৌকন দিবেন? তিনি দৈন্য জানাইয়া বিনীতভাবে সীতারামের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন; সীতারাম তাঁহাকে তদ্রূপ সকাতর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি নিতান্তই কিঞ্চিৎ উপহার দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আঙ্গিনার পাশে যে লাউগাছটি লতাইয়া উঠিয়াছে, সেইটি পাইলেই সীতারাম চরিতার্থ হইবেন। বৃদ্ধা বলিলেন—তথাস্তু। সীতারাম তখন অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৃদ্ধার কি এমন কোন গুপ্ত বাসনা নাই, যাহা রাজানুকম্পায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? বৃদ্ধার একটি ক্ষুদ্র বাসনা ছিল;—জলকষ্টে তাঁহাকে বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত। তিনি তখন একটি কূপ খনন করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। কূপখননের জন্য লাউগাছের মূলদেশ খনিত হইল। সীতারাম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, তথায় প্রচুর অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে! তখন আর কূপ খনন করা হইল না;—সীতারাম সেই অর্থে একটি বিস্তৃত দীর্ঘিকাখননের আদেশ করিলেন। নিকটে সেনাপতি মেনা হাতি দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible] হইবে? সীতারাম বলিলেন, তোমার আকর্ণ সন্ধানে তীর যত

সন্ধানে তীর ছাড়িয়া দিলেন;—সে তীর বহুযোজন দূরে কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরভূমি অতিক্রম করিয়া ভূমিতল স্পর্শ করিল! সীতারাম আর ব্রহ্মত্র হরণ করিলেন না;—যত দূর পারিলেন, খনন করিয়া দিলেন। লোকে তাঁহার এই অলৌকিক কীর্ত্তি চিরজীবী করিবার জন্য দীঘির নাম "রামসাগর" রাখিয়া দিল।*

মহম্মদপুরের রাজধানীতে যে আরও অনেকগুলি জলাশয় খনিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, তাহার একটির ইতিহাস হইতে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র "চিত্তবিশ্রাম" নামক রমণীয় উদ্যানবাটীর কল্পনা গঠন করিয়াছিলেন! সে জলাশয়ের নাম "সুখসাগর,"—তাহা দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে, অনতিদূরেই খনিত হইয়াছিল। সুখসাগরের আয়তন খুব বড় নহে, একেবারে নিতান্ত ছোটও নহে। মধ্যস্থানে একটি দ্বীপের ন্যায় মৃত্তিকাস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে;—গৌরবের দিনে সেই দ্বীপের উপর সীতারাম একটি সুশীতলসুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্যে দুর্গমধ্যে বাস করিবার অসুবিধা হইলে, সীতারাম কখন কখন চিত্তবিনোদের জন্য সেই হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিতেন। তাহার এখন আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই!

দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আর একটি দীঘি বর্ত্তমান আছে। তাহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী অনেক;—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নলদীর নায়েব মহাশয়ের পাচক ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সেই জলাশয়ে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইয়াছিল! সেই কথা দেশরাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, নড়ালের বাবুরাও স্বর্ণমুদ্রার লোভে অনেক অর্থব্যয় করিয়া জলশোষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন! † তাঁহাদের ভাগ্যে পণ্ডশ্রমই সার

---

* ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই জনশ্রুতি সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সীতারাম যে আরও অনেক জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। সেকালের হিন্দু রাজারা প্রজাসাধারণের অন্নজলে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সাধ্যানুসারে অন্নজল সুলভ করিয়া দিতেন।

† The Naral Baboos, who for some time had possesion of the temple-lands (debuttur) at Muhamadpore, made diligent search in the tank, to find any stray treasure which might be in it. They tried to pump out the water, but there dwells a genius in the tank who frustrated their impious

হইল! কিন্তু শুনা যায় যে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবার একজন এক ঘটি টাকা কুড়াইয়া পাইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস যে, সেখানে এখনও সাত রাজার ধন অজ্ঞাতে যক্ষ মহামতির কঠিন শাসনে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। পাঠক! ঐতিহাসিক অনুরাগে না হউক, আর্থিক অনুরাগে মহম্মদপুর পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা হইতেছে কি?

সীতারাম যেরূপ ভাবে মুসলমান শক্তিকে প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে বাহুবলে রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল যে, আজ হউক, কাল হউক, মুসলমান একদিন না একদিন তাঁহার রাজদুর্গ ধ্বংস করিবার জন্য সাগ্রহে বাহুবিস্তার করিবে! সেই জন্য তিনি কেবল দুর্গপ্রাচীর সুদৃঢ় করিয়া এবং প্রাচীরমূলে পরিখা খনন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; মুসলমানেরা পুরী অবরোধ করিলে যাহাতে হিন্দুর সযত্নসঞ্চিত ধনরত্ন কিছুতেই কুক্ষিগত করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্য দুর্গমধ্যে এই দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার গুপ্ত কোষাগার। সঞ্চিত অর্থ এই জলাশয়ে নিমজ্জিত হইত; আবশ্যক হইলে, সন্ধাননিপুণ সীতারাম তাহা উত্তোলন করিতে পারিতেন। এখন আর কেহ সে সন্ধান জানে না, সেই জন্য সীতারামের গুপ্ত কোষাগার চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জলাশয় খনন করা সেকালে বড়ই পুণ্য কার্য্য বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিল। তাহার জন্য পুণ্যশীল জলদাতা রাজসরকার হইতে উপাধি পাইতেন না, কিন্তু হিন্দুর দেশে হিন্দুর সমাজে হিন্দু নরনারীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। বাঙ্গলাদেশে এইরূপ অনেক প্রাচীন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবে, কাহার ব্যয়ে এই সকল জলাশয় খনিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রত্যেক প্রাচীন জলাশয়ের সঙ্গেই কোন না কোন মহাত্মার পুণ্যনাম সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজদিগের পুরাতন সমাধিমন্দিরগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গভর্মেণ্ট মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন। তাহাতে অবশ্যই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি সঞ্জীবিত রাখিবার সদুপায় হইতেছে। কিন্তু সে গুলি কেবল ইষ্টকস্তূপ,—তাহাতে লোকলোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করে, বিস্ময় উৎপাদন করে, ক্বচিৎ বা কাহারও কল্পনাপ্রবণ উর্ব্বর

দুঃখদুর্দ্দশার কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে না! আর হিন্দুর সেই সকল জল-দানের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি,—এই সকল হিন্দুহৃদয়ের লোকহিতৈষণার সমাধি-মন্দিরগুলি, হিন্দুজীবনের পরহিতব্রতের এই সকল জীবন্ত নিদর্শনগুলি, কাল ক্রমে শৈবালে শাদ্বলে পঙ্কে দূষিত সলিলে অব্যবহার্য্য হইয়া কত লোকের কীর্ত্তিলোপ করিতেছে! সদাশয় গভর্মেণ্ট যদি এই সকল সমাধিচিহ্ন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে হয় ত আরও বহুকাল তাহা এদেশের উপকার সাধন করিত।

ইংরাজেরা তাঁহাদের নগণ্য গতজীব সহযোগীদিগের সমাধিমন্দিরের জরা-জীর্ণ প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। * আমা-দের দেশের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া এবং পুরাতন জলাশয়গুলির কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া কেহ যদি গ্রন্থরচনা করেন, তাহা হইলে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ সজীব থাকিতে পারে। আমরা সীতা-রামের ইতিহাস পাই নাই; কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ-স্থানীয় প্রাচীন দেবমন্দির এবং পুরাতন দীর্ঘিকাদি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহারও কোনরূপ বিব-রণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি না!

সীতারাম সে সকল জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কেবল সাধারণভাবে তাঁহার পুণ্যপিপাসা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নহে; সেকালে সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার সকলেই সেরূপ সৎকীর্ত্তিসংস্থাপন করিতেন;—তাহাতে কাহারও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটিত হইত না। কিন্তু সীতারামের জলাশয়-গুলি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র, বুদ্ধিকৌশল এবং দূরদর্শিতা বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে "রামসাগরের" উল্লেখ করিয়া তাঁহার সংগ্রামকৌশলের পরিচয় দিয়াছি, দুর্গপরিখার বর্ণনা করিয়া তাঁহার রচনা-কৌশলের আভাস দিয়াছি, এবং "সুখসাগরের" পরিচয় দিয়া তাঁহার বিলাস-বাসনার প্রকৃতিনির্ণয় করিয়াছি। অন্যান্য জলাশয়গুলিতেও এইরূপ একটি না একটি পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

এদেশে অনেকেই জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খনন-প্রণালীর দোষে কিছু দিন পরে সে সকল জলাশয় দুষ্টজলে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে! অনেকে ইহার অনেকরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন মাটির দোষ, কেহ বলেন জলাশয়-তীরে বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিবার দোষ

ধারণা এইরূপ যে, এই উভয়দোষবর্জ্জিত হইলেই হয় ত জলাশয়গুলি একবারে দোষসম্পর্কশূন্য হইত! কিন্তু প্রধান দোষ এই যে, খনিতমৃত্তিকা কেমন করিয়া কোথায় স্থাপন করিলে সরোবরের অনিষ্ট না হয়, সে দিকে কেহ সবিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। সরোবর খনিত হইয়াছে; ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত সুবিস্তৃত সোপানাবলী সুগঠিত হইয়াছে; তীরে তীরে রুচিভেদে তাল তমাল বা নারিকেল বৃক্ষ, কখন বা কুসুম-বহুল অশোক চম্পক বকুল পলাশ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। কিন্তু খনিত মৃত্তিকারাশি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিত; তাহার যথাযথ বিন্যাসের জন্য কেহ আর অর্থব্যয় করা আবশ্যক মনে করেন নাই!

সীতারামের দুই একটি জলাশয় দেখিলে মনে হয় যে, তিনি এই চিরপ্রচলিত কুরীতির অপকারিতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; এবং যথাসাধ্য সংশোধন করিবার জন্য একটি সরোবরে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার নাম "কৃষ্ণসাগর"; বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র দেব ঠাকুরের নামানুসারে পরিচিত। এই "কৃষ্ণসাগর" রামসাগরের ন্যায় বৃহদায়তন নহে; কিন্তু ইহার জল এখনও বড়ই উপাদেয়। সীতারাম "কৃষ্ণসাগর" খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিকারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার অবসর দেন নাই; তাহা সরোবরতীর হইতে প্রতিদিকে প্রায় এক বিঘা দূরে আনিয়া চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া যে পঙ্কিল সলিলস্রোত প্রত্যেক সরোবরকেই বর্ষাকালে আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা আর "কৃষ্ণসাগরের" সীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে! ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব "কৃষ্ণসাগরের" দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, আধুনিক সময়েও সরোবরখননকালে সেই প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। *

স্থানে স্থানে তড়াগাদি খনন করা ভিন্ন সীতারাম এক নদী হইতে আর এক নদীতে গমনাগমন ও নৌকা-চলাচলের সুবিধার জন্য সুদীর্ঘ খাল খনন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কিরূপ দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

---

* This probably results from a peculiarity of construction, which

নবম অধ্যায়।

আমরা আজকাল অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল! দেশে যে অন্ন বস্ত্র নাই, তাহা নহে; নানা কারণে দেশের অন্ন বস্ত্রে আমাদিগের অভাবপূরণ হয় না। বহুবিধ ঘটনাপরম্পরায় দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা লজ্জারক্ষার জন্য ম্যানচেষ্টারের তাঁতিদিগের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইতেছি, লৌহদ্রব্যের জন্য সেফিল্ডের কর্ম্মকারগোষ্ঠীর হাফরের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছি;—জীবনধারণের জন্য, কায়িক মানসিক সাংসারিক সকল প্রকার দৈনিক অভাব মোচনের জন্য বিদেশের লোকের কাছে কর-যোড়ে দাঁড়াইয়া আছি। সেকালে এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না। বাঙ্গালী তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত করিয়া লইত। হাতে অর্থ থাকিলে লোকে ঘরে বসিয়া সকল দ্রব্যই সহজে সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু সীতারামের সে সুবিধা ঘটিল না।

তিনি মুসলমানশক্তি উপেক্ষা করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী সংস্থাপন করায় রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; সুতরাং অন্যান্য গ্রাম নগর হইতে আবশ্যকমত দ্রব্যজাত আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে তেমন সহজ ছিল না। অথচ তাঁহার সকল দ্রব্যেরই নিতান্ত আবশ্যক। স্বাধীনতারক্ষার জন্য দুর্গপ্রাচীর গঠিত হইল, নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সেনা-দল গঠিত হইল, কিন্তু অস্ত্র শস্ত্র সেরূপ সহজে সংগৃহীত হইল না। কামান বন্দুক গুলি গোলা ও বারুদের সৃষ্টি হইয়া অবধি সমরশিক্ষার যুগান্তর উপ-স্থিত হইয়াছে। আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ নাই, আর ধর্ম্মযুদ্ধ নাই, আর ধনুঃশর,—সম্মো-হন, একাঘ্নী, পাশুপতের দিন নাই। এখন যুদ্ধ করিতে হইলে তদুপযোগিনী শিক্ষা চাই; যুদ্ধ শিখাইতে হইলে তদুপযোগী গুলি গোলা বারুদ কামান ও বন্দুক চাই। সুতরাং সীতারামের চারিদিকেই অভাব। তিনি নবাবের অধি-কৃত রাজ্য হইতে এই সকল দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে লোকে শীঘ্রই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিত; নবাবও তাহার গতিরোধ করিবার অবসর পাইতেন। সীতারাম সে পথ অবলম্বন করিলেন না।

তিনি নানা স্থান হইতে বিবিধশিল্পবিশারদ কার্য্যকুশল শ্রমজীবীদিগকে পরম সমাদরে নূতন রাজধানীতে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং

করিয়া দিলেন। নবাব ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; কেহ ঘুণাক্ষরেও তাঁহার অভিসন্ধির অনুসন্ধান পাইল না। অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদপুরে বাজার বসিয়া গেল। সে বাজারে সকল দ্রব্যই মিলিত; মিলিত বলিলে ঠিক বলা হইল না;—সকল দ্রব্যই প্রস্তুত হইত। তাহাতে বহু লোকের অন্নসংস্থানের সুবিধা হইল। লোকে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া দোকান খুলিতে আরম্ভ করিল। তখন মহম্মদপুরে বসিয়া সেই সকল কারিগরেরা কেহ বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ চারুশিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল; কেহ বা যুদ্ধোপযোগী বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধ্যে সীতারামের বাজার আর সামান্য বাজার বলিয়া মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর সুবৃহৎ শিল্পাগার হইয়া উঠিল।

সীতারামের এই শিল্পাগারে যে সকল তৈজসপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে;—ক্রমে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। সীতারামের শ্রমসহিষ্ণু কর্ম্মকারগণ যেরূপ নিপুণ হস্তে সুদৃঢ় কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মোগল তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কি কৌশলে সীতারাম সহসা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য যাহারা কিছুমাত্র জানিবার অবসর পায় নাই, তাহারা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকচক্ষুর নিকট সীতারামের কার্য্যকলাপ বিচিত্র ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

সেকালের বাঙ্গালী কর্ম্মকারেরা যে সত্য সত্যই কামান গড়িতে জানিত, তাহা কাহারও রচা-কথা নহে; সেরূপ দুই একটি কামান এখনও বর্ত্তমান আছে; অবশিষ্টগুলি অযত্নে অনাদরে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূষণা অঞ্চলেও এই সকল পুরাতন কামান দেখা যাইত; কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ কালেক্টার তাহার কোনটি লইয়া রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোনটি গলাইয়া কয়েদীদিগের বেড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, কোনটি বা তিন টাকা মূল্যে নিলাম করিয়া দিয়াছেন। *

মুর্শিদাবাদের বিলুপ্ত-গৌরব প্রাচীন রাজধানীর নিকটে এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর স্বহস্ত-গঠিত একটি পুরাতন কামান বর্ত্তমান আছে। কালে তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি তরুশাখা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে মাটি হইতে শূন্যদেশে উঠাইয়া ফেলিয়াছে;—দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই কামানের

নাম "জাহানকোষ" ;—ওজনে ২১২ মণ ; ২৮ সের বারুদ না হইলে তাহার বৃকোদর পূর্ণ হইত না। এই কামানের উপর যে ফলকলিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, কার্য্যপরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাধীনে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দনের দ্বারা, ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঢাকা নগরে এই বৃহদায়তন কামানটি গঠিত হয়। * ঢাকাই কর্ম্মকারদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্সিদকুলী খাঁ ঢাকার মোগল রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া মুর্সিদাবাদে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মহম্মদপুরের সীতারামের রাজধানীও সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ঢাকাই কর্ম্মকারদিগের কেহ কেহ মহম্মদপুরে আসিয়া সীতারামের অস্ত্রাগার পূর্ণ করিবার সহায়তা করিয়াছিল। সে সকল অস্ত্র শস্ত্র কালসহকারে বিলুপ্ত না হইলে বাঙ্গালীর গঠনপ্রতিভার পরিচয় বিলুপ্ত হইত না ; কিন্তু সে সকল অস্ত্র শস্ত্র যে যুদ্ধকালে শত্রুপীড়নে কত দূর সক্ষম হইয়াছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে তাহার পরিচয় একবারে বিলুপ্ত হয় নাই! মুর্সিদাবাদের নবাব-বাড়ীতে এখনও এই সকল পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র কতক কতক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। শেলেখানার মধ্যে কোন প্রতিভাশালী শিল্পকার প্রবেশ করিলে, সে সকল অস্ত্রশস্ত্রের গঠনকৌশল দেখিয়া অবশ্যই অপরিসীম কৌতূহল অনুভব করিবেন!

সীতারামের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি সাহসী স্বাধীন-চেতা স্বাবলম্বনপরায়ণ প্রতিভাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, তাহার অভাবপূরণের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ছিল না ; যত্ন চেষ্টা করিয়া স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতেন। ঘটনাসূত্রে তাঁহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহুবল ভিন্ন আর কোন সম্বল ছিল না ; মোগলের দেশে বাস করিয়া মোগলশক্তিকে পরাজিত করিতে হইলে অবশ্য মোগলের নিকট সহায়তালাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না ; সুতরাং বাধ্য হইয়াও তাঁহাকে স্বাবলম্বনপরায়ণ হইতে হইয়াছিল। তিনি এরূপ ভাবে প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা

---

* The gun Jahan Kasha was constructed at Jahangirnagar, otherwise called Dacca, during the Darogaship of Sher Mahammud, and when Har ballav Das was mashrif (Inspector) and Janarjan chief blacksmith, in the month of Jumadi-us-sani, in the year of 11 the reign corresponding to 1047 (October 1637). [illegible]

না করিলে, মহম্মদপুরের রাজধানী ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারিত না। উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র পাইলে, উপযুক্ত সুশিক্ষিত সেনাদল পাইলে, উপযুক্ত অর্থ-ভাণ্ডার লাভ করিতে পারিলে, দেশের লোকের শুভাশীর্ব্বাদ এবং সহায়তা সম্বল করিতে পারিলে, অনেকের পক্ষেই বীরত্বের পরিচয় প্রদান করা সহজ হয়। স্বাধীন নরপতিদিগের পক্ষে এ সকলই সুলভ; তাঁহারা সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া জনসাধারণের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করেন, যত্নসঞ্চিত রাজকোষে অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন প্রাপ্ত হন, রণপণ্ডিত সেনাপতিপরিচালিত সুশিক্ষিত সেনা-দল আসিয়া করযোড়ে অভিবাদন করে, সুতরাং তাঁহাদের বীরকীর্ত্তির জন্য তাঁহারা যশস্বী হইলেও, সেরূপ বীরকীর্ত্তিতে কোনরূপ বিশেষত্ব সূচিত হয় না। কিন্তু যাঁহার এ সকল সুবিধা নাই, যাঁহাকে জঙ্গল কাটিয়া রাজধানী বসাইতে হয়, শস্যক্ষেত্র সমুন্নত করিয়া দুর্গপ্রাচীর গঠন করিতে হয়, কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী দরিদ্র নিরক্ষরদিগকে সম্মিলিত করিয়া সেনাদল গঠন করিতে হয়, অর্থসংগ্রহ করিয়া রাজ্যপালন, সেনাপরিপোষণ এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র গঠন করিয়া লইতে হয়, তিনি যদি প্রতিকূলশক্তিসংঘর্ষে পতিত হইয়া অল্পদিনের জন্যও স্বাধীনভাবে জয়পতাকা বহন করিতে সক্ষম হন, তবে তাঁহার জন্য ইতিহাস অবশ্যই স্বর্ণসিংহাসন গঠন করিয়া থাকে। সীতারাম বাঙ্গালী, সীতারাম নিঃসম্বল দরিদ্র কায়স্থ, সীতারাম পরাধীন বঙ্গদেশের পরাধীন ক্ষুদ্র প্রজা; কিন্তু ইতিহাস তাঁহার জন্য স্বর্ণসিংহাসন গঠন করিয়া দিয়াছে! ইহাতেই সীতারামের গৌরব; ইহাতেই বাঙ্গালীর গৌরব; এবং এই জন্যই সীতারামের ইতিহাস বাঙ্গালীর নিকট সমধিক সম্মানলাভের অধি-কারী। বাঙ্গালী কি সীতারামকে সে সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? বাঙ্গালী যেরূপ উন্নত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া উৎসাহের সহিত সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, বাঙ্গালী কি সে উৎসাহের অংশমাত্রও এই সকল ঐতিহাসিক রত্নোদ্ধারের জন্য নিয়োগ করিতে গৌরববোধ করিবেন না?

দশম অধ্যায়।

সীতারামের রাজধানী বহুবিস্তৃত জনাকীর্ণ মহানগর হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্ত-মান মাগুরা সবডিবিসনের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ১৪ মাইল দূরে এই পুরাতন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে কোন-

তলগত হইলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইয়াছিল। সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মহম্মদপুরেই যশোহরের জেলা সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে সীতারামের পুণ্যকীর্ত্তিগুলি ধূলিপরিণত হইত না; সীতারাম এবং মহম্মদপুরের নাম লোকের নিকট পূর্ব্ববৎ সুপরিচিত থাকিত। কিন্তু ইংরাজবণিক ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে চারি দিকে যে ভীষণ কালের চিতা জ্বলিয়া উঠে, তাহার অগ্নিকণা মহম্মদপুরেও পতিত হইয়াছিল; ১২৪৩ সালের সমকালে এমন মহামারীর আবির্ভাব হইল যে, সেই সময় হইতে মহম্মদপুর জঙ্গল হইয়া গেল; লোকে প্রাণ লইয়া দূর স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল; যাহারা ইংরাজের আদেশে মহম্মদপুরের ভিতর দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করিতেছিল, সেই সকল কয়েদীদিগের মধ্যে শত শত লোক কালকবলে পতিত হইল। সুতরাং তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে! * শতাধিক বৎসর হইল, মেজর রেণেল যে সুবিখ্যাত মানচিত্র † সংকলন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধাননগর বলিয়া মহম্মদপুরের নাম বৃহদক্ষরে লিখিত আছে; সে সময়েও ভূষণা চাকলার সদর কাছারী মহম্মদপুরেই সংস্থাপিত ছিল!

শিল্পের জন্য, বাণিজ্যের জন্য, সীতারামের আন্তরিক অনুরাগের জন্য, মহম্মদপুরের বাজার অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, ক্ষুদ্রায়তন দুর্গের মধ্যে তাহার স্থান সংকুলন হইয়া উঠিল না। সীতারাম সেই জন্য শিল্পীদিগকে [illegible] অ বাহিরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতে [illegible] বস্তৃত করিয়া দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত এই বাজার [illegible] ভিন্ন আ পড়িয়াছিল। সীতারামের সময়ে তাঁহার নিতান্ত অনুগত লোক [illegible] যে, কেহ দুর্গাভ্যন্তরে দোকান খুলিতে পারিত না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন [illegible] দূরস্থানে সেই জন্যই তিনি বিদেশাগত শিল্পকারদিগকে দুর্গমূল হইতে [illegible] শ্রেণী কতদূ্রাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই সকল বিপণী[illegible] চিহ্ন কিছু [illegible]র্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও তাহার সীমা-[illegible] াগল শাসন দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible] ...র অগোচরে অলক্ষিতভাবে তাড়াতাড়ি নগর পত্তন

* Westland[illegible]s Jessore.

† Major Rennel's map.

করায়, মহম্মদপুরে স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার প্রত্যেক ইষ্টকস্তূপের সঙ্গে সীতারামের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে বলিয়া, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক। রাজধানীর অন্যান্য বাড়ীঘরের সবিশেষ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সীতারামের কল্যাণে যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

এই সকল দেবমন্দিরের অধিকাংশই গঠনকৌশলে বিশেষ গৌরবলাভ করিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু গঠনকৌশল বা বাহ্য শোভার বাহুল্য না থাকিলেও, প্রত্যেক দেবমন্দিরেই সীতারামের এক একখানি প্রস্তরফলক নিবিষ্ট ছিল। কালক্রমে সে সকল ফলকলিপির অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছে! কে কোন্ সময়ে তাহা অপহরণ করিল, সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, হয় ত এখনও ভগ্নাবশেষ ইষ্টকরাশির মধ্যে সে সকল ফলকলিপি অনাদরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে! ওয়েষ্টল্যাণ্ড যথন মহম্মদপুর পরিদর্শন করেন, তথন অধিকাংশ ফলকলিপিই বর্ত্তমান ছিল না; তিনি দেবপূজকদিগের মুখে তাহার যে বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাই সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিদর্শনের পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট সে সকল ফলকলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * সেই গ্রন্থলিখিত পাঠের সহিত ওয়েষ্টল্যাণ্ডের লিখিত পাঠের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তদবলম্বনে মন্দিরগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল মন্দিরের মধ্যে "দশভুজালয়" নামক ম[illegible] সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই মন্দির সীতারামের [illegible]র-স্থানীয় দুর্গমধ্যস্থ সরোবরতীরে সংস্থাপিত। মন্দিরটি নিতান্তই ক্ষুদ্র [illegible] 'বাঙ্গলা' ঘরের মত; একটি মাত্র কক্ষ, এবং কক্ষের সম্মুখে ক্ষুদ্রায়[illegible]। বারান্দার সম্মুখস্থ পুরাতন খিলানগুলিও কালক্রমে পড়িয়া [illegible] সকালে 'বাঙ্গলা' ঘরের অনুকরণে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্র[illegible] [illegible]টোরের রাজবাটীতে ও অন্যান্য অনেক স্থানে রাণী ভবানীর নির্ম্মি[illegible] [illegible]নেকগুলি দেবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। "দশভুজাল[illegible] কোন ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই। সেকালে ইহাতে যে প্রস্ত[illegible] ছিল, তাহাতে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যাইত,—

* Bengal Monuments.

"মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী-শকে দশভুজালয়ং।
অকারি শ্রীসীতারামরায়েন মন্দিরম্॥"

হস্তাক্ষর বাঙ্গলা, কিন্তু অনেকটা প্রাকৃত ধরণের, বিশেষ সুগঠিত সুখপাঠ্য অক্ষর-সম্বদ্ধ নহে। এই ফলকলিপির পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "শ্রী সীতারাম রায় কর্ত্তৃক মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।" মহী অর্থে পৃথিবী—একার্থবাচক; ভুজ দ্বি-অর্থ-জ্ঞাপক, রস ষট্-সংখ্যা-দ্যোতক, ক্ষৌণী পৃথিবীরই প্রতিশব্দ, সুতরাং তাহাও একার্থবাচক। সংখ্যাগণনায় ১২৬১ হয়। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ;"—সুতরাং ১৬২১ শকে এই মন্দির নির্ম্মিত হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। ১৬২১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন ঢাকা মুসলমানের রাজধানী; আরঙ্গজীবের প্রবল প্রতাপ চারি দিকে দেদীপ্যমান; হিন্দু-দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়ানিচয় ধরাতলে বিলুণ্ঠিত; কাশীধাম সীমা-চিহ্নপরিশূন্য বিচ্ছিন্ন ভগ্নস্তূপ; তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্তম্ভের উপর সমুন্নত মুসলমান-মসজেদে "আল্লাহো আকবর" রব সদর্পে প্রতিশব্দিত!

যে লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের সৌভাগ্য-সূচনার মূল কারণ বলিয়া লোক-সমাজে চিরবিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্যও একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত। এই মন্দির অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতল গৃহ; গঠন-গৌরববিবর্জ্জিত ইষ্টকস্তূপ মাত্র। ইহার অবস্থা এখনও কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববৎ সংরক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণের নামে এখনও দেবপূজা চলিতেছে, কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে, আসল লক্ষ্মীনারায়ণ আর মহম্মদপুরে নাই। মহম্মদপুর যে লক্ষ্মীহীন হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়া গিয়াছেন যে, "আসল লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা নড়ালের বাবুরা চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে!" *

লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরেও একখানি ফলকলিপি নিহিত ছিল, তাহা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত ছিল যে;—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরম্॥"

ইহার পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "সীতারাম রায় কর্ত্তৃক পিতৃপুণ্য-সংস্থানাশায় লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থিতির জন্য তর্কাক্ষিরসভূশকে মন্দির নির্ম্মিত

* Westland's Jessore.

হইয়াছিল।" তর্ক শব্দ দর্শনজ্ঞাপক, দর্শনগুলি সংখ্যায় ছয়টি; অক্ষি দ্বি-সংখ্যা-প্রতিপাদক; রস শব্দ ষট্‌-সংখ্যাবাচক; ভূ শব্দে পৃথিবী, একার্থ-বোধক; সুতরাং অর্থ যোজনা করিলে জানা যায় যে, এই মন্দির ১৬২৬ শকে নির্ম্মিত হয়। ১৬২৬ শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে মুসলমান রাজধানী উঠিয়া আসিতেছে।

সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণের কল্যাণে যাত্রা মহোৎসবাদিতে সবিশেষ সমারোহ হইত। তন্মধ্যে দোলযাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষেই লক্ষ্মীনারায়ণের বিভবচ্ছটা সমধিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তেমন বৃহদায়তন নহে; সুতরাং তাহাতে দোলযাত্রার সমারোহ সুসম্পন্ন হইত না। তজ্জন্য সীতারাম সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনসম্মুখে পৃথক একটি দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে কোন ফলকলিপি ছিল না। দোলমঞ্চটি সমুন্নত, অপেক্ষাকৃত সুগঠিত এবং সুসজ্জিত;—তাহা এখনও প্রায় সেইরূপ অবস্থাতেই আছে। নবাবী আমলে দোলযাত্রার বড়ই আড়ম্বর ছিল। মুসলমান সরকারে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দোলযাত্রা উপলক্ষে এক পক্ষ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজদরবার বন্ধ থাকিত। এই প্রথা নবাব সিরাজদ্দৌলার সময় পর্য্যন্তও যে সমভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা সিরাজদ্দৌলার লিখিত একখানি পত্রে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। * দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পরিখার সমসূত্রে একটি সুবিস্তৃত দীর্ঘায়তন রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া সীতারাম রায় শ্রীঈশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের রথযাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপর দিয়া সুন্দর সুচিত্রিত রথারোহণে বিগ্রহদেব মৃদঙ্গকরতালসমন্বিত সংকীর্ত্তন-সমারোহে হেলিতে দুলিতে মথুরাগমনের পূর্ব্বস্মৃতির সৌভাগ্যগর্ব্ব উপভোগ করিতেন;—ভক্তভৃঙ্গকণ্ঠোচ্ছ্বাসপরিপূরিত হরিধ্বনি কোলাহল করিয়া জয় ঘোষণা করিত!

দুর্গস্থিত এই সকল দেবমন্দির ব্যতীত দুর্গসংলগ্ন কানাইনগর গ্রামে সীতারামের আর একটি দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। এই মন্দিরটি এখন চতুষ্পার্শ্বস্থ বিটপিরাজির মধ্যে নীরবে বিগত গৌরবের বিলুপ্ত কাহিনীর স্মৃতি-চিহ্ন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরটি প্রায় সমচতুষ্কোণ; সর্ব্বত্রই খিলান; ছাদের উপর মন্দিরচূড়া; তাহা প্রায় মন্দিরের সমান উচ্চ; দুই পার্শ্বে ঈষদুন্নত দুইটি চূড়া। সম্মুখভাগে নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-

গঠিত, এবং তিনটি দ্বার-সংযুক্ত। এই মন্দিরে সীতারাম প্রাণপণে বাহ্যশোভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক দ্বারের উপর এক একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, তাহাতে বিচিত্র-চিত্রনিপুণ স্থপতিবিদ্যাকুশল কারিগরগণ সীতারামের গৌরবঘোষণার জন্য আঁকিয়া রাখিয়াছেন,—দুই দিক হইতে দুইটি পরাক্রান্ত সিংহ মধ্যস্থ রাজমুকুট সগৌরবে ধরিয়া রাখিয়াছে! পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া দ্বার, দ্বার-পথ অতিক্রম করিলেই বারান্দা; তাহার পর মন্দিরমধ্যস্থ কক্ষ; সেথানে রত্নচতুর্দ্দোলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ বিরাজ করিতেন। সীতারাম নাই, কিন্তু কানাইনগরে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং দিঘাপতিয়ার রাজবাটীতে কৃষ্ণজী বিগ্রহ এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

এই মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত কবিতার যে ফলকলিপি নিহিত আছে, তাহা সহজে পাঠ করা যায় না। তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া গবর্মেণ্ট এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কবিতাটি স্থানাভাববশতঃ চরণে চরণে বিভাগ করিয়া লেখা হয় নাই; কোন স্থানে বিরাম যতির কোনরূপ চিহ্নও ব্যবহৃত হয় নাই; সুতরাং বিদেশী লোকের পক্ষে তাহার পাঠোদ্ধার করা শ্রমসাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে! মন্দিরফলকে অবিকল এইরূপ লিখিত আছে:—

বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে
পরিগণিত শকে কৃষ্ণতোষা
ভিলাষী শ্রীমদ্বিশ্বাসভাযো
ত্তব কুলকমলে ভাসকোভানু
তুল্য অজস্রং সৌধ যুক্তে রুচিররু
চি হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং শ্রীসীতা
রামরায়ো যদুপতি নগরে
ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।

পরিষ্কার করিয়া লিখিলে কবিতাটি এইরূপ দাঁড়ায়;—

"বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাযোত্তবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্য
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ॥"

পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "শ্রীমদ্বিশ্বাসভাযোদ্ভবকুলকমলে যিনি ভানুতুল্য দীপ্তিপ্রদান করিয়া পিতৃবংশপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই

কানাইনগর গ্রামে বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রপরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী হইয়া এই বিচিত্র কৃষ্ণগেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" বাণ শব্দ ভগবান মকরকেতনের তূণীরগর্ভস্থ পঞ্চবাণ সূচনা করে; দ্বন্দ্ব শব্দের সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব হইবে না; অঙ্গ বলিতে ষড়ঙ্গই বিঘোষিত হইয়া থাকে, চন্দ্র শব্দ পাঠশালার বালকদিগের চিরাভ্যস্ত একার্থবোধক সুপরিচিত সংখ্যা। সুতরাং ১৬২৫ শকে সীতারাম রায় এই মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৬২৫ শক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন বাঙ্গলাদেশে মোগলের গৃহকলহ উপস্থিত; সম্রাটপৌত্র আজিমশ্বান অথবা ক্রীতদাস মুর্শিদ কুলী খাঁ,—আরঙ্গজীবের বিচারে কাহার জয় হইবে, তজ্জন্য সকলেই আগ্রহাতিশয্যে উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন।

এই মন্দির-ফলকে সীতারাম আত্মবংশের উল্লেখ করিয়া আপনাকে "শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা সীতারামের আত্মম্ভরিতার পরিচয় নহে; লোকে তাঁহাকে তৎকালে কিরূপ গৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করিত, তাহারই পরিচায়ক। ভাষা কথায় লোকে যাঁহাদিগকে "বিশ্বাস" উপাধি ধরিয়া ডাকিত, সেই বিশ্বাসবংশকমলের পক্ষে সীতারাম যে ভানুতুল্য উদ্ভাসক শক্তিরূপে সেকালে লোকসমাজে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই!

একাদশ অধ্যায়।

দিন দিন সীতারামের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সেই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া শীঘ্রই মোগলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। মোগল সে সময়ের বাদশাহ, মোগল সে সময়ের নবাব, মোগল সে সময়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সুতরাং সীতারাম মোগলের নিকট রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিচিত হইলেন। মোগল তাঁহার প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিবার জন্য যথারীতি আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সীতারামের রাজধানীর পূর্ব্ব দিকে মধুমতী নদী; তাহার পূর্ব্ব তীরেই ভূষণার বিস্তৃত জনপদ। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশ ১১ চাক্‌লায় বিভক্ত করেন; ভূষণা তাহার মধ্যে একটি প্রধান চাক্‌লা বলিয়া পরিচিত ছিল। এই চাক্‌লার পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূষণায় একজন মুসলমান ফৌজদার থাকিবার রীতি ছিল। তাঁহার সঙ্গেই সীতারামের সর্ব্বপ্রথম কলহ উপস্থিত হইল।

সেকালের মুসলমান নবাব রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেন না, রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; সুতরাং সীতারাম মোগলকে করপ্রদান করিতে সম্মত হইলে, তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চেষ্টা করিত না। সীতারাম করপ্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি নবাবের আদেশ প্রতিপালন করিতে বা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে সীতারামের কলহ উপস্থিত হইল।

ভূষণার মুসলমান ফৌজদার অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন; অবশেষে বাহুবল প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন সীতারামের সুশিক্ষিত সিপাইদিগের সঙ্গে ফৌজদারের ফৌজদিগের শক্তিপরীক্ষার আয়োজন হইল। মধুমতীর জলস্রোত রুধিররঞ্জিত হইল, হিন্দু ও মুসলমানের শবদেহ কাতারে কাতারে ভাসিয়া চলিল, অবশেষে ফৌজদারের পরাজয় এবং সীতারামের জয় হইয়া সমগ্র ভূষণা অঞ্চল সীতারামের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

রাজা সীতারাম এই বিস্তীর্ণ জনপদে স্বাধীনভাবে আত্মশক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদপুরের ন্যায় আরও অনেক স্থানে দীঘি পুষ্করিণী এবং রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার পাংসা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে এবং মাগুরার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ, হরিহরনগর এবং সূর্য্যকুণ্ডে এই সকল রাজপ্রাসাদাদির কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে যে, সীতারাম নিরন্তর রাজধানীতে আলস্যে কালযাপন না করিয়া, সময়ে সময়ে এই সকল প্রাসাদে বাস করিয়া স্বচক্ষে রাজ্যকার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। সুতরাং সাহস করিয়া কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা সহজ নহে। তথাপি এই সকল ভগ্নকীর্ত্তি দেখিয়া জনশ্রুতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। সেকালের মুসলমান নবাব বা হিন্দু জমিদারগণ প্রায়ই রাজধানীর সযত্নরচিত রাজপ্রাসাদের শীতলকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইতেন না। লোকে তাঁহাদের নাম শুনিত, কিন্তু সচরাচর চর্ম্মচক্ষে দর্শনলাভ করিতে পাইত না। ইহাতে রাজা প্রজার মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতে পারিত না। কিন্তু সীতারাম ইহার ব্যতিক্রম করিয়া সরলভাবে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হইতেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্যে মোগল সহসা তাঁহার

রাজকারাগার ছিল, বিচারালয় ছিল এবং সদর মফঃস্বলে রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য স্থানে স্থানে কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছিল ;—সুতরাং তিনি যেমন বাহুবলে মোগলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া স্বরাজ্যে রাজা নাম সদর্থযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকে সহজেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন রাজশক্তি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। রাজবিধি যদি প্রজাসাধারণের কল্যাণকর হয়, তবে লোকে রাজবিধির প্রতি এবং রাজশক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে, এবং রাজার ব্যক্তিগত স্বভাব যেরূপ হউক না কেন, তাঁহার নিকট রাজভক্তি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। সেকালে রাজশক্তির এরূপ অবস্থা ছিল না। রাজা কেবল স্বভাবগুণে বা ক্ষমতাবলে লোকের ভয়ভক্তি উপহার পাইতেন। সুতরাং রাজার স্বভাব ভাল না হইলে, তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না।

সেকালের রাজদরবারে মৌখিক রাজভক্তির বাড়াবাড়ি থাকিলেও, অনেক স্থলে আন্তরিক রাজভক্তির বড়ই অভাব দৃষ্টিগোচর হইত। সীতারামের রাজ্যে কিন্তু আন্তরিক রাজভক্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রণার সহায়, যাঁহারা তাঁহার বাহুবলের সহায়, যাঁহারা তাঁহার স্বাধীনতালাভের উৎসাহদাতা, তাঁহারা সকলেই এরূপ আন্তরিক স্নেহে তাঁহার সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া থাকিতেন যে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাঁহারা সীতারামের জয়পতাকা রক্ষা করিতে কাতর হইতেন না। এই সকল লোকের ইতিহাস, ইঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ, ইহাদিগের নাম ধাম সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—যাঁহাদের এখনও নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ, গবরদালান, এবং মেনাহাতির নামই সর্ব্বপ্রধান। মেনাহাতির প্রকৃত নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইনি সীতারামের প্রধান সেনাপতি এবং দক্ষিণ বাহু বলিয়া এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত। দৃঢ়োন্নত বলিষ্ঠদেহে মেনাহাতি অমানুষিক বল ধারণ করিতেন ; লোকে সেই জন্য তাঁহাকে মেনাহাতি বলিয়া ডাকিত। ইনি সমস্ত দিন দুর্গমধ্যে সেনাচালনা ও রণশিক্ষা দিয়া রজনীযোগে সীতারামের সিংহদ্বারে শয়ন করিয়া থাকিতেন, সেকালের লোকে অলৌকিক শক্তিতে এত দূর বিশ্বাস করিত যে, সকলেই বলিত মেনাহাতি

না বলিয়া দিলে কেহ কখনও মেনাহাতিকে নিহত করিতে পারিবে না। এই বিশ্বাসে মেনাহাতির সেনাদল সর্ব্বদাই গর্ব্বোন্নতশিরে সর্ব্বত্র আস্ফালন করিয়া বেড়াইত। অকৃত্রিম অনুরাগে, অলৌকিক বাহুবলে, অপরিসীম সাহসে এবং অবিমিশ্র প্রভুভক্তিতে এই বাঙ্গালী বীরপুরুষ স্বদেশে আত্মগৌরবস্মৃতি চিরস্মরণীয় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালী কেবল নাম-মাত্রই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। মহম্মদপুরে তাঁহার যে সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান আছে, কোন বাঙ্গালী কোন দিন তাহাতে জয়মাল্য জড়াইয়া দেয় নাই!

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভূষণা অঞ্চলে সীতারামের একাধিপত্য সংস্থাপিত হইবার পর, নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁ আর তাঁহাকে সহসা পরাজিত করিবার অবসর পাইলেন না। মেজর রেণেল-কৃত প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় যে, সেকালের ভূষণা চাকলার উত্তরে এবং পূর্ব্বে পদ্মার প্রবল প্রবাহ, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পশ্চিমে রাজসাহী ও কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধ জনপদ। পশ্চিম ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়া সীতারামকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু মধুমতী নদীর পশ্চিমতীরে দুর্গরচনা করিয়া সীতারাম আপন রাজ্য বিশেষরূপে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নবাব বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সীতারামের নাম দিল্লীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সেকালে মোগল অমাত্যগণ দিল্লীর দরবার হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে জায়গীর বা রাজ-পদ দিবার জন্য সহজেই সনন্দ প্রদান করিতে পারিতেন। আবুতোরাপ নামক এক জন মোগল সেনাপতি এই সময়ে দিল্লীতে বাস করিতেন। তিনি বাহুবলে সীতারামকে পরাজিত করিতে সম্মত হওয়ায়, বাদশাহের দরবার হইতে তাঁহাকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করা হইল। তোরাপ দিল্লীর দরবারে সবি-শেষ প্রতিপন্ন ছিলেন, আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং আবু তোরাপ সহজেই সনন্দ হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি সসৈন্যে মুর্সিদাবাদের রাজধানীতে শুভাগমন করিয়া যথারীতি নবাব-দরবারে ফৌজদারী সনন্দ দাখিল করিয়া দিলেন, এবং ভূষণা দখল করিবার জন্য নবাবের নিকট সেনাসাহায্য পাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নবাব মুর্সিদকুলী খাঁ তখন পূর্ণিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত; তিনি

সাহের দরবার হইতে আসিয়াছেন; সুতরাং বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আপন যৎসামান্য সেনাবল লইয়া ভূষণার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সীতারামের চর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। দিল্লীতে বা মুর্সিদাবাদে কোথায় কি হইতেছে, সীতারাম তাহা মহম্মদপুরে বসিয়াই জানিতে পারিতেন। তিনি ভূষণা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে স্বাধীনতারক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক দল দুর্গরক্ষার জন্য মহম্মদপুরে রহিল। অপর দল লইয়া সীতারাম ভূষণার মধ্যে চারি দিকে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পশ্চিম দিক হইতে মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া, মধুমতী উত্তীর্ণ হইয়া, ভূষণার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে;—আবু তোরাপ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সামান্য ফৌজ মহম্মদপুরের দিকে পাঠাইয়া দিয়া সসৈন্যে ভূষণা আক্রমণের জন্য ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন না যে, সুচতুর সীতারামও সসৈন্যে ভূষণা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সহসা হিন্দু মুসলমানে দেখা সাক্ষাৎ হইল, আবু তোরাপ ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইতিমধ্যে সীতারামই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। আবু তোরাপের পরিশ্রান্ত সেনাদল সীতারামের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না; অনেকে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল, কেহ কেহ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, এবং যুদ্ধশেষে রুধিরচর্চ্চিত রণভূমে আবু তোরাপের বীরতনু বীরশয্যায় পড়িয়া রহিল। সীতারাম বীর। তিনি বীরবর আবু তোরাপের শবদেহ সযত্নে ভূষণার মধ্যে যথাযোগ্য সসম্ভ্রমে সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিদেশের ইতিহাস-লেখকেরা এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম নবাবের ভয়ে এতই জড়সড় হইয়াছিলেন যে, আবু তোরাপের মৃত্যুতে তিনি সাতিশয় শঙ্কাযুক্ত হইয়া নবাবের মনস্তুষ্টির জন্যই সমুচিত সমারোহে তাঁহাকে সমাধি দিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। *

---

* When Sittaram found it was the Fouzdar he had slain, he much regretted the circumstance; and told his followers that the Nawab would certainly revenge the insult offered to his government, by flaying them

আবু তোরাপের মৃত্যুতে মোগলের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সীতারাম অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল এ নিদারুণ অপমান নীরবে সহ্য করিবে না। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক তাঁহাকে যেরূপ ভীত ও আতঙ্কযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত হইলে অবশ্যই সন্ধিসংস্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে করপ্রদান করিতে সম্মত হইলেই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত; রাজ্য থাকিত, রাজদুর্গ থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব ঘোষণা করিত; এবং হয় ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহ্নে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজা রাজা বা নিতান্তপক্ষে রায় বাহাদুর বলিয়া অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, একটু ক্ষমাভিক্ষা করিলে, একটু অধীনতা-স্বীকার করিলে হাস্যময়ী রাজপুরী এমন শ্মশানভূমিতে পরিণত হইত না। যিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়া বাহুবলে সেই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি যে এতটুকুও বুঝিতেন না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না কেন? এই জন্যই মনে হয় যে, আত্মবংশ বা আত্মপরিবারকে ধনগৌরবে গৌরববান্বিত করিবার জন্য সীতারাম ব্যাকুল হন নাই; বাহুবলে স্বাধীনরাজ্য গঠন করিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের ইতিহাস পড়িতে বসিলে ইহা ভিন্ন অন্য কোন অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায় না!

এই সময় হইতে সীতারাম আত্মকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিণাম চিন্তা করিয়া অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কাল নিকট হইতেছে জানিয়াও, একদিনের জন্য মোগলের পদানত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমরা পরাধীন জাতি; আমাদের অস্থি-মজ্জা অন্তঃসারশূন্য; আপাতরম্য সুখস্বচ্ছন্দতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। আমাদের বিচারে সীতারামকে যদি আমরা অবিবেচক মূর্খ বলিয়া উপহাস করি, তাহাতে সীতারামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না! বঙ্কিমবাবু রাজমহিষী রমার মুখ দিয়া আকারে ইঙ্গিতে সে কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। আমরা রমা-প্রকৃতি বাঙ্গালী পুরুষ, সীতারামের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে শিহ-

---

respectfully delivered the body to the Fouzdar's attendants, who carried it to Bhoosnah, and interred it in the vicinity of that town.

রিয়া উঠিব, এবং বারম্বার জিজ্ঞাসা করিব—এ সব কেন? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতারক্ষার জন্য এত নিষ্ফল প্রয়াস কেন?

স্বাধীনতাই যে মহত্ত্বের একমাত্র সোপান, এবং মহাপুরুষেরা যে কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাসে সীতারাম সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সেকালের বাঙ্গালী যদি সীতারামের সাধু দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতে পারিত, তবে মোগলের গ্রাসবিগলিত সোনার রাজ্য বিদেশের বণিক সমিতি বিনা পণে কুড়াইয়া লইবার অবসর পাইত না!

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে মুর্সিদ কুলী খাঁ সত্য সত্যই বিচলিত হইলেন। তিনি সীতারামের প্রবল প্রতাপে ভীত হইলেন না; তাঁহার মনে হইল যে, বাদসাহ তাঁহাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া এখনই হয় ত আর কাহাকেও বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব করিয়া পাঠাইবেন। সুতরাং তিনি আর বিলম্ব করিতে সাহস করিলেন না। বক্স আলী খাঁ নামক একজন বিশ্বস্ত মুসলমানকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন, এবং যথারীতি দিল্লীর দরবারে সমাচার জ্ঞাপন করিলেন।

এক জন ফৌজদারের শূন্যপদে আর এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করা খুব সহজ কথা। ইঙ্গিতমাত্রে অমাত্যবর্গ সনন্দ প্রস্তুত করিয়া আনিল; অবলীলাক্রমে তাহাতে নবাবের মোহর দস্তখত অঙ্কিত হইয়া গেল। কিন্তু সীতারামকে পরাজিত করিবার উপায় কি,—সে কথা ইঙ্গিতমাত্রে মীমাংসিত হইবার বিষয় নহে।

নাটোর রাজবংশের স্বনামখ্যাত রায় রাইয়ান রঘুনন্দন এই সময়ে নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রভুত্বের অবধি ছিল না। রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ রামজীবনের প্রবল প্রতাপ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব অনন্যোপায় হইয়া রামজীবন এবং রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন। সীতারামের রাজ্যের উত্তর এবং পশ্চিমে রামজীবনের বিস্তৃত জনপদ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সীতারামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা খুব সহজ। রঘুনন্দন প্রতিভাবলে সকলের নিকটই সুপরিচিত হইয়া [illegible]

স্থির করিলেন যে, চারিদিক হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা রহিত করিতে হইবে, এবং জমিদারী ফৌজ ও সুবাদারী সিপাই সম্মিলিত করিয়া ভূষণারাজ্য অবরোধ করিয়া ধীরে ধীরে সীতারামকে বশীভূত করিতে হইবে। যেমন পরামর্শ হইল, জমিদারদিগের উপর সেইরূপ আদেশলিপি প্রচারিত হইল।

কেহই এই রাজাদেশ অবহেলা করিতে সাহস পাইল না; সুতরাং পদ্মা, গৌরী, মধুমতী, জলঙ্গী প্রভৃতি নদীস্রোতের সঙ্গে যে সকল পণ্যদ্রব্য সীতারামের রাজ্যে বাহিত হইত, তাহার সমাগম সহসা রহিত হইয়া গেল। চরমুখে এই সকল গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া সীতারাম বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঘটনাচক্রে নিতান্ত নিরীহস্বভাব ভালমানুষকেও দুর্দ্দান্ত করিয়া তুলে; সীতারামেরও তাহাই হইল। তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, বাণিজ্যদ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রী আমদানী হইতেছে না, তখন আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করিতে হইল। যুদ্ধকলহে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করা দোষাবহ নহে। কিন্তু ইতিহাসলেখক সকল সময়ে সে কথা স্মরণ করিতে চাহেন না। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম নৌকাপথে দেশ লুট করিয়া বেড়াইতেন; তিনি শুধু বিদ্রোহী নহেন, পরাক্রান্ত উৎপীড়নকারী দস্যু! *

যাঁহারা দিগ্বিজয়ী সেকন্দার বাদশাহ এবং দস্যুদলপতির উপকথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাদশাহ এবং দস্যুর মধ্যে বাদশাহই প্রকৃত দস্যু। সীতারাম দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু উদরান্নের জন্য, যানবাহনের জন্য, অথবা কেবল শত্রুপক্ষকে অপদস্থ ও হীনবল করিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতিমাত্রই সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

সীতারামের অত্যাচারে সুবাদারী সিপাহীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; মেনাহাতির প্রবলপরাক্রমে জলস্থল কম্পিত হইতে লাগিল; গ্রামে নগরে, লোকালয়ে, নিবিড় বনে, নদীসৈকতে, সর্ব্বত্র খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে সকল কলহে সীতারামকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিল না।

নাটোর রাজবংশে দয়ারাম রায় নামে একজন বিচক্ষণ প্রভুভক্ত সাহসী ও

---

* Sittaram kept in his pay a band of robbers, with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers, and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Fouzder

প্রতিভাসম্পন্ন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বাহুবলে ও পদগৌরবে নাটোরাধিপতি মহারাজাধিরাজ রামজীবন যেমন লোকসমাজে সুপ্রথিত, অসীম সাহসে ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে দয়ারাম রায়ও সেইরূপ সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। দয়ারাম নাটোর রাজসরকারের দক্ষিণবাহু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যখন সীতারামকে পরাজিত করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন দুই দিক হইতে দুই দল সেনা প্রেরিত হইল। সুবাদারী সিপাহীদিগের অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ এবং জমিদারী ফৌজের অধিনায়ক দয়ারাম রায়, যুগপৎ ভূষণা আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাস চিরদিনই একরূপ। বাঙ্গালীই চিরদিন বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী যদি স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও বদ্ধপরিকর হইত, সপ্তদশ অশ্বারোহীর অধিনায়ক স্থূলোদর খর্ব্বদেহ মর্কটাকার ব্যক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপে শুভাগমন করিবার অবসর পাইতেন না! বাঙ্গালী যদি একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, আজ যাঁহারা রাজা, হয় ত তাঁহারা চিরদিনই বাণিজ্যব্যাপার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বাঙ্গালীর ধারাবাহিক ইতিহাস চিরদিনই একরূপ, চিরদিনই বাঙ্গালীর মন্ত্রণাকৌশলে অথবা অযথাবিন্যস্ত বাহুবলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সীতারামেরও তাহাই হইল!

দয়ারামের কৌশলে মেনাহাতি নিহত হইলেন! মেনাহাতির হত্যাকাণ্ডে দেশের লোক শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাকে কেহ সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে সাহস পাইত না; সুতরাং দয়ারাম সম্মুখযুদ্ধের আয়োজন করিলেন না। গুপ্তচরের সাহায্যে অল্প কয়েক জন লোক মহম্মদপুরে প্রবেশ করিয়া, সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সীতারাম ভূষণায় এবং মেনাহাতি মহম্মদপুরে সসৈন্যে রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন। মেনাহাতি অতিপ্রত্যূষে নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইতেন; সাহসী সেনাপতি সঙ্গে অনুচরমাত্র লইতেন না। সেই গুপ্তসংবাদ পাইয়া দয়ারামের অনুচরবর্গ একদিন প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া মেনাহাতিকে অন্যায় কৌশলে শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মেনাহাতির জীবন ও মৃত্যু অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তীতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। লোকে বলে যে, মেনাহাতি শূলবিদ্ধ হইয়াও মরিলেন না; জর্জরিতদেহ রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি প্রাণবায়ু বাহির হইল না। অবশেষে তিনি আর অনর্থক যন্ত্রণাবহন করা

মেনাহাতি নিহত হইল, কিন্তু মহম্মদপুর হস্তগত হইল না। গুপ্তচরগণ রাজরোষ উদ্দীপ্ত করিয়া গোপনে নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িল; সীতারাম এই সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং যথোচিত সমারোহে মেনাহাতির কবন্ধদেহের সৎকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জমিদারী ফৌজের অধিনায়ক মেনাহাতির ছিন্নমুণ্ড লইয়া নবাবদরবারে উপনীত হইলেন। সে বীরমস্তক যেন ভীমের মস্তক। নবাব তাহা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, হায়! হায়! এমন মহাবীরকে হত্যা করা হইল কেন? ইহাকে সশরীরে কারারুদ্ধ না করিয়া গুপ্তভাবে নিহত করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। * তিনি সসম্ভ্রমে সীতারামের নিকট সে বীরমুণ্ড উপহার পাঠাইয়া দিলেন। মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সেই বীরমুণ্ড সমাহিত হইয়াছে; সীতারাম তাহার উপর যে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মেনাহাতিই সীতারামের দক্ষিণবাহু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেনাহাতি নিহত হইলে সীতারামের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। চারি দিক হইতে নবাবের ফৌজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কালক্রমে সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে, বক্স আলী খাঁ সীতারামকে ও তাঁহার পরিবারস্থ সমুদায় নরনারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে চালান দিয়াছিলেন; নবাব সীতারামের স্ত্রীপুত্রদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া সীতারামকে শূলদণ্ডে নিহত করেন, এবং সগৌরবে দিল্লীতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করেন। †

---

* It is narrated that his head was sent to the Nawab at Moorshedabad and that the Nawab, seeing the huge head, said,—"A man like that you should have brought alive and not killed." He directed the head to be taken back to Muhammedpore, and it was there buried, and a great tomb raised over it. The spot marked by the brick foundation of the tomb is still shewn, close to the north east corner of the present bazar.—J. Westland.

† These proceedings were entered in the public records; and the Governor wrote a particular representation of all the circumstances to the Emperor, placing his own conduct in the most favonrable point of view.—Stewart.

মুসলমানদিগের এই কাহিনী ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রাজসাহী প্রদেশে আজিও সীতারামের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; এ দেশের লোকেও মুসলমানদিগের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। নলডাঙ্গার রাজসরকার হইতে সীতারামের স্ত্রীপুত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃত্তিলাভ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ বা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করার বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দিল্লীর দরবারে বাহবা পাইবার জন্য নবাব বাহাদুর যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসলেখকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সীতারাম শূলদণ্ডে নিহত হইলে অবশ্যই তাহার জনশ্রুতি বর্ত্তমান থাকিত।

ভূষণারাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বিজয়োন্মত্ত জমিদারী ফৌজ মহম্মদপুর লুটিয়া লইল। দয়ারাম রায় এই অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নবাব-দরবার হইতে "রায় রাইয়ান্" উপাধি লাভ করিলেন। * সীতারামের সুবিস্তৃত রাজ্য মহারাজা রামজীবনের রাজসাহী-রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ দিল্লীর দরবারে যেরূপ ভাবে বিজয় ঘোষণা করুন না কেন, মহারাজা রামজীবনের সনন্দে কিন্তু ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কেবল ইহাই লিখিত আছে যে, অন্য লোকে ভূষণা চাক্‌লার জন্য যে পরিমাণ রাজকর দিতে চাহিল, রামজীবন তদপেক্ষা অধিক রাজকর দিতে অঙ্গীকার করায়, চাক্‌লা তাঁহারই জমিদারীভুক্ত করা হইল।

ভূষণা রাজসাহী রাজ্যে ভুক্ত হইয়া গেল। দয়ারাম তাড়াতাড়ি আপন বাটী দিঘাপতিয়াতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, ভূষণা লুটের মূল্যবান সম্পত্তিগুলি বুঝি দিঘাপতিয়ায় চলিয়া গেল। নাটোর রাজবংশের কুমার কালিকাপ্রসাদ গোপনে সন্ধান লইবার জন্য দিঘাপতিয়ায় উপস্থিত হইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে সংশয় দূর হইয়া গেল। সাহসী সুচতুর দয়ারাম পরমভক্ত বৈষ্ণব; তিনি সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহদলন করিয়াছিলেন, কিন্তু লুটের দ্রব্যের কপর্দ্দকও স্পর্শ করিতে সাহস করেন নাই। যে ভাবে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তকাল

* The Rajas of Rajshahi.

করিয়া যে অর্থাগম হয়, তাহা প্রতি বৎসর সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রয়োজন মত টাকা জমিলেই মেয়েটিকে কলেজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডকে "শিক্ষা-উদ্যান" বলে। কখনও বা বালিকা একটা "কলেজীয় গাভী" প্রাপ্ত হয়। সে উহার দুগ্ধ দোহন করে, এবং সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত, মাখম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আইসে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমিতে থাকে। ইহার উপর আবার "কলেজীয় মুর্গী" আছে। ইহারা "কলেজীয় ডিম্ব" প্রসব করে। সেই ডিম্ববিক্রয়ে কলেজী বিদ্যালাভের যোগাড় হয়।

কিন্তু উহাতে সব সময় কুলাইয়া উঠে না। কাজেই ছাত্রীগণকে আপনাপন স্বাধীন পথ দেখিয়া লইতে হয়। পথও ইতিমধ্যে নানাবিধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোর্ডিং বিদ্যালয়ে অনেক স্থলে চাকর চাকরাণীর পরিবর্ত্তে দরিদ্রা ছাত্রীদিগকেই ঘরকন্নার কাজ করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে তাহারা শিক্ষাকল্পে অল্পবিস্তর বেশ সাহায্য পাইয়া থাকে। সেঞ্চুরীর লেখিকাও এই উপায়ে কলেজী বিদ্যা উপার্জ্জন করেন।

ঘরকন্নার কঠিন কঠিন, কষ্টসাধ্য যে সব কাজ,—যথা, বাসন মাজা, কড়া মাজা, রন্ধন করা প্রভৃতি,—তাহা দস্তুর মত চাকরদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এ সব কাজ কোনও ছাত্রীকে

গৃহস্থালী।

করিতে দেওয়া হয় না। খাবার-ঘরের যা কিছু কাজ, সে সব ছাত্রীরাই করে। কেহ বা কখনও কখনও রন্ধনবিদ্যায় আপনার বাহাদুরী দেখাইবার অনুমতিও প্রাপ্ত হয়। তবে উহারই মধ্যে যেটুকু সৌখীন, সেইটুকুই করিতে পায়;—মোটা কাজে হাত দেওয়া নিষেধ। আমাদের বেথুন কলেজে অন্ততঃ এই রন্ধনের বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষীয়গণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু ইহাতে সস্তা মোটার বিচার করিলে চলিবে না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য না হউক, শিক্ষার জন্যও ইহার প্রয়োজন। আজ কালকার গৃহস্থ[illegible], রন্ধনশালাকে অঙ্গলাবণ্যের নিতান্ত গ্লানিকর জ্ঞান করিয়া, বামুন ঠাকুর বা ঠাকরুণের হস্তেই উহার একাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। এদিকে বাবু ভায়ার দলকে দিন আট্‌টা হইতে রাত আট্‌টা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। বেচারী সব তৃপ্তিপূর্ব্বক পেট পুরিয়া যে চাট্টি ভাত খাইবে, সে গুড়েও ক্রমশঃ বালি পড়িয়া আসিতেছে!

স্কুলের ঘণ্টা বাজান, কাপড় চোপড় কাচিয়া ইস্ত্রী করা প্রভৃতি আরও কয়েকটি কাজ ছাত্রীরা করিতে পায়। ইহাদিগকে এক প্রধানা গিন্নীর অধীনে কাজ করিতে হয়। প্রকৃত

কলেজে দাস্য।

চাকরদিগের সংস্পর্শে কখনও আসিতে হয় না। যে [illegible] ছাত্রী বড়-মানুষের মেয়ে, তাহাদের সহিত এই দরিদ্রাদিগের কোনও প্রকার প্রভেদ করা হয় না! কেবল দরিদ্রাগণ বিশ্রামের সময় বড় বেশী পায় না,—এই [illegible] অনেক সময়ে বড় মানুষের ঝীদিগের অপেক্ষা এই গরিবের মেয়েরাই গুণবত্তায় [illegible] করিয়া থাকে। শ্রীমতী এলিজাবেথ বলিয়াছেন,—"আমাদের সময়ে যিনি সঙ্গী[illegible] ছিলেন, তিনি এক জন পল্লীনিবাসী যাজকের কন্যা। ইনি প্রত্যহ দুই [illegible] লইয়া চিনের বাসনগুলি পরিষ্কার করিতেন। অপরাহ্ণ [illegible] সেই হস্ত [illegible] পিয়ানোর উপর খেলিতে থাকিত, তখন তাহাতে কি মধুর সঙ্গীতই বাহির হইত! [illegible] সঙ্গীত-গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইতাম, আর পরস্পরকে বলিতাম,—কি চমৎকার প্রতিভা!"

দারিদ্র্যবশতঃ নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, কেবল আমোদের জন্য কোনও ছাত্রীকে

সক নয়, দরকার।

এইরূপ গৃহকার্য্যের ভার লইতে দেখা যায় না। অনেক সময় এই সকল ছাত্রীদিগের হৃদয়মহত্ত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত শুনুন। এক বালিকা নিজের ও তাহার পিতামাতার পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার সাহায্যে, চারি

...ক সাহিত্য সমালোচনা।

...নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা" ... উপযোগী নহে,—কিন্তু প্রবন্ধটিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের ...।" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের লিখিত একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে ... শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "শিখ সম্প্রদায়ের অধঃপতন" তাঁহার ...ত প্রবন্ধাবলীর একটি অংশ। কবে শেষ হইবে? "ইংরাজি ও ...ত লেখক বিলাতি থিয়েটারের দৃশ্যচিত্রাদির সহিত দেশীয় রঙ্গ- ... করিয়াছেন। দেশীয় রঙ্গভূমির সহিত বিলাতী থিয়েটারের ...শের পক্ষে য়ুরোপীয় শিল্পসৌন্দর্য্যের অনুকরণ অসাধ্য ও অসম্ভব। ...র এক অন্তরায় আছে;—সাধারণতঃ দেশীয় দর্শকের পকেটে ...দের ঘটেও তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির অভাব। এই জন্যই বোধ করি ...বিকতার এত প্রাদুর্ভাব। দর্শকদের মধ্যে স্বভাবের আদর্শে শিল্প ...কিলে, দেশীয় রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণ বাধ্য হইয়া সে বিষয়ে অবহিত ... মূলে তাহার অবসর নাই। এই জন্যই দেশীয় রঙ্গালয়ে দর্শকদের ...র মেজ বউ' তথাকথিত খিড়কীর ঘাটে নাচিতে থাকে, আশু- ...র শব্দে করোগেটেড্ ছাদ প্রতিধ্বনিত করিয়া আনন্দ উপভোগ ... না হইলে, সুসাহিত্য ও সুকুমার শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক অনু- ...না হইলে, য়ুরোপীয় থিয়েটরের বিন্দু বিসর্গও এ দেশে অনুকৃত বা ... রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এ বিষয়ে সাধারণের পথপ্রদর্শক হইতে ... জাতীয় রুচি প্রবৃত্তির নিয়ন্তা নহেন। পক্ষান্তরে, সাহিত্য ও ...ক্ষেত্রে তাঁহাদের এখনও অনেক কর্ত্তব্য আছে;—সর্ব্বথা লোকের ... তাঁহারা সাধারণকে উচ্চ আদর্শের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা ...মাদের বিশ্বাস, সাধারণ দর্শকগণের রুচি উন্নত হইলে রঙ্গালয় ...হা না হইলে কোনও কালে রঙ্গালয়ের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। "বসন্তে" ... একটি কবিতা। সুধীন্দ্র ব... লইয়া বঙ্গসাহিত্যের আসরে ...। আমরা এই নূতন কবি... তীক্ষা করিতেছি। "সিরাজ- ...তেছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "দুটি সাহেবের দৌত্য" আর ... ভাষা একটু জটিল।

...ন। প্রথমেই শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "বিদ্যাসাগর"। উক্ত ...বলিতেছেন,—"পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র, বাবু নারায়ণচন্দ্র ও বাবু সুরেশ- ...সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন।" আমি বিদ্যাসাগরের ...কোনও উপকার করিতে পারি নাই। বিদ্যাসাগরের একজন জীবন- ...চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত জীবনচরিতের ভূমিকায় আমার নাম ... এবং চণ্ডী বাবুকে আমার নাম তুলিয়া দিতে বলি। চণ্ডী বাবু ... সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত তিনি আমার ...ই। মান্যবর ক্ষীরোদ বাবুর প্রস্তাবে ইহার পুনরুল্লেখ দেখিয়া ...ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইল। ক্ষীরোদ বাবু ইহার পরেই ...য়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভ্রমনিরাস নামক গ্রন্থে যে মৎসরতার পরিচয় ...বংশীয়েরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে